CUK- H01827-6-P030199

মহিষাসুরমর্দ্দিনী

("দক্ষিণ ভারতপথ" হইতে শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে) (মহাবালিপুরমের গুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ প্রাচীন দশভূজামূর্ত্তি)

6

P 30199

দশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ | ১ম সংখ্যা

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্থু—

সকালে আমরা লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। ায় আরবারে ছিলুম আসছে সপ্তাহে যাব এখন সেখানে জায়গা খালি হয়নি। লিম্পিক বলে যে জাহাজে চড়ে আটলান্টিক ছি সেই জাহাজটা বোধকরি পৃথিবীর মধ্যে া বড় জাহাজ। শান্তিনিকেতন থেকে ন্ত যতটা ততটা লম্বা হবে। আমরা যে ্যাবিনে ছিলুম সে ডেকটা পঞ্চম তলার ়ং তার উপরে থাকে থাকে আরও চার বিন আছে এবং তার নিচেও অনেক তলার এর থেকে বুঝতে পারবে জাহাজটা কত উঁচু। তা ছাড়া শয়নাসন আরাম বিরাম আহার বিহারের যে ব্যবস্থা সে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ছদিন মাত্র মেয়াদ কিন্তু এই ছদিনের জন্যে রাজকীয় আয়োজন এই বিপুল ভোগের বোঝা বহন করে বেড়াবার যে শক্তি তা কল্পনা করলে বিস্মিত হ'তে হয়—কোথাও লেশমাত্র মলিনতা বা শিথিলতার চিহ্নটুকু নেই। এত বড় একটা উদ্যোগ কিন্তু কোন খানে প্রয়াসের কোনো লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায় না! আমাদের মস্তিষ্কে হৃৎপিণ্ডে পাক যন্ত্রে যেমন অহরহ একটা বিচিত্র এবং বৃহৎ চেষ্টা চলেছে অথচ আমরা সমস্তকে কেমন অনায়াসে বহন করে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি এ কতকটা যেন সেই

রকম। যে শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ও সচেষ্ট থেকেও আপনাকে সুবিহিত পারিপাট্যের মধ্যে সমাবৃত রাখতে পারে তাকে দেখে মনের মধ্যে সম্ভ্রম জন্মায় বিশেষতঃ এই জিনিষটা আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাইনে। সেখানে শক্তির রথ গোরুর গাড়ীর মত, তার সামর্থ্য অল্প, সে চলে কম, সে শব্দ করে বেশী, তার বাহন বেচারা অবিশ্রাম ল্যাজ মলা খায় এবং তার চালকেরও মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম নেই।

আমাদের আশ্রম বিদ্যালয়ের ললাট থেকে এই কুণ্ঠার কুঞ্চনরেখা এখনো ঘোচেনি। আমাদের ত্যাগের মধ্যে চেষ্টার মধ্যে ক্লেশ রয়েছে; যতদিন আমাদের মধ্যে দীনতা থাকবে ততদিন এই ক্লেশের ভার আমাদের বহন করে চলতে হবে। ততদিন এর চাকার ভিতর থেকে আর্ত্তস্বর শুনতে পাবো। কিন্তু তবু এ ক্লেশ স্বীকার করতে হবে; এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা করলে চলবে না। কেননা চলতে চলতেই তবে চলবার বাধা ক্ষয় হয়। আমাদের আত্মার দীনতা ধনের দীনতার মত নয়, দান করতে করতেই তার দৈন্য হ্রাস হতে থাকে তার ভার বহন করবার দুঃখটা বহন করবার দ্বারাই দিনে দিনে লঘু হয়ে আসে, বস্তুতঃ শ্রমের দ্বারাই তার শ্রান্তি দূর হয়ে আসে। এইটেই কি আমাদের আশ্রমের সাধনার ভিতর থেকে [illegible] দেখতে পাইনি? কিন্তু অধীর হলে চলবে জীবনের কার্য্য ইমারৎ গেঁথে তোলার ম[illegible] কতখানি অগ্রসর হল কিছুই স্পষ্ট দেখা যা[illegible] এমনকি অনেক সময় বিরুদ্ধ আকারে সে আ[illegible] প্রকাশ করে, সেই জন্যে আমি বাইরের দিক সফলতার বিচার করতে চাইনে; আমি কেব[illegible] টুকুই দেখতে চাই, আমি যেন সত্য হতে [illegible] আমি এই জানি আমার উপর যে দাবী আ[illegible] আমাকে যেমন করে হোক পূরণ করতেই [illegible] এ দাবী অন্যে স্বীকার করছে কি না সে[illegible] বিচার করতে গেলেই নিজের দায় অন্যের[illegible] চালাবার দুর্ব্বলতা মনকে পেয়ে বসে। [illegible] অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার যা বোঝা পড়া আ[illegible] আমি জানি—আমি আর কিছুই জানিনে [illegible] চেষ্টা করতে গেলে পদে পদে ভুল বিচার[illegible] তাতে কেবল অপরাধ বাড়তে থাকে। [illegible] দাবী হচ্চে কেবল দেবার দাবী—অন্যে[illegible] থেকে পাবার দাবী কিছুই নয়—এই[illegible] যেন প্রসন্ন মনে অন্তরের মধ্যে জাগরূক[illegible] পারি।

অস্তি, নেতি, স্বস্তি

শ্রী সুধাময়ী দেবী

মান যুগে মানুষ চারিদিকেই দেখিতেছে প্রবলের ‍ দুর্ব্বলের প্রতি; প্রকৃতির মধ্যেও দেখিতেছে প্রতীয়মান খামখেয়ালীর খেলা।

র্ব্বের ধর্ম্মবিশ্বাস—ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ ও দয়ার দৃঢ় ধারণার মূলে আঘাত পড়িতেছে চারিদিকে য় লীলা খেলার প্রভাবে।

জ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার ও বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আপনাকে সর্ব্ব-ন মনে করিতেছে—এবং সেই শক্তি শুভ অশুভ দ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতেছে।

ক্তি লাভ ও শক্তির প্রয়োগ মানুষ করিবে ইহা ক। কিন্তু শক্তির অপপ্রয়োগ সেখানেই হয় তাহা অপরের ক্ষতিকর। আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু সেই স্বার্থ র্ণতার চরম সীমায় উঠিয়া অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ যায় তখন তাহাকে যুগে যুগে মানুষই বলিয়া ছ অধর্ম্ম।

র মূলগত অর্থ হইল যাহা ধারণ করে—ধারণ করে নুষ্যত্বকে।

ত্ব বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই হত্ব দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলে। ক্ষুদ্রতাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় তখনই ত্বের বিকাশ। মানুষের যথার্থ ধর্ম্ম তাহাকে মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে—বিনষ্ট হইতে দেয় না।

ংগ্রাম, এই সংঘাত কোথা হইতে উদ্ভূত হয়? মহত্তর, বৃহত্তর "আমি" তাহাকে নিশ্চিন্ত ভাবে গণ্ডীতে নামিয়া যাইতে দেয় না। ক্ষণিকের য়ত বা মানুষ সঙ্কীর্ণ পশুবৃত্তিকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া রতে পারে, কিন্তু যথার্থ শান্তি সে কখনও লাভ পারে না।

ত্বের এই আদর্শ মানুষকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মানুষের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ। এই ঘনিষ্ঠতা যতই উপলব্ধি করে ততই অপরের প্রতি তার কর্ত্তব্য বড় হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সারাক্ষণ মানুষ এই মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকেনা! ক্ষুদ্রতার মধ্যে হয়ত বা ডুবিয়া যায়; কিন্তু বস্তুতঃ মহৎ প্রবৃত্তি তাহার অন্তরে সুপ্তাবস্থায় নিহিত রহিয়াছে—যেমন মানুষের জ্ঞান তাহার সুপ্তাবস্থায়ও থাকে তাহার অজ্ঞাতে। জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসে।

সুপ্তাবস্থায় যেমন তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, জাগরণের সঙ্গে ফিরিয়া আসে, তেমনি বিশেষ মানুষ জানিবার আগেও বৈজ্ঞানিক সত্য যাহা—তাহা ছিল। মানুষ সেই সকল সত্য ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ—যাহা তাহাদের অজ্ঞাতে ছিল—তাহাই তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে শক্তিও বাড়িতেছে।

শক্তিলাভের মাদকতায় মানুষ ভুলিয়া যাইতেছে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের সামান্য আভাস সে লাভ করিয়াছে। সামান্য জ্ঞানলাভ করিয়া কত বিপদ, দুঃখকে সে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখ অপসারণের ক্ষমতা লাভ করিয়া আবার অপরকে দুঃখ দিবার দানবীয় প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসে। শক্তির অপপ্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

এই প্রবৃত্তির মূলেও মানুষের অজ্ঞতা। বিরাট এই জগতের নিয়ন্তা যিনি, এই জগৎ ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও তাঁহার হাতে। তবে কেন নিয়মের মধ্যে তিনি ইহা ধ্বংস করিতেছেন না? তাহার কারণ তিনি কেবল সর্ব্বশক্তিমান নহেন—তিনি প্রেমময়।

ভগবানের প্রেম, দয়া সম্বন্ধেও অবশ্য নানা প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে। ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় লোকক্ষয় দেখিয়া ভগবানের প্রেম সম্বন্ধে অনেক সময় সংশয় হয়। কিন্তু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট পায়। মানুষ যত

জানিতেছে ততই এই সকল বিপদ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছে।

বিরাট জগতের গঠন আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ফলে কিছু সাময়িক ক্ষতি অনিবার্য্য। প্রাণী জগতেও যেমন জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ও প্রলয় অবিচ্ছেদ্যভাবে কাজ করিতেছে! কিন্তু সমগ্রভাবে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে আমরা দেখিতেছি সাময়িক দুঃখ, অশুভের মধ্যদিয়া শুভেরই সূচনা হইতেছে। যা কিছু দুঃখ তা জ্ঞানেরই অভাবে।

জ্ঞান যথার্থ লাভ করিলে প্রেমের অনুভূতি স্বভাবেই আসে। যে যথার্থ জ্ঞানী সে আবিষ্কার করে পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে একটী অখণ্ড যোগসূত্র। কোন বস্তু কোন প্রাণী, কোন ঘটনা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একক নয়! পরস্পরের সঙ্গে এই যে সম্বন্ধ এই যে একত্ব উপলব্ধি, তাহার পরেই আসে পরস্পরের প্রতি মমত্ব! এই মমত্ব বোধ অবশ্য নানা স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

প্রথমে অল্প কয়েকজনকে আমার মনে করিয়া অপর সকলকে "আমার নয়" বোধে মানুষ বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখে। আপনার জনের সুখ সাধনের জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে।

এইরূপেই নানা বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি। কিন্তু মমত্ব বোধ ক্রমশঃ প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে আমার বা আত্মীয়ের গণ্ডীও প্রসারিত হইতে থাকে! যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এই বৃহত্তর আমির আভাস পাইয়া পৃথিবীর সকল মানবের কল্যাণ কামনায় হাসিমুখে দুঃখবরণ করিয়া লইয়াছেন।

কেবল কি মহাপুরুষগণই এই বৃহৎ মমত্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন? জগৎ আগাইয়া চলিয়াছে এই যোগসূত্রকে আবিষ্কার করিতে করিতে; এই মহামানবের সাগরতীরের দিকে! মাঝে মাঝে হিংসাবিদ্বেষের ঢেউ দেখিয়া অভিভূত হইয়া মানুষ হতাশ হইয়া ভাবে হিংসা দ্বেষই বুঝি চরম লক্ষ্য।

কিন্তু মহামানবের সাগর সঙ্গমে যাবতীয় বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির স্রোত আসিয়া মিলিত হইতেছে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত গতিতে, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মমত্ববোধের অগ্রগতির পথে হিংসা বিদ্বেষের আলোড়ন অনিবার্য্য। ইহা দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই।

প্রথমে মানুষের কাছে কেবল সে নিজেই
তার নিজের অস্তিত্বই একমাত্র সত্য, অপর সকলে
অকিঞ্চিৎকর। ক্রমশঃ অল্প কয়েকজনের অস্তি
নিজের মতই তাহার নিকট বড় হইয়া দেখা দে
আমি ও আমার স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অপ
করিতে অপরের স্বার্থ গ্রাস করিতে সে হয় উদ্যত

তাহার নিজের অস্তিত্ব ব্যতীত অপর সক
নিকট নাস্তি।—এমন কি এইরূপে নিজের অ
করিবার সর্ব্বনাশা প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসে!

এই সর্ব্বনাশের স্তর পার হইয়া আসিয়া
নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে হইলে অপরের
মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে চলে না; কারণ পরস্প
বিচ্ছিন্ন নয়, একে অন্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত।
আসে স্বস্তির অধ্যায়।

বর্ত্তমানের এই সর্ব্বনাশা সর্ব্বগ্রাসী স্বা
ঢেউ দেখিয়া স্বভাবতই নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। বি
নব যুগেরই পূর্ব্বাভাস। অন্ধ স্বার্থান্বেষণের
চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া সমূহ বিনষ্টির পর সু
সূচনা করিয়া দিবে।

সূচনা ত হইয়াছেই কেবল স্থিরভাবে সেই গ
করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে

জ্ঞানে, বীর্য্যে, প্রেমে মণ্ডিত মানুষ আ
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনারই সমকক্ষ অপরকে
দান করিবে।

সমকক্ষতার মাপকাঠি অবশ্য আত্মীয়তা বো
উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আত্মীয়ের যোগ্যতা
উপলব্ধি করা যায়, অপরের যোগ্যতা
দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আত্মীয়তাবোধের সাধনা মানুষ যুগে
আসিয়াছে। ক্ষণিকমোহের বশে যদি সে
রুদ্ধ হইয়া থাকে তবে হতাশ হইলে চলিবে না।
সকল শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্য হইক হৃদয়ের সম্প্র

হৃদয়ের সম্প্রসারণ অবশ্য বিচারবুদ্ধি দ্বা
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে নতুবা শুভাশুভ নি
হইয়া পড়িবে।

প্রেম ও পাষাণ

নাটিকা

শ্রীকণা দত্ত

"যাঁরা আছেন"—

ভগবান গৌতম বুদ্ধ

—অম্বরীষ—মৃগদাবের রাজা

রূপকেতু—ঐ কুমার

রঞ্জন—সভাকবি, কুমারের বন্ধু

বিধায়ক—মন্দিরের পুরোহিত, রাজার বন্ধু

পার্থসারথি—ঐ নবাগত শিষ্য

অনাথ পিণ্ডদ—বৌদ্ধ ভিক্ষু (বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য)

আনন্দ— ঐ

বনশ্রী—(পরে নবনীতা) বিধায়কের পালিতা কন্যা দেবতার সেবাদাসী।

সুকৃষ্ণা—বনশ্রীর সখী (পরে সঙ্ঘমিত্রা)

দীপঙ্কর—সুকৃষ্ণার স্বামী (পরে শ্রীজ্ঞান)

পরিচারিকা, অম্বালিকা, পরিষদ জয়ন্ত, সভাসদ্‌গণ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ।

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

জেতবনের সঙ্ঘবিহার। ভোরের আলো সবে সুপরিস্ফুট হইতে সুরু করিয়াছে। ভগবান সিদ্ধার্থ এক অশোক তরুমূলে প্রস্তরবেদীতে একাকী ধ্যাননিমগ্ন। মাথার চুলগুলি চূড়ার আকারে মস্তকে শোভিত। সৌম্য প্রশান্ত আননে শান্ত সহাস দিব্য জ্যোতি বিরাজমান। সঙ্ঘবিহারের মধ্য হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের অপূর্ব্ব স্তোত্রমন্ত্রের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে।

"অক্কোচ্ছি মং অবধি মং
অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপন্ যহন্তি
বেরং তেসূপসম্মতি॥"

সূর্য্যালোক মুখে পড়িল। গৌতমের ধ্যান ভাঙি নীলোৎপল কমল আঁখিদুটী মেলিয়া ভগবান চাহিলেন।

বুদ্ধদেব

কালস্রোতে মানবের জন্মজন্মান্তর
ঋতুসম ক্রম বিবর্ত্তনে
অতীত সময় হোতে ভবিষ্যের পানে
চলিয়াছে অগ্রসর হয়ে।
কেনো এই অভিযান—
কেনো এত আয়োজন, কেনো এ সন্ধান ?
জীবনের প্রতি প্রয়োজনে—
মানব জানেনি আজো সত্য অর্থ তার ;
মিথ্যারে সজ্জিত করি
বারে বারে করিয়াছে ভুল,
সত্যের শুভ্র ছদ্মবেশে,
চরিতার্থ করিছে সকলে
নিজ নিজ পশুবৃত্তি যত।
কতো যুক্তি ছলনার রচিয়া শিবির
আবরিয়া রাখিয়াছে কালের কালিমা
নিশাচর পেচকের মতো।
অজ্ঞান মানব তার প্রাণতরুমূলে
বারংবার নিজ হাতে হানিছে কুঠার
মায়া মোহে ভুলিয়াছে আপন স্বরূপ
হারায়েছে চেতনা ও আত্মার সন্ধান।
অজ্ঞানতা—মৃত্যু জরা দুঃখ দীর্ঘশ্বাস
হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব আর লোভ
প্রতি পলে মানুষের জীবনের সুধা
তিলে তিলে করিছে হরণ ;
অমর অমৃত হোতে অমৃতের পুত্রদের
ছলনায় করিছে বঞ্চিত।—
কবে এ মানব-স্রোত গভীর তিমির হোতে

মুক্তি পাবে জ্ঞান আর সত্যের আলোকে
রাহুমুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের মতো
সত্যের সাম্রাজ্য কবে প্রতিষ্ঠিত হবে ?
(ক্ষণেক থামিলেন)
সত্য ও জ্ঞান যেথা পাশাপাশি
লভিয়াছে স্থান
সে স্থান অমর।
সর্ব্ব শোক, জরা মৃত্যু, সর্ব্বকালজয়ী
মানব রচিতে পারে নিজ নিজ মনোমাঝে
সে রাজ্যের রাজসিক শোভা।
সত্য ও জ্ঞানের সে গেহে,—
মানবের সর্ব্ব বাধা সকল সংশয়
দিগন্তে বিলীন হবে ॥
সূর্য্যোদয়ে কুহেলীর মতো ;
সর্ব্ব দুঃখ দৈন্য হবে শেষ—
ছিন্ন হবে সর্ব্বগ্রাসী কালের বন্ধন,
মানবের চিরমুক্তি হবে ।
হিংসার হোমানলে প্রতিদিন শত শত প্রাণ
ভস্মসাৎ হয়ে যায় আহুতির রূপে ;
মায়া আর মিথ্যার পূজায়
কেনো এই পশুবৃত্তি, ঘৃণ্যতম আচরণ
কেন এ ক্রন্দন
অন্তরের অন্তস্থলে করে না আঘাত ?
এখনো কী বোঝেনি মানব
আহতের আর্ত্তনাদ উষ্ণ রক্তধারা
মেঘে মেঘে পুঞ্জীভূত হয়ে
অভিশপ্ত ধরণীর গর্ব্বিত মস্তকে
বর্ষণ করিছে রোগ শোক দুঃখ জ্বালা
মৃত্যু বিভীষিকা !
হায় ! মানব ভুলিয়া গেছে আপনার পথ
মিথ্যা ও হিংসায় কভু মেলে কী সন্ধান
পরম রতন সেই পরশমণির ? ?
বারে বারে হেরি তাই জন্ম জন্মান্তরে—
চির ব্যর্থ মানবের মহা অভিযান
ধর্ম্মে কর্ম্মে বেধেছে বিরোধ ॥

(অনাথপিণ্ডদের প্রবেশ। বুদ্ধের চরণে তিনি প্রণাম রাখিলেন)

বুদ্ধ—এস বৎস ! কুশল তো ?

অনাথ—হাঁ প্রভু ! খবর পেলেম মগধের মহারাজ অজাতশত্রুর প্রচেষ্টায় মৃগদাব রাজ্যে গোপালজীর এ[illegible] মর্ম্মরমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহা আড়ম্বরসহকারে পূ[illegible] অর্চ্চনা, নৈবেদ্য আর নৃত্যারতি দিয়ে পাষাণ বিগ্র[illegible] বন্দনা করা হোচ্ছে। মৃগদাবের রাজা অম্বরীষের হু[illegible] হয়েছে রাজ্যসীমানায় বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখলে দূর দূর ক[illegible] তাড়িয়ে দিতে। মন্দিরের আচার্য্য বিধায়কই নাকি এ[illegible] মন্ত্রণা দিয়ে রাজাকে উত্তেজিত করে তুলেছেন। আ[illegible] কী জানেন প্রভু ! বিধায়ক তাঁর পালিতা কন্যাটি[illegible] দেবতার চরণতলে চির জীবনের মত সেবাদাসীরূ[illegible] উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

বুদ্ধ—এ শুধু আমাদের প্রতিকূল আচরণ করার উদ্দেশ[illegible] না অনাথপিণ্ড ?

অনাথপিণ্ড—হাঁ প্রভু ! মৃগদাব রাজ্যে আর্ত্ত অসহা[illegible] দীন দুঃখীর অভাব নাই। কেমন করে তাদের সেবা ক[illegible] আর সম্ভব হবে, তা আমরা কিছুতেই ভেবে ঠিক ক[illegible] পারছি না।

বুদ্ধ—কুমার রূপকেতু, যিনি এখানে কয়েকদিন অবস্থ[illegible] করে গেলেন,—

অনাথ—হাঁ প্রভু, তিনিই মহারাজ অম্বরীষের পুত্র[illegible] পিতা ও পুত্রের আচার-ব্যবহারে আকাশ পাতাল প্রভে[illegible] পিতা নরক, পুত্র স্বর্গের অনুরূপ কোমল আর পবিত্র।

বুদ্ধ—ধিক্ বৎস ! এখনও মনে বৈরীভাব পো[illegible] করছ ? এভাব শান্ত কর। রিপুজয়ী হও।

অনাথ—ক্ষমা করুন পিতা। মুহূর্ত্তে আত্মবি[illegible] হয়েছিলেম।

বুদ্ধ—শান্ত হও অনাথ ! ভিক্ষা সংগ্রহে যাও। এদি[illegible] ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি সঙ্ঘস্থবিরের সঙ্গে পরামর্শ ক[illegible] দেখবো। মৃগদাব রাজ্যে গতায়াত সম্বন্ধে তিনিই বন্দোব[illegible] করে দিতে সমর্থ হবেন। (বুদ্ধদেব আবার ধ্যানে নিম[illegible] হইলেন, অনাথ প্রণাম করিলেন)

তবে আসি ভগবান। (প্রস্থান

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

* * * মৃগদাব রাজ্যের শেষ সীমানাটুকু। গহন গভীর বনানীতে ঘেরা। কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত্রের চাঁদের ভীরু পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাটুকু বনের শিয়রে শান্ত স্নিগ্ধ এক মধুস্বপ্নের মায়াছবি রচিয়া তুলিয়াছে।

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ফুটিতেছে। শ্বেতশুভ্র রূপালী জ্যোৎস্না ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

বনজঙ্গল ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অরণ্য একা নয়!

একটী শ্বেতশুভ্র মর্ম্মর মন্দির জাগিয়াছে। শেষ রাত্রের ক্রম-অস্তমান চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় মন্দিরেরও সারা অঙ্গে এক নিস্পৃহ উদাস মধু-বেদনার স্বপ্নছবি আঁকা।

উদার, স্বচ্ছ নীল আকাশের তলে সুশীতল স্তব্ধ রাত্রি। রাত্রিশেষের গভীর ঘুমে মানুষ আচ্ছন্ন।

শুধু, পাতায় পাতায়, বনে লতায়, ভীরু অস্ফুট মর্ম্মর ধ্বনি!

মন্দির প্রাঙ্গনে চাঁদের আলোয় ঘুমাইতেছে একটী মেয়ে। মেয়ে নয় তো—যেন একফালি রজতলেখা।

আকাশের ক্লান্ত চাঁদটীর মতই শিথিল আলস্যে মেয়েটী স্বপ্ন দেখিতেছে। কোন্ অজানা সুখস্বপ্ন দেখিয়া মেয়েটীর ঘুমন্ত পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানি হঠাৎ হাসিতে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

স্তব্ধ রাত্রির প্রশান্ত মায়া ছিন্নভিন্ন করিয়া সুদূর রাজ-প্রাসাদের তৃতীয় নহবৎখানা রজনীর তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিল্।

দূরে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষুগণ পাষাণ শয্যা ত্যাগ করিয়া পবিত্র স্তোত্রমন্ত্র আবৃত্তি সুরু করিলেন।

মন্দির পুরোহিতের নবীন শিষ্য পার্থসারথিও সেই অতি প্রত্যুষে স্নান সারিয়া তাঁয়রো সুরে বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন।

আলো আঁধারের এমনি সঙ্গম মুহূর্ত্তে রাজকুমার রূপ-কেতু মন্দিরে দেবতাকে প্রণাম জানাইতে আসিয়াছেন। বহুদিন দেশবিদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক তিনি গতকল্য সবে রাজ্যে ফিরিয়াছেন)

অকস্মাৎ ঘুমন্ত মেয়েটীকে দেখিয়া চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন

রূপকেতু (স্বগতঃ)—এ কী স্ব... ভীরু এত কোমল! মানুষ কখনো ... হয়? না—না—এ অন্যায় অবৈধ ... যুবতীর সৌন্দর্য্য সুধাপান। ছিঃ ছি... কুমারের পক্ষে শুধু লজ্জাকর নয়, হীন চৌ...

(ত্বরিতপদে প্র...

(মেয়েটী যেন অকস্মাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া ... নিদ্রালস আরক্ত চোখ দুইটী বারে বারে মুছি... দৃষ্টি প্রখরতর করিবার চেষ্টা করিলেন)

বনশ্রী—কোথায় কে? শুধু স্বপ্ন! শুধু মায়া ... মরীচিকা ছল!! মরীচিকা, ছলনা, তবু কত ... ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যায় তবু ভাল লাগে। যত সে দূ... হ... দূরান্তরে সরে সরে যায়, তত তাকে ভাল লাগে. কি আমার নেই? রূপ যৌবন, বিদ্যাবুদ্ধি, মানুষের যা কিছু কাম্য সব—সব আছে, তবুও সে ফিরে চায় না। বুঝি ব্যথা দিতেই সে ভালবাসে। বুঝি উপেক্ষা করেই সে সুখ পায়?

(কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিলেন)—এ যে তারই পদধ্বনি? শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুটী ও পদধ্বনির শব্দ চেনে? ভুল তো কোনমতেই হবার নয়?

(উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া উঠিলেন)—নিশ্চয় সেই!

(পার্থসারথির প্রবেশ)

(পার্থসারথির প্রশস্ত উদার ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা? এই প্রত্যুষেই তিনি স্নান সারিয়া গৈরিক বস্ত্রে শুচিস্মিত হইয়া আসিয়াছেন? হাতে বনফুল চয়িত একটী পিতলের সাজি। শুভ্রবক্ষে ততোধিক শুভ্র যজ্ঞোপবীত-গাছটী দেহের সৌন্দর্য্যকে যেন আরও পবিত্র ও গম্ভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। এত বেলায় অলসের মত বনশ্রীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পার্থ বিস্মিত হইলেন।)

পার্থসারথি—বনশ্রী! শরীরে কি কোনো অসুস্থতা বোধ করচ? তোমার পিতাকে কি খবর দেবো?

(বনশ্রীর মুখ অকারণে কঠিন বিদ্রূপ হাসিতে ভরিয়া গেল)

...মি কি সত্যিই এত অবুঝ? ...না মনে হয় তুমি পাষাণ—আবার ...। পাষাণেরও অঙ্গ কখনো কখনো ...তে ভরে যায়। তুমি তো পাষাণ ...।

...ড়িতে নাড়িতে)—হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই ...। সহজ মানুষ কখনো, আমার এতো ...রও, এমন স্থির ধীর—এমন অবিচল থাকতে ...

(...র্থ বিস্ময়াকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বনশ্রী অকস্মাৎ হাসির উচ্ছ্বাসে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এতই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন)

বনশ্রী—শারীরিক কুশল সংবাদের প্রয়োজন তোমার? আর কিছু নয় তো?

যাও—যাও, তোমার গুরুদেবকে বল গিয়ে, বনশ্রীর স্বাস্থ্য চমৎকার আছে, এতটুকু ভাঙ্গনের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই।

(দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া)

আমার দুঃখ তুমি কি বুঝবে পার্থ? তোমার গুরুদেবের সাধ্য কি, সে মর্ম্মান্তিক ক্ষতে সান্ত্বনার এতটুকু প্রলেপ দেন্?

(স্বগতঃ) অসহ এ সংগ্রাম! কত বোঝাই, তবু যে মন বোঝে না। কেন আমি এত অসহায়, কে জানে?

পার্থ—দেবী, তা কি আমার অপরাধ? বনশ্রী, তোমার শরীর নিশ্চয় অসুস্থ হয়েছে। অবিলম্বে আচার্য্যকে খবর দেওয়া প্রয়োজন।

বনশ্রী—উন্মাদ তুমি! কোথায় আমার ব্যাধি। সে কি দেহে? সে কি, দেহে?

মনের গোপন গভীরে যে যন্ত্রণাময় অনুভূতি তিল তিল করে মানুষকে ক্ষয় করে, তোমার আচার্য্য তাকে কেমন করে নিবৃত্ত করবেন। তুমি উন্মাদ, তুমি শিল্পী, শুধু জানো স্বপ্নে স্বপ্নে স্বর্গলোক রচনা করতে! যাও পার্থ—তোমার সাজিভরা ফুল রৌদ্রের প্রখরতাপে শুকিয়ে গেল যে! পূজা কর গিয়ে।"

পার্থ—কিন্তু বনশ্রী! এ কি প্রহেলিকা? কেমনতর এ হেঁয়ালী তোমার? সহজভাবে কথা কি তুমি কোনদিনই বলবে না?

(বনশ্রীর মুখখানি পাণ্ডুর করুণ কান্নাভরা হাসিতে ভরিয়া গেল)

বনশ্রী—বনশ্রী যে আর তার সেই সহজ জীবনে বেঁচে নেই পার্থ! সোজা কথা সে আজ কেমন করে বলবে বল তো?

পার্থ—নূতন দিনের রাঙ্গা রবির আলোয় মনের যত গ্লানি ধুয়ে ফেলে সহজ জীবনে আবার বেঁচে ওঠো দেবী! সুখ তাতেই। উন্‌নাভের মতো হেঁয়ালীর এ মায়াজালে নিজেকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে কি সুখ যে পাও তুমি, তা আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না।

(বনশ্রী অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

বনশ্রী—কিসে আমার সুখ আর কিসে আমার দুঃখ, যদি তুমি তাই বুঝবে পার্থ, তবে এমন তিলে তিলে আমার জ্বলে পুড়ে মরার প্রয়োজন? আমার সুখ দুঃখের এতটুকু ভাবনা যদি তুমি ভাবতে পার্‌তে, তাহ'লে তো বেঁচেই যেতাম আমি। কিন্তু যে শুধু স্বপ্ন রচে, রক্তমাংস আর ধুলোমাটির আকাঙ্ক্ষা আর ব্যথা তাকে কেমন করে বোঝাব বল? (নেপথ্য হইতে বিধায়ক ডাকিলেন)

বিধায়ক—বনশ্রী, পার্থ, আঃ, কোথায় যে গেল সব? পার্থ, আমার তাম্রকুণ্ড কই? হায়! হায়! দেবতার পূজায় অযথা ত্রুটি বিলম্ব? ধ্বংস হয়ে যাবে না সব! অভিশাপে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে না এরা? আঃ কোথায় যে গেলে সব তোমরা? বনশ্রী! বনশ্রী!

বনশ্রী—যাই পিতা, (পার্থকে)—সরতো, আমি যাই।

(পার্থ বাধা দিলেন)

পার্থ—তুমি কোথায় যাবে? অশুচি অস্নাত বস্ত্রে বিগ্রহ দেবতার পূজার উপকরণ সংগ্রহে? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ বনশ্রী? গুরুদেব তাহ'লে সারাদিন উপবাস করে দেবমন্দিরে হত্যা দেবেন। এ বিষয়ে তিনি যে কি নিষ্ঠাবান, তা কি ভুলে গেলে তুমি?

(বনশ্রী বিহ্বলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন)

আমার হয়েছে কি? আমি কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?

(পার্থ পথ ছাড়িয়া দিলেন। বনশ্রী চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক প্রবিষ্ট হইলেন।)

(ললাটে রক্তচন্দন লেখা, গৈরিক কাষায় বস্ত্রধারী রুক্ষ অধৈর্য্য বিধায়ক, প্রস্থানরত বনশ্রীর লুণ্ঠিত অঞ্চল ও আলুলায়িত কেশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল)।

বিধায়ক—অনাচার, অনাচার! দেবতার যে সেবাদাসী, দেবতার পূজায় তার প্রতিপদে ত্রুটী ঘটছে। রোদে রোদে আকাশ পৃথিবী ছেয়ে গেল, তবু তোর ঘুম ভাঙ্গে না? হু এ অলক্ষণ! এ অন্যায়! (পার্থকে শুচিস্নাত দেখিয়া খুশী হইলেন)

বাঃ! বাঃ! বেশ! এই তো চাই; বাঃ ফুলও তুলেছ দেখছি। বৎস! তবে তুমিই দাওনা আজ আমার পূজার আসনটা ঠিক করে। আর কি বল্‌ছিলাম যেন—হ্যাঁ, পট্ট বস্ত্রটাও বার কোরো আজ। একবার সভায় যাবো। কুমার রূপকেতু নানাদেশ ভ্রমণ করে সম্প্রতি রাজ্যে ফিরে এসেছেন। তাকে একবার আশীর্ব্বাদ করে আসা একান্ত প্রয়োজন— একটু থামিলেন)—

আর দেখ পার্থ, আমি চলে গেলে ঐ মুণ্ডিতমস্তক, কপট ভিক্ষুকেরা যদি এ মন্দির প্রাঙ্গনের কাছ দিয়েও হেঁটে যায়, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিও ওদের।

পবিত্র বিগ্রহকে দূরে ঠেলে যারা মাটীর মানুষকে ভগবান বলে পূজা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি। তারা কখনও সৎলোক নয়। সাবধান! তাদের ছায়াও মাড়ানো পাপ।

(চুপি চুপি কহিলেন)

ওরা রাজবিদ্রোহী! ওরা ভণ্ড! ওরা চোরের দল। বুঝলে? অজাতশত্রুকে মগধের সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ওরা ওই কপট ধূর্ত্তটাকে মগধের সিংহাসনে বসাবে। ধর্ম্ম, করুণা, নির্ব্বাণ অনন্ত মোক্ষের ইতিহাস, সব বাজে, সব ছলনা। আসল যা সঙ্কল্প ওদের, তা শুধু ঐ রাজ্য কেড়ে নেওয়া। মনে রেখো পার্থ! ওরা আমাদের শত্রু!

চল যাই, ঢের বেলা হ'ল। আমার পূজোই বাকী এখনো।

তৃতীয় দৃশ্য

দিনের শেষে অস্তোন্মুখ রক্তরাঙ্গা রবি আকাশের বুকে মুঠো মুঠো রাঙ্গা সিঁদূর ছড়াইয়া দিয়াছে। আলো ও আঁধারের এম্নি মিলনসঙ্গমের সময় রাজবাটীর পুষ্পোদ্যানে রূপকেতু ও রঞ্জন বেড়াইতেছেন!

রূপকেতু বড়ই যেন অন্যমনস্ক!

কবি রঞ্জন—দেশ পর্য্যটন থেকে তুমি ফিরে আসা অবধিই লক্ষ্য করছি তোমার যেন কি রকম একটা অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটেছে।

(কবি গান ধরিলেন)

আকাশ পারে ছড়িয়ে গেছে অস্তরবির সোনা
এমন ক্ষণে কার স্বপনে রয়েছো আন্‌মনা,
কোন্ অরূপের মধুর মায়া
আঁকলো চোখে ছায়ার কায়া
কী ধন পেয়ে আপন ভুলে
কিসের এ ভাবনা।
আঁধার নামে আলোর পাশে ছায়ার ছলে
কোন্ বিরহের আভাষ জাগায় জলে স্থলে।
বিরহী মনের গোপন কথা
স্বপনে কী পায় সফলতা
দিবস গেলে তারার আলোয়
মেলে কি সান্ত্বনা।

রূপকেতু—কতদিন পরে আবার পাশাপাশি থেকে তোমার গান শুনলাম, বলতো কবি? বেশী দিন তো নয়—তবু যেন মনে হচ্ছে কত যুগ পরে আবার তোমাদের মধু সঙ্গ লাভ করলেম। নিজের আশ্রয়নীড়টুকুতে ফিরে আসায় যে এত সুখ এত সান্ত্বনা, কে তা জান্‌তো।

রঞ্জন কবি—তবে আবার শোনাই। শোন:—

কোন সাধনে ঘরের ডাকে নীরব রবে মন—
তারে বাঁধার লাগি দিকে দিকে মায়ার আয়োজন।
যখন পাখী আকাশ পারে
চলে আলোর অভিসারে
জাগে পলে পলে বুকের তলে
নীড়েরি বন্ধন।

বাহির পানে যতই চলি
যুক্তি দিয়ে সত্য ছলি
(ওরে) পিছন পানে ততই ডাকে
ঘরের আবাহন।

(রূপকেতু অন্যমনস্ক ভাবে অদূরে একটী আগুনের শিখার মত রক্তিম রক্তপলাশ গুচ্ছের পানে চাহিয়া একমনে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন ॥)

রঞ্জন—শুধুই চিন্তা আর শুধুই চিন্তা, কিন্তু চিন্তাটা এত কিসের শুনি? আপন মনে এত ভাবছো কি বন্ধু! বলতো?

(পরে হাসিয়া) অহো! বুঝেছি, বুঝেছি কুশীনগরের রাজকুমারী মধু মঞ্জুলিকারই বরানন খানি।

ভয় নেই হে ভয় নেই! মহারাজ আগামী পূর্ণিমাতেই পাত্রী আশীর্ব্বাদের শুভদিন স্থির করেছেন শুনছি। আশ্বস্ত হও বন্ধু! দেরী আর বেশী নেই। দিন ঐ ঘনিয়ে এল বলে।

রূপকেতু—এসব তুমি কি বলছো কবি? আমি যা ভাবছি তা তোমার ঐ কুশীনগরের রাজকুমারী মধুমঞ্জলিকার চেয়েও ঢের, ঢের, শ্রেষ্ঠ। চেয়ে দেখতো ঐ সুদূরের বৃক্ষচূড়ে, ঐ রক্তিম পুষ্পস্তবকটীর পনে—কত সুন্দর, তবু কত সুদূর। যা কিছু এই তৃষাতুর প্রাণের রক্তিম কামনা দিয়ে পরম আগ্রহ ভরে বুকে জড়িয়ে নিতে চাই, তাই দেখি শুধু মায়া, শুধু মরিচীকার মত দূর হতে দূরান্তরে সরে সরে যায়।

রঞ্জন—কেন এত আক্ষেপ বন্ধু? কেন এত ব্যথা?

রূপকেতু—ব্যথা নয় কবি। একটা দুঃসহ মধুর আকাঙ্ক্ষা। একজনের রাঙ্গাদুটী পায়ে আজ শুধু নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবার দুর্ব্বার কামনায় আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছি। কিছুই চাইনা আমি কবি শুধু যদি সে আমার পানে একবার চেয়ে দেখতো। যদি একবার শুধু তার রাঙ্গা ঠোঁট দুটী আমার পানে চেয়ে মধুহাসিতে স্ফুরিত লীলায়িত হয়ে উঠতো।

(একটু থামিয়া)

ব্যথা? হ্যাঁ ব্যথাও বলতে পারো তাকে। সুমধুর প্রতীক্ষা! তবু যেন একটা অনির্ব্বচনীয় গভীর ব্যথায় স্নাত।

রঞ্জন—এ যে দেখি নূতন খবর। কে সে তোমার এমন নিভৃত ধ্যানের ধন মিতা? কে সে, যে তোমায় এমন করে আকুল করে তুলেছে আজ? বল, বল তার নাম যে অরূপ তার রূপের মোহন মায়ায় এমন করে বাঁধলো তোমায়। কেমন রূপ তার? কেমন গুণ? যে এমন সুগোপনে তার রাঙ্গা রাখিটী তোমার হাতে পরিয়ে দিলো? কোথায় তার ঘর? কি তার ঠিকানা বন্ধু?

কে সে তা তো জানিনা। চিনিনে তো তাকে। শুধু মুহূর্ত্তের তরে দেখেছি এক আঁধার রাত্রির শেষে অস্তমান পাণ্ডর চাঁদের আলোয়। সে মুখে অপরূপ এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য শুধু স্বর্গের মানুষেরই আছে কবি। মর্ত্তে তা সুদুর্লভ।

(পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)

কবি, আঁধার আলোর সঙ্গম মুহূর্ত্তে স্বপ্নের মত তাকে ঘুমাতে দেখেছিলাম। কোথায় জানো? রাজপ্রাসাদে নয়, আরামে রচিত কোনো সুখশয্যায় নয়। মন্দির প্রাঙ্গনের মাটীতে শুধু আঁচলখানি বিছিয়ে সে গভীর ঘুমে কার যেন স্বপ্ন দেখছিলো, কার সে সুখস্বপ্ন—কে জানে?

তবু সেই স্বপ্ন দেখেই মুখে তার স্বর্গীয় সুখ আর হাসির অসীম তৃপ্তি আর জ্যোতি ফুটে উঠেছিলো। অপূর্ব্ব সে মাধুরীমা। কে সে তা·········

(রঞ্জন বাধা দিলেন)

রঞ্জন—সর্ব্বনাশ! এ কি বোল্‌ছো তুমি বন্ধু? যার জন্যে তুমি এমন অস্থির এত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ, সে কি সাধারণের ভোগের সামগ্রী?······দেবতা, দেবতা, পাষাণ দেবতার চরণ তলে আজন্ম উৎসর্গীকৃত নারী সে। পুরোহিত বি ায়কের পালিতা কন্যা বনশ্রী! অবিলম্বে ভুলে যাও তার কথা। সে মেয়েতো মাটীর মানুষের জন্যে সৃষ্টি হয়নি ভাই।

রূপকেতু—বনশ্রী! বনশ্রী! সামান্য নাম উচ্চারণেও যে এত মধু ক্ষরে, কে তা জান্‌তো? যদি একবার তার দেখা পেতাম। যদি একবার তার রাঙ্গাদুটী পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌তে পারতাম, দেবী, আমি মাটীর মানুষ, তবু

দেবতার চেয়ে অনেক বেশী অর্ঘ্য, ভালবাসা—আমি তোমায় দোবো। আমায় শুধু তুমি নাও। আমার সমস্ত জীবন তুমি উজাড় করে তোমার পূজায় গ্রহণ কর; আর বিনিময়ে আর কিছু নয়ত, শুধু ঐ শ্বেতশুভ্র পা দুটীতো মাথা রেখে আমায় নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবার অধিকার দাও

(ঈষৎ বিস্মিত বিদ্রূপ হাসিতে রঞ্জনের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তার কথার স্বরে স্পষ্ট অবিশ্বাস)

রঞ্জন—প্রতিদানের এতটুকু আশা রাখো না,—মাটীর মানুষের পক্ষে এমন স্বর্গীয় প্রেম! এও কি সম্ভব ভাই?

রূপকেতু—ঠাট্টা কোরোনা রঞ্জন! কেউ অনেক পেয়েও মনে করে বুঝি কিছুই পেলাম না, আবার—আবার, কেউ এতটুকু পেয়েই মনে করে "কত! কত পেলাম।" এদের মধ্যে কে সত্যিকার সুখী বলতে পারো ভাই?

রঞ্জন—কে? যে ভাবে অনেক পেলাম, অথচ সে কিছুই পেলো না?

(রূপকেতুর মুখে ম্লান মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল)—যাকে ভালবাসি সে হয়তো কিছুই দিতে পারে না, আর যার কাছে কিছুই না চাই, সে হয়তো উজাড় করে ঢেলে দেয় সব! তার জীবন আশা-আকাঙ্খা-সর্ব্বস্ব!! তবু মন কি চায় জানো? যে কিছু দেয় না তারই চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে থাকৃতে। তাকে যে ভালবাসবার অধিকারটুকু পেলাম সেই কি আমার অনেক পাওয়া নয়?

রঞ্জন—এ যে দেখি···আচ্ছা! ছন্দ গেঁথেই বলি। সেইটেই আমার পক্ষে ঢের সহজ ভাই।

(রঞ্জনের গান)

মনের নীরব পরম ভালবাসা
নয় সে শুধু চরম পাওয়ার আশা।
সে যে আপন রঙে আপনি ভুলে
ফুটে ওঠে রঙীন ফুলে
লুটিয়ে পড়ে প্রিয়ার পায়ে
হারিয়ে সকল ভাষা।
সে তো চায় না পূজা চায় না জয় মালা
চায় না দানের অর্ঘ্যভরা উপহারের থালা।
সে যে আপন নেশায় আপনি চলে
প্রিয়ার রাতুল চরণতলে
(ওরে) ধ্যানের ধনের স্বপন-বিভোর
তাহার যাওয়া আসা॥

(রূপকেতুর মুখ খুশীতে রাঙা হইয়া উঠিল)—"ঠিক্, ঠিক্ এই তো আমার কথা! ভালবাসাই তো চরম সার্থকতা! পাওয়া বা না পাওয়ার কথা ঢের পরে।

(রূপকেতু কিছুক্ষণ থামিয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিয়া আবার বলিলেন)

আরও কি জানো ভাই? ও জিনিষটা—মানে প্রেম, সে এত কোমল, এত করুণ আর ভীরু যে ব্যবসাদারীর গন্ধ গায়ে লাগা মাত্র, যেন কর্পূরের মত কোথায় উবে উড়ে যায়।

(রঞ্জন মাথা নাড়িলেন)

রঞ্জন—কিন্তু তাই বলে ভৃত্যের মত আজ্ঞাবহ! দাস! ধিক্কার দাও বন্ধু!

রূপকেতু—কিন্তু সেইখানেই তো প্রেমের চরম মুক্তি পেলাম।

(মহারাজ অম্বরীষের প্রবেশ)

(কবি ও কুমার দুজনেই কাব্যলোক ছাড়িয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।)

অম্বরীষ—(ব্যস্তভাবে) রূপকেতু, রঞ্জন, তোমরা এখনও এখানে বেড়াচ্ছো।

(রূপকেতুকে) বৎস, দেবমন্দিরে আজ বিগ্রহকে প্রণাম করে আসা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। গিয়েছিলে কি সেখানে?

রূপকেতু—হাঁ পিতা!

(অম্বরীষের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল)

অম্বরীষ—"জান্‌তাম্ আমি! পুরোহিতকেও বলে ছিলাম তাই! "আমার পুত্র, আমার কেতু! পবিত্র বিগ্রহে তার পরম প্রীতিভক্তি। বিগ্রহ প্রণাম না করে সে কিছুতেই সুস্থির হবে না এ আপনি দেখে নেবেন আর্য্য!"—হ্যাঁ বিধায়ক! তাঁকেও প্রণাম করেছ তো?

রূপকেতু—না পিতা, প্রণাম আমি কাউকেই করিনি। পবিত্র বিগ্রহকেও না।

(অম্বরীষ চমকাইয়া উঠিলেন)

অম্বরীষ—বল কি ? মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েছিলে অথচ··· এ আবার কি কথা ? এ কি সত্য কেতু ?

(পিতার চোখের পানে ক্ষণেক চাহিয়া রূপকেতু মাথা নামাইলেন।)

"হাঁ পিতা ! বিগ্রহ দর্শনের স্থবিধা ছিল না। মন্দির প্রাঙ্গনে দেবদাসী নিদ্রিতা ছিলেন, তাই আমি আবার এলাম।

(পুত্রের এ সাবধানতায় অম্বরীষ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন)

অম্বরীষ—বেশ বেশ ! আমার পুত্রের উপযুক্তই ব্যবহার। কিন্তু এখন যাও বৎস—দেবমন্দিরে বিগ্রহ ও আচার্য্যকে প্রণাম করে এস। দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ বিনা, জীবনের কোনো সদ অনুষ্ঠানই শান্তি আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে না জেনো। তোমার অভিষেক এগিয়ে এলো ক্রমে, আর আমারও বাণপ্রস্থের দিন ঘনিয়ে এল।

(রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন)

[স্বগত] সবই সুসম্পন্ন হয়ে যাবে—হায় শুধু যদি আজ রাণী বেঁচে থাকতেন।

(চলিয়া যাইতে যাইতে আবার দাঁড়াইলেন)

(পরে কবির দিকে ফিরিলেন)

কবি, বিধায়ককে বলো তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদটুকু বিশেষ করে যেন কুমারের মঙ্গল কামনাতেই আজ অর্পিত হয়।

রঞ্জন—যে আজ্ঞা মহারাজ। (অম্বরীষের প্রস্থান)

(রঞ্জন কৌতুক হাসি হাসিলেন)

রঞ্জন—সময়ে সময়ে মনের গোপন ইচ্ছার সঙ্গে—দৈবঘটনার যে কি আশ্চর্য্য মিল ঘটে যায়। অদ্ভুত ! বিচিত্র ! চমৎকার !! সেই মন্দির। সেই দেবদাসী, সেই দেখা। যা চাওয়া যায়, ঠিকই কী তাই ?

চলহে চল ! শুভকার্য্যে অযথা কেন বা বিলম্ব করা ?

রূপকেতু—শুনলে তো রঞ্জন ? আমার অভিষেক হবে। আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া বাতাসে উড়বে। সোনার আলোয় সোনার তরবারী উঠবে ঝলমলিয়ে কিন্তু রঞ্জন ! ওরা কি শান্তি দেয় ? ওরা কি তৃপ্তি আনে ?

রঞ্জন—শান্তি তৃপ্তি না আনুক, আনবে ঐশ্বর্য্য, আনবে ক্ষমতা। জগতজুড়ে তোমার শান্তি বিরাজ করবে বন্ধু ! তোমার কীর্ত্তিধ্বজা জয়গৌরবে আকাশ পানে মাথা তুলবে কুমার। তোমার প্রশংসা গানে ভুবন ছেয়ে যাবে ভাই।

রূপকেতু—কীর্ত্তি ? খ্যাতি ? কি বা তাদের দাম ? কতটুকুই বা প্রয়োজন তাতে ? তারা কি বাঁচায় ? তারা কি জীবনের মূল্যকে এতটুকু ঐশ্বর্য্যবান করে তুলতে পারে। মিথ্যা কথা !

মুহূর্ত্তের সৎকাজ মানুষের জীবনকে গৌরবের সপ্তমস্বর্গে তুলে দেয়। পর মুহূর্ত্তেই ভুল তাকে মাটীতে ফেলে গুঁড়ো গুড়ো করে পদদলিত করে।

মানুষের নিন্দা প্রশংসা। কতটুকু তার দাম ? কতটুকু তার স্থায়িত্ব ? বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী সুখ, রামধনুর মত সে মিথ্যা স্বপ্ন। মনকে শুধু ক্ষতবিক্ষত করে আশানিরাশায় জর্জ্জরিত করে দেয় ভাই।

রঞ্জন— (কুমারের কাঁধে হাত রাখিলেন)

জগতে সবই সত্য ! আবার সবই মিথ্যা ভাই ! মিথ্যা জেনেও, তবু লোকে তাই-ই আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য হয়। অনেক সময় সব জেনেও, না জানার মত ভাণ করে। ওই প্রতারণাটুকু না করলে, সে বাঁচবে কেমন করে কেতু ? নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে বলেই তো মানুষ বাঁচে। ভেঙ্গে পড়েও সে আবার উঠে দাঁড়ায়।

এক মুহূর্ত্তে কাঁদে, পরমুহূর্ত্তে হাসে, স্বপ্ন দেখে আর ভালবাসে। একমুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব হারিয়ে, পরমুহূর্ত্তে আবার নতুন কিছুর সন্ধান পায়। অতীতে স্বপ্নের মৃতচিতা নব বসন্তের রক্তপলাশপুঞ্জে আকীর্ণ করে তোলে। আর এই পারে বলেই তো সে মানুষ। ভগবানের শ্রেষ্ঠদান সে আর পশু নয়।

(খানিক থামিলেন)

মন্দিরে যাবে না কুমার ? আরতিক্ষণে পৌছানোই যে আমাদের প্রয়োজন।

রূপকেতু—হ্যাঁ চল, নইলে পিতা ক্রুদ্ধ হবেন। মনে ব্যথা পাবেন।

রঞ্জন—শুধু পিতার ক্রোধ ! আর কিছু না ?

(ব্যঙ্গ হাসিলেন)

ক্রমশঃ

রামটেক্

(শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ)

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন কেবল সাধকগণকে তাঁহাদের সাধন ভজনের স্থান নির্দ্দেশ করে, তাহা নয় কবিগণকেও তাঁহাদের নব নব কল্পনার উৎস যোগায়! রামটেক্ সাধু ও কবিগণের পরম রমনীয় মনোহারী স্থান। চারি দিকে গিরিশৃঙ্গ মধ্যে সগর্ব্বে শির উত্তোলন করিয়া সমতল ভূমি হইতে সরল ভাবে প্রায় বারশত ফিট উচু হইয়া রামগিরি দণ্ডায়মান। সাগরজল সমতল হইতে এই পর্ব্বত শৃঙ্গ প্রায় দুই হাজার ফিট উচু!

পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে উপত্যকায় সচ্ছনীরপূর্ণ বিস্তৃর্ণ সরোবরের শোভা স্থানটির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভির্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পর্ব্বত শিরোপরি শ্বেতবর্ণের রাম-লক্ষনের দেউল নৈবিদ্যর স্ত:পর শিরে (আগের) মতন শোভা ধারণ করিয়াছে।

নাগপুর হইতে ২৬ মাইল রেলপথে যাইলে রামটেক ষ্টেশন! নাগপুর ষ্টেশন হইতে কাম্পটীর ছাউনী সহরের পার্শ্বে কাহ্বান নদীর সুদৃশ্য প্রস্তরের বিস্তৃর্ণ সেতুর উপর দিয়া যে রেলপথ আসিয়াছে, তাহারই এক শাখা রামটেক্ গিয়াছে। রামটেক্ ষ্টেশন হইতে 'রেনীতে' (দরমার ছত্রীওলা যুগল অশ্বদ্বারা চালিত গরুর গাড়ীর মতন যান) আঁকিয়া বাঁকিয়া বাঁধান পথ দিয়া দুই মাইল যাইলে রামটেকের পল্লি-নগরে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে রামটেকগিরি সোজা উঠিয়াছে; এই পর্ব্বত পদতল দিয়া পর্ব্বতারোহনের পথ গিরিবরকে বেষ্টন করিয়া ধিরে ধিরে উত্থিত হইয়া 'আম্বাড়ার' সচ্ছনীর পূর্ণ প্রকাণ্ড হ্রদ তীরে রেণী উপস্থিত হইয়াছে অম্বাড়া হ্রদের তিন দিক সুদৃশ্য সুদৃঢ় সোপান শ্রেণীর দ্বারা মণ্ডিত। চারিকোণে চারিটি প্রস্তরের বুরুজ স্থাপিত। মধ্যে মধ্যে বৃহদায়তনের ঘাট, মন্দির, চাঁদনী নির্ম্মিত রহিয়াছে! সরোবরটি দীর্ঘে ½ মাইল, উত্তর তীরে সরল সোজা পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান, তাহাদের বিপুল দেহে বৃক্ষ-লতা গুল্মাদির প্রতিবিম্ব স্বচ্ছনীরে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সৃজন করে। হ্রদটীর শোভা যেমন মনোলোভা, হিন্দুর নিকট তেমনিই পবিত্র। প্রায় ৭০০ শত সিঁড়ি অতিক্রম ও উঠা নামা করিয়া পর্ব্বত উপর দেব দেউল দর্শনের পর এই হ্রদে স্নান করিলে পরম পুন্য হউক বা না হউক, পরম তৃপ্তি পাওয়া যায় ইহা সত্য!

ভারতের সৌভাগ্য রশ্মি যখন ম্লান হইয়া যায় নাই, স্বাধীন মহারাষ্ট্র নরপতিগণের প্রতিপত্তি যখন ভারতবাসীর চিত্তে আনন্দ ও আতঙ্ক উৎপাদন করিতে ছিল, সেই সময় নাগপুরের ভোঁসলা বংশের এক নরপতি এই হ্রদটীর সংস্কার করিয়া দিয়াছিল। এবং এই ভোঁসলার বংশের অন্য এক নরপতি পর্ব্বত উপর সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মান করিয়া রামচন্দ্রজীর অপূর্ব্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগের প্রায় পাঁচহাজার বৎসরের পূর্ব্বে যখন রামচন্দ্র বনবাস যাপন কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সেই শুভা গমনের পুন্য স্মৃতি জাগরূপ রাখিবার উদ্দেশ্যেই মন্দির স্থাপিত, এবং প্রকৃতির অপূর্ব্ব ঐশর্য্যশালী স্থানের প্রতি সংসারী নর-নারীদের আকর্ষন করিবার জন্যই এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।

হ্রদতীর হইতে পর্ব্বত আরোহনের জন্য প্রায় সাত শত বিস্তৃর্ণ সোপান মন্দিরের দ্বারে গিয়াছে। দেবতার আশীষ লাভের জন্য যাত্রিরা মানত করিয়া তীর্থ যাত্রীর ক্লেশ দূর করিবার জন্য সোপান নির্ম্মান করিয়া দিয়াছে। সোপান গাত্রে দাতার নাম ও সময় উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিতে বালক বা বৃদ্ধা কাহারও ক্লেশ হয় না।

সোপান শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পর্ব্বতের একবারে শিখরের উপর দীর্ঘ আকৃতিতে সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাকার বেষ্টিত দুইটী সুন্দর মন্দির বিরাজিত। পর পর তিনটি তোরণ ও প্রদান পার হইয়া মূল মন্দিরের যখন সম্মুখীন হওয়া যায়, দিগন্তের

অসীম অনন্ত দৃশ্য চিত্তে পরম পুলক সঞ্চার করে। মন্দিরের ঈশান কোনের 'রামঝরকা' মঞ্চ উপর উঠিলে গিরি পদতলের আম্বাড়া হ্রদ ও অদূরে 'খিরিক্কি তলাও' সচ্ছনীর পূর্ণ দিঘি মনোরম ছবি নয়নে ভাসিয়া উঠে। যেন মনে হয় ভগবানের সবই খেলা ঘর। এই চিত্তহারী স্থানে দাড়াইলে পর্ব্বত আরোহনের ও পথ চলনের সকল ক্লান্তির অবসান হয়, মনও শান্ত হয়, ভগবানের দর্শন ইচ্ছা প্রবল হয়। সোপান পার্শ্বে অজস্র 'সীতাফল বৃক্ষ' (আতা গাছ) হইতে সুপক্ক সীতাফল ভক্ষণে দেহের ক্লান্তিও দূর হয়।

এই রাম ঝড়কায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল সেই রম্য রামগিরি যাহা কালিদাসকে মেঘদূত লিখনের অনুপ্রেরণা যোগাইয়া ছিল, মনে পড়িল মহাকবির বিরহী যক্ষের সন্তপ্ত হৃদয় উচ্ছসিত মর্ম্মকথা। সেই নিস্তব্ধ নিরালা প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে প্রণয়িনীর নিকট মেঘকে দূতরূপে গমন করিবার বাক্য মহাকবির সুললিত কাব্যচ্ছন্দে যেন মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামটেকই কালিদাসের রামগিরি বলিয়া সপ্রমানে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সম্প্রতি এক গুহাতে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপি পাঠে এই স্থানই কালিদাসের এক সময়ের লীলা নিকেতন ছিল ইহাই নির্দ্ধারণ করা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকুট হইতে পঞ্চবটী বনে আসন পাতিবার সময় রামগিরি হইয়া গিয়াছিলেন সেই জন্য এই পর্ব্বত পবিত্র এবং জগতের মহাকবি কালিদাসের অবস্থান ক্ষেত্ররূপে খ্যাত, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এই স্থানের বিশেষ মহত্ব।

দ্বিতীয় তোরনের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ আকারের প্রস্তরের এক বিরাট বরাহ মূর্ত্তি অবস্থিত। মূর্ত্তিটী নয় ফিট দীর্ঘ ও ছয় ফিট উচ্চ, সিন্দুর লেপিত অবতার রূপে ভক্তগণের দ্বারা পূজিত।

প্রথমেই বহু শিখর বেষ্টীত চুড়ার মন্দির মধ্যে রৌপ্য সিংহাসনে কাল পাথরের মনোরম লক্ষণ মূর্ত্তি বিরাজিত। ভ্রাতৃবাৎসল্যের অবতার লক্ষণের পূজা ভগবান রামচন্দ্রের অগ্রে করাই বিধেয়। ইহার পশ্চাতে অন্য মন্দিরে রামচন্দ্রের মুনিজনলোভা সুশ্রী মূর্ত্তি দর্শকের মনকে পুলকিত করে। মন্দিরের রৌপ্য সিংহাসন, কারু কার্য্য খচিত কপাট, নানা আয়ুধ সজ্জিত নাট মন্দির বিক্ষিপ্ত চিত্ত দর্শকের মননিবেশের সুযোগ প্রদান করে। এই মন্দিরে আসিয়া রাম লক্ষণের মূর্ত্তি দর্শনে পূন্য অর্জ্জন হয় কি না জানি না, তবে মনে যে পরম আনন্দ হয়, এবং শান্তি বিরাজ করে তাহা নিঃসন্দেহ।

শরৎ

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

(গান)

শরৎ আকাশে আলো ঝলমল,
শেষ হ'ল বরিষণ।
নীল দিঘীজলে শ্বেত শতদল
দেখিছে দিবা-স্বপন।
মাঠে মাঠে জাগে সোনার ফসল,
ফুল অনুরাগে ভ্রমর চপল—
মৃদু গুঞ্জনে ভরি' বনতল—
করে মধু আহরণ।

শেষ হ'ল বরিষণ।
দিগন্ত ছেয়ে ছড়ায়ে প'ড়েছে শুভ্র কাশের হাসি,
শারদ রাণীর আবাহন গানে জাগো জাগো পুরবাসী।
দূর বিমানের সাগরের নীর—
মেঘ-তরঙ্গে হয়েছে অথির;
নভ-অঙ্গনে বলাকার ভীড়—
দেখিয়া হাসে তপন।
—শেষ হ'ল বরিষণ।

হজরত মুহম্মদের উপদেশ

অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ মনস্মুরউদ্দীন এম-এ

হজরত মুহম্মদের উপদেশ "হাদিমা" নামে অভিহিত হয়। তাঁহার সকল বাণী ছয়খানি প্রামাণ্য হাসিদ গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে। উহাকে "ছেহাদেত্তাহ্" বলে। হাদিস গ্রন্থের কিছু কিছু অনুবাদ হইয়াছে ইংরাজী, ফরাসী ভাষায়। উর্দ্দূ এবং ফারসীতে প্রায় সকলগুলি হাদিস গ্রন্থই অনূদিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় হাদিস গ্রন্থের কিছু কিছু অনুবাদ আছে। পরলোকগত মৌলভী গিরিশচন্দ্র সেন "মিসকাত" শরীফ নামক প্রসিদ্ধ হাদিস সঙ্কলন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। বটতলা হইতে মিসকাত, বোখারী প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। ইদানীং মৌলভী আজাহারউদ্দীন এম-এ মহাশয়ের "হাদীসের আলো" নামক গ্রন্থে প্রায় এক সহস্র উক্তি অনূদিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি পরলোকগত স্যর আব্দুল্লাহ্ আল মামুন সুহরাওয়ার্দী এম-এ, ডি-লিট, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল প্রণীত Sayings of Mohamed গ্রন্থখানির একটী চলনসই বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। এই গ্রন্থের খানিকটা বহুপূর্ব্বে মৌলবী মোজাম্মেল হক্ মহাশয় "কোহিনূর" নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১) উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্যের বিচার হইবে।

(২) মুসলমানের অকপটতার [প্রকৃষ্ট] প্রমাণ এই যে, সে [তাহার] কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনোযোগ প্রদান করে না।

(৩) নিজের অভিলষণীয় বস্তু যে স্বীয় ভ্রাতার জন্য কামনা না করে, সেইরূপ কোন ব্যক্তিই প্রকৃত বিশ্বাসী নহে।

(৪) যাহা [ন্যায় ও] ধর্ম্মসঙ্গত তাহা [সকলেরই] বোধগম্য এবং যাহা [ন্যায়বিরুদ্ধ] ধর্ম্মবিগর্হিত তাহাও [সকলেরই] সহজবোধ্য। কিন্তু, এতদুভয়ের মধ্যে কতক-গুলি সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে; ঐ সকলের অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকাই ভাল।

(৫) তোমরা সকলেই সদ্গুণযুক্ত হইও।

(৬) যে জ্ঞানার্জ্জনে জীবন উৎসর্গ করে, তাহার মৃত্যু নাই।

(৭) জ্ঞানিগণকে সম্মান করিলে, আমার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন হয়।

(৮) প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, এবং সমস্তদিন তোমাদের কর্ম্ম ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে।

(৯) যে নিজের জন্যও পরিশ্রম করে না বা অপরেরও কোন কার্য্য সম্পাদন করে না, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না।

(১০) শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যক্ষম হইয়াও যে নিজের জন্য পরিশ্রম করে না বা অপরেরও কোন কার্য্য সম্পাদন করে না, ঈশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন নহেন।

(১১) যাহারা সাধুভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়।

(১২) যে ভিক্ষা না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন।

(১৩) দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রদান করে, বাম হস্ত জানিতে পারে না, এরূপ দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(১৪) যে দান গুপ্তভাবে প্রদান করা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হইয়া থাকে।

(১৫) যে ব্যক্তি কথা বলিবার সময় মিথ্যা কথা বলে, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, এবং তাহার নিকট কোনও দ্রব্য গচ্ছিত রাখিলে তাহা আত্মসাৎ করে, সে আমার কেহই নহে।—বরং প্রকৃতপক্ষে সে (আমার) বিরুদ্ধ-আচারী।

(১৬) যাহারা গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে না, কথা বলিয়া তাহার অন্যথাচরণ করে না এবং অঙ্গীকার করিয়া তাহা রক্ষা করে, তাহারাই বিশ্বাসী [প্রকৃত মুসলমান]।

(১৭) ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন "যাহারা বিপদপাতে অধীর হয় না এবং অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তাহারা সদগুণের অনুষ্ঠানকারী।

(১৮) গর্ব্বহীনতা ও শিষ্টাচার ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে গণ্য।

(১৯) প্রকৃত বিনয় সকল সদগুণের [পুণ্য বা ধর্ম্মের] মূল।

(২০) বিনয় এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা ইসলাম ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ।

(২১) যে দান হৃদয় হইতে স্বতঃ নিঃসৃত হয় এবং দুঃখক্লিষ্ট জনের যন্ত্রণা উপশমকারী বাক্যে ব্যক্ত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

(২২) অকপট, বিশুদ্ধ এবং দয়াশীল হৃদয়বান লোকই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করে।

(২৩) যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব ও স্বকীয় সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহশীল নহে, ঈশ্বরও তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন না।

(২৪) যে সকল যুবক বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বৃদ্ধদিগের সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাদের বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগকে সম্মান করিবার জন্য ঈশ্বর লোক নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২৫) যে সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহশীল নহে ও বৃদ্ধদিগের সম্মান রক্ষা করে না, যে আমার নহে এবং যে সদনুষ্ঠান বিধান করে না ও অসদনুষ্ঠান নিবারণ করে না, সে ও আমার কেহই নহে।

(২৬) যে স্বীয় ভ্রাতাকে সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে রক্ষা করে, সেই সত্য বিশ্বাসী, [প্রকৃত মুসলমান]।

(২৭) কথায় কার্য্যে এবং চিন্তায় যিনি সত্যপরায়ণ তিনি বাস্তব অর্থে ইমানদার [সত্য বিশ্বাসী]।

(২৮) শ্রান্ত ও ক্লান্তের চিত্তের সন্তোষ বিধান, ক্লিষ্ট ব্যথিতের ক্লেশ মোচন—এইরূপ পরোপকার নিজেই নিজের পুরস্কার। দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির দিনে সৎকার্য্যের স্মৃতি বেগবতী নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত আসিয়া আমাদের দুঃখভার বহন করিয়া লইয়া যায়।

(২৯) সর্ব্বদা অটলভাবে সৎকার্য্য করিবে।

(৩০) সাহায্য আবশ্যকের সময় যে তাহার সম শ্রেণীস্থ লোকদিগকে সাহায্য করে, ঈশ্বর কিয়ামতের দিনে [শেষ বিচার দিবসে] তাহাকে সাহায্য করিবেন।

(৩১) কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ? মানব হৃদয়ের সন্তোষ বিধান, ক্ষুধাতুরকে আহার দান, যন্ত্রণা গ্রস্তের সাহায্য, দুঃখপীড়িতের দুঃখ লাঘব ও নিগৃহীতের কষ্ট মোচন।

(৩২) ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে? যে তাহার সৃষ্টজীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করে।

(৩৩) চেষ্টা সফল হউক বা না হউক যে স্বীয় ভ্রাতার অভাব মোচনে চেষ্টা করে ঈশ্বর তাহার পাপ মার্জ্জনা করিবেন।

(৩৪) যে মানব জাতির উপকার করে, মানুষের মধ্যে সেব সর্ব্বোত্তম।

(৩৫) ঈশ্বরের যাবতীয় সৃষ্টজীব লইয়াই তাহার পরিবার, যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ জীবগণের অধিক উপকার করে, সেই ঈশ্বরের প্রিয়তম।

(৩৬) ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং সত্যবাদীতায় সর্ব্বদা সকলকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে।

(৩৭) যে কেহ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের উপর সদয়, ঈশ্বরও তাহার উপর সদয়, অতএব মানুষের সদসৎ নির্ব্বিশেষে দয়াবান হইবে, অসতের প্রতি দয়া প্রকাশে তাহাকে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান-নিবৃত্ত করা হয় এরূপ দয়া প্রকাশ করিলে স্বর্গগতগণ তোমার উপর সদয় হইবেন।

(৩৮) জান্নাতের [চির সুখ ভবন স্বর্গ] অধিকারী তিনজন—প্রথম—ন্যায় পরায়ণ, প্রজার হিতানুষ্ঠানকারী ও সদগুণ ভূষিত নরপতি, দ্বিতীয়—আত্মীয় স্বজন ও পরের প্রতি সদয় হৃদয় স্নেহশীল মানব তৃতীয় ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য।

(৩৯) তোমাদের নিকট আমি দুইটী জিনিষ রাখিয়াছি এই দুইটীকে তোমরা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তোমরা গোমরাহ [বিপথগামী] হইবে না একটী ঈশ্বরের পুস্তক (কোরাণ), অপরটী তাহার দূতের [হজরত মহম্মদের দঃ] ব্যবস্থা বিধান [হাদীস]।

ক্রমশঃ

চিল্কা পরিভ্রমণ

শ্রীমতী সুধা সেনগুপ্তা

৩০ শে আগষ্ট, বুধবার।

ঘড়িতে তখন দশটা। কনিষ্ঠা ভগ্নি রুনু ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ছোড়দি, তোমার বাস এসেছে। তৎক্ষণাৎ আমি বই খাতা লইয়া বাসে উঠিতে যাইতেছি, কিন্তু আমাদের সদাপ্রফুল্লময় ক্লিনার ইন্দ্রমণি যাওয়ার পথে বাধা দিল স্বহস্তে একটী পত্র দেখাইয়া। এবং তাহার শুভ্র চতুষ্পাটী দন্ত বাহির করিয়া বলিল, দিদি, এহি রিপোট খণ্ড স্বাক্ষর করি দিয়। বড়দিদি দেইছন্তি। আমি তাহা খুলিয়া পাঠ করা মাত্রই আমার মুখমণ্ডলে হাসির রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই রিপোর্টটী এই শুভ সংবাদ আনিয়াছিল যে, আমাদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মাননীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এবং পূজনীয়া মিস্ সোম ৩১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার আমাদের চিল্কা ভ্রমনার্থে লইয়া যাইবেন এবং শুক্রবার পুনরায় আমরা পুরী প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

মার অনুমতি লইতে আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই, আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই রিপোর্টটী প্রত্যেকের গৃহে গৃহে গমন বাণী প্রচার করিতেছিল। প্রায় অধিকাংশ মেয়েরাই অভিভাবকদিগের নিকট সম্মতি পাইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকজনের অমত ও হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেকে বাসে আরোহণ করিতে লাগিল এবং বাসটী অন্যদিন অপেক্ষা বেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের আনন্দ-স্রোতে যাহারা যাইবে না, তাহাদের দুঃখ কোথায় যে নির্ব্বাপিত হইল তাহা আমরা বুঝিতেই পারি নাই। তারপর বাস আসিয়া স্কুল গেট সম্মুখে থামিল। এবং আমরা বাস হইতে অবতরণ করিলাম। ফার্ষ্ট ট্রিপের মেয়েদের মধ্যে কে কে যাইবে এবং কে কে অনুমতি পায় নাই তাহা জানিতে আমাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। তাহাদের মধ্যেও কয়েকটী মেয়ের মুখমণ্ডলে দুঃখের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের এত আন... মধ্যে তাহারা তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিল।

হঠাৎ ক্লাশের ঘণ্টা পড়িয়া গেল। সেদিন ... মোটেই মন দিতে পারিতেছিলাম না। ক্লাশের ... মনোযোগ দেওয়া যে আমাদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর ... ব্যক্ত করা কঠিন। কোনরূপে চারিটি পিরিয়ড ক... দিলাম। টিফিনের সময় বড়দি আমাদের ... ডাকিলেন এবং কি কি লইয়া যাইতে হইবে, ... উত্তমরূপে জানাইয়া দিলেন। আরও জানাইলে... সেখানে একটু কষ্ট করিয়া রাত্রি যাপন করিতে হ... আমরা সব সহ্য করিতেই প্রস্তুত।

শরৎকাল। তখনও মাঝে মাঝে বর্ষা ধ... করিবার নিমিত্ত এবং আবর্জ্জনা দূরীভূত করিবার ... ধরায় বর্ষিত হইয়া খাল বিল জলপূর্ণ করিত। সেই ... আমাদের পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল যে, যদি বৃহস্প... বৃষ্টি হয় তবে যাওয়া হইবে না। আমরা বা... আকাশ পানে চাহিতেছিলাম; আকাশের অবস্থা ... ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে কয়েকটী ধূসর ব... আসিয়া আমাদের প্রাণে নিরাশার সঞ্চার করি... ইহা ব্যতীতও বন্যার নিমিত্ত চিল্কায় কোন গৃ... যাইতে ছিল না। এবং সেই নিমিত্তই নিরাশা ... আমাদের আশায় বাধা দিতেছিল। অবশেষে ... বাঙ্গলো পাওয়া গিয়াছিল।

যাক্, সে দিবস কোনক্রমে অতিবাহিত হই... পর দিবস সূর্য্যদেব বেশ উত্তপ্ত কিরণ ধরণীবক্ষে... করিতেছিলেন। মনটা আনন্দে আপ্লুত হইয়া ... কিন্তু কে বলিতে পারে মেঘের চাতুরী?

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একটী ছোট্ট সুট্‌কেশে ... করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে বাসের অপেক্ষ... রহিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস আসিয়া আমাদের ...

পৌঁছাইয়া দিল। তারপর বেলা চার ঘটিকার সময় দলে দলে মেয়েরা ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। বাসে করিয়া আমরা তিন ট্রিপে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমাদের জন-কোলাহল পূর্ণ স্কুলটীতে মুহূর্ত্তে নিরবতা বিরাজ করিল এবং পুরীর নিস্তব্ধ ষ্টেশানটী কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা দলে বেশ ভারী ছিলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন মেয়ে, প্রত্যেকে স্ব স্ব সুটকেশ হস্তে 'দুর্গা' বলিয়া একটী বৃহৎ রিজার্ভ কামরায় উঠিয়া বসিলাম, ট্রেণ ছাড়িতে বেশী বিলম্ব হইল না। গার্ড সবুজ নিশান দেখাইয়া যাত্রার সঙ্কেত করিল। ক্রমে আমরা নবোৎসাহে চিল্কা দর্শনোদ্দেশে নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। লৌহবর্ত্মের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ জঙ্গল ও লতাগুল্মে বিবিধ বর্ণের প্রস্ফুটিত বনজ কুসুমগুলি মৃদু মন্দ সমীর হিল্লোলে দুলিতেছিল। কোথাও মন্দিরাকৃতি উইয়ের ঢিবিগুলি স্বগর্ব্বে তাহাদের কৃতিত্ব প্রচার করিতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়। তন্মধ্যে শালুক, পদ্ম ইত্যাদি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছে। কোথাও আবার দুই পার্শ্বে ভারতের প্রাণ শষ্যক্ষেত্রগুলি বন্যার জলে পরিপূর্ণ। কোথাও গভীর জল। তন্মধ্য হইতে এক খণ্ড জমি তখনও মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বগর্ব্বে ভাসিতেছে। তাহাতে কোন দরিদ্র পরিবার তাহাদের ভগ্নাবশেষ অতি পুরাতন সম্বল ঐ পিতৃ পিতামহের বসত ভিটার মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া তখনও গভীর আশায় তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে ব্যস্ত। এই সমস্ত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপটে উদিত হইয়া পুনরায় চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় দৃষ্টির অন্তরালে দূরীভূত হইতে লাগিল।

ক্রমে ট্রেণের গতি হ্রাস হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকৃতি দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য নয়নপট হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া আমরা মালতী পাটপুর, গোপালপুর, জানকদেইপুর, সাক্ষীগোপাল, ভেলা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এখানে ট্রেণ বেশী বিলম্ব করে না। কয়েকদল যাত্রীকে লইয়া এবং কয়েকদল যাত্রীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইবামাত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশনগুলিতে সামান্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং কুলি, পান, বিড়ি সিগারেট প্রভৃতি আগ্রহসূচক ডাকে ষ্টেশনগুলি মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপরে ট্রেণ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টেশানগুলিতে পুনরায় নিরবতা বিরাজ করে।

ট্রেণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিষ্কার কুটীরগুলি যাত্রীদের মন আকৃষ্ট করে। ট্রেণ দেখিয়াই কুটীর হইতে সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ছোট ছোট বালক বালিকাগণ ছুটিয়া আসে ট্রেণের নিকট। দেহে তাহাদের মলিন বস্ত্রও জীর্ণ, কিন্তু মুখের হাসিটি তাহাদের যেরূপ মধুর সেরূপ সরল ও সেরূপ রমণীয়। তাহাদের শিশুপ্রাণের হাসিটী মলিন মুখমণ্ডলে উথলিয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ আবার হাতছানি দিয়া আমাদের ডাকিতেছিল। তাহাদের সরল প্রাণ ও হাস্য বিকশিত মুখগুলি দেখিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল।

দূরে একটী প্রাচীণ পুষ্করিণী আমার নয়নাগোচর হইল। তাহার সোপানগুলি বড়ই জীর্ণ। দিবসের কার্য্যাবসানে এক উড়িয়া পল্লীবধূ তাহার শূন্য গাগরী পূর্ণ করিতে শেষ সোপানে দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া তাহার গাগরী কটিদেশেই রহিয়া গেল। তাহার দৃষ্টি ছিল আমাদের পানে। নয়নদ্বয় তাহার বন্য হরিনীর ন্যায় উজ্জ্বল। ক্রমে এই সুন্দর ছবিটী ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইল। আমিও চলিয়া গেলাম, তাহার শূন্য গাগরী ও হয়তো জলপূর্ণ হইল। ধীরে ধীরে আমার মানসপটে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুইটী ছত্র ভাসিয়া উঠিল।

বুক ভরা মধু, বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্
চোখে আসে জল ভরে।

ক্রমে রবির বিদায়কাল ঘনাইয়া আসিল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া রবি পশ্চিম দিগন্তে ঝোপের অন্তরাল হইতে ধরনীর পরপারে যাত্রা করিলেন। তখনও তার ক্ষীণ কিরণছটা বিলুপ্ত হয় নাই। গোধূলির আলোকে চতুর্দ্দিক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। নীলাম্বরে সেই সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। কোথাও শুভ্র মেঘ প্রভৃতির অপরূপ রূপ মাধুরী

অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপন মনে চলিয়াছে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে। কোথাও ধূসর জলভরা মেঘ তাহার নয়নবারি ধরণী বক্ষে বর্ষণ করিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী জলপূর্ণ করিবার মানসে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। নিম্নে ধান্য ক্ষেত্রের ধান্য শিশুগুলিতে মৃদুমন্দ পবন আসিয়া তাহাদের কর্ণকুহরে কি এক আশার বাণী প্রচার করিয়া চলিয়া যায়। এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে তাহাদের মস্তক অবনত করে। মাঝে মাঝে শুভ্র কাশ ফুলগুলি সমীর স্পর্শে যেন সন্ধ্যারাণীকে চামর ব্যঞ্জন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে গৃহে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। পূর্ব্বদিগন্ত হইতে শশধর ধীরে ধীরে উদিত হইয়া তাহার উজ্জল কিরণ পৃথিবী বক্ষে বিতরণ করিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিকের দৃশ্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময় আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করযোড়ে চাহিয়া "প্রভু শকতি দাও", এই স্তবগানটী করিয়াছিলাম, ইহা ব্যতীত" আয় মোরা সবাই মিশে খেলব রাই বিশে" অতীত গৌরব বাহিনী উঠগো ভারত লক্ষ্মী প্রভৃতি সঙ্গীতে আমরা আমাদের কামরাটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলাম।

হঠাৎ সমীরা বলিয়া উঠিল, সুধাদি ঐ দেখ! চাহিয়া দেখি কিছুই বিস্ময়কর জিনিষ নহে। খুরদা ষ্টেশান। দূর হইতে খুরদার দৃশ্য অতি চমৎকার লাগিতেছিল। আলোক মালায় আলোকিত। ধীরে ধীরে ট্রেণ আসিয়া খুরদা ষ্টেশনে থামিল। তৎক্ষণাৎ "চাই পান বিড়ি সিগারেট চা; চাই গরম চা? কুলি কুলি" ইত্যাদিতে ষ্টেশানটী জনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেখানে অনেকে কিছু জলযোগ করিয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ট্রেণ সেখানে অপেক্ষা করিয়াছিল। এই ষ্টেশানটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃহৎ এবং সুন্দর। হঠাৎ গোলমালের পথে বাধা দিয়া ট্রেণ নির্দ্ধারিত লাইনে চলিতে লাগিল। পুনরায় আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম।

মাঝে মাঝে দৈত্য, দানবাকৃতি বৃহৎ বৃহৎ পাহাড়গুলি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহারা কত যুগযুগান্তরের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দূরে কোথাও মশালের ন্যায় আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে পুনরায় নিমেষে নির্ব্বাপিত হইতেছে। কখনও দুই পার্শ্বে বন্ধুর প[illegible] পরিত্যাগ করিয়া, কখনও বা পার্ব্বত্য পথ ভেদ করিয়া বন বনানী ঝোপ জঙ্গল পশ্চাতে ফেলিয়া আমাদের ট্রেণ চলিয়াছে। সঙ্গীত লহরীতে ক্লান্তি আমাদের উদ্যমে মোটেই বাধা দিতে পারিতেছিল না। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ আমার নয়নে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উদিত হইল। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহুদূরে কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া [illegible] রৌপ্য দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে। ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্যটী আর কিছুই নহে। চিল্কা হ্রদ। তাহাতে চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইয়া এত চকচক্ করিতেছিল [illegible], সেই অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্য এবং অপূর্ব্ব শ্রী দর্শন করিলে দর্শক দিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঝোপ ঝাড়ের মধ্য হইতে উঁকি মারিতে মারিতে চিল্কাও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। তারপর কয়েকটী ষ্টেশান কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থান বালুগাঁ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। শুনিয়াছিলাম এখানে ট্রেণ খুব অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে। সেইজন্য যতশীঘ্র পারি সুট্‌কেশ লইয়া ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশানটী বেশ অন্ধকার ছিল। কয়েকটী আলো ষ্টেশানের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারে নাই। এবং সেইজন্য আমি ষ্টেশানটী উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই।

তারপর আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া একটী অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। পথটীর দুইপার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জাতীয় বৃক্ষ অবস্থিত। দুই একটী গৃহে মিট্‌মিট করিয়া ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। রাস্তটী নিরব নিস্তব্ধ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা একটী বাঙ্গলোর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং ক্লান্ত দেহে আসিয়া সেখানে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। মাননীয় মিঃ লাহিড়ী বহু পূর্ব্বেই ষ্টেশান হইতে আমাদের বাঙ্গলোর পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলোর ব্যাবস্থা আমাদের ভালরূপে নিরীক্ষণ করাইলেন।

বাঙ্গালোর সম্মুখে একটী জলাশয় অবস্থিত। এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে আম, লেবু, পেয়ারা, কুল ইত্যাদি নানা জাতীয় বৃক্ষ বাঙ্গালোর শোভা বর্দ্ধন করিয়া

ছিল। মাটীর প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটী বাঁধান কূপ। অবস্থানের নিমিত্ত আমাদের তিনটী ঘরও সম্মুখের একটী বারাণ্ডা নিযুক্তছিল; রন্ধনশালা কিছু দূরেই অবস্থিত। তাহার পশ্চাতেই একটী বৃহৎ প্রান্তর। আমাদের বাঙ্গালোটী এইরূপ।

পাচক বহুপূর্ব্বেই রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিল। আমরা আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম তৎপরে বড়দির সহিত চিল্কা দর্শনোদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। যাহা দর্শন করিতে আমারা আমরা এতদূর আসিয়াছি, এবং যাহার রূপ বর্ণনা লোক মুখে শ্রবণ করিয়া, ভূগোলে পাঠ করিয়া যে ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া আমাদের বাঙ্গলোর গেট অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বের বৃক্ষ সকল পথে বেশ শীতল বায়ু প্রবাহিত করিতে ছিল। চন্দ্রকিরণ বৃক্ষ পত্রের ফাঁকে ফাঁকে পথস্থ বৃক্ষছায়ায় পতিত হইয়া পথের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই পথ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা এক কলরব শব্দ শ্রবণ করিলাম। শব্দ অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম পথের দুইপার্শ্বে বৃহৎ নালা অবস্থিত এবং তাহার মধ্যদিয়া প্রবলবেগে বন্যার জল চলিয়া যাইতেছে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেদিকেই কেবল পাহাড় শ্রেণী দণ্ডায়মান। মাঝে মাঝে দুই একটী গৃহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ঝোপের মধ্যস্থ কুটীর হইতে মিটমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা চিল্কা দর্শন করিলাম। এই বিশাল হ্রদের পরিসীমা যে কোথায় তাহা আমার দৃষ্টি গোচর হইল না। তীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে। হ্রদের জলে কয়েকটী নৌকা ভাসিতেছিল। তাহাতে মাঝিরা সারাদিবসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সুখে নিদ্রায় রত। চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। হ্রদও বুঝি তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহে। সেই নিমিত্তই বোধ হয় ধীর স্থির হইয়া তাহার অঙ্গে তাহাদের ঘুমপাড়িয়ে সঙ্গীতে নিদ্রামগ্ন করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ আমাদের আগমনে তাহাদের সুখস্বপ্ন নিমেষে ভাঙ্গিয়া অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তারপর আমরা হ্রদের গর্ভে নৌকাযোগে নৈশ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলাম। এবং কিছুক্ষণ পরেই আমরা চিল্কা গর্ভে ভ্রমণের নিমিত্ত দুইটী নৌকায় আরোহন করিলাম। চতুর্দ্দিকে মৌনতা বিরাজ করিতেছে। হ্রদের লবণাক্ত স্বচ্ছজল ধীর স্থির। একটী তরঙ্গ নাই। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি পাহাড় দৃষ্টীগোচর হইতে ছিল। তাহারা হ্রদ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান।

উর্দ্ধে সুনীল আকাশে কৃষ্ণ পক্ষের শশধর শোভা পাইতেছিল। তাহার বিহনে বোধ হয় আমরা এত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম না। হ্রদের অপূর্ব্ব শ্রী দর্শনে মনে হইতেছিল যেন চন্দ্রদেবী একটী রৌপ্য নির্ম্মিত মুকুর দ্বারা তাহার অপূর্ব্ব মুখশশীর শ্রী দর্শন করিতেছিলেন। এবং মৃদু মৃদু হাস্য বিকশিত মুখখানি তাহার সেই মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। চিত্রকরের অঙ্কন পটুতা, লেখকের লেখনী এবং কবির কল্পনা এই অপরূপ দৃশ্যের নিকট হার মানিতে বাধ্য।

কখন দুইটী নৌকা একত্রিত হইতে ছিল, পুনরায় দূরে চলিয়া যাইতেছিল। এইরূপে পনেরো কুড়ি মিনিট ভ্রমণের পর আমরা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমরা আমাদের সঙ্গীতে নিস্তব্ধ হ্রদগর্ভ মুখরিত করিয়া তুলিলাম।

তারপর নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় সেই পরিত্যক্ত পথটী ধরিয়া বাঙ্গলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সারা দিবসের ক্লান্ত দেহে সতরঞ্চির উপর শয়ন করিলাম। তখন সেই সতরঞ্চিতে শয়নই আমাদের নিকট পরম উপভোগ্য হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম ভীষণ মশকের উৎপাত। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম। মশকের উৎপাত মোটেই হয় নাই।

যে যেখানে পারিল সেখানে শয়ন করিল। আমি, কুইন, ইলা, ভানু, সলিলা, ইত্যাদি কয়েকটী মেয়ে সম্মুখের ঘরের এক পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ গল্প করার পর আমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় বন্যা যেরূপ গর্জ্জন করিয়া গ্রাম ও নগর জলপ্লাবিত করে, সেইরূপ একটী শব্দ হইল। ইলা মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "ট্রেণ, ট্রেণ; এই সুধা ওঠ, না, দেখ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে।" উঠিয়া সম্মুখের জানালা দিয়া দেখিলাম, একটী

অজগরের ন্যায় ট্রেণ যাত্রীসহ আঁকিয়া বাঁকিয়া গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে লাইন ভেদ করিয়া। আমার ভুল ধারণায় আমি নিজেই নিজের মনে হাসিয়া উঠিলাম। তারপর কখন যে আমি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছি তাহা নিজেই জানি না।

নিদ্রা আসিয়া আমাদের রঙ্গমঞ্চে একটী কৃষ্ণ বর্ণ-পর্দ্দা ফেলিয়া সে দিবসের অভিনয়ে যবনিকা পতন করিল।

ধরণীর পরপার হইতে সূর্য্যদেব ধরণাকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া কৃষ্ণ বর্ণের পর্দ্দাটী উত্তোলন করিলেন। পুনরায় রঙ্গমঞ্চের কার্য্য আরম্ভ হইল।

"এই সুধা; ওঠ না; তোর ঘুম কি আর ভাঙ্গবে না?" ভানুর স্বরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আমি পুনরায় পুরী হইতে চিল্কায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্বপ্নটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। নিদ্রা বিজড়িত নয়নদ্বয় উন্মিলিত করিয়া প্রথম বালুগাঁয়ের প্রভাত দর্শনে আমার হৃদয় নবোৎসাহে পূর্ণ হইল। ঈশ্বরের চরণে একবার মস্তক অবনত করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। প্রভাতের সহিত নিস্তব্ধ বালুগাঁ জাগিয়া উঠিল। প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। নিশা বহু পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছে। কিন্তু তখনও নীলাম্বরে ম্লান শশধর শোভা পাইতেছিল। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তপ্ত কিরণে চন্দ্রের উজ্জল কিরণ ম্লান হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আমাদের বাঙ্গলোর সম্মুখেই রেল পথ। এবং তাহার অপর পার্শ্বে সুবিস্তৃত প্রান্তরে ধূসর বর্ণের পাহাড় সমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে বালুগাঁকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছিল যেন তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া ধুমরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। দুই একটী ডাক গাড়ী ও মালগাড়ী লাইন ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চিল্কা-স্রোতে অবগাহনের নিমিত্ত বেলা দশ ঘটিকার সময় রওনা হইলাম। পুনরায় আমরা রাত্রের সেই পথটী ধরিয়া চলিলাম। পথের দুই পার্শ্বে ধান্য চারাগুলি তখনও বন্যার জল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সেই স্রোতের জলে কেহ কেহ অবগাহনে ব্যাপৃতা, কেহ কেহ আবার কলস ভরিয়া জল লইতেছে গৃহকার্য্যের নিমিত্ত। নববধূ আমাদের দেখিয়া লজ্জায় তাহার অবগুণ্ঠন টানিয়া আজানু সলিলে দণ্ডায়মানা। স্রোতের জলের অপর পার্শ্বে ঝোপের অন্তরাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি উঁকি মারিতেছিল। এই সমস্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চিল্কার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া আমরা প্রথমে তিনটী নৌকায় উঠিয়া বসিলাম এবং ভ্রমণের নিমিত্ত নৌকা ছাড়িয়া দিল। উর্দ্ধে সূর্য্যদেব যেন আমাদের এত আনন্দ ও উৎসাহে বাধা দিবার নিমিত্ত সহস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু আমাদের উৎসাহের নিকট তাহাকে হার মানিতে হইল।

এখন হ্রদে রাত্রি অপেক্ষা অধিক তরঙ্গ ও স্রোত। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি হেলিয়া দুলিয়া একটী পাহাড়ের উদ্দেশে চলিতে লাগিল। আমরা দূরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর তীরভূমি ক্রমেই অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। অবশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সমূহ, তীরস্থ তাল নারিকেল বৃক্ষাবলী সকলই একে একে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল হ্রদের তীরে একটী সূক্ষ্ম দিক্ চক্রবাল রেখা পড়িয়া রহিল। হ্রদমধ্যস্থ পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি শ্রী বৃদ্ধি করিতেছিল। জল, স্থল ও নভ চতুর্দ্দিকেই প্রকৃতির নিপুণ হস্তের দক্ষতা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছিল। চিল্কার নীল স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি পাহাড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া ও তীরে আঘাত করিয়া সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে। হ্রদের জলে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব চাকচিক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অবশেষে আমরা একটী পাহাড়ের পাদদেশে নৌকা রাখিয়া কূলে অবতরণ করিয়াছিলাম। সেখানে একটী পুষ্করিণীর তীরে বৃক্ষছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। নিকটেই একটী পুরাতন শিব-মন্দির বৃক্ষ ছায়ায় যেন ক্লান্তি দূর করিতেছিল। তার প্রতি প্রস্তরে যেন অতীতের বহু ইতিহাস খোদিত রহিয়াছে। বৃক্ষের শীতল সমীরে প্রাণ মন শীতল হইয়া উঠিয়াছিল।

অনন্তর আমরা ধীরে ধীরে নিকটস্থ একটী পাহাড়ে আরোহণ করিবার মানসে যাত্রা করিলাম। সেই পাহাড়টী বিলক্ষণ উচ্চ। কণ্টক বৃক্ষ, বিবিধ গুল্ম ও ঝোপের মধ্যে নানা জাতীয় কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া ইহার প্রধান আভরণ

স্বরূপ আচ্ছাদিত। অতি কষ্টে মিঃ লাহিড়ীর সাহায্যে ধীরে ধীরে আমরা শিখরীর কিছুদূর আরোহণ করিয়াছিলাম। উপরে উঠিয়া প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্য ও অসীম সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নয়নে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। নীম্নে ফেনিল তরঙ্গরাশি শৈল প্রান্তে অবিরাম তাহার কঠিন পাদমূল চুম্বন করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছে। কোথাও বিটপি শোভিত দ্বীপাবলী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ বেষ্টিত শিখরীসমূহ নীল স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া হ্রদ মধ্যে আর একটী অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অদূরে চিল্কার প্রান্ত দেশে গগনভেদী উন্নত গিরি শ্রেণী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে অবস্থিত হইয়া আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ভাবে বিভোর হইয়া একবার সৃষ্টি কর্ত্তার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এইরূপ শান্তি-কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া আর জনকোলাহলপূর্ণ জগতের কথা স্মরণ করিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না।

হ্রদের নিকটে কয়েকটী জীর্ণ কুটীর অবস্থিত। বন্যায় চিল্কার জল এত বাড়িয়েছে যে, তাহাদের কাহার কুটীরের পৈঠা কাহারও বারাণ্ডা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। কুটীরস্থ পরিবারগণ তখনও কুটিরগুলিকে বন্যার জল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা হ্রদের জল অবরোধ করিয়াছে। কে জানে তাহাদের আশা সফল হইবে কি না? গ্রীষ্মকালে তাহারা বর্ষার আগমনের নিমিত্ত হয়ত আকাশ পানে চাহিয়াছিল প্রচুর শষ্য উৎপন্ন করিবে বলিয়া। কিন্তু সেই বর্ষাই পুনরায় তাহাদের এত আশা নিরাশায় পরিণত করিরা তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে প্রস্তুত।

এইরূপ করুণ দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতে পারে নাই। পুনরায় আমরা শিখরীবক্ষ অতিক্রম করিয়া নৌকা যোগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তপ্ত কিরণ তখন আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা নানা সঙ্গীতে ক্লান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হঠাৎ আমাদের মুখে "রজনী রাজী কি তোতে দেলা মেলানি" এই উড়িয়া সঙ্গীতটী শ্রবণ করিয়া মাঝিরা একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল।

যাক, তৃষ্ণায় তখন আমাদের শরীর অবশ। কোন রূপে স্রোতের জলে উত্তপ্ত দেহ মন শীতল করিয়াছিলাম। তীরের জল তত পরিষ্কার নহে। কোনরূপে স্নান সমাপ্ত করিয়া নিকটস্থ একটী কুটিরে সিক্ত বসন পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছিলাম। তৎপরে আহার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। কেহ বিদায় গল্প করিতেছিল। কেহ কেহ লুডো খেলিতেছিল এবং গ্রামোফোন শুনিতেছিল। আবার কেহ কেহ ক্লান্ত দেহ সতরঞ্চির উপর এলাইয়া দিয়াছিল।

ক্রমে আমাদের বিদায়সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। প্রত্যেকের মনই বিষাদ পূর্ণ। প্রত্যেকে তাহাদের সুটকেশ সজ্জিত করিয়া স্ব স্ব প্রসাধনে ব্যাপৃত। প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুটকেশ লইয়া বালুগাঁয়ের সেই একদিবসের পরিচিত বাঙ্গলোটী পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ষ্টেশনের উদ্দেশে। তখন আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছে। হয়ত আমাদের বিদায় সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে ও কয়েক বিন্দু অশ্রু আমাদের উপর বর্ষণ করিল এবং একটু পরেই থামিয়া গেল। তারপর কোনরূপে বালুগাঁয়ের ক্ষুদ্র ষ্টেশনটীতে আসিয়া বসিলাম। ষ্টেশনের সম্মুখে একটী বৃহৎ প্রান্তর অবস্থিত। তথাকার গগন ভেদী পাহাড়ের চূড়া মেঘ বেষ্টিত করায় মনে হইতেছিল যেন বরফ জমিয়া তাহার মস্তক শীতল করিতেছে। বটবৃক্ষগুলি তাহার শিকড়গুলি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া জটাধারী সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

তারপর দূর হইতে ট্রেণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটি মালগাড়ী আসিয়া আমাদের উপহাস করিয়া চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিকে কম্পিত করিয়া থামিয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট কামরায় আসিয়া উপবেশন করিলাম। তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে বর্ষা নামিল। প্রত্যেকের মন বিষাদে পরিপূর্ণ। গার্ড তাহার সবুজ নিশান দেখাইয়া যাত্রীদিগকে বালুগাঁ পরিত্যাগের সঙ্কেত করিল। মিঃ লাহিড়ী তখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন।

তাঁর এইরূপ আমাদের নিমিত্ত শরীর ব্যয় ও সময় ব্যয়ে আমরা তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা পুনরায় আমাদের বাঙ্গলোটি ট্রেণ হইতে দেখিতে পাইলাম। উহা একেবারে নিরব নিস্তব্ধ। কখনও বৃষ্টি হইতেছে, পুনরায় থামিয়া যাইতেছে। এইরূপে নানা দৃশ্য দেখিতে এবং বড়দির নিকট হইতে বহু আশাপ্রদ গল্প শুনিতে শুনিতে পুরীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তৎপরে আমরা আসিয়া পুরী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম এবং বাসারোহণে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অকস্মাৎ এই ভ্রমনানন্দের মূলে কেবলমাত্র উড়িষ্যা প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কাননগো মহাশয়ের অর্থদান এবং আমাদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলি, এবং সরোজনলিনীর সেক্রেটারী মাননীয়া মিস্ সোমের ... অর্থ ব্যয়। সেই নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব। *

* পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম-স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে এই রচনা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পরিণতি

শ্রীসত্য মজুমদার

গ্রামের নাম কুসুমপুর। পূর্ব্ববঙ্গের একটি ছায়াশীতল পল্লীগ্রাম। সাধারণ গ্রাম বলিতে যাহা বুঝায়, কুসুমপুর তাহা হইতে অনেক বড়। এই গ্রামে চারশত লোকের বাস। জমীদার গ্রামেই বাস করেন; গ্রামের উন্নতির জন্য তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা। তাঁহার চেষ্টায় গ্রামের মধ্যে পঙ্কিল ডোবার সংখ্যা খুবই কম। কয়েকটি পুষ্করিণী আছে, তাহা স্বচ্ছ বারিতে পরিপূর্ণ। গ্রামে আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি ফলের গাছের অভাব নাই।

এই গ্রামে বিধবা বসুগৃহিণী বাস করেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র রমেশকে লইয়া তিনি অকূল পাথারে পড়িলেন; স্বামী কয়েক বিঘা জমী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে কোন রকমে তিনি পুত্রটিকে মানুষ করিতে লাগিলেন। গ্রামে একটি হাইস্কুল ছিল, সেই খানেই রমেশ ভর্ত্তি হইল। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের দয়ায় তাহার মাহিনা ফ্রি হইয়া গেল।

বর্ত্তমানে রমেশ অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছে। মেধাবী বলিতে যাহা বুঝায় সে সেরূপ ছিল না। গত দুই বৎসর সে নিজের সমধিক চেষ্টা সত্বেও অষ্টম শ্রেণী ত্যাগ করিয়া উচ্চে উঠিতে পারে নাই। পড়াতে যে তাহার মন নাই তাহা ঠিক নহে। সে পড়ার জন্য অনেক সময় অতিবাহিত করে কিন্তু স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং বুদ্ধি ও কিঞ্চিৎ স্থূল। তাহারই ফলে সে দুই বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীতে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত গরীব বলিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ফ্রীসিপের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

এবার রমেশ অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে। আজ প্রমোশনের দিন। তাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা ভগবানই জানেন। আহারের পরে দেবদেবীকে নমস্কার করিয়া রমেশ বিদ্যালয়ের দিকে যাত্রা করিল। পথে কত কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিল। যদি এবারেও সে ব্যর্থকাম হয় তবে কেমন করিয়া লোকের সম্মুখে মুখ দেখাইবে? গ্রামের লোকে তাহাকে কতই যে নিন্দা করিবে। এইসব যখন সে ভাবিতেছিল তখন তাহার মাতার বিষাদ-মলিন মুখ খানি মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি দিতে ছিল।

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতে ও পারে নাই; ছাত্রেরা সকলে হট্টগোল করিয়া বেড়াইতেছে। আজ আর ক্লাসে পড়া হইবে না। নবম শ্রেণীর প্রমোশন হইতেছে। অন্যান্য ছেলেরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে মত্ত।

ক্রমে অষ্টম শ্রেণীর প্রমোশনের সময় আসিল। হেডমাষ্টার মহাশয় দপ্তরীকে সঙ্গে লইয়া ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। রমেশের বুকখানি অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক তাহার মনে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে।

হেডমাষ্টার মহাশয় উত্তীর্ণ বালকদের নামের তালিকা পড়িয়া চলিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নাম আসিল, কিন্তু রমেশের নাম আসে না। তাহাকে এখনও ডাকিতেছেন না। দেখিতে দেখিতে প্রমোশন শেষ হইয়া গেল। হেডমাষ্টার মহাশয় সপ্তম শ্রেণীতে প্রমোশন দিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

রমেশের চোখ ছাপাইয়া কান্না আসিল। দুইটি বৎসর সে এই শ্রেণীতে কাটাইয়াছে, আরো সুদীর্ঘ এক বৎসর কাটাইতে হইবে। সে এত মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছে কিন্তু শেষে এই ফল হইল? ঈশ্বর তাহা হইলে কি তাহার উপর একেবারেই নির্দ্দয়? সে তো দুরন্ত ছেলের মত পড়াতে অবহেলা করে নাই, অত্যন্ত যত্নের সহিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল যে কিরূপে বাড়ীতে মুখ দেখাইবে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর যদি নিষ্ফলতার মধ্য দিয়া কাটিয়া যায় তাহা হইলে কি মা তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

এই সময় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফটিক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার সহিত এক শ্রেণীতেই পড়িত; এবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ছেলেটি রমেশকে আন্তরিক স্নেহ করিত। সে তাহাকে কোনোদিন মন্দ ছেলে বলিয়া ঘৃণা করে নাই। রমেশ অকুণ্ঠিতভাবে ইহার সহিত আপনার সুখদুঃখের কথা আলোচনা করিত।

ফটিক আসিয়া সস্নেহে রমেশের হাত ধরিয়া বলিল, কি ভাই, মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, নয়? চল, আমার সঙ্গে একবার বেড়িয়ে আসবে।

রমেশ বলিল, কি আর বলব ভাই, দুই বছর চেষ্টা করেও তো পাশ করতে পারলাম না, বোধ হয় আমি পাশ করি, তা ভগবানের ইচ্ছা নয়।

ফটিক বলিল, কেন ভাই, মিছিমিছি মন খারাপ করছ? যা তোমার কপালে ছিল তাই হয়েছে। এ বছর চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই ভাল ভাবে পাশ করবে।"

এই কথায় রমেশের মুখের উপর নৈরাশ্যের একটা কালো ছায়া পড়িল। সে একেবারে হতাশ হইয়া বলিল, "আমি আর বোধ হয় মায়ের কোনও উপকারে এলাম না। আমার জীবনই বোধ হয় ব্যর্থ হতে চলেছে, আর আমার পড়াতে মোটেই মন লাগবে না।"

ফটিক বলিল, "সে কি ভাই? ও রকমভাবে মন খারাপ করলে কি চলে? মন প্রাণ দিয়ে খেটে চল, অবশ্যই তার ফল পাবে। ও সকল ভাবনা একেবারে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। চল বেড়িয়ে আসি।"

পথে যাইতে যাইতে ফটিক তাহার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নানারূপ গল্প করিয়া তাহার দুশ্চিন্তা দূর করিবার প্রয়াস পাইল। রমেশ কিন্তু তাহার সকল কথা মন দিয়া শুনিতেছিল না। অন্যমনস্ক ভাবে কোনও কোনও কথার উত্তর দিতেছিল। বন্ধুর সহিত খানিকক্ষণ বেড়াইয়া যেন তাহার মন কতকটা শান্ত হইল।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরের দিন হইতে লম্বা ছুটি। যাহারা নূতন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু রমেশের মন বিষাদে আচ্ছন্ন, তাহার মা আজ তাহার নিষ্ফলতার সংবাদ পাইয়াছেন। ইহার জন্য রমেশ তাঁহার কাছে খুব তিরস্কৃত হইয়াছে। দুঃখে, ক্ষোভে সে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইল যে শিক্ষার পথে মাতাকে সুখী করা তাহার ভাগ্যে নাই। এই পথ তাহার নিকট সুদুর্গম বলিয়া বোধ হইল; একেবারে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার ইচ্ছা হইল।

দুপুরে আহারের পরে রমেশ বাড়ী হইতে পথে বাহির হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে জমীদার বাবুর বাড়ীতে আজ বেলা তিনটার সময় কবিগান হইবার কথা আছে। সেখানে গেলে তবু কতকটা অন্যমনস্ক থাকা যাইবে, এই মনে করিয়া সে সেদিকে পা বাড়াইল। শান্ত দ্বিপ্রহরে গ্রামটি নিস্তব্ধ; কেবল মাথার উপরে একটা ঘুঘু করুণস্বরে চেঁচাইয়া চলিয়াছে। দিবসের প্রথমভাগে

যে কল-কোলাহল উঠিয়াছিল তাহা সমস্তই থামিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সে জমীদার শিবুবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। বাড়ীর উঠানে একটা প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙান হইয়াছে। গান আরম্ভ হইবার এখনও অনেক দেরী। ততক্ষণ আর রমেশ কোথাও গেল না; সেইখানেই বসিয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিল। ক্রমে সেইস্থানে জনসমাগম হইতে লাগিল। সেই গ্রামের এবং পাশের অনেক গ্রামের বহু লোকের আগমনে স্থানটি প্রায় ভরিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর গান আরম্ভ হইল।

শিবুবাবু আসিয়া তাঁহার বিশাল বপুটি লইয়া সভাস্থান আলোকিত করিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। গ্রামের অপরাপর ভদ্রলোকও সেখানে উপস্থিত। প্রথমে দীপু নামে এক কবি উঠিল এবং তাহার কবিগানের সঙ্গে যে বাজনা বাজাইবে সেও ঢোলক লইয়া উঠিল। গান আরম্ভ হইয়াছে; দীপুর গান জমাইবার ক্ষমতা অসাধারণ। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সকলের প্রশংসা লইল। রমেশ আগ্রহান্বিত হইয়া শুনিতে লাগিল। দীপুর পালা শেষ হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনাথ আসিল। সে পূর্ববর্তী কবির কতকগুলি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিল। পালা হইতেছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয় লইয়া। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বনাথ গাহিয়া উঠিল, "ওরে শোকানলে গোকুল ভেসে যায়।" ইহা শুনিয়া শিবুবাবু প্রভৃতি ভদ্রলোক কৌতুকের সহিত 'বাহবা' 'বাহবা' বলিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন। ইহাতে সে ভাবিল যে নিজে একজন বিশিষ্ট কবি হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে যোড়হস্তে শিবুবাবুর সামনে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে কত্তা! এ আমার নিজের রচনা।" শিবুবাবু বলিলেন, "তা আমি আগেই বুঝেছি, তুমি অনলে গোকুল ভাসিয়েছ, তখন এ রচনা তোমার না হয়ে যায় না।" বিশ্বনাথ পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা।" দুঃখের সময়েও রমেশের হাসি আসিল।

ছয়টা বাজিয়া গেলে সে আসর হইতে উঠিয়া পড়িল। ইহা শুনিতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। পথে বাহির হইতেই আবার সেই পুরাতন ভাবনা তাহার মন অধিকার করিল। ভাবিতে ভাবিতে সে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে। যখন বাড়ীর নিকট আসিল তখন সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাহার খাতা হইতে একটি সাদা পাতা লইয়া সে গোটা গোটা অক্ষরে লিখিল,

"মা! আমি আর পড়িব না। চাকরীর চেষ্টায় চলিলাম। বেশী ভাবিও না। পড়ায় আমি উন্নতি করিতে পারিব না। বিদেশে নিজের উন্নতি করিতে পারিলে তোমাকে সংবাদ দিব।

ইতি

রমেশ।"

এই কাগজখানি আঠা দিয়া ঘরের মধ্যে বিছানার পাশের দেওয়ালে আঁটিয়া রাখিয়া ক্যাশবাক্স হইতে পাঁচটি টাকা লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ষ্টেশনে যাইবার জন্য পৃথক রাস্তা ধরিয়া যাত্রা করিল। মাইল দুয়েক পরে ই বি রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশন। এইখানে আটটার সময় কলিকাতাগামী গাড়ী দাঁড়ায়; সেই গাড়ীতে সে ভাগ্য অন্বেষণে যাত্রা করিবে।

যখন সে ষ্টেশনে পৌছিল, তখনি ঝিঁ ঝিঁর গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের চন্দ্র আকাশে কিরণ দিতেছে। এখনও গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। ছোট ষ্টেশন, যাত্রীও বেশী নাই। যথাসময়ে টিকিটের ঘণ্টা পড়িবার পর টিকিট করিয়া সে দেখিল যে তাহার কাছে দুটাকা পনেরো আনা পয়সা আছে। গাড়ী আসিলে সে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিল।

ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ষ্টেশনে যে এত বেশী গোলমাল হয় তাহা তাহার কোনও দিন ধারণা ছিল না। পল্লীগ্রামের ছেলে—কোনও দিন সহরে আসে নাই, তাই এত বড় ষ্টেশন দেখিয়া সে একেবারে অবাক। প্ল্যাটফর্মে নামিবার পর গেটে টিকিট দিয়া যখন সে বাহির হইল তখন হঠাৎ তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। রাত্রিতে অজানা জায়গায় কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া সে ভাবিল যে রাত্রিটা সে এইখানেই ঘুমাইয়া কাটাইবে; সুতরাং নিকটবর্ত্তী একটি দোকানে

যাইয়া এক কাপ চা খাইয়া নিদ্রার যোগাড় দেখিতে লাগিল।

পরদিন বুধবার। রমেশের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরের সেই সারাদিন ব্যাপী কর্ণ পীড়াদায়ক শব্দ আবার সুরু হইয়াছে। রমেশ প্রথমে তাহার পয়সাগুলি যথাস্থানে আছে কিনা দেখিল। সেইগুলি ঠিক আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। কিন্তু এই জন-সমুদ্রের মধ্যে চলাফেরা করা তো তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। ফুটপাত লোকে একেবারে ভর্ত্তি। রমেশ 'বাসে' না চড়িয়া ফুটপাত দিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল। রাস্তার দুইপাশে বড় বড় দালান বাড়ী, রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মটোর দেখিয়া সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ভাবটা যখন কাটিয়া গেল তখন তাহার মনে পড়িল, কি জন্য সে আসিয়াছে। এই প্রাসাদোপম বাড়ীগুলির একটাতে যদি সামান্য চাকরী পায় তাহা হইলেই সে ধন্য হইয়া যাইবে।

কতকগুলি ব্যবসায়ীর নিকট আবেদন করাতে সে ব্যর্থ মনোরথ হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, বেলাও অনেকখানি হইয়া গিয়াছে। রমেশ একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ক্ষুধায় সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। রাত্রে সে চা ছাড়া কিছু খায় নাই, আর আজ সকাল হইতে কিছুই খাওয়া হয় নাই। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ভাবিয়াছিল যে অতবড় সহরে অবশ্যই একটা চাকরী মিলিয়া যাইবে, কিন্তু এখন দেখিল যে চাকরী অত সস্তা নহে! কাছাকাছি একটি হোটেলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার পর সে আবার পথ চলিতে লাগিল।

এইরূপে তাহার দিন যাইতে লাগিল। প্রভাতে উঠিয়া তাহার হাঁটা সুরু হয়, মধ্যাহ্নকালে নিকটবর্ত্তী কোন হোটেলে আহার সমাধা করিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইতে হয়। সন্ধ্যাকালে মলিন মুখখানি লইয়া ফিরিতে হয়। দেখিতে দেখিতে হাতের পয়সাও ফুরাইয়া যাইতেছে। একদিন আহারের পর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সে একটি পার্কে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিল। তখন বেলা দেড়টা। সেখানে দেখিল অনেক বাড়ীর চাকর কার্য্য অবসানে বিশ্রামসুখে মগ্ন। ভাবিল যে ইহারা কি সুখী! এক স্থানে কতকগুলি চাকর গল্পগুজব করিতেছে। একজন বলিতেছে, "আর ভাই, এত কম মাইনেতে পোষায় না। হাট বাজার করা, ঘর ঝাট দেওয়া, বাসনমাজা সবইতো আমায় করতে হয়। এই সামান্য দশটাকা মাইনে, আর দুবেলা দুটা ভাত দেয় খেতে,—এতে কি আর চলে?" অপর চাকরেরা সায় দিল। রমেশ ভাবিল—"ইহারা আমার তুলনায় কত সুখী তবু অসন্তুষ্ট। আমি এই রকম একটা কাজ পেলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।

পনরটি দিন এইরূপে নিষ্ফলভাবে কাটীয়া গেল। এখন তাহার হাতে একটি দুয়ানী ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন সে একজন ধনী মাড়োয়ারীর দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মাড়োয়ারীর দুইটি মস্ত দোকান—একটি কাপড়ের, অপরটি মুদীখানার। কয়দিন দুশ্চিন্তায় রমেশের মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। একবার ভাবিল যে এই দোকানেই চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক! অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে দোকানে প্রবেশ করিয়া ভগ্নস্বরে আপনার প্রার্থনা জানাইল। তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া বোধ হয় মাড়োয়ারীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, কয়দিন সে কাজ শিখিবে, পরে কার্য্যে নিপুণতা দেখিয়া বেতন স্থির হইবে! সে যেন অকূলে কূল পাইল। কাপড়ের দোকানে সে কাজে নিযুক্ত হইয়া গেল।

রমেশ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাজ করিতে লাগিল। সে মনিবকে যথার্থই শ্রদ্ধা করিত। কত বাঙ্গালীর দোকানে সে কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু সেখানে স্থান পায় নাই। শেষে তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বিদেশী মাড়োয়ারী তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। সেইজন্য সে প্রাণপণে মনিবের উপকারের চেষ্টা করিত। নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য ছাড়াও তাঁহার অনেক প্রিয় কার্য্য সে করিত। ইহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। মনিবের সাতবৎসরের পুত্রটিকে সে নিজের ইচ্ছায় পড়াইতে লাগিল—এজন্য কোনও পারিশ্রমিক লইত না। তাহাকে সে বৈকালে পার্কে বেড়াইতে

লইয়া যাইত। মাস খানেক পরে তাহার বেতন খোরাক পোষাক বাদে পনেরো টাকা স্থির হইয়া গেল।

কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্য দিয়া একমাস কাটিয়া গেল। রমেশ পৌষ মাসের শেষে তাহার প্রথম উপার্জ্জনের পনেরোটি টাকা পাইয়া প্রথমেই ডাকঘরে ছুটিল। সেখানে যাইয়া মাতার নামে দশটাকা মণি-অর্ডার করিয়া ফর্ম্মে মাতার নিকট অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের উপার্জ্জনের কথা জানাইয়া দিল।

* * *

ছয়বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমেশ এখন মনিবের অত্যন্ত সুনজরে পড়িয়া গিয়াছে। সে যে কতদূর বিশ্বস্ত তাহার প্রমাণ মনিব অনেকবার পাইয়াছেন। দোকানের সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা তাহাকেই তিনি অধিক বিশ্বাস করেন। ইতিমধ্যে তাহার মাহিনাও পঁচিশ টাকা হইয়াছে এবং অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহার হাতে আসিয়াছে। এই কার্য্য করিতে করিতে সে চক্ষের সম্মুখে কত আই-এ, বি-এ, পাশ করা ভদ্রলোককে দেখিয়াছে কুড়ি টাকা মাহিনার কাজের জন্য এই দোকানে দরখাস্ত করিতে। দোকানের কাজে আই-এ, বি এ, পাশের দরকার নাই বলিয়া সকলকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া সে বুঝিল যে ভগবান তাহার মাতার মুখ চাহিয়াই তাহাকে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়াছেন।

একদিন সহপাঠি ফটিকের সহিত দেখা হইয়াছিল। সে কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়ে। তাহারও অবস্থা সবিশেষ ভাল নহে। কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, এক ভদ্রলোকের বাড়ী থাকিয়া তাহার ছেলের টিউশানী করিয়া যাহা পায় তাহা দিয়াই কোনও রকমে অধ্যয়ন চালাইতেছে। তাহার নিকট একটি খবর শুনিয়া রমেশ সাতিশয় দুঃখিত হইল। সে শুনিল যে কয়েকমাস হইল ফটিকের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। তাহার একটি ভাই আছে, মানুষ করিতে হইবে। তাই সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িতেছে।

রমেশ সেদিন সন্ধ্যা বেলায় ফুটপাতে একটু পায়চারী করিতেছিল। হঠাৎ পশ্চাতে শুনিতে পাইল, "বাবু, পান চাই।" অন্যমনস্ক হইয়া সে বলিল, "না হে পান চাই না।" তথাপি পানওয়ালা বিনীত স্বরে বলিল, "বাবু দয়া করে যদি"—রমেশ একটু উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "কেহে বাপু, বারণ করলে শোননা, বারে বারে জালাতন করছ?"—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইতেই সে অবাক্ হইয়া গেল। ফটিক; এ তাহার কিরূপ চেহারা হইয়া গিয়াছে। চুলগুলো রুক্ষ, পরণের কাপড় জীর্ণ,—পায়ে জুতা নাই! এই কি তাহাদের সেই ফটিক? যাহার সাম্নে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল বলিয়া সকলে অনুমান করিত, তাহার এইরূপ অবস্থা যে কল্পনাও করা যায় না।

ফটিক পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। খানিক্ষণ সে কথাই বলিতে পারিল না, পরে ধীরে ধীরে তাহার কাহিনী বিবৃত করিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সাহায্যকারীরা সাহায্য বন্ধ করায় ও টিউশানীর ছাত্রটির পিতা অন্যত্র বদলী হওয়ায় তাহার এবৎসর বি-এ, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে একটি পনেরো টাকার চাকরীও চেষ্টা করিয়া জুটাইতে পারে নাই। শেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই ব্যবসা ধরিয়াছে। ইহাতে নিজেরই খাওয়া পরা চলে না—আর বাড়ীতে মাকে কি পাঠাইবে? মা তাহার উপর কতই আশা করিয়াছিলেন, সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে মাকে সুখী করিতে পারিল না। আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছে, চাকরী করিয়া কত টাকা আনিবে। ভাইয়ের জন্য কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ কিনিয়া আনিবে। সেই সব কথা মনে পড়িয়া তাহার মনের মধ্যে শুধু নিরাশার হাহাকার জাগিয়া উঠিতেছে।

কথার শেষে সে বলিল, "ভাই, তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলাম পড়তে। আমার কথা শুনলে তোমারও হয়ত এই রকম অবস্থা হত। তা' না শুনে ভালই করেছ।" সমস্ত কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। রমেশ যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিল। এবং বলিল যে তাহার মনিবকে ফটিকের জন্য বলিবে।

রমেশ ধীরে ধীরে ফেরার মুখে চলিল। প্রিয়তম বন্ধুর এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা বারে বারে তাহার মনে আঘাত করিতেছে। পিছনে শব্দ শুনা গেল, 'বাবু, পান চাই।'

ফুল ও মৌমাছি.

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

ফুল থেকে ফল হয়, বীচি হয়। কিন্তু কী ক'রে হয়? এ খবর আমাদের অনেকেরই জানা নেই। একটি ফুল গাছ থেকে তুলে আনলে আমরা তার ভিতর প্রথম দেখতে পাই পাঁপড়ির দল, পাপড়ির দলের ভিতর আছে কেশরের দল, কেশরদলের মাঝখানে আছে বীজাধার বা গর্ভকোষ। এই বীজাধারের ভেতরে থাকে গর্ভদানা, কোন ফুলে থাকে একটি, কোন ফুলে থাকে দুটি, কোন ফুলে থাকে ততোধিক। বীজাধার দেখতে অনেকটা জলের কুজো বা আতরদানের মতো। উপরের দিকটা সরু, তলার দিকটা ফোলা। এই ফোলা অংশের ভিতরেই গর্ভদানা থাকে। ফুলের প্রতি কেশরের মাথায় একটি ক'রে রেণুর থলি। ফুল ফুটলে এই রেণুর থলি ফেটে যায়—ফেটে গিয়ে রেণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রেণুকে বলা হয় ফুলের পিতৃকোষ আর গর্ভদানাকে বলা হয় মাতৃকোষ। ফুলের পিতৃকোষে ও মাতৃকোষে মিলন ঘটলে তবে ফুলে বীচি হয়। ফুলে বীচি হয় আগে। বীচিকে ঘিরে যে শাঁস, যে রস জন্মে তাই ফল। বাইরের শত্রু, বাইরের নানারকমের আঘাত থেকে বীচিকে রক্ষা করবার জন্য ফলের শাঁস, ফলের উপরের খোলসের প্রয়োজন।

বীচি হবার জন্য ফুলের রেণুতে ও গর্ভদানায় মিলন ঘটা প্রয়োজন। কোন কোন ফুলে এ মিলন ঘটে অতি সহজে। কোন কোন ফুলে এই মিলন ঘটবার বাধা অনেক। কোন কোন গাছের একই ফুলে রেণুও থাকে বীজাধারও থাকে, কোন কোন গাছে থাকে পৃথক ফুলে রেণু ও বীজাধার, আবার এমন গাছও আছে যাদের রেণু ও বীজাধার জন্মে পৃথক পৃথক গাছে। পেঁপে, তাল প্রভৃতি সেই জাতিয় গাছ।

রেণু ও গর্ভদানা একই ফুলে থাকুক কিম্বা পৃথক পৃথক গাছের ভিন্ন ভিন্ন ফুলেই থাকুক গাছ চায় এক ফুলের রেণুর সঙ্গে তার সমজাতীয় অন্য ফুলের গর্ভদানার মিলন ঘটিয়ে বীচি জন্মাতে। একই ফুলের রেণু ও গর্ভদানায় মিলে যে বীচি হয় সেবীচি চারা হবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়, সে রকম বীচির চারা হয় দুর্ব্বল, নিস্তেজ, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবার মতো সে চারা শক্তি পায় কম। সেই জন্যই গাছ কেবলি এক ফুলের রেণুর সঙ্গে তারি সমজাতীয় অন্য একটী ফুলের গর্ভদানার মিলন ঘটিয়ে বীচি জন্মাতে চায় কিন্তু একাজ অন্যের সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না, এবিষয়ে সাধরণতঃ তাদের সাহায্যকরে হাওয়া, প্রজাপতি নানা জাতিয় কীট পোকা, বোলতা ভ্রমর। কোন কোন পাখীও এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

ফুল ফুটলে রেণুর থলি ফেটে যায়। তখন হাওয়া সেই রেণু একফুল থেকে অন্য ফুলের গর্ভাধারের মুখে নিয়ে ফেলে। গর্ভাধারের মুখে থাকে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথ দিয়ে রেণুর ভিতরের একটু থলথলে জিনিস সূক্ষ্ম চুলের মতো হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। তলাতে গর্ভাধারের ফোলা অংশে যেখানে গর্ভদানা থাকে সেখানে থলথলে জিনিসের সূক্ষ্ম সুতোটি নেমে গেলেই তা গর্ভদানার সঙ্গে মিশে যায়। দুইয়ে মিশে গেলেই বীচি হ'ল। তারপর সেই বীচি একটু ক'রে বড় হ'তে থাকে। পুষ্ট হ'তে থাকে। পেকে গেলে গাছ থেকে ঝরে পড়ে' আবার নূতন গাছের জন্ম দেয়।

কিন্তু হাওয়া সব ফুলেরই ঘটকের কাজ করতে পারে না। অনেক ফুলের গর্ভাধার বা কেশরের দল থাকে পাঁপড়ির ভিতর মোড়া। সেখানে হাওয়া সহজে ঢুকতে পারে না। সে সব ফুল ঘটকের কাজ করিয়ে নেয়, পাখী, কীট, পোকা, প্রজাপতি, নানাজাতীয় ভ্রমর বিশেষভাবে মৌমাছিদের দিয়ে।

কীট, পোকা, ভ্রমর, প্রজাপতি, মৌমাছিরা সকলেই মধুখোর ও রেণুভক্ত। এদের সকলেরই ফুলের ভিতর থেকে মধু চুষে খাবার জন্য মুখের মধ্যে হুলের মতো একটি

শুঁড় লাগানো থাকে। ফুলের উপর বসে মধুর থলিতে শুঁড় চালিয়ে দেবার সময় কীট পোকা প্রজাপতি প্রভৃতির পায়ে, ডানায়, মাথায়, মুখে সর্ব্বত্র ফুলের রেণু লেগে যায়। সেই রেণু নিয়ে মধু চোষবার সময় যখন অন্য ফুলে বসে তখন তাদের গায়ের রেণু সেই ফুলের গর্ভাধারে দু'চারটি লেগে যায়। আর অমনিই ওরা গর্ভাধারের মুখের ছিদ্রপথ দিয়ে পথ ক'রে চলে ভিতরের গর্ভদানার দিকে। সেখানে গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে রেণুর ভিতরের থলথলে অংশটুকু মিশলেই উভয়ে মিলে বীচিতে পরিণত হয়।

মৌমাছির সমস্ত শরীরটাই যেন ফুলের মধু ও রেণু খাবার জন্য তৈরী হয়েছে। এদের পায়ে আছে কুঁচির মতো লোম লাগানো, তা দেখতে অনেকটা বুরুশের মতো, গায়েও আছে অতি সূক্ষ্ম হালকা লোম। ফুলের উপর বসলেই পায়ের কুঁচিতে ও গায়ের হালকা লোমে রেণু লেগে যায়। এদের পিছনদিকের পায়ে আবার একটী থলের মতো জিনিস আছে—তার দুধার দেয়ালের মতো লোম দিয়ে ঘেরা। মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে চাকে ফিরবার সময় পিছন পায়ের থলি কয়টি ফুলের রেণু দিয়ে বোঝাই ক'রে নিয়ে যায়। মধু জমাবার জন্য তাদের পেটের ভিতরেও থাকে বিশেষ একটী থলি। ফুল থেকে একটু একটু ক'রে মধু চুষে নিয়ে তারা পেটের ভিতরের এই থলিটীতে জমায়। পেটের থলিটী যখন মধুতে ও পায়ের ব্যাগটী রেণুতে ভরে যায় তখন মৌমাছির দল তাদের বোঝা হালকা করবার জন্য চাকে ছুটে আসে। সেখানে মধু ও রেণুর থলি হালকা ক'রে আবার ছুটে যায়, মাঠে, বনে, বাগানে মধু ও রেণু সংগ্রহ করবার জন্য।

কিন্তু মৌমাছি ফুল খুঁজে খুঁজে বের ক'রে কী করে? কোথায় কোন গাছে ফুল ফুটলো, তাতে মধু আছে কি নেই এ খবর ওরা কী ক'রে পায়?

ফুলের রং মৌমাছিদের পথ চিনবার খুব বড় একটী নিশানা। তার প্রমাণ রাত্রিতে যে সব ফুল ফোটে যেমন বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, শিউলি প্রভৃতি ফুলঃ এদের পাপড়িতে রঙের কোন বাহার নেই কিন্তু গন্ধ ছড়ায় এরা বহুদূর অবধি। রাত্রিতে রং চোখে পড়ে না, কিন্তু গন্ধ বহুদূর হতেও নাকে আসে। রাত্রিতে রং চোখে দেখা যায় না ব'লে রাত্রির ফুল অধিকাংশই সাদা।

কিন্তু তা ব'লে এটা মনে করলে ভুল হবে, যে ফুলের রং আমাদের নিকট খুব উজ্জ্বল সে ফুলের রং তাদের নিকটও উজ্জ্বল। আমাদের ইন্দ্রিয় বোধের শক্তি ও ইতর প্রাণীর ইন্দ্রিয় বোধের শক্তি অনেক সময়েই এক রকম নয়। কুকুর একটা উজ্জ্বল চকচকে জিনিস অনেক দূর থেকেও চিনে নিতে পারে কিন্তু রং সম্বন্ধে ওরা দৃষ্টিকানা। মৌমাছিরাও আংশিকভাবে রং কাণা। ওরা হলদে ও নীল রঙের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে কিন্তু লাল রঙ সম্বন্ধে ওদের কোন রকম ধারণা আছে ব'লে মনে হয় না। লাল ও কালো ওদের নিকট একই রং। সেইজন্য নীল ফুলের উপর ওদের বেশী দেখতে পাওয়া যায়, তারপরেই বেশী দেখতে পাওয়া যায় হলদে ফুলের উপর। মৌমাছির ঘ্রাণশক্তি খুব বেশী তীক্ষ্ণ নয়, খুব কাছে থেকে কোন কোন ফুলের গন্ধ ওরা আন্দাজ করে চিনে নিতে পারে। খুব কাছে থেকে ফুলের পাঁপড়ির উপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফোঁটা আঁচড় বা দাগ দেখেও কোন কোন বিশেষ জাতের ফুলকে ওরা চিনে নেয়। কিন্তু-রাত্রি-চরা 'মথ' জাতীয় প্রজাপতি-দের ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। রাত্রিতে ফুলের গন্ধই এদের পথ চিনিয়ে দেয়। তাই রাত্রি বেলায় ফুলের উপর মথ জাতিয় প্রজাপতি বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

যারা চাকের মধ্যে মৌমাছি পোষেন তারা সেই সব মৌমাছিদের একরকম ভাষাও আবিষ্কার করেছেন। মৌমাছির ভাষার সঙ্গে শব্দ অপেক্ষা অঙ্গভঙ্গীর সম্পর্কই বেশী। তাদের ভাষা চাকের উপর একটু নৃত্য, একটুখানি ডানা নাড়া, একটুখানি শরীরের আন্দোলন। মৌমাছি যদি হঠাৎ কোন জায়গায় মধুর সন্ধান পায় তাহ'লে সে চাকে ছুটে গিয়ে রেণু ও মধুর থলি উজাড় করেই চাকের এক জায়গায় নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে ডানা নাড়তে থাকে। অমনি চাকের মজুর শ্রেণীর মৌমাছির দল (মজুর মৌমাছিদের কাজ চাকের জন্য মধু ও রেণু সংগ্রহ করা) ছুটে আসে, তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কাছে গিয়ে তার গা শুঁকতে থাকে। একটু পরেই

সেই মৌমাছিটী নৃত্য শেষ ক'রে আবার ছুটে চলে মধুর খোঁজে।

এই নৃত্য থেকে চাকের মৌমাছির দল বুঝতে পারে কোথাও মধুর বড় একটি ভাণ্ডার আবিষ্কার হয়েছে। নাচের সময় মৌমাছির গা থেকে যে গন্ধ পাওয়া যায় তার থেকে তারা বুঝতে পারে সে কোন ফুল। তখন তারা দলে দলে বের হয় সেই ফুলের খোজে। ফুলের সন্ধান মিললে দু' একটি ফুলের উপরে মৌমাছির গায়ের গন্ধ থেকে তারা বুঝতে পারে এ সেই মধুর ভাণ্ডার।

কিন্তু যেখানে রসদ মধু না হ'য়ে রেণু হয় সেখানে এ খবর দিতে হ'লে তাদের নাচের ভঙ্গিমা যায় বদলে। যদি প্রচুর রেণুর খোঁজ কোথাও পাওয়া যায় তাহ'লে একটি মৌমাছি চাকের উপর এক জায়গায় বসে শরীরটি এদিক্ ওদিকে একটু দুলিয়ে সে খবর চাকে ছড়ায়। তখন চাকের মৌমাছি দলের মধ্যে আবার পড়ে যায় সাড়া। আবার সকলে মিলে তাকে ঘিরে সোৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। গায়ে শুঁড় বুলিয়ে বুলিয়ে গন্ধ নেয়। তারপর আবার ছোটে একটি একটি ক'রে সেই রেণুর সন্ধানে।

নানান রঙের নিশান উড়িয়ে বিচিত্র গন্ধ ছড়িয়ে মধু রেণুর লোভ দেখিয়ে ফুলেরা এই যে মৌমাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গদের তাদের কাছে ডেকে আনে তার কি কোন উদ্দেশ্য নেই? মৌমাছি, প্রজাপতি ভ্রমর প্রভৃতির দল নিমন্ত্রণ পেয়ে তাদের কাছে এসে অবশ্য পেটভরে খুবই মধু ও রেণু খেয়ে নেয় কিন্তু তাতে ফুলের কী লাভ?

ফুল নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনে না। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ফুলের আসল কাজ বীচি জন্মানো। আর সেই বীচির জন্ম হওয়া চাই দুটি সমজাতির ভিন্ন ভিন্ন ফুলের রেণু ও গর্ভদানার মিলন ঘটে'। অন্যের সাহায্য ব্যতীত ফুলে এরূপ মিলন ঘটাতে পারে না। তাই যে সব ফুল হাওয়াকে দিয়ে এ কাজ করাতে পারে না তারা সে কাজ করিয়ে নেয় মৌমাছিকে দিয়ে, প্রজাপতিকে দিয়ে, বোলতা ভ্রমর ও অন্যান্য কীট পতঙ্গকে দিয়ে। কিন্তু তারা ফুলের জন্য এ কাজ করতে যাবে কেন? তাদের এমন কি দায় ঠেকেছে যে এক ফুলের গর্ভদানার সঙ্গে অন্য এক ফুলের রেণু এনে মিলন ঘটাতে হবে? ফুলে যদি মধু না থাকতো, রেণু না থাকতো তাহলে মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি দলের ফুলের দিকে ছুটে আসবার কোন আগ্রহই থাকতো না। তাহলে এক ফুলের গর্ভদানার সঙ্গে অন্যফুলের রেণুর মিলন ঘটাও শক্ত হতো। এ মিলন ঘটার উপরই গাছের বংশ রক্ষা, বংশ বৃদ্ধি নির্ভর করছে। ফুলে বীচি না হতে পারলে অনেক গাছই পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যেতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নিজেদের প্রাণের ধারাকে ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গাছের পক্ষে তাদের ফুলের মধ্যে মধু ও রেণু জন্মানো একান্ত আবশ্যক। ফুলে মধু ও রেণু হয়েছে পরের উপকারের জন্য নয়, গাছেরই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য। ফুল বীচি জন্মাবার জন্য মৌমাছি প্রজাপতি প্রভৃতির দলকে খাটিয়ে নেয়, তারি বকশিস হচ্ছে রেণু ও মধু। এই বকশিসের লোভেই প্রজাপতি মৌমাছির দল সকাল হ'তে না হ'তেই ফুলের দিকে ছুটে আসে।

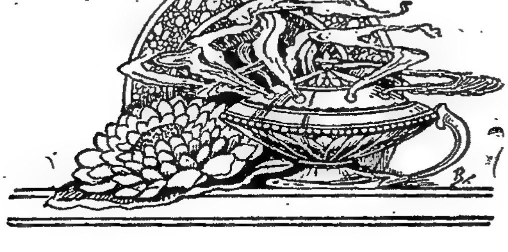

যৌগিক

৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্বানুবৃত্তি

অশেষ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখেছেন, অতসী ধীরস্বরে বল্‌ল, "হাসিটা মেয়েদের পক্ষে অপরাধ বিশেষ।"

অশেষ বিস্মিত হ'য়ে বলেন, "কি রকম! আমি কি সে কথা বলেছি?"

—"তুমি বলনি, কিন্তু এ সত্যি কথা।"

অতলা এরি মধ্যে মনে মনে ভেবে নিয়েছে কি বল্‌বে। বল্‌ল, "জামাইবাবু কিছুই জানেন না! কেন, লক্ষ্মীর ব্রত-কথায় পড়েননি কি?"

অশেষ হাসবার অবকাশ পেলেন না। অতসী নিষেধের ভঙ্গীতে বোনের দিকে তর্জ্জনী তুলে বল্‌ল, "তুই থাম্ অতি।...আমাদের শাস্ত্রেও এর নিষেধের বিধান আছে। এমন কি 'হাস্যমুখী নারী' সম্পর্কে একটা কুৎসিত প্রবচন সেকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সমানে চলে আস্‌ছে।"

'উইমেন্‌স্ মুভমেন্টের' উত্তাপ অতলার কথার ঝাঁঝে ফুটে বেরোয়ঃ "শুধু এদেশ কেন, সে দেশের চার্চ্চের বিধানেও মেয়েদের হাস্‌তে আদৌ উৎসাহ দেওয়া হয়নি। সাপ্রেশান আর কাকে বলে!"

অশেষ বল্‌লেন, "তোমরা ভুল কর্‌ছ। হাসি নারীর একটা শ্রী, একথা সব দেশে সকল কালে স্বীকৃত। কিন্তু হাসির একটা সংক্রামকতা দোষ আছে যা অত্যন্ত হ'য়ে উঠে' অনেক সময় নারীশ্রীকে নষ্ট করে, সেইটে নিবারণ করবার জন্যই ঐসব বিধি-বিধান।"

অতলা বলে, কিন্তু পুরুষদের পক্ষে কি হাসির অত্যান্তিকতা দোষ ঘটে না?"

অশেষ তাঁর কথায় জোর দিয়ে বললে, "নিশ্চয়ই পুরুষদের পক্ষেও। আমাদের দেশে যে উপনয়ন প্রথা আছে—তার অর্থ মানুষকে দ্বিজত্ব দান অর্থাৎ মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে সে দ্বিতীয় জন্ম লাভ কর্‌ল। সেই উপনয়নের মন্ত্রে কি আছে জানো? সে হাসির অত্যান্তিকতাকে প্রশ্রয় দেবে না।"

দেবনাথ এতক্ষণ পরে কথা বলেন, "আসল কথা, দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ হাসিকে ভয় করে।"

বলে অতসীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসেন।

অশেষ বলেন, "এর মধ্যে দুর্ব্বলচিত্ততার কথা আসছে না; হাসি অনেক আনন্দেরও হন্তারক হয়ে বসে। অষ্ট্রেলিয়ায় কাকাবারা নামক এক প্রকার পাখী আছে; তাদের হাসি নাকি এমন সংক্রামক যে যার কাণে এসে সেই হাসি ঢুকবে সেই হাসিতে ফেটে না পড়ে পার্‌বে না। ঐ কাকাবারাকে সেখানকার বড় বড় ক্রিকেটবীররা পর্য্যন্ত ভয় করে চলেন, খেলার মাঠে ভেসে এসে না পড়ে কাকাবারার হাসি।

অতলা বল্‌ল, "সেখানকার মানুষ নিশ্চয় কাকাবারা-কুলকে আইন করে নির্ম্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছে?"

হেঁয়ালি!...অশেষ মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, "না ত; এমন কথা ত আমি শুনিনি!

—"কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি যে, হেসেছি এই অপরাধে আপনি সেই থেকে আমাদের কথার বাণ মেরে মেরে অস্থির করে তুলেছেন!" এক মুহূর্ত্ত থেকে থেকেই অশেষ এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসির সংক্রামকতা ওরা কেউই রোধ করতে পারল না।

অশেষ কলেজে চলে যাবার পরই দেবনাথ তাঁর এ্যাটাচিকেস্ হাতে করে বেরিয়ে এলেন। তিনি যে বিশেষ কোন প্রয়োজনে বেরুচ্ছেন তা তাঁর পোষাক দেখলেই অনুমান করা যায়। একটা পরিষ্কার গাঁচরং

পা-জামার ওপর লম্বা ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবী, মাথায় যে পাতলা চাদর পাগড়ীর মতন করে জড়ানো তার রং গৈরিক। পোষাক এবং গায়ের রং মিলিয়ে একটা বিচিত্র সজীব ত্রিবর্ণ চিত্রের মত তিনি বেয়ে আসছিলেন।

এদিকের বড় ঘরের সামনে এসে তাঁর গতিটা অপেক্ষাকৃত ধীর হয়ে এল। জুতার শব্দ হচ্ছিল কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কারু সাড়া তাঁর কাণের প্রত্যাশা পূর্ণ করল না দেখে তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটো একবার এদিকের খোলা জানলা থেকে ওদিকের দরজা পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তেই ঘুরে এল।

—কে? ওঃ, ওর বোন! অতলার মুখখানা তখনই জানলার ধার থেকে প্রতিমুখ হয়ে যায়।

—"দিদি, তোমার গেষ্ট কোথায় বেরুচ্ছেন সেজেগুজে।"

অতসী মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়, "তা' কি নাচব আমি!"

অতলা দোরগড়ায় এসে চৌকাঠে হাত দিয়ে দাঁড়ায়।

দেবনাথ দোর সামনাসামনি মুখ তুলে চাইলেই অতলা বলে; "আপনি বেরুচ্ছেন বুঝি···এই দুপুর বেলায় রোদ্দ রে!"

দেবনাথ মাথা ঝুকিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ, কাজ আছে একটু থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে, তারপর একবার বেলুড়ের দিকেও যাব হয়ত।"

বলে' একবার হাস্‌বার মত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতসী দেবী কি ইচ্ছে করে'ই সাড়া দিলেন না।

অতলা শেষ সৌজন্য প্রকাশ করে "একটু সকাল সকালই আস্‌বেন ফিরে' বেলাবেলি।"

দেবনাথের দিক থেকে আর কোনও জবাব আসে না। তিনি বেরিয়ে যান।

অতলা ঘুরে দাঁড়াতেই আলনার কোন থেকে অতসী শ্লেষের স্বরে বলে, রংচংয়ে "পোষাক পরে যেন ছেলে-মানুষটি চলেছেন! শেম্।

অতলা বলে, "কেন,—বেশত' ডিসেণ্ট ড্রেস।"

কোথাকার কোন্ অজানা অচেনা লোক, সামান্য পরিচয়ের সূত্রে উপসূত্রের মত এসে পড়েছে তাদের পরিবারের মধ্যে, দুদিনের বেশী নয় যার অবস্থিতির দীর্ঘতা—এরি ভেতর সেই নবাগতের পোষাকের রুচি পরিপাট্য নিয়ে এই যে তারা বিচার আলোচনা কর্‌তে বসেছে অসঙ্কোচে, এ কি শালীনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যাওয়া নয় তাদের মত দুটি মেয়ের পক্ষে?

ড্রেসের ডিসেন্সি।—কি এসে যায় তাতে কার? অতলা যেন অন্যায় করেছে, এমনি ভাবে অতসী তাকে অপ্রিয় দৃষ্টি দিয়ে তিরস্কার কর্‌তে চায়।

—"এত তুই ড্রেস টেষ্ট্ কর্‌তে পারিস্ ত' সাহেব দর্জ্জির দোকানে গিয়ে চাক্‌রি নে।"

দিদির চোখে চোখে চেয়ে অতলা বলে, "তোমার সুপারিশে র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীতেও ঢুক্‌তে পারি হয়ত'।··· কিন্তু তুমিই ত' আগে সামঝদারের মত ছেলেমানুষের পোষাক বলে' মত দিলে দিদি? উনি একজন ছেলে মানুষই বটে!"

"অপরাধটা এসেছে সত্যি ওর নিজের দিক থেকেই আগে।···অন্যায় রাগ দেখিয়ে বলে, "দেখ্ অতি, ফাজলেমি আমি ভালোবাসিনে, জানিস। আমাকে রাগাস্‌নি!"

অতলা জোর করেই হাসে না। আধগুটানো মাদুরটা মেঝেয় পড়ে'ছিল জড় হ'য়ে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঠেলা দিয়ে মাদুরটাকে ছড়িয়ে নিয়ে অতলা শুয়ে পড়্‌ল তার ওপর হাতের ডানাকে বালিস ক'রে।

ওর দোষ কি। ও ত' শুধু তার কথার পিঠে কথা বলেছে। আর অতসীরই বা নিজের কি দোষ? নবাগত এবং স্বল্প পরিচিত বিদেশী মানুষ হ'লেও দেবনাথ ও অন্য মানুষের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যে একটা নতুন সম্পর্কের ভাবী সম্ভাবনা দেবনাথের আগমন ও অবস্থানের ভেতর রয়েছে সেই সম্ভাবনাই তাকে অন্য অপরিচিতের থেকে অপেক্ষাকৃত আত্মীয় পর্য্যায়ে ফেলেছে।—দেবনাথ অবশ্যই তাদের অলোচনার অযোগ্য বিষয় নয়।

বরং এম্‌নিভাবে অতি'র সঙ্গে অনুকুল আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টা অগ্রসর হ'লেই সম্ভাবনাটির সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। অতি'র এখন বয়স হয়েছে, যে ভবিষ্যতের অর্দ্ধেক দায়িত্ব ওর নিজের অংশে এসে

দাঁড়াবে সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওর দায়িত্বের দিক থেকে খোলাখুলি আলোচনা হওয়াই সঙ্গত।

আজ দুদিন গিয়ে তিনের দিনে পড়েছে, এখন পর্য্যন্ত বিষয়টার সামনে অতি'কে এনে মুখোমুখি দাঁড় করানো গেল না প্রত্যক্ষভাবে। পরোক্ষতঃ যে কৌশলের সাহায্যে অতসী ওকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল সে কৌশলের ফাঁদে পা দেবার আগেই দৈব ওকে পিছিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু দেবনাথই কি এগিয়ে এলেন তাই বলে'—?

হাঁ,—দেবনাথ···

অতসীর মুখে যেন আত্মগ্লানির ভাব ফোটে। দেবনাথ এগিয়ে এলেন সত্যি, কিন্তু বোনের পাশ কাটিয়ে একেবারে এসে দাঁড়ালেন দিদির সামনে।...হ্যাঁ তারই সামনে যে তার আর ভুল নেই,—অতসী অস্বীকার করতে পারে না।

অতসী অনুতপ্ত হয়। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণ দেবনাথকে ভুলপথে আকর্ষিত করল তারই দিকে, সত্যিই সে তার কিছু জানেনা। সে যতটুকু উপস্থিত করেছে আপনাকে দেবনাথের উপস্থিতির সামনে, ততটুকু তার সহজ সৌজন্য এবং আতিথেয়তার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই। এবং তারও ভেতরে তলে তলে এই প্রয়াসটাই প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল যে, তিনি যেন তার বোনের কুমারীত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে তাঁর স্বীয় কৌমার্য্যের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখেন মানুষের জীবনের সম্পূর্ণতার দিক থেকে। এইটুকুই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ও এখনও আছে, এবং তা ছাড়া এতটুকু আর কিছু নয়।

আসল কথা, সে একদিক থেকে অতলাকে এবং অন্য দিক থেকে দেবনাথকে ওদেরই পরস্পরের দিকে মনোযোগী হবার সুযোগ দেবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করতে ত্রুটী করেনি, কিন্তু ওদের দুজনেরই মন পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে কিছুতেই দাঁড়াবে না ব'লে যেন পণ করে' বসেছে।

কিন্তু—এখনই অতসী হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। দেখা যাক্ ত'!

অতসী অতলার দিকে মনোযোগী হয়।—ও অমনি ভাবে শুয়েই ঘুমোয় না কি? কি অলস মেয়ে—বালিসটাও টেনে নিতে পারেনি।

উবু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে দরজার কপাট জোড়া ঠেলে দিতে দিতে মুখ ফিরিয়ে ডাকে, "অতি, ঘুমুলি না কি রে?"

অতলা ঘুমোয় নি। এক হাতের ডানার উপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আর হাতের ডানাটী ঘুরিয়ে এনেছে চোখের ওপর দিয়ে আধখানা মুখ ঢেকে মাথার দিকে। ডানার তল দিয়ে লুকিয়ে ও দিদির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর ভাবছে মনে মনে, দেবনাথবাবুর মত অমনি রংচংএ পোষাক আর কেউ পরলে তাকে ছেলেমানুষের মত দেখায় কি না। নীতীশ?—সে ত' ছেলেমানুষই। লক্ষ্মীনাথ?—ছি ছি! পোষাকটারই যেন অপমান করা হয়।······আচ্ছা, আর কেউ—

জামাইবাবু?—সত্যি, জামাইবাবুকে যদি ঐ পোষাকটা নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়—ঐ পাজামা, পাঞ্জাবী আর পাগড়ীটা, আর ঐ পোষাক প'রে যদি তিনি সামনের বারান্দা দিয়ে যান,—কেমন হয় দেখতে? তাঁকে দেখেও কি দিদি বলবে ছেলেমানুষ যাচ্ছে।

তাঁকে দেখে অতলাও গিয়ে দাঁড়াবে দরজার চৌকাট ধ'রে······?

দেবনাথের চেহারার সঙ্গে একেবারেই তফাৎ হ'য়ে যায়! হাত পা, শরীর—সবই আলাদা। পাগড়ীর নীচ ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে না কাঁধ ঢেকে মেয়েমানুষের মত লম্বা চুলের গুছি। মুখখানা একেবারেই নয় অমনি মেয়েলি ঢঙের···তার ওপর অতলা মনে মনে তুলনামূলক সমালোচনায় জামাই বাবুর গোঁফ জোড়াটি এনে বসিয়ে দেয় দেবনাথের কেশচিহ্নহীন ঠোঁটের ওপর।···

কেমন হয় দেখতে?

হঠাৎ এমন হাসি পেয়ে যায় অতলার যে তা' আর বলবার নয়।

এমন সময় অতসী ওকে ডাক দেয়, "অতি' ঘুমোলি না কি রে?"

"না, দিদি" অতলা বলতে চায়, কিন্তু বলবে কি, ও ডানার ওপর মুখ চেপে হাসি চাপতে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, তারই ফলে কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে' উঠতে থাকে।

"অতি'—বলে আরেক বার ডাক দিয়ে, অতসী যেমন নিরুত্তরা অতলার দিকে ভালো করে চায়, অমনি একেবারে

হকচকিয়ে ওঠে। ওকি। অমন করছে ফুলে ফেঁপে কেঁপে কেঁপে উঠছে কেমনতর···কাঁদছে নাকি? কি হয়েছে!

এঃ, একেবারে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান আর কি! কি বলেছে সে, যে তারি জন্যে কাঁদতে হচ্ছে? কান্না নয়, যাকে বলে ফুক্‌রে ফুক্‌রে কাঁদা! আচ্ছা ত মেয়ে···

কিন্তু রাগটা প্রকাশ করে না অতসী—কাঁদছে যে, তাতে ত আর ভুল নেই? এগিয়ে এসে ওর গায়ের ওপর হাত রাখে। "এই অতি, শোন্—মুখ তোল।"

ও মুখ তুলে তার কথা শুনে না।—মুস্কিল—

অতসী এবার জোর করে ওর মাথার ওপর আড়করা হাতখানা সরিয়ে ফেলে ওর মুখখানাকে ঘুরিয়ে এনে ঝুঁকে পড়ে সেই মুখের ওপর। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে সত্যি, কিন্তু—

কাঁদছে কোথা—হাস্‌ছে! চাপা হাসি হাসতে হাসতে ও রকম চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ছে।

অতসী ভঙ্গী ক'রে চেঁচিয়ে বলে, "বাবা রে বাবা, কি মায়াবী মেয়ে! কার সাধ্যি আছে বুঝবে হাসি না কান্না! আমি ভেবে মরি এদিকে······"

অতলা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে বসে। তখনও ওর ঠোঁট পুরে হাসি, যদিও দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে ঠোঁটের পাটি।

"—এমনটী আর দেখিনি······একেবারে দম আটকে মরিস্‌নি যে তাই ভালো!"

হাসিকে থম্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অতলা বলে, "আমার কি দোষ—"

একটু থেমে বলে, "আমার দোষ কি, এমন হাসি পেল তা' আমি জোর করে'ই হাসিনি।"

এমন হাসি পেল হঠাৎ কিসে? অতসীর কৌতূহলের সহিত সন্দেহ এসে মেশে—কিজন্য ও' হাস্‌ল, ওর হাসির উপলক্ষ কি সে-ই? অনুসন্ধানের ভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে, "হাসি যে পেয়েছিল তা বুঝতে পারছিই, কিন্তু অমন হাসি পেল তোর কেন?"

"বল্‌ছি," বলে' অতলা সংক্ষেপে তার হাসির মূল কারণটা বলে "ঐ ছেলেমানুষী পোষাকটা পরলে জামাই বাবুকে ঠিক ছেলেমানুষের মত দেখায় কি না, মনে মনে স্কেচ্ করে' দেখছিলুম আর—"

অতসীও মনে মনে স্কেচ্ কর্‌তে কর্‌তে বলে, "আর অম্‌নি হাসি পেল যে, দম আট্‌কে মরিস্!"

অতলা হাত তুলে' বলে, "আঃ আগে শোনই না। জামাই বাবুকে আর দেবনাথ বাবুকে ঐ ছেলেমানুষি পোষাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখি; তারপর আবার করি স্কেচ্:"

অতলা মুখখানাকে যথাসাধ্য চেষ্টায় গম্ভীর কর্‌তে করতে বলে, "মনে মনে জামাই বাবুর গোঁফজোড়া এনে বসিয়ে দেবনাথ বাবুর নাকের ডগায়, অম্‌নি—"

অতলার ঠুন্‌কো গাম্ভীর্য্যকে কে যেন টোকা মেরে ভেঙে ফেল্‌ল হঠাৎ। এবং, এবার আর কথায় নয়, সশব্দে—হি-হি-হি-হি-হি—হুঃ হুঃ!"

অতসী ওর হাসিতে বাধা দেয় না, কিন্তু নিজেও এতটুকু হাসে না। একদিকে মুখ তার গম্ভীর হ'য়ে আসে, অন্যদিকে মন তার নেমে যায় মনের ভেতর।

কোথায় তার মগ্ন মন—? তারই সঙ্কেত জান্‌তে অতসী ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।···

আশ্চর্য্য এই রূপবদ্‌লি! দেবনাথ গিয়ে দাঁড়ান অশেষের রূপে, অশেষ এসে পড়ে বর্ত্তান দেবনাথের রূপে।···

এখন বাকী থাকে শুধু অতসী ও অতলা। অতলার কামনা এবং অতসীর চিন্তার মধ্যে বসে যেন একটা দুর্জ্জেয় ভবিষ্যত স্কেচ করে চলেছে···তারাও যেন বদ্‌লে যেতে পারে।···

অতলার দিকে মুখ তুলে চাইতে অতসীর ভয় করে।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলেই অতসী বলে "দেখ অতি একটা কথা বল্‌ব তোকে কিন্তু—"

দিদির কথা বলবার আকস্মিকতা ও তার গম্ভীর ধরন দেখে অতলা একটু থতমত খেয়ে যায়।—"কি কথা—?"

অতসী বলে, "কিন্তু তোকে কোন কথা বল্‌লেই কথার আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাস তুই।"

কথাটা কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ কর্‌বে ভাবতে ভাবতে বলে, "তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক কথাই তোকে বলা হয় না।"

অতলা আস্বাচ্ছন্দ্যের স্বরে বলে, "বুঝতে পারছিনে দিদি, কোন কথায় কেমন করে পাশ কাটিয়ে যাই, খুলে বল।"

"এদিকে সরে আয় না আরেকটু ওঃ, তোর কষ্ট হ'চ্ছে?" বলে' অতসী উঠে দাঁড়ায়। খাটের বিছানা থেকে সামনের বালিশটা উঠিয়ে নিয়ে মাদুরের ওপর ধপ্ করে ফেলে এসে হাঁটু মুড়ে বস্‌তে বস্‌তে বলে "বালিস মাথায় দিয়ে ভালো করে শো।"

অতলার অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেছে। বালিসের একাংশে মাথা দিয়ে শুয়ে অনুরোধের স্বরে বলে, "তুমি শোও না দিদি এখানটায়।"

অতসী বালিশের অপরাংশে মাথা দিয়ে শুয়ে ওর বুকের ওপর হাত রেখে বলে, "বল্‌ছি, শোন্—"দেবনাথ বাবুর কথা বলছি; বুঝলি?"

—"কি?" তখনও যে একটা ভেতরে ভেতরে সংশয়ের অশান্তি অতলার মনে আণবিক আকারে ছিল সেটিও আর রইল না প্রসঙ্গের গোড়ায় দেবনাথের নাম শুনে'। ও নিশ্চিন্ত কৌতূহলে চোখ দুটি বড় করে' দিদির দিকে চায়।

অতসী ওর বুকের উপর রাখা হাতের আঙুল দিয়ে ওর বুকে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলে "হ্যাঁ দেবনাথ বাবুর কথা।...অতি বল্ ত' ক'দিন আমাদের বাড়ীতে এসে আছেন?"

অতলা সকৌতুকে আঙুল গুনে বলে, "এক, দুই, তিন—আজ দিয়ে তিন দিনে পড়েছে। কিন্তু দিন কম করাচ্ছ কেন দিদি আমাকে দিয়ে?"

অতসী হেসে বলে, "মাত্তর তি-ন দিন! কিন্তু মনে হচ্ছে নাকি কদ্দিন থেকে যেন উনি এসে এখানে আছেন... যেন এখানেই থাকেন উনি বরাবর?"

অতলা একটু ভেবে বলে, "তা একেবারে ফ্যামিলিয়ার ভাবে আছেন কিনা এসে ফ্যামিলির ভেতর সেই জন্যই এমনি মনে হয়। উনি কেন আর কেউ এসে থাক্‌লেও এম্‌নি মনে হত।"

"উঁহু তাই কি?" অতসী মাথা নেড়ে বলে, যে-কেউ এসে থাক্‌লেই কি তার পোষাকের ডিসেন্সি অডিসেন্সি নিয়ে আলোচনা করতে পারতিস?"

অতলা একেবারেই ধরতে পারে না দিদির কথার ধারা; নির্ব্বুদ্ধিতার ভাবে বলে, "কেন, তুমিও ত' তাঁর ড্রেস নিয়ে ডিস্কাস করলে।"

—"হ্যাঁ করেছিই ত' কিন্তু দেবনাথ বাবু বলে'ই করেছি অন্য যে-কেউ হলে করতুম না। কারণ ঐ যে বল্‌লি ফ্যামিলিয়ার ভাব—তা শুধু আমাদের ফ্যামিলিতে এসে থাকবার জন্যে নয়, এখানে আস্‌বার আগেই যে ফ্যামিলিয়ারটি আমরা তাঁর সম্বন্ধে পোষণ করতুম তারি জন্যে।"

অতলা যেন বিরক্ত হ'য়েই বলে "আমি কারু সম্বন্ধে কোন ফ্যামিলিয়ার বোধই করতে যাই নি কোন দিন, আমি কি কারুকে চিনতুম জানতুম!"

অতসী বিরক্তিকে গ্রাহ্য না করেই বলে "চিনতিস না সত্যি কিন্তু জানতিস এক আধটুকু বইকি। আমাদের নীলির দেওর খুব লার্নেড আমেরিকার মত জায়গায় ছিলেন কত দিন কোন্ মিশনে, ব্যাচিলার, যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে, এখন এদেশেই বসবাস করবার ইচ্ছা করেছেন, সম্প্রতি কল্‌কাতায় এসেছেন কিজন্যে—এ সব কিছুই জানিস্‌নে না কি?—ন্যাকা!"

অতলার মনের স্বচ্ছন্দতা আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেবনাথ বাবুকে যেন ওর মনের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে দিদি···কি তার উদ্দেশ্য!...অতলার মনে একটা সন্দেহ হয়।

ও গম্ভীর ভাবে বলে "দেবনাথ বাবু এখানে কি জন্যে এসেছেন দিদি?"

বোনের ভাবান্তর দিদিকে সাবধানী করে। একটু ভেবে বলে, "কি জানি! সোসাইটিতে কিসের নাকি দরকার আছে, শুনেছি।"

এখনই ত বলে গেলেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি যাচ্ছেন। অতলা চুপ করে ভাবে থিয়োসফিই? হতে পারে।

কিন্তু এই থিয়োসফির কথা শুনাবার জন্যই কি দিদি এত আগড়ুম বাগড়ুম ভূমিকা করছিল। দেবনাথ বাবু থিয়ো-

সফিষ্ট ত ওর কি ! নিশ্চই ভাবে বলে অতলা পাশ ফিরে শোয় "শুন্‌লুম তোমার কথা। এখন একটু ঘুমুই দিদি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"আমারও কি পাচ্ছে না!" হাই তুলতে তুলতে অতসী বলে "আমিও ঘুমুব। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা শেষ করে নি। ফিরে শো।"—চেষ্টা করে আবার এদিকে ফিরিয়ে শোওয়ার।

অতসী ওর বেজা চোখের পাতার ওপর আল্‌গা আঙ্গুল বুলিয়ে বলে তাকিয়ে শোন—দেবনাথ জানেন না কিন্তু আমি আর নীলি তাঁর কল্‌কাতা আসা ব্যাপারে আর একটা জিনিষ জানি।"

অতলার নিস্পৃহতা কেটে না গিয়ে পারে না; আশ্চর্য্য ত! যাঁর বিষয় তিনি জানেন না, অপরে জানে এও কি একটা কথা! এমন কি বিষয় হতে পারে? ও চোখ মেলে চায় এবং দিনের দিকে একটু সন্দেহাতুর দৃষ্টিতেই চায়।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ

(২)

মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

আমরা ইতি পূর্ব্বে মহাভারত হইতে কৃষির্ভূবাচকো শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচক ইত্যাদি বাক্য হইতে কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণ কেশজাত জন্য কৃষ্ণ বর্ণ কল্পিত মাত্র তাহা পাইয়াছি। তাঁহার বর্ণ শুভ্র তাহা ভাগবতের ১০।৮।১৩ শ্লোকে "শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" বাক্যে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে; ইহাই শ্রুতি-সম্মত—"অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"। মুণ্ডক! যিনি পুরাণে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারী সুদর্শন যাঁর প্রকৃষ্ট অলঙ্কার যিনি কৌস্তুভ ও শ্রীবৎস-লাঞ্ছন কনক কুণ্ডল শোভিত কর্ণ, যাঁহার বিশেষ নিদর্শন পীতবাস, শিখি-পুচ্ছ-মৌলি ও অনন্ত শয্যা সেই যে কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যে বিরাট রূপ তাহাও ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতে পাইয়াছি। ঐ সকল বসন ভূষণের প্রকৃত তত্ত্ব যে কি তাহাও ভাগবত পুরাণ সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহাতে বনমালা ত্রিগুণময়ী মায়া; অনন্ত সর্প অধিষ্ঠান নহে অব্যাকৃতই অনন্তাখ্য যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া তিনি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করেন। বেদ তাঁর পীত বসন; সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রদ্বয় কনক কুণ্ডল স্থানীয় কৌস্তুভ তাঁর স্বাত্মজ্যোতিঃ, উহার প্রভা শ্রীবৎস লাঞ্ছন; মৌলি সর্ব্বজন অভয়প্রদ পারমেষ্ঠি পদ। সত্ত্ব পদ্ম, ওজঃ বলমহত্ত্ব গদা; শঙ্খ রস; তেজ তত্ত্ব সুদর্শন। ইহারই প্রতিচ্ছবি আমরা গীতাতে একাদশে দেখিতে পাই যেখানে বিরাটের রূপ বর্ণিত। তথায় "পশ্যামি দেবাং তব দেবদেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূতা-বিশেষ সঙ্ঘান্ ব্রহ্মানমীশং কমলা সনস্থম্ ঋষিং শ্চ সর্ব্বাণুরাগং শ্চ দিব্যান্॥"

ইত্যাদি শ্লোকে সেই বিরাট দেহে দ্যৌৎ লোকবাসী ব্রহ্মাদি দেবগণ অন্তরিক্ষচারী ঋষি কিন্নরাদি পাতালবাসী নাগগণ এবং এই ভূলোকবাসী ভূতগণ সব বাস করে। সে জন্য তাঁহাকে বাসুদেব বলা যায় "বাসুদেব সর্ব্বমিতি"। বসতি ইতি বাসু বা বাসয়তি ইতি বাসু। যিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন অথবা সর্ব্বভূত যাতে বাস করে। অর্জ্জুন মহাবীর হইলেও গ্রসিষ্ণু সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হওতঃ আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তখন ভগবান স্বীয় বিরাট মূর্ত্তি সংহৃত করিয়া মায়িক চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে হ্রস্ব অবয়বাদি যুক্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন এবং পুনরায় সৌম্য বপু হইয়া মনুষ্যরূপে দেখা দেন। এই যে তাঁর বিরাট দিব্য দেহ তাহাকেই ব্যক্ত ভাব বলা হয়। ইঁহারই দিবায় সৃষ্টি রাত্রিতে প্রলয় ঘটিয়া থাকে। যাহা গীতায় অষ্টম অধ্যায় বর্ণিত আছে, এবং ইহা অপেক্ষাও এক অব্যক্ত অক্ষর ভাব তাঁহার আছে যাহা গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত "পরস্তস্মাত্ত

ভাবোহন্যোহ ব্যক্ত ব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্ব্বেষু-ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" ॥ ২০।

অব্যক্তোহ ক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তেতদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া। এই যে পুরুষ ইহার অর্থ পূর্ণং অনেন সর্ব্বম্ ইতি পুরুষঃ যাঁহার দ্বারা সব পূর্ণ। যে বিরাট দেহে ত্রিভুবন বা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত তাহাও সর্ব্ব-ব্যাপি।—ইহা হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ নিরয়ব—যিনি "নিত্য সর্ব্ব গতঃ স্থানুর চলোহয়ং সনাতনঃ। অব্যক্তো-হয়ম চিন্তো-হয়ম বিকার্য্যো-হয় মুচ্যতে" (॥২।২৪ গীতা) বাক্য দ্বারা প্রকাশিত। ইহা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। এই অবিকারী নিত্য সনাতন যে পুরুষ, তিনিই বিরাট পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ জন্য পুরুষোত্তম বলিয়া অভিহিত হন। ইহা আমরা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক হইতে জানিতে পারি। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তির জ্যোতিঃই ব্রহ্ম বলিতে চাহেন, তাঁহাদের উক্ত ভাগবৎ পুরাণোক্ত বিরাটই যে চতুর্ভুজের তাৎপর্য্য—উহা যে প্রতীক মাত্র—তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁর বিরাট রূপ সমষ্টি ব্যক্ত রূপ ও এক এক দেহ তাঁর ব্যষ্টি ব্যক্ত রূপ। তাহা পূর্ব্ব উদ্ধৃত গীতা বাক্য হইতে সুপ্রকাশ। গীতায় যে তিনি বিরাট হইতে ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ দেহ অবলম্বন করেন তাহা যে মায়িক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তদ্ভাব লক্ষ্য করিয়াই ঋক বেদে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপং ঈয়তে। রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব" ইত্যাদি বাকেনিরবয়বের মায়িক অবয়ব ধারণ বলা হইয়াছে। শঙ্খ চক্রাদি ধারণকারী বনমালাধারী মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইলেও তাহা গীতার "ব্যক্ত মধ্যানি" ভাব। অগ্রে ও পশ্চাতে—তাঁর রূপ অব্যক্ত। শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেহপি তত্তথা। কাল রূপী কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে প্রসিন্ধু হইয়া যে ধ্বংস লীলা করেন তাঁহার ফলে সনাতন ধর্ম্ম চিরতরে বিনষ্ট না হয় তদবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া—অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করতঃ গীতা বলিয়াছেন ও তাহা ভগবান বাদরায়ণ দ্বারা সপ্ত শত শ্লোকে নিবদ্ধ করাইয়া—বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এবং উদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া পুনঃ ভাগবতের একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণিত ভাগবৎ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। উক্ত একাদশ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায় কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ॥ বাক্যে স্পষ্ট অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামী মতে এই দ্বৈতাসত্যতয়া স্তুতি নিন্দয়ো নির্বিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি কিং ভদ্রমিতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ। অবস্তুনো দ্বৈতস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবাঅভদ্রং কিয়দ ভদ্রং কিংবা বা অভদ্রং ইত্যর্থঃ অবস্তু তমেবাহবাচেতি। বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণম বাচা উদিতং উক্তং চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্‌ দৃশ্যম্ মনসা চিন্তিত তদনৃত মিতি॥ ইহার অর্থ দ্বৈত অসত্য তজ্জন্য তাহা ভদ্র বলিয়া স্তুত বা অভদ্র বলিয়া নিন্দনীয় সম্ভবে না। যাহা বাক্য দ্বারা কথিত হয় যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয় মন দ্বারা কল্পিত হয় তাহা অনৃত অর্থাৎ জীব কল্পিত নাম রূপাত্মক সংসার বলিয়া যাহা অভিহিত তাহা অনৃত অনুধ্যানের অযোগ্য। তাই গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন:—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য। যোগ মায়া সমাবৃতঃ। মূঢোহয়ং নাভি জানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্ ॥ ৭।২৫

অর্থ, মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যে অব্যয় অনুত্তম ও অব্যক্ত, তাহা না জানিয়া অজ্ঞান বশে আমাকে ব্যক্ত দেহধারী বলিয়া মনে করে। যোগমায়া সমাবৃত জন্য আমি সকলের নিকট প্রতিভাত হই না। তাই অজ্ঞান মনুষ্যগণ অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না অজ্ঞান বশে জন্ম রহিতের ও কল্পনা করিয়া থাকে। যাহাদের এই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন হয় তাঁহারাই তাঁর সেই অব্যক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা ব্রহ্মের দেহ কল্পনা করেন তাঁহারা স্পষ্ট শ্রুতি বিরোধি বাক্য বলেন তাঁহাদের যুক্তিবাদ গ্রহণ যোগ্য নহে। ঈশাউপনিষদে—সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রনমস্নাবিরংশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" কঠোপনিষদে ১।২।২১ মন্ত্রে অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ বস্থিতম্" তথা মুণ্ডকে "অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রোহ্যক্ষরাৎপরতঃ পরঃ। ঋক্‌বেদে প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তের ৪র্থ মন্ত্রে—

"কো দদর্শ প্রথমং জায়মান মাহস্বন্তং যদ নাহা বিভর্ত্তি॥ ঐ ৬ মন্ত্রে বিয়স্তম্ভন্ত যড়িমা রজাংস্য জস্য কিমপিস্বিদেকং।" অর্থ তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপী শুক্র দীপ্তিমান সুতরাং তমঃ রহিত। অকায় অভন আস্নু (অর্থাৎ স্থূল সুক্ষ্ম শরীর রহিত শুদ্ধ (মল মায়া রহিত) অপাপবিদ্ধ পাপ মোহ দ্বারা অবিদ্ধ

অন বস্থ শরীরে অশরীর (অজ আত্মা) অবস্থিত ॥ অমনা অপ্রাণণ (ইন্দ্রিয়াদি বহিস্করণ মনাদি অন্তকরণ রহিত অর্থাৎ (সুক্ষ্ম শরীর হীন) শুভ্র অর্থাৎ (জ্যোতির্ম্ময়) অক্ষরের ওপরে অবস্থিত। প্রথম উৎপন্ন কে কে দেখিয়াছে, অনস্থ (অর্থাৎ অস্থিহীন) অর্থাৎ অশরীর অস্থি যুক্ত দেহে অবস্থিত।

লোক সত্য ব্রহ্মলোক ত্যাগে। স্তম্ভণ কারী সেই অজ (জন্ম রহিত) তিনি অদ্বিতীয়। যাঁহারা শ্রুতি সম্মত পথেই চলিয়া থাকেন এ মত অভিমানী তাঁহারা শ্রুতি বিরোধী কথায় তর্ক পথ অনুসরণ করিলে তাঁহারা জনগণকেও আপনাকে বঞ্চনা করিতেছেন বলা অসমীচিন হইবে না। যদি সনাতন বৈদিক মত ত্যাগে কেহ অর্ব্বাচিন পৌরাণিক বাক্যে আস্থা স্থাপন করেন সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জানা উচিৎ যে যাহা অতি বিরোধী তাহা অনার্য্যভাবাপন্ন। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরের গরিয়সী"। চার্ব্বাক বুদ্ধ জৈনাদি মত শ্রুতি বিরোধি জন্য নিন্দিত এবং সাংখ্য ন্যায়মত বাদীগণ তর্ক প্রমাণ জন্য গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতি এক মাত্র প্রমাণ একারণ শ্রুতি ব্রহ্ম বিষয়ে সব লক্ষণাত্মক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার একটিও ত্যাগ করা চলেনা। শ্রুতিবাক্য মধ্যে বিরোধ নাই। যদি আপাততঃ কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহার সামঞ্জস্য ষড় শ্রুতি লিঙ্গানুসারে বিচার করিলে আর তাহাতে বিরুদ্ধভাব থাকে না। এইরূপে কৃষ্ণ সর্ব্বগত নিত্য সর্ব্বাত্মা অহমাস্পদ হওয়ায় তিনি প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহ ন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ") (বৃথা ১।৪।৮)। ইহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। যদি কাহারও রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয় এবং গৃহদাহ জনিত তাপে নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন অগ্নি ইহাতে আপনাকে রক্ষা করিবার সময় অতীব সঙ্কীর্ণ। সে পুত্র দারাদিকে অহ্বান পূর্ব্বক আসন্ন বিপদ হইতে প্রাণ বাচাইবার জন্য উহাদের অপেক্ষা না করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় যদি কেহ বলে যে একা কি করিয়া বাহির হইয়া আসিলে সে তাহার উত্তরে বলে ভাই বাচিলে দ্বিতীয়বার দূরে পরিগ্রহ করিয়া পুত্রাদি সম্পদ লাভ হইতে পারে। এই জন্য স্বীয় প্রিয় প্রাণ বাচাইয়া বাহিরে আসিয়াছি। কিছুদিন গতে তাহার শরীর কোন দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্থ হইল। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া দুর্ভোগ ভোগ করিয়া সে অস্থির চিত্ত হইয়া বলে এখন প্রাণ গেলে বাচি"। এই প্রাণ গেলে সেই বস্তু নিশ্চয়ই প্রাণ হইতেও প্রিয় সন্দেহ নাই। ইনিই অহম্পদ বস্তু। ইহাই সব চেয়ে প্রিয় অর্থাৎ প্রিয়তম তাই সদা সেই প্রিয়তমকে কৃষ্ণকে বা আত্মাকে ধ্যান করত জীবন সফল করা সকলেই কর্ত্তব্য।

গান

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

রাখাল তোমার বাঁশীটি বাজাও—
ভ'রে তোল মধু-যামিনী!
রাধিকার নতি—মিনতি জানাও,
জাগাও গোপিনী ভামিনী
কাননে কাননে ফোটে যত ফুল—
ঠোঁটে ঠোঁটে তা'র ফুটে থাক হুল,
ভ্রমর-হিয়ার পাথার-পীরিতে
ডুবে যাক ফুল-কামিনী!

নূপুরের রঙে রাঙা হোক মন—
পথে পথে থাক ঢালা,
বালিকার মত কিশোরী স্বপন—
কুড়ায়ে যে গাঁথি মালা;
হিয়া তা'র ফাঁদে স্বরলি বাঁধন—
ডাক শুনে তুই কুড়ালি কঁদন,
আজ কবি তোর কবিতা-কপোতী
হবে কি রে অনুগামিনী?

আনন্দাশ্রম

(২)

শ্রীপ্রেমা দেবী

'যাঁহা হ'তে হইয়ে পৃথক্ পশেছি এ দেহকারাগারে।
হ'লে পুনঃ আগত সময় আলিঙ্গিব হরষে তাঁহারে॥

—আর জানত আমাদের প্রধানতম গুরু ভাই স্বামী অচ্যুতানন্দজী। শ্রীশ্রীগুরু দেবের আদেশ মণ্ডলীর যে অনুশাসন রচনা করে রেখে গেছেন, তার গোড়াতেই তিনি উল্লেখ করেছেন—'অমাদের অর্থ্যাৎ মণ্ডলীস্থ সেবকদের স্বতন্ত্র কোন সত্বা নাই। শ্রীগুরু দেবের মহান্ সত্বা স্বরূপ এই বিরাট মণ্ডলীদেহের আমরা কেহ হস্ত, কেহ পদ মাত্র। আমাদের নিজেদের রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নাই, সে ভার মণ্ডলীর। মণ্ডলীর নির্দ্দেশে জনহিতকর কার্য্য এবং তপস্যা ছাড়া আমাদের কর্‌বার কিছু নাই। যেখানে যাকিছু যে গ্রহন কর্‌ব সে মণ্ডলীর জন্য, নিজের জন্য ধূলি মুষ্টি ও পরিত্যজ্য;' আর ভাই! সম্মুখে একটা বিরাট কর্ত্তব্য ও উপস্থিত। হরিদ্বার হৃষীকেশ অঞ্চলের কুম্ভমেলা ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারীদের ভিড় লেগেই আছে। এজন্য রোগের প্রাদুর্ভাবও ভীষন ; ঔষধ, পথ্য এবং যত্নের অভাবে কত লোক যে মারা পড়ে তার অন্ত নাই। এইসব প্রত্যক্ষ করে গুরুদেব একদা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—হরিদ্বারে একটি স্থায়ী চিকিৎসা ও শুশ্রূষা নিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্য! তাঁহার প্রকট অবস্থায় ত হয় নাই, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দজী ও দেহ রক্ষার পূর্ব্বে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং আমরা যাতে গুরু বাক্য কার্যে পরিনত কর্‌তে পারি সেজন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি এবং আর সবাই গুরুদেবের পাদমূলে চলে গেছেন, এখন এ অধমের দ্বারা কি হবে না হবে তা গুরুদেবই জানেন। তবে একটা আশা হয়েছে গুজরাটের বিখ্যাত ধনী সুতার ব্যবসায়ী লছমন দাস বাগুরিয়া বিগত কুম্ভ মেলায় হরিদ্বারে এসেছিলেন এবং আমাদের মণ্ডলীর ছাউনিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসে ঐ বিষয়টি জেনে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি চিঠি লিখেছেন যে, ঐ কার্য্যের জন্য তিনি এককালীন দু'লাখ টাকা দিবেন এবং আবশ্যকীয় চল্‌তি খরচার জন্য অন্যূন দেড়লাখ টাকা বার্ষিক আয়ের জমীদারি ষ্টেট্ মণ্ডলীর হাতে লেখাপড়া করে দিবেন! এই দেখ তাঁর চিঠি! সৌবর্ণানন্দজী মণ্ডলাধীশের হাত থেকে চিঠি খানা নিয়ে সব পড়ে দেখলেন এবং চিন্তাকুল হৃদয়ে মুক্তানন্দজী আর কি বলেন শুন্‌বার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। মণ্ডলাধীশ গম্ভীর ভাবে অকপট সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করে বল্‌তে লাগলেন ভাই এ কাযে হাত দিতেই পাঁচ লাখ টাকা চাই, শেষ হ'তে অন্ততঃ দশ বার লাখের দরকার। এজন্য মণ্ডলীর ভাণ্ডারে আজতক্ লাখ খানেক টাকা জমেছে মাত্র। সত্বর কার্য্যারম্ভের জন্য আর ও লাখ দুই টাকা এক্ষুনই দরকার। গতবৎসর অজন্মার জন্য দেশের সর্ব্বত্র যে রূপ অন্নকষ্ট তাহাতে এখন দেশের লোকের কাছে আর টাকা পাবার কোনই আশা নেই অথচ জন মজুর খুবই সস্তা বলে কার্য্যারম্ভের এই মস্ত সুযোগ। "চিকিৎসা ও শুশ্রূষা নিকেতন" নির্ম্মানের আনুমানিক হিসাবে এবং মণ্ডলীর ভাণ্ডারের হিসাব পত্র দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মহাউৎসাহে ভরে বলে উঠ্‌লেন তোমার ত ভাই, লাখ চার-পাঁচ টাকা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত আছে, সে সব মণ্ডলীর ভাণ্ডারে ঢেলে দিয়ে গুরুদেবের অভীপ্সিত মহৎ কার্য্য সম্পাদনে দক্ষতার সহিত অগৌনে লেগে যাও, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

সৌবর্ণানন্দজী সুরু থেকেই যে আশঙ্কা কর্‌ছিলেন তাই সত্যে পরিনত হতে দেখে একটু আধটু নয়, খুব বেশী রকম বিচলিত হ'লেন, এমন কি জীবন ভরা যত্নে সংগৃহীত অর্থে স্বতন্ত্র অমরাবতী রচনার সুখ স্বপ্ন ভাঙবার ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে পড়্‌লেন। কয়েক মিনিট কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না। পরে নিজেকে একটু সাম্‌লিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—সব ত শুন্‌লাম, এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কিছু ভাবি নাই। আমি ভেবে চিন্তে আপ্‌নাকে বল্‌ব'খন।

এই উত্তরে মণ্ডলাধীশ মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তাঁর শান্ত মুখমণ্ডলে সরল উল্লাসের বদলে কুটিল বিষাদের ছায়া লক্ষিত হ'তে দেখে করুনার্দ্র ভাবে তিনি আবার বলতে লাগলেন, আমাদেরই গুরুদেবের সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধনায় ভোগী গৃহীরা এত দিতে পারছে আর ত্যাগী সন্নাসী হয়ে সেজন্য কিছু গুরুদেবেরই অশেষ দয়ালব্ধ দান, দিতে কুণ্ঠাবোধ, ভাবনা চিন্তা! ভাবনা চিন্তা ত পুটুলীর জন্য, তা ঝেড়ে ফেল্লেই সব চুকে গেল। সৌবর্ণানন্দ মাথায় বাবড়ি চুল তখনও মস্তক মণ্ডিত হয় নাই, আলোড়ন করতে করতে বললেন,—আচ্ছা এ বিষয়ে সত্বরই একটা সিদ্ধান্ত করে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি জানেন হয়ত আমার আনন্দাশ্রমের ও ট্রাষ্টি রয়েছে; তাঁদের সঙ্গে একবার বুঝাপড়া করা দরকার। এই কথা কয়টি বলে মুক্তানন্দজীর কক্ষ থেকে বিদায় নিয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস গ্রহন করলেন। দিন দুই তিন চিন্তাকুল ভাবে কাটতে না কাটতেই সৌবর্ণানন্দের অনুরক্ত বিকানিকের মহারাজা তাঁহার আলমোড়াস্থ রাজ প্রাসাদ থেকে আহ্বান করে তার পাঠালেন। স্বামিজী তার পাবার পর কাল বিলম্ব না করে মণ্ডলাধীশের নিকট দিন কয়েকের জন্য বিদায় গ্রহণ করলেন এবং শিষ্যাগণসহ আলমোড়ায় যাত্রা করলেন। মণ্ডলাধীশ এবং অন্য অনেকে স্পষ্ট বুঝলেন যে পুনরাগমনের আশা বাদ দিয়েই যাত্রা হচ্ছে। রাজঅতিথিরূপে অলমোড়া থাকা কালে সে স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং জলবায়ুর অবস্থা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তথায়ই আনন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা স্থির করলেন। গুরুদেব প্রতিশ্রুত মণ্ডলাধীশের উপদেশ অনুরোধ কোথায় যে গেল তার কোন সন্ধানই মিলল না। তিনি বিদেশে থাকা কালে আমাদের দেশীয় অনেক রাজা মহারাজা যাঁরা দরিদ্র প্রজার রক্ত-রঞ্জিত অর্থ অপব্যয় করে পাশ্চাতের বিলাস ভ্রমণে জীব নধন্য করে তাঁদের সৌহার্দ লাভ করিয়াছিলেন তাই দেশে এসেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা রীতিমত পাওয়া গেল; তা ছাড়া গরীবের দেশ হ'লেও সাধু সন্ন্যাসীকে দান করে পুণ্য সঞ্চয়েচ্ছু ধনবানদের সংখ্যা যথেষ্ট থাকায় তাঁহাদের সাহায্য পাবার জন্য ও চেষ্টা হ'তে লাগল।

ক্রমে তিনি পাশ্চাত্যের বিলাস ভূষা কমিয়ে পূর্ব্বের ন্যায় দেশীয় মুণ্ডি সন্ন্যাসী হলেন এবং কাল, বাদামী ও লাল রঙের পোষাকের বদলে গেরুয়া পোষাকই বেশীর ভাগ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারা নাথ ভট্টশালী নামে একজন শিক্ষিত ও তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বিশেষ অনুরক্ত ভক্তরূপে লাভ করেন। এই কৌশলপূর্ণ চেষ্টায় অল্পদিনের ভিতরই আশ্রমের জন্য একটি মনোমত জমী ক্রীত হ'ল এবং দেখতে দেখতে প্রাসাদোপম হর্ম্ম্য নিকেতন গগন চুম্বন করে উত্থিত হ'ল। ভট্টশালীর প্রবল আগ্রহে গৃহপ্রতিষ্ঠাকালে প্রধান ঋত্বিকের কায করবার জন্য হৃষীকেশস্থ মহামণ্ডলীর অধ্যক্ষ আমন্ত্রিত হলেন। উদার মহাপুরু স্বামী মুক্তানন্দজী নির্ব্বিকার চিত্তে উপস্থিত হয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদিত এবং সকলের মঙ্গলার্থে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে যাবার পর স্বামী সৌবর্ণানন্দের তত আগ্রহ না থাকলেও ভট্টশালী মহাশয় আনন্দাশ্রমকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

পুরুষদের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বেদবিদ্যালয় এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীতে শ্রমজ কুটীর শিল্প শিক্ষার কারখানা করলেন। বেকার সমস্যার দিনে বহু যুবক আনন্দাশ্রমে ভিড় করল। তাহাদের দ্বারা অল্পবয়স্ক বালকদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থাও করা হল। পুরুষের বিভাগটি পূর্ণাঙ্গ করার পর মার্কিন বাসিনীদের দ্বারা অনুরূপ একটি নারী বিভাগ পরিচালনা করবার জন্য ভট্টশালী সঙ্কল্প স্থির করলেন। স্বামিজীকে অনেক করে বুঝিয়ে রাজি করালেন এবং তদনুসারে কাযও আরম্ভ হয়ে গেল। ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক ও সাময়িক সংবাদ পত্রে আনন্দাশ্রমের অফুরন্ত প্রশংসাবাদ প্রকাশিত করিয়ে এবং রাজা, মহারাজা, ধনী ব্যবসায়ী ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের অভিভূত করে মুগ্ধ করতঃ পত্র সাহায্য বা প্রশংসাপত্রাদি আদায় করে সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশেও আশ্রমপর্ব্ব বেশ চলতে লাগল। মেয়েদের বিভাগে দেশীয় যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাবে কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হওয়া অসম্ভব বুঝে স্বামিজী ও ভট্টশালী উভয়ে একজন সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। যোগ্যতা

সম্বন্ধে উভয়ে স্থির করলেন—কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। যখন এইরূপ শিক্ষয়িত্রী পাবার জন্য চেষ্টা চল্‌ছে ঠিক তেম্‌নি সময় রাম হরি বাবার এক শিষ্যা যিনি সংযুক্ত প্রদেশবাসী কোন ব্রাহ্মণের কন্যা, আজীবন তপস্বিনী এবং যাঁর গুরুদত্ত নাম দেবীগিরী তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তপস্বিনী মাতাজী তখন অশীতি-পর বর্ষিয়া, তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে এসে স্বামী সৌবর্ণানন্দের আনন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠার খবর পেলেন এবং তদ্দর্শনার্থ আল-মোড়াতে উপস্থিত হলেন। বহু বৎসর পর হঠাৎ মাতাজীকে পেয়ে সৌবর্ণানন্দের আনন্দের অবধি নাই। নানা প্রসঙ্গে বাক্যালাপের ভিতর নারী প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কথা উঠল। মাতাজী শ্রবণ মাত্রই আগ্রহে বলে উঠলেন—তোমাদের শিক্ষয়িত্রী আমি ঠিক করে দেব। তোমার হয়ত স্মরণ থাকতে পারে যখন গুরুদেব প্রকটিত ছিলেন তখন তাঁর পদপ্রান্তে আস্‌বার কালে একটি ছোট্ট মেয়েকে সঙ্গে করে আনতাম নাম লক্ষ্মী। সে আমার পূর্ব্বাশ্রমের কোন আত্মীয়ের কন্যা। তার বাবা ও মা ওর বয়স যখন সবে দু তিন মাস তখনই তিন দিন আগু পাছু মারা যান। আমি ঐ দুঃসময়ে উপস্থিত ছিলাম। ওর মা'ই শেষে মারা যান। তিনি মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে মেয়েটিকে আমার কোলে দিয়ে বলেছিলেন এটিকে তুমি রক্ষা করিও বোন্! আজ থেকে তুমিই ওর মা। এই কথা কয়টি বল্‌তে বল্‌তেই তাঁর প্রাণবায়ু দেহ ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। সেই থেকে সে মেয়ে আমার কাঁধে চাপে। সে আমাকেই মা বলে জানে এবং ডাকেও তাই। তোমরা অনেকে তা'কে কোলে কাঁধে নিয়েছ হাতে তুলে নাচিয়েছ তাকে নিয়ে কত রঙ্গ করেছ। সৌবর্ণানন্দজী শুনতে শুনতে পূর্ব্বকথা স্মরণ করতে পারলেন এবং বলে উঠলেন ও আমাদের ক্ষুদে লক্ষ্মীমনি! সে কোথায়? তার কথা মনে পড়েছে, সে আছে বেশ? সে এখন কি করে? বে-থা দিয়েছ নাকি? মাতাজী হেসে বল্লেন—না গো না, আগে শুনই না সব কথা! গুরুদেব অপ্রকট হ'লে পর পাগল হয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করে কোথাও শান্তি না পেয়ে শেষে ৺কাশীধামে মা অন্নপূর্ণার কোলে কিছুকাল স্থির হয়ে রইলুম। তখন মেয়েটার পড়াশুনায় বেশ ঝোঁক দেখে একটা মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলুম। ক্রমে বৃত্তি নিয়ে ম্যাটিক পাশ করলে। এনিবেশান্তকে ধরে কুইন্স কলেজে ভর্ত্তী করা গেল। সেখান থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করলে বটে কিন্তু বৃত্তি পেল না। তখন পণ্ডিত মালব্যজীকে ধরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি বোর্ডিং সমেত ভর্ত্তী এবং বি, এ, পাশ করে কয়েক বৎসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটা মেয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করছিল। বছর দুই নানা স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থাদিতে ঘুরা ফিরা করে শেষে ত্যাগের পন্থা অবলম্বন করবে বলে বদ্ধপরিকর হ'ল এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করল। এখন নাম হয়েছে লক্ষ্মীগিরী; সম্প্রতি নৈনীতালে একটি বিশেষ ভক্তের বাড়ীতে আছে। তুমি অনায়াসে তাকে এ কাজে নিতে পার, যদি মত হয় সেখানে তার করে দাও, সে নিশ্চয় চলে আসবে। সৌবর্ণানন্দ কাল বিলম্ব না ক'রে ভট্টশালীকে বলে তার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। দিন কতক পরেই লক্ষ্মীগিরী এসে আনন্দাশ্রমে হাজির। তাঁর সঙ্গ পেয়ে মার্কিনী মহিলাদের বেশ আনন্দ বাড়ল। লক্ষ্মীগিরী মেয়ে বোর্ডিং সংলগ্ন কন্যা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করতে লাগ্‌লেন। দেবীগিরী মাতাজী কিছুদিন থেকে অন্য তীর্থের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

জনবহুল নগর নগরীতে এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হয়ে বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে স্থাপিত হ'লেও ছাত্র ছাত্রীর অভাব ঘটে নাই। উভয় বোর্ডিংএর ব্যয় ভার বহনে বেশ সমর্থ লোকদের পুত্র কন্যাতেই ভরে উঠ্‌ল। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে দেশের ধনী লোকেরা রুগ্ন ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উভয় লাভের আশায় মাসিক নির্দ্দিষ্ট খরচার উপর সাময়িক দানাদি যথেষ্ট দিয়েও তাঁহাদিগকে এখানে সাগ্রহে পাঠাতেন, আর পাঠাতেন, বিপত্নীক ধনবানেরা তাঁহাদের ছেলে মেয়েদিগকে। এই দুই শ্রেণীর ছেলে মেয়েরাই বেশীর ভাগ এবং তারাই আনন্দাশ্রমের আনন্দের খোরাক যোগাবার প্রধান অবলম্বন।

এইরূপে আনন্দাশ্রমের দুইটি বিভাগই বেশ উন্নতির পথে চল্‌তে লাগ্‌ল। কর্ম্ম বাড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীর সংখ্যাও বেড়ে চল্‌ল। শ্রীযুত ভট্টশালী মহাশয় অতীব নৈপুণ্য সহকারে উভয় বিভাগের কার্য্য পরিচালনা

করতেন। হিসাব পত্রাদি ঠিক ঠিক রাখার ব্যবস্থা এবং কোন গোলযোগ উপস্থিত হ'লে তিনিই মাথা ঘামিয়ে সব মিটমাট করতেন। ভট্টশালীর প্রভাব ক্রমেই বাড়তে লাগল। তিনি কাঁহারও ত্রুটি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন। সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা গুণ তাঁহার ভিতর এত অধিক ছিল যে, স্বয়ং স্বামিজীকেও বাগে পেলে তিনি আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। স্বামিজী এই সুযোগ্য সহকারীর প্রভাব নীরবে সইতে মোটেই দ্বিধা বোধ করতেন না, কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিই ছিলেন তাঁর অন্ধের যষ্ঠী; কিন্তু মেয়ে প্রতিষ্ঠানে শ্রীমতী লক্ষ্মীগিরী এবং সেই বিভাগের দু'টি পুরুষ কর্ম্মী ভট্টশালী মহাশয়ের প্রভাব প্রতিপত্তিকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। এর কারণও শীঘ্রই প্রকাশ হ'তে লাগল।

বৎসর কয়েকের ভিতরই নারী বিভাগটি এত বেড়ে উঠল যে, স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে স্বতন্ত্র যায়গা কিনে বিরাট গৃহ, উদ্যান, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়ল। ভট্টশালী স্বামিজীকে পুনঃ পুনঃ বলে তাঁর ধনবতী শিষ্যা নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ চর্ম্ম ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা মিস্ কষ্টারকে এই কার্য্যে কিছু বেশী টাকা দান করবার জন্য পত্র লেখালেন। তাঁর পিতার নাম ভারতে অক্ষয় করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের নাম "কষ্টার ইন্‌ষ্টিটিউট্" করা হবে, একথাও স্পষ্ট লিখে দেওয়া হ'ল। যথাসময়ে মিস্ কষ্টার এক লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট পাঠিয়ে দিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের নাম "ভারত নারী শিক্ষাশ্রম" রাখতে অনুরোধ জানালেন। তদনুসারে স্বতন্ত্র বাড়ী তৈরী হ'য়ে সুচারুরূপে নারী শিক্ষাশ্রমের কার্য্যাদি চলতে লাগল। এখন উহার সব কর্ত্তৃত্ব লক্ষ্মীগিরীজির উপর ন্যস্ত। মার্কিনী মহিলারা তাঁহারই পরিচালনাধীনে সেলাইর কাজ, সূচীকর্ম্ম, চিত্রকলা, রোগী পরিচর্য্যা, ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদান প্রভৃতি করেন এবং নিজেদের সাধন ভজন ও উচ্চতর জ্ঞান চর্চ্চায় দিনাতিপাত করেন। তাঁহাদের সরলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতুলনীয়। চক্ষের সম্মুখে এসব দেখও পরাধীন আমাদের আত্ম প্রবঞ্চনাময় কুটিল স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তন হয় না—এমনই অধম আমরা! নারী প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক হ'লেও ভটশালী মহাশয় শত ব্যস্ততার ভিতর যখনই সময় করে উঠতেন, তখনই উপস্থিত হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব খবর নিতেন এবং হিসাব পত্রাদি দেখে শুনে দোষ, ত্রুটি ও ভ্রম সংশোধন করে দিতেন। ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি যাতে না হয় সেজন্য সর্ব্বদা তিনি সকলকে বিশেষ যত্ন রাখতে উপদেশ দিতেন।

অতিরিক্ত খাটুনীতে ভটশালী মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তিনি মাস দু'তিন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মান্দ্রাজ ওয়েণ্টায়ারে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হন। ওয়েণ্টায়ারে যাবার অনতিপূর্ব্বে এ দিকে নারী শিক্ষাশ্রমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বৃহৎ বৃহৎ আরও কয়েকটি গৃহ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বহুল অর্থব্যয় সাপেক্ষ কার্য্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে কি করে সম্পাদন হবে তা তিনি ভেবে ব্যাকুল হলেন। লক্ষ্মীগিরী ও অন্যান্য সকলকে খুব সাবধানতার সহিত হিসাবপত্র ঠিক রেখে সব সুব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষ ভাবে বলে কয়ে স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভের জন্য প্রায় তিন মাসই তিনি ওয়েণ্টায়ারে থাকা প্রয়োজন মনে করেছিলেন কিন্তু তিন মাস পূর্ণ হবার দিন কতক পূর্ব্বেই হঠাৎ স্বামীজির জরুরী তার পেয়ে আনন্দাশ্রমে চলে আসতে হ'ল। এসে দেখেন যে স্বামীজির বহুমূত্র রোগটা বেড়ে চলেছে। তিনি দিল্লী থেকে বড় বড় দু'তিন জন চিকিৎসক আনিয়ে বিশেষ চিকিৎসা ও যত্নের ব্যবস্থা করলেন। ভট্টশালীর সকল চেষ্টা তখন স্বামীজির সেবায় প্রবৃত্ত হ'ল। এই মহা ব্যস্ততার ভিতর ও তিনি আনন্দাশ্রমের সকল বিভাগের খবরাখবর নিতে লাগলেন। নারী শিক্ষাশ্রমের গৃহ নির্ম্মানাদি তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তিনি হিসাব পত্রাদি সামান্য ঘাটাঘাটি করতেই কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয় কি প্রতিকার করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এসব ব্যাপারের কথা বাইরেও প্রকাশ করা চলে না, আর স্বামিজীর বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁকেও বলা চলে না। প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে কোন কথা ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ না করে, মনে মনেই প্রতিকারোপায় চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে

অপরাধীরা ভট্টশালী মহাশয়কে মহা শত্রু বলে ভাব্‌তে লাগ্‌ল এবং তার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ রটনা কর্‌তে লাগ্‌ল। ভট্টশালীও মহা বিপদ গনলেন। একে স্বামিজীর রোগ যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়্‌তে দেখে মহাদুশ্চিন্তা, তার উপর এই অনর্থপাৎ তাঁহাকে মহা বিব্রত করে তুল্‌ল। দিন রাত আশ্রমের সব বিভাগের সুব্যবস্থার জন্য পরিশ্রম, স্বামিজীর সেবাশুশ্রূষার তত্বাবধান, ঔষধ পথ্যাদি সেবন বিষয়ে সতর্কতা ইত্যাদি নিয়ে পাগলের মত তিনি ছুটাছুটি কর্‌ছেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও স্বামিজীর রোগ যন্ত্রণার উপশম না হ'তে দেখে এক একবার অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছেন।

একদা কয়জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বামিজীকে দেখ্‌তে এসেছিলেন, তাঁহারা ভট্টশালীকে নারীশিক্ষাশ্রমের প্রতিকূলতার জন্য তীব্র মন্তব্য শুনালেন। ভট্টশালী তাও নীরবে শুন্‌লেন মাত্র, কোন উচ্চবাচ্য তখন কর্‌লেন না—ইহাতে ফল এই হ'ল যে, সত্য চাপা পড়ে নিরপরাধ ভট্টশালীকেই ভ্রান্ত মন্তব্যকারীগণ অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে গেলেন। দিন কতক পরে স্বামিজীর অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সঙ্কট কেটে গেল বলে চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ কর্‌লেন এবং তাঁহাকে কোন প্রকার বিরক্ত না করে দীর্ঘকাল পূর্ণ বিশ্রাম দিবার জন্য সকলকে সতর্ক থাক্‌তে বল্‌লেন।

ভাই ফোঁটা

শ্রীবিমলা দাস

আজি শুভ ভাইফোঁটা দিনে তোমারে মিলিবে মোর কাছে
জয়টীকা আঁকিয়া কপালে পাঠাইব শত্রুসেনা মাঝে।
প্রশান্ত ললাট মাঝে তব ফোঁটা মোর নেত্রময় হয়ে
ধিকি ধিকি জ্বলিবে অনল, চকিত হইবে সবে ভয়ে!
স্তব্ধ হবে গভীর বিস্ময়ে যত আছে দেবাসুরগণ—
যুক্ত-করে মাগিবে অভয় বন্দি তব যুগল চরণ!
মহাযোগী ধ্যানেতে মগন, রহিয়াছ অটল শঙ্কর!
অসুর প্রতাপে ধরা কাঁপে, মেলিলে না দৃষ্টি প্রভাকর।
তব ভালে তাই আমি আজি লেখি দিব আগুনের শিখা
ভস্মীভূত হবে শত্রুকুল মুহূর্ত্তে ঘুচিবে অনামিকা!
সহস্র আদিত্য-জ্যোতিঃ হবে দীপ্তি হীন ক্ষুদ্র রেখাপাতে
শক্তি লেখা নহে সাধারণ—পরাজিত সর্ব্বভুক্ যাতে!
সমরে চলেছ তুমি একা!—কোথা তব যুদ্ধ আয়োজন
অঙ্গুলির কোণে ছিল মোর জালাময়ী স্তব্ধ হুতাশন
মহাশক্তি স্ফুরিত যাহায়, জয়যুক্ত ক্ষিপ্র যার গতি,
ভগিনীর ভাই পরিচয়ে উজলে যা' ভালে দিব্য জ্যোতিঃ
আমার অঙ্গুলি আঁকা চাঁদ তোমার ললাট-নভে ভেসে
ছড়াইবে অমিয় সুষমা স্নিগ্ধকারী, সুমধুর হেসে!
বুকে মোর কত আছে সাধ ; ভরা ভাদরের নদী সম
উছলিয়া গিয়া সরোবর জাগাইবে ভাব গাঢ়তম!
ভাষাহীন এত আশা হায় বিফলে তা যায় যে বিলয়ে
হিয়ার বাসনা হিয়া মাঝে অকালেই মরিছে শুকায়ে।
ভ্রাতা তুমি, তোমার ভগিনী মোর এই শ্রেষ্ঠ পরিচয়
উজল করিয়া তোল আজি, কর তারে অমর অক্ষয়

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠতম দান যেমন মানব সৃষ্টি, গ্রন্থ সৃষ্টি সেইরূপ মানবস্রষ্টির মহৎ এবং অনবদ্য দান। মানবের অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ পুস্তক বিশ্ব-মানবের এক অভিনব সম্পদ। এই গ্রন্থের মত জাতির হিতকর বস্তু জগতে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয়না। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই পারে জাতিকে উন্নত, সমৃদ্ধ, মার্জিত ও প্রসারিত করে তুলতে, জাতির অন্তরের মহামানবের পরিচয় প্রদান করতে, মানবের নিভৃত স্থলে জ্ঞানের একটী মোহ উদ্রিক্ত করে তুলে নিখিল বিশ্বের জ্ঞান কক্ষের চাবিকাঠির গোপন সন্ধানটী বলে দিতে, নিরক্ষরতার কলঙ্ক বিদূরিত করতে এবং এই গ্রন্থই পারে দিকে দিকে বিশ্বরাষ্ট্রে -যে উপলব্ধি ও নিরখিবার বাতি প্রজ্বলিত রয়েছে, সেই আলোর ছায়া জাতির মনের পটে রেখাপাত করে জাতিকে প্রেরণা দানে আপন দেশ ও সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার কল্পে উন্মুখিত করে তুলে এক জ্যোতির্ময় আনন্দে আপ্লুত করে, একটি আদর্শ মণ্ডিত সুন্দর সুষ্ঠু ও নির্ভিক জাতি গঠন করে তুলতে। কারন যুগ মরে, মানুষ মরে, কিন্তু গ্রন্থের অমৃতময় লিপিবদ্ধ বানী চির অমরত্ব লাভ করে, কোন সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের বার্ত্তা, সত্যের সন্ধান জাতিকে দিতে পারে; বর্ত্তমান জগতের সাথে জাতির যোগাযোগ রাখতে পারে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, এই গ্রন্থই পথ প্রদর্শক স্বরূপ জাতির পথ চলার পরম সুহৃদ। তবে কথা হচ্ছে এই, মানব চরিত্রের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্বটুকু বা প্রকৃতির রূপ আধারের সৌন্দর্য্যটুকু অসীম গুণ মাধুর্য্যে বিকশিত হয়ে মানব মনের উপরে রেখাপাত করে জাতিকে যদি উপকৃত ও বিমোহিত করতে না পারে তাহলে সে গুণ-সম্পদ গুলি যেমন অকাল ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেইরূপ অর্থপূর্ণ গ্রন্থ যদি শিক্ষায়, জ্ঞানে, আদর্শে ও আনন্দে দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে জাতির মনের পরে প্রভাব বিস্তারে, উন্মেষে নব যুগের নবীন আলো জাতির প্রাণে জালিয়ে দিতে না পারে, তাহলে সে গ্রন্থ রচনা কোনও মতেই সার্থকতার দীপ্ত প্রভায়, গৌরব অর্জন করতে পারেনা। তবে যে দেশে এখনও শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিরক্ষর সেই দেশে পুস্তক প্রচার কার্য্য যে কত কঠিন ও দায়ীত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। এবং এই নিরক্ষরতার প্রধানতম কারনই হল আমাদের এই কাঙাল দেশের ঐকান্তিক অর্থাভাব ও পরাধীনতা। মূর্তিমান কলঙ্কের রূপ নিরক্ষরতার জটিল বন্ধন হতে মুক্ত জাতির প্রাণে পাঠস্পৃহা ও পুস্তক প্রীতি উদ্রিক্ত হয়ে উঠতে না পারলে পুস্তক প্রচার কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রন্থ প্রিয়তা, পাঠানুরাগ ব্যতীত জাতি কিছুতেই জ্ঞান আলোকে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনা। জারের রাজত্ব কালে রাশিয়ায় নিরক্ষরতার যে কালো মেঘ সে দেশের শিক্ষা আকাশে স্তুপীকৃত হয়েছিল, তা অপসারিত হতে পেরেছিল জনশিক্ষার ভার যখন রাসিয়ান গবর্ণমেণ্টের হাতে এল; এবং সে দেশ স্বাধীন হতে পেরেছিল বলে আলাউদ্দিনের প্রদিপের মত অভিনব পন্থায় মাত্র পাঁচটী বৎসরের ভিতর স্কুল কলেজ পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরক্ষতার মলিনতা দেশ হতে বিদূরিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই পরাধীন ও গরীব দেশে এইরূপ পন্থায় যখন জাতিকে শিক্ষা ও জ্ঞান গৌরবে গৌরবান্বিত করা সম্ভব নয়, তখন আমার মনে হয় দেশবাসীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারই গ্রন্থ প্রচার এবং মানব মনের প্রতিভার প্রভাব বিস্তার দ্বারা জাতিকে আনন্দ পূর্ণ জ্ঞান প্রদানে জনশিক্ষাকে সার্থক করে একটি আদর্শমণ্ডিত জাতি গঠন করে তুলতে পারবে। প্রয়োজনীয়তার ও উপকারিতার প্রতীক স্বরূপ এই পাঠাগারই যে জাতির এক অতুলনীয় সম্পদ সে বিষয় কোন ও সন্দেহ নেই। তবে সেই পাঠাগার কি পন্থায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করতে পারলে দেশবাসী অধিক উপকার পাবে ও তার প্রয়োজন সার্থক হবে সেই সমস্যার সমাধানটি সত্যই বড় জটিলতর। সাধারণতঃ মানবের জ্ঞান আহরণের পথে তিনটি অভাব পরিলক্ষিত হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকার, যার জন্য জনসাধারণ পুস্তকগত শিক্ষা অর্জন করলেও পাঠস্পৃহা ও

পুস্তক প্রীতি তার মনে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারেনা ; দ্বিতীয় নিরক্ষরতা ; এবং শেষোক্তটী হচ্ছে আমাদের দেশের আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দীনতা ও অর্থাভাব ;—যার জন্য কত নব মুকুলিত ছেলে মেয়ে যে জ্ঞানকক্ষের চাবিকাঠিটীর সন্ধান পেয়েও এই অর্থাভাবে স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান বিস্তারের পথে প্রতিহত হয়, সে খবর কয়জনে রাখতে পারেন? হয়তো বা এই সকল ছেলে মেয়েরাই দেশ, সমাজ ও সংসারের নিকট জ্ঞান অর্জ্জনের পথে সহায়তা লাভ করতে পারলে হতে পারতেন দেশের শ্রেষ্ঠতম মানষিবৃন্দ এবং এদের দ্বারাই দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তবে কথা হচ্ছে এই, জ্ঞান আহরণ করবার কেমনও লজ্জা বা ক্ষণ নেই ; মানুষ তা আপনার ইচ্ছা ও অবসর মত স্বাধীন ভাবে করতে পারে ; শুধু দেশের ও সমাজের নিকট তার ঐকান্তিক সহায়তা চাই। অতএব মূলমন্ত্র স্বরূপ জাতির এই তিনটী অভাব বিদুরণ সঙ্কল্পে সুচারু পরিচালনা দ্বারা, কতকগুলি নিয়ম সুসংবদ্ধ প্রবর্তন করে, সুষ্ঠু ও আদর্শপূর্ণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, পাঠাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হবে, জনসাধারণের প্রয়োজন সার্থক হবে, দেশের নিকট তারা সত্যিকারের উপকার পাবে এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠার প্রণালী যতই জটিলতর হোক্ না কেন, তা সহজ এবং সরল হয়ে উঠবে। এবং সেইরূপ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি পারবে অজ্ঞানতার সুপ্তি হতে জাগ্রত হয়ে উঠতে, পাঠানুরাগ ও গ্রন্থপ্রীতিতে সমৃদ্ধি লাভ করতে, নিরক্ষরতার বন্ধন হতে মুক্তি পেতে? এবং এইরূপ পাঠাগারের সহায়তাতেই যে জ্ঞান আলোককে আয়ত্তে আন্‌তে পেরেছে সে বঞ্চিত জ্ঞান অর্জনে, সঞ্চিত জ্ঞানে দেশের এক অভিনব সম্পদ হয়ে উঠতে পারবে। সচরাচর দেখা যায় আমাদের দেশের পাঠাগার প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার একান্ত অভাবে সেগুলি হয় যেন নিতান্ত একটী আমোদ প্রমোদের আগার ; জন সাধারণ অর্থাৎ স্কুল অফিসের কেরাণী ও শিক্ষক বৃন্দ এবং অধিকাংশ ছাত্রদের পাঠানুরাগ ও গ্রন্থপ্রীতির ঐকান্তিক অভাবে পাঠাগার তাস পাশা, দাবা প্রভৃতিতে ক্রীড়া মত্ত এবং আকাশ প্রান্ত বিদীর্ণকরা থিয়েটার মহলার এক অভিনয় মঞ্চ হয়ে ওঠে। এবং অকুণ্ঠিত অর্থব্যয় এরই উদ্দেশ্যে অজস্র হয়ে থাকে। অথচ ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়, যে পাঠাগারের প্রাণ স্বরূপ প্রকৃত সম্পদ হল গ্রন্থ,—অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সেই পাঠাগারে পাওয়া সম্ভব হয় না। হয়তো বা সূক্ষ্ম নির্বাচন, কিম্বা অর্থাভাব, এই গ্রন্থ ক্রয় করার পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়, না হয় কোনও মেম্বারের গৃহকোণে তা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি জ্ঞান অর্জনের কোনও লজ্জা বা ক্ষণ নেই। মানুষ তা চলার পথে চির সাধনায় পরি-ব্যাপ্ত রাখতে পারে, এবং প্রকৃত পাঠাগারই পারে তার সেই নিরন্তর সাধনাকে সহায়তা করতে ও সার্থক করে তুলতে। তবে আমি বলছি না খেলাধূলা, সঙ্গীতপ্রিয়তা, অভিনয় করবার স্পৃহা এগুলির কোনও মূল্য নেই?—না তা নয়—এগুলির মূল্য অপরিসীম, এগুলি পারে জনসাধারণকে অভি-নব আনন্দ প্রদান করতে, এবং মানুষ তার অন্যতম প্রতিভাকে এরই সহায়তায় বিকশিত করে তুল্‌তে পারে, কর্ম্মক্লান্ত দেহ ও মনকে সজীবতার প্রতীক করে। তবে কথা হচ্ছে, এইগুলি নিয়ন্ত্রণের ভিতর একটি সুচারু ও সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা রাখতে হবে, এবং তার সাথে ছাত্রদের স্বাস্থ্যকে উন্নত, মার্জিত ও রক্ষা করবার শিক্ষা প্রদান কল্পে ব্যায়াম চর্চ্চা—লাঠি অসি প্রভৃতি খেলার প্রচলন করতে হবে ; তবে সূক্ষ্ম চয়ন দ্বারা আনন্দ ও জ্ঞানপূর্ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রচারে সাহিত্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ধর্ম এবং বিশ্বরাষ্ট্র সংবাদের প্রভাব মানবমনের পরে বিস্তার করে জাতিকে প্রকৃত মানুষ করে তোলাই পাঠাগার পরিচালনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে। এইজন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কার্য্য নির্বাহক সমিতির কর্তৃপক্ষকে খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ হতে হবে, নিঃস্বার্থ ও চকিত দৃষ্টি জন সাধারণের উপর রেখে পূর্ব্বোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যকে সাধিত করবার সঙ্কল্প নিয়ে পাঠাগার পরিচালনা করতে পারলে, পাঠাগার পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠা সত্যিকারের সার্থকতার দীপ্ত প্রভায় গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে। যেমন যাঁরা জ্ঞানকক্ষের চাবি কাঠিটীর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থপ্রদানে তাঁদের উন্নত হওয়ার পথে সহায়তা করতে হবে, যাঁরা শিক্ষার গৌরব যথেষ্ট অর্জন করেও, অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে এখনও মুক্ত হতে পারেননি—তাঁদের মনে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিতে, পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থপ্রীতিতে তাঁদের সমৃদ্ধ করে তুল্‌তে হবে, এবং দেশ হতে নিরক্ষতার কলঙ্ক বিদূরণ করে, জাতিকে উন্নত হওয়ার পথে সহায়তাকারী স্বরূপ একটী আদর্শবাদী জাতি গঠন করে তুলতে হবে। প্রত্যেক বর্ণিতদের রুচি অনুযায়ী গ্রন্থ সাধ্যমত চেষ্টায় তাঁদের সরবরাহ

করতে হবে, পাঠাগারে যদি সম্ভব না হয়, তাঁদের নিকট সে গ্রন্থের লিষ্ট নিতে হবে, এবং পাঠাগারের নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ কালীন এই লিষ্টগুলিকেও প্রয়োজনীয়তার প্রতীক বলে মনে করতে হবে। দ্বিতীয় বর্ণিতদের পাঠের প্রতি অনুরাগ বৰ্দ্ধিত করে তোলাই পাঠাগারের উদ্দেশ্য হবে, এবং এই গ্রন্থপ্রীতি তাঁদের মনে উদ্রিক্ত করে তুলতে হলে সর্ব্বপ্রথম সভা সমিতি করে জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা গ্রন্থের মাধুর্য্য তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে—গ্রন্থরুচি তাঁদের বিকশিত করে তুলতে হবে, এবং আনন্দপূর্ণ যে পুস্তক তাঁদের মনের পরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অতি সূক্ষ্ম চয়ন দ্বারা সেইরূপ গ্রন্থাদি তাঁদের জন্যে সংগ্রহ করতে হবে। তৃতীয় বর্ণিতদের অর্থাৎ নিরক্ষর যারা সেই শ্রমিক ও কৃষিজীবিদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করতে নৈশ বিদ্যালয় প্রবর্তন দ্বারা তাদের অক্ষর পরিচয় ও শিক্ষা প্রদান করা, পাঠাগারের কার্য্য পরিচালনা করা। পাঠাগারের কার্য্য পরিচালনা সমিতির অন্যতম প্রধান একটী কর্ত্তব্য মনে করা এবং নিরক্ষর এই দেশবাসীদের অজ্ঞ মনের পটে শিক্ষা মাধুর্য্যের রেখাপাত করবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতাকে অতি সহজ ও সরল পন্থা বলে আমার মনে হয়। এই ম্যাজিক লণ্ঠনেরই ছবিগুলি অজ্ঞকে অজ্ঞানতার সুপ্তি হতে জাগ্রত করে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে চকিত করে তুলতে ও জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারবে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, এই পাঠাগারের সহায়তায় দেশবাসী উন্নত হওয়ার পথে কতখানি সহায়তা লাভ করবে এবং প্রয়োজনীয়তার ও উপকারিতার প্রতীক স্বরূপ কোনও বস্তুর সৃষ্টির মূলে তার গঠন কার্য্যের নিপুণতার অভাব তাকে যেমন নিতান্তই ব্যর্থ করে সেইরূপ পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় দেশবাসীকে জ্ঞান ও আনন্দ অর্জ্জনের পথে যথেষ্ট সহায়তা করলেও—সে প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি যদি নিখুত ও সুষ্ঠু না হয় তাহলে সে গঠন কার্য্য কিছুতেই সফলতার বিজয়মাল্যে দোদুল্যমান হয়ে উঠতে পারে না। অতএব পূর্বোক্ত তিনটী উদ্দেশ্যকে পাঠাগারের ভিত্তি গেঁথে জনসাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দ ও সুবিধার প্রতি উন্মুখিত দৃষ্টি রেখে নিখুত ও নিপুণ পরিচালনা দ্বারা তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলতাপূর্ণ করে তুলতে হবে। যেমন জন সাধারণের সঙ্গে পাঠগৃহের সম্বন্ধ শুধু গ্রন্থ আদান প্রদানের ভিতর আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাঁদের রুচি অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন করার সুযোগ তাঁদের দিতে হবে, প্রত্যহ পাঠগৃহ দুইবেলা উন্মুক্ত রেখে নিভৃত পাঠ কক্ষে তাঁদের পাঠচর্চ্চা করবার সুবিধের প্রতি বেশ সচকিত দৃষ্টি রাখতে হবে। নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক সংবাদ, ও বিষয়ের সাথে সম সাময়িক যোগাযোগ রাখতে দৈনিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাঁদের সরবরাহ করতে হবে, এবং এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠান স্থানটীকে এমন সূক্ষ্মভাবে নির্বাচন করতে ও তার আবাস গৃহের গঠন প্রণালী এমনই সুচারুপূর্ণ করতে হবে—যে সে স্থান হয়ে উঠবে বেশ স্বাস্থপূর্ণ, উন্মুক্ত, ও বাতাস অবাধ গতিবিধিতে স্বচ্ছ ভাবে বইতে পারবে। কারণ সকল স্থানে যখন বিদ্যুৎ পাখা প্রচলন সম্ভব হয় না, তখন প্রকৃতির বাতাসের অভাব হলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হবে, এবং মেম্বারগণের আধিক্য কক্ষের উপর অসহনীয় হয়ে উঠবে, সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় তারা কিছুতেই কর্মে নিবিড় হতে পারবেন না, দেহের সুস্থতা ও স্বস্তিই হল কর্মে প্রেরণাযুক্ত হওয়ার ভিত্তি স্বরূপ। তারপর পাঠাগার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সৌষ্ঠবপূর্ণ করতে হলে তার মাসিক একটী আয় থাকা একান্তই প্রয়োজন। পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা তো যতদূর সম্ভব পাঠাগারের নিয়মিত খরচগুলি ব্যয় সঙ্কুল হবেই যেমন নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রন্থাগারিকগণ অবৈতনিক তো হবেনই—তবে প্রতিমাসে কিছু কিছু গ্রন্থ সঞ্চয় করতে না পারলে পাঠাগারের উন্নতি লাভ সম্ভব হবে না। এইজন্য সহৃদয় নিঃস্বার্থ দেশবাসীর নিকট ঐকান্তিক সহায়তা চাই, যে মেম্বরগণের সামর্থ্য আছে তাঁরা তো প্রতিমাসে কিছু কিছু চাঁদা দিবেনই এবং ধনী যাঁরা তাঁদেরই অকৃত্রিম সহায়তা পাঠাগার প্রতিষ্ঠানের প্রিয়তম ও দরদী বন্ধুর মত এই অর্থ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তবে আমাদের এই গরীব দেশের অর্থকৃচ্ছ্রতা ও দীনতার কথা স্মরণ রেখেই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে, ধনী দেশের অনুকরণ করলে আমাদের চলবে না, আমাদের আদর্শ হবে উচ্চ এবং ধনী, চালচলন হবে গরীবিয়ানা পূর্ণ। যেমন যতদূর সম্ভব গ্রন্থ পুরাতন ক্রয় করতে হবে, দেশবাসীর নিকট সংগ্রহ করতে হবে, এবং যে সকল পাঠাগার সুন্দর সুন্দর পুস্তক সম্পদে সমৃদ্ধ, তাদের সহিত যোগ্যসূত্র রেখে পুস্তকের আদান প্রদান করতে হবে এবং অল্প ব্যয়সঙ্কুল আসবাব

পত্রে পাঠগৃহ সুসজ্জিত হবে। যে গণ্ডগ্রামগুলিতে সম্ভব নয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার দ্বারা সে স্থানের অধিবাসীগণকে পুস্তক প্রচার দ্বারা জ্ঞান আলোকে প্রভাময় করে তোলা পাঠাগার পরিচালনার একটী অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আমার মনে হয় যে-পাঠাগার প্রতিষ্ঠান পারবে সুষ্ঠু ও নিপুণ পরিচালনা দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ গ্রন্থপ্রচারে দেশবাসীর মনের পরে প্রভাব বিস্তার করে, জ্ঞান অর্জ্জনের প… তাদের সহায়তা করতে সেই পাঠাগারই দেশের এক অভিন… সম্পদ হয়ে, দেশবাসীর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতী… স্বরূপ, জাতিকে উন্নত প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে… একটী আদর্শ মণ্ডিত জাতি গঠনকার্য্যে সার্থকতার দীপ্ত প্রভা… সমুজ্জ্বল হয়ে গর্ব্ব এবং গৌরব অর্জ্জন করতে সমর্থ হবে।

আউচ ফুল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

এ ফুল মোদের পল্লীর একান্ত,
শোভন করে প্রান্তর-প্রান্ত।
দারুণ খর রৌদ্র শিরে সয়,
রুক্ষ ধরার স্তন্য টেনে লয়।
নাইকো ছায়া ফলেরি বিত্ত,
কষ্টে ও সে করে আতিথ্য।
সুদূর ব্যাপী বিতরে গন্ধ—
কি অপ্রত্যাশিত আনন্দ!

২

দারুণ নিদাঘ, ঠেকানী সমীর—
ঈষৎ শীতল বয় হবে ঝির ঝির,
তরু-মৃগনাভির আসে বাস—
গোটা গ্রামের গন্ধ-অধিবাস!
রক্ষাকালীর শূন্য বেদীর পর—
অঞ্জলি দেয় সেই ত নিরন্তর।
জানিনে তার গোত্র কিম্বা কুল,
আমাদের সে গ্রাম্য আউচ ফুল।

৩

সৌরভের তার আনন্দবাজার
গৌরব সে নাই পেলে রাজার!
তাহার সুবাস মন্দিরেতে যায়,
ধনী এবং দীনের আঙিনায়।
পথে ঘাটে মাঠে তাহার দান,
পথ-চারীর জুড়ায় দেহ প্রাণ।
মরুর বুকের প্রসাদী গুগ্‌গুল
গ্রামের গরব, ক্ষুদ্র আউচ ফুল।

৪

অধ্যাপক যে গ্রামেই যেন রয়,
মহা মহোপাধ্যায় সে নয়।
পায় না রাজার বৃত্তি কিম্বা দান
গ্রামের চতুঃপার্শ্বে জোড়া মান।
নয় কো প্রতিগ্রাহী, যশ প্রিয়,
গ্রামকে শুধু করছে রমণীয়॥
সার্থকতায় কোথায় তাহার তুল?
শূন্য গ্রামের—ক্ষুদ্র আউচ ফুল।

ভাগের মা

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বছর দুই আগেকার কথা। বন্ধু হরিপদ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে চন্দ্রনাথ-তীর্থে গিয়েছিলাম। সেখান হ'তে ফেরার পথে মেহের কালীবাড়ী দেখার সাধ হলো।

মেহেরে সর্ব্বানন্দঠাকুর দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ হয়েছিলেন। সর্ব্বানন্দের বংশের এক শাখার সন্তান আমার কুলগুরু। মেহেরের প্রতি কাজেই আমার আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল।

মেহেরে সর্ব্বানন্দের বংশধর বর্ত্তমান। তাঁরা এখন দু তরফে বিভক্ত। এক তরফের মেজোঠাকুরের সঙ্গে ট্রেণে হঠাৎ আমাদের পরিচয় হলো! বাসস্থান ও আহারের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা মেহেরে পৌছলাম। স্নানাদি সেরে দুপুরে কালীবাড়ীর দিকে রওনা হলাম। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে উচ্চ রাস্তা। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে চারিদিক খাঁ খাঁ করছিল। পথচারী আমরা দু বন্ধু, সঙ্গে সেই মেজোঠাকুর আর পথের সাথী অন্নদাঠাকুর।

সর্ব্বানন্দঠাকুর জিনগাছতলায় বসে তপস্যা ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। পূজার স্থান তাঁর সেই সিদ্ধাসনের সংলগ্ন। সেই স্থানের সম্পর্কেই মেহের কালীবাড়ীর নাম। কিন্তু সেস্থানে পৌঁছে—না দেখলাম কালীর প্রতিমা, না দেখলাম পূজার মন্দির। ঠিক যেন কলকাতার পদ্মপুকুর, পদ্মও নেই পুকুরও নেই!

গাছতলার তিনটি দিক অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ নিকানো। তার মাঝে বাঁশের বেড়া দিয়ে স্থানটিকে সমানভাবে দুভাগ করা হয়েছে। এই দুভাগের মালিক সর্ব্বানন্দের স্থানীয় বংশধরের দুই তরফ। মায়ের পূজার অধিকারীও তাঁরা। ঠাকুরের বংশধরেরা যেমন দুভাগ হয়েছেন, তীর্থেশ্বরীকেও তেমনি ভাগের মা ক'রে পূজার ভার একভাগে নিয়েছেন এক তরফ, আর একভাগে নিয়েছেন অন্য তরফ। বাঁটোয়ারাটিও এমন সুনিপুণভাবে করা হয়েছে যে পূজার সময় এক তরফের সঙ্গে অন্য তরফের মুখ দেখাদেখির জো থাকে না। যে তরফের যে যাত্রী, তাঁর তীর্থকৃত্য সেই তরফের সীমানার মধ্যেই করতে হয়।

আমাদের মেজোঠাকুরটি যে তরফের অংশীদার তারই সীমানায় আমাদের আসন পাততে হ'লো।

সেদিকে পূর্ব্ব হ'তেই ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা হচ্ছিল। পূজারীর তান্ত্রিকের বেশ—পরিধানে লাল কেটে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে গাঢ়বর্ণ ফোঁটা। পূজা দিচ্ছিলেন কোথাকার এক মুন্সেফবাবু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর যুবক পুত্র। পূজান্তে মুন্সেফবাবু পুত্রকে বললেন—লুটিয়ে প্রণাম করো।' সঙ্গে সঙ্গে নিজেও 'মা মা' বল্‌তে বল্‌তে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর আমাদের পূজার পালা। আমরা ভেবেছিলাম সোয়াপাঁচ আনার পূজায়ই কাজ হবে। মেজোঠাকুর বল্লেন—উহু! তিনটাকার কমে পূজা চলে না।' আমাদেরও দেশাচারই মান্‌তে হ'লো। মেজোঠাকুরের নির্দ্দেশ মত পূজার জিনিস নিকটের এক দোকান হ'তে কিনে আন্‌লাম।

পূজার পূর্ব্বে সিদ্ধাসন প্রদক্ষিণের নিয়ম। সেজন্য উভয় তরফের সীমানার সম্মুখ দিয়ে পথ। প্রদক্ষিণের সময় আমরা অন্য তরফের সীমানায় যাঁদের দেখতে পেলাম, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃদ্ধ—শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু দেহও শুভ্র; তার উপর কেশ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ। আমরা সেদিকে যেতেই আমাকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করলেন—'মহাশয়ের নিবাস?'

আমি বল্লাম—'বরিশাল জেলায়।'

—'বরিশাল জেলায় কোন্ গ্রাম?'

—'ফুল্লশ্রী।'

গ্রামের নামটি শুনে বৃদ্ধের চক্ষু বিস্ফারিত হ'লো। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'ফুল্লশ্রী আপনার বাড়ী? কাশীপ্রসন্ন দাশকে চেনেন, যিনি পুলিশে কাজ করতেন?

আমি বল্‌লাম—তিনি আমাদের জ্ঞাতি, সম্পর্কে ভাইপো হন।'

'বটে!'—বলেই ভদ্রলোকটি সম্মুখে এগিয়ে এলেন, তারপর বল্লেন—'কালীপ্রসন্ন দাশ আমার যজমান; তিনি আপনার ভাইপো, আর আপনি পূজো দিচ্ছেন ঐ তরফে? আপনি জানেন সর্ব্বানন্দঠাকুর সিদ্ধ হয়েছিলেন কোনখানে? আর কোনোদিকে নয়, ঠিক এইখানে—তিনি আঙ্গুল দিয়ে নিজেদের সীমানাটা দেখিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অন্যদিক হ'তে মেজোঠাকুরের তাগিদ এলো—এখনও কি করছেন ওদিকে? কাজ সেরে শীগ্‌গীর আসুন।

আমরা ফিরে আস্‌তেই মেজোঠাকুট বল্লেন—সর্ব্বানন্দঠাকুর সিদ্ধ হয়েছিলেন কোথায় জানেন তো? আর কোনো দিকে নয়, ঠিক এইখানে—আঙ্গুল দিয়ে নিজেদের সীমানাটা দেখিয়ে দিলেন।

বুঝলাম ভাগের মায়ের ভাগাভাগির এও এক নমুনা।

কিন্তু অক্ষরেখার কোন্ বিন্দুতে সর্ব্বানন্দঠাকুরের সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল আমাদের সে গবেষণার প্রয়োজন ছিল না। আমরা আমাদের কাজ করতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে পড়লাম।

পূজান্তে পূজারী বল্লেন—কই, কারণের জন্য কিছু দিলেন না!

করজোড়ে বললাম—মাফ করবেন, ও রসে বঞ্চিত মোরা। আমাদের গুরুদেবকেও বঞ্চিত দেখেছি।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে পূজক বললেম—হুঁ! সর্ব্বানন্দঠাকুরের সন্তানের কারণে আবার অরুচি! শুষ্ককাষ্ঠে রসো নাস্তি বুঝেই তিনি তারপর মৌন হয়ে রইলেন।

সেদিন অন্য তরফের কোন যাত্রীই জুটলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দলবল নিয়ে উঠে গেলেন।

আমরা পূজা সেরে ফিরছি, আধাআধি পথ যেতেই দেখি যাত্রী বোঝাই একখানি মোটর বাস সম্মুখ দিক থেকে আস্‌ছে। আর তার পেছনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—খালি গায়ে খড়ম পায়ে। আমাদের কাছে এসেই তিনি হঠাৎ থেমে পড়লেন। তারপর আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—এটা কি ভালো হলো মশাই? কালীপ্রসন্ন দাশ আমার যজমান, তিনি আপনার ভাইপো, আর আপনি পূজা করলেন ও-তরফে! এতে কি মঙ্গল হবে ভাবছেন?

কথাটা অভিশাপের মতই শুনালো। কিন্তু কাজটা যে আমাদের স্বেচ্ছাকৃত নয়, মেজোঠাকুরকে পথে পেয়ে ঘটেছে, তা তাঁকে বুঝাবারও অবসর হলো না। কথা শেষ করেই বৃদ্ধ বাসের পেছনে ছুটলেন।

কিন্তু তাঁর ছুটাছুটিই সার হলো। অন্য তরফ তখন সিদ্ধপীঠে বসে ছিলেন,—ভাগের মা এবারেও তাঁদেরই দয়া করলেন।

এই ভাগের মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা মেহের-তীর্থ হ'তে ফিরলাম।

পুরী বিধবাশ্রমের নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রী

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে পুরী বসন্ত কুমারী বিধবা আশ্রম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া উড়িষ্যা প্রদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম এ মহোদয়া দেড় বৎসর যাবৎ এই আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে এই আশ্রমের উন্নতি সাধন করেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সুনীতি বল বর্ত্তমানে পুরী আশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়াছেন।

মহিল-াসমাচার

(শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ)

বোম্বাইতে বাঙ্গালীর মেয়েদের শিক্ষামন্দির

প্রবাসে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের বাঙ্গালা দ্বারা শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থার অত্যন্ত অসুবিধা। বোম্বাইতে প্রায় তিন হাজার বাঙ্গালী বসবাস করেন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিজস্ব স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্ত্তমান বর্ষে "দি বেঙ্গলী এডুকেশন্যাল সোসাইটী" একটী সুরম্য গৃহ নির্মান করিয়া একটী বাঙ্গালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমিতির ন্যাস রক্ষক (ট্রাষ্টিট) বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ও শ্রীযুক্ত এন্ এস্ সেন। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সেন। বিদ্যালয় গৃহটী এ সি চ্যাটার্জ্জির স্মৃতির জন্য 'এ সি চ্যাটার্জ্জি হল' নামে খ্যাত।

এই বিদ্যালয়ে ৫২টী বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বোম্বাই প্রবাসী অনেক বঙ্গ মহিলা এই বিদ্যালয়ে সাহায্য করেন। শ্রীমতী সরযু চ্যাটার্জ্জি এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়া ছিলেন। শ্রীমতী শান্তি সেন গুপ্ত বিত্র ও কুমারী মায়া গুপ্তভায়া বি-এ, বি টি পরামর্শ সমিতির সভ্য। মিসেস্ এ চাটার্জ্জি ইহার একজন সুদক্ষ শিক্ষয়িত্রী।

নবগৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত খের এবং দ্বারমোচন করেন মিসেস্ হানসা মেটা এম এ, প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মহোদয়া। অনতি বিলম্বে এই বিদ্যালয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে। ব্যবস্থা ও বাটী দেখিয়া পরম পুলকিত হওয়া যাইল।

মিসেস্ অনুসূয়াবাই ক্যালের বাঙ্গালী প্রীতি—

নাগপুরের এসেম্ব্লীর ডেপুটী স্পীকার মিসেস্ ক্যালে এম এল এ, বি এ এর সহিত সাক্ষাতে ও কথাবার্ত্তায় তাহার বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার কথা অবগত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করা যাইল। মহারাষ্ট্রীয় নারীরা যে বাঙ্গালা সাহিত্যর ঐশর্য্যর ও বাঙ্গালায় সংস্কৃতির পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক তাহাও প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালীরা যদি প্রবাসে মহারাষ্ট্র নরনারীদের বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সেই দেশের নরনারী সুমধুর বাঙ্গালা সাহিত্যর প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইবে, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি পায় ও তার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীও সমর্থিত হয়।

প্রবাসে বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী—

মধ্য প্রদেশের নাগপুরের নিকট সেন্ট উরসুলা গার্লস্ হাইস্কুলের কুমারী সরলা নন্দী বিএ, বিটি শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও বাঙ্গালী মহিলারা অবাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আহুত হন। এখনও বাঙ্গালী শিক্ষিত নরনারীর সম্মান মধ্য প্রদেশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমাদের সাধনা ও সচ্চরিত্র দ্বারাই তাঁহা সুপ্রতিষ্ঠ রখিতে সক্ষম হইব।

অভিনেত্রীর বদান্যতা

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী কলিকাতা রঙ্গালয়ের একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতে ও অভিনয়ে নাট্যামোদী মাত্রকেই মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একটি উইল করিয়া তাঁহার যাবতীয় উদ্বৃত্ত অর্থ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং নারী হইয়া নারীর দুঃখে সকল সময়ে দরদী ছিলেন; তাই বিদ্যাসাগর বাণীভবন, সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি আদি নারী কল্যানকর প্রতিষ্ঠান গুলিতে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নটীর এ বদান্যতা বহু নারীকে অনুপ্রাণিত করিবে আশা করা যায়।

উইমেন্স এথ্ লেটিক ক্লাব—

উইমেন্স এথ্ লেটিক্ ক্লাবের মহিলা সন্তরণ বিভাগ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। ইহা

পুনরায় ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে খোলা হইবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে ৫টা হইতে ৬৷৷০টা পর্য্যন্ত কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে পর্দ্দানশীন মহিলাদিগকে সন্তরণ শিক্ষা দিয়া থাকে। এই বৎসর শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা পঞ্চাশের উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। গত ৮ই অক্টোবর এই ক্লাবের একটি প্রীতি সম্মেলনী হয়। সদস্যগণ ও বাহিরের বিশিষ্ট মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। মহিলাগণ যে উত্তরোত্তর সন্তরণ শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন ও এবিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতেছেন ইহা অতিশয় সুখের বিষয়। সঙ্গীত ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

কলিকাতা শাখার অধিবেশন

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

বোম্বায়ের বেগম হামিদ আলীর সভানেত্রীত্বে রবিবারে, ২৬শে ওয়াই ডবলিউ সি এ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিনে (রবিবার) নিম্নলিখিত মর্ম্মের প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত :—(ক) খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের যেরূপ নিকট সম্পর্ক তাহাতে এই সম্মেলন মনে করেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে বাঙ্গলার নারী-সমাজের আরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বা পুস্তকাদি পড়িয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ এবং সেই অনুসারে পারিবারিক আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করা উচিত। (খ) তরুণ-সম্প্রদায়ের হিতকর কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা সরকার ৭২,০০০ টাকা বাজেটে মঞ্জুর করিয়াছেন জানিতে পারিয়া এই সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছেন, যেন ইহা হইতে পরিমাণমত অর্থ অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের বলিকাদের জন্য উন্নতিমূলক কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিতে ব্যয় করেন।

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় :—কলেজের ছাত্রীদিগের হোষ্টেল পরিদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন ইন্সপেক্ট্রেস নিযুক্ত করিবেন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন জানিয়া এই সম্মেলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। গত বৎসরের বার্ষিক সভায় কলেজের ছাত্রীদের বাসস্থান সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, এবারও এই সম্মেলন সেই মত প্রকাশ করিতেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালকে অনুরোধ করিতেছেন, যেন তাঁহাদের নিয়মাবলীর চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদের ১নং বিধি প্রত্যেক কলেজে প্রতিপালিত হইবার ব্যবস্থা করেন এবং তাহা অমান্য করিলে ছাত্রীদিগকে যেন পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া না হয়।

সামাজিক :—(ক) এই সম্মেলন মনে করেন যে, বঙ্গদেশের সমস্ত অনাথালয়, বিধবা আশ্রম ও এই জাতীয় অন্যান্য নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং বিবাহ-অনুষ্ঠান সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইন পাশ হওয়া প্রয়োজন। এই সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীমতী উমা নেহেরু যে বিল আনয়ন করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(খ) এই সম্মেলন মনে করেন যে, এ দেশের নারীদের মধ্যে সামাজিক কাজের জন্য ক্রমেই যেরূপ আগ্রহ বাড়িতেছে, উপযুক্ত পরিমাণে দক্ষ মহিলাকর্ম্মীর অভাবও সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ প্রবলভাবে দেখা যায়। এই কারণে সম্মেলনের মতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা বেতনভোগী মহিলাকর্ম্মী যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। (গ) এই সম্মেলন মত প্রকাশ করিতেছেন যে, বঙ্গীয় অবৈধ নারী-ব্যবসা দমন সম্পর্কিত আইন যাহাতে অধিকতর ফলপ্রসূ হয় সেভাবে সংশোধিত হউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে যেন এই আইনের সংশোধন সম্পর্কে অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন

ও ভিজিলেন্স এসোসিয়েশনএর পরামর্শ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এই সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছেন :—(১) এই কাজের জন্য একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হউক। (২) এই কাজের সাহায্যের জন্য মহিলা পুলিশ কর্ম্মচারী এবং মাদ্রাজের অনুরূপ মহিলা কর্ম্মীসমূহ নিযুক্ত করা হউক। (গ) এই আইন অনুসারে যে সব অর্থদণ্ড গ্রহণ করা হইবে তাহা দ্বারা যেন গবর্ণমেণ্ট উদ্ধার আশ্রম প্রভৃতি নারী মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করেন।

নারী শ্রমজীবি সংক্রান্ত :—(ক) এই সম্মেলন অবগত হইয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে মাতৃ-মঙ্গল আইন এই প্রদেশে প্রবর্ত্তন করিবেন। এই সম্মেলন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে আইনটির কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ও নারী শ্রমজীবিগণকে সাধারণভাবে উপদেশ দিবার জন্য বোম্বাই প্রদেশের মতন একজন উপযুক্ত শিক্ষিতা নারী পরিদর্শিকা, একজন লেডী ডাক্তার বা একজন ধাত্রী শীঘ্র নিযুক্ত করা হউক

মহিলা সমিতির প্রতি নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র-সমিতির উৎসব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা-সমিতির উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের একটী বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ আগামী জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখ হইতে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আপনাদের সাহায্য এবং সহানুভূতি না পাইলে ঐ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কি কি করা প্রয়োজন তাহা নিবেদন করিবার জন্যই আপনাদিগকে এই পত্র দিতেছি। কেন্দ্র-সমিতির শিল্পবিদ্যালয়-মন্দিরে ঐ প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আপনাদের সমিতিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এবং বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট ৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রেরিত দ্রব্যের একটী তালিকা আপনারা রাখিবেন এবং একটী আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটীতে নম্বর দিয়া দিবেন। যে গুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উপরে "বিক্রয়ার্থ" এই কথা লিখিয়া মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং অপর গুলির উপরে "বিক্রয়ার্থ নহে", শুধু এই লিখিবেন। তালিকাসহ দ্রব্যগুলি রেলওয়ে পার্শেলে ষ্ট্রীট ডেলিভারী (**60-B, Mirzapur Street, Harrison Road Junction**) দিবার কথা লিখিয়া এমন সময় পাঠাইবেন, যেন ৭ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে আমাদের অফিসে পৌঁছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে আপনাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আপনাদের সমিতি হইতে যে সকল প্রতিনিধি বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রদর্শনী পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কোন্ সময়ের মধ্যে আপনাদের দ্রব্যাদি আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র তাহা জানাইবেন। নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলিই বিশেষভাবে বিক্রয় হইয়া থাকে :—কাঁথা, সতরঞ্চ, টেবিল ক্লথ, মুগার কাজ করা টিপয় কাভার, উলের জামা, টুপী, মোজা, গলবন্ধ (কম্ফর্টার), আলোয়ান প্রভৃতি; বিভিন্ন প্রকারের কাপড় ও পুঁতির ব্যাগ, ফুলের সাজি, ছেলেদের কাপড়, সতরঞ্চের আসন, গালিচার আসন, কাগজ বা মাটীর খেলনা; বাঁশী, সাবান, সেণ্ট, জ্যাম-জেলি, আচার, মোরব্বা, বিভিন্ন প্রকারের চটের আসন, পাপোষ, আঁশের সাজি, এম্ব্রয়ডারী, নারিকেলের আশের বা চুলের

ঘড়ির চেন্; কাপড়ের পাড়ের পর্দ্দা, বালিশের ঢাকনা, বিভিন্ন প্রকারের চিত্র, ঝিনুকের বোতাম, পেপার-ওয়েট, কাঠের পুতুল, মাটির এবং কাঠের ছাঁচ, নারিকেলের মালার বাটী, চায়ের পেয়ালা, ফুলদানী, ভাঙ্গা পাথরের সন্দেশের, ছাঁচ দড়ি বা শোনের সিকা, খেজুর এবং নারিকেল পাতার টুপী, পাখা, ব্যাগ, কাগজের পাখা, বেতের ঝুড়ি, ঝাঁকা, বাস্কেট, সাজি ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকারের নারিকেলের খাবার (বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটা)।

কেন্দ্র সমিতির এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করিবার বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন।

বিনীতা

শ্রীহেমলতা দেবী

সম্পাদিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—

বর্ত্তমান বর্ষের কেন্দ্র-সমিতির প্রাপ্য বার্ষিক চাঁদা যদি আপনাদের না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পৌষ মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি ১৫শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। আগামী বর্ষে উপযুক্ত ভাবে ইহার কার্য্যপরিচালন করিবার জন্য সমগ্র মহিলা সমিতির সভ্যাগণের মঙ্গলেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সভ্যাগণ সমিতির ভিতর দিয়া নারীজাতির মঙ্গলকার্য্যসাধনে সাহায্য করিবেন। কেন্দ্র-সমিতির কার্য্যের সফলতা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা-সমিতির উপর নির্ভর করে। নানাস্থানে ছোট ছোট মহিলা-সমিতিসমূহের সমষ্টিগত কার্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতি গঠনের সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহিলা সমিতি সুপরিচালিত, সুগঠিত এবং প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবে।

১৪শ বৎসর পূর্ণ হওয়ার বিলম্ব না থাকায় অনতিবিলম্বে কেন্দ্র সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী লিখিত হওয়া প্রয়োজন; তজ্জন্য সমস্ত মহিলা সমিতির কার্য্যবিবরণী অবিলম্বে কেন্দ্র সমিতির কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কি কি বিষয়ে মহিলা সমিতির বিবরণী প্রদান করিতে হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ—(১) মহিলা সমিতি স্থাপনের ইতিহাস, (২) উদ্দেশ্য, (৩) বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা, (৪) জনসেবার কার্য্য, (৫) পরস্পর ভাবের আদান প্রদান ও মেলামেশা বিষয়ে চেষ্টা, (৬) মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার, (৭)মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য্য, (৮) গৃহশিল্প-শিক্ষা (ক) গৃহশিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ, (খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কিনা? (গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, (ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়াছেন, (ঙ) গৃহশিল্প-শিক্ষা করিয়া কতজন মহিলা মাসিক কি পরিমাণ উপার্জ্জন করিতেছেন, (চ) আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য মাসিক কি পরিমাণ হইতে পারে, (ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কিরূপ ব্যবস্থা আছে, (জ) কোন শিশু-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা, (ঝ) নিম্নলিখিত শিল্প ও চারুকলার কোন্‌গুলি সমিতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেলাই ও কাট-ছাট, রিপুকর্ম্ম, সূচিশিক্ষা চিকণের কাজ, লেস, আসন, কাঁথা, বেত ও বাঁশের কাজ সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, পাটের ও শোনের দড়ি প্রস্তুত, নানা প্রকার মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত, মুড়ি ভাজা, বড়ি, লিখিবার কালী তৈয়ারী, সাবান প্রস্তুত, কাপড় ও কাগজের ফুল তোলা, তালের পাখা পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত, সুপারী কাটা, পাপোষ নানা প্রকার উলের কাজ রেশমের সূতা তৈয়ারী, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন আলিপনা, মাটির, কাপড়ের ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, সুতা ও কাপড়ে রং করা প্রভৃতি (ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয় কিনা? (৯) মহিলা সমিতির কয়টী অধিবেশনে কি কি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে, (১০) সমিতির স্থায়ী গৃহ আছে কিনা (১১)সমিতির সভায় যাতায়াতের উপায়, (১২) সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি কিরূপ, (১৩) সঙ্গীতগান এবং উদ্যান-রচনায় মহিলা সমিতির কার্য্য (১৪) গো পালন

কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে সভ্যাগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সমিতির সহায়তায় তাহার আলোচনা, (১৫) বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা বিধান, (১৬) পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্যলাভের জন্য সমিতির সভ্যাগণের চেষ্টা, (১৭) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে সাহায্য (১৮) পল্লীসংগঠনে মহিলা সমিতির কার্য্য (১৯) ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা। রোগীর সেবা; আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্যদান, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদান (২০) বিধবাদের জন্য সমিতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা (২১) সমিতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ (২২) বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব।

মহিলা সমিতি-পরিচালনে উৎকৃষ্ট কার্য্য করার জন্য কেন্দ্র সমিতি মহিলা-সমিতিকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।

বিনীতা
শ্রীহেমলতা দেবী
সম্পাদিকা

কেন্দ্র সমিতির কথা

ডোমজুড় মহিলা সমিতি :—গত ৭ই নভেম্বর কেন্দ্র সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ এবং প্রচারক শ্রীযুত সুধীরলাল সরকার ডোমজুড় পল্লীসংস্কার নারীমঙ্গল সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। প্রথমে তাঁহারা সমিতি ও সমিতি-পরিচালিত প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

ঐদিন অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় ষষ্ঠীতলায় একটী মহিলা সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় প্রায় দুশতের অধিক মহিলা ও প্রায় ১ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভ সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলে শ্রীযুত সরকার ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিবিধ মহিলা সমিতির কার্য্যাবলী ও জাতি গঠনে মহিলাদের স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

কেশবপুর সভা :— ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে কেশবপুর উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মহিলা ও পুরুষের একটী সম্মিলিত সভা হয়। শ্রীযুক্তা ঘোষ ও শ্রীযুত সরকার এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ প্রথমে মহিলা সমিতি সংগঠন ও সমিতির উপকার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে শ্রীযুত সরকার মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা ও মহিলা সমিতি দ্বারা জাতীয় উন্নতির কত প্রকার কাজ করা সম্ভব হইতে পারে তৎ সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা দেন। প্রায় ৪ শত মহিলা ও পুরুষ এই সভায় যোগদান করেন।

বারুইপাড়া মহিলা সভা :— ৯ই নবেম্বর বাড়ুই পাড়ায় একটী মহিলা সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুত সরকার "মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ" এবং মহিলা সমিতির উপকারিতা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

জয়পুরে মহিলা সভা :—গত ২৪ শে নভেম্বর জয়পুর (হাওড়া) সুরঙ্গময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলাদের সভা হয়। প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক ল্যাণ্ঠান সহযোগে মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য, গঠন ও পরিচালন প্রণালী এবং কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং পরের দিন স্থানীয় আর্য্য সমিতির উদ্যোগে কুন্দলিয়া গ্রামেও মহিলাদের সভা হয় এবং পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্ঠান সহযোগে বক্তৃতা করেন।

পুস্তক পরিচয়

চম্পা ও পটল—প্রণেতা স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, প্রকাশক, তৎমাতা, তারাবাস ৪৬ ঝাউতলা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা ও গানই বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টনের প্রধান ধারা। বাঙ্গলার বহু নারী তাহাদের মর্ম্মব্যথা কবিতায় ব্যক্ত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্যও পুষ্ট হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা দেবী বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগের ইংরাজি শিক্ষিত মহিলা, সরল ও স্বচ্ছ ভাষায় কবিতা লিখিয়া প্রাণের আবেগ প্রকাশ যেমন করিয়াছেন, তেমনি ভাবের গভীরতায় পূর্ণ হইয়াছে তাঁর কবিতাগুলি। ছোট বইখানি হইলেও পাঠে সকলে তৃপ্তি পাইবে। এ ধারার লেখা কবিতা আজকাল বিরল।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখিয়াছেন—প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। ভাষার সচ্ছতা ভাবের সরলতার সংবেদন।

প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণা করলেও বাংলা ভাষার মর্য্যাদা কোথাও অতিক্রম করেনি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়াছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। তার জীবনে যত সে পেয়েছে বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে অশ্রুধারার মতো।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।

পটুয়া সঙ্গীত—প্রণেতা শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কেবল যে বাঙ্গলায় সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত তাহা নয় তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের এক সুপ্রতিষ্ঠ সাধক। পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করিয়াও তিনি বাঙ্গলার যা কিছু নিজস্ব যা কিছু সুন্দর, যা কিছু গৌরবময় এই আত্মবিস্মৃত জাতির নর নারীর সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। পট শিল্প বাংলার নিজস্ব নূতন ধারায় অঙ্কিত হইয়া জগতের গণচিত্র সমাজে এক সময় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহারই ইতিহাস দিয়া দত্ত মহাশয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলার পটুয়াগণ কেমন করিয়া জাতির মনোরাজ্যের উচ্চ আদর্শ অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা সঙ্গীত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছিল এবং কেমন করিয়া বাংলায় পটুয়াগণ পট প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে তাহারই ইতিহাস পুস্তকে দিয়া গণশিল্পের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বাংলার সরল পল্লীবাসীর জীবন যাত্রার সম্যক পরিচয় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সংকলিত পটুয়া সঙ্গীত গুলির মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে। কেমন করিয়া পটুয়াগণ তাহাদের সহজ কবিত্ব শক্তির মধ্য দিয়া অতি সুন্দর অথচ সহজ ভাবে বাংলার সাধারণ গৃহস্থ দম্পতির জীবনের ধারা শিবদুর্গালীলা-চিত্রে বর্ণিত করিতেন তাহারই পরিচয় এই গ্রন্থ খানিতে পাওয়া যাইবে। বাংলার কৌতুক ও রস-সাহিত্য কেমন করিয়া সাধারণ গণ-সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিত, তাহাই তিনি, চাষা পালা, 'গো পালন', 'পাঁচ কল্যাণী' গীতগুলি সংগৃহীত করিয়া বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লিখিবার এক শ্রেষ্ঠ উপকরণ দান করিয়াছেন।

পটুয়ারা সমাজে নিম্নস্তরের ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইলেও তাহারা তদানীন্তন বাংলার জাতীয় চরিত্র গঠনে এবং ধর্ম্ম অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার প্রধান পুরোহিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। এই অবহেলিত জাতির মহিমা ঘোষিত করিয়া উচ্চপদস্থ দত্ত মহাশয় কেবল পটুয়াদের গৌরব বৃদ্ধি করেন নাই, গণজাগরণের যুগে গণ শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাংলার পটশিল্প প্রথমে কাপড়ের উপর অঙ্কিত হইত, পরবর্ত্তী সময়ে কাগজই পট অঙ্কনের প্রধান আধার হইয়া ছিল। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাংলার এই লুপ্তপ্রায় অপূর্ব্ব পট শিল্পের প্রতি বাঙ্গালী শিল্পীদের চিত্ত বহুদিন হইতে আকর্ষিত করিতেছেন। প্রদর্শনী, বক্তৃতা, পট ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কেবল ক্ষান্ত হন নাই। পটুয়া সঙ্গীত পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন দান করিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা দেশ বাসীকে প্রদান করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং বাংলার উপকার করিলেন। তাঁহার অমূল্য পল্লীশিল্প সংগ্রহালয়ের কতকগুলি পটচিত্র মুদ্রিত হইয়া পুস্তকখানির গৌরব ও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধুনা বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও প্রসারের জন্য পুস্তক মুদ্রণ করিতেছেন। পটুয়া সঙ্গীত মুদ্রণ করিয়া তাঁহারা বাংলার লুপ্তপ্রায় পটশিল্পের পরম উপকার করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ

বেড়েই চলে

চায়ের চাহিদা যে-ভাবে বেড়ে চলেছে তা' থেকে বোঝা যায় যে আমাদের জনসাধারণ এই সুন্দর পানীয়টির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশি করে' উপলব্ধি করছে। চায়ের ব্যবসার সঙ্গে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য এবং জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বোধহয় এই কারণেই চায়ের প্রচেষ্টা সব দিক থেকেই যে সাহায্য এবং প্রশংসা পেয়েছে, তা' খুব কম প্রচেষ্টার ভাগ্যেই জোটে।

বহু স্বদেশপ্রেমিক এবং দূরদর্শী নেতা চা-কে জাতীয় কল্যাণের উপায় বলেই মনে করছেন। তাঁদের বিশ্বাস এ- প্রচেষ্টার ফলে জাতি সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকেই এগিয়ে যাবে। দক্ষিণ ভারতের একজন প্রধান কংগ্রেস নেতা চা-কে 'দরিদ্রের বন্ধু' আখ্যা দিয়েছেন। যে-সব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীরা সুরাবর্জন আন্দোলন সুরু করেছেন সেই সব প্রদেশে ভারতীয় চা-প্রচার সমিতি নির্দোষ ও সত্যিকারের শক্তিদায়ক পানীয় চায়ের প্রচারের দ্বারা তাড়িখোরদের কু-অভ্যাস বদ্‌লাতে চেষ্ট করছেন। এই প্রচেষ্টা সর্বত্র কিরূপ সুখ্যাতি লাভ করেছে তা' আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলির লেখা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

কল্‌কাতার বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী দৈনিক "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিছুদিন আগে লিখেছেন :

"চা খাবার অভ্যাস এখন এদেশে স্থায়ী হয়ে গেছে; আর, যে উদ্যম নিয়ে চা-প্রচার-সমিতি তাঁদের প্রচেষ্টা সুরু করেছেন তাতে খুবই আশা হয় যে এ-অভ্যাস আরো বহুবিস্তৃত হবে।

কল্‌কাতার আর একখানি সুপরিচিত দৈনিক, "যুগান্তর" লিখেছেন :—মদ্যপানের কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া দেশের এতগুলি লোক আজ সন্তুষ্ট থাকিতেছে।

যে-দিক দিয়েই দেখা যাক্ আজকের দিনে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে চায়ের প্রচারের ফল আমাদের দেশে ইতর-ভদ্র সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হয়েছে। চায়ের আনন্দময় পাত্র আজ জাতীয় কর্মকুশলতা ও চরিত্রবত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-সম্পর্কে বিলেতের বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার ম্যাল্‌কম্ ওয়াট্‌সন এল্. এল্ ডি. এম্. ডি. সি. এম্. ডি. পি. এইচ-এর একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ছে। স্যার ম্যাল্‌কম বলেছেন :—ব্রিটেনে চা খাবার অভ্যাসের প্রসার এবং এখানকার বড় বড় সহরে এই চমৎকার তৃপ্তিদায়ক পানীয়টি উপভোগ করবার সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধির ফল যে এ-দেশের পক্ষে বিশেষ ভালো হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মধ্যপ্রদেশে আকোলা জেলার ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার ডি. ভি. রেজ, আই, সি, এস্ সম্প্রতি তাড়ির দোকান থেকে পরিবর্ত্তিত কয়েকটী চায়ের দোকান পরিদর্শন করে লিখেছেন : "আমি আকোটের তহশীলদারকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকালে কতকগুলি চায়ের দোকান পরিদর্শন করলাম। সহরের ভিতর ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান বোর্ড যে তিনটি চায়ের দোকান খুলেছেন সেখানে আগে যারা মদ খেতো তাদের অনেকেই আসে। চা এদেরকে মদের নেশা ছাড়াতে খুবই সাহায্য করেছে।

ক্যানসার রোগের অভিনব চিকিৎসা

সর্ব্ববিধ ক্যান্সার রোগ :—জরায়ু ক্যানসার, জরায়ুর স্ফীতি, অসহ্য বেদনা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শ্বেত স্রাব, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি রোগে সপ্তাহ মধ্যেই আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্ভবস্থলে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ না করিয়াও চুক্তিবদ্ধ ভাবে চিকিৎসা করা হয়।

রাজবৈদ্য—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভিষক্‌শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যারত্ন-কবিভূষণ।

২০৬।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane and Published by him from60B, Mirzapur Street. Calcutta.

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
Reg. No.........
Book No.........

পঞ্চদশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৬ | ২য় সংখ্যা

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার
নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের
এই ডানা,
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই
রূপ কথার
পথ ভুলে যাই দূর পারে কোন্
চুপ-কথার,

পারুল বনের চম্পারে মোর
হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি'
মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাতসাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দেশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার
দিই হানা
মনে মনে॥

তারিখ
২,১২,৩৯ সন

সংসারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমলতা দেবী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘর-সংসার কেমনটি ছিল, সংসারের মধ্যে থেকে সংসারী হয়ে কি ভাবে তিনি দিন কাটাতেন, তার দু-একটি চিত্র দেখাতে ও দু-একটী কাহিনী শোনাতে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি ঐ পরিবারের পুরানো দিনের পুরানো বৌ, পুরানো কথা আমার জানা থাকার সম্ভাবনা। যেটুকু দেখেছি ও স্মরণে রাখতে পেরেছি তারই দু-চারটি খবর তাঁদের অনুরোধে আজ লিখতে উদ্যোগী হচ্ছি।

কবির সংসার-চিত্রে যদি কেউ সুন্দর একটি সুবিন্যস্ত সাংসারিকতার রূপ দেখার আশা করেন তবে তাঁকে হয়তো নিরাশ হ'তে হবে।

সাংসারিক পারিপাট্য ও শ্রীবৃদ্ধি বলতে সাধারণত যা বোঝায়—ঝাড়লণ্ঠন-ঝোলানো বৈঠকখানা, বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুম, পত্নীর গা-ভরা গহনা, আলমারী-ভরা বারানসী, বোম্বাই, রেশমী শাড়ী, বনিয়াদী ঘরের উপযোগী ঘরভরা রূপার বাসন, ব্যাঙ্কে জমানো মোটা সংখ্যার টাকা, ঘরের দেওয়াল কেটে বসানো লোহার সিন্দুকে তাড়া-বাঁধা কোম্পানীর কাগজের স্তূপ—এর কোন কিছুই ছিল না কবির কোন দিনও। তেতালায় নিজের শোবার ঘরের পাশে খোপের মত ছোট একটি ঘর বানিয়ে তাতেই ব'সে কবি লিখতেন। পাশে সেই মাপেরই আর একটি খুপরী ঘরে ছিল বসার ব্যবস্থা। এরা কবির নিজস্ব রুচির পরিচয় দিত লোকের কাছে।

কৈশোরে কবি নিজের গায়ের আলোয়ান বেচে বই কিনেছেন শোনা গেছে, সংসারী হয়ে নিজের সংসারটিকে নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন দেখা গেছে। কবির কন্যারা তৎকালীন প্রচলিত ধারায় লোরেটো, বেথুনে পড়ে নাই, পুত্র সেণ্টজেভিয়ার্স, প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয় নাই। নিজের আদর্শের আবেষ্টনে কবি তাদের মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকে। কবির সৃষ্ট ভবিষ্যৎ আদর্শ শিক্ষালয়ের গোড়াপত্তন এদের নিয়ে।

প্রতিভার বরপুত্রদের প্রতিভার প্রভাব ছড়ায় ঘরে-বাইরে সর্বত্র। চলতি ভাবের সঙ্গে লড়াই বাধে তাঁদের পদে পদে, তাঁরা নূতন চোখে দেখেন, নূতন পথ সৃষ্টি করে চলেন, নূতন ভাবের কথাগুলি নূতন ছাঁদে বলেন ব'লে। তাঁদের দৃষ্টিতে যেটি সহজ, সংগত, স্বাভাবিক সাধারণের দৃষ্টিতে সেটি অসহজ, অসংগত, অস্বাভাবিক ঠেকে প্রথম প্রথম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

কবিরা সাধারণত আদর্শের টানে চলেন। সৃষ্টিধর্মী কবি-জাতটি আদর্শ-সৃষ্টির অনুরাগে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। তাঁদের ঘর-সংসার-পরিবার সেই আদর্শ-অনুরাগের গতিমুখে পড়ে সময়ে সময়ে কতকটা আবর্তিত না হয়ে পারে না। স্থিতিশীল সাংসারিকতা আদর্শবাদীর ধর্ম নয়।

অসংসারী কবি-চিত্তে সংসারসাধনা ও কাব্যরচনা সহজে জোড় খায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও নিজের প্রেরণার তাগিদে গুছিয়ে সংসার করতে পারেন নাই কোনদিন। নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে সেই টানে টেনে নিয়ে ফিরেছেন—এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। বাসা-ভাঙা কবি বাসা ভেঙেই এসেছেন চিরদিন, স্থায়ী ভাবে একটি স্থানে বাসা বাঁধেন নাই কোন দিনও। ফলে পরিবারবর্গও বাসা বেঁধে বসতে পারে নাই কোন একটি স্থানে কখনও। আজও কবির বাসা-বদলের বিরাম নাই, কাছের লোকে সবাই জানে।

সংগীতের স্বরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কবি যেমন বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চান নাই।

কবি-পত্নী ছেলেদের দামী পোষাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন, বড়মানুষীর আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না, অভ্যাসে তার গলদ জমে ওঠে অনেক। তোমার সন্তানরা খুব ভাল করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি। শুনে কবি-পত্নী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সুন্দর সুন্দর দামী পোষাকে সাজাবার সাধ। আশেপাশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শই অনুসরণ ক'রে চলতেন।

সাধারণ লোকদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব—না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙ্গে গড়তে চাইতেন তাদের মত অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য। বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরী বাড়ীর এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেকদিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে,—একসঙ্গে একই খাদ্য।

কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।

বিলাস'বর্জন, উপকরণ বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে-সময় কবির মুখে। মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো রং বেরঙের প্রজাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলঙ্কার-বহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন—অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ চিত্তির করে। মুখে রং মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়?

আমাদের ধরাধরিতে এক দিন কবি-পত্নী কানে দুটি দুল ঝোলানো বিরবৌলী পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশমাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দিলেন। টানাটানি ক'রে আমরা হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বিরবৌলী কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশী। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না, এই ছিল তাঁর ভাব। বড় বড় ভাসুরপো ভাগ্নেয়রা চারি দিকে ঘুরছে—আমি আবার সাজব কি—তাঁর নিজের মুখের কথা।

কবি, পিতার শেষ সন্তান, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

কবিপত্নী একবার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন ব'লে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবি-পত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন [illegible] পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র—বুঝতে [illegible] লাগে।

বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের [illegible] বড় কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্র বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালীর ভার থাকৃত কবি-পত্নীর হাতে, তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর*। খাওয়া হ'ত চমৎকার, কবি-পত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, "নীচে ব'সে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘী, চাই সুজি, চিনি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরী হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, [illegible] হয়েছে খুব।" আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, "[illegible] তো কখনও 'না' বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা ও তোমার মত গিন্নি হ'লেই হয়েছে [illegible] কি, দু-দিনে ফতুর।" কবি-পত্নী ভাসুরপুত্রের (আমার স্বামীর) নাম করে বলতেন, "সে সংসার বোঝে, তার [illegible] কাজ ক'রে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন।"

স্নেহাস্পদ বলেন্দ্রনাথ একবার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সকালে দুধ-জলখাবার খাওয়ার পরে ছেলের দল [illegible]

---

* দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র)।

আমি বেড়াতে বেরোতুম। বলেন্দ্রনাথ সঙ্গে থাকতেন প্রায়ই। আশ্রমের পূর্বধারে কতকগুলো কাঁকর-ঢালা উঁচু মাটির ঢিবি—দেখতে ছোট পাহাড়ের মত—তার উপর চ'ড়ে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়া ছিল ছেলেদের একটা খেলা। বলেন্দ্রনাথ এক দিন ছেলেদের সঙ্গে উঠে নামতে পারেন না। কুঠিতে গিয়ে লোক ডেকে এনে তাঁকে নামাতে হয়। ছেলেরা হেসে লুটোপুটি—বলুকাকাকে, বলুদাদাকে চাকরে ধরে নামাচ্ছে দেখে। তার পর থেকে তিনি কখনও ঢিবিতে ওঠেন নি।

তখনকার দিনে এত হাতে হাতে ক্যামেরা ঘুরত না, কথায় কথায় ফটো নেওয়া হ'ত না, নতুবা ছবি দেখিয়ে পাঠকদের খুশী করে দেওয়া যেত।

আশ্রমের আশপাশ ছিল তখন জনমানবশূন্য, কেবল আমরাই অধিবাসী। সন্ধ্যায় কবি নিজের রচনা পড়ে শোনাতেন। "দেবতার গ্রাস" তার অল্প দিন আগেই লেখা হয়েছে।

কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরী করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের এক বার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় কবি-পত্নীর হাতের তৈরী দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর কুশলতা এ সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, "দেখলে, তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।" তিনি চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা-খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্ব্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, "বলুন না কাকীমা কাকামশায়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।" কবি-পত্নী বলতেন, "তোমরা চেনো না; বললে জেদ আরো বাড়বে; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমন কি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে ছোলা ভিজানো, মুগ-ডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান তখন কার্য্যসূত্রে মাঝে মাঝে কবিকে পতিসরে যেতে হ'ত। কবির শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তখন নিজগ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না ক'রে জামাতার পাতে দিলে কবি "না" বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করত, "এখানে বাবুমশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণ যা দেন তাই খান; একটি

কথা বলেন না—শাশুড়ী কী না!" ভৃত্যরা খুশী মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে, তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

শান্তিনিকেতন কুঠীর দোতলায় এক দিন বিকালে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভাল মিষ্টি কাকামহাশয়ের জন্যে তৈরী করা হোক বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।" বুঝলুম কাকীমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন ক'রে সেদিন কথাটুকু মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েছিল।

এই বার উপকরণ-বর্জনের পালা। সংসার-সরঞ্জাম সব কিছু ফেলে চলো যে-পথে কবি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল তাঁর আর এক দিকের আর এক ভাবের কথা।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম, উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েক বার। যাত্রাকালে কবির মুখে এক কথা—উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিষ—বঁটি কাটারি, কুরুণী, বারকোষ, কড়া, খুন্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটেমটে বলতেন "এ-সব জঞ্জাল জড়ো করা কেন?" যেন দুখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভাল হয় কবির মতে।

পথযাত্রায় গৃহস্থালী সরঞ্জাম দু-একটি বেশী সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ীর মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হ'ত না. কবি-পত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক ক'রে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন "দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি ক'রে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, ভাজো শিঙাড়া, ভাজো নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হ'লে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হ'লে জিনিষ আসবে কোথা থেকে সে-কথা বলে কে।"

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে ফেলতে মনে কোন দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শপ্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন্ কোন্ সংকটে জড়িয়ে ফেলে এ ভাবনা কবি-পত্নীর মনে থাকত। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন; কবি বিপন্ন হ'লে পরিবারটিরও বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।

স্বামী-সন্তানের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা পত্নী ও জননীর স্বাভাবিক ধর্ম! সকল জননী, পত্নীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের পথেই এই আদর্শের গতি। পুরুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বাঁচায়। ঘরে বাইরে পুরুষ ও নারীর এই আদর্শ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশেষ অধ্যায়।

কবির মুখে "ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো" শুনে কবি-পত্নী বলতেন, 'ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে এক কথায় ফকির সাজা চলে না।' পতি-পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাবে কবি-পত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পরে কবি পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি অধিকারের অল্প কয়েক বৎসর পরেই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রে লেখাপড়া ক'রে ছেলেদের নামে দেবার জন্য কবি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—তার মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও ছিল। দলিলাদি তৈরীর খাড়া পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিল। কবির জনৈক নিকট আত্মীয়—ছেলেরা এখন ছোট, এখনই এ কাজ করা সংগত হবে না, ইত্যাদি অনেক কারণ দেখিয়ে তখনকার মত কবিকে

সে কাজ হ'তে নিরস্ত করেন। বিষয়ের বোঝা নামাবার সেই একান্ত আগ্রহ কবির, আমাদের চোখে এখনও স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। নিজের সমস্ত বাংলা পুস্তকের কপিরাইট বিক্রয় ক'রে শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক ধারে একটি নারীবিভাগ গড়ে তোলার জন্যও কবি সে-সময় অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। দেওয়ার বেগে কবি তখন অধীর সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ সাজে সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, "এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ সম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই। বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে সে-সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।"

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিনী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙ্গে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন তার ছাপটী মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি একদিনের জন্যও দেন নাই।

স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্তরূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবি-পত্নী অনেক বার বলতেন, "আমাকে বল্লেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!" জননীর শেষ সন্তান শমী তখন শিশু। ছেলেদের সে সময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাঁদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারতেন না।

সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।

সন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ২৩, ১৯০২), রবিবার, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নী পরলোকগমন করেন। আমি সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। নিজে সে সময়ে যেতে পারি নাই, রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ীর মৃত্যু হয়েছে, কাকা মশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন কাউকে কাছে যেতে।" প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি ক'রে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নী-বিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন, "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া, নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।" ভাগ্যবতী কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন—কবির সংসার গেল ভেঙে; সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্য্যন্ত।

অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট পর্বে হ'তে চলেছে পরিসমাপ্ত।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ [প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

ছোট গল্প

(১২৯৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রচর্ত্তী, সরস্বতী, এম, এ,

"উপন্যাস শ্রেণীর গ্রন্থ পূর্বকালে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। নায়ক-নায়িকার কথা লিখিতে হইলে রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিতে হইত। বীরত্ব, সতীত্ব ও সাধুত্ব লইয়া কাব্য লিখিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির মধ্যে যে সব উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহারই মধ্য হইতে কোনও একটি বাছিয়া লইতে হইত। এখন অনিবার নগেন্দ্র খগেন্দ্র অমলা বিমলার সৃষ্টি হইতেছে, সেকালে কিন্তু নিয়মিত কয়েকটি প্রসঙ্গ ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইবার রীতি ছিল না; সকলই ধর্ম্মের নামে লিখিত হইত। সাহিত্য ধর্ম-প্রচারের একরূপ যন্ত্রবিশেষ ছিল, ধর্মের নামে মধ্যে মধ্যে অধর্মের কথা কাব্যে না থাকিত এমন নয়; তাই এই ধর্ম-রাজ্যে বিদ্যাসুন্দরেরও উদয় হইয়াছে; কিন্তু উহাও অন্নদামঙ্গলের একাংশভুক্ত হইয়া ধর্মের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছে—গৃহস্থের বধূগণও তাহা পড়িতেন, কেহ আপত্তি করিতেন না। তাই বলিয়া-ভারতচন্দ্রকে অমান্য করিও না, তিনিও ধর্ম্মের পাণ্ডা হইতে পারেন, তারকেশ্বরের শ্রীমান্ মোহান্ত যেরূপ পাণ্ডা, ইনিও সেরূপ। কিন্তু সামান্য মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপ হইতে ইহাদের কার্য স্বতন্ত্র, কারণ তাহা আধ্যাত্মিক ও ব্যাখ্যাযোগ্য।

পাণ্ডারা সাহিত্য-সংসার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। এখন কত আয়েসা ও সমানী উৎপন্ন হইয়া সাহিত্যকে নূতন সাজে সজ্জিত করিতেছে, এখনকার কল্পনা আকাশে মন্দির নির্মাণ করিয়া সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিতেছে; কিন্তু তখনকার দেশের রুচি ঐরূপ ব্যাপারে কখনও স্বীকৃত হইত না। ধর্ম-প্রসঙ্গ ব্যতীত প্রতিভার দিগন্ত উজ্জ্বলকারী শক্তির বিকাশ দেখিলেও তাহারা প্রণত হইত না। প্রাচীন শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ রচিত না হইলে কবিতা-প্রতিভা মিথ্যা হইয়া যাইত। কল্পনা না ছিল এমন নহে; কল্পনা অবারিত পক্ষে দ্যুলোক ভূলোকে বিহার করিত; কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত হইতে উপাখ্যানটি গ্রহণ করা চাই। ধর্মের সঙ্গে একটু সংশ্রব থাকিলে পর্ব্বত-শিখাগ্রে পদ্মের বিকাশ হইতে পশ্চিম দিগ্বিভাগে ভানুর উদয় পর্য্যন্ত সকল কথাই বিশ্বাস করিতে লোক প্রস্তুত হইত। কবিগণ হনুমানের কক্ষতলে সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেন, ইছাই ঘোষের কবন্ধে মস্তক যুক্ত করাইতে পারিতেন, শতবর্ষের ছিন্ন কন্দর ন্যায় লখিন্দরের গলিত শবে পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন! সেই কথা শুনিয়া কাহারও চক্ষে দর দর ধারা বহিত, কেহ আত্মহারা ও বিমোহিত হইয়া কবির চরণে জীবন বিকাইতে যাইত। মঙ্গলচণ্ডী কি শনিঠাকুরের কথা যে পুস্তকে আছে তাহা পড়িবার কালে ভক্তগণ প্রতি পত্রে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতেন। বেহুলার ক্রন্দনে পদ্মার সান্ত্বনা-বাক্যে, কি ঢেকুর পালা শুনিয়া হো হো করিয়া করুণ অশ্রুপাত করিতেন। ইহার এক কথা মিথ্যা হইলে বক্তার ত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। উদাহরণ, আমার ঠাকুরমাকে একদিন দুর্গেশ-নন্দিনীর গল্পের সার শুনাইয়া ছিলাম, প্রথম প্রশ্নই এই 'গল্প সত্য কি না'; আমি বলিলাম 'তোমার শনির পাঁচালির সদাগরের কন্যা যে বোয়ালের পেট হইতে অলঙ্কার পরিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা কি সত্য!' এই প্রশ্ন শুনিয়া, পাছে আমি শনির বিরাগভাজন হই, এই জন্য তিনি ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ শ্রোতাদিগের স্কন্ধে গন্ধমাদনের মত গুরুভার চাপাইয়া দেওয়াও সহজ। অথচ একটা তৃণের ভার বহনেই তাহারা অস্বীকৃত।

বঙ্গে এই জন্য মৌলিক গল্পের সৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান ব্যতীত চাঁদ সদাগরের কথা, লাউসেনের কথা, বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের কিছু নাড়াচাড়া হইয়াছে। কিন্তু কোনটিও কবিগণের মনগড়া গল্প বলিয়া বোধ হয় না।"—'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম' দীনেশচন্দ্র সেন, সাহিত্য ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র সংখ্যা।

উপরের উদ্ধৃত অংশে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের ও তাহার পাঠক পাঠিকা এবং শ্রোতাদের মনোভাবের কিছু ধারণা পাওয়া যায়, অধিকন্তু সাধারণের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হয়।

সুতরাং এই ধর্ম্মপ্রবণ ও সংস্কারান্ধ দেশে একটা সম্পূর্ণ বৈদেশিক চিন্তাধারা কিরূপে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহাই আশ্চর্যজনক। যে দেশে উপন্যাস বলিয়া কোনও জিনিষ প্রচলিত ছিল না, সেই দেশে ছোট গল্প স্থান পাইল, ইহাই অদ্ভুত ব্যাপার।

দূর পাশ্চাত্যের বিজয় অভিযান পরাধীন প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, নতুবা তাহাদের রাজনীতিগত শাসনতন্ত্র অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত, সামাজিক ও আচার-ব্যবহার মূলক জয়ের পরিকল্পনা তাহারা করিয়াছেন। তাই বিজয়ী পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছিল।

ছোট গল্প এদেশের নহে, ইহা সম্পূর্ণ বৈদেশিক। এ দেশের যাহা নিজস্ব, তাহা এই প্রবন্ধে প্রারম্ভে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিতে বলা হইয়াছে এবং তাহাতে দেখানো হইয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে কিরূপ ধর্ম বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ গল্প লিখিতে হইলেও, এমন কি বিদ্যাসুন্দরের গল্প লিখিতে হইলেও অন্নদামঙ্গলের নামকরণ আশ্রয় লইতে হইত, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে বিজয়ী ইংরাজ এ দেশের সেই বদ্ধমূল সংস্কারকেও হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া নিজের সিংহাসন অবাধে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাই নবীন সাহিত্যের নবতম শাখা ছোট-গল্পের প্রথম প্রবেশ এই বাংলা দেশে।

... .. "উপন্যাস ও ছোট-গল্পে অভেদ বিষয়ক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ছোট-গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রচারিত হইবার প্রাক্কালে উপন্যাস ও ছোট গল্পে বিশেষ প্রভেদ করা হইত না। তখনকার দিনে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী সাহিত্যিকগণের অক্ষয় লেখনী বিদেশীয় সাহিত্যশাখাভুক্ত উপন্যাসের অনুকরণে এই দেশীয় আদর্শ, চিত্র, চরিত্রাবলম্বনে অমর উপন্যাসাবলী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গদেশ বাসীরাও সে সমস্ত চমকিত হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত উপন্যাসের যে গুলি ক্ষুদ্র আকারে লিখিত হইত সেই গুলিকেই পাঠক পাঠিকা ছোট-গল্প আখ্যা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই নবসজ্জার তথাকথিত ছোট গল্পগুলিকে যথার্থই এই দেশীয় প্রাচীন গল্প, পুরাণের গল্প, উপনিষদের গল্প, হিতোপদেশের গল্প, নীতিগল্প, পারস্য রজনীর দৈত্যদানবের গল্প, ঠাকুরমা ঠাকুদার ভূত প্রেত রাক্ষস খোক্ষসের গল্প হইতে পৃথক ভাবে দেখিতেন। তাঁহারা ইহাতে অধিকতর আনন্দ পাইতেন, কারণ একে ছোট গল্প নূতন ধরণের ছিল, তাহাতে আদিরসাত্মক ভাবও ইহাতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইত।

কিন্তু কিছুকাল পর হইতে উক্ত ক্ষুদ্র আকারের উপন্যাসগুলির (ছোট-গল্প বলিয়া পরিচিত) অনুকরণে যে সবস্ত ছোট গল্প রচিত হইতে লাগিল তাহাতে আধুনিক কালের ছোট গল্পের ন্যায় চরিত্রাঙ্কণ একমুখিতা করুণান্ত প্রভৃতি আবশ্যক লক্ষণগুলি থাকিত না, তাই এমনও দেখা গিয়াছে, সেকালের ছোট গল্পগুলি অধিকাংশ নীতিমূলক রচনা হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের ধর্ম্মপ্রবণ ভাব যেন ইহাতে আদিতে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে এবং ছোট গল্প লেখক যেন কিছুতেই সেই মন্ত্রমুগ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রেমমূলক ছোট গল্প লিখিতে বসিয়া যেন ধর্ম্মের ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"অজ্ঞাতনামা ছোট গল্প লেখকবর্গ শীর্ষকে বলা হইয়াছে "রচনার সহিত আত্ম পরিচয় প্রদান করিবার প্রথা তখনও বোধ হয় হইয়া উঠে নাই" কিন্তু এখানে ইহাও ইঙ্গিত করা হইতেছে ছোট-গল্প লেখকবর্গ ঐরূপ প্রেমাত্মক, আদি রসাত্মক ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ

করিয়া বোধ হয় নিজের নাম প্রকাশ করিতে লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করিতেন, নতুবা এত অধিক সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ছোট-গল্প লেখক তখনকার দিনে কিরূপে অত অসংখ্য ছোট-গল্প মাসিক পত্রিকাদিতে লিখিলেন !

"আলোচিত গ্রন্থ তালিকায়"ইহা স্পষ্টাক্ষরে দেখানো হইবে, যত জন ছোট গল্প লেখক পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের যত ছোট-গল্প আলোচনার্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার তুলনায় অজ্ঞাতনামা ছোট-গল্প লেখকদের ও তাঁহাদের রচিত ছোট-গল্প সমূহের সংখ্যা নেহাৎ কম নহে।

সে যাহা হউক উপন্যাস ও ছোট-গল্পে অভেদ না করিয়া ছোট-গল্প লেখক বলিয়া জন সাধারণের অব গতির জন্য পরিচিত করিয়া, সকল লেখকের পূর্বে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিলে) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া অনুমান হয়।

"মধুমতী" নামক ছেট-গল্পটিতে "শ্রী পূঃ" সঙ্কেতে যে পরিচয় পাওয়া যায় উহার প্রকৃত লেখক কে তাহা অনুমান হইলেও সত্য বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং "মধুমতী"ই বাংলা ভাষার প্রথন ছোট-গল্প বলিয়া উহাকে সম্মান দান করা হইয়াছে।

তবে এই "মধুমতী" লেখক শ্রী পূঃ ব্যতীত ছোট-গল্প লেখকের নাম ও তাঁহাদের ছোট-গল্প যে না পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে, যথা, "পূর্ণ ভক্ত" অথবা, 'পূরণ ভকত" ছোট গল্প-লেখক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, কিন্তু তাঁহাদের তো এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই, যেহেতু এই গ্রন্থের ছোট-গল্প লেখকবর্গকে নির্বাচিত করিবার সময় যে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার বিষয় এই প্রবন্ধের একাদশ পরিচ্ছেদে "চারুচন্দ্র বন্দোপাধায়" শীর্ষকে বলা হইবে, সুতরাং ঐ সমস্ত ছোট-গল্প লেখকের বিষয় কোনও কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা ছোট গল্পের আদি কালের ছোট-গল্প লেখক বলিতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারকে বুঝাইত, কারণ ইহাদের সাহিত্য-প্রতিভা অন্তমুখী হইলেও ইহারা ছোট-গল্প লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছেন।

নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ও শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের বিষয় একটি মন্তব্য করা হইতেছে যে তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্য-জীবনের সমগ্র অবস্থায় বা সময়ে একরূপের লেখক ছিলেন না। তাঁহারা সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন রূপ ভাষায় ছোট-গল্প রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই পৃথক রূপ পাঠক পাঠিকার দৃষ্টির সম্মুখে বিশদ ভাবে ফুটিয়া উঠে।

বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কুক্ষিগত রাখিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার প্রথম সাহিত্য জীবনে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; ক্রমে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাষা বলিয়া বাংলা ভাষাকে স্বীকার করিয়া এবং উহাতে চলতি ভাষার রূপ দিয়া তাঁহারা ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন।

চুরি না বাহাদুরী, ভারতী, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চুরি না বাহাদুরী" ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখকের সর্ব প্রথম ছোট গল্প, "চুরি না বাহাদুরী'তে যে ভাব ও ভাষার নমুনা পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসাজনক বটে।

তখন ছোট গল্প প্রাচীন কালের ধারা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে যে পারিয়াছিল ইহাই অনুধাবন যোগ্য। ইহাতে পুরাতন যুগের পুরাণের, উপনিষদের, হিতোপদেশের, ভূত-প্রেতের, বা আরব্য রজনীর গল্পের নির্মোক নাই, ইহাতে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ভূমিকা বা অবতারণা বা প্রস্তাবনা নাই। অথবা ইহাতে কোনও নৈতিক আদর্শ স্থাপনার মনোভাব নাই। ইহাতে শুধু সরল সাবলীল ভাবের ঘটনার বর্ণনা আছে, যাহাতে পাঠক পাঠিকা রসবোধ করিতে পারে, এবং চমকিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাতে ছোট গল্পের বিধি-নিয়ম আংশিকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। ইহাতে চরিত্রাঙ্কন বলিয়া একটা জিনিষের সম্পূর্ণ অভাব। ইহাতে করুণতা, বিহ্বলতা, কোনও ভাব, বিশিষ্ট অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরুক্তি, নাটকীয় প্রভাব প্রভৃতি মোটেই নাই। তাই এই চোরের হাত সাফাইয়ের বাহাদুরী শিশু-সাহিত্যের উপযোগী।

ইহাকে ছোটদের ছোট-গল্প বলিলেই যেন শোভন হয়। শিশুমনই এই অদ্ভূত ট্রেণে চুরির বৃত্তান্তে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, ছোট-গল্পের শিশু-জীবনে ইহা প্রশংসার্হ। ইহার ভাষাও ছেলেদের উপযুক্ত।

ঘরের অলক্ষ্মী। ভারতী ও বালক, ১২৯৬

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ঘরের অলক্ষ্মী' ১২৯৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে যেন ছোট গল্পের পূর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে 'চুরি বা বাহাদূরী'তে যে জিনিষ কয়েকটির অভাবের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যেন 'ঘরের অলক্ষ্মী'তে পূরণ হইয়াছে।

'ঘরের অলক্ষ্মী' নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বিতীয় ছোট গল্প বলিয়া অনুমিত।

'চুরি না বাহাদুরী'তে যেরূপ চরিত্রাঙ্কনের অভাব 'ঘরের অলক্ষ্মী' ছোট-গল্পে সেরূপ নহে। ইহাতে ভুবনমোহিনীর চরিত্র নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চমৎকার অঙ্কন করিয়াছেন।

ভুবনমোহিনী মেয়েটিই ছোট-গল্পের উদ্দিষ্ট ঘরের অলক্ষ্মী। পিতা হরিহর মুখোপাধ্যায়ের নাকি তাহার জন্মের পর হইতে অমঙ্গল ও অবনতি ঘটিতেছিল। সে প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপসী, কিন্তু ভগবান তাহাকে বধির ও মূক করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। এই বধিরতা ও মূকতার সঙ্গে কন্যার গৃহের অলক্ষ্মী হইবার কি বিধি সঙ্গত কারণ আছে তাহা অনুমান করা যায় না। তাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাহা সমুচিত মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। সকলেই ভগবানের সৃষ্ট জীব, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই সেই সর্ব সাধারণের পিতার অনুগ্রহের পাত্র, সকলেই জ্ঞানে অজ্ঞানে দোষ করে, পাপ করে এবং ভগবান ও তাহাদের দোষের, পাপের শাস্তি দেন। তবে ভাইয়ের শাস্তিতে ভাই কি ধর্ম দেখিতে পারে; দুই সহোদরের একজনে অন্যায় করিলে পিতা যখন সেই জনকে শাস্তি দেন, তখন অন্য ভাই তাহার কাপড়ের খোঁট দিয়া সেই অপরাধী শাস্তি-প্রাপ্ত সহোদরের চোখের জল মুছাইয়া দেয়, সে কখনও বলে না 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, ধর্ম দেখেছি,' তাহা হইলে যে সৌভ্রাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

ভুবনমোহিনীর বৈকল্যের জন্য পিতার এবং সকলের আক্রোশ বিশেষ দূষনীয় বলিয়া ছোট-গল্প লেখক প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভুবনমোহিনীর অঙ্গহীনতা হরিহর মুখোপাধ্যায়ের অবনতির কারণ,—ইহা ধারণা করাতে পিতার মহাপাপ এবং পিতা যে সাফাই করিতেছে যে এই ভুবনমোহিনী অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করায় তাহার পাপে ক্ষতি হইয়াছে, সে মদ্যপ ও চরিত্রহীন হইয়াছে, ইহা পিতার দৌর্ব্বল্য, পাপকে বুঝ দিবার নজির মাত্র।

যে হৃদয়হীনতার আবহাওয়ায় ভুবনমোহিনীর জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, সেই হৃদয়হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে ঐ বাড়ীর গৃহপালিত পশু, বিড়াল-কুকুর। ঐ ইতর জীবেরাও বুঝিয়াছিল যে এই হতভাগিনী বালিকা এই বাড়ীর সকলের তাচ্ছিল্যের বস্তু, তাই ইহারা সকলের তুচ্ছা মেয়েটিকে সহচরী করিয়া আনন্দ পাইত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই "ঘরের অলক্ষ্মী" ছোট-গল্পে যে মায়ের চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অপার্থিব হইয়াছে। মা সুন্দর সন্তানেরও মা, কুৎসিৎ সন্তানেরও মা, মা পূর্ণাঙ্গ সন্তানেরও মা, হীনাঙ্গ সন্তানের মা, মা নীরোগ সন্তানের ও মা, রুগ্ন সন্তানেরও মা। তাঁহার জঠরের সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ, সমান করুণা।

মায়ের পীযুষ-ধারা স্থান কাল পাত্র ভেদে বর্ষিত হয় না, উহা পার্থক্য জানে না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এইরূপ মা সৃষ্টি করিয়াছেন।

"চুরি না বাহাদুরী" ঘটনামূলক কিন্তু "ঘরের অলক্ষ্মীকে শুধু ঘটনামূলক বলা চলে না। ইহাতে দুইটি বিষয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সন্তানের পিতার হৃদয়ের কঠোরতা, আর, সন্তানের মায়ের হৃদয়ের কোমলতা। মায়ের প্রাণ কখনও পুত্রের প্রতি স্নেহহীন হইতে পারে না কিন্তু পিতার মন ঘটনা-বশে কঠিন হইতে পারে। [ক্রমশঃ

রঙ্গপুরের মেয়েলী ছড়াগান

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গলা দেশ যদি "স্বপ্ন দিয়ে তৈয়ারী ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা," তবে বাঙালীর হৃদয়প্রান্তর কাব্যে ভরা। বাঙালীর হাসি-কান্নায় কাব্যের ছন্দ, বাঙালী মেয়েদের ব্রত ছড়ায় কাব্যবস্তু। তাই বর্ষিয়সী মহিলার অঙ্গনে গোময় ছড়া দিবার পূর্ব্বে ছোট্ট মেয়েরা শ্লোক ছড়া আরম্ভ করিয়া দেয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু ছড়ার কথা। ছড়া বলিতে পারিলে কত আনন্দ! বাড়ীর বুড়ীদের নিকট হইতে মেয়েরা ছড়া শিখিয়া লয়। ছড়ার মধ্যে ছন্দের রীতিকে অব্যাহত রাখা হইয়া থাকে। রংপুরের পল্লী অঞ্চলে ছেলে মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করে।

টেপ্‌ড়ি মাই, টেপ্‌ড়ি মাই
হামার বাড়ী যাইস।
আম দেইম, কাঠোল দেইম
ত্বয়ারে বসি খাইস॥
সরু সরু শাখা দেইম
টেপার হাট যাইস॥
না যাওঁ মুই টেপার হাট
নাও ডুবিছে।
নাওর উপর ঢোরাসাপ
ফোপ্পে উঠিছে।'

পূর্ব্বে ছড়া কাটীবার জন্য ওস্তাদী মেয়েদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। এমনকি শাশুড়ী সম্পর্কের হইলেও বিয়ের রাতে সে সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া অনেককে জামাতার সঙ্গে রঙ্গালাপ করিতে হইত। পূর্ব্বে বাঙালার প্রায় সর্ব্বত্র বিয়ের সময় মেয়েরা গান করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সে হারমোনিয়ম, বেহালা, গ্রামোফোন, প্রভৃতি সাহায্যে সিদ্ধ হইতেছে। এসবের দ্বারা আমরা অনেকটা আন্তরিকতা ও প্রাচীন ভাবধারাকে ব্যাহত করিয়াছি। সেযুগের রীতি-নীতির মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।

উত্তর বঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার পল্লী অঞ্চলে এখনো মেয়েরা বিয়ের সময় গান করিয়া থাকে। বিবাহের চারপাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে বরকনের বাড়ীতে গ্রাম্য মেয়েরা গান গাহিয়া থাকে। সে সব গানের মধ্যে অনেক ইতিবৃত্তের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি সংগ্রহের জন্য একদল খামখেয়ালী লোকের আবশ্যক। এখনো চেষ্টা করিলে অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিছুদিন পরে তাহার পাত্তা মিলিবে না।

বিয়ের পূর্ব্বে রংপুরের পল্লী অঞ্চলে যাইটোর পূজা করিবার রীতি আছে; যাইটোর পূজা ষষ্টি পূজার নামান্তর মাত্র। সন্তানের মঙ্গলকে উপলক্ষ করিয়া পূজার প্রচলন হইয়া থাকে। ছেলে হইবার পূর্ব্বে অনেকে যাইটোরের কাছে পুজা মানত করে এবং ছেলে হইবার পর যাইটোরের আয়োজন করে। যাইটোরের বরে যে পুত্র হয় সে একটু ডানপিটে গোছের হয়। যাইটোরের মানত করিয়া যে পুত্র লাভ হয় তাহার বিয়ের সময় উক্ত পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূজার উপকরণ মধ্যে একটি শোলার চোঙার মধ্যে কলা রাখিবার নিয়ম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অঙ্গনের এককোণে "শোলার গাছটি পুতিয়া রাখা হয়। মেয়েরা 'চালন বাতি' হাতে করিয়া তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া গান করিতে থাকে।

আগা হাটের বামনা রে
পাছা হাটের বামনা,
মূলায় বামনা ঠাকুর রে
আগা হাটের কলা।
কলাতি পুচেছে ও বামনা ঠাকুর রে
কি করি মেন আগ্‌বোল হাটের কলা রে
তোমার মাথা হয়েছে পাকা সন।
কোমর হয়েছে ধনুক বান্।
তোমাকে কি সাজে এলায়
ছাওয়ালের বাপরে।

হাটের আগ বিক্রীত কলা কিনিয়া আনিয়া যাইটোর পূজা করিতে হয়। আঁটু কুড়ো বুড়ো সেই কলা কিনিতে গিয়াছে,

---

*আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় বিশেষ ক্লেশ করিয়া অনেক ছড়াগান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কুড়িগ্রামের মুন্সেফ শ্রীইন্দুভূষণ বর্ম্মা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বর্ম্মা আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

কলাওয়ালা তাহাকে দেখিয়া রঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছে তাহা উপরি উক্ত গানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

কলা না পাইয়া হয়ত আঁটকুড়ো বুড়োকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। শেষকালে 'এটেকলা' দিয়া কাজ চালাইতে হয়। মেয়েরা গান করিবার সময় তাহাতে রঙ্গ ফলাইয়া বলিতে থাকে ঃ—

ষাইট মা মোর ষাটিয়া
কলা খায় মোর অটিয়া।
ষাইটোর মায়ের বরে,
ছাওয়া পুল পুল করে॥
কলাতির বাড়ীত কলা নাই
ষাইটোর পূজির মনে নাই॥

ক্রমে মেয়েরা 'চালন বাতি' হাতে করিয়া গ্রাম-দেবতার দুয়ারে যাইয়া গান গায়।

গোপাল ঠাকুরের আগে
কিসের বাইজন বাজে।
হামার বালার বিয়ে হয়,
তারে বাইজন বাজে॥ ইত্যাদি।

বিয়ের পূর্ব্বে হর-গৌরীর পূজা করিতে হয়। 'হরগৌরীর' মিলনকে উপলক্ষ করিয়া বাঙলার প্রাচীন কবিরা অনেক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালীরা হরগৌরীকে সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে আনিয়া একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন। 'হর গৌরীর' পূজার সময় ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া অনেক রঙের গান করা হইয়া থাকে। পূজার উপকরণের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর কেমন কৌশলে তাহা আত্মসাৎ করে, তাহা উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হর গৌরী পোজেরে বামন,
টের চোখে দেখে।
চাইলনের কলা দেখি বামন
নকর পকর করে॥
খালু তা খালুরে বামন,
জল কোঠে পালু।
বাসনার জল দিয়া
মুখ শুদ্ধ করিলু॥
খালু তা খালুরে বামন
গুয়া কোঠে পালু।
চাইলনের গুয়া দিয়া মুখ শুদ্ধ করিলু॥
খালু তা খালুরে বামন।
চূণ কোঠে পালু।
দোলা বাড়ীর বগের গু,
চূণ বলিয়া খালু রে॥

বিয়ের পূর্ব্বে গ্রামের মেয়েরা মিলিয়া পান-সুপারী কাটিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এ রীতির ব্যতিক্রম হয় না। পান সুপারী কাটিবার সময় মেয়েরা সুর ধরিয়া গান করিতে থাকে। মুসলমানী মেয়েরা বলে—

মাথা কাটা গুয়া রে
কাচি কাটা পান।
কিও মিঞাজান।
বইস কালার ধুতি নিয়া
করব আসোর গান রে॥

কল্লা মালি উঠিয়া বলে
মোক সে দিন মান
কিও মিঞাজান॥

বিবাহের জন্য নানারূপ যোগাড় যন্ত্রের সময় মেয়েরা উপভোগ্যরূপে রঙ্গ করিয়া গান গায়।

কলা আলা বাড়ী গেনু মালতি রে
সে কলা হয় বাসিয়া।
ধুনা আলা বাড়ী গেনু মালতি রে
সে ধুনা হয় বাসিয়া রে॥

বিয়ের সব কিছু ঠিক ঠাক্। এদিকে ঘটকের দেখা নাই। ঘটক সময়মত না আসিলে বিয়ের পাকা পাকি কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ঘটক আসিয়া 'মোড়া' ধরিবে, তবে বিয়ের কাজ আরম্ভ হইবে।

ঘটক শালাক ডাক দেওরে,
মাড়া ধরি এলা ও নাইরে
আমার টিকা জমিদারি
মোড়া না লইলে টিকা বইসে নারে॥
জালা বাঁশের নালা
পান সুপারী না খাইলে গলা উঠে না॥

ঘটককেও পান সুপারী খাওয়াইতে হয়, তারপর বিয়ের কাজ আরম্ভ হয়।

উঠানের এক কোণে কলার গাছ পুঁতিয়া রাখা হয়। তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া খই ছড়াইতে ছড়াইতে মেয়েরা সমবেত সুরে গান করিতে থাকে। এ সময় বর কনের পিতামাতা, মামা মামি, পিসা পিসিকে উপলক্ষ্য করিয়া রঙ্গের গান করা হইয়া থাকে।

মাড়োয়ার গোরে গোরে ছিটাইনু রে খই,
বরের মাওটার হেটা ঠোট কই
কি দিয়া খাইবে হামার জলুয়া দই রে
মাড়োয়ার গোরে গোরে ছিটাইনু রে খই
বরের বাপটার হেটা ঠোট কই—ইত্যাদি ॥

বিয়ের সময় কনের মায়ের ছুটাছুটির অন্ত নাই। তাহাকে সব দিকে দেখিতে হয়। তাহার ব্যস্ততাকে লক্ষ্য করিয়াও মেয়েরা গান করে।

ওরে কইনার মাও
লম্বা মাথার ক্যাশ
হাটিয়া গেইতে ঢলিয়া পড়িস্
পাগল করলি কাক্ ॥
ওরে কইনার মাও।
তোর আস্তার বগ্‌লে ঘর
যতলোক পাক পাড়ে,
বিছানার জোগাড় কর
যত লোক পাক পাড়ে
খিলির জোগাড় কর ॥

বিবাহের আনুষ্ঠানিক কাজ কর্ম্ম চলিতে থাকে। কন্যা সমর্পণ করিবার পর পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মনে বিয়োগের ছায়া-পাত হয়। এতদিন যাহাকে সুখে দুঃখে পালন করিয়া আসিয়াছে তাহাকে পরের হাতে সমর্পন করিতে হয়। তাহারা যেন শ্রীদুর্গাকে মহাদেবের হাতে সঁপিয়া দেয়।

শ্রীপঞ্চ কলার গাছ মোর দুয়ারে গাড়িয়া
হেন দুলাগী বেটীকে মোর পরে নৈয়া গেল।
বাপের যিনি পাঞ্জা ভাঙ্গে,
মায়ে যিনি করুণা করে।
শ্রীপঞ্চ কলার গাছ দুয়াবে গাড়িয়া
দুর্গা ভাতিজিক পরে নৈয়া গেল।
জেঠেয়ে যিনি পাঞ্জার ভাঙ্গে,
জ্যোঠাই যিনি করুণা করে॥ ইত্যাদি।

কনের ভবিষ্যত লইয়া তখন ভাবিতে থাকে। যাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করা হইবে সে না জানি তাহাকে কেমন যত্নে রাখে। জামতাকে লক্ষ্য করিয়া তখন গান হইতে থাকে। তাহার মধ্যে একটু আক্রোশের ভাব আছে।

হাতে দামাল তোর ললিত বাঁশী
দাঁতে দামাল তোর মিশি,
বিবাহ করতে আসছেন দামাল
জমিদারের বেটীরে
জমিদারের বেটি হোথা জোর জোরন তোয়াপরে।
ভরম ঠেঙ্গুয়ার বেটি হথা দিতে নাহি পারে ॥

পাল্কীতে উঠিয়া কন্যা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যায়। কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে পথ বাহিয়া চলে, শ্বশুরবাড়ীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে কান্না থামাইতে হয়। রংপুরের পল্লী অঞ্চলে এখনো এরকম রীতি অব্যাহত আছে। অপরিচিতের নিকট তাহা অনেক সময় আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কন্যার শ্বশুরবাড়ী গমনকে লক্ষ্য করিয়া মেয়েরা অনেক গান করিয়া থাকে। কন্যার শ্বশুরবাড়ী কোন্ দেশে, তাহা লইয়াও গান চলে।

উলু উলু মাণ্ডালের ফুল,
কই না বাড়ী কত দূর
হেটে ডাঙ্গা মধুপুর,
তাক্ ছাড়ি অনেক দুর,
কই না আলু ঘামিয়া
ছাতি ধরো টানিয়া
ছাতির উপরে গামছা,
তিন-বইনের তামসা রে ॥

কন্যাকে তাহার শ্বশুরবাড়ী দেখাইয়া দেওয়া হয়। তাহাকে বুঝান হয়, যে শ্বশুরবাড়ীর লোকজন এখন হইতে তাহার অত্যন্ত আপনার।

ও সুন্দর ময়না ও—
চিনিয়া নে তোর দলান কোঠা বাড়ী রে
তোর বাপের মতন শ্বশুর কোণা পাছিস্
তোর মায়ের মতন শ্বাশুড়ী কোণা পাছিস্
ও কি ও—
তোর বইনের মতন ননদ পাছিস রে !

এ সব সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ীর লোকের উপর আশঙ্কা হয়। বাঙ্গালীর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর জ্বালা অনেক সহ্য করিতে হয়। তাহার চাল-চলনকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে হয়ত খোঁটা দিতে পারে, "ননদিনী বাঘিনী" তাহাকে বিব্রত করিতে পারে।

এসব ভাবধারাও গানের মধ্যে পাওয়া যায়। শাশুড়ী-ননদে যেন জোট বাঁধিয়া বধূকে জ্বালাইতে থাকে।

ও কি ও ময়না রে—
কৈ দেখি তোর পাল্কির পাছত......
ঘরে আছে ময়না তোর আপন শাশুড়ী,
উঠ্তে বস্তে ময়না,
তোক দিবে খোটা রে
পড়বে ময়না সরুযাই চোখের পানি।
ভিজবে ময়না শাড়ীর অঞ্চল খানি রে।

(২)

কাথিনী গুয়া গাছ হেলেছে
শ্বশুর ছুলালি নাচেছে
ভাসুরে গাইলে মা, মুই মরিয়া যাও।
ঘরে আছে বাবা কগজ (?) ছায়া যাও।
তেম্নি নাছানা খেমত নামা দেও॥

(৩)

হীরা জীরা নদীর পর
ঐঠে জীরা ধোয় গাও
ধুইতে হারাইল কমরের শাড়ী রে
শ্বশুরে গালি দেয়,
শাশুরী মারিবার যায়,
শিরের সোয়ামি শির পাতিয়া নেয়,
হারাইছে শাড়ীয়া আমি দিব কিনিয়া॥
জীরা কলাই ধোয়,
কলাই ধুইতে হারাইল গলার হার—
শ্বশুরে গালি দেয়,
শাশুড়ী মারিবার যায়
শিরের সোয়ামি শির পাতিয়া নেয়।
হারাইছে হারোয়া, দিব কিনিয়া রে॥

শ্বশুরবাড়ীর নানারূপ জ্বালাতনের মধ্যেও যদি সে স্বামীর সোহাগ পায়, তবে সে সব সহ্য করিতে পারে। কনের বাপের অবস্থা ভাল হইলেও তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বরের বাড়ীর সব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। মেয়েলী গানের মধ্যেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

(ক)

কলঙ্কিনী গুয়া গাছ তাঁরে আগাল সরু
বাপই বইস বইস।
শ্বশুর দেশে গেইছেন বাপই,
কি কি পাইছেন দানে॥
থাল পাছি নোটা পাছি,
আরও পাছি ঝারি॥
মোটা না ঝালক দেখিয়া
মনে হইল গোসা।
শ্বশুর শ্যালার দুঃখ দেখিয়া
ছাড়িয়া আইলাম আশা রে॥
দুপুরে হইল বিয়া ওরে
সন্ধ্যায় করিল আও॥
শুন শুন মোরে সোনার চান রে
শাশুড়ী মায়ে গালি পাড়ে
একথা শুনিয়া কইনার, রাগে জ্বলিল্ গাওরে
শাশুড়ী মায়ের বসিবার সোড়া
ফিকিয়া ফেলাইল রে॥
ননদিনী গালি দেয়
নগুরী দেশের কইনা রে।
ননদিনীর পানের বাটা,
ফিকিয়া ফেলাইল রে।
শুন শুন ও মোর সোনার চাঁদ রে।

রংপুরের মেয়েলী গানের মধ্যে রঙ্গ রসের অভাব নাই। কিন্তু সে সব রঙ্গরসে যথাসম্ভব শ্লীলতা রক্ষা করা হইয়াছে। রঙ্গ রসের গান পূর্ব্বে কয়েকটি উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

বিয়ের পর বর কনে ঘরে ঢুকিতে গেলে একদল মেয়ে দুয়ার আগলাইয়া থাকে। তাহারা তখন তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে চায়। তাহারা তখন নানারূপ লইবার বাহানা ধরে; রংপুরের মেয়েলী গানের মধ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে।

কিরকিরি কোয়ারি সিরিযের বান্দন,
তুই দামাল ঘর সোন্দাইস, (প্রবেশ করিস্)
তোর কামিণীক ধরি।
কামিণীর কানের সোনা নেইম
তেমনি কোয়ারি ছাড়িয়া দেইম॥ ইত্যাদি।

বেয়াই বেয়ানদের মধ্যেও রঙ্গ চলিতে থাকে। এ সময় মেয়েরা বয়সের কথা ভুলিয়া যায়, তাহারা যেন নব-জীবনের সন্ধান পায়।

(ক)

মুস্থর কালাইর ফুল ফুটিল
বাইগোন ঝোকা ঝোকা।
কইনার মাও টাক্ রান্দিয়া থুইসে
ছেগ্না মন্তরের তলে,
কুত্তি গেলু রে ছাওয়ার ছুলাল
দেখিয়া লৈজ্জা নাগে রে।
মাথার পাগুরি বন্দক থুইয়া
শাশুড়ী উদ্ধার করে॥
বাছা বালির করুণা শুনিয়া
ছাড়িয়া আথির ঘণায়।
কইনার মায়ে থেমটানি রে কান্দন দেখি
পেণ্টি দেখিবার মনায়॥

(খ)

সরকার দেখিয়া ফরকাইলাম বাঙালারা রে
হাম ত জানি নারে বরের বাপের গাও
হাতির বরণ।

আন হাতি বন্দে কলার গাছে রে
খাউক হাতি খাউক কলার গাছ রে॥
সরকার দেখিয়া ফরকাইলাম বাঙালারা রে
হাম ত জানি না, বরের খুড়ার গাও শুয়ার বরণ।
আন শুয়ার বন্দে কচু বাড়ীত,
খাউক শুয়ার খাউক কচুর মুড়া রে॥

যাহার বিয়ে তাহার পক্ষে এ সব রঙ্গরস দেখিতে মানা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে সে সব আজ উপভোগের দিন। বরকে উপলক্ষ্য করিয়া ক'নে রঙ্গালাপ করিয়া থাকে। গানের মধ্যে তাহা অনেকটা মার্জ্জিত ভাবে স্থান পাইয়াছে।

পানি গামছা তেলের ওরে বাটি
কইনা চান করিতে গেল॥
এক ডুব ছুই ডুব তিন ডুব দিল,
ফির না ডুবিবার বেলা কইনা
নৌকায় তুলি লইল রে॥
কিসের আইলাম চান করিতে
আগা নৌকা বহ বহ পিছা নৌকা ভারি॥
আস্তে আস্তে খেওয়াও নৌকা
পতির কান্না শুনি।
না কান্দ না কান্দ পতি
কান্দন ক্ষমা কর।
ঘরে আছে ছোট বহিন
তারে বিয়াও কর রে।

এত সব রঙ্গ রসের পর ছুঃখের গান না আসিয়া পারে না, সেজন্য বরকন্যার ছুঃখের কাহিনী মেয়েলী গানের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সে সব করুণ কাহিনীর সঙ্গে প্রাচীন ইতিবৃত্ত জড়িত আছে।

মেয়েলী গানের মধ্যে লক্ষ্মীন্দরের বাসর রাত্রে সর্পের দংশনের কিছু কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গল গান বাঙ্গালার পল্লীবাসীর মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, মেয়েলী ছড়া গানও সে প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই। এস্থলে তাহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিতেছি।

ছাও ধরিয়া রত্তম ধরিয়া ছাও মরিয়া গেল,
ওঝা ধরিয়া ঝারিবার গেইল
ওরে ছাও মরিয়া গেল॥ ইত্যাদি।

ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগর অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরের বিবাহ দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার জন্য কন্যার খোজ করিতে তিনি পাত্র মিত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। মেয়েলী ছড়া গানের মধ্যে অনুরূপ একটি বিবরণ আছে।

তোমার ছয়পুত্র মরিয়া গেইল, কালীদয় সাগরে।
দেওয়ান কও ছোঁ তোর আগে।
হামার ছেলের জোরা মিলাও দেওয়ান
সংসারের মাঝে।
তোমার ছেলে জোরা আছে,
খড়িকাটার ঘরে।
গুগুরি ও চিড়া বান্দিয়া দিল
চাদরের কানিতে।
ছয় মাসের রাস্তা দেওয়ান,
একে দিনে হাঁটে॥
তোমরা ঘাটের চৌধারা
চট করে পার করি দেও যাই শ্বশুর বাড়ী॥
কেশমতী বইনি মোর হাত ধর তোরে
পাও ধর বা তোরে॥
রথখানি আটকাও বইনি নখের গোরেতে॥

পানের খিলি বানেয়া থুনু সিতানের মাথাতে।
ছবি একটা আকিয়া থুনু কপাটের উপরে।
ছবিটা দুলিতে লাগিল চন্দ্র-সূর্য্যতে।
রারা কওছো তোর আগে—
তোমার ছেলের জোড়া মিলাও,
সংসারের মাঝে।
হামরা যাইছি বাবা দেবের দেবপুরে ॥

এসব ভিন্ন গদ্য-পদ্য মিশাইয়া মেয়েরা কতকগুলি ছড়া-গান করিয়া থাকে। মেয়েরা যখন সাধারণ ব্রতকথা বলে, তখনো তাহারা ছড়ার আবৃত্তি করে। এরূপ গদ্য-পদ্যময় কথা রংপুরে মেয়েলী ছড়ার মধ্যে অনেক আছে। রূপকথার প্রকারে বিয়ের সময় রংপুরের পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা যে সব ছড়া-কথা বলে, তাহা বিশেষ উপভোগ্য। আমরা এস্থলে সামান্য একটি উল্লেখ করিতেছি। একটির বিষয় বস্তু এইরূপ ঃ—কোন সদাগরের ছয় পুত্র মারা গেলে, তিনি শোকে বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়েন। পুত্রবধূরা কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি বিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সে আসক্তির মধ্যে স্নেহের ভাগই বোধ করি বেশী ছিল। কালে সদাগর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলেন ; কিন্তু পুত্রবধূরা কনিষ্ঠ পুত্রকে নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিল। তাহাদের বিবাহ হইবার পর মুখ দেখিয়া নাকি তাহার ভ্রাতৃগণ মারা যায়। কনিষ্ঠ পুত্র সে কথা শুনিয়া আর পত্নীর মুখ দেখে না। এদিকে নবোঢ়া বধূ মনের দুঃখে কাঁদিয়া বেড়ায়।

আরে ও এতোই যদি ছিল মনে
আমাক বিভাও করছেন কেনে ॥
বিভাও করি এর্তয় দুক্ষ মোরে ॥

* * * *

বনে বনে কেন্দে যাব, বনফল খাইতে পাব
কোথায় পাব কাঞ্চন সতীর দেশ রে।

এরূপ কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার দিন চলিতে চায় না। পত্নী তখন পতির সাক্ষাৎলাভের জন্য বাজারে মাছ বেচিতে লাগিল। স্বামী বাজারে যাইয়া মাছের দর জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী মূল্যের বিনিময়ে অঙ্গুরী প্রার্থনা করিল।

তোমার হাতের আঙটি যদি দিবার পারেন।
হামার মাছের ভাগা তবে নিবার পারেন।

সদাগার-পুত্র আঙটি দিয়া মাছ লইলে, চাকর তাহা দেখিতে পাইল, এবং ভ্রাতৃবধূগণের নিকট তাহা নিবেদন করিল। ভ্রাতৃবধূগণ তাহার উপর খুব পীড়ন করিতে লাগিল। তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করে, কিন্তু পত্নীর চরিত্র-গুণে সে বাঁচিয়া উঠে, জলের মধ্যে ডুবাইয়া মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পত্নীর কৌশল ক্রমে সে বাঁচিয়া যায়।

পরিশেষে সে যখন স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ী পৌছিল, তখন তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইল এবং স্ত্রীর নিকট সকল অপরাধ স্বীকার করিল।

ছয় ভাউজে কইছে বাদা,
বিভার রাত্রে মরছে দাদা,
সেইজন্য দেখি নাই তোর মুখ। ইত্যাদি ॥

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় এস্থলে আর বিশেষ কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। এ রকম বহু গান পল্লী অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সে সব গানের মধ্যে প্রাচীন ভাব-ধারার নিদর্শন আছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আধুনিকারা তাহা অবহেলা করিয়া ঠুংরি গজন লইয়া ব্যাপৃত থাছেন। আমাদের দেশের সাহিত্য-প্রীতি-সম্পন্না বিদুষীরা এ বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সংগ্রহে যত্নশীলা হইলে প্রাচীন স্মৃতির সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়।

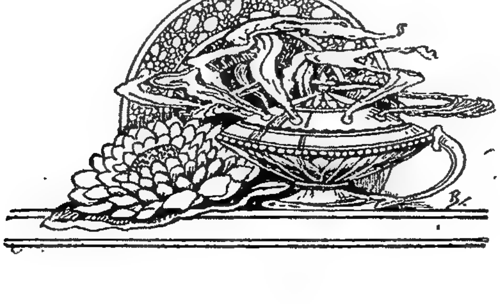

প্রেম ও পাষাণ

শ্রীকণা দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(চতুর্থ দৃশ্য)

(কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাতের সবে সূচনা ; ধূসর বৈশাখের মর্ম্মরিত বেণুবণের বুকে স্বপ্নের মত ,আব্ ছা মন্দিরটী। পাণ্ডুর বনবীথির শিয়রে জাগিয়া আছে হাজারো প্রদীপের ভীরু স্তিমিত আলো। দূরের পৃথিবী হইতে ভাসিয়া আসা নূতন-জাগা রজনীগন্ধার মৃদু সুগন্ধে বাতাস ভরপুর)

ঘুমন্ত বেণুবণের তনুতটে বাতাসের অনুকম্পার আত্র মধুর স্নিগ্ধ শিহরণের অনুভূতি জাগিয়াছে।

একাকী অরণ্য।

ধীরে ধীরে অতল কালো আলো করিয়া জাগিয়া উঠিল একফালি ভাঙ্গা বাঁকা চাঁদ—ম্লান আর বিষণ্ণ।

আরও জাগে! আরও। আরও।

কালো আঁধার স্বচ্ছ হোতে স্বচ্ছতর হয়। শুভ্রতর হয় নিবিড় প্রেতায়িত অমারাত্রি।

ছায়ায় আবার কায়া ফুটিয়াছে।

অরণ্য একা নয়!

সাথী দুই পথিক। রঞ্জন-রূপকেতু,—কুমার আর সভাকবি।

দুজনে ধীরপদে মন্দিরের প্রাঙ্গণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। একজনের মুখ কি এক অজানা আশা আনন্দ, কৌতুহল ও উত্তেজনায় রক্তিম। আর একজনের মুখে মৃদু কৌতুক হাস্য।

অরণ্য পথ ফুরাইল।

মন্দিরের অভ্যন্তরে গোপালের সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। বহুমূল্য স্ফটিক ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোয় প্রাঙ্গন ও দেবতার সৌম্য মুখকান্তি উদ্ভাসিত।

দুয়ারের সম্মুখে বসিয়া আছেন পার্থ-সারথি। ক্রোড়ে বীণা, মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিতেছেন।

দেবদাসীর হাতে সোনার পঞ্চপ্রদীপ। পাঞ্চ্যশঙ্খ বাজাইয়া, দেবতার মাথায় পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বনশ্রী আরতি করিলেন, প্রদীপ ও অবনমিত প্রণামটী রাখিয়া বাহিরে আসিলেন।

কুমার ও কবি অন্তরালে গোপন রহিলেন।

বনশ্রী হাসিয়া পার্থসারথির প্রশান্ত আননের পানে সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বনশ্রী—ভারী ভালো লাগছে আজ! "চন্দ্রোদয়" নাচটা নাচবো?

(ঈষৎ হাসিয়া পার্থ আবার বীণায় ঝঙ্কার দিলেন)

পার্থ—যা তোমার খুসী।

বনশ্রী—(মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন, পরে)

"একবার চাও দেখি আমার পানে।

(পার্থ—বিস্মিতের ভাণ করিলেন। তবু একবার বনশ্রীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন)—কেন বল তো?

(তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বনশ্রী মুখ নত করিলেন)

বনশ্রী—না, এমনি! চন্দ্রোদয় দেখছিলাম। সেই সুরটা বাজাবে?

পার্থ—বাজাবো না কেন? কোন গানটা?

বনশ্রী—যেটা তুমি সব চেয়ে ভালবাসো।

পার্থ-সারথি—বনশ্রী! তুমি দেবতার পূজারিনী, আমার (ক্রুদ্ধ হইলেন) ভাল লাগা-না-লাগায় তোমার কেন এত প্রয়োজন? এ অন্যায়, এ দুর্নীতি! তুমি কি তা বোঝনা? এত বুঝাই, তবু কেন শোন না বলতো?

(বঙ্কিম বিদ্রূপ হাসিতে বনশ্রীর সুন্দর ঠোঁটদুখানি ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল)।

বনশ্রী—দেবতা! দেবতা! তুমিও কি দেবতা নও? মানুষের সুখ দুঃখের অনেক উপরে? মানুষের চাওয়া, পাওয়া, ব্যথা বেদনার অনেক উর্দ্ধে যার স্থান, তুমিও তো তাই, তুমি তো তাই-ই। মুখ ঢাকিলেন।

নাঃ নাচবো না, ভাল লাগছে না নাচতে (ক্ষণেক পরে) তোমায় ব্যথা দেবার চেষ্টা করেছি, রাগ করে দেখেছি, অভিমান করেছি। তোমায় ঈর্ষান্বিত করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব বৃথা—সব ব্যর্থ। যে তুমি সেই তুমিই আছ। আমি নিজেই শুধু নিজেকে ভাঙ্গছি, গড়ছি, নিজেই শুধু স্বপ্ন দেখছি আর ব্যথা পাচ্ছি।

(পার্থ আবার বীণায় ঝঙ্কার দিলেন)

(মুখে, বলিলেন)—এ সব কথা আমার ভাল লাগে না বনশ্রী! নিজেকে বড় ক্লান্ত—বড় অসহায় বলে মনে হয়। তুমি কি নাচবে? আমি কি গাইবো?

বনশ্রী—গাও, আমি নাচি, শুধু নাচেই আমি যা কিছু সুখ পাই। নাচই আমার জীবনে যা কিছু সান্ত্বনা। যা কিছু বিস্মৃতি।

(পার্থ গান ধরিলেন)

আপন দেহ দহন করো আরতি দীপ সম
পূজার বেদীতলে
ছন্দ গানে নৃত্যরসের শিহর দোদুল দোলায়
জাগো পলে পলে।

আপন ভুলে ফুলের মতো
জনম জনম অবিরত
দেবতারে বরণ করো
নীরব নয়নজলে।

হে তপতী, প্রেমের পূজার
সকল আয়োজন
দেবতার দুই চরণ তলে
করিও অর্পণ।

রিক্ত করি চিত্ত তোমার
সাজাও পূজা দীপের আধার
সফল করো জীবন-মরণ
পূজার সাধন বলে॥

(নাচ থামিল। অন্তরাল হইতে কুমার ও সভাকবি তদ্গতচিত্তে সমুখের পানে আগাইয়া আসিলেন।)

রূপকেতু—এমন স্বর্গীয় নৃত্যভঙ্গিমা জীবনে দেখিনি! সুন্দর! অনুপম!

(অন্তরাল হইতে বিধায়কের প্রবেশ। কুমারের শেষ কথাগুলি তাঁহার শ্রুতি এড়ায় নাই।)

বিধায়ক—(হাঃ হাঃ করিয়া হাসিলেন)।

কি সুন্দর, কুমার? (উভয়ে আচার্য্যকে প্রণাম করিলেন)।

রূপকেতু—আপনার কন্যার চন্দ্রোদয় নৃত্য, প্রভু! শুধু সুন্দর নয়, আচার্য্য! অপূর্ব্ব! স্বর্গীয়!

(বিধায়ক আবার হাসিলেন। অট্টহাসিতে প্রাঙ্গণের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া বলিলেন)।

সুন্দর? সুন্দর? হাঁ সুন্দর বটে, রমণীয় বটে! কিন্তু কী জানো? দেবতার, ঠিক যোগ্য নয়। দেবতা তো শুধু সুন্দর চাননা, তিনি চান একনিষ্ঠ ভক্তি, অনাবিল পূজা-আরতির শিখা।

ছেলেমানুষ তুমি। নিতান্ত ছেলেমানুষ! তাই যা কিছু দেখ নয়নরঞ্জন—তাই তোমার চোখে সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়।

রঞ্জন—কিন্তু সুন্দরের পূজায় সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্যই তো বিশেষ প্রয়োজন গুরুদেব!

বিধায়ক—হ্যাঁ প্রয়োজন বটে, কিন্তু তারও অধিক প্রয়োজন নিষ্ঠা ভক্তি। ভক্তি বিহীন পূজা মানুষকে দিতে পারো, দেবতার পূজায় তা একান্তই অচল।

(বনশ্রী আগাইয়া আসিলেন)।

বনশ্রী......আমার আরতি নৃত্য এখনও শেষ হয়নি পিতা! সবে সুরু করেছিলেম।

বিধায়ক—শেষ হয়নি? বেশ, শেষ কর। আজ রাজার কুমার স্বয়ং অতিথি। তোমার ভক্তি নৃত্যে তাকে দীক্ষা দাও বনশ্রী। অরূপের পূজায় তোমার নৃত্যকে সমর্পণের ভঙ্গীতে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দাও মা।

(বনশ্রী পার্থর মুখের পানে চাহিলেন)

বনশ্রী......তাই হবে পিতা।

(ধীরে ধীরে বনশ্রীর সোনার তনু বিকশিয়া উঠিল। প্রথমে সুখ পুলকে ছন্দিত হইতে হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিনতিতে মিনতিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কখনো অনুরাগ, কখনো অভিমান, কখনো ক্রোধ, কখনো মিনতি। প্রেমাষ্পদকে বিচলিত করিবার যত উপায়, যত উপচার ছন্দে ছন্দে সারা শরীরে হিল্লোলিত তরঙ্গে বহিতে লাগিল।

বনশ্রীকে এমন নাচ পার্থও কখনো নাচিতে দেখেন নাই। অনেকক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত বনশ্রী দেবতাকে প্রণাম করিয়া নাচ শেষ করিলেন, পরে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রঞ্জন রূপকেতুর মুখ বিস্ময় আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল)

রঞ্জন……আর্য্য! নাচ আমি অনেক দেখেছি। রাজার রাজসভাতেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর অভাব নেই। অম্বা, চন্দা, মঞ্জ সকলেই পরম নৃত্য কুশলা। কিন্তু……এমন স্বর্গীয় ভাবব্যাঞ্জনা! এমন অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির বিকাশ! আশ্চর্য্য! সুদুর্লভ!

রূপকেতু—এ কথা সত্য দেব! আপনার কন্যা অতুলনীয়া গুণবতী॥

বিধায়ক—সত্যিই কি তাই? তা হবে!

(রূপকেতু, রঞ্জন গুরুকে প্রণাম করিলেন)

আচ্ছা, অনেকক্ষণ গত হলো, এবার তবে আমরা আসি।

(বিধায়ক আশীর্ব্বাদ করিলেন)। শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

পঞ্চম দৃশ্য

(মন্দিরের উদ্যান; অপরাহ্ন। প্রস্ফুটিত বৃক্ষতলে বনশ্রী একাকী হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। সদ্যচয়িত ফুল দিয়া একগাছি সুদৃশ্য মালা রচিতে রচিতে সুকৃষ্ণা তাঁহার নিকটে আসিলেন)—

সুকৃষ্ণা……চুপ করে বসে আছিস যে? ব্যাপারখানা কি? পার্থ বকেছে নাকি?

বনশ্রী……হুঃ পার্থর বকুনিকে আমি ভারী গ্রাহ্য করি কি না!

(মালা গাঁথা শেষ হইয়া গেল। দাঁত দিয়া বাকী সুতাটুকু কাটিয়া ফেলিয়া সুকৃষ্ণা তাহা টপ্ করিয়া বনশ্রীর গলায় ফেলিয়া দিলেন।)

সুকৃষ্ণা—তা বটে, তুই পার্থকে তো গ্রাহ্যই করিস না, কথাটা ভুলই বলেছি বটে।

বনশ্রী—করিই না তো, দেবতার পূজারিণী আমি, আমার আবার পার্থ, স্বার্থ কি? যা বলেছি সব ভুল! ভুলে যা কৃষ্ণা। (বনশ্রী হাতে মুখ ঢাকিলেন)। ও সব কথা ছেড়ে দে; তার চেয়ে তোর দীপঙ্করের কথা বল, শুনি।

সুকৃষ্ণা—হ্যাঁ তার আবার কথা! কতদিন ঐ সঙ্ঘারামেই যাতায়াত করছে; আমার কথা তার মনেই থাকে না। বোধ হয় ও ভিক্ষুদের দলে মিশে প্রব্রজ্যা নিয়ে ভিক্ষু হবে। তা হোক্ গে যাক্ কিন্তু তোর আবার এত বৈরাগ্য হোলো কেন বাপু? এত ভালবাসা, এত কাঁদা হাসা, সব মিছে?

বনশ্রী—মিছে নয় তো কি? ও কি মানুষ, ওর কি কোনো সুখ দুঃখ বোধ আছে নাকি? পাথরের মত শক্ত প্রাণ! শুনেছি বেশী কাঁদলে দেবতারাও শোনেন, কিন্তু তবু ও শোনে না। (দুই হাতে সুকৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিলেন) বলতে পারিস ভাই কি করি আমি? কেমন করে শান্তি পাই?

সুকৃষ্ণা—শান্তি চাস্ তো ভুলে যা ওকে, একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী। কি আছে ওর?

বনশ্রী—ও কথা বলিস না কৃষ্ণা, ওর কি নেই? ও ভণ্ড নয় ভাই, শুধু উদাসীন, আর সেই স্বভাবটাই যেন ওকে বেশী মানায়।

সুকৃষ্ণা—তবে আর কি করবো আমি? গদ্‌গদ চিত্তে বসে বসে কাঁদো; আমি হ'লে অমন উদাসীনের ঝুঁটী ধরে টেনে হিঁচড়ে উদাসীনত্ব ঘুচিয়ে দিতাম। মাথার ব্যথায় তখন দেখতাম ও কেমন ক'রে উদাসীন থাকে? যত সব ন্যাকামো।

বনশ্রী—তুই পাগল কৃষ্ণা! ধ'রে বেঁধে কি হবে, যদি এমনিই না এলো? নির্য্যাতন করে—ভালবাসা? যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ? কি লাভ ওতে, কতটুকু সম্মান?

সুকৃষ্ণা—তবে আর আমায় শুধানো কেন বাপু? (পরে আগ্রহভরে) শ্রী, একটা কথা রাখবি? অনেকদিন তোর নাচ দেখিনি; কতদিন পরে এলাম বলতো? একটা নাচ দেখাবি?

বনশ্রী—(উঠিয়া বসিলেন) কোথায়?

সুকৃষ্ণা—কেন এইখানে!

বনশ্রী—(আবার হেলান দিয়া বসিলেন) পাগল? দেবতার সম্মুখে ছাড়া আমার নাচ দেখানো বারন, নাচ শুধু দেবতা দেখবে।

সুকৃষ্ণা—(রাগ করিলেন) মিথ্যে কথা বলিস্‌নে শ্রী। তুই কাকে নাচ দেখাস? সত্যি বল্‌ তো? দেবতাকে না পার্থকে।

বনশ্রী—জানি না। (সুকৃষ্ণা রাগ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন)।

সুকৃষ্ণা—জানো সবই! শুধু বলবে না।

বনশ্রী—(তাহার অঞ্চল প্রান্ত টানিয়া ধরিলেন)। জানি রে জানি। বলবো? পার্থকে।

সুকৃষ্ণা—(হাসিলেন) পোড়ারমুখী! মরণেও তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

বনশ্রী—নেই নাকি? তোর ন্যাড়া মাথা দীপঙ্করকে বলিস, আমার হয়ে যেন প্রায়শ্চিত্তটা করে দেয়।

সুকৃষ্ণা—যতই ঠাট্টা করিস, সে কিন্তু এখন আলাদা মানুষ। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ভাই, রাগালে রাগে না বকলে হাসে, আশ্চর্য্য! সস্মিত প্রশান্ত মুখশ্রী! তথাগতের অদ্ভুত প্রভাব ভাই!

বনশ্রী—(সন্ত্রস্তে।) খবরদার! চুপ, চুপ, পিতা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না কৃষ্ণা, তিনি বুদ্ধদেবের পরে ভীষণ চটা। বলেন, ওরা ভণ্ড, ওরা শয়তান।

সুকৃষ্ণা। শুনেছেন নাকি রে? পালাই বাবা, ওঁকে আমার ভারী ভয় করে। খবরদার, যা বলাম বলিস্‌ না যেন ওঁকে।

(এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সুকৃষ্ণা ছুটিয়া পলাইলেন)

বনশ্রী—আশ্চর্য্য—যতো দেখছি ততো বিস্মিত হচ্ছি—যত দিন যাচ্ছে ততই আশাহত হচ্ছি। পৃথিবীর নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাতে স্বপ্ন আশা কামনা প্রেম ক্ষণে ক্ষণে অপমানে উপেক্ষায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত। প্রেম দিয়েই যদি মানুষ মানুষকে না বাঁধতে পারলো, তবে কি দিয়ে আর বাঁধবে? তার চেয়েও সুদৃঢ়, বৃহত্তর কোন্‌ বন্ধনের সন্ধান সে পেয়েছে কিনা কে জানে? কেন তার এ উপেক্ষা!

(অন্তরাল হইতে বিধায়ক ডাকিলেন)

বনশ্রী! বনশ্রী! কোথায় গেলি মা?

বনশ্রী—যাই পিতা?

(বনশ্রী উঠিতে গেলেন, হঠাৎ সম্মুখে রূপকেতুকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন)

কে কে তুমি? ওঃ রাজকুমার রূপকেতু? কিছু প্রয়োজন আছে? পিতাকে চাই? আসুন! পিতা তো মন্দিরেই আছেন।

রূপকেতু—(থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পরে দ্বিধা-কম্পিত স্বরে বলিলেন)

আপনার পিতাকে চাই না দেবী, আমি শুধু আপনাকেই দেখতে এসেছিলাম। দেখা দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, তবু ধরা পড়ে গেলাম। (বনশ্রী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন)

বনশ্রী—দেখতে এসেছিলেন? আড়াল থেকে? আমাকে? কেন বলুন তো?

রূপকেতু—কেন? আমার ভাল লাগে, তার জন্যেই শুধু দেবী! আর কিছু নয়।

বনশ্রী—ভাল লাগে! কিন্তু কেন?

রূপকেতু—আমি তোমায় ভালবেসেছি বনশ্রী?

বনশ্রী—(বনশ্রী দুই পা সরিয়া গেলন) আমায় ভালবাসেন? বনশ্রীকে? আমার কতটুকুই বা আপনি জানেন, যে এমন অপ্রত্যাশিত অযাচিত ভাবে আপনার বহুমূল্য ভালবাসাটুকু বৃথা অপচয় করবেন? এ মনোভাব সংযত করুণ কুমার? জানেন, আমি দেবদাসী? শুধু দেবতারই আমার উপর অধিকার। জানেন, আমায় ভালবাসা পাপ?

রূপকেতু—পাপ কি পুণ্য জানিনা দেবী। শুধু জানি তোমায় দেখেছি, ভাল লেগেছে, আর ভালবেসেছি।

(অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু বিধায়ক প্রবেশ করিয়া কহিলেন)

বিধায়ক—ভালবেসেছি! ভালবেসেছি। একদিনের সাক্ষাৎ, পরের দিনই প্রেম। চমৎকার এ অভিনয় কুমার! এ নির্জ্জন, অন্ধকারাচ্ছন্ন বনতলে দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃতা যে নারী তারই চরণে প্রেম নিবেদন! ভবিষ্যতের রাজার উপযুক্তই ব্যবহার বটে!

(পরে সগর্জ্জনে) বনশ্রী!

বনশ্রী—পিতা!

বিধায়ক—তুমি দেবদাসী—স্মরণ আছে?

বনশ্রী—আছে পিতা!

বিধায়ক—তবে, এ তোমার কি ব্যবহার?

রূপকেতু—উনি কোনো দোষে দোষী নন্, আর্য্য। দোষী আমি!

বনশ্রী—না পিতা? আমরা কেহই দোষী নই। ভালবাসা অপরাধ নয় পিতা।

বিধায়ক—অপরাধ নয়? দেবতার ভোগ্যা নারীকে প্রেম নিবেদন অপরাধ নয়? অপরাধ, ব্যাভিচার তবে আর কিসে হয়? তুমি কি আমায় পাগল পেয়েছ বনশ্রী?

এই দুর্নীতি—এই অসংযম, এর প্রতিরোধ হবে না, প্রতিকার হবে না?

(রূপকেতু আগাইয়া আসিলেন)—আমি কি অপরাধী আচার্য্য? দেবতার অর্ঘ্য কামনা করা অপরাধ, কিন্তু আমি তো কিছু কামনা করি না, আমি শুধু ভালবাসি! সূর্য্যমুখী যেমন সূর্য্যকে দেখেই ধন্য হয়, নীলকুমুদ যেমন চাঁদের দেখাটুকুর প্রতীক্ষাতেই মুহূর্ত্ত গণে, আমি শুধু সেই দেখারই প্রত্যাশী।

বিধায়ক—উঃ অসহ্য এ স্পর্দ্ধা! ঠিক ঐ সঙ্ঘারামের ভণ্ড তপস্বীটার মত ব্যবহার, ঐ মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক কৌপীন ধারী ভিক্ষুদের মতই দুর্নীতি!

দেবতার চেয়ে মানুষের প্রাধান্য? দেবতার অপমান? তুমি কি অম্বরীষের পুত্র? সেই অম্বরীষ! দেবতার একটী কৃপাকটাক্ষের বিনিময়ে যে নিজের বুকের রক্ত দিতে পশ্চাৎপদ নয়। দেবতার এ অপমান দেখে নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে যে বিসর্জ্জন দিতে তিলমাত্র বিলম্ব করবে না। তুমি কি তাঁর পুত্র? এ কি সত্য? এ কি সম্ভব?

বনশ্রী—জগতে কি অসম্ভব পিতা? দেবতার পাষাণ চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে যে বাধ্য আমি, আমিই যদি কোনো মাটীর মানুষকে ভালবেসে থাকি, তাও অসম্ভব নয়।

বিধায়ক—এতদূর? এত হীন পরিণতি? শরীরের শিরায় শিরায়, অস্থিমজ্জায় পাপের দূষিত স্রোতে কলঙ্কিত দেহ নিয়ে তুই দেবতার পূজানৃত্য করিস। কলঙ্কিনী সর্ব্বনাশিনী! আকাশ বাতাস ছেয়ে গেলো তোর পাপের কাহিনীতে, তোর কলঙ্কিত চিন্তাধারায় (রূপকেতুর পানে চাহিলেন)

আর তুমি! এক ছলনাময়ী মায়াবিনীর কুহকমায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে দেবতার ধন হরণ কর। নির্লজ্জ, যাও এখনি যাও এখান থেকে, অবিলম্বে। এই কালনাগিনীর বিষবৎ সঙ্গ পরিত্যাগ কর।

(রূপকেতু নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

কই, গেলে না যে।

রূপকেতু—প্রণাম করে যাবো। (নত হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, বিধায়ক সরিয়া গেলেন) প্রণাম নয়, প্রতীকার চাই! আমার দেবতাকে অপমান করেছ তুমি। আমার পবিত্র দেবমন্দিরের শুভ্র শুচিতা কলুষিত করেছ তুমি—আজন্মের মত উৎসর্গীকৃত দেবদাসীর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিচলিত করেছ তুমি! এর যোগ্য শাস্তি চাই, আমার দেবতার অপমান আমি সহজে ভুলি না।

যাও চলে—আমার আদেশ! এই মুহূর্ত্তে এ স্থান পরিত্যাগ করো। এর প্রতিবিধান আমি করবোই! এর শাস্তি আমি দেবোই।

(রূপকেতু বনশ্রীর নত নয়নের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমন পথের পানে চাহিয়া বিধায়কের রুদ্র মুখশ্রীতে তীব্র ব্যঙ্গহাসি ফুটীয়া উঠিল) (চীৎকার করিয়া বলিলেন)—রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে জানাবো, কেমন চরিত্রবান্ তাদের ভবিষ্যতের রাজা; রাজাকে জানাবো, হাঃ হাঃ হাঃ প্রজারঞ্জনকারী ধার্ম্মিক অম্বরীষ! কেমন তোমার পুত্র! চমৎকার! চমৎকার!

(বনশ্রী বিধায়কের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন)

বনশ্রী—আপনার পায়ে ধরি, ওঁকে ক্ষমা করুন

পিতা। সত্যিই উনি কোনো দোষ করেন-নি। মাটীর মানুষ মানুষকে ভালবাসবেই, ভালবেসেই বাঁচবে, একি অন্যায় পিতা? একি অপরাধ? মানুষ তো পাষাণে গড়া দেবতা নয় পিতা!

বিধায়ক (হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন) চুপ কর তুই! পাপ পুণ্য বিধায়ক সব বোঝে। তুই তাকে শিক্ষা দিতে আসিস্?

"যদি ভালবাসি"! ভালবাসা! দেবদাসীর আবার ভালবাসার সখ কেন? দেবতার আরাধনা, দেবতার পূজা, ব্রত অর্চ্চনাই তো দেবদাসীর একমাত্র জীবন, অনন্য লক্ষ্য!

কলুষিত চিন্তার কালিমায় সেই অর্ব্বাচীন রাজার ছেলে তোর সমস্ত চিন্তা কলুষিত করে গেছে। আমার সব উদ্দেশ্য বিফল করে দিলি তুই! আমার ঐকান্তিক তপস্যা, দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমার হৃদয়-তর্পণ হেমার করে ভেঙ্গে চুরে আজ ধরার ধূলায় ছড়িয়ে দিলি তুই। এ কী কম যন্ত্রণা? এর প্রতিশোধ নেবো না, এর প্রতিকার হবে না। অসম্ভব! অসম্ভব!

(দ্রুত প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজসভা)

মধ্যাস্থলের রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে অম্বরীষ উপবিষ্ট। পরিচারিকা অম্বালিকা রাজার মাথায় চামর ঢুলাইতেছে।

সিংহাসনের অদূরেই সভাকবি রঞ্জন ও কুমার রূপকেতুর আসন, তাহাদের পরেই মন্ত্রী, সভাসদ্ ও অমাত্যগণ ইতস্ততঃ সমাসীন। রাজার প্রিয়পাত্র বিদূষক বিরূপাক্ষ অম্বরীষের মনোরঞ্জনেই ব্যস্ত।

অম্বরীষ—অম্বালিকে! চন্দা, মঞ্জুদের খবর দাও, অনেকদিন পরে আমার কেতু আজ সভায় উপস্থিত। তাকে সম্বর্দ্ধনা করা প্রয়োজন, কী বল মন্ত্রী!

(বৃদ্ধ মন্ত্রী অল্প দাঁড়াইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন)

মন্ত্রী—নিশ্চয়! নিশ্চয়! অবশ্য কর্ত্তব্য! আমাদের কুমার, আমাদের ভবিষ্যতের রাজা, তাঁর সম্বর্দ্ধনা! এ তো বিশেষ করেই প্রয়োজন। (অম্বালিকার প্রস্থান)

(অনতিক্ষণ পরেই রাজনটী চন্দা মঞ্জুশ্রী এবং অম্বপালিকা সভামঞ্চে ঢুকিয়া প্রথমে রাজাকে, পরে আর সকলকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল)

অম্বরীষ—চন্দা, মঞ্জু, তোমাদের রাজকুমার, তোমাদের ভবিষ্যতের রাজা আজ সভায় সমাসীন, তাঁকে নৃত্য গীতে অভিনন্দন জানাও অম্বা?

অম্বা, মঞ্জু ও চন্দা—আমরা প্রভুর দাসী! আমরা কুমারের দাসী!

(পরে নৃত্যসহকারে) গান

সখীরা—মোরা দক্ষিণ হাওয়ায় তন্দ্রাভাঙ্গা রঙীন প্রজাপতি
ফুলের মধু খেয়ে ফিরি চির চপলমতি।
মোরা ফুলের বাসে পড়ি ঢলে
ফুলের রঙীন নরম কোলে
হাল্‌কা পাখায় ছড়িয়ে চলি
রঙের স্বপন জ্যোতিঃ।
মোরা বাদল রাতের খদ্যোতিকা
প্রদীপ জ্বালাই বনে,
মোরা মরুর মাঝে মরীচিকা—
হারাই ক্ষণে ক্ষণে।
মোরা আঁধার রাতের উজল তারা
উজল রাতের জ্যোৎস্না ধারা
আমরা সকল রস ও রূপের
চরম পরিণতি॥

(ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই গান দুইবার গাহিলেন ও নাচিলেন। কখনো একসঙ্গে কখনো একা একা। নাচ শেষ হইয়া গেলে নাচের ভঙ্গিমায় অভিবাদন জানাইয়া নাচিতে নাচিতে তাঁহারা সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

বিরূপাক্ষ—এরাও নাচেন, তবে মহারাজ! নাচ দেখেছি বটে বিধায়কের পালিতা কন্যা বনশ্রীর। দেবতার আরতি-পূজা-লগ্নে যা নাচে; মহারাজ স্বর্গীয়! স্বর্গীয়!

অম্বরীষ—অজাত শত্রুর অনুরোধ মত জেতবনের কাছাকাছি মন্দির নির্ম্মাণ করে ভবে ভালই করেছি। কী বল মন্ত্রী? সব কটা ভণ্ড ব্যাটা জব্দ হয়ে যাবে। হয়ে গেছে একেবারে। (পরে রূপকেতুকে) বৎস,

আমার বাণপ্রস্থের পর রাজা হবে বটে। কিন্তু ভুলেও যেন ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসোনা। দেবতা মানেনা, ওরা নাস্তিক, কপটাচারী।

রূপকেতু—কিন্তু পিতা! রাজ্যে ফেরার পূর্ব্বে আমি কিছুদিন ধরে, দৈব দুর্ব্বিপাক হেতু জেতবনের সঙ্ঘবিহারে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেম। ভগবান তথাগতের কী যে দিব্যজ্যোতি পিতা, তাঁর মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে আপনার মনে হবে আপনি কত দীন, কত অসহায়। অপূর্ব্ব ত্যাগশক্তি তাঁদের, আর্ত্ত অসহায়ের প্রতি আশ্চর্য্য করুণা। তাঁরা কপটাচারী নন পিতা! তাঁদের অমায়িক ব্যবহার আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি অতি নিকটে থেকে তাঁদের যথার্থ পরিচয় লাভ করেছি প্রভু!

অম্বরীষ—ভুল বুঝেছ বৎস! সেও তাদের একটা কপট ছলনা মাত্র। জানে তুমি ভবিষ্যতে এ রাজ্যের রাজা, তোমাকে হস্তগত করে এই রাজ্যে তাই আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস করেছিল।

বিরূপাক্ষ—যা বলেছেন মহারাজ! ব্যাটাদের দেখলেই যেন গা জ্বলে যায়, সেদিন আবার এক নেড়া রাজ্যের সীমানায় ঢুকে পড়েছে।

অম্বরীষ—আমার বিনা অনুমতিতে মৃগদার রাজ্যে প্রবেশ করে, এত বড় স্পর্দ্ধা!

১ম সভাসদ—মহারাজ! মারটাও খেয়েছেন তেম্নি; বাছার ভিক্ষুগিরির যে উদার ব্রত বেরিয়ে গেছে।

অম্বরীষ—বটে! কে মারলো? প্রতিহারী বুঝি?

দ্বিতীয় সভাসদ—না মহারাজ! প্রতিহারী নয় স্বয়ং আচার্য্য বিধায়ক।

বিরূপাক্ষ—বল কী হে? একেবারে যমের হাতে? বিধায়ক যে ওদের কুকুরের মত ঘৃণা করেন বলেই শুনেছি।

অম্বরীষ—বিধায়ক? তিনি টের পেলেন কেমন করে?

দ্বিতীয় সভাসদ—আজ্ঞে, সে বেটা যে মন্দির-প্রাঙ্গণেই উঠে গেলো সোজা। আচার্য্য তখন পূজোয় বসেছেন।

গিয়ে বলে কী না, "ও মাটীর পুতুলকে নাড়াচাড়া করে ফল কী বলুন?"

আর্য্য তো রেগেই সারা। বললেন "ভণ্ডটার চোর-গিরি ছেড়ে এখানে কেন বাপু?" তখন বলে কী! "এ রাজ্যে অনাশ্রিত, দুঃখী, আর্ত্ত, অসহায় কেউ আছে নাকি তাই খবর নিতে এসেছি।"

অম্বরীষ—(উত্তেজিতভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আমার রাজ্য! আমি রাজা। আর্ত্ত অসহায়ের সেবার যদি প্রয়োজন হয়, আমি সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম!

বিরূপাক্ষ—নিশ্চয়ই তাই! নিশ্চয়ই তাই! তুমি দালালি করবে, কে হে বাপু?

দ্বিতীয় সভাসদ—আজ্ঞে মহারাজ, বিধায়ক ঠিক তাই-ই বললেন। "আছে না আছে সে রাজাই দেখে নেবেন, তুমি কে বাপু, তোমার কিসের এত মাথা ব্যথা?

অম্বরীষ—(বসিয়া পড়িলেন) ঠিক্! ঠিক্! এই জন্যেই বিধায়কের অসীম জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধিকে আমি এত সম্মান করে মেনে চলি।

বিরূপাক্ষ—তা মারটা খেলো কখন?

দ্বিতীয় সভাসদ—ঐ তখনই, যেই জবাব দিয়েছে 'আজ্ঞে, পরহিতব্রতই আমাদের সঙ্ঘের দৈনিক ব্রত। আমাদের ভগবান দুঃখীকে করুণা করে অসীম সুখ পান, তাঁরই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আমরা দেশবিদেশে দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্তের সন্ধান নিয়ে ফিরি? শুনেই তো আর্য্য রেগে খুন। আমার মন্দিরে এসে মানুষকে ভগবান্ বলে স্বীকার করা—এত বড় স্পর্দ্ধা! বলে, দিলেন পায়ের হস্তীদন্তের খড়ম্ ছুঁড়ে। নেড়া মাথা বেয়ে একেবারে রক্তের বন্যা।

অম্বরীষ—উপযুক্ত শাস্তি! পবিত্র দেববিগ্রহের অপমান? (রূপকেতুকে) শুনলে তো বৎস? মাটীর মানুষকে ভগবান বলে সম্ভাষণ। দেবতার সঙ্গে তাঁরই হাতের সৃষ্ট মানুষকে এক পর্য্যায়ে ফেলে সমান অধিকার দান, অবৈধ, অদ্ভুত!

রূপকেতু—কিন্তু এমন ভাবে মারাটাও আমি সমর্থন করিনা পিতা। অপরিচিত অতিথির গায়ে হাত তোলা, এই কী তবে ন্যায় ধর্ম্ম?

অম্বরীষ—তারা নিজের দোষেই মার খায় বৎস। সিদ্ধা

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারে, তা বলে ভগবান নয় নিশ্চয়।

বিরূপাক্ষ—নিশ্চয় না, নিশ্চয় না! জয়ন্ত, তারপর কী হোলো হে?

দ্বিতীয় সভাসদ—পুরোহিতের ঐ নবীন চেলা পার্থ সারথি তখন লোকটাকে তুলে খুব যাহোক সেবা যত্নটা করলে। দেবদাসী মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে অনেক করলো; তা উনি করলেন ঐ পার্থসারথিকে সাহায্য করবার জন্য। বাপের রাগকে গ্রাহ্যও করলো না ও আবার ঐ ছোঁড়াটার জন্য, বুঝলে কী না?

(অর্থসূচক ভঙ্গী করিল)

অম্বরীষ—এ অসম্ভব! দেবতার সেবাদাসী, মানুষের…

(রূপকেতু আসন ছাড়িয়া আহত সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সভাসদের প্রতি)

রূপকেতু—চুপ করুন আপনি! প্রকাশ্য সভার মাঝে পরনারীর কুৎসা! এ অতি নীচ প্রবৃত্তি।

বিরূপাক্ষ—বটেই তো, বটেই তো! তারপর আর্য্য কী করলেন?

প্রথম সভাসদ—করবেন আর কী, জলভরা মেঘের মত থম্‌থম্‌ করতে রইলেন। ও বাবা, এ যে দেখি স্বয়ং বিধায়কই আস্‌ছেন, সর্ব্বনাশ! একেবারে সিংহের মত প্রলয় মূর্ত্তি যে।

(দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু বিধায়কের প্রবেশ)

বিধায়ক—প্রতি পদে আমি অপমানিত! প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বিরুদ্ধাচরণ—

(অম্বরীষ সশব্যস্তে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। রাজার দেখাদেখি সভাসদরাও দাঁড়াইলেন)

অম্বরীষ—আসুন দেবাচার্য্য! আসন গ্রহণ করুন। বহুদিন পরে এ রাজসভা আজ আপনার পুণ্য পদরেণু লাভে ধন্য, কৃতার্থ হোলো।

ও কি, অত অধীর হয়েছেন কেন? সুস্থির হোন্! বসুন।

বিরূপাক্ষ—আমরা আজ ধন্য হলেম প্রভু!

(তাহার পানে চাহিয়া বিধায়ক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন)।

বিধায়ক—চুপ কর তুমি! তোষামোদকারী। ইতর

(পরে কঠোর বিদ্রূপ হাসি হাসিলেন)

কি রাজা? তোমার পুত্র যে মহৎ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা। ধর্ম্মের, ন্যায়ের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি! ধর্ম্মে অটুট বিশ্বাস! দেবতায় অচল ভক্তি। না রাজা?

অম্বরীষ—(তাঁহার কথার ব্যঙ্গ রেশটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না)

আশীর্ব্বাদ করুণ আর্য্য! ভবিষ্যতের রাজা যেন ঠিক তাই-ই হয়।

(রূপকেতুর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, রঞ্জন চঞ্চল হইলেন, বিধায়ক অট্টহাসি হাসিলেন)

হাঃ হাঃ হাঃ, ভবিষ্যতের রাজা রাজাই বটে! লম্পট! হীন, কাপুরুষ! তোমার পুত্র আমার মন্দিরের শুচিতাকে হত্যা করেছে রাজা। (অম্বরীষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন)

অম্বরীষ—আমার পুত্র? আমার রূপকেতু? এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব?

বিধায়ক—শোনো অম্বরীষ! বিধায়ক মিথ্যা কথা বলে না। বিধায়ক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। জিজ্ঞাসা কর তোমার পুত্রকে; জিজ্ঞাসা কর তার বিবেককে, আমার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা?

(অম্বরীষ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন) —রূপকেতু—

রূপকেতু—পিতা?

অম্বরীষ—একি সত্য রূপকেতু?

কেতু—হাঁ পিতা। (রঞ্জন দ্রুতগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রঞ্জন—মহারাজ, এ মিথ্যা অভিযোগ, সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা!

(দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বিধায়ক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন)।

বিধায়ক—মিথ্যা কথা? অন্যায় স্পর্দ্ধা! আমার দেবতার অপমান হয়েছে, এ কথা মিথ্যা?

(অম্বরীষ ব্যাকুলভাবে সকলের মুখের পানে চাহিয়া ধপ করিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন)

অম্বরীষ—সকলেই সব জানে, শুধু আমিই অসীম তিমিরে আচ্ছন্ন!

(বিধায়ক এবার শান্ত হইলেন)

বিধায়ক—তবে শোনো রাজা, তোমার পুত্র আমার পালিতা কন্যা, দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃতা বনশ্রীকে অন্যায়-ভাবে কামনা করেছে। প্রেমের প্রণয়-গুঞ্জনে তার শুদ্ধ পবিত্র চিত্তমন্দিরকে কলুষিত করেছে সে!

(রূপকেতু উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রূপকেতু—মিথ্যা কথা! আমি তাঁকে কামনা করিনি পিতা।

(বিধায়ক আবার অশান্ত হইয়া উঠিলেন)

বিধায়ক—ছায়াঘন অন্ধকারে, নির্জন বনস্থলীর অবকাশে তুমি তার কাণে কাণে শোনাওনি প্রেমগুঞ্জন? এ কথা তবে মিথ্যে?

রূপকেতু—শুনিয়েছি, প্রণয়ের মধুগুঞ্জন নয়। অতি ধীরে স্পষ্ট ভাষে শুধু দুটী কথা "ভাল লাগে।"

অম্বরীষ—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

তুমি? তুমি এ কথা বলেছ কেতু? রাজকুমারী মধু মঞ্জুলিকা যার গলায় মালা দেবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে তপস্যা করছেন—প্রতীক্ষা করছেন, সেই তুমি বলেছ এ কথা?

(রূপকেতু নয়ন নত করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন)—হাঁ পিতা।

(অম্বরীষ উদভ্রান্তের মত আসনে বসিয়া পড়িলেন)

অম্বরীষ—কুশীনগরে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাও মন্ত্রী। এই পূর্ণিমাতেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়ে যাক্। রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদেরও প্রয়োজন নেই; বিলম্ব হবে।

রূপকেতু—এ আপনার অসম্ভব কল্পনা পিতা। এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অমত।

অম্বরীষ—অমত! কেন অমত? কিসের বাধা?

রূপকেতু—আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।

(বিধায়ক আগাইয়া আসিলেন)

বিধায়ক—শুনেছ রাজা? তোমার পুত্রের অসীম দুঃসাহস। দেবতার যে সেবিকা, মানুষ তাকে অন্যায়ভাবে কামনা করবে? হোক সে তোমার কুমার, হোক সে ভবিষ্যতের রাজা! সমাজের কলঙ্ক সে, ব্যাভিচারের জ্বলন্ত প্রতীক সে অসহ্য তার স্পর্দ্ধা, অসহনীয় তার এই ভোগ-পঙ্কিল চাওয়ার ধৃষ্টতা।

(রাজার সম্মুখীন হইলেন)

কি রাজা? চুপ করে রইলে যে? প্রাণাধিক পুত্র বলে? স্নেহের পুত্তলী বলে? মায়া? স্নেহ?

অম্বরীষ—(কণ্ঠস্বর কম্পিত)

এ অন্যায় অনুযোগ কেন পুরোহিত ঠাকুর?

বিধায়ক—(আগ্রহভরে)

তবে? তবে কেন এ দ্বিধা রাজা? ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা তুমি, ধর্ম্ম ও নীতির একমাত্র পালনকর্ত্তা। শাস্তি দাও রাজা, প্রতিকার কর বন্ধু, তোমার দেবতার এই চূড়ান্ত অপমানের। হোক্ সে তোমার পুত্র! হোক্ সে ভবিষ্যতের রাজা! তবু সে কঠোর শাস্তির যোগ্য! দণ্ড দাও রাজা, অন্যায় দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিও না আর। দিও না আর কালসাপকে তোমার আদরে যত্নে পরিপুষ্ট আর বর্দ্ধিত হতে।

(রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রঞ্জন—অপরাধ কোথায় গুরুদেব, যে কুমারকে দণ্ডিত করা প্রয়োজন হচ্ছে?

(বিধায়ক অট্টহাসি হাসিলেন, কণ্ঠস্বর শাণিত বিদ্রূপে ভরা)

বিধায়ক—অপরাধ—কোথায়—গুরুদেব?

অপরাধ নয়? অন্যায়, ব্যাভিচার, পাপ নয়? এতেও যদি পাপ না হয়, এও যদি অপরাধ নয়, পাপ তবে কিসে রাজা? একমাত্র দেবতারই অনুগৃহীতা যে নারী, মানুষ তাকে গোপনে প্রলোভিত করে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। কুমারের অপরাধ, পাপ এইখানেই সভাকবি।

রঞ্জন—এ আপনার ভুল ধারণা আচার্য্য! কুমার তাকে ক্ষণেকের জন্যেও আকর্ষণ করবার প্রয়াস করেননি।

চিরসুন্দর কোনো শোভা দেখে মানুষ যদি তাকে প্রীতির চোখে দেখে, তা কী পাপ গুরুদেব?

বনশ্রীর নৃত্য রমণীয়। বনশ্রী সুন্দর, কুমার তাই মুগ্ধ হয়েছিল। সুন্দরকে ভালবাসা তো পাপ নয়, সে যে নিজেই স্বভাবশোভায় অন্যকে আকর্ষণ করে আর্য্য!

বিধায়ক—চুপ কর সভাকবি। বিধায়ক তোমার কাছে পাপ পুণ্যের ইতিহাস শুনতে আসেনি। (রাজার দিকে ফিরিলেন) বিচার কর রাজা, পবিত্র দেববিগ্রহ আর

অপমানিত। আমার শুচিশুভ্র মন্দির-প্রাঙ্গণ আজ তোমার পুত্র কলুষিত চিন্তার কালিমায় ক্লেদপঙ্কিল করে তুলেছে! প্রতীকার কর মহারাজ!

(অম্বরীষের কথার স্বরে ক্লান্তি ও বেদনা ঝরিয়া পড়িল)

অম্বরীষ—কুমারকে শাস্তি দিতে চান? কী শাস্তি আপনি দিতে চান বিধায়ক? কত নির্ম্মম সে প্রতিশোধ স্পৃহা?

(বিধায়কের মুখ আশা ও আনন্দে-উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি রাজার আরও সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন)

বিধায়ক—প্রতিশোধ বোলো না রাজা, বল প্রতিরোধ! প্রতিরোধ অধর্ম্ম আচরণের।

(অম্বরীষের আর্ত্তকণ্ঠ আবার বাজিয়া উঠিল)

অম্বরীষ—তাই, তাই-ই, গুরুদেব। কী আপনার আজ্ঞা, আদেশ করুন।

বিধায়ক—এই মুহূর্ত্তে কুমারকে নির্ব্বাসন দাও, রাজা, বহু দূরে সে চলে যাক্, এ রাজ্যের সংস্পর্শ ছেড়ে

(অম্বরীষ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, দুই হাতে কপাল টিপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল)

অম্বরীষ—নির্ব্বাসন? আজ বাদে কাল যার অভিষেক, এত তুচ্ছ, এত সামান্য কারণে তাকে রাজ্য হ'তে চির নির্ব্বাসন দেবো? এ আপনি কি বলছেন বিধায়ক ঠাকুর?

(বিধায়ক আগাইয়া আসিলেন)

একে তুমি তুচ্ছ বল? ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎএর সৃষ্টি হয় রাজা! ক্ষুদ্র অপরাধ তুচ্ছ করবার সামগ্রী নয় জেনো।

ওই কলুষকালিমালিপ্ত অবৈধ চিন্তাধারার অনলে পুড়ে যাবে তোমার এই দেশ। ছারখার হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে রাজন্, তোমার এই শস্যশ্যামলা, সুখসমৃদ্ধিশালিনী ভূমি।

ধ্বংস পুষে রেখো না অম্বরীষ, দূর করে সরিয়ে দাও—তোমার সুখের পৃথিবী হোতে অনেক—অনেক দূরে। দূর হতে দূরান্তরে বিদেয় করো এ সর্ব্বনাশা ব্যাভিচারের জলন্ত মুশল।

অম্বরীষ—(বিলাপের সুরে)

আমার-সুখের পৃথিবী—আর তবে কোথায় থাক্‌বে আমার পৃথিবী।

(হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন)

কি বললেন আচার্য্য? আমি রাজা না? ধর্ম্মের প্রতিপালক, ন্যায়নীতির পালন-রক্ষাকারী রাজা না?

(অকস্মাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন, সভাসদ্‌গণের প্রতি চাহিলেন)

রাজা দেখেছ অমিতাভ? নির্ম্মম ন্যায়দণ্ডধারী রাজা দেখেছ জয়ন্ত? তুমি দেখেছ রঞ্জন? (পাগলের হাসি হাসিলেন) দেখনি, তবে এই দেখ।

(নয়ন নত করিলেন, স্বর ভাঙ্গিয়া গেলো)

তবে তাই হোক্ বিধায়ক। আপনারই তীব্র প্রতি-হিংসার আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ করতে, আজ আমি আমার জীবনাধিক পুত্রের চির নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দিলাম।

(রঞ্জন ও সভাসদ্‌গণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; প্রায় সমস্বরে)

অসম্ভব! এ আজ্ঞা ফিরিয়ে নিন্ রাজা।

রঞ্জন—কোনো অপরাধে কুমার অপরাধী নন মহারাজ।

(বিধায়কের চক্ষুতে শিকারী বিড়ালের দৃষ্টি)

(অম্বরীষ মুখ তুলিলেন)

অম্বরীষ—আমাকে রাজার নিয়ম পালন করতে দাও কবি। রূপকেতু!

[রূপকেতু ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন। সিংহাসনের সমীপে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন, অগ্রসর হইয়া বিধায়ককে প্রণাম করিলেন]

রূপকেতু—তবে আসি পিতা, আসি গুরুদেব।

(ধীরে ধীরে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সভা স্তম্ভিত)

রঞ্জন—আমাকেও মার্জ্জনা করুন মহারাজ।

(পানিবদ্ধ করিলেন ও রূপকেতুর পশ্চাতেই বাহির হইয়া গেলেন)

সভাকক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অম্বরীষের আর্ত্তকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—

অম্বরীষ—রূপকেতু! আমার জীবনাধিক! যাও বৎস, এ হিংসাকলুষিত রাজ্যে তোমার মত প্রেমিক হৃদয়ের স্থান নাই।

ক্রমশঃ

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর আদর্শ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

এই বিশ্ব সংসারে রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের বিলাস বৈচিত্রের নিত্য যে সুখ দুঃখের লীলা চলছে, মানব অন্তরের অনুভূতিস্পর্শে স্পষ্ট ভাষায় তাহারই প্রকাশকে আমরা সাহিত্য নামে অভিহিত করি। একদিন যখন বাঙ্গালী জাতির নিজের দেশের ও জাতির মুক্তির চিন্তাধারার সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সারথি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় "পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই বাণী সার্থক করে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বাংলার বুকে।

বঙ্কিমকে নিয়ে বাঙ্গালীর গর্বের ও গৌরবের কারণ শুধু তাঁর রূপলোক বা তাঁর জাতীয় উদ্বোধন মন্ত্র বন্দে-মাতরম ধ্বনি নয়, এই মন্ত্রের যাহা মূল ও প্রাণ সেই ভারতাত্মাকে নূতন করে আবিষ্কার ও নূতন করে উপলব্ধি। যখন নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীজাতির কাছে বাংলা ভাষা ছিল নিতান্ত অনাদৃত, অবহেলিত ও অপরিচিত হয়ে, সেই সময় বঙ্কিম তাঁর সর্ব্বতোমুখী অসাধারণ প্রতিভা ও বকুভরা স্বদেশ প্রীতি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের গঙ্গোত্তরিতে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার রসসৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও দেশমাতৃকার তপস্যার মধ্য দিয়ে একই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—"

সাধারণতঃ আমরা বঙ্কিমের উপন্যাস গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি: (১) যার মধ্যে অল্প বিস্তর পরিমানে ঐতিহাসিকতা আছে। যেমন দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা, মৃনালিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি। অন্য গুলির মধ্যে ঐতিহাসিকতা ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কিছুমাত্র নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলিকে সামাজিক উপন্যাস নামে অভিহিত করে থাকি। যেমন রজনী, ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্তর উইল প্রভৃতি। কতকগুলির মধ্যে ইতিহাসের গল্প পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি রচিত হয়েছে কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্যে, যেমন দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতি। এর মধ্যে থেকে দেবী চৌধুরাণীর বিষয় নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা কোরবো।

বঙ্কিমকে আমরা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে মানি। কিন্তু লোকচক্ষে তিনি শিক্ষকের আসনই বেশী কামনা করেছিলেন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আদর্শবাদী। অনেক আদর্শ তিনি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছিলেন। নারীচরিত্রের যে আদর্শ তাঁর মনোমত, দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে সেই আদর্শটি তিনি অতি সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটির বিষয়বস্তু যদিও ঐতিহাসিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তবুও একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এই রচনাটি একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গীতার নিষ্কামবাদ ও ফরাসী দার্শনিক Comteর অনুশীলন তত্ত্ব মিলিয়ে তিনি যে অপূর্ব্ব আদর্শ ও ধর্ম্মের কল্পনা করেছিলেন, ধর্ম্মতত্ত্বে তা প্রকাশিত হয়েছে সেই আদর্শ যাহা আমরা তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে দেখতে পাই তাহা মূর্ত হয়ে উঠেছে আনন্দ মঠের জাতীয় জীবনে, সীতারাম ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পুরুষের জীবনে দেবী চৌধুরাণীর নারী-জীবনে।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,—"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"

বঙ্কিমের এই কল্পিত আদর্শের উৎস কোথায়?

এই কথাটি বঙ্কিমের সম্বন্ধে বলা খুবই চলে। কারণ পশ্চিমের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্য হতে কোমতের মতামতকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছেন এবং এই কোমতের প্রভাবে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কোমতের Culture তিনি অনুশীলন তত্ত্ব বলে মেনে নিয়ে বলেছেন, শারিরীক ও মানসিক শক্তির

অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম ; Culture আর অনুশীলনের অর্থ এক ; এদের মূলমন্ত্র সামঞ্জস্য। বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থির নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই অনুশীলন ধর্ম না হলেও ধর্মের প্রথম সোপান”—

দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল ছিল নিতান্ত দরিদ্র বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান। অদৃষ্টের ফেরে মস্ত বড় লোক জমীদার হরবল্লভ রায় তাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনেন। কিন্তু জননীর মিথ্যা দুর্ণাম শ্রবণে তিনি প্রফুল্লকে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দেন। অভাগিনী প্রফুল্ল নিজের ভাঙ্গা ভাগ্যের পীড়নে যথেষ্ট নিপীড়িত হয়েও কোনও রকমে দিন গুজরান করছিল। কিন্তু জননীর মৃত্যুই তার জীবনের সরল রেখাঙ্কিত পথে দারুন বিপর্য্যয় এবং সৌভাগ্য-গরিমায় উদ্ভাসিত নব আলোক-বর্ত্তিকা এনে দিল।

সেই সময় দুর্লভ রায় কর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে সে বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল এবং বৈষ্ণবের দেহাবসানে তার শেষকৃত্য সমাপন করে তাঁর আদেশানুসারে বহু ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হল। এই সূত্রেই তার ডাকাতের সর্দার শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সাধক ভবানী পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

দেশের অবস্থা তখন দারুণ শোচনীয়। মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্ত গেছে। ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করছেন। রাজার অবর্তমানে রাজ্যশাসন বন্ধ, কাজেই দেশে তখন ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। ভবানী ঠাকুর সেই সময় দেশের ও জাতীর কল্যাণ কল্পে ধনী ও অত্যাচারীদের সর্বস্ব অপহরণ করে দেশের দরিদ্র কাঙ্গালদিগকে দান করতেন। এই সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি একটি রাজা অথবা রাণীর প্রয়োজন অত্যন্ত অনুভব করতেন। হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে সর্ব সুলক্ষণা প্রফুল্লর দর্শনে এবং তাহার সহিত বাক্যালাপে তিনি নিঃসন্দেহে অনুমান করলেন যে বালিকাটী শুধু সুরূপা নয়, সুবুদ্ধিসম্পন্নাও বটে। সেই খানেই তাঁর রাণী লাভের আশা পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

রাণীর আসন অলঙ্কৃত করতে হলে যে সমস্ত বিদ্যা এবং গুণের প্রয়োজন, নিরক্ষর প্রফুল্ল তার কিছুই জানত না তাই ভবানী স্বয়ং নিজ হস্তে তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন।

মানুষের ধর্ম এক এবং তাহার নাম মনুষ্যত্ব—কোম্‌তের অনুশীলন ধর্ম” বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীতে রাণীর চরিত্রে এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোম্‌তের ধর্ম অনুশীলন করতে পারলে মানুষ বাসনা কামনা ইত্যাদির মোহ হতে মুক্ত হতে পারে, তারপর সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে বিজয়লক্ষ্মী স্বহস্তে তার ললাটে বিজয়টিকা অঙ্কিত করে দেন। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন। এবং এরই প্রভাবে সে উত্তর জীবনে প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত শুদ্ধাচারিনীর মত ভবানীঠাকুরের সাধনার পথে চললেন। প্রফুল্ল ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং শিখবার আগ্রহ ছিল তার ততোধিক প্রবল। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ভবানী ঠাকুর প্রদত্ত সমস্ত শিক্ষা আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রথমে সে ব্যাকরণকাব্য গ্রন্থ পড়ল। ভবানী ঠাকুর তাকে যোগ-শাস্ত্রাধ্যায়নে নিযুক্ত করে, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা অধীত করালেন ; পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রফুল্ল সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হল। এর মধ্যে দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর যখন তাকে বললেন, এইবার মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করতে হবে তখন সে বলেছিল “স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে ?” তার উত্তরে ভবানী ঠাকুর বলেছিলেন “দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না”

তখন অতি যত্ন সহকারে প্রফুল্ল মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করল। তার সমস্ত শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করবে” প্রফুল্ল বললে, কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে” গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর—

ভবানী ঠাকুর এই অনাসক্তির কথাই প্রফুল্লর কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। ইহার প্রথম লক্ষণ “ইন্দ্রিয় সংযম··· দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্ম আচরণ নাই···তৃতীয় লক্ষণ, সর্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে”—

প্রফুল্লর সেই বহুশ্রমের সাধনালব্ধ শিক্ষা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একস্থানে একটু ছিদ্র থেকে গেল। একাদশীর দিন সে

জোর করে মাছ খেতো। সে দিন গোবরার মা হাট থেকে মাছ কিনে না আনলে সে খানা ডোবা বিল থেকে নিজে মাছ ধরতে দ্বিধা বোধ করত না। এই কথাটীর নিগূঢ় অর্থ ভবানী বুঝতে পারেননি; প্রফুল্ল কত দেখল, কত জানল, কত পরিবর্ত্তন এল গেল তার জীবনে। সোণার সিংহাসনে বসে সে রাণীগিরি করল, হাজার হাজার পাইক বরকন্দাজ তার একটু চোখের ইসারায় প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকত। সেই হেন ঐশ্বর্য্যশালিনী সন্যাসিনী প্রফুল্লর অন্তরের সর্ব্বোচ্চশিখরে অতি নিভৃতে পাতা ছিল একটী আসন, সেটী তার স্বামী ব্রজেশ্বরের। সেখানে সে রাণী নয় বা তপস্বিনীও নয়, সেখানে সে শুধু স্বামীর স্ত্রী, একটী মাধবী রাত্রির স্বপ্ন-স্মৃতিতে সমুজ্জল ব্রজেশ্বরের প্রফুল্ল। ভবানী ঠাকুরের সর্বতোমুখী শিক্ষা সার্থকতা লাভ করেছে এইখানে, আর এরি মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম নারী-চরিত্রের আদর্শ সর্ব সমক্ষে প্রকটিত করে তুলেছেন।

প্রফুল্ল যখন বললে "স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না"—

তার উত্তরে নিশি বলেছে, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠতে পারে, কেননা তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, গুণ অনন্ত—"

নিরক্ষর প্রফুল্লর হয়ে তখন বঙ্কিম উত্তর দিলেন, ঈশ্বর অনন্ত জানি? কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামীই ঈশ্বর আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা—"

তার এই অতুলনীয় স্বামীভক্তি ক্ষুদ্র স্বার্থর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহা বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর সকলকেই সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবেসে ছিল। তাই জন্য যে স্বামী তার কাছে দেবতার চেয়েও প্রিয় ও কাম্য বস্তু ছিল সেই স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য সে আর পাঁচজনের অনিষ্ট করতে রাজী হয় নি। যখন ইংরাজ সৈন্য অতর্কিতে দেবীরাণীর দলকে আক্রমন করতে উপস্থিত হয়েছে, দেবী উপায়ান্তর না দেখে প্রাণ বিসর্জ্জনে স্থিরসংকল্প করেছে, সেই সময় নিশি যখন বললে,—"তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার…… কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী, তাঁর কথাও একবার ভাবলে না?"

তখন দেবী বললে, "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোনও অধিকার নাই।—আমার স্বামী আমার বড় আদরের কিন্তু তাদের কে?"

ধন্য প্রফুল্ল, ধন্য তোমার জীবন, ধন্য তোমার নিষ্কাম ধর্ম শিক্ষা করা।—

প্রফুল্ল রাণীগিরি করেছে। তাই সে প্রচুর বিলাস ব্যসনের সংস্পর্শে এসেছে। সে ঐশ্বর্য্যের কণাটুকুও তার অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি, অঙ্গের আভরণ হতে পারে নি, শুধু দেহের আবরণ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। সে সমস্ত ছিল কেবল বাইরের ঠাট ঠমক। রাণীগিরি করবার জন্য যে দোকানদারীর প্রয়োজন হয়েছিল, তার অভিনয় মাত্র—কেবল শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম সাধনের জন্য।

ভবানী ঠাকুরের শিক্ষা প্রফুল্লর জীবনে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর শিক্ষার পূর্ণতা প্রফুল্লর জীবনে আর একদিকে অতি সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছিল। সে হচ্ছে নারীর পরম তীর্থস্থান শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী-পুত্র পরিবেষ্টিত সংসারপ্রাঙ্গণ; পাঁচজনের ছোটো বড় নানা অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখের ঘটনাপূর্ণ পবিত্র গৃহস্থালীর মধ্যে। বঙ্কিমের চক্ষে নারীর স্থান অতি শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর সাহিত্যে নারী পেয়েছে আসন অতি উচ্চে। তিনি বলেছেন, নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সংসার। তাই দেবীকে তিনি অত পাণ্ডিত্য শিখিয়ে গুরুভার পূর্ণ রাজত্ব করিয়েও অবশেষে তাকে ফিরিয়ে আনলেন, সেই সংসার প্রাঙ্গণে।

কিন্তু প্রফুল্ল যথার্থই নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা করেছিল। সেই জন্য সে যখন অত লোকজন রাজত্ব সিংহাসন প্রভৃতি ছেড়ে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে পুনরাগমন করল তখন সাগর তাকে জিগ্যেস করলে, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে?"

প্রফুল্ল বললে, "ভালো লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি।

এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোনোও যোগই কঠিন নয়......এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য।" সাধারণতঃ দেখা যায় স্ত্রীলোকেরা সতীনকে শত্রু জ্ঞান করে এবং তার সঙ্গে সেইরূপ আচার ব্যবহার করে। কিন্তু প্রফুল্ল তার অলৌকিক চরিত্রবলে অসাধারণ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, ও সার্বজনীন প্রীতি দিয়ে অন্তরের সেই দুর্ব্বলতাটুকুও জয় করেছিল। স্বামীর চিত্ত তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট দেখে সে অনুযোগ করে বলেছে, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি... ..আমায় যেমন ভালো বাসো, উহাদিগকেও তেমনি ভালো না বাসিলে আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা সম্পূর্ণ হইল না—"

প্রফুল্লর বিষয়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় এবং সুবিবেচনার অসাধারণত্বের গুণে জমীদারীর সমস্ত বিষয় পত্র তারই হাতে এল। সংসারের সে হল কর্ণধার এবং সৎ পরামর্শদাত্রী। তার গুণগানে জমীদারগৃহ মুখরিত। কলহপ্রিয় নয়ান বউও তার কাছে হার মানতে বাধ্য হ'য়েছে।

বঙ্কিম গীতার আদর্শ প্রফুল্লর চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর প্রফুল্ল সংসারে এসে তার সদ্ব্যবহার করেছে। সর্ব্বদা সে কাজ খুঁজতো, এবং কাজ করে অন্তরে যথার্থ তৃপ্তি লাভ করত। তাই সে সংসারের যে কাজে হাত দিত কখনও তা ব্যর্থ হত না। সে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য অপূর্ব বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল সংসারের খুটীনাটী গৃহস্থালীর মধ্যে, আত্মীয় পরিজনের সেবার মধ্যে। এইখানেই বঙ্কিমের প্রফুল্ল-চরিত্র সৃষ্টি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন, "গৃহধর্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়না সেই যথার্থ পণ্ডিত।"

যৌগিক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

অতসী বেশ একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়ে বলে, "না—যাক্, সে কথা আর তোকে বলে' কাজ নেই। আর সে শুধু আমার আর নীলির কল্পনারই জিনিষ, আজকে সফল না হলে কোনদিনই তা' ফল্‌বে না। বলেও শুধু মন খারাপি করা! তার ওপর তোর যেমন মেজাজ—বল্‌তেও ভরসা পাইনে, ছ্যাঁৎ করে' উঠবি বলে।"

অতলার সত্যি রাগ হয়। বাঃ বেশ ত' মজা! দিদি যেন ওকে কথার চার দিয়ে মাছের মত খেলাচ্ছে! "বটে, না বল্‌বে ত মিছামিছি আমাকে বকিয়ে মারলে কেন এতক্ষণ। আমি আর কোনদিনই তোমার কোন কথায় থাক্‌ছি নে!"

অতসী হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, "না বল্‌লেও যখন রাগবি, তখন বলে রাগালেই ভালো! তবে কাণে শুনেই অম্‌নি না রেগে, মনে বুঝে পরে রাগিস্।...নীলী'র বিরাগী দেওর দেবনাথ—নীলি তাকে চায় সংসারী করতে। এই উদ্দেশ্যে সে আমাকে পত্র লিখে যে-অনুরোধটি জানিয়েছে তার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তেম্‌নি—এক তুই ছাড়া, আর কেউ আমাকে কক্ষণো অপরাধী করবে না, যে, আমি একটি খামখেয়ালী মেয়ের জন্যে—যে মেয়ে একেবারে ধনুকভাঙা পণ করে বসেছে যে কোন পুরুষকেই সে বিয়ে করবে না, যেহেতু তেমন উপযুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে একটিও নেই যে তার বর হতে পারে,—সেই খামখেয়ালী মেয়ের জন্যে যদি কোন ইচ্ছা গোপনে পোষণ করে পত্রোত্তরে আমি নীলিকে কিছু লিখে থাকি, এবং তার ফলে—"

ওর বুকের ওপর রাখা দিদির হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে অতলা উত্তেজিত ভাবে উঠে বসতে বসতে বলে, "সত্যি করে বল দিদি, তার ফলে দেবনাথবাবু একদিন

এসে পড়লেন কিনা হঠাৎ আমাদের কলকাতার বাড়ীতে... ?

অতসী রাগের ভাণে বলে, "দেখ্ অতি ; মনে করিস্নি যে তোর রাগ আছে আর আমার রাগ নেই!...লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে তারপর কি বলছি শোন্।"

অতলা বল্তে বল্তে ওর মাথাটিকে নামিয়ে বালিসের ওপর আনে, "ঠিক তবে কি সেই নারীবিদ্বেষীকে জব্দ করার স্কীম্ যা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল সেদিন, সেটা আমাকেই ফাঁদে ফেল্বার ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়, না ?"

অতলার হাতের মুঠি থেকে হেঁচকাটানে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে এনে অতসী এবার অপমানিতের স্বরে বলে, "আমাকে তুই অপমান করতে চাস্ এই কথা বলে !... আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন আর তোর জন্যে এম্নি কিছু করতেন ত' তুই তাঁকে এই কথা বল্তে পারতিস সাহস করে ?

অতলা গম্ভীর ভাবে বলে, "তার চেয়ে তুমি সোজাসুজিই কেন বল্লে না দিদি, যে, তুই আমাদের বড় ভার হয়েছিস, এই লোকটিকে বিয়ে করে মুক্তি দে আমাদের...। আমি হয় ত' চোখ মুখ বুজেই তোমাদের ঋণ শোধ করতুম !"

অতসী তার হাতখানা আবার ওর বুকের ওপর রাখে। কোমল স্বরে বলে, "দেখ অতি" আমি তোকে ভালবাসিনে বলে' কি তোর সন্দেহ হয়!...আমি কি জানিনে যে তুই আমার চেয়েও অনেক জানিস বুঝিস, অনেক বেশী ষ্টাডি করেছিস ? তোর বিচারের বিরুদ্ধে আমি জোর করে কিছু করতে যাব, এ ধারণা তোর কেন হয়, এই আশ্চর্য্য। আমি যদি কিছু করতে গিয়ে থাকি, সে শুধু বিষয়টার সাম্‌নে তোকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই—বিষয় নির্ব্বাচন করবি তুই নিজেই...।"

অতলার দুই চোখ বুজে এসেছে। একটিও কথা বলে না।

অতসী কোমলতর স্বরে বলে, "আমি কোনই ফন্দি-ফিকির করতে যাই নি। দেবনাথের মধ্যে নারীবিদ্বেষের পরিচয় পেয়েছিলুম, এই জন্যেই সেদিন রেগে ঐসব যুক্তি করেছিলুম তোর সঙ্গে। রাগবো না কেন, আমার এমন সুন্দরী বোন, অথচ—"

অতসী হঠাৎ থেমে যায়। অতলার বোজা চোখের পাতা কাঁপতে কাঁপতে সহসাই চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর করে' ফোঁটা ভাঙা জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে।

পূরোপুরিরও পরে ফাওশুদ্ধ নিয়ে নিদ্‌টা শেষে ফিকে হয়ে এসেছে। একটা একটানা করুণ সুর কাণে আস্‌ছে সেই পাতলা ঘুমের ফাঁকে। অনেকক্ষণ ধরে' যেন কেউ সুর করে কাঁদছে। আল্‌গা আচ্ছন্নতা তখনই যায় কেটে, ওঃ, চৌবাচ্চায় জলধরার শব্দ! কানের মানযন্ত্রে শব্দের স্বরগ্রাম মিলিত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, চৌবাচ্চা আধাআধিরও বেশী হয়ে উঠেছে নিশ্চয় না হলে শব্দটা হত অন্য রকম। কতক্ষণ জল এসেছে কলে। চারটের কম নয় বেলা, কি তারও বেশী। এতক্ষণ ধরে সে ঘুমিয়েছে, এই আশ্চর্য্য।

কিন্তু ঠিক কান্নার মত সুর!... বালিসের ওদিকটা খালি। অতি কখন উঠে গেল, ডাকে নি ত ? তখন মেয়েটা কথা বল্তে বল্তে কেমন কেঁদে ফেলেছিল...

অতসীর বুকের মধ্যে বেদনার মত লাগে। কেন, ওসব কথা বল্তে গেল সে ওকে ?—"অতি' অতি'—"

সে উঠে দাঁড়াল ; ওর উত্তর এল না।

ও গেল কোথায় উঠে ?...অতসী হাই তুল্তে তুল্তে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

রোদটা সরে গেছে, কিন্তু শানটা তখনও তপ্ত। অতসী আর একটু দোরের দিকে পিছিয়ে দাঁড়ায়। ওর ঘুমের জড়িমা একেবারেই কেটে যাচ্ছে, আর একবার হাই তুলল। ওর ইন্দ্রিয়বোধের সচেতনতা একই সঙ্গে ওর চোখকে এবং কাণকে জানিয়ে দেয় : লক্ষ্মীনাথ নীচের দালানে কয়লা ভাঙতে সুরু করেছে ; ঘরের ভেতরে ফ্যানটা এখনও বন্‌বন্ করে ঘুরছে—বন্ধ করে দিয়ে আসা হয়নি।

অতসী ঘরে ঢুকে ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে ওদিকের দালানে বেরিয়ে গেল। বাতাস আসছে—জরো রোগীর

হাতের তলার মত গরম। টবের গাছগুলো যে একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েছে···আহা! আজ বুঝি টবগুলোতে জল দেওয়া হয়নি ভুল করে'। অতিকেও ডেকে···

কিন্তু অতি গেল কোথায়; ওদিকে নেই, এদিকেও দেখা যাচ্ছে না। কলতলায় কি?—না, সেই একটানা জল ঝরার শব্দ। নীতিদের ঘরে? হয়ত; নিশ্চয়ই সে স্কুল থেকে ফিরেছে এতক্ষণ, যদিও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অতসী খোঁজ নিতে এগিয়ে চলে।

ওরাই এগিয়ে আস্‌ছে—অতলা ও নীতীশ। অতলা যেন নীতিশকে টেনে নিয়ে আস্‌ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কি হ'ল আবার ওদের মধ্যে?

অতসী আশ্বস্ত হয়, অতির মুখে চাপা-হাসি ফেটে পড়বার মত হয়েছে; মুখভারীর একটুও লক্ষণ নেই।··· কিন্তু নীতুকে কেন টেনে আনছে অমন করে'···?

অপরাধীকে পাকড়াও করে এনে জজের সামনে যেন খাড়া করে অতলা।—জজ কিন্তু তখনও বুঝ্‌তে পারেন নি ব্যাপারটা কি।

—"কি রে অতি?"

"দেখ্‌ছ না, এই দেখ!" বলে' অতলা নীতিশের মাথার পেছনের দিকে একগুছি চুল আঙ্গুল দিয়ে উস্‌কিয়ে তোলে। ওর মুখের চাপা-হাসি এবার বিদ্রূপের তিরস্কারে কঠিন হয়ে ওঠে।

নীতিশ লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে কাঁদতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছে ওর সামনের লম্বা চুল জোরে মুঠি করে ধরে অতলা বলে, "একেবারেই বর-ছাঁটা, জামাই বাবু যা একেবারেই দেখ্‌তে পারেন না দু' চোখে, বিশেষতঃ ব্যাটা ছেলের মাথায়।"

ওঃ তাই ত'! দেখতে কিন্তু মন্দ মানায়নি। কিন্তু কোথা থেকে ও ছেঁটে আস্‌ল এই ইস্কুল ফিরতির মুখে? বলে, "আচ্ছা আমি সব শুনেছি; তুই এখন ওর চুল ছাড়।"

নীতিশ ছোটদির দিকে একবার ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে বড়দির কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে বলে, "আমার কি দোষ! মিঃ স্বামীজি বলেছিলেন এম্‌নি করে' চুল ছাঁট্‌লে দেখতে খুব আপ্‌-টু-ডেট্ হয়। তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন পয়সা···।"

"নিজের কথাটা বাদ দিয়ে বলিস কেন?" অতলা বলে, "তুই তাঁকে বলেছিলি না কি আগে, তাঁর মাথার চুলের মত চুল কর্‌তে তোর ইচ্ছে হয়। নিশ্চয়ই বলেছিলি কারণ আমাকেও তুই বলেছিসি কাল তোর পছন্দের কথা!"

নীতিশ এবার হাতে পিঠ দিয়ে চোখ মোচ্ছ। ছোট্‌দি কিন্তু যে কি ট্রেচারাস্! ভয়ে ভয়ে শুধু বলে "বাঃ! আমার কি দোষ···"

অতসী বলে, "ছেলেমানুষের দোষ কি, দোষ ঐ বুড়ো মানুষটারই!···

নীতু, আয় কাঁচিখানা নিয়ে কলতলায়; আমি ঠিক করে' দিচ্ছি।···অতি গামছা আর সাবানখানা নিয়ে আয় লক্ষ্মীটি ঘর থেকে, চ' গা ধুয়ে এসে পরে চুল বাঁধব।"

নীতিশ বেরিয়ে যেতেই কলঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় অতলা। কি রকম মুখ ভারী করে নীতু গেল, দেখেছ দিদি?"

অতসী নীতিশের পক্ষ নিয়ে বলে, "মুখ ভারী কর্‌বারই কথা, আমি কি চুল ছাঁট্‌তে জানি না আর কিছু!"

অতলার কথায় বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় "স্কুলের ছেলেদের অম্‌নি গান্ধী কাটই ভালো। বব্‌কাট্ একেবারে পাকামী!"

—"কিন্তু বেশ দেখাচ্ছিল নীতুকে ঐ চুলে। তুই নষ্ট কর্‌লি, নাত' আমি বুঝিয়ে বল্‌লেই উনি কিছু বল্‌তেন না।"

অতলা কথাটাকে পরিহাসে ঘুরিয়ে বলে "দেবানন্দ বাবুর বাবরি দেখছি তোমাকেও কম ইন্‌সপায়ার্‌ড করে নি, নীতু ত' ছেলেমানুষ।"

অতসী হেসে বলে, "তুই তাঁকে বলিস্ তাঁর বাবরি ছেঁটে ফেল্‌তে। ঐ জন্যেই তাঁকে তোর পছন্দ হয় না, না?

অতলার হঠাৎ একটা কি অদ্ভুত কথা মনে পড়ে যায়, বলে, হাসির কথা নয়, যদিও হাসি না পেয়ে যায় না দিদি! শোন!"

হেসে স্বরটাকে একটু খাটো করে বলে, "মিঃ স্বামীজি

নাকি ওকে চুমু খেয়েছিলেন সেদিন! শুনচ দিদি, ছিছিঃ ছিঃ!"

হঠাৎ হাসি থামিয়ে তর্জ্জনী উঁচু করে' বলে, "ছেলেটাকে দেখছি স্পয়েল কর্‌বেন উনি আরও দু' চার দিন এখানে থাক্‌লে।"

অতসী বিরক্তির সঙ্গে বলে, "কি মিন্ করে' বল্‌ছিস তুই বুঝছি না। নীতুকে ভালবাসেন বলেই হয়ত' আদর জানিয়েছিলেন, আমিও ত' আগে ওকে কত চুমু খেয়েছি··· আর,—"

মধুর হাসিতে অতসীর মুখখানা ভরে যায়।—"আর তোকেও ত' কম চুমু খাইনি···তোর মনে নেই···।"

অতলার মনে আছে। সলজ্জ হাসির রক্তিমা মুখে নিয়ে চোখ দুটি উজ্জ্বল করে' বলে, "সে আগে যখন ছেলেমানুষ ছিলুম···।"

—"এক বছর আগেও খেতুম। এবং—"

অতসীর ছেলেমানুষি এখনও যায় নি।···বলে, "এবং এই এক বছরে তুই এত বুড়িয়ে যাসনি যে এখনও চুমু খেলে দোষ হ'তে পারে।"

দিদি সাবান মাখা হতেই খপ করে বোনের গলা জড়িয়ে ওর ঠোঁটের উপর ওর চুমু খায় আর বলে "ছেলেমানুষি হচ্ছে না কি সত্যি করে' বল্?"

স্নেহের আবেশে অতলার চোখের পাতা বুজে আসে।

—"বাঃ রে; নতুন বৌয়ের মত হঠাৎ যে চোখ বুজলি লজ্জায়!"

"যাও দিদি!" বলে দিদির হাতের নিগড় থেকে অতলা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে আনে।

চুল না ভেজে এমন কায়দায় কলে পিঠ দিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বলে; "লজ্জায় কি না···"

অতসীর প্রসঙ্গের মেড়টা হঠাৎ ফিরে যায়। সে যেন হঠাৎ আঁতকে উঠছে, এমনি ভঙ্গীতে বলে, "দেখি দেখি—পিঠটা সোজা করে বস্?"

পিঠ সোজা করে বস্‌তে ওর ঘাড়ের দিকের চুল খানিকটা ভিজে' যায়। বিরক্তির স্বরে কৌতূহল লুকিয়ে বলে, "কি হয়েছে দিদি পিঠে, যে········"

ঝিঙের খোসায় সাবান ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বলে, "লক্ষ্মীছাড়া, শুধু সাবান ঘস্‌লেই হয় না, মাখতেও জানা চাই"

একহাতে ওকে কলের জল থেকে তার কোলের কাছে টেনে সরিয়ে বসায়, অন্যহাতে ঝিঙের খোসাটা ওর পিঠের উপর জোরে রগ্‌ড়াতে রগড়াতে বলে, "তাই, বাজি, বুকের দিক থেকে পিঠের দিক কেন কালো·····পুরু হয়ে যে ময়লা জমে আছে মোষের পিঠের মত!"

অতলা ক্লিষ্টস্বরে বলে "মোষের পিঠের মত হ'লেও চামড়াটা দিদি মানুষের······ইঃ! একেবারে ছাল তুলে ফেলবে নাকি!"

"হয়েছে" বলেই অতসী থেমে পিছন ফিরে বসে।—"আমার পিঠটাও একটু একটু রগড়ে দেত খোসা দিয়ে। কিন্তু শোধ নিস নি যেন তাই বলে'!"

অতলা হেসে ফেলে।—একবার তোমার পিঠ চুলকিয়ে দিতে গিয়ে আঁচড়ে' দিয়েছিলাম, মনে আছে দিদি?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে অতসী হঠাৎ গাঢ় স্বরে বলে, "অতি, তখন কথায় কথায় খামোকা কেঁদে ফেল্‌লি কেন অমন করে? কি এমন জায় বেজায় বলেছিলাম আমি তোকে।"

প্রসঙ্গান্তর এমনি অতর্কিত যে অতলা থমকে না গিয়ে পারে না। গলায় একপ্রকার শব্দ হয়, কিন্তু কথার উত্তরে কিছুই ও বলে না।

যেন অনভিপ্রেত, অপ্রীতিকর একটা কিছুর মধ্যে দিদি ওকে ধাক্কা দিয়ে এনে ফেলল এম্‌নি একটা বিব্রত ভাব ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠে। ওর মুখে যেন সহসাই ওর সারা দেহের রক্ত এসে জমেছে···হতে পারে তা লজ্জার প্রকাশ বা অপ্রকাশ বেদনার রক্তিমা।

অতসী সন্দিগ্ধ হয়। অতলা যদি মুখ ফুটে সব বল্‌তে পার্‌ত!···লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ও কিছুই বলে না; কিন্তু অতসী ওকে কিছু বলাবেই। আশ্চর্য মেয়ে—একেবারেই যে মৌনীবাবা! কি বল্‌লুম, শুন্‌তে পাস্‌নি অতি?

অতলা কিছুই বলে না, অদ্ভুত ভাবে একটু হাসে।

অতসী ওর কাঁধে হাত রেখে নির্ব্বন্ধের সঙ্গে বলে

"অতি, সত্যি করে' বলবি, তোর কি এমন কোন দুঃখের কথা আছে যা' তুই বরাবর আমাকে লুকিয়ে যাচ্ছিস ?"

অতলার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।—কি ?

অতসীর স্বরে স্নেহের ক্ষোভ ফুটে ওঠে ; "তার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুই কি ঠিক আগের মত আমাকে আর ভালোবাসিস্‌নে ?"

অতলা এতক্ষণে কথা বলবার একটা ফাঁক পায়, "তোমার কি সন্দেহ হয়, দিদি ?"

অতলা ধীরে ধীরে বলে, "মার পরই যে তুমি আমাকে ভালবাস দিদি সে কি আমি জানিনে···তোমার ভালোবাসাতেই মায়ের অভাব বুঝিনি !"

এক মুহূর্ত্ত দুজনেই চুপ করে থাকে। মনে মনে কিন্তু মার কথা কেউই ভাবে না।

অতলা ভাবে : দিদি কি শুনতে চায় ওর মুখ থেকে ? সে কি কোন কিছুর সন্দেহ করেছে ওর সম্বন্ধে ?—কিসের সন্দেহ !

অতসী ভাবে : এমন কোন্ বেদনাকে এ সঙ্কোচ দিয়ে অমন করে' ঢেকে রেখেছে ! কি এমন গোপন কথা থাকৃতে পারে ওর যে সেকথা ও' আভাসেও তাকে বলতে পারে না ? ও কি গোপনে কারুকে ভালবেসে ফেলেছে, এবং সে এমন গভীর ভালবাসা যে তাকে ছাড়া আর কারুকে ও স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে না ? কি জানি কেউ ওকে সঙ্গোপনে বাগ্‌দান করেছে কি না···। বিয়ের কথায় ও' শুধু রেগে ওঠে না, কেঁদেও ফেল্লে ! কিন্তু কখন্ পেলে ও' এই প্রেম করবার সুযোগ ? আগে বরং দু' চারজন কলেজের ছাত্র এসে আনাগোনা করত তাদের বাড়ীতে অশেষের কাছে, এখন ত কেউই আর বড় একটা আসে না। তাদেরই মধ্যে কি কারু সঙ্গে···

অতসী ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। ঠিক করাও কঠিন ও' যদি তাকে কিছু খুলে না বলে। কোন্ কৌশলে সে ওর মনের কথা ওরই মুখ দিয়ে বার করবে ?

অতসী বলে, "চুপ করে' আছিস্—মা'র কথা ভাবছিস বুঝি ? কিন্তু মা ত' বেঁচে আছেন আমাদের দুজনের মধ্যে আমাদের মমতায়, ভালবাসায়, এ্যাফেক্‌সানে, তাই না ?"

অতলা বংশানুক্রমের দার্শনিকতা না বুঝলেও মাথা নেড়ে সায় দেয়।

অতসী বলে "দেখ অতি, এই হচ্ছে মানুষের জীবনের বড় কথা। মানুষ তার সন্তান মধ্যে বেঁচে থাকতে চায় এবং সেই জন্যেই—"

অতলা বলে, "দিদি গা' টা মুছে ফেল্‌তে ফেলতে কথা হোক, গরমের দিনেও বেশী ঠাণ্ডায় অসুখ করতে পারে !"

অতসী চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে গামছা চিপতে চিপতে বলে "এবং সেই জন্যই মানুষ বিয়ে করে···বিয়ের ইচ্ছে তার নেচারাল।"

অতলা হেসে বলে, "তোমার গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে পিলে হোক্ দিদি ?—আমাকে মাফ কর !"

অতসী বলে, "তোর যে না হবে এমন কিছু নয় !"

অতলা যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাবে চোখ বুজে বলে "ভয়ানক !......সেইজন্যই বিয়ে করব না, আমার প্রতিজ্ঞা"

—"প্রতিজ্ঞা নয়—তোর ফাঁকি। মানুষের রক্তমাংসের শরীরে একটা যে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে কি তুই অস্বীকার করতে চাস ? না তুই সেটাকে জয় করেছিস।

অতলা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বলে,—সায়েনটিফিক হলেও এসব কথায় আমার ভারি লজ্জা করে।...ভুলে যাও কেন, ব্যতিক্রম বলেও একটা জিনিষ আছে। এক কথায় অন্যে যা পারে না আমি তাই পারবার জন্য চেষ্টা করি।

অতলা কাপড় ছেড়ে ভেজা কাপড়খানা পায়ের তলায় ফেলে' দাঁড়িয়ে আছে। অতসী ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে বলে, "দেখ অতি ; তোর আর আমার ভালোবাসা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেই আগের দিনের কথাগুলো একবার মনে কর্। এমন কোন কথা ছিল কি সেদিন যা, তুই আমাকে বলিস্‌নি বা আমি তোকে বলিনি ? তখন আমাদের লজ্জা কোথায় ছিল !"

অতলা অর্থহীন ভাবে একবার মাথা ঝোঁকায়।

অতসী একহাত দিয়ে তার আঁচলখানা কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনে, অন্য হাত অতলার মাথার ওপর রেখে বলে, "সত্যি করে' বল দেখি বোন্‌টি, কোন্ গোপন কথা তুই

আজও আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিস্? তোর মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করে' বল্‌ছি, যে কোন কথাই হোক্ আমি তোর ওপর একটুও রাগ করব না, বরং সাধ্যমত চেষ্টা করব যাতে তোর......"

অতলার মুখ নীরক্ত হ'য়ে পড়তে চায়। ও' তাড়াতাড়ি ওর মাথাটি কাত করে দিদির হাতের আয়ত্তের বাইরে সরিয়ে আনে। দিদি জানে না যে সে কি সাংঘাতিক শপথ করেছে!

অতসী বোনের মুখের পরে ঝুঁকে' পড়ে' মৃদুস্বরে বলে, "আমাকে খুলে বল লক্ষ্মিটী; তুই কাকে মনে মনে ভাল্‌বেসে ফেলেছিস?"

অতলার ঠোঁট দুটি শুকিয়ে ওঠে কিন্তু ও' জোর করে হেসে বলে, "ভালবাসি অনেককেই দিদি, কিন্তু গোপনে নয় প্রকাশ্যে। তোমাকে, নীতুকে, জা-জামাইবাবুকে...." ও' যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। একটা উত্তপ্ত কৌতুক আশ্চর্য্য ভাবে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে অতর্কিতে "আচ্ছা দিদি, ও' মাথা ছুঁয়ে দিব্যি কেটে বসলে...আমি যদি জামাইবাবুকে ভালবেসে থাকি, তুমি কি চেষ্টা করবে তার সঙ্গে আমায় বিয়ে দেবার জন্য!"

বলেই ও' অদ্ভূত ভাবে একটু হাসে এবং ছাড়া কাপড়খানা পা দিয়ে ফুটবলের মত ঠেলে ফেলে কলের তলায়।

অতসী অস্পষ্ট স্বরে একবার বলে 'হু'।

একটু বিবর্ণ হাসি হেসে স্পষ্ট স্বরে বলে, "আজ থেকে আর কোনদিন তোকে বিয়ের কথা বল্‌ব না..."

কৌতুকের ভেতর দিয়ে যেন একটা সত্যের আভাস বিদ্যুতের মত জ্বলে গেল। বিদ্যুতের মতই আকস্মিক এবং যুগপৎ দাহকারী। কিন্তু সাময়িক বোধরাহিত্য কেটে গিয়ে একটা বেদনাবোধ ধীরে ধীরে অতসীর সারা মনে চারিয়ে পড়ল্। সাপের মৃদু বিষের মত সেই বেদনার ভেতরও যেন একটা আচ্ছন্নতা আছে। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগল, কিন্তু অস্থির হয়ে পড়ল না সে। চলাফেরার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটল্ না। সহজ ভাবেই চলে এল সে অতির সঙ্গে আগে-পিছে হ'য়ে কাচা-কাপড় হাতে করে ওপরে। রেলিংয়ে কাপড় মেলে দিয়ে একই সঙ্গে দুজন এসে ঘরে ঢুকল।

অব্যতিক্রমের ভেতরেও অতলা মনে মনে ভাবে, দিদি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট না হ'য়ে পারেনি ওর ওপর। পরীক্ষা করবার ছলে বলে, 'দিদি, চুল বাঁধতে বস্‌ব নাকি?"

—'কবে বেঁধে দিই নে চুল, বস্।"

ঠিক অসন্তুষ্ট না হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে দিদি। এবং সে ক্ষুণ্ণতা, ও বিয়ে কর্‌তে রাজী হয় না বলেই,—কোন গোপন কথার জন্য অবশ্যই নয়। আর, কৌতুক করে' যে ওখন জামাই বাবুর নামটা একটু ঘুরিয়ে বললে,—তা এমন অনেক বোনই দিদিকে বলে থাকে। এমন গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেনি তার জন্যে। ক্রমশঃ

ভাই ফোঁটা

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সাহা

বাংলা দেশের বোন যে তোরা বঙ্গ ললনা,
মোদের ভাল, তোদের মত কেউত ভাবে না।
ভাই-কপালে দিয়ে ফোঁটা,
যম-দুয়ারে দিতে কাঁটা
এমন প্রথা, এমন ঘটা
কোথাও দেখি না,
ভায়ের তরে তোদের প্রাণের শুভ কামনা।
থাকিস্ যদি স্বামীর ঘরে
প্রাণটী কাঁদে ভায়ের তরে,
বছর বছর ফোঁটা দিতে
তাইত ভুলিস্ না;
বুক্‌ভরা এ ভালবাসার নাইক তুলনা।

সেবা যত্নে স্নেহডোরে
বেঁধে তোরা রাখিস যে রে
চিরতরে সহোদরে
কোরে আপনা;
বাংলা দেশের লক্ষ্মী তোরা বঙ্গ ললনা।
ললাট পরে তোদের ফোঁটা
রক্ষা কবচ হয়ে সেটা
হোক না মোদের জয়ের টীকা
জাগাক্ প্রেরণা;
স্নেহ মাখা হাতের ফোঁটা যমেও ছোঁবেনা।

হজরৎ মুহম্মদের উপদেশ

অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ মুনস্যুর উদ্দীন এম-এ

(৪০) আল্লাহ তালা একটি সরল পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এই পথের দুই দিকে দুই প্রাচীর বিদ্যমান। এই প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে বহু সংখ্যক দ্বার আছে; পর্দ্দা দ্বারা সেগুলি আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাস্তার পুরোভাগে জনৈক পথনির্দ্দেশক দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "যাত্রিগণ! সরল পথ ধরিয়া চলিয়া যাও, কদাচ বক্র পথে পা বাড়াইও না।" এই পথ নির্দ্দেশকের উপরেও আর একজন রহিয়াছেন। যে কেহ উক্ত দ্বার সমূহে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—"না না, ও পথে প্রবেশ করিও না, করিলে ধ্বংস নিশ্চয়।" এই সকল পথই ইসলাম ধর্ম্ম; ঐ দ্বারগুলি আল্লাহ তালার নিষেধাজ্ঞা সমূহ; উহাদের উপরিস্থ পর্দ্দা সমূহ আল্লাহ তালার নির্দ্দিষ্ট সীমাচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্য দিকে ঐ পথ নির্দ্দেশক স্বর্গীয় কোরাণ গ্রন্থ ও ঐ উপরিস্থ উপদেশক প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের হৃদয়বাণী আল্লাতালা।

(৪১) আমার কথাসকল আল্লাতালার কথার বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু আল্লাতালার কথা আমার কথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে, এবং আল্লাতালার কোন কোন কথা অপর কতকগুলিকে 'রদ্দ' করিয়া দেয় (জাবের)। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "কোরাণ শরীফের মত আমার কোন কোন কথা অপর কতকগুলিকে রদ্দ করিয়া দেয়।" (এবনে ওমর)

(৪২) সত্য সত্যই স্বর্গীয় আদেশ সমূহ তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি ভুলিও না; অধর্ম্ম কার্য্যসমূহ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেগুলিতে লিপ্ত হইও না; তোমাদিগকে সমস্ত বিষয়ে সীমা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিও না; এবং কতকগুলি বিষয় বিস্মৃত হইতে নিষেধ করিয়াও, সেগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি লইয়া বাদানুবাদ করিও না।

(৪৩) আলি! আত্মাকে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা কর।

(৪৪) আমি আলোক লাভ করিয়াছি, এবং আলোকেই জীবন ধারন করিতেছি।

(৪৫) আমার বাণীই ধর্ম্মবিধি, আমার দৃষ্টান্তই ধর্ম্মমত, এবং আমার অবস্থাই সত্য।

(৪৬) যাহার জিহ্বা ও হস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান; এবং খোতাতালার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমূহ হইতে যে দূরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই মোহাজের।

(৪৭) ইস্লামের মূল বিষয় সম্বন্ধে আমাকে জানাইয়া দিন, যাহাতে কোন বিষয়ে অন্য কাহারও নিকট আমাকে যাইতে না হয়। প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "হে সুফিয়ান! বল যে আমি আল্লা তালার উপর ইমান (বিশ্বাস) আনিলাম; তৎপরে আদেশ সমূহ পালন করিতে থাক ও নিষিদ্ধ কার্য্য সমূহ পরিত্যাগ কর।"

(৪৮) হিংসা যদি ধর্ম্মসঙ্গত হইত, তবে দুই ব্যক্তিই হিংসার যথার্থ পাত্র হইত। একব্যক্তি সেই, যাঁহাকে খোদা তালা ধনী করিয়াছেন, এবং যাঁহার ধন পরার্থে ব্যয়িত হয়। অপর ব্যক্তি সেই, যাঁহাকে খোদা তালা ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছেন এবং যিনি নিজেও ধর্ম্ম কার্য্য করেন এবং অন্যকেও ধর্ম্ম শিক্ষা দেন।

(৪৯) স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকর যেরূপ বিভিন্ন, মনুষ্যগণও পরস্পর হইতে সেইরূপ বিভিন্ন। অজ্ঞতার অবস্থায় যাহারা সৎ থাকে খোদা তালার জ্ঞান লাভ করিলে তাহারা ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাধক হয়।

(৫০) যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কোনও বিশ্বাসীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন খোদাতালাও পরকালে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। যিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচন করেন, ইহকালে ও পরকালে খোদাতালা তাঁহার মঙ্গল করিবেন

বড়দিনে

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

বড়দিনের ছুটি। কলিকাতা নগরীতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টানদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্বদিন ইহা—তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুর আবির্ভাব এইদিনেই হইয়াছিল। দিকে দিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস নানা ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। চৌরঙ্গীর সুসজ্জিত দোকানগুলিতে বড় ধুম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গড়ের মাঠে ভাল ভাল সার্কাসের দল তাঁবু গাড়িয়া বসিয়াছে। প্রত্যেক দিনই এখানে অসম্ভব ভিড় হয়। চারিদিকে হাস্যমুখর নরনারী দেখিয়া মনে হয় যেন ইহাদের মনে কোনও দুঃখ নাই। আজিকার দিনে সকলেই মনের দুঃখবেদনা সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উৎসবে মত্ত।

অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছিলাম, সার্কাস দেখিতে যাইব। কিন্তু কয়দিন অন্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। সেদিন একটু অবসর পাইয়াছিলাম। বন্ধু সীতেশের মুখে শুনিলাম যে গ্রাসন্যাল সার্কাস খুব ভাল খেলা দেখাইতেছে। তাহাদের কতকগুলি খুব ওস্তাদ খেলোয়াড় আছে এবং অনেকগুলি খেলা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। এই সার্কাসে দর্শকের ভিড় অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। সীতেশের কথার দাম আছে বলিয়াই জানিতাম, তাহার কথা কোনও দিন ব্যর্থ হইতে দেখি নাই। তাহার কথা অনুসারে কাজ করিয়া প্রত্যেকবারেই আশানুরূপ ফল লাভ করিয়াছি। এবারও তাহার কথা লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা হইল না, পাড়ার সুবিনয়কে সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত হইলাম।

সার্কাসের দেরী ছিল। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। আমি সুবিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোন সার্কাস দেখলে ?"

সুবিনয় বলিল, আরে ভাই দেখেছিতো একটা। কিন্তু শুনছি সেটার থেকে এটা ঢের ভাল। নইলে কি ভাই আমার মত লোক আবার পয়সা খরচ করে আসে ?"

আমি বলিলাম, তোমার স্ত্রীকে দেখিয়েছ তো ?"

সুবিনয় বলিল, আরে ভাই, ওরা ছেলেমানুষ। বুঝবে কি ? ওদের আমি কিছু দেখাইনে। কয়দিন খুব বায়না ধরেছিল, তা আমি কি দমবার পাত্র ? এ কয়দিন ভাল করে আমার সঙ্গে কথাই বলছেনা।"

আমি বলিলাম, বেশ স্বার্থপর লোক তো তুমি! নিজে দু'তিনবার করে মজা করে দেখছ, আর সে বেচারীর বেলায় অষ্টরম্ভা।"

সুবিনয় বলিল, বাবা! বিয়ে তো করনি, তাই ফস্ করে এই উদার মত প্রকাশ করতে সাহস করলে। ওদের সব কথা শুনতে গেলে কি আর সংসার করা চলে ? ছোট ছেলেদের মত বায়না ধরেই আছে।"

"যাই বল, এ কাজটা তুমি অন্যায় করেছ।

পরে সুবিনয় অনেকগুলি অনাবশ্যক কথা বলিয়া গেল। এদিকে সার্কাসের সময় আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া দুখানা টিকিট করিয়া আমরা তাঁবুর মধ্যে গিয়া আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। সত্যসত্যই লোক অনেক হইয়াছে। সময়টা কাটিবে বেশ।

আমার বন্ধুটির খুব হাততালি দেওয়া রোগ আছে এবং সেই জন্যই আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই খুব উচ্চ দরের খেলা দেখান হইতেছিল। সুবিনয় এরকম খেলা কোনও দিনই দেখে নাই। সুতরাং সে প্রত্যেক খেলাতেই পরম উৎসাহে হাততালি দিতে লাগিল। কানের কাছে বসিয়া হাততালি দিলে আমার ভারী বিরক্ত লাগে। হাততালি দিতে যে কি আনন্দ তাহা ভগবানই জানেন। শুধু হাত ব্যথা করা ছাড়া তো আর কিছু হয় না। ঐতো আমাদের অফিসের চুনীবাবুও আসিয়াছেন, তখন যদি এই দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিতাম! আমি সুবিনয়কে কয়েকবার বেশ ধমক দিলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা ? সে শুধু হাততালি

দেয় আর বলে, দেখনা ওঃ কি সুন্দর! marvellous! বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল।

বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিলাম, কি বিপজ্জনক খেলা! খেলোয়াড়েরা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া দর্শকদের আনন্দের খোরাক জুটাইতেছে। শুধু অর্থের জন্য দিনের পর দিন ভীষণ ভীষণ খেলা দেখাইতেছে। এক তারের গোলোকের মধ্যে সারি সারি ছুরী বসাইয়া দিয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হইল। মধ্যে থাকিল অতি সামান্য একটু ফাঁক। এক চীনাম্যান দেখিলাম অবলীলাক্রমে সেই অল্প ফাঁকটির মধ্য দিয়া পার হইয়া গেল। অথচ একটু পাশে ঘেঁসিয়া গেলে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত।

যেগুলি খুব ভাল খেলা সেগুলির সময় সুবিনয় খালি আমাকে খোঁচা মারে আর বলে, দেখছ? এই তো খেলা। পয়সাগুলো কাজে লাগল। বারে বারে খোঁচা খাইয়া বিরক্ত হইয়া গিয়া বলিলাম, হ্যাঁ নিজের বেলায় তো পয়সাগুলো কাজে লাগে কিন্তু নিজের স্ত্রী দেখতে চাইলেই পয়সার যত অপব্যয়।"

এই সকল খেলার ফাঁকে ফাঁকে একটা ক্লাউন মাঝে মাঝে আসিতেছিল—দর্শকদের আনন্দ দিবার জন্য। সত্যই এত সার্কাস জীবনে দেখিলাম কিন্তু ইহার মত এমন ওস্তাদ ক্লাউন কোনও দিন দেখিলাম না। হাসাইতে এমন পটু লোক কোনো দিন দেখি নাই। তাহার প্রবেশ মাত্রেই হাসির হররা পড়িয়া যাইতেছে। তাহার মনে সর্ব্বদাই আনন্দ। দুনিয়ায় এমন দুই একটি লোক দেখা যায় যাহাদের হাসি অফুরন্ত। তাহারা হাস্যবিতরণে কার্পণ্য করে না। চির জীবন তাহারা হাস্যমুখে কাটাইয়া আসিতেছে। আমি তাহার দ্বারা খুবই আকৃষ্ট হইলাম।

যথাসময়ে খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। সুবিনয় আর হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আমার পিঠে একটি উত্তম চড় দিয়া কহিল, "চল, চল। আজকের দিনটা কাটল ভাল।" তারপরে যথাসময়ে ট্রামে আরোহণ করিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম।

* * * *

পরদিন অন্যমনস্কভাবে গড়ের মাঠে পায়চারী করিতেছি। সঙ্গে কেহই নাই। ছুটির দিন, সামান্য কিছু জিনিষপত্র কিনিবার ছিল। তাহা কিনিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। কালকের সেই ভাঁড়টার কথা ভাবিতেছিলাম। ঐরকম পরিপূর্ণ সুখ আমার যদি থাকিত। তা নয়, আমাদের মনের মধ্যে একটা না একটা দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে। ভগবানের অপূর্ব্ব দান যে মনের আনন্দ, তাহা আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সামনে একটা পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম। ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া চিনিতে পারিলাম। তাইত! এ সেই নয়? সেই অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী লোকটি। আলাপ করিবার ইচ্ছা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—হাতনাড়া দিয়া ডাকিয়া ফেলিলাম, বলিতে কি, কাল ইহাকে দেখিয়া সত্যই আলাপ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

ডাকিবামাত্র তিনি আসিলেন। অমনি নমস্কার করিয়া আলাপ করিতে রত হইলাম। তাঁহার নাম শুনিলাম 'জন'। বহুদিন হইল নাকি তিনি সার্কাসে যোগদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বয়স একত্রিশ বৎসর। ব্যবহারে দেখিলাম খুব ভদ্র; অল্প সময়ের মধ্যেই কথাবার্ত্তা খুব জমিয়া উঠিল। অপরিচিত বলিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। আমি দ্বিধা হীনচিত্তে আমার সমস্ত সাংসারিক গল্প করিয়া গেলাম।

আমি শেষ দুঃখ করিয়া বলিলাম, "জীবনটা কেটে যাচ্ছে একরকম, কোন বৈচিত্র নাই। কলের পুতুলের মত দিনের পর দিন একই কাজ করে যাচ্ছি। মনের পরিপূর্ণ শান্তি কোনদিন পেলাম না। নানা দিক থেকে নানা চিন্তা এরকমভাবে ঘিরে ধরেছে যে হাসির উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। তাই কাল এসেছিলাম সার্কাস দেখতে, দুদণ্ড যদি অন্যমনস্ক থাকা যায়। আপনার পার্ট দেখলাম কাল, আমাদের মনে কি আনন্দ দিয়েছেন তা কি বলবো। আপনার মত হাসিমুখে জীবনটা কাটাতে পারলে আর কিছু চাইতাম না।"

এই কথায় জন এমন একটা ম্লান হাসি হাসিল যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহার মুখে যে ওরকম

ম্লান হাসি দেখিতে হইবে ইহা আমি আশা করি নাই। জন বলিলেন, আমার জীবন যদি সুখের হয় তবে দুঃখী কে! এখন সকল লোকের মনে আনন্দ দিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু এর পেছনে যে আমার কতখানি দুঃখের ইতিহাস লুকোনো আছে তা যদি জানতেন।"

আমি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছিলাম। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম আপনার জীবনের স্মৃতি তাহলে একে একে গুছিয়ে বলুন। এখন ত কোন কাজ নেই।

জন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন "শুধু নিরুপায় হয়ে এই কাজে যোগদান করেছি। এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে এই কাজ যদি তখন না পেতাম তবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতাম। আমি একেবারে মরণের প্রান্তদেশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; আমার কোন আশাই ছিল না। কতদিন অনাহারে কাটিয়েছি। আমি যে এই কাজ করব কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

"তখন আমার বয়স মাত্র বারো বৎসর. পিতার আদরে লালিতপালিত। দারিদ্র্যের কষাঘাত কাকে বলে কোনদিন বুঝি নাই। আমি একমাত্র ছেলে পিতার হৃদয়স্থ স্নেহ সমস্ত আমাকেই ঢেলে দিয়েছিলেন। ওঃ! সে ছিল কি আনন্দের দিন আর তার সাথে তুলনায় আজকের দিনগুলো কি দুঃখের।"

বারো বছর পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব পড়াশুনা করেছি। পড়াশুনায় আমি বরাবর ভালই ছিলাম। উপযুক্ত সুবিধা পেলে এদিকে খুবই উন্নতি করতে পারতাম। তাহলে আজ একটা মানুষের মত মানুষ হতে পারতাম। কিন্তু মানুষের জীবনের উপর ভাগ্যের কর্ত্তৃত্বই সব চেয়ে বেশী; অজ্ঞাত নিয়তি যে দিক দিয়ে টেনে নিয়ে যায় সেই দিকে যেতে মানুষ চিরদিনই বাধ্য।

অকস্মাৎ বারো বছর পরে জীবনের বাঁক ঘুরে গেল। সুখের ক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। সেই সময় হঠাৎ পশ্চিমে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কত মূল্যবান মানবদেহ যে এই যা বেঁচে থাকলে জগতের কত রকম উন্নতি করতে পারত তা বিনষ্ট হতে লাগল। কত বৎসরের লালিতপালিত এই দেহ মানুষ অক্লেশে বিসর্জ্জন দিলে, ধ্বংসের করালমূর্ত্তি চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠল। শুনতে পেতাম আজ এর পুত্র মরল, কাল ওর স্বামী মরল, আর চোখের সামনে শুনতাম আত্মীয়হারা নরনারীর কাতর আর্ত্তনাদ। যুদ্ধের নেশায় সকলে উন্মত্ত। ঐ সঙ্গে আমার পিতারও ডাক পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে। মনে পড়ে তাঁর বিদায় নেবার সেই দিনটা। আমি শুধু তাঁকেই জানতাম। তাঁকে যে ছাড়তে হবে আমি কোনদিন ধারণাই করতে পারি নাই। জানতাম যে চিরদিন সেই রকম সুখে পিতার সঙ্গে থাকব। তিনি চিরদিন আমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবেন—সংসারের দুঃখের স্পর্শ আমার গায়ে লাগতে দিবেন না। তাই তাঁর বিদায়দিনে আমার বেদনা বড় তীব্র হ'য়ে উঠল। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানই সব চেয়ে বড়, তিনি আমার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে চলে গেলেন।

তারপরে সুরু হ'ল নানারকম দুশ্চিন্তা। কবে হয়ত কি খবর আসে। আমি একেবারে মুসড়িয়ে পড়লাম। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি, তাঁকে হারিয়ে আমি একেবারে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম। কেবল ভাবতাম কবে তিনি আসবেন ফিরে বিজয়ী বীরের মত, আবার আমাকে কোলে করবেন। বলবেন, 'বাঃ এত বড় হয়েছিস্!' তারপর আবার সেই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন আরম্ভ হবে। জীবনযাত্রার পথে তিনি হবেন আমার সহায়।

মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতাম তাঁকে। সেই প্রসন্ন সহাস মূর্ত্তি, আমাকে নিয়ে কত আনন্দ করছেন। তারপরে হঠাৎ স্বপ্ন যেত ভেঙে—এক মুহূর্ত্তে আনন্দের অত্যুচ্চ শিখর থেকে দুঃখের গভীর গহ্বরে নেমে যেতাম। হায়! সুখের স্বপ্ন কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে যায়! এই অলীক স্বপ্ন যদি মনে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারে তবে তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না কেন? মনে হত, সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের আজ হয়ত কি পরিবর্ত্তন হয়েছে। কত চিন্তা বোধ হয় তাঁর কপালে গভীর দাগ কেটে দিয়েছে। আমার সেই দয়ালু পিতা আজ মানুষের প্রাণ হরণ করছেন। গভীর নিশীথে একমনে চিন্তা করতে করতে আতঙ্কে শিউরে উঠতাম। বাইরে সব নিস্তব্ধ শুধু ঝিঁঝিঁগুলো একটানা শব্দ করে যেত। ক্রমে আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম।

"এই রকম করে তিন বছর কেটে গেল। যুদ্ধের নিবৃত্তি নেই। এত প্রাণের আহুতি পড়ছে সেই যুদ্ধের

হোমাগ্নিতে, তবু তা নিবতে চায় না, তার তৃষ্ণা আরো বেড়ে ওঠে। লেলিহান জিহ্বা বের করে আরো গ্রাস করতে চায়।

* * * *

একদিন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল আমার পিতা বিপক্ষদলের নিক্ষিপ্ত বোমার আগুনে প্রাণ হারিয়েছেন। শুনে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। মায়ের অবস্থা হল আরো শোচনীয়। ভেবে ভেবে তাঁর দেহে কিছু ছিল না। তিনি এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। নিজের শোক সামলে নিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকলাম। তাদের সঙ্গে মিলে যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করলাম। কিন্তু সে প্রাণহীন দেহ আর উঠল না। একদিনে আমি পিতৃহারা আর মাতৃহারা হলাম।

অতল বারিধিবক্ষে একটা ছোট নৌকা যদি তুমুল ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে তাহলে তার যা অবস্থা হয় আমার সেই অবস্থা হল। চারিদিকে আঁধার দেখলাম। আশার একটা ক্ষীণ রশ্মিও দেখতে পেলাম না। ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে দুঃখের বেদনা কত তীব্র, কি দুঃখে লোকে আত্মহত্যা করে। তখন মনে হত আত্মহত্যা একটা সামান্য কাজ আমার কাছে তা অত্যন্ত সহজ বলে মনে হত। আমি যে তখন উন্মাদ হয়ে যাইনি এই আশ্চর্য্য।

এক ভদ্রলোকের বাড়ী আশ্রয় পেলাম। তিনি আমার কাজের প্রতিদানে যা দিতেন তা যৎসামান্য, সেখানে জীবন কাটাতে লাগলাম পশুর মত। দুবেলা আহার পেতাম তার বদলে তিরস্কার যা পেতাম তাতে মনে হত দুবেলা সেই অবহেলার দান গ্রহণ করতে আমার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু উপায় ছিল না। অবশেষে একদিন সত্যিই আর পারলাম না! সে আশ্রয় ছাড়লাম।

তারপরে কত জায়গা যে ঘুরে বেড়ালাম তার ঠিক নেই। সে সব গুছিয়ে বলতেও পারব না। সে সব দিন গুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে। কতদিন যে অনাহারে কেটেছে। ক্রমে পশ্চিমের অশান্তির ঘনঘটা কেটে গেল। যুদ্ধ থামল অসংখ্য প্রাণের আহুতির পরে যারা বেঁচে ছিল, ফিরে এল। আমার অবস্থা তখন অত্যন্ত হীন। আমি যে বাঁচব তার আশাও ছিল না। তখন এই চাকরী যেন ভগবানের আশীষের মত নেমে এল।

"এই ভাঁড়ের পার্ট করি কিন্তু প্রথম প্রথম অত গভীর দুঃখ চাপা দিয়ে কি রকম করে যে পার্ট করতাম ভেবে অবাক হয়ে যাই! মুখে যখন হেসে আকুল হতাম মনের মধ্যে তখন দুঃখের আগুন দাউ দাউ করে জলছে। অন্তর যখন বেদনায় শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতাম। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি জানতেন যে আমি পারব।

আজ আমি খুব বিখ্যাত হয়েছি। কিন্তু কি গভীর দুঃখ চাপা দিয়ে আমি সকলকে আনন্দ দিচ্ছি তা কি কেউ জানে? সেই বাল্যের আনন্দোজ্বল স্মৃতি আমার মনকে ঘিরে থাকে কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে মাতাপিতা হারিয়েছিলাম কিন্তু সেজন্য বেশীক্ষণ দুঃখ করতে পারলাম না। কঠিন হস্তে শোকাশ্রু মুছে পরমুহূর্ত্তেই উদরের জালায় বেরিয়ে পড়তে হল।"

এইখানে তাঁহার কথা থামিল। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে আমি তো ইহার অপেক্ষা শতগুণ সুখী!

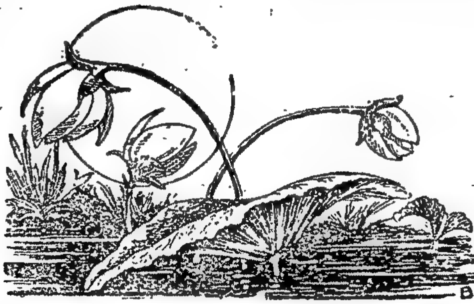

৺দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি বঙ্গ ভাষার ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একজন প্রধান সাধক। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গ সাহিত্যের এই ঐতিহাসিকের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যতদিন যত স্থানে বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্য পরিব্যপ্ত হইবে ততদিনই দীনেশচন্দ্রের নাম ও তাঁহার সাধনার ফল বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধা বর্দ্ধন করিবে।

মানিকগঞ্জের সন্নিকট বোগজরী গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু সেন বংশে ১৭৮৮ শকাব্দে, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৮৬৬ খৃঃ ৩রা নভেম্বর শুক্রবার শেষ রাত্রে, রাত্রি ৪ দণ্ড থাকিতে দীনেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন তাঁহার জনক এবং রূপলতা দেবী তাঁহার জননী ছিলেন। তাঁহার পিতার সাহিত্যবৃত্তি এবং উচ্চমনের অধিকারী হইবার তাঁহার সৌভাগ্য ছিল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তদানীন্তন ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, সেইজন্য পিতৃবিয়োগের পরই অল্প বয়সেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে শ্রম করিতে হয়।

১৮৮৫ খৃঃ তিনি প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তাঁহার পত্নীর বয়স ৮ বৎসর এবং ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। বাল্যকালে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও এই সেন দম্পতি সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর সুস্থ শরীর ও মনে দাম্পত্য জীবন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কিরণচন্দ্র, অরুণচন্দ্র, বিনয়চন্দ্র, বিনোদচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র নামে ছয় পুত্র ও মাখনবালা, ফুলবালা, ব্রজবালা, সুনীতি বালা, সাবিত্রী ও প্রতিভা দেবী ছয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমে হবিগঞ্জ হাইস্কুলের তিনি শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্রাইভেট ছাত্ররূপে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহারই পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুমিল্লায় বাস করিবার কালেই তাঁহার অনুসন্ধানি কার্য্যে স্পৃহা প্রাণে জাগরিত হয়। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের প্রবল ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে জাগরিত হয়; তৎকাল হইতে মরণ সময় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল নানা অনুসন্ধান, রচনা, মৌলিক লেখা, সম্পাদন করিয়া বঙ্গ ভাষা জননীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

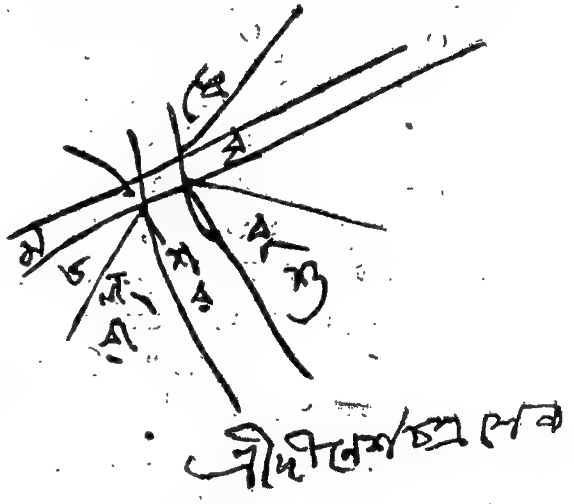

দীনেশচন্দ্রের রাশিচক্র

বাঙ্গালায় পল্লীতে পল্লীতে, উড়িষ্যায় জনপদে জনপদে ভ্রমণ করিয়া "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের জন্য মাল মসলা আহরণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই গ্রন্থখানি ত্রিপুরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উপকার হইয়াছে এবং বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এই পুস্তক রচনা করিতে দীনেশবাবুকে সাত বৎসর ভীষণ শ্রম করিতে হইয়াছিল।

তাহার পরই স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি দীনেশ সেন মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যেরই উপর কয়েকটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। তাহারই ফলে "হিষ্ট্রী অব বেঙ্গলী লেঙ্গুয়েজ এণ্ড লীটারেচার" নামে সুবিখ্যাত বাঙ্গলা ভাষা তত্ত্বের পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১১ খৃঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিল। ১৯১৩ খৃঃ তিনি পুনারায় 'রীডার' নিযুক্ত হইয়া মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে তার নানা ঐতিহাসিক ও নূতন গবেষণার পরিচয় প্রদান করেন এবং কতকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু রিশার্চ ফেলো নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি বাঙ্গালা বহু পুরাতন সাহিত্যের মহামূল্য রত্ন উদ্ধার করেন, শত শত ছাত্র ও ছাত্রীকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করেন। সেই সময় ইংরাজি ভাষায় Chaitnya and his age ১৯২২ সালে, Chaitanya and his companions ১৯১৭ সালে, Folk literature ১৯২০ সালে, The Bengali Ramayana ১৯২০ সালে, Bengali Prose Style ১৯২১, East Bengal Ballads অষ্টম খণ্ডে ১৯২৩ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে তিনি "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" নামে ১৯০৮ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি ১৯১৪ সালে লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা সংগ্রহে পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্ত বিস্মৃত পল্লী সাহিত্য রত্ন উদ্ধার পাইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের অতীত গরিমা, পল্লীর শ্রী, গ্রাম্য সমাজচিত্র বঙ্গের নরনারীর সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জগতের সুধী সমাজ এই গীতিকা পাঠে মুগ্ধ, শ্রীমতী রোমাণ্ড (Romain Rolland এর ভগ্নী) এই পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করাতে পাশ্চাত্য সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বাঙ্গালা ভাষা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা প্রচলন হয় তখন হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত দীনেশ সেন মহাশয় বাঙ্গালা বিভাগে প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের পরেই এই পদে বৎসারবধি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রতী হন। বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং কর্ত্তা।

বাঙ্গলা ভাষায় অনুসন্ধান কার্য্য, গবেষণা, ও মৌলিক রচনার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ সালে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯৩২ সালে তাঁহার অবসরকালে বিশ্ববিদ্যালয় জগৎতারিণী পদক প্রদানে তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

ইংরাজ সরকার ও তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও পরিপুরিষ্ট জন্য তাঁহাকে রায় সাহেব ও রায়বাহাদুর খেতাব প্রদান করিয়া এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেট তাঁকে ইণ্ডিয়ান লিটারারী পেন্সন (সাহিত্য অধ্যাপনা বৃত্তি) প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই বৃত্তি তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্যম বৃদ্ধ বয়সে কণা মাত্র হ্রাস হয় নাই, অবসর প্রাপ্তির পর তিনি ১৩৪১ সালে বৃহৎ বঙ্গ দুই খণ্ডে ১২১৫ পৃষ্ঠা রয়েল সাইজের বৃহৎ পুস্তকখানি রচনা করেন। এই পুস্তকদ্বয় ১ম খণ্ড (৬০৯ পৃঃ) ২য় খণ্ড (৬০৬ পৃঃ) বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃহৎ বঙ্গ পাঠে বাঙ্গলায় শৌর্য, বীর্য, শিল্প, সাহিত্য, সমাজের সুবিস্তৃত কাহিনী, ঘটনা, চিত্র সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য প্রীতি, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সঙ্গেই বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনার ফল প্রদর্শনের শক্তি পুস্তকে প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী, বাঙ্গালার সরল জীবন তাঁহারই আদর্শ, বাঙ্গালার ভাবধারা তাঁহার বিস্তার উৎসব, বাঙ্গালার শিল্প তাঁহার কাম্য বাঙ্গালার বৈষ্ণব দর্শন তাহার প্রিয়, বাঙ্গালার গরিমা তাঁহার গৌরব ছিল ; এই পুস্তকের প্রতি ছত্রের লেখাতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার রচনার সমালোচনার এ সময় নয়। তথাপি মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়, তাঁহার বাঙ্গালা

সাহিত্যে এই বিপুল অবদান যতদিন বাঙ্গালা ভাষা চলিত থাকিবে ততদিন তিনি স্মরণ পথে রহিবেন।

তাঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিপুলায়তনের প্রকাশিত পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, নীলমানিক, রাময়ণী কথা, চাকুরীর বিড়ম্বনা, আলোকে আঁধার, ওপারের আলো, পুরাতনী ধারার দ্রোণ ও কুশধ্বজ; পৌরাণিকী; আশুতোষ স্মৃতিকথা, জড়ভরত, বেহুলা সতী; কানুপরিবাদ ও শ্যামলী; দোহা, পদাবলী মাধুরী, শ্যামল কজ্জল, সাঁজের ভোগ, বৈদিক ভারত, ঘরের কথা, সরল বাঙ্গালা সাহিত্য, রাগরঙ্গ, গৃহশ্রী, ভারত পরিদর্শন, তিন বন্ধু, মালুয়া, ভয়ভাঙ্গা, রাখালের বাঁশরী, মুক্তাচুরী, সুবল সখার কান্ত, বৈশাখী, রেহা, কুমার ভূপেন্দ্রসিংহ এবং গায়ে হলুদ পুস্তকগুলির পরিচয় পাই।

লর্ড রেনল্ডসে সাহেব ভারত সচীব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ও বৃহৎ বঙ্গ পাঠে মুগ্ধ হইয়া ৫পাউণ্ড দীনেশ বাবুকে পাঠাইয়া দেন। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ববীদ এণ্ডারসন সাহেব এই পুস্তকের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও অপূর্ব্ব।

এখনও তাঁহার দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক বঙ্গের পুরনারী এবং বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানি অবদান মুদ্রিত হইতেছে। প্রথমখানি ন্যাসন্যাল লিটারেচার কোং এবং দ্বিতীয়টী মুকদমী লাইব্রেরী প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর ১১দিন পূর্ব্বে প্রথম যেদিন অসুস্থ হন সেই দিবস রাত্রি ১॥ পর্য্যন্ত এই পুরনারী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া শেষ করেন, এই পরিশ্রমই তাঁহার আয়ু নিঃশেষের প্রধান হেতু। মৃত্যুকালে এই পুস্তকখানি কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই দিবস ১০ই নভেম্বর শুক্রবার প্রাতে দীনেশবাবুর বাটীতে যখন গমন করি, সহাস্যবদনে কত আদর করিলেন, প্রচুর জলযোগ করাইলেন। পরিচিতজনকে খাওয়াইতে তাঁর কি আনন্দ, যিনি সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনিই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। জলযোগের পর তাঁহার নস্কারপুরের বাগানে আমার সহিত গমনে ক্লান্তি বোধ করেন নাই। মৃত্যুর দুই দিবস হইতে বহুবার আমার সহিত কথা কহিয়া কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আর অবগত হইতে পারা গেল না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার একখানি ইংরাজী পুস্তক "Fores that ore eory literature মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার ঐশর্য্য প্রকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। বাঙ্গালা ভাষার এরূপ একনিষ্ঠ সাধক জন্মগ্রহণে বঙ্গদেশ যেমন ধন্য হইয়াছে তাঁহার তিরোধানে তেমনি দীন হইল।

তাঁহার মৌলিক রচনা কবিতা, তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদন করিয়া যেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি সাধারণের পরম উপকার সাধিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচক্রবর্ত্তী গোপীচন্দ্র রচনা প্রবেশিক নবীন সাহিত্য, সাহিত্য বীর্য্য পুস্তকগুলিও অন্য গ্রন্থকারের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তিনি যে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের সমজদার ও গুণ গ্রাহী ছিলেন তাহা নহে, বাঙ্গালার শিল্পের ও একজন প্রধান ভক্ত। বহু অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিয়া বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট প্রস্তর শিল্প, কারুশিল্প, বয়ণ শিল্প, কাঁথা, পট-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ বিষয় তাঁহার গবেষণার ফল বৃহৎবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ বহু সম্ভার এখন ত্রিপুরার রাজ ভাণ্ডারে রহিয়াছে। তিনি বেহালার রূপেশ্বর মহাদেবের মন্দির গাত্রে অনেকগুলি প্রস্তর শিল্প ও ভাস্কর্য্যের প্রস্তর টুকরা গ্রথিত করিয়া রাখিয়া তৎদর্শনে অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন। এখনও তাঁহার আলয়ে অনেক মূল্যবান শিল্প সম্ভার রহিয়াছে। সেগুলি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে প্রদানের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

বহু বাধা বিঘ্ন, প্রতিকূল অবস্থা, নিন্দা, বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে সত্য পথ হইতে বিচলিত করে নাই। হাততালীর প্রত্যাশা করেন নাই, স্তুতিতে মুগ্ধ হন নাই। সাধকের মতনই সাধনা করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।

দ্রাবিড় দেশ

শ্রীকমলা দেবী

("সুধর্ম্মা" বালীগঞ্জ কলিকাতা)

(১)

কলকাতা—মাদ্রাজ

বাংলা দেশে আমরা দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে ক'র্‌লে সাধারণতঃ পশ্চিমের কথাই ভেবে থাকি। আমাদের কাছে পশ্চিমের যত সহর আর তীর্থস্থান যেন সর্ব্বদা তাদের ডাক শোনাচ্ছে। "পশ্চিম" এই কথা উচ্চারণ ক'রলেই আমাদের মনে প্রাচীনকালের আর পুরাণের যুগের কত স্মৃতি জেগে ওঠে। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের একটা নাড়ির টান আমরা অনুভব ক'রে থাকি, কারণ আমাদের ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, সভ্যতা, রীতিনীতি, সুরুচি, প্রায় সবই পশ্চিম থেকেই বাংলা দেশে এসেছে। তাই গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতির নাম হ'লেই আমাদের মন নেচে ওঠে—রামায়ণ-মহাভারতের কথা আমাদের মনে জাগে, রাজপুত, পাঠান, মোগল-ইতিহাসের কথাও আমাদের টানে।

কিন্তু দক্ষিণ আমাদের সে ভাবে টানে না। আমরা বড় জোর পুরী অবধি যাই, তার বেশী এগোতে কেউ চাই না। প্রাচীনাদের কেউ কেউ হয়তো সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শন করে আসেন, কিন্তু—দক্ষিণ দেশের সম্বন্ধে তেমন কৌতূহল আমাদের মনে জাগে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভাষাসঙ্কট। আমরা হিন্দি ভাষার সাহায্যে উত্তর ভারতের সব জায়গায় চালিয়ে নিই, কিন্তু দক্ষিণে খুব কম লোক হিন্দি বোঝে, আর তাদের দ্রাবিড়ী বুলি আমাদের কানে অদ্ভুত ঠেকে। তা ছাড়া, দক্ষিণের সঙ্গে আমাদের যোগ তত ঘনিষ্ঠ নয়।

কাঞ্চীপুর, কাবেরী নদী, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর আর কন্যা-কুমারী ছাড়া অন্য কোন তীর্থের কথা আমাদের ঘরে ঘরে তেমন করে পৌঁছয় নি, যেমন করে কাশী-বৃন্দাবন কেদার-বদরী পুরী-দ্বারকার কথা পৌঁচেছে। আর তা ছাড়া দক্ষিণ দেশের সহর আর তীর্থগুলোর নাম কি অদ্ভুত—ত্রিচিনোপলী, তিরুকালিকুণ্ড্‌ম্‌, আন্নামালাই, ত্রিবান্দ্রম্‌ প্রভৃতি। এর চাইতে আরও বিদ্‌ঘুটে নাম আছে।

কিন্তু অনেকদিন ধ'রে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর আর কন্যা-কুমারী আমায় টান্‌ছিল। এই সব জায়গার কথা, যাঁরা দেখে এসেছেন তাঁদের কাছে শুনি, আর আমার স্বামীর কাছেও দক্ষিণ দেশের পুরাতন কীর্ত্তির প্রশংসা শুনি; মহাবলিপুর, চিদম্বরম্‌, তাঞ্জোর, মদুরা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের আর মূর্ত্তির অনেক ছবি দেখেছি। তাই যোগাযোগে যখন দক্ষিণ দেশে আমরা যাবো ঠিক হ'লো তখন মনে খুবই আনন্দ হ'লো।

আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করলাম ১৯৩৯ সালের ১২ই আগষ্ট, শনিবার—আমার স্বামী, আমি, সঙ্গে একজন চাকর।

কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত তেমন কোনও কিছু দেখা হয়নি। গাড়ীতেই মাদ্রাজি খাদ্যের সঙ্গে পরিচয় হ'লো "ভিজিয়ানাগ্রাম" অর্থাৎ বিজয়নগরম্‌ ইষ্টিসানে। আগে থাকতে খবর দেওয়ায়, যখন আমরা সাড়ে-এগারোটায় ইষ্টিসানে পৌঁছালাম, তখন দুইজন ব্রাহ্মণ বেশ পরিষ্কার-ভাবে এলুমিনিয়াম্‌ থালার উপরে আস্ত কলাপাতায় ধব-ধবে আলো চালের ভাত আর তার পাশে ছয়-সাতটা বাটী ক'রে নানান রকমের দক্ষিণী তরকারি দিয়ে গেলো। তরকারিগুলো আমার ভাল না লাগায়, আমার স্বামী একটু দমে' গেলেন। তিনি স্বদেশে বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, সব দেশের রান্না-ই তাঁর কাছে ভাল লাগে। তাঁর অনুরোধে একটা সুপ-জাতীয় জিনিস একটু

খেয়ে দেখলাম যে, সেটা যেমন টক্ তেমনি ঝাল। তিনি তো বেশ চেখে চেখে খেতে লাগলেন, ব'ললেন, এটা টক্ দেওয়া ডালের স্যুপ, খুব হজমি, এর নাম "রসম্"—দক্ষিণ ভারতের সভ্যতায়—দ্রাবিড়ী সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ "অবদান", ইংরেজরা পর্য্যন্ত এই "রসম্"-এর রসে মজেছে, তামিল ভাষায় এই "রসম্"কে বলে "মুল্গু-তন্নীর্" অর্থাৎ "লঙ্কার জল", ভারতবর্ষে ইংরেজদের হেঁসেলে—থুড়ি, ইংরেজদের বাবুর্চ্চিখানায়—এই রসম্ "মালিগাটনী স্যুপ" নাম নিয়ে নিজের জায়গা করে' নিয়েছে। রসমের এই দিগ্বিজয় সত্ত্বেও, একে মেনে নিতে পার্লাম না। আমি ঘি-দই-পাপর আর লঙ্কা-মাখানো সরু সরু কাঁচকলা ভাজা দিয়ে কোন রকমে আহার সার্লাম। স্বামী আশ্বাস দিলেন, এটা তেলুগু দেশ, এখানকার লোকেরা ভাল রাঁধিয়ে নয়, আমরা যাচ্ছি তামিল দেশে, সেখানকার পাণ্ড্য রাজবংশের রাজারা ছিলেন সাক্ষাৎ পাণ্ডবদের বংশধর, অতএব সেখানে দ্রৌপদীর কৃপা আছে, সেখানকার রান্না ভাল হবে।

যাবার পথে উড়িষ্যা আর তেলুগু দেশের মাঝে যে বিখ্যাত চিল্কা হ্রদ আছে তা আমার দেখা হয় নি, কারণ তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—জেগে থাকলেও কিছু দেখতে পেতাম না, কারণ রাত্রি তখন কৃষ্ণপক্ষের ছিল। চিল্কা হ্রদের সৌন্দর্য্য নাকি খুব চমৎকার। একদিকে ডাঙা, সেখানে পাহাড়, আর খুব নারকেল গাছের বন, আর এক দিকে হ্রদ।

হ্রদ হচ্ছে আসলে সমুদ্রের একটা অংশ, ডাঙার ভিতরে চলে এসেছে। এই সামুদ্রিক হ্রদের মধ্যে ছোট-খাট অনেকগুলি দ্বীপ। আমার স্বামী অনেক বছর আগে যখন কলেজে পড়তেন, তখন একবার চিল্কা হ্রদে বেড়িয়ে যান, চিল্কার ধারে রম্ভা ইষ্টিসানে এক বাংলা বাড়ীতে একদিন ছিলেন, তিনি আর তাঁর জন কতক বন্ধু,—আর জেলেদের নৌকা করে হ্রদের জলে বেড়ান। এসব পুরাণো গল্প শুন্লাম। চিল্কার জল নোন্তা, সমুদ্রের অংশ কি না।

নুলিয়াদের মাছধরার অভিযান

চিল্কায় খুব মাছ পাওয়া যায়, আর কল্কাতায় এ সব মাছ চালান হয়,—ভেটকি, পায়রা-চাঁদা, চিংড়ি। ফেরবার পথে প্রথম রাত্তিরে চিল্কার ধার দিয়ে যখন আমরা যাই তখন বেশ জ্যোৎস্না ছিল, তাতে চিল্কার সৌন্দর্য্যের একটা আভাস পাই। হ্রদের ধার দিকে মস্ত এক ধনুকের মতন অর্দ্ধ-চন্দ্র আকারে পাহাড়ের কোল দিয়ে রেলের লাইন চলে' গিয়েছে। নবমীর চাঁদের আলোয় আমাদের বাঁ দিকের তীরভূমি আর ডান দিকের হ্রদের জল যেন একটা রূপালী আলো-আঁধারির পাতলা চাদরে মোড়া। জল চক্চক্ করছে, আর মাঝে মাঝে দুই একটা করে' দ্বীপের গাছ-পালা জমাট

আঁধারের টুক্‌রোর মতন দেখা যাচ্ছে। সবটা যেন অবাস্তব পরীরাজ্যের ব্যাপার। দিনের আলোয় এই জায়গা আমার হয়ত সুন্দর লাগতো না—রাত্রে চাঁদের আলোতে যা দেখলাম আমি তাতেই খুসী, রোদ্দুরে খুঁটিনাটির সঙ্গে সব দেখ্‌তে পেলে বোধ হয় মনকে এতটা ভরিয়ে দিতে পারিতো না।

আমাদের গাড়ি চ'ল্‌ল। পুরো দশ মিনিট লাগলো আমাদের পোল পেরুতে। এই থেকেই নদী কত চওড়া তা অনুমান করতে পারা যাবে। ও দেশে পুরো বর্ষার সময়, তাই দুই কূল ছাপিয়ে ভরা নদী। কাদা-গোলা ঘোলাটে জল, ময়লা মুগার মতন, এক-টানা ধীরগতিতে চলেছে। গোদাবরীর মোহনা রাজমহেন্দ্রী থেকে খুব দূর নয়। এত জল সত্ত্বেও

মাদ্রাজের ক্রাইষ্টেফ্‌র কলেজের ছাত্রী-আবাস

পথে আর একটী প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বেশ খুসী হয়েছিলাম, সেটী হচ্ছে গোদাবরী নদী। রাজমহেন্দ্রী ইষ্টিসানের পরে সন্ধ্যার দিকে গোদাবরী নদীর পোলের উপর দিয়ে

নদীর মাঝে মাঝে খুব চড়া পড়েছে। কতকগুলি চড়া এক একটী দ্বীপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে চাষবাসও হয়; দূর থেকে পূব দিকে দেখা গেলো' সাদা পাল তুলে

দুই চারখানা নৌকা পারাপার করছে। গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় নদী। দক্ষিণের লোকেরা গোদাবরীকে গঙ্গার মতন পবিত্র বলে' মনে করে। আমাদের পূজার মন্ত্রে ভারতবর্ষের যে সাতটী বড় নদীর নাম করা হয় তার মধ্যে গোদাবরী একটী। এই সাতটী নদীর চারটী আমার দেখা হ'লো—গঙ্গা ছাড়া, যমুনা-দর্শন আর তাতে স্নান দুই-ই হয়েছে, এবার গোদাবরী আর কাবেরী দর্শন হলো, যদিও স্নানের সৌভাগ্য আর পুণ্য হ'লো না। তবে আমার স্বামী আগে এই দুই নদীতে নেয়ে গিয়েছেন, "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" এই বচনে আমারও স্নানের পুণ্য তাতে হ'য়ে গিয়েছে। বাকী তিনটী নদী—সরস্বতী, সিন্ধু আর নর্ম্মদা—কবে এদের দর্শন হবে তা ভগবান্ জানেন।

রাজমহেন্দ্রীর পর, ক্রমে অন্ধকার হ'লো, রাত্রি নাম্‌লো। তার পরের দিন সকালে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু দেখবার মতন চোখে আসেনি। খালি ভাষা আর লোকজনদের চাল-চলন যে বদ্‌লাচ্ছিলো, তা বুঝতে পারছিলাম। রাত্রে যখন উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে যাই, তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন উড়িষ্যা আর তেলুগু দেশের মিলনস্থানে আমরা পৌছুলাম। ইষ্টিসানে বাংলা ভাষা আর শোনা যাচ্ছে না, তবে হিন্দি শোনা যাচ্ছে। তেলুগু দেশ আরম্ভ হয়ে যাবার পরেও, মাঝে কোন্ একটা ইষ্টিসানে দেখলাম, কাঠের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা, "হিন্দু চা"—তাহলে এখানেও বাংলা অক্ষরে যাদের ডাকা হয় এমন যাত্রীর আগমন বেশী ক'রে ঘটে। ক্রমে ইষ্টিসানের লোক জন সবাই তেলুগু দেখা দিতে লাগলো; ইষ্টিসানের নাম তেলুগুতে লেখা, চোখে যেমন গোল গোল অক্ষর, কানেও তেমনি ড় আর নয়ের আওয়াজে ভরা ভাষা। ফিরিওলারা এখনও হিন্দিতে দুই একটা কথা বলে, তবে যেমন আমাদের উত্তরের ভাষায় "দুধ" শুন্‌ছি, তেমনি দ্রাবিড়ী ভাষায় "পালু"-ও কানে আসছে। পান ওলারা হাঁকছে "কিলি-বিড়ি", অর্থাৎ খিলি আর বিড়ি; আমার স্বামীর কাছে শুনলাম, আর পরে নিজে গিয়েও দেখলাম, দক্ষিণ দেশে সাজা পান বিক্রী করার নিয়ম নেই, তবে উত্তর ভারতের প্রভাবে সে নিয়ম আস্‌ছে। সারাদিন এই ভাবে তেলুগু দেশের ভিতর দিয়ে গেলাম। তেলুগু ভদ্রলোকদের প্রায় একটু ময়লা রংয়ের বাঙালী বলে ভ্রম হয়। বেশীর ভাগই খদ্দর পরা। সেকেলে ধরণের লোক সংখ্যায় খুব ;—মাথাটী উড়ে-কামানো, পিছনে লম্বা চুলের ঝুঁটি, কপালে ফোঁটা; আবার কেউ কেউ ধুতির উপর নেক্-টাই আর কোট চড়িয়েছেন; তার উপর গলায় চাদর, মাথায় কালো গোল টুপি। কপালে ফোঁটা, সঙ্গে নেক্‌টাই পরেছেন বটে, কিন্তু পায়ে জুতা নেই। তেলুগু কুলি আর রেলের খালাসিরা মাথায় মস্ত মস্ত পাগড়ি জড়িয়ে লাল রংয়ের

তিনিভিল্লী
(তাম্রসভার দারুশিল্পের নমুনা) বেণু গোপাল

ছোবানো কাপড় পরে খাকী কাপড়ের কামিজ গায়ে ঘো
ঘুরি করছে। এখানকার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক
গেঁটে মাকড়ী তো পরেই, তার উপরে অনেকে না
ডান বা বাঁ দিক ফুঁড়ে সোনার তারের এক রকম গে
মাকড়ী পরে', গোঁফওয়ালা মুখের শোভা বাড়ায়

গাড়ি থেকে দূরে সব গ্রাম দেখা যাচ্ছে—ছোট ছে
পাহাড়, লাল মাটীর রাস্তা, খুব বেশী তাল গাছ; মা
গোল গোল কুঁড়ে ঘর, তাল-পাতায় ছাওয়া; কুয়ার ধ

মেয়ের দল জল তুলতে এসেছে—ফেরতা দিয়ে সাড়ি পরা, আমাদের বাংলা দেশে কম-বয়সী মেয়েদের মধ্যে (আর অনেক ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের মধ্যেও) এই মাদ্রাজী ধরণের সাড়ী পরা আজকাল এক রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

এইভাবে নানান জিনিস দেখতে দেখতে আর ওদেশের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে সারা দিনটা কাটিয়ে দেওয়া গেলো। মাঝে কি একটা ইষ্টিসানে একজন গেরুয়া-পরা দণ্ডী সন্ন্যাসীকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিল তার অনেকগুলি শিষ্য, মেয়ে আর পুরুষ দুই-ই। সন্ন্যাসীটী বুড়ো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ থাকলেও, বেশ প্রশান্ত সৌম্য মুখ। তাঁর টিকিট ইণ্টার ক্লাসের, বুড়ো মানুষ সারা রাত ইণ্টারে যেতে হবে, হয়তো একটুও শুতে পাবেন না, তাই মুখে বেশ একটু উদ্বেগভাব ফুটে উঠেছিলো। দক্ষিণ দেশের লোকেরা কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীর মান রাখে; যে গাড়ীতে সন্ন্যাসীটী উঠলেন, সে গাড়ির যাত্রীরা বেশ যত্ন করে' তাঁকে বসালে, তাঁর বিছানার জন্য জায়গা করে দিলে। গাড়ি ছাড়বার সময় তাঁর শিষ্যরা ভক্তিভরে খুব ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করতে লাগলো। বুড়ো মানুষ, রাত্রে শোবার জায়গা পেলেন দেখে আমরাও বেশ খুসী হ'লুম।

আমাদের গাড়ীতে সারাপথ সহযাত্রী ছিলেন একটী মালাবারের ভদ্রলোক। কলকাতায় তাঁর দোকান আছে, মাদ্রাজ সহরে আর অন্যত্রও আছে, জার্ম্মান টাইপ্‌রাইটার আর ফোটোগ্রাফের যন্ত্র প্রভৃতি বিক্রী করেন। পাতলা চেহারার লোকটী, বেশী কথা বলেন না, নম্র, বিনয়ী, অত্যন্ত ভদ্র।

সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় মাদ্রাজ সহরে পৌঁছুবার আগে, বাঁ দিকে আমরা বালিতে ঢাকা জমী আর ঝাউ আর নারকল গাছের বন দেখে বুঝতে পারলুম যে সমুদ্র কাছেই। দুই এক জায়গায় দূর থেকে সমুদ্র নজরেও পড়লো। মাদ্রাজ ইষ্টিসানে পৌঁছবার আগে, একটা ছোট ইষ্টিসানে গাড়ী অনেকক্ষণ থামলো। ইষ্টিসানে এক হিন্দু চায়ের ষ্টলে খুব যাত্রীর ভিড়, সকলে তিলের তেলে ভাজা গরম গরম কড়াইয়ের ডালের বড়া আর "উপ্‌মা" অর্থাৎ নোন্‌তা হালুয়া, আর কফি কিনে খেতে লাগলো। আমার স্বামী কফির ভক্ত, দুটো পাতলা পিতলের বাটী করে তাঁকে কফি দিলে; আমার জন্য কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে—ও কফি আমি বুঝি না। এই ইষ্টিসানে আমাদের টিকিট নিলে। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ইষ্টিসানে পৌঁছুলাম, আমাদের হাওড়ার তুলনায় এই ইষ্টিসানকে ছোট-ই ব'ল্‌তে হবে। কুলিরা দুই এক কথা হিন্দি জানে। নানা হোটেলের লোকেরা আমাদের ছেঁকে ধ'রলে। কোথায় উঠবো আগেই ঠিক ছিল, "মডার্ণ হিন্দু হোটেল"-এর সুখ্যাতি শুনেছিলাম, তাদের লোক মাল-পত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিলে, আমরা তার সঙ্গে হোটেলের দিকে রওনা হলাম।

পৌষের গান

শ্রীহেমলতা দেবী

মাটিতে ধনের ঘড়া
গড়াগড়ি যায়
আকাশে হাত বাড়ায়ে
যাচি যে ধন—হায়!
তাকালে মাটির পানে
মেলে ধন ক্ষেতের ধানে
অড়হর মুগ মুশুরীর
পউষ-পসরায়!

সারাদিন মাটি কেটে
ফেরে যে পায়ে হেঁটে,
শ্রমে তার ছন্দ আনে
মাটির টানে
মেঠো ভঙ্গিমায়।
মাটি আর মেঠো সুরে
ছাতি যার উঠলো পুরে
হাঁকে "ধন আয় নিবি রে—
খুশির ব্যঞ্জনায়

সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়

নারীগণকে স্বাবলম্বিনী করিবার জন্য সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয় যে বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা দিনে দিনে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এ বৎসর ঐ বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক। (১৯৩৯) ডিসেম্বর মাসে যে-সব ছাত্রী দুই বৎসরের শিক্ষা শেষ করিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনেও সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ রাখিতে পারেন তৎপ্রতি প্রত্যেক ছাত্রীর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য একটি মিলনবাসর গত বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ বৎসরও অনুরূপ মিলনবাসর যাহাতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

ছাত্রীগণের পাঠস্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য স্কুলের লাইব্রেরীটি নূতন ভাবে গঠিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকাগারে প্রায় পনর শত পুস্তক ও নানাবিধ মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিকপত্র রাখা হইয়াছে। ঐ সব পুস্তক যথারীতি আদান-প্রদানের জন্য একজন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষা নিযুক্ত আছেন। ছাত্রীদের মধ্যে যাহাতে সাহিত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে সুসাহিত্যিক এবং বক্তাগণকে আহ্বান করিয়া সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

বাহিরের মহিলাগণও যাহাতে এই পুস্তকাগারের পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন, তাহার জন্য অচিরে একটি "ফ্রি রিডিং রুমের" বন্দোবস্ত করা হইবে। এই রিডিং রুমে যে কোন মহিলা আসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

আগামী জানুয়ারী মাসে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির যে বার্ষিক প্রদর্শনী হইবে, ঐ প্রদর্শনীতে শিল্প-বিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্বহস্ত-প্রস্তুত বহুবিধ কারু ও চারু শিল্প প্রদর্শিত হইবে।

জুনিয়ার ট্রেণিং বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে এবং ঐ বিভাগের কার্য্যকারিতাও ক্রমশ বাড়িতেছে। বর্ত্তমান বৎসর ঐ বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য যাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উত্তীর্ণা হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভর্ত্তি হইবেন। আমরা সর্ব্ব সাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা সামর্থ্যানুযায়ী এই শিল্প-শিক্ষালয়কে যে যে-ভাবে পারেন সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

রচনা প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের জীবন-চরিত অবলম্বনে "ভারত-নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক ৫০৲ টাকা ও কুড়ি টাকা মূল্যের ২টী পদক যথাক্রমে ১ম ও ২য় পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। কেবল মহিলারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। প্রবন্ধ ৫ই জানুয়ারী (১৯৪০) মধ্যে ৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে "বঙ্গলক্ষ্মীতে" প্রকাশ করিতে পারিবেন।

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০৩+১।৶, মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত এই গীতাটী সুন্দর কাগজে ছাপা ও সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই। ইহাতে গীতার মূল শ্লোক, অন্বয়, অন্বয় মুখে প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দে প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, দুর্ব্বোধ্য অংশের সরল বাংলা পাদটীকা ও বর্ণানুক্রমিক শ্লোক সূচী এবং অনুবাদ, গীতা ধ্যান, গীতা মাহাত্ম্য ও গীতা পাঠ বিধি আছে। অন্বয়ার্থ এ অনুবাদ শঙ্করাচার্য্যের গীতা-ভাষ্যানুযায়ী করা হইয়াছে এবং মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি অন্য যে সকল টীকাকারগণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেই সকল স্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কোন পকেট গীতাতে এতগুলি বিষয় একত্রে পাওয়া যায় না।

গীতা হিন্দুমাত্রেরই পরমপ্রিয় নিত্য পাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গীতাখানি যে শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের নিত্য পাঠোপযোগী হইয়াছে তাহা নহে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ অন্যের সাহায্য ব্যতীত অনায়াসে অবগত হইতে পারেন, উহা সম্পূর্ণরূপে তদুপযোগী হইয়াছে। এইরূপ একখানি গীতা প্রত্যেক হিন্দু গৃহে থাকা আবশ্যক। ইহা গীতাতত্ত্ব প্রচারে পরম সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে সকল পাঠক পাঠিকা নিজে নিজে গীতার্থ বুঝিতে পারেন না, আমরা তাঁহাদের সহৃদয় দৃষ্টি এই বইখানির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই গীতার বহুল প্রচার কামনা করি।

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা—কাজী দীন মহম্মদ, বি-এ, বি-টি প্রণীত, ৮২ সদর বক্সী লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত; মূল্য ১।৶০

রসরাজ অমৃতলালের পর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের খোরাক যোগাইয়াছেন "বীরবল" ও "পরশুরাম"। তাঁহাদের হাস্যরস উচ্চাঙ্গের এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি পাঠকদের উপভোগ্য। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে যে অভিনব হাস্যরস পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা একাধারে উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি লেখকের কৌতুকোজ্জ্বল ভাষার ছটায় এমন সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে তাহা পড়িয়া আনন্দ লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনে তীব্র বেদনার মেঘ জমিয়া উঠে। কাহাকেও আঘাত না করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়া দেওয়া বড় কম ক্ষমতার কথা নহে। গ্রন্থখানি যেরূপ যুগোপযোগী সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

বাংলা ভাষার উপর লেখকের দরদ সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি কোথাও অনাবশ্যক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যেখানে ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে সেই শব্দটিই প্রয়োজ্য।

একাধারে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পরম উপভোগ্য এই রস রচনাটীকে বাঙালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

চিত্রলেখা:—শ্রীখগেন্দ্র নাথ ঘোষ; এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক ১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১।০

কবিতার বই। সর্ব্বশুদ্ধ ছাব্বিশটী কবিতায় গ্রথিত গ্রন্থখানি পড়িয়া ভাল লাগিল। কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং আছে সাবলীল ভাব-ব্যঞ্জনা। কিন্তু যাহা হইবার,—রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত অধিক। তথাপি ভাল লাগিল, কারণ কবিতাগুলি সত্যিই কবিতা হইয়াছে। গদ্যরূপী কাঁঠালের আমসত্ত্ব নহে। কবি চেষ্টা করিলে রবীন্দ্র প্রভাব হইতে অন্তত কিছুটা মুক্ত হইতে পারেন, এমন সম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে।

কয়েকটী লাইন :—"চিরন্তনী, হে চির অমরী,
তোমারে অমর করি কবি যাবে মরি!
কবির হৃদয় হতে কাব্যের আসনে
কবির মানস হতে সবাকার মনে
তোমায় প্রতিষ্ঠা হবে।"

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

জবাকুসুম তৈল—আমরা স্বনামখ্যাত কেশতৈল "জবাকুসুমের" একটি সুদৃশ্য প্যাকেট প্রাপ্ত হইয়াছি। জবা কুসুমের গুণ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ঘরে ঘরে আদরণীয় এই তৈলের প্যাকেটটিও এমনি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে রূপশিল্পীর গৃহের ইহা একটি অনুপম উপাদানে পরিণত হইয়াছে। এই মহোপকারী তৈলের জনপ্রিয়তা বাঞ্ছনীয়।

"ইণ্ডিয়ান হোম" এর শুভ চেষ্টা

"হোম এডুকেশন কমিটি" হইতে আমরা একটি সুন্দর পুস্তিকা পাইয়াছি। ইঁহারা Indian Home নামক একখানি সুন্দর মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি "গৃহে খাদ্য সম্বন্ধে যত্ন" সম্বন্ধীয়। সুন্দররূপে চিত্রিত। গৃহে কিরূপে খাদ্য অপচয় হয়, কিরূপেই বা উহার যথাযোগ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং কোন খাদ্য কিরূপ গুণসম্পন্ন তাহাও আলোচিত হইয়াছে। ইঁহাদের উদ্দেশ্য, যাহাতে সাধারণ ভদ্রগৃহস্থগণও খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং সতর্ক হইতে পারেন। এই সাধু উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহারা যে এই কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে সকলেই ইহা সাদরে গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেকেই এই সৎকার্য্য অনুমোদন করিবে।

উক্ত "ইণ্ডিয়ান হোম" এর ঠিকানা,
৩০ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, এস্‌প্লেনেড্ ফোর্ট, বোম্বাই।

গোলাপজল—গোলাপজল চিরদিনই অবাঙালীর নিকট হইতে কিনিতে হয়। অথচ উক্ত বস্তুটি চক্ষুরোগের ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রয়োজনে নিত্য ব্যবহৃত হয়। কোন বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কারখানায় গোলাপজল, গোলাপী আতর বা অনুরূপ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইতে দেখিলে স্বতঃই আনন্দ জন্মে। কে, এল, সাহার নিকট হইতে আমরা এক শিশি গোলাপ জল পাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা বাজার প্রচলিত যে কোন গোলাপজল হইতে গন্ধে, গুণে কিছুমাত্র ন্যূন নহে, অথচ দামে সস্তা এবং বাঙ্গালীর প্রস্তুত। ঐ কোম্পানীর কারখানা আলিগড় সহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। কলিকাতার অফিস ৬৪।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। নিজস্ব গোলাপবাগ থাকায় ইহাদের প্রস্তুত জল অত্যুৎকৃষ্ট। আমরা সার্ব্বসাধারণকে উক্ত কোম্পানীর গোলাপজল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ঐ কোম্পানীর প্রস্তুত গন্ধতৈলের নির্য্যাসটিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছয় আনা মূল্যের এক শিশি নির্য্যাস এক সের তিল বা নারিকেল তৈলকে সুবাসিত করে এবং গন্ধ বেশ স্থায়ী হয়। দুর্মূল্যের দিনে গন্ধ তৈল ব্যবহারকারীগণ ইহা ব্যবহার করিলে আর্থিক দিকেও লাভবান হইবেন।

———

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

ম্যাট্রিকছাত্রীদের বৃত্তি—গত জুন মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে কিন্তু ছয় মাস বাদে তাহার বৃত্তি ঘোষণা হইল। ইহাতে ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে ক্ষমা ব্যানার্জ্জি (বেলতলা গার্লস) রঞ্জিতা দে (ব্রাহ্ম গার্লস), মাধুরী লাহিড়ী (মালদা) ও অমিয়া দাসগুপ্ত (বারহামপুর) মাসিক ১৫৲ করিয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছেন।

২১ জন ছাত্রী ১০৲ দশটাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে রঙ্গপুরের রেজিনা খাতুন একমাত্র মুসলমান ছাত্রী। ভিক্টোরিয়া ২ জন, ব্রাহ্মগার্লস ৩ জন ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছেন; অবশিষ্ট বেলতলা গার্লস, গোখেল, ডায়োসিসেন বীণাপাণি, চুঁচড়া বালিকা, কুমিল্লার কায়জুন্নিসা, চাঁদপুর প্রতিমা মিত্র, কুমিল্লা শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, মেদিনীপুর মিশন, বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় হইতে এক একজন ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছেন।

আসামের মহিলা মন্ত্রী—আসামের কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলী পদত্যাগ করায় যে নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে তাহাতে এক পার্ব্বত্য রমনী, মিস নাম্নু একজন মন্ত্রী

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে দ্বিতীয় মহিলা মন্ত্রী। ইতি পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলীতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রথম মহিলা মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই মহিলা মন্ত্রী নিয়োগে আমরা আনন্দিত।

মাদ্রাজে আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার পত্তন

স্ত্রী শিক্ষার গোড়ার পত্তন মিস কুক (পরে মিসেস্ উইলসন) ১৮২৪খৃঃ করেন। হেদুয়ার পূর্ব্বে রাজা বিশ্বনাথ বাহাদুরের বদান্যতায় ভারতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হয়।

মাদ্রাজে তাহারই পরে সি, এম, এ বিদ্যালয় স্থাপন হয় কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে সর্ব্ব প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ১৮৩১ খৃঃ স্থাপিত হয় তিন্নিভেল্লী সহরে। মাদ্রাজে ১৮৪১ সাল হইতে ১৮৪৯ সালের মধ্যে ছয়টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকলগুলি মিসনারীদের দ্বারা; তাহার মধ্যে ক্রাইষ্টচার্চ বালিকা বিদ্যালয় অন্যতম। মাদ্রাজে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে হইয়াছে। ১৮৮২খৃঃ মাদ্রাজ এডুকেশন কমিশন রিপোর্টে এই ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতা আর্ট স্কুলে ছাত্রী-বিভাগ

মেরী হারবার্ট কলিকাতা আর্ট স্কুলের চিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে মহাশয় আর্ট স্কুলের মহিলাদের চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, জ্ঞাপন করেন। ইহাতে বাঙ্গালী মেয়েদের চিত্রাঙ্কন শিখিবার অতিশয় সুবিধা হইল। আর বাঙ্গালী মেয়েদের ইদ্রিশ খা বি-এর ন্যায় মাদ্রাজে গিয়া চিত্রাঙ্কণ শিখিতে হইবে না।

কেন্দ্র সমিতির কথা

পৃষ্ঠপোষিকা

বাংলার মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের পত্নী মাননীয়া লেডী হারবার্ট সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পৃষ্ঠ-পোষিকা হইতে সম্মতা হইয়া সমিতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।

প্রচার কার্য্য

ফরিদপুর:—আলোচ্য মাসে কেন্দ্র সমিতির প্রচারজন্য পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ ফরিদপুর জিলার নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহে বিভিন্ন মহিলা সভায়—কুটীর শিল্প, শিশু মঙ্গল, প্রসূতিকল্যাণ, সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির গঠন-প্রণালী ও কার্য্য ধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা প্রথমে বেলগাছিয়া, পরে নলিয়া গ্রাম, বোয়ালমরী, কামার গ্রাম, সোটাশী; চতুল, কাশিয়ানী এবং পিঞ্জলিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এই প্রচারের ফলে পুরাতন মহিলা সমিতি ব্যতীত চতুল ও গোতাশী গ্রামে ২টি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়।

হাওড়া:—বর্ত্তমান মাসে অন্যতম প্রচারক শ্রীযুত সুধীরলাল সরকার হাওড়া জিলার বিভিন্ন গ্রামে গমন করিয়া মহিলা সভায় সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম্মধারা, জাতিগঠনে মেয়েদের স্থান, শিশুপালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমে তিনি আমতা থানার অন্তর্গত ঝিকড়া রাউতাড়া, আমড়াগড় এবং পরে বড়গাছিয়া থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া, গোবিন্দপুর, মাজু এবং নরেন্দ্রপুর গমন করেন। অতঃপর বালি থানার অন্তর্গত কোণা, খেলিয়া, চামড়াইল এবং মাজের হাট প্রভৃতি গ্রামে গিয়া মহিলা সভায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দেন। এই গ্রামগুলির মধ্যে কতিপয়

গ্রামবাসী নিজ নিজ গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

মহিলা-সমিতির-প্রতি নিবেদন

সবিনয় নিবেদন :—

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র সমিতির বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপরই কেন্দ্র সমিতির এই অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। এই প্রদর্শনী ও উৎসব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

সুতরাং আশা করি, আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট ও ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে শিল্প দ্রব্যাদি পাঠাইয়া বাধিতা করিবেন।

সমিতির প্রতি নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতিগুলির উন্নতি-কল্পে বর্ত্তমান বৎসর (১৩৪০ সাল) মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা ও প্রতিনিধিগণের কয়েকটী অধিবেশনের ব্যবস্থা হইতেছে।

আগামী ১৭ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই অধিবেশনের কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইবে। এই সঙ্গে উহার কর্ম্মসূচী প্রদত্ত হইল।

এই সভায় আপনার ও আপনাদের সমিতির এক বা একাধিক সভ্যার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন কারণে আপনার যোগদান করা সম্ভব না হইলে সমিতির পক্ষ হইতে অন্য মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা প্রার্থনীয়।

আপনার ও সমিতির একজন প্রতিনিধির বাসস্থান এবং আহারাদির ব্যবস্থা আমরা করিব। সম্পাদিকার বা একজন প্রতিনিধির যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করিতেও আমরা প্রস্তুত রহিলাম।

এই পত্র পাঠান্তে আপনার সমিতির সভ্যাগণের সহিত আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব সত্বর উত্তরদানে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

কর্ম্মসূচী

১৭ই জানুয়ারী—মফঃস্বল মহিলা সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। সময়, অপরাহ্ন ১টা—২টা
মহিলা সম্মেলন " ২টা—৫টা

১৮ই প্রতিনিধিগণের বিশেষ অধিবেশন (ইহাতে, নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে)

(ক) মহিলা সমিতির কার্য্যবৃদ্ধির পথে অন্তরায়
(খ) এই অন্তরায় দূরীকরণের উপায়
(গ) অর্থ-সমস্যা ও তাহার সমাধান
(ঘ) ব্যক্তিগত মন্তব্য ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ

১৯শে জানুয়ারী,—প্রার্থনা সভা, প্রাতঃ ৮টা ১০টা
বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সভা—অপরাহ্ন ৫। টা

২০শে সমিতির সভ্যাগণের অধিবেশন ও সাধারণ আলোচনা। —প্রাতঃ ৮টা ১০টা

সভ্যাগণকে কলিকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা। —মধ্যাহ্ন ১২টা— ৪টা

বিনীতা
শ্রীনীরজবাসিনী সোম
কলিকাতা কেন্দ্র-মহিলা-সমিতির
সম্পাদিকা

আনন্দাশ্রম

শ্রীপ্রেমা দেবী

সরলতা যারা কুটীলতাকে জয় করিবার দৃঢ় বিশ্বাসে একদিন একাকী লক্ষ্মীগিরিকে নিভৃতে ডেকে সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ ও দুর্নীতি পরায়ণতার কথা নিয়া বিস্তর আলোচনা করেন। স্বস্তিবাচন শুনেই উচ্চশিক্ষাভিমানিনী গৈরিক ধারিণী মহা অহঙ্কার ভরে বলে উঠ্‌লেন,—কি, আমাকে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া, এতবড় স্পর্দ্ধা! কত পড়াশুনা কর্‌লাম। কত তীর্থ পর্য্যটন করে সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ কর্‌লাম, স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করে যথারীতি সাধন, ভজন ও জনহিতায় শিক্ষাদান ব্রতে নিযুক্তা আছি, আর সেই আমাকে আদর্শ শিখাতে আসা। কি আশ্চর্য্য? ভট্টশালী মহাশয় অহঙ্কারের মাত্রাধিক্য দেখে মহা উত্যক্ত হ'লেন, তবু ধীরভাবে বল্‌তে লাগলেন—অহঙ্কার, ক্রোধ, দম্ভ, ঘৃণা, ত্যাগপথের পাথেয় নহে। বড় বড় সাধু মহাজনদের উপদেশ আছে যে, আদর্শ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকার কাছ থেকেও গ্রহণ করা চলে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোবির সহিষ্ণুনা' হতে পারলে যথার্থ ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। আপনি অমুক লোকের নিকট মিথ্যা রটনা করেছেন কেন? সংসারের নানা চাপে গৃহীরা সময় সময় নানা মিথ্যা কথা বলে থাকে সত্য, কিন্তু অহেতুক মিথ্যা কথা বল্‌তে সন্ন্যাসী হ'য়ে আপনার বাধে না? আপনি আর দু'জন কর্ম্মীর সহযোগে যে গুরুতর অপরাধ করেছেন, তাতে প্রতিষ্ঠানের এবং বিশেষ করে আপনাদের সমূহ ক্ষতি হবে বলে আমি এ যাবৎ কাউকে জান্‌তে দেইনি। আর আপনারা এর প্রতিদান স্বরূপ যার তার কাছে আমরই বিরুদ্ধে যা-তা মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন! ধন্য আপনাদের বুদ্ধি, ধন্য আপনাদের কায! আদর্শ ভঙ্গ করে ঘোর অন্যায়াচরণ কর্‌বেন, আবার চোখ রাঙাতে ও পেছু কামড়াতে ছাড়বেন না। তা করবেন বই কি, আজকাল পোষাকী সাধু সন্ন্যাসীরা গেরস্থদের চাইতেও যে অধম বলে লোকে গালাগাল দেয় তা ঠিকই দেয়। আমি একজন খুব বড় নাম করা সন্ন্যাসীর বিষয় সাক্ষাৎভাবে জানি। মিথ্যা বল্‌তে বা আদর্শ ভঙ্গ করতে তাঁর মোটেই বাধে না। একবার কোন বিশিষ্ট লোক তাঁহাকে এক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করতে আসেন। সন্ন্যাসী তাঁর অনুরোধ শুনেই বলে উঠলেন—আমিত কোথাও যাই না হে!' আগত ব্যক্তি ছাড়বার পাত্র নহেন, তিনি সাধুর মুখে উচ্চারিত প্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত মিথ্যা কথার প্রতিবাদে বহু স্থানে সাধুর যাতায়াতের সত্য ঘটনা উল্লেখ কর্‌লেন। সাধু অপ্রস্তত হয়েও নির্লজ্জ ভাবে বল্লেন্—আরে, সে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলুম। আগত ব্যক্তি ও মুখের উপর বলে দিলেন—অন্যত্র যদি হাওয়া খেতে যেতে পারেন, তবে আমাদের এখানে না হয় একটু ধুঁয়া খেতেই গেলেন। এই ত গেল তাঁর সত্য নিষ্ঠার কথা, এর পর তাঁর আদর্শ নিষ্ঠাও চমৎকার! তিনি যে মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত, কামকাঞ্চন বিরাগী সন্ন্যাসী, সৌভাগ্যবশতঃ কাঞ্চনের পরশ পেয়ে সেই মণ্ডলীর সহিতই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সর্ব্বাগ্রে আদর্শ ভঙ্গের পথ মুক্ত করেন। বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরই যদি এমনতর ব্যাপার, তবে আপনাদের আর কা কথা?

কাঁহার সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় এ সব বল্‌ছিলেন লক্ষ্মী গিরী অনায়াসে বুঝতে পার্‌লেন এবং রাগে গর্ গর্ করতে লাগলেন। তাঁর আরক্তিম চক্ষু তারা ঠিকরে পড়ার উপক্রম। তিনি প্রচণ্ড স্বরে গর্জ্জিয়া উঠলেন—এত বড় কথা। যাঁর আশ্রয়ে থাকা খাওয়া, তাঁরই বিরুদ্ধে কথা। ধর্ম্মে সইবে না। শ্রীশ্রীভগবান রামহরি বাবার যিনি সাক্ষাৎ শিষ্য তাঁর চরিত্র নিয়ে তিক্ত সমালোচনা; কত বড় ঔদ্ধত্য, কত বড় স্পর্দ্ধা? ভট্টশালী মহাশয় কথা কয়টি শুনে আবার বল্‌লেন—গিরী মাইজী, আমায় কেহ দয়া করে খেতে থাকৃতে দিচ্ছে না, খাট্‌ছি অফুরন্ত—তার তুলনায় সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন অতি তুচ্ছ। গতর খাটাতে পার্‌লে যেখানে কেন থাকি না, খেতে নিশ্চয় পাবো। সেজন্য ভাবনা নাই কিন্তু সত্যকে মিথ্যা দিয়ে চাপা দেবার অভিনব আদর্শ গেরুয়ার অন্তরালে দেখেই যত ভাবনা হচ্ছে। দোষ

যিনিই করবেন তিনিই দোষী বলে লোক চক্ষে হেয় হবেন। বড়লোক বলে ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলবে না, আর গরীব হলে সবাই ঢাক পিটাবে—বিংশশতাব্দিতে সাম্যবাদ ও গণজাগরণের যুগে এই মিথ্যা আদর্শ কেউ মান্‌বে না। যদি তাই মান্‌তে হয়, তবে স্বয়ং বাবা তারকনাথের প্রতিভূ মোহন্তকে কলঙ্কের জন্য গদীচ্যুত করা চলে না! আপনাকে আর কি বল্‌ব, একে মাতৃজাতিয়া, দ্বিতীয় ভগ্নী, যা ভাল বুঝ্‌ছেন তাই করুন্! আমি আর আপনাদের ত্রিসীমানা মাড়াচ্ছিনা। স্বামিজী সুস্থ থাক্‌লে একটা হেস্তনেস্ত করা যেত, তাঁর এই দারুণ অসুখের সময় তাঁকে গিয়ে এসব নিয়ে জ্বালাতন করা আর তাঁকে যমদ্বারের দিকে এগিয়ে দেওয়া একই কথা। আপনি তাঁকে এ নিয়ে উত্যক্ত কর্‌বেন না—এই শেষ অনুরোধ।

ভট্টশালী বিতাড়ন

ভট্টশালী মহাশয় চলে গেলে লক্ষ্মীগিরী তাঁর সকল কর্ম্মের সহায়ক পুরুষ কম্মিদ্বয়ের সহিত গুজুর গুজুর অনেক পরামর্শ করে শেষে স্বামীজীর প্রতি নিক্ষিপ্ত ভট্টশালীর নিদারুণ মন্তব্য অবিলম্বে তাঁহাকে জানান স্থির করলেন। কাজেই পরদিন আনন্দাশ্রমে ছেলেদের বিভাগে ভট্টশালী মহাশয় কুটীর শিল্প শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকা কালে ঠিক সুযোগ বুঝে লক্ষ্মীগিরী স্বামিজীর রোগশয্যা পার্শ্বে গিয়ে হাজির হলেন এবং পরিনাম চিন্তা না করে চরম শয়তানী বুদ্ধিতে ভট্টশালী কথিত আদর্শ ভঙ্গ ও মিথ্যা কথনের ব্যাপার সব পল্লবিত করে স্বামীজিকে নিবেদন কর্‌লেন। কপট ক্রন্দনের সুরে তৎপ্রতি ভট্টশালীর দুর্ব্যবহার, সর্ব্ব বিষয়ে অসহ্য মাতব্বরি, যেন তাঁর অধীনেই দাসখত দিয়ে সবাইকে থাক্‌তে হচ্ছে ইত্যাদি অনন্ত অভিযোগ কর্‌তে কর্‌তে চোখের জলে নাকের জলে এক কর্‌লেন। যে যত বড় মহাপুরুষই কেন হউন্ না এবং যত উদার নীতিই বক্তৃতায় ও লেখায় ঘোষণা করুন্ না, অধীনস্থ লোকের মুখে দোষ ত্রুটির সত্য সমালোচনা শুনে হজম কর্‌বার মত সহিষ্ণুতা কাহারও নাই। বৃদ্ধ ও রুগ্ন সৌবর্ণানন্দ স্বামীর অসহিষ্ণুতাই পুরামাত্রায় প্রকাশ পেল। ভট্টশালীর প্রাণপাত পরিশ্রম, অতুলনীয় সহকারিতা সব ভুলে গেলেন। প্রবলের মুখে অসত্য আত্মনিন্দা শুনেও কিল খেয়ে [illegible] করার নীতিতে নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা চলে, কিন্তু [illegible] দুর্ব্বলের মুখে খাঁটি সত্য আত্মনিন্দা শুনে চুপ্ করে [illegible] মস্ত বড় কাপুরুষ ও পারে না। তাই স্বামিজী শয[illegible] থেকে ক্রোধে মনে মনেই লাফাতে লাগলেন এবং ক্ষিপ্ত প্রা[illegible] হয়ে লক্ষ্মীগিরীকে বল্‌তে লাগলেন—বুঝেছি, ও বড্ড বে[illegible] গেছে, আমার সঙ্গেই কত তর্ক-বাদানুবাদ করে, আর তোমাদের সঙ্গে কা কথা? দাঁড়াও, আজই ওকে তাড়াতে হবে। এই কথা কয়টি বলে একজন সেবককে দি[illegible] ভট্টশালীকে ডেকে পাঠালেন। ভট্টশালী ছুটে এ[illegible] স্বামিজী সকাশে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মীগিরিকে দে[illegible] দেখেই তিনি বুঝ্‌লেন, রুগ্ন বৃদ্ধকে অশান্তির বিষাক্ত প[illegible] সেবন করায়ে কি যে অনর্থের আয়োজন হচ্ছে। [illegible] ভবিষ্যত চিন্তা তাঁকে ততটা বিচলিত কর্‌তে পারেনি, যতটা করে ছিল স্বামিজীর আকস্মিক অনিষ্ট স[illegible] চিন্তা। স্বামিজী ভট্টশালীর প্রতি রোষকষায়িত দৃ[illegible] কর্‌লেন মাত্র। কিছুক্ষণ কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না। কয়েক মিনিট এই ভাবে থাকার পর স্বামিজী হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লেন, তোমার ব্যবহার দেখছি অনেকে[illegible] অসহনীয় হয়ে পড়েছে। তা কাজ কি বাপু গো[illegible] প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে কিছুকাল অন্যত্র কোথাও [illegible] থাক্‌লেই যেন সব ভাল হয়। তারপর সবার মনো[illegible] পরিবর্ত্তিত হলে ফের আসা যাবে'খন। যদি দরকার [illegible] কর, এখান থেকে তোমার যাবার জন্য প্রস্তুত হতে [illegible] সময় নিতে পার। শ্রীযুক্ত ভট্টশালী নীরবে [illegible] বৃদ্ধের অতি কষ্টে উচ্চারিত উত্তেজনাপূর্ণ [illegible] বিচারের হুকুম শুন্‌ছেন আর প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধির [illegible] চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছেন। [illegible] সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করেই কর্ত্তা যে চরম বিচার-দক্ষতা দেখালেন তদ্দর্শনে কোন বাদানুবাদ নিষ্ফল [illegible] 'স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন' নীতি পালন করাই তিনি শ্রেয়ঃ ম[illegible] কর্‌লেন। ভট্টশালী সরল আনুগত্য সহকারে উত্তর [illegible] স্বামীজিকে, এ অবস্থায় আপনাকে উৎপীড়িত হতে দেখে আমার কষ্টের অবধি নাই। যাক্ আপনার আদেশ শিরো[illegible] আমায় সময় নিবার মোটেই দরকার নাই, এই মুহূর্ত্তে

আমি আশ্রম থেকে চল্লুম। সকলেই নীরব। সামান্য চাদর জামা যা গায়ে ছিল তাই নিয়ে ধীরে ধীরে ভট্টশালী নিজ প্রাণপাত শ্রমে গড়া আনন্দাশ্রম ছেড়ে যে দিকে দৃষ্টি যায় সেই দিকে ধাবমান হলেন। আশ্রমের সবাই হাহুতাশ করতে লাগল। একটা অমঙ্গল সূচক বিষাদের ছায়া আশ্রমকে ঘিরেছে বলে যেন স্পষ্ট অনুভূত হতে লাগল। ভট্টশালী-বিতাড়নের পর সপ্তাহকাল মধ্যেই হঠাৎ হৃদযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে স্বামী সৌবর্ণানিন্দ মারা গেলেন। চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। আনন্দাশ্রমের আনন্দের হাটে নিরানন্দ দাবানল দাউ দাউ করে জলে উঠ্‌ল। স্বামিজীর দেহরক্ষার মাস কতক পরেই আশ্রমের সকল বিভাগের কায ক্রমে অচল হয় আস্‌ল। সকলকে সন্তুষ্ট রেখে কর্তৃত্ব করার মত যোগ্য প্রবীণ লোক কেউ নাই; বিশেষ করে নারী-শিক্ষাশ্রমে বিশৃঙ্খলার মাত্রা এত বাড়্‌ল যে মার্কিন মহিলারা তিষ্ঠান অসম্ভব বুঝে স্বদেশ ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। আশ্রম কমিটির সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের হিতৈষীগণ ক্রমে লক্ষ্মী গিরীর স্বরূপ বুঝ্‌তে পার্‌লেন। মেয়েদের অভিভাবকদের সঙ্গে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনাময় ব্যবহার করায় মেয়ের সংখ্যা বিস্তর কমে গেল। শেষ সহকারী পুরুষ কর্ম্মীদ্বয়ের সঙ্গেও বেবন্তী ঘটায় আত্মীয়রূপে সংগৃহীত ব্যাঙ্কের টাকাগুলি মেরে নিয়ে তারা উধাও হ'ল। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন দুরবস্থার ভিতর প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব টল্‌টলায়মান হ'য়ে উঠ্‌ল। শ্রীমতী লক্ষ্মীগিরী এমনতর দারুণ প্রতিকূলাবস্থার কথা পূর্ব্বে কখনও ভাব্‌বার অবকাশ পান নাই। এখন কায়দায় পড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তাইত কি করা যায়?

ক্রমশঃ

কেন ভালোবাসি

পৃথিবীর অধিকাংশ লোক চায়ের এত ভক্ত কেন? সারা জগতে এত অসংখ্য লোকের চা না হ'লে চলে না কেন? লণ্ডনে এবং বিলাতের অন্যান্য জায়গায় কিছুদিন আগে অনেক বাড়ীতে চা-সম্পর্কে এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' পাঠানো হয়েছিলো। বাড়ীর কর্ত্তা এবং গৃহিণীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কেন এবং কখন তাঁরা চা খান। এই সব প্রশ্নের যাঁরা জবাব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে, দেখা গেছে শতকরা ৩৫ জন সকালের খাবার আগে চা খান; শতকরা ৯৮ জন সকালের খাবার সঙ্গে খান; শতকরা ৮৮ জন বিকেলে খান এবং শতকরা দশজন রাত্রে শোবার আগে খান। এ-ছাড়া দুপুরের আগে এবং রাত্রির আহারের পর চা খাবার অভ্যাসও অনেকের আছে।

'কেন তাঁরা চা খান' এ প্রশ্নের উত্তরে এরা যে-সব কারণ জানিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, চায়ের সুগন্ধ এবং তাজা করে' তোল্‌বার শক্তি। পুরুষরা যেমন চায়ের সতেজ করে' তোল্‌বার শক্তির উপরই জোর দিয়েছেন বেশি, মেয়েরা তেম্‌নি চায়ের সৌরভটাকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। অন্যান্য যে-সব কারণে লোকে চা খায় বলে' জানিয়েছে তা'র মধ্যে চায়ের তৃষ্ণা নিবারণের শক্তি, এর সুলভতা এবং শীতের দিনে শরীর উষ্ণ করে' তোল্‌বার ক্ষমতা অন্যতম। একজন বিখ্যাত চৈনিক কবি চা'কে সহস্রগুণসম্পন্ন পানীয় আখ্যা দিয়ে এর সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্বের যে ইঙ্গিত করেছিলেন তা'র প্রমাণ ঐ সব প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়।

'চা লোকের এত প্রিয় কেন' তা'র কারণ বিশ্লেষণ করে বিলাতের "ডেইলি টেলিগ্রাফ এণ্ড্ মর্ণিং পোস্ট" নামক বিখ্যাত কাগজ সম্প্রতি লিখেছে:

"নিয়মিত সময়ে লোক চা খায় কেন? এক পেয়ালা চায়ের মধ্যে তা'রা কি পায়? এ-সব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব আছে; নিজেদের অভিজ্ঞতার থেকে তা'রা জানে যে চা দ্রুত শক্তি ফিরিয়ে আনে এবং এর থেকে তৃপ্তি ও আরাম পাওয়া যায়।"

চায়ের তেজোদায়ক শক্তির কথা উল্লেখ করে' লেখক বল্‌ছেন:

"স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রে চা শক্তি সঞ্চার করে। তার ফলে কাজে মনোযোগ আসে, স্মৃতিশক্তি বাড়ে, একটা চটপট ভাব আসে এবং মানসিক ক্লান্তি কমে যায়।"

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা চা নিয়ে গবেষণা করে' যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেগুলোর মোটকথা এই লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন:

"টাইপ্‌রাইটিং, হিসেব কষা এবং পড়া ও নম্বর দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করে' দেখা গেছে যে চা মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি এক কথায় মানসিক বৃত্তিগুলো জাগিয়ে তোলো। পরীক্ষা ক'রে এ-ও দেখা গেছে যে সাধারণত আমরা যেরকম চা খাই তাতে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া তো হয়ই না, বরং মানসিক বৃত্তিগুলোর সতেজভাব অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে।"

সরোজনলিনী

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব জীবনের যাত্রার পথে দাও দাও এই বর
হে হৃদয়েশ্বর,
প্রেমের বিত্ত
পূর্ণ করিয়া রাখুক চিত্ত,
যেন সংসার মাঝে
দক্ষিণ মুখ রাজে,
সুখে পাই তব ভিক্ষা,
দুখে পাই তব দীক্ষা,
মন ক্ষুদ্রতা করুক মুক্ত,
নিখিলের সাথে হোক সে যুক্ত।
শুভ কাজে যেন না মানে ক্লান্তি।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন
১৪ই পৌষ, ১৩৪৬

সরোজনলিনী

নারী মঙ্গল সমিতি

সরোজনলিনী স্মৃতি-সংখ্যা

বিলাতে ক'দিন

—সরোজনলিনী

৭ই জানুয়ারী ১৯২০। সকালে উঠে স্নান করলুম; তারপর কাপড় পরে প্রাতরাশের পর আমরা হেঁটে "কেন-সিংটন গার্ডেনে" গেলুম; বস্তা (সরোজনলিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) তার কলেজে গেল। আমরা হেঁটে Lyceum Club পর্য্যন্ত গেলুম, সেখানে মিস মেটা আমার ছাতাটা এনে পোর্টারের (ক্লাবের চাকর) কাছে রেখে গেছে, লিখেছে, আমি সেদিন তার বাড়ী চা খেতে গিয়ে ছাতাটা ফেলে এসেছিলুম। আমি একখানা ঢাকাই সাড়ী পোর্টারের কাছে রেখে এলুম মিসেস টাটাকে দেবার জন্য। তারপর সেখানেই ক্লাবে ভর্ত্তি করবার কি-কি নিয়ম, তাই দেখলুম। পরে ব্রম্পটন রোড্ হয়ে হেঁটে বাড়ী এলুম।

লাঞ্চ খেয়ে বসবার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বসে ইতিহাস পড়লুম। তাতে "ইজিপ্ট"এর প্রাচীন সভ্যতার কথা আছে। উনি বুঝিয়ে দিলেন। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত পড়ার পর চা খেয়ে আমরা "হাউস ডেকরেশন একজিবিশন্" (গৃহসজ্জা-প্রদর্শনী) দেখতে গেলুম। হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট গ্যালারীতে এই প্রদর্শনীটা দেখবার মত।

বিশেষভাবে গরীব লোকদের অল্প পয়সাতে কেমন সুন্দর করে ঘর সাজান যায়, আর কি রকম বাসন ইত্যাদি ব্যবহার করলে কম পয়সায় ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তাও দেখিয়েছে। এটা দেখে আমরা আবার ভূগর্ভ পথ দিয়ে বাড়ী এলুম। দেখলুম বস্তা ফিরেছে। সবাই ডিনার খেতে বসলুম। বাবার, ডলির ও দিদির চিঠি এলো ; বাবার চিঠি বস্তার চিঠির মধ্যেই ছিল, সেজন্য আসতে দেরি হয়েছিল। আমরা জ্যোতিষের চিঠি কালই পেয়েছি। "কুক্"রা (টমাস্ কুক কোম্পানী) বস্তার চিঠি বড় দেরিতে পাঠায়।

পরদিন সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। স্নানাদি সেরে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরুলুম। বস্তাকে ভূগর্ভ-রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমরা ব্রম্পটন রোড্এ কিছু জিনিষপত্র কিনলুম। তারপর হেঁটে নাইটস্ ব্রিজ হয়ে কেন্সিংটন-পার্ক দিয়ে গ্লচেষ্টার রোড্ হয়ে জুতার দোকান ও পশমের দোকান হয়ে বাড়ী ফিরলুম

এসে লাঞ্চ খেয়ে একটু পড়লুম। সাড়ে তিনটায় ভূগর্ভ-রেল ধরে বেরন্স্ কোর্টএ নাবলুম। সেখান থেকে হেঁটে মিস লিসের বাড়ী চা খেতে গেলুম।

মিস লিস বেশ বাড়ীতে আছেন, ওঁদের নিজেদেরই বাড়ী। ওঁর অন্য অবিবাহিতা বোন আর তিনি একাই এখানে থাকেন। মিসেস এমারসন, ওঁর ছোট বোন, ওঁদের সঙ্গে থাকেন না। তিনি একটু পরে আসবেন বলেছিলেন। মিস লিস অনেক কথাবার্ত্তা বল্লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ; চা খাওয়ালেন।

তিনি বল্লেন যে বিলিতি মেমরা ভারতবর্ষে গিয়ে সে-দেশের ভাষা শিখতে চেষ্টা করে না, এটা বড় দুঃখের বিষয়। এমনি নানারকম কথা হোল। সিউড়ীর পিতল ও কাঠের পাত্র ওঁদের ঘরে সাজান রয়েছে দেখলুম। পাঁচটার সময় মিসেস এমারসন এলেন ; তিনি ক্রম্ওয়েল রোড্ এ থাকেন। সেটা আমাদের হোটেলের মতই একটা ছোট হোটেল। মিসেস এমারসন বুধবারে আমাদিকে তাঁর বাড়ী চা খেতে যেতে বললেন। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করলুম।

এমারসনের এক ছেলে আছে, সে স্যাণ্ডহার্টস্এ পড়ে ; ভারতীয় সেনাদলে আসছে বছর যোগ দেবে। এখন ছেলের বয়স উনিশ বছর।

"বুকের তলা ভরলো এসে
আকুল সে আহ্বান !
চলতে পথে পাশাপাশি
পড়লো ঝরে ফুলের রাশি
পূর্ণ হোল এই পৃথিবীর
পূজার অনুষ্ঠান ॥"

—হেমলতা দেবী

আমরা ৬টার সময় এখান থেকে বিদায় নিলুম। মিসেস এমারসন আগেই চলে গিয়েছিলেন। এমারসন ঢাকার কমিসনার হবেন ও লিস বোর্ডের মেম্বর হবেন—মিস লিস বল্লেন।

বাড়ী এসে দেখলুম বস্তা ফিরে এসেছে। তখনো ডিনারের ঘণ্টা হয় নি। একটু গল্প করা গেল।

৯ই তারিখে কলেজ নাই, সেজন্য আমরা তিনজনে হেঁটে গ্লচেষ্টার রোড্ হয়ে কেন্‌সিংটন পার্কে বেড়াতে গেলুম। সেখান থেকে পশমের দোকানে কোটের গলার কাছে একটা চেন লাগিয়ে জুতোর দোকান থেকে জুতো নিয়ে বাড়ী এলুম। এসেই আমরা সবাই দেশের মেলের জন্য চিঠি লিখলুম। আমি হেমতাকে ও জ্যোতিষকে লিখলুম, তারপর লাঞ্চ খেয়ে কিছুক্ষণ শেলাই করলুম। বস্তাও বসে তার পড়া তৈরী করলে।

চারটায় চা খেয়ে উনি ওঁর কেম্‌ব্রিজের কলেজের সহপাঠী একজন বন্ধু Mr Dines এর বাড়ী গেলেন। বন্ধুটি মিটিরিয়োলজি অফিসে কাজ করেন। তিনি ওঁকে বলেছেন যে এ বছর শীতটা খুব শুষ্ক হবে, বেশী বৃষ্টি হবে না। আমরা আর বেরুলুম না, বড় ঠাণ্ডা ছিল। তাছাড়া বস্তা পড়তে চাইলে, আমারও কুঁড়েমি লাগল। উনি সাতটার সময় ফিরে এলেন। *

* সরোজনলিনীর লিখিত বিলাত-ভ্রমণের দিনলিপি হইতে।

'পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও, মেয়েদের চরিত্রই তাদের প্রধান অলঙ্কার; মেয়ে যদি সম্পূর্ণ সচ্চরিত্রা না হয়, পতিব্রতা না হয়, তবে তার শিক্ষা, ধন, মান, সাজ, সজ্জা, জাঁক জমক সবই বৃথা। সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আমরা—আমাদের দেশের মেয়েদের চরিত্র এমন হওয়া উচিত যেন অন্য দেশের মেয়েরা তার অনুকরণ করতে পারে।'

—সরোজনলিনী

স্মৃতি-তর্পণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আজি-স্মরি নাম শ্রদ্ধায় সেই মহীয়সী মহিলার,
যিনি সাধ ক'রে লইলেন শিরে মা'র দায়িত্বভার।
গৃহে গৃহে যিনি দীপ হাতে করি'
ঘুরিলেন সারা যৌবন ভরি।
যাঁহার অভয় হাস্যে দীপ্ত শতশত সংসার।

যিনি অসহায়া বাঙালী নারীর হৃদয়ের গূঢ়কথা
জানিতেন নিজ মর্ম্মে মর্ম্মে, বুঝিতেন তার ব্যথা।
নারী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা-দান
ছিল যাঁর মহাব্রতের সমান,
তাঁর গুণগান—স্মৃতি পূজা নয়,—অর্চ্চনা দেবতার।

আজি দেহে নাই, কোন গেহে নাই, স্নেহে শুধু তাঁরে পাই।
প্রিয় দয়িতের হৃদয়-সরোজে নিয়াছেন তিনি ঠাঁই।
তবু ব্রত তাঁর যান্‌নিক ভুলে,
আজিও শুষ্ক জীবনের মূলে
ঢালে রসধারা তাঁহার হাতের প্রীতিভরা ভৃঙ্গার।

মৃত্যু-হীন

গুরুসদয় দত্ত

করাইছ যাহা মোরে তুমি
লোকে বলে করিতেছি আমি;—
জানে না যে তারা তুমি মোর
অহরহ অন্তর-যামী।

নিতি নব ভাবের প্রসূন
ফুটাইয়া দিছ মোর চিতে,—
তোমারি প্রেরণা পায় রূপ
মম গঠন-কাজেও গীতে।

ইন্দ্রিয়ের অতীত জগতে
দেহী আর বিদেহী বঁধুর
মৃত্যুহীন মানস-মিলনে
জীবন আমার সুমধুর। *

মাঘ, ১৩৪৬

* সরোজনলিনীর উদ্দেশে রচিত।

সরোজনলিনী

সরোজনলিনী ও বঙ্গনারী

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহীয়সী নারীর শুভাগমনে বঙ্গ-ভূমির নারীজা[illegible] মহাজাগরণ উপস্থিত হইয়াছে, দেবী সরোজনলিনী তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি [illegible] অমর হইয়াছেন ; তিনি প্রাণপাত করিয়া এক বিপুল নারী-মঙ্গল আন্দোলনে[illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদ্যা ও অর্থাদি ঐহিক সম্পদ তাঁহার প্রচুর ছিল, [illegible] সকল তুচ্ছ করিয়া সংযম ও সেবার দিব্যালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক তিনি বঙ্গন[illegible] উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্গলক্ষ্মীদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া ছিল[illegible] আজ সমগ্র বাংলায় এবং বাংলার বাহিরেও তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রেরণায় বহু [illegible] নারী-প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে। নারী-প্রগতির নবযুগে বাংলায় এইরূপ একটি [illegible]

আন্দোলনের অত্যন্ত অভাব ছিল, তাই জননী সরোজনলিনীর প্রাতঃস্মরণীয় নামে এক বিরাট নারী-মঙ্গল সমিতি উৎপন্ন হইয়া শিক্ষা ও কুটীর শিল্পাদি প্রচারের দ্বারা আত্মবিস্মৃতা বঙ্গনারীকে শিক্ষিতা, জাগ্রতা ও জাতীয় ভাবাপন্না করিতেছে।

নারীদিগকেই তাঁহাদের সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইবে। অপরে তাহা পারিবে না। কারণ নারীদের মুক্তিমন্ত্র তাঁহাদের অন্তরেই রহিয়াছে। তাই সরোজনলিনী বঙ্গনারীগণকে নিজেদের বিষয় ভাবিতে ও সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। আজ তিনি স্থূল দেহে নাই; কিন্তু রহিয়াছে বঙ্গনারীর প্রতি তাঁহার অগাধ প্রীতি ও অসীম সহানুভূতি এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্পে তাঁহার দুর্জ্জয় সংকল্প। তাঁহার সেই অশরীরি সংকল্প ও সমবেদনাই অশেষ বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গনারীর আত্মসম্বিৎ জাগ্রত করিতেছে এবং অন্যান্য দেশের উন্নতা ও উত্থিতা নারীর মত বঙ্গনারীকে প্রবুদ্ধা ও আত্মনির্ভরশীলা করিতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নারী-আন্দোলন আছে, কিন্তু সরোজনলিনী সমিতির মত সক্রিয়, সতেজ ও সবল আন্দোলন অন্যত্র নাই বলিলেই চলে। এই সমিতির এক একটী কেন্দ্র সরোজনলিনীর হৃদয়ের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই নারী সমিতি বাংলার প্রাণ-শক্তিতে সজীব ও বাংলার বৈশিষ্ট-সুষমা-মণ্ডিত হইয়াছে। নারী-সেবাব্রতে ব্রতী এই সমিতির শাখা বাংলার প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত হউক। বঙ্গনারীমাত্রেই এই সমিতিতে যোগদান পূর্ব্বক উহাকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত করিবার জন্য প্রাণপণ করুন,—এই নিবেদন!

মেটারলিঙ্ক সত্যই বলিয়াছেন, নারী মাত্রেই আজন্ম অন্তর্মুখী সাধিকা (mystic)। নারীর এই আদর্শ ভারতেই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

তাই নিবেদিতা বলিয়াছেন—পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রীশক্তি, আর প্রাচ্যে, বিশেষতঃ মহাভারতে নারী মাতৃশক্তি; নারীত্বের চরম পরিণতিই মাতৃত্বে। মাতৃত্বের বিকাশ হইলেই নারী দেবী হন। সেই মাতৃত্বের বিশেষ প্রকাশ সরোজনলিনীর মধ্যে হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আদর্শ জননী-বা দেবী হইয়াছিলেন। জননী সরোজনলিনীর অমর স্মৃতি-প্রত্যেক বঙ্গলক্ষ্মীকে উদ্বুদ্ধা করুক এবং প্রকৃত হিন্দু-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক বঙ্গলক্ষ্মী নারীজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন—এই প্রার্থনা।

রাষ্ট্রীয় সাধনা ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম পুরুষদের উপর ছাড়িয়া দিয়া দ্বন্দ্ব-চঞ্চল ও যুদ্ধরত সমাজের নিভৃত অন্তরালেও ভাবী সমাজনায়ক তৈরী হয়। নব জার্ম্মাণীর ভাগ্যবিধাতা হিটলার তাই বলিয়াছেন, "জাতি সংগঠন কার্য্যে নারীকে কিন্ডার (শিশু) কিচেন (রান্নাগৃহ) ও কুশ (গির্জ্জা) এই তিনটীর সম্পূর্ণ ভার লইতে হইবে।" পরিবারের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম এবং শিশুকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নারীরই ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য আছে। রমণীই সর্ব্বদেশে শিক্ষা ও সদাচারের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী ও সমাজের স্থিতিবিধায়িনী। এই ভগবদ্দত্ত দায়িত্ব অবহেলা করিয়া অন্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের প্রকৃত প্রগতির বেশ হ্রাস এমন কি একবারে বন্ধ হইতে পারে? দেশের প্রাচীন আদর্শকে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা সমুজ্জ্বল করাই বর্ত্তমান যুগে প্রধান কর্ত্তব্য। সরোজনলিনী-সমিতি এই কর্ত্তব্য-সাধনে বঙ্গনারীকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার এই সরল বিশ্বাস সফল হউক, হে ভগবান! আবার গার্গী ও মৈত্রেয়ী, মদালসা ও সারদামণি প্রভৃতি আদর্শ নারীর পুনরভ্যুদয়ে বঙ্গভূমি ধন্যা হউক, হে জগদম্বে! জননী সরোজনলিনীর জীবন-স্বপ্ন সার্থক হউক, হে প্রভু!

—বেলুড় মঠ

CALCUTTA
Acc. No.
Book No.
LIBRARY

সরোজনলিনী

—বন্দে আলী মিয়া

দিন যায়—মাস যায়—বর্ষ হয় গত
যে জন চলিয়া যায়—ফিরে কভু আসে নাকো আর।

বরষের বিশেষ দিনেতে
মোরা তাঁরে শ্রদ্ধা ভরে করি গো স্মরণ।
সভা করি—বক্তৃতা দিই,
পুষ্পে ভূষিত করি প্রতিকৃতি তাঁর।
অসহায় নর মোরা অতীব দুর্ব্বল,
এর বেশী সাধ্য কিছু নাই।
বাংলার কুলবধূ সরোজনলিনী,
একদা যে-সেবা আর প্রীতি তাঁর ছিলো বক্ষ ভরা,
ছিলো নিজ পরিজন লাগি—
আজি তা হয়েছে ব্যাপ্ত নিখিল মাঝারে,
বাংলার দুঃখী যত বোনেদের তরে।
তাঁহার মাভৈ বাণী বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে
এনে দিলো যেই দীক্ষা সবাকার প্রাণে—
ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে দিলো নিঃশঙ্ক সাহস,

*

'মফঃস্বলের মেয়েদের প্রশস্ততর চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে এনে আর তাঁদের সুবিস্তৃত ভাবে দেখবার শক্তি দিয়ে খুব ভালো কায করতে পারা যায়।' —সরোজনলিনী

*

'যে দেশে মা শিক্ষিতা না হবে সে দেশের কখনও উন্নতির আশা করা যায় না,—তা আপনারা সকলেই জানেন। মায়ের কাছেই ছেলেমেয়ে প্রথম শিক্ষা পায়,—মা যদি অশিক্ষিতা হয়, তা' হলে কেমন করে সন্তানের ভালো শিক্ষা হবে?' —সরোজনলিনী

*

চোখে দিলো সুদূরের তৃষা,
তাঁরে আজ জানাই প্রণতি।
বরষার ম্লান দিনে অবিরল বারিধারা শেষে
অকস্মাৎ রোদের ঝলক—
বিধবার অশ্রুঝরা মুখে ফোটে আজ হাসি,
নিঃসহায় বালিকার বুকে জাগে আজ
তেমনি আশ্বাস।
হে মাতা সরোজনলিনী—
আজি তব স্মরণ-বার্ষিকী।
যুগে আর যুগে তুমি এসেছিলে এ ভারত ভূমে,
জানকীর বেশে তুমি গিয়েছিলে দণ্ডক অরণ্যে;
বুদ্ধের সুজাতা তুমি,
কৃষ্ণের আছিলে তুমি সাধনার সহচরী রাধা।
তুমি যবে ছিলে হেথা—চিনি নি তোমায়—
তোমারে হারায়ে খুঁজি নিখিল ভুবন।
আবার আসিও তুমি
ফিরে এসো ভাগ্যহত বাংলার বুকে।

——

সরোজনলিনী স্মৃতি-রেখা

শ্রীমতী শ্রীলেখা চৌধুরাণী

কত ফুল ফোটে নিতি,
অজানা যে কত ঝরে যায়,
মনে কেহ রহে কারো,
কেহ কাল সাগরে হারায় ;
একটী কমল শুধ্
ফুটে রয় চিরদিন তরে,
সরোজনলিনী সে যে
বিশ্বজন-স্মৃতি-সরোবরে।
সরোজনলিনী, ওগো,
মাতা তুমি সমগ্র বাঙ্গলার,
তব কীর্ত্তিগাথা লিখি,
আছে কি সে শকতি আমার !
বাঙ্গলার কুটীর দ্বারে
সামান্য এ বধ্ একজন,
তোমার স্মরণ দিনে,
করে শ্রদ্ধা-অঞ্জলি অর্পণ।
চির দুঃখী বাঙ্গালার
ছিল মা'র-স্নেহ প্রয়োজন,
শ্রীগুরুসদয় ঘরে
তাই হোল তব আগমন।
অকলঙ্ক মূর্ত্তি শুভ,
একখানি স্নেহসিক্ত হিয়া,
করুণা কি মূর্ত্তি ধরে
এল দেব-আশীর্ব্বাদ নিয়া।
আলোর বারতা এল
আঁধারের অন্তরাল হ'তে,
ভাসিল মুমূর্ষু বঙ্গ
অফুরন্ত নব প্রাণ-স্রোতে।
দুর্গতি-গহ্বর হ'তে
নারীকুলে তুমি গো কল্যাণী,
বাঁচায়েছ স্নেহভরে,
শুনায়েছ অমৃতের বাণী।
নিরাশ বঙ্গের বুকে
ঘোষিলে মা তুমি বারে বার—
"নারীরও রয়েছে হেথা
বাঁচিবার পূর্ণ অধিকার।
সমাজের সমুজ্জ্বল ভাবীকাল
নারীর মাঝারে
রহিয়াছে সুপ্ত হয়ে
স্নেহময়ী মায়ের আকারে !
নারীর উন্নতি বিনা
কোথা হয় জাতির কল্যাণ।"
বাঙ্গালার জনগণে দিলে মাগো
এই দিব্য জ্ঞান।
বুঝেছিলে মনে প্রাণে
কর্ম্ম নহে কথার প্রাসাদ,
নীরব অক্লান্ত কর্ম্মী,
কর্ম্মে পেলে অমৃতের স্বাদ।
সবার হৃদয়ে রাজে
তাই তব হৈম সিংহাসন,
দেবীরূপে চলে সেথা
নিত্য তব পূজা-আয়োজন।

বাংলার নারীর সত্যকার পরিচয়

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাসে প্রকৃতির যে লীলা-স্রোত বহিতেছে, তাহার তুলনা সারা পৃথিবীতে মিলে না। বাংলার প্রকৃতির স্বভাবই হইতেছে, সে স্বতঃই আত্মহারা, আত্মভোলা। বাংলার কাননে-কাননে, প্রান্তরে-প্রান্তরে, নদীতে-নদীতে যে সুর প্রতি নিয়ত রূপান্বিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বাংলা মায়ের আত্মহারা আনন্দের ছন্দোময় গীতির অনুপ্রকাশ রূপায়িত। বাংলা মায়ের কণ্ঠস্বরে বিশ্বপ্রেমের কাব্যরসের সৃষ্টি সম্পূর্ণ সরল, স্বাভাবিক। তাই বাংলার মাটিতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, বাংলার জলে যাঁহারা পরিপুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও আত্মহারা বিশ্বপ্রেমের রসিক। অতীশ, দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যপ্রভা, বীতপাল, ধীমানের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যরস বাংলাভূমিতেই সম্ভব! গোপাল, দিব্য, ভীমের অভাবনীয় বীর্য্যরস বাংলাভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব আলোকপাত করিয়াছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলা মায়ের সন্তানেরা বিশ্বপ্রেমের কাব্য-সাহিত্যে যে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার তুলনা কি সারা জগতে মিলে? এমনি করিয়া আমরা বাংলার প্রকৃতিতে মাতৃরূপের জীবন্ত চিত্রও পাইয়াছি অসংখ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা সেই সব স্বর্গ-প্রতিমার ইতিহাস রাখি নাই। তবুও আমাদের মনে পড়ে রাণী ভবানী, রাণী রাসমণির মত গরীয়সী বীর রমণীদের দিব্য প্রতিভার কথা। অতি আধুনিক যুগেও মহীয়সী মহিলাদের জীবন্ত প্রতীকের অভাব ঘটে নাই। এ যুগেও যে সমস্ত স্বনামধন্যা মহীয়সী মহিলা বাংলা ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে বাংলা মায়ের উজ্জ্বল প্রতীক, সেবাধর্ম্মের দীপশিখা স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর কথা।

বাংলার নারী ছিলেন স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা-ধর্ম্মের মূর্ত্তপ্রতীক! দীন-দুঃখী আর্ত্ত-ক্ষুধিতের সেবাশুশ্রূষায় বাংলার নারী আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে কোনও [illegible] করেন নাই। আপনার অন্তরের স্নেহ-মায়াদ্বারা আর্ত্ত [illegible] দুঃখীকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়া পরহিতব্রতে [illegible] নিয়োগ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ব্রত-উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া [illegible] বহু প্রাচীনকালেই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে [illegible] ছিলেন। আতিথ্যের মধ্য দিয়া ক্ষুধিত, আর্ত্তকে অন্ন [illegible] করিয়া বাংলার নারী অফুরন্ত আনন্দ অনুভব [illegible] পরোপকার-ব্রতে আত্মদানে যে পবিত্র নির্ম্মাল্য [illegible] করা যায়, তাহার স্বাদ বাংলার নারী যতখানি [illegible], সারা পৃথিবীতে কি তাহার দ্বিতীয়টী মিলিবে? [illegible] পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলার পবিত্র নারী-আদর্শ [illegible] বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও পল্লী-বাংলায় [illegible] অপূর্ব্ব নারী-আদর্শের জীবন্ত ধারা মূর্ত্ত রহিয়াছে [illegible] দেশের নারীর নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্মের আদর্শ, বাংলার [illegible] নিজস্ব শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট এবং ইহা জগৎ-বরেণ্য [illegible] অত্যুক্তি হয় না।

মহীয়সী মহিলা সরোজনলিনী বাংলার সং[illegible] উপর পরম বিশ্বাসবতী ছিলেন বলিয়াই তিনি [illegible] ব্রতচারিণী এবং সেবাধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে [illegible] গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। বাংলার নিজস্ব [illegible]-কলা, বাংলার নিজস্ব শিল্প, বাংলার নিজস্ব উৎ[illegible] সরোজনলিনী আন্তরিক ভালবাসিতেন। বাংলার [illegible] বৈশিষ্ট্যকে কি ভাবে নারী-ধর্ম্মের সহিত সমন্বিত [illegible] তাহা তিনি আন্তরিক উপলব্ধি করিতে পারি[illegible] অতি 'মডার্ণ' যুগেও আমরা বাংলা দেশে স[illegible] ন্যায় একজন দৃঢ়চরিত্রা আদর্শ মহিলাকে [illegible] এতখানি গর্ব্বিত, একথা বলাই বাহুল্য। [illegible] গৃহলক্ষ্মীকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের গৃহের আনন্দ ছন্দোময় করিয়া তুলিতে হইলে, [illegible] সরোজনলিনীর আদর্শ আন্তরিকতার সহিত [illegible] কর্ত্তব্য।

সরোজনলিনী

সরোজনলিনী সমিতি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরোজনলিনী স্বদেশের নারী-জাগরণের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে মন শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া পারে না। এই মহিয়সী মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার প্রাণশক্তি আজ বাংলার প্রত্যেক নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে-জীবনধারা বৈদেশিক পঙ্কপ্রভাবে ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া উঠিতেছিল, সরোজনলিনী জীবন পণ করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পান এবং বঙ্গের পুরনারীবৃন্দের প্রাণে নবীন আশার আলোকশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। তাই আজ শিল্পে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায় হইয়াছে নব প্রাণের আবির্ভাব।

সরোজনলিনী দেবী অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, নারী হৃদয়ের প্রেরণা না পাইলে দেশ জাগিবে না, আর প্রেরণা যোগাইবার শক্তি নারীকে অর্জন করিতে হইবে আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া। তাই তিনি নিজের জীবনালোক দিয়া জ্বালিয়া গিয়াছেন বাংলার কুটীরে-নগরে প্রাসাদে-প্রান্তরে জ্ঞানালোকবর্তিকা, যাহা দেশ এবং কালকে দিনে দিনে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে।

সরোজনলিনী নারী-সমিতির সাফল্য-গৌরবে প্রত্যেক বঙ্গবাসী গৌরবান্বিত।

সরোজনলিনীর
আঁকা ছবি

বঙ্গ নারীর গর্ব্ব

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

ইহার মধ্যেই একটা বছর চলিয়া গেল। এই এক বছরে সরোজনলিনী দেবীর সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী জানিবার সুযোগ পাইলাম আমার যাযাবর জীবনের জন্য! এই সুদূর প্রবাসে, যেখানে দশ ঘর বাঙ্গালী আছেন, সেখানেও সরোজনলিনী দেবীর অনুকরণে মহিলাগণ ছোট একটি সমিতি গড়িয়াছেন। বাঙ্গালা থেকে দূরে থাকিয়াও তাঁর কাজ করিতে পাওয়ায় মহিলারা সৌভাগ্যই মনে করেন।

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আজ ঋষি বঙ্কিমের মত, সরোজনলিনী দেবীর [illegible] আমার বলিতে ইচ্ছে করে—দেবী! হৃদয়ে তোমার স্বজা[illegible] প্রীতি, বাহুতে তোমার কর্ম্মশক্তি! তাই তোমার আ[illegible] সামনে রাখিয়া এই প্রবাসেও আমরা কাজে [illegible] পাই!

আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, সরোজনলিনী দেবীর ক[illegible] সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত যে প্রসার লাভ করিয়াছে, ইহা ভা[illegible] বিশেষ বাঙ্গালীদের কতখানি গর্ব্বের বিষয় তা কাহ[illegible]

করিতেছেন, সে সব ভগিনীদের আমার চোখে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, আজও কিন্তু আমি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, আর কামনা করি, তাঁরা যে গুরুকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন সাফল্য লাভ করেন! সত্যই যেন একদিন বঙ্গললনার কার্য্য ভারতনারীর আদর্শ হয়! এই কার্য্যের সহায়ক স্বরূপ যে পুরুষেরা আছেন, তাঁহারাও আমার কম শ্রদ্ধার পাত্র নন্। এইরূপ ভ্রাতা ভগিনী মিলিয়া কাজ করাই তো সুখের—আর তাহাই হয় স্থায়ী!

বলিয়া না দিলেও চলিবে! অর্থের দিক্ হইতে বাঙ্গালী কাঙ্গাল হইলেও, কর্ম্মের দিক্ থেকে তারা কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নয়! কত কর্ম্মবীর বঙ্গমায়ের শ্যামল কোলে জন্ম লইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন—সরোজনলিনী দেবী সেই দেশেরই তনয়া।

যে সব মহিলা তাঁর অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা

লোকে বলে "যে গেছে তাকে আর পাওয়া যায় না"। জানিনে, সে কথা কতখানি সত্য। কিন্তু আজ যাঁর কথা বলিতেছি, সত্যিই কী তাঁকে আমরা হারাইয়াছি! না—তিনি আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও তাঁর বোনেদের মধ্যে যে রহিয়াছেন, তা কি আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি!

জব্বলপুর

'বাঙ্গালী মেয়ে নিরক্ষর হতে পারে কিন্তু কখনও অশিক্ষিতা নয়। তাঁদের সুযোগ দিন অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে একত্রে মেলা মেশার এবং দেশের ও সমাজের কাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে দিন, দেখবেন, তাঁদের কথা বলবার অভাব হবে না। মুখে কথা ফুটবে, এবং কর্ম্মের সুপ্ত শক্তি তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হয়ে পরিবারের ও দেশের অসীম কল্যাণ সাধন করবে।' —সরোজনলিনী

সরোজনলিনা কল্যাণ-মন্দির

—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গুরু তুমি ব্রতচারী ব্রত করি দান
সদয় তরুণে দীনে সদা আগুয়ান
দত্ত-প্রাণ সেবাব্রত ত্যাগ-তীর্থ-নীরে
সিক্ত স্নাত অভিষিক্ত পবিত্র মন্দিরে
বঙ্গলক্ষ্মী পদতলে মুক্ত অভিমান
সরল সলিল স্বচ্ছ তব মন প্রাণ
ধরি দিলে উপহার প্রস্ফুট সরোজ
নলিনী প্রফুল্ল দল মথিত মনোজ
ছিন্ন বৃন্ত বেদনায়।
ছাত্রী দলে দলে
জ্ঞানাঞ্জনে নিরঞ্জন লভিয়া সকলে
সিক্ত নেত্রে স্মরে তাই, সমুজ্জ্বল ছবি
অবিস্মরণীয় গাথা গাহে মুগ্ধ কবি
মহীয়সী মহিলার,—
গর্ব্ব বাঙালীর
সরোজনলিনী-শিল্প-কল্যাণ-মন্দির।

যে সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে চাহেন তাঁহারা বিবাহ করুন; কিন্তু হিন্দুনারী বিবাহ বন্ধনকে যে-রূপ পবিত্র আদর্শে দেখিয়া থাকে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, যে সকল হিন্দু বিধবা স্বামীকে একবার ভালো বাসিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা কখনই আর বিবাহ করিতে রাজী হইবে না বা চাহিবে না। তবে বালবিধবার কথা স্বতন্ত্র। যাহাতে কোন মেয়ে বাল বিধবা না হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিবার একমাত্র উপায়, ষোল-সতের বৎসর পূর্ব্বে কোন মেয়ের বিবাহ না দেওয়া।
—সরোজনলিনী

'যাহারা নিজেদের বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার জন্য অন্যান্য দেশের ও জাতির কাছ থেকে নূতন নূতন বিষয় ও জ্ঞান শিক্ষা করিবে না—তাহারাও ডুবিয়া থাকিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও ডুবাইয়া রাখিবে। জাপানের পুরুষ ও মেয়েরা এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাই আজ জাপান এত উঁচুতে আর আমরা এত নীচে।' —সরোজনলিনী

'লোকে উচ্চপদ বা ধনলাভ করে কেন জাঁক করে তা বুঝি না। উচ্চপদ বা ধনলাভের একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে সাধারণের সেবার সুযোগ লাভ। তা না করে যারা জাঁক জমক বা বিলাসিতা করে তাদের উচ্চপদ বা ধনলাভ বিড়ম্বনা মাত্র।' —সরোজনলিনী

নিবেদন

বিদায়-আরতি জানাতে হবে যে, বিষাদ-মলিন চিত্তখানি
আনন্দ সাথে বেদনা জড়ায়ে এসেছি জুড়িয়া যুগল পাণি।
কত বসন্ত শরৎ কেটেছে তোমার স্নেহের গুঞ্জরণে,
বিদ্যার্থিণী আমরা কজন ছিলাম তোমার পুষ্পবনে
আপন আদরে লালন করেছ, দিয়েছ তোমার যা-কিছু দেয়
সবার উপরে দিয়েছ তোমার মাতৃহৃদয়-গলিত স্নেহ।
আমরা ছিলাম সূত্রে গ্রথিত তোমার গলার গুঞ্জমালা,
তব চরণের পুষ্পপত্রে ভরিয়া লয়েছি জ্ঞানের ডালা,
জীবনের স্রোতে ভেসে যেতে হবে, কে কোথায় যাব জানিনে কিছু
তোমার স্মৃতিটী চাহিয়া রহিবে সবার ভবিষ্যতের পিছু।
বন্দিত করি, নন্দিত করি বিদায়ের এই পরম ক্ষণে—
দিয়াছ যা কিছু তাই লয়ে যেন যেতে পারি মোরা তৃপ্ত মনে।
স্মরণের সাথে সংযোগ যেন ছিন্ন না হয় একটি দিনও,
আমরা তোমার কন্যা-ভগিনী, এই বলে যেন সতত চিনো;
বিদায় শঙ্খ বাজালেম আজ অন্তরে তব মূর্ত্তি আঁখি—
চির অভাজনা শিষ্যাগণের নত হৃদয়ের প্রণতি রাখি।

বর্ত্তমান বর্ষের উত্তীর্ণা ছাত্রীগণ

CALCUTTA ...
Acc. No.........
Book No.........
LIBRARY

যৌগিক

পূর্ব্বানুবৃত্তি

৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পিঠের আঁচল সরিয়ে সাম্‌নের দিকে এনে দু'কাঁধের সঙ্গে আড় ক'রে আটকায়। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে এনে খোঁপার মুখের ক্লিপ-কাঁটা দুটো টেনে তুলে ফেলে—পাক খুলে পিঠের 'পরে প্রলম্ব হয়ে পড়ে তিনটি কালো বেণী কালো তিনটি সাপের মত। তারপর ও পেছন দিকে হেলে বসে।

প্রতীক্ষা করে। মুহূর্ত্ত থেকে মিনিট পার হ'য়ে যায়, পেছন থেকে কেউ ওর চুলে হাত দেয় না। বাঃ রে—

"দিদি", বলে' ডাকে, অম্‌নি ঘাড় ঘুরিয়ে চায়।

অমন করে' রয়েছ যে!...হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে ঘুরে' বসে' ভালো করে' লক্ষ্য করে, আলনার আড়-কাঠের ওপর মাথা রেখে অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে দিদি, ওর ডাক কানে যায়নি।

আশ্চর্য্য ত'!......আবার ডাকে, "দিদি, চুল বাঁধতে বসেছি যে—"

অতসী মাথা তোলে, কিন্তু ওর দিকে ফিরে তাকায় না। দু' আঙুলে কপালের দু'দিকের রগ চেপে ধরে' সোজা খাটের দিকে এগিয়ে চলে—বলে, "আমি পার্‌ছিনি বাপু, যে মাথা ধরল হঠাৎ—উঃহ্‌!"

অতসী পা দুটো বাইরে রেখেই বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ এমন সাংঘাতিক মাথা ধরে' বসল দিদির...... অতলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে আসে।

যাক্‌, না-ই হ'ল আজ চুল বাঁধা।......ও' উঠে দাঁড়ায়।

গরমে ধর্‌তেও পারে মাথা। ফ্যানটা বন্ধ ছিল; খুলে' দিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে আসে।

এদিকের বারান্দায় রোদ না থাক্‌লেও ছায়ার স্নিগ্ধতা নেই। যেন এতক্ষণ ধ'রে কেউ একটা বিরাট আয়নার কাচে দূর থেকে আলো ফেল্‌ছিল, আলোর মুখটা সরিয়ে নিয়েছে আয়না থেকে কিন্তু পরিষ্কার কাচটা এখনও চক্‌মক্‌ করছে।

ধীরে দু'পা এগিয়েই ও কি ভেবে আবার দাঁড়ায়। দরজাটা আড়ালে পড়েছে কিন্তু খোলা জানালাটা ওর পাশেই। পাশ ফিরে জানালার দিকে চায়।

পালিস-করা ঘরের মেঝেয় ফ্যানের ছায়াটা বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরছে। অতসী এদিকের খাটের কিনারে পা বার করে' দিয়ে ওদিকে মাথা দিয়ে শুয়েছে। বাতাসের উত্তম ভাগটা নিশ্চয়ই মাথা-সোজাসুজি লাগ্‌ছে না।

দিদির মাথা ধরেছে—। যে গরম, মাথা ধরা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু যে উল্টো-ডিঙী হ'য়ে শুয়েছে দিদি, ফ্যানের হাওয়া লেগে যে শীগগির ছেড়ে যাবে মাথাটা তাও সম্ভব নয়।

ও' ফিরে আবার দরজার দিকে যায়। হাত-পাখা দিয়ে একটু বাতাস করে' আসুক, শিয়রে বসে' কপালটা কিছুক্ষণ টিপে দিলেই......

ওরই বা এত কি গরজ দিদি ত' ডাক্‌ল না!........ যাক্‌ গে'।

অতলা ফিরে আবার এগিয়ে চলে।

—কিন্তু, সত্যি মাথা ধরেছে, না তার ওপর রাগ করে'......

তখনকার কৌতুকের শরে কি বিদ্ধ করল ওর দিদির হৃদয়?

হ'তে পারে।......ও অনুতপ্ত হয় না; মনে মনে বলে —বেশ হয়েছে! দিদিই ত' খুঁচিয়ে ওকে অতিষ্ঠ করে' তুলেছিল। এখন কেমন? কেঁচো তুল্‌তে এম্‌নি করে'ই সাপ ওঠে......।

ওর ভ্রূদুটি একবার কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।

অতলা এসে পড়ে নীতীশের ঘরের সাম্‌না সাম্‌নি।

একটা করুণ হাস্যকর পরিস্থিতি —

নীতীশ তার ছোট গোল আয়নাখানা উঁচু করে' ধরে, মাথাটাকে এপাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ তির্য্যক দৃষ্টিতে আয়নার প্রতিচ্ছায়ার দিকে চেয়ে বিশেষজ্ঞের মত বারবার পর্য্যবেক্ষণ করছে চুল-ছাঁটাইয়ের ক্রমবিকাশের বিশেষ তিনটি ক্রম: চুলটা তার যেমন ছিল আগে, তারপর যেমন করে' সে ছেঁটে আস্‌ল সেলুন থেকে, এবং তারও পর তার বড়দি' যেমন করে' সেই চুলের আবার কাট-ছাঁট কর্‌ল।

তার মন সায় দিতে না চাইলেও সে মনে মনে সিদ্ধান্ত কর্‌তে চাইছে, তারতম্যে শেষবারকারটাই শ্রেষ্ঠ।……… এমনি করে'ই ত' তাদের ইস্কুলের সেকেন্-মাষ্টারমশাই চুল ছেঁটে থাকেন,……তার ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় ভবেশও চুল ছাঁটে অনেকটা এই রকম ঢঙেই।……

কিন্তু—না, আয়নাতে পেছনের দিকটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। রবি বর্ম্মার ছবির সমুদ্রশাসনকারী রামচন্দ্রের ভঙ্গীতে পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে আবার সে ঘাড়টাকে সার্কাসের ক্লাউনের মত মুচ্‌ড়ে ঘুরিয়ে আয়নার গোল কাচের ওপর মাথার পেছন দিকের প্রতিচ্ছায়া ফেল্‌তে চেষ্টা করে।

গোল আয়নাটা ঘুর্‌ছে না, ঘুর্‌ছে গোল মাথাটাই।… গ্যালিলিও যেন প্রমাণ কর্‌ছেন, যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারি-দিকে ঘুরছে না, পৃথিবীই কর্‌ছে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ।

পরিস্থিতির হাস্যকর দিকটা যেমন অতলাকে স্পর্শ করে না, তেম্‌নি করুণা-উদ্রেককারী দিকটাও। ও নীতীশের ঘরের সাম্‌নে থেকে নীরবে তখনই সরে' আসে।

যেতে যেতে অতলা দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝের ঘরখানা আধাআধি পার হ'য়ে এসে। কপাট দুটো ভালো করে' টেনে দেওয়া ছিল না বোধ হয়, দরজাটা কেমন হাঁ-হ'য়ে আছে। ঘরটার ওপর যে একটা মমতার আকর্ষণ ছিল, তারই টানে ও এগিয়ে আসে দোরগোড়ায়।

এ ত' বিশেষ করে' ওরই ঘর…। হঠাৎ স্বাধিকার বেঞ্চিতের বিস্মৃত বেদনা ওর বুকের মধ্যে খোঁচা দিয়ে ওঠে। কান্ অপরাধে এই গৃহের অধিকার থেকে ওকে বঞ্চিত করা হয়েছে অপরিচিত আর এক ব্যক্তিকে অযাচিত গৃহস্বামিত্ব দিয়ে।

অতিথি—তা' দিদির অবিশ্যি, দিদি কেন তার নিজের ঘরটি ছেড়ে দিল না সেই অতিথির জন্যে? এ ত' বিশেষ করে' ওরই ঘর…

দোর পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকছে, হঠাৎ চকিত হ'য়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। কিসের যেন সাড়া পাওয়া যায় ঘর থেকে—আছে নাকি কেউ ঘরে? আর কে থাক্‌বে। ও-ঘর থেকে নীতি হয়ত' আস্‌তে পারে মাঝদরজা দিয়ে।

—"নীতি—!"

কেউ সাড়া দেয় না। অতলার ভয় হয়—চোর-টোর নয় ত'? সজোরে কপাট দুটি দু'হাতে ঠেলে খুলে ফেলে।

ঘরের ভেতরটা আলোকে ভরে' গেছে। ও সাহসী হয়। এক হাতে চৌকাট চেপে ধরে' ও ঘরের ভেতর আধখানা দেহ বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখে—না, কেউ ত নেই।

ও তবু ইতস্ততঃ করে। শব্দটা যেন আস্‌ছেই………

ওমা! এরই জন্যে শব্দ হচ্ছে!……ও তখনই চৌকাঠ ছেড়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ায়। ওর ভুল করে' ভয় পাওয়াটা ঠিক ছেলেমানুষের মতই। কিন্তু ও হাসে না, বরং মুখে ওর বিরক্তি চিহ্ন ফুটে উঠে।

নিশ্চয় ফ্যান্‌টা খুলে রেখেই উনি বেরিয়ে গিয়েছেন তখন, না হ'লে আর কে খুলে রেখে যাবে। কতটা কারেন্ট মিছামিছি নষ্ট হ'য়ে গেল……মানুষটা কিন্তু একেবারে বেহুঁস। 'গৌরীসেনের পয়সা'!—অতলা মনে মনে বলে এবং সুইচ্ টিপে বন্ধ করে' দেয় ফ্যান।

আর—

এই কি তার ঘরের শ্রী!……অতলা সমস্ত ঘরখানার ওপর দিয়ে ছিদ্রান্বেষণের দৃষ্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে আনে।

শেল্‌ফের ওপরকার বইগুলো পাঁজা করে' রাখা হয়েছে টেবলের ওপর নামিয়ে, আর যত সব হিজিবিজি জিনিষ গিয়ে উঠেছে শেল্‌ফের ওপরটায়—সেই যে চ্যাপটা 'হুসে'র শিশি, খালি গগল্‌স্ চশমার খাপ, শেভিংয়ের সরঞ্জাম চুরুটের কাঠের বাক্স এবং আরও কি সব এটা সেটা আজে বাজে জিনিষ।

একি, তার টিপয়টার এই দশা। পুরী থেকে নিয়ে আসা অতি যত্নের সেই ঝিনুকের শ্বেতপদ্মটি গেল কোথায় তার? ওটা কি কাগজ-চাপা যে টেবলের কোণায় তাই দিয়ে কিসের কতকগুলো কাগজ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। চমৎকার! টিপয়টা হয়েছে ওর স্যুটকেস রাখবার জায়গা। আর জায়গা ছিল না এই এত বড় ঘরটায়?

গৃহবাসীর অর্ব্বাচীনতার বিষয় ভাবতে ভাবতে অসন্তুষ্টির সঙ্গে অতলা এসে চৌকীর বিছানায় বসে।

একটা মিষ্টি কিসের গন্ধ যেন ওর ঘ্রাণে আস্‌ছে। বাতাসে কি ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে দূর থেকে, না এখানেই কোথাও ফুল রয়েছে—গন্ধটা মৃদু হলেও ভারী চমৎকার, কিন্তু ওর পরিচিত কোন ফুলের গন্ধের মত নয়।

অতলা উবু হ'য়ে সেখানের বালিসের কাণায় হাত বাড়িয়ে খোঁজে—ফুলের গুছি হাতে ঠেকে না কিন্তু গন্ধের মূল আবিষ্কৃত হ'য়ে যায়।—উনি যে হেয়ার লোশান মাখেন, তারই গন্ধ আস্‌ছে বালিসের তোয়ালেটা থেকে।

ঠিক এমনি পিকিউলিয়ার গন্ধের একটা হেয়ারলোশান এনেছিলেন একবার জামাই বাবু···দিদির জন্যে এনেছিলেন কিন্তু সদ্ব্যবহার করেছিল প্রধানতঃ অতলাই। জামাই বাবু অনুযোগ করলে দিদি বলেছিল, ওই মাখুক ওসব, বিলিতি লোশানের চেয়ে আমি দিশি তেলই পছন্দ করি বেশী। জামাই বাবু তখন বলেছিলেন, কিন্তু তোমার বোন যে লোশান ইউজ করতে জানে না, মাথায় সাবান মেখে তবে মাখতে হয় ঐ লোশান।

...ঐ লোশানের খাতিরে অতলা কতদিন মাথায় শুধু সাবান মেখেছে।

ওর ঘ্রাণে আস্‌ছে লোশনের মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটার কিন্তু কেমন যেন মাদকতা আছে। ও আরও একবার বালিশের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

এ বিছানা, এমন কি এই বালিশটা ওরই। এই মিষ্টি গন্ধের ভিতর দিয়ে ওর এই বিছানায় এবং বালিসে আজ আর একজনের অস্তিত্ব বিজড়িত।......একটা অর্দ্ধস্ফুট কল্পনা ওর মনের ভেতর যেন কি এক মোহের দুর্ব্বলতা নিয়ে আসতে চায়।

এই দুর্ব্বলতার ভেতর যেন নারীজীবনের চিরন্তন আকাঙ্খার একদিকে কুমারীত্ব, অন্যদিকে বধূত্ব—মাঝখানে নিঃসঙ্গতার নিগূঢ় বেদনা।

ওর মাথাটা ওর অজ্ঞাতেই বালিস ছুঁয়ে নেমে আসে। চোখ দুটো অর্দ্ধনিমিলিত হ'য়ে এসেছে।

মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা কাটিয়া তখনই ও সোজা হ'য়ে উঠে বসে বালিসটাকে ঠেলে কোণের দিকে সরিয়ে। ভগবান রক্ষা করুন ওকে এই বাবরি চুলের হেয়ার লোশানের হাত থেকে।

অতলার হাসি পায় নিজের আশ্চর্য্য দুর্ব্বলতা মনে করে। মনে মনে একবারও ত' দেবানন্দের সঙ্গিত্বের কামনা করে নি। দিদির শুভাকাঙ্ক্ষার ছোঁয়াচ পেয়েই কি ওর এই মনোভ্রম হল? ও কি এই লোকটাকে বিয়ে করে এর আজীবন সঙ্গিত্ব বরণ করে নিতে চায়?

অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেই ফেলে,—"না—না, কক্ষনো না...কিন্তু মুখের হাসি তলিয়ে যায় গাম্ভীর্য্যে। একটা নিঃসঙ্গতার বেদনাবোধ যে ওর বুকের ভেতর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই।

...ওর মন ধরা পড়ে গেছে আজ ওর মনের কাছে। ও মনে প্রাণে চায় আজ সত্যই একজন জীবন-সঙ্গীকে যে দিনের আলোকে ওর সহযাত্রী এবং রাতের আঁধারে ওর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

ওর মুখভাবে একটা আশ্চর্য্য দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। ও উঠে দাঁড়ায় এবং ওষ্ঠ দংশন করে। ও যাকে চায়, ভুল করে, সে ঐ স্বামীজি ব্যক্তিটা নয়।

অতিথির ব্যবহৃত শয্যায় বসে ও যেন আপনার দেহকে কলঙ্কিত করেছে, এম্‌নিভাবে একবার ওর দেহের দিকে চায়, একবার পরিত্যক্ত শয্যাটির দিকে।

আর একবার বিরূপ দৃষ্টিতে শয্যাটির দিকে চেয়ে ও' মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হেঁটমুখে ও' দোরের দিকে এগিয়ে চলে। ওর মুখ এবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। ও' যাকে চায়, তাকে—তাকে পেয়েও পেতে পারে না কিছুতেই'—কাছে থেকেও সে বহু—বহু দূরে থাকে। বাহ্যতঃ সে এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে যে তার নিশ্বাস পর্য্যন্ত ওর গায়ে এসে লাগবে কিন্তু তবু ধরতে ছুঁতে পারা যাবে না তাকে। তার

আর ওর মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, যে ব্যবধান কোন সামাজিক মানুষ কখনও দূর করতে পারে না কোন প্রকারে। আর—

আর কেউ নয়,—এই ব্যবধান রচনা করেছে, যে, সে ওর সব চেয়ে বড় আপনার জন—ওর মায়ের পরই সে ওকে বেশী ভালবাসে। ওর আপনারই মায়ের পেটের বোন···ওর দিদি···

উঃ! দোর সোজা না এসে ও' একেবারে ওদিকে গিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে' বসেছে!

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দুয়ারের দিকে ঘুরে আসে ও'।

আঘাতটা যেন ওর মাথায় লাগল না, মস্তিষ্কে লাগলো। ওর চিন্তাকেন্দ্র বদলে যায় সঙ্গে সঙ্গে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে ও' যেন আবার ওর মনকে দেখতে সুরু করে। চিন্তার গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওর চলার গতিও পরিবর্ত্তিত হয়ে' পড়ে। বিচলিত ভাবে ও' হেঁসেলের পাশের সরু দালানের ফালি বেয়ে ছাদের সিঁড়ির পেছনের কাণাচে গিয়ে দাঁড়ায়, উল্টাভাবে দেয়ালের গায়ে দুটি হাতের তলা রেখে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে ও' যেন অবিচলিত থাকতে চায়।

মায়ের পরে যে ওকে ভালবাসে, সেই দিদি, ওর প্রতি যার স্নেহের তুলনা নাই, যে ওকে শুধু আশ্রয় দেয় নি, স্নেহের প্রশ্রয়ে সমপদস্থতা দিয়ে আশ্রিতের দীনতা থেকে বাঁচিয়েছে, সেই স্নেহময়ী দিদির সম্বন্ধে ওর এই আত্মসুখসর্ব্বস্ব চিন্তা কি তারই কৃতজ্ঞতার পরিশোধ?

মানুষের স্বতন্ত্র সত্তার মতই তার একটা পৃথক স্বার্থবোধ অবশ্য না থেকে যায় না। কিন্তু সেই স্বার্থের মুখে মানুষ কি যাবে সব চেয়ে বড় আঘাত করতে তাকেই, যে তাকে সব চেয়ে বড় বেশী ভালবাসে?···অতলা কি ওর আত্মসুখ সন্ধানের মুখে ওর দিদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দাঁড় করাচ্ছে না?

······সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ও' মর্ম্মান্তিক আঘাত করে' তার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়, যেহেতু সে দাঁড়িয়েছে ওর সুখের পথ রোধ করে।······

ওর নিজের সুখের জন্য ও ওর দিদির সুখের সংসারে আগুণ ধরাতে চায়—! অথচ এই দিদি ওকে তার সুখের সংসারের ভাগী করেছে স্বেচ্ছায় ডেকে এনে······

•সমভাগী—? ওর সমস্ত চিন্তা যেন এখানে একটি নিগূঢ় প্রশ্নে একীভূত হতে চায়।

সমভাগী নয় ত' কি! একই জোড়া কাপড়ের মধ্যে এক খানা দিদি ওকে দেয় পরতে, তার প্রসাধনের, তার সব কিছু ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়ের একটা অযাচিত সম্পদ আপনি এসে বর্ত্তায় ওর দিকে, একথা কি ও' অস্বীকার করতে পারে?

······দিদি এখনও ওকে টেনে বসিয়ে খাওয়ায় একই পাত্রের খাদ্য যে পাত্রের খাদ্যের উত্তম ভাগ পড়ে ওরই অংশে!

এক কথায় দিদি নিজে যা নেয় তা' থেকে ওকে বঞ্চিত করে না একতিলও।

কিন্তু তাই বলে সত্যিই সমভাগী? আহার্য্য ও পরিধেয়ই কি মানুষের সব, আর কিছু নাই!

কি থাকতে পারে আর—?

সহসা অতলা অস্বাভাবিক উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। সমস্ত দেহের রক্ত যেন মুহূর্ত্তে এসে ওর মুখে জমেছে।

······ওর চিরাচরিত নায্য দাবী ও কেমন করে ছেড়ে দিতে পারে।···ওর বাঁকা ঠোঁটে বাঁকা ছুরির ফলার মত একটা তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হাসি চকচক্ করে ওঠে।

ছুরির ফলাকে চকিতেই আবার খাপের ভেতর পুরে রাখল এম্‌নি ভাবে গাম্ভীর্য্য দিয়ে অতলা ঢাকল ওর তীব্র হাসিটুকুকে।

কপালে ফোঁটায় ফোঁটায় তপ্ত ঘাম ফুটে বেরচ্ছে আঁচল দিয়ে কপালশুদ্ধ সমস্ত মুখ খানাকে একবার ঘষে' মুছল—শুধু ঘাম নয়, মুখভাবটাকে পর্য্যন্ত যেন ও ঘষে মুছে, ফেলেছে।

অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকলে মানুষ যেমন ভাবে শ্বাস মোচন করে, তেমনি ভাবে একটা অতিদীর্ঘ শ্বাস ফেলে আবর্ত্তের ভঙ্গীতে একবার ঘুরপাক দিয়ে ও' সিঁড়ির খিলানের নীচ দিয়ে দ্রুত ওদিকের বারান্দায় গিয়ে পড়ে।

কারও ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—।

ও এমন চম্‌কে ওঠে যে···!—কে?

সচকিতে চোখ তুলে' চায় কিন্তু তখন আর সম্বরণের সময় নেই।

ভাগ্যে অশেষ ওকে ধরে' সাম্‌লিয়েছেন! কিন্তু নিজেকে সাম্‌লানো তাঁর কঠিন হ'ত, যদি না প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অতলা তৎক্ষণাৎ পেছনে ঝুঁকে দাঁড়াত।

"আঃ!" বলেই অশেষ ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন।—"অশ্বমেধের ঘোড়াকে ধর্‌তে বেরিয়ে আমার এই নাকাল! কোথায় না খুঁজেছি,···জান্‌তুম কি যে ঘোড়াটা ছুটে আস্‌ছে এখান দিয়ে?"

"আমি দেখিনি।" ব'লে গম্ভীরভাবে অতলা আপনাকে সংঘাতের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দাঁড়ায়।

অশেষ বলেন, "ব্যাপার কি, তোমরাই জানো!······ তোমার দিদি দেখ্‌ছি এখনো ঘুমুচ্ছে; ছাদের ওপরের দুপদাপ শব্দে বুঝতে পারলুম তুমি যদি ছাদে থাক্‌তে নীতির দৌরাত্ম্যটা অমন বেপরোয়া হ'ত না; স্বামীজির ঘরে স্বামীজিও নেই—গাইড হ'য়ে তাঁকে নিয়েই কি কোথাও গেলে, ভেবে লক্ষ্মীনাথকে পার্কের দিকে খুঁজতে পাঠালুম; তারপর—"

অতলা বলে, "লক্ষ্মীনাথ বোকা! দেবনাথবাবু ত' সেই কখন দুপুরে বেরিয়ে গেছেন······।"

একটু থেমে উষ্মার সঙ্গে বলে, "আর আপনার জানা উচিত ছিল যে আমি বাড়ীর লোক ছাড়া কক্ষনো কারু সঙ্গে বেরুই না কোনদিন।"

অশেষ নিজের কথাটাই বলে' যাচ্ছেন, "তারপর, বাড়ী তোলপাড় করে' কত খোঁজাখুঁজি······কেউ নেই······ পাতালপুরীর নির্জ্জনতা ফুঁড়ে হঠাৎ তুমি বেরিয়ে এলে ভুস করে'।"

অশেষ থামেন। অতলা নির্ব্বাক হ'য়ে একটা অতলস্পর্শ নির্জ্জনতার উপলব্ধি করে। ওর দুচোখে একটা কাতর বিহ্বল ভাব ভীরু পাখীর দুটি ডানার মত স্থির হয়।

অশেষ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, "অতি, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম·····।"

"এই ত' খুঁজে পেলেন।" বলেই ও পাশ কাটিয়ে আস্‌তে পা বাড়ায়, ঘাড় বাঁকিয়ে একটু হাসে।

অশেষ ওর পাশের হাতটি ধ'রে ফেলেন।—"অতি, যেয়ো না—শোন, একটা কথা আছে যা এখন না বল্‌লে হয় ত' আর বলার ফাঁক পাওয়া যাবে না।"

এদিকে বারান্দা প্রান্তের আলোকিত অংশ, ওদিকে খিলানের নীচে আবছা ছায়াচ্ছন্নতা। আলো-আঁধারীর সীমারেখায় অতলা অশেষের মুখের দিকে চায়।

ও হঠাৎ ওর ধরা হাতখানা ছিনিয়ে এনে দুহাতে অশেষের দুটি হাতের মণিবন্ধ সজোরে চেপে বলে—জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।"

বল্‌তে বল্‌তেই ওঁকে এক রকম ঠেলেই এনে ফেল্‌লে খিলানের নীচের অনেকটা এদিকে।

অশেষ প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। ভয়ে আর বিস্ময়ে মিলে' মিশে' একটা ডোরা-কাটা দাগ ফেলে তাঁর মনে।—ওর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল হঠাৎ! কি জানি কি বোঝাপড়া করতে চায় ও তাঁর সঙ্গে? তাঁর কৌতূহলও হ'ল কম নয়। হাতটা ওর মুঠির ভেতরই ধরা রইল, প্রশ্নের ভাষা হাতড়ে পেলেন না, শুধু নির্ব্বোধের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অতলা তাঁর ধরা হাত দুটিতে ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে, "বলতে পারেন জামাইবাবু, কেন ঐ গেরুয়াধারীকে এনে এদ্দিন ধরে' ঠাকুরসেবা করা হচ্ছে বাড়ীতে?"

অশেষের ভয় কেটে গিয়ে বাকী থাকে বিস্ময় ও কৌতূহল। অতলার বদ্ধ মুষ্টির উষ্ণতা অনুভব করতে করতে তিনি বলেন, "তোমার দিদি জানে। কিন্তু এদ্দিন হলো আসেননি উনি—আজ অতিথির তৃতীয় দিন।"

কথাটার শেষাংশে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার সুরও ছিল।

অতলা অসহ্য বিরক্তির সুরে বলে, "দিদির গেষ্ট্‌, রাখুক্‌ না কেন দিদি তিনবছর ধরে' ঘাড়ে করে', কিন্তু আমার ঘরের ঘাড়ে চাপোনো কেন! আমার ঘর···আমার বিছানা!"

—"কেন তোমার দিদির ঘরে তোমার থাকার শোবার খুব অসুবিধা হ'চ্ছে নাকি?"

অতলার মুখে চোখে একটা কাতর বিহ্বল ভাব। ফুটে ওঠে।—

নিরুত্তরে ও একমুহূর্ত্ত অশেষের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর হাতের মুঠি শিথিল হ'য়ে, খুলে আসে অশেষের মণিবন্ধ থেকে।

অশেষই এবার ওর দুটি হাত নিজের হাতে অঞ্জলি রচনা করেন ; তাঁর বিস্ময় এবং কৌতূহলকে পাদপীঠ করে দাঁড়ায় এসে এবার মমতা। গাঢ়স্বরে বলেন, "অতি, সত্যি করে বল, কি বোঝাপড়া করতে চাও তুমি আমার সঙ্গে ?"

অতলা বলে,—"তার আগে সত্যি করে' বলুন, ঐ লোকটাকে নিয়ে কি মত্‌লব পাকিয়েছেন আপনারা দুজন মিলে'।"

একটু মলিন হাসি হেসে অশেষ বলেন, "আমি কোন মত্‌লব পাকাই নি ; কিন্তু তোমার দিদির কোন উদ্দেশ্য থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে এবং তা হয়ত, তোমার মঙ্গলের জন্যই।"

"দিদির কাছে শুনেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য, এত সব জেনেও আপনি আমাকে কিছু বলেন নি কেন।"—অতলা বসে এবং ওর হাতদুটি জোর করে' টেনে অশেষ অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বলেন, "এসব ব্যাপারের মধ্যে আমাকে কেন তোমরা জড়াও, তাই ভাবি।"

একহাত খিলানের পিঠে রেখে এবং অন্যহাত মুষ্টিবদ্ধ করে' অতলা বলে, "দিদিকে আমি বলেছি, আপনিও বলবেন, যে আমি কারুকেই কোনদিন বিয়ে করতে যাচ্ছিনে, তা' তিনি গেরুয়াধারীই হোন কি মুকুটধারীই হোন্।"

"কারুকেই না—?"—অশেষ গম্ভীর বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চান।

অতলার মুঠি ধীরে ধীরে খুলে আসে। মলিন হেসে বলে, "এবং কেন নয়, তার কারণ একমাত্র আপনিই জানেন।"

"আমি জানি!"—তাঁর মুখ তাঁর অজ্ঞাতেই মলিন হ'য়ে পড়ে।

অতলার মুঠি খোলা হাত ওর বুকের ওপর এসে আশ্রয় পায়।

অশেষ অন্যমনস্ক ভাবে বলেন, "কি আমি জানি ?"

—"আপনি জানেন, যে আমি—"

অশেষ অকস্মাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন। ওর বুকে রাখা হাতখানাকে এমনভাবে টেনে নিলেন যেন হাত কেড়ে আনলেম। আঙুল শুদ্ধ ওর হাতখানাকে জোরে চেপে ধরে বললেন' "তুমি—তুমি কি ?"

অতলা দৃঢ়স্বরে বলে, "আপনি জানেন।......তেমনি আমিও জানি, যে, আপনি—"

অশেষের উত্তেজনার শেষ সীমা ছাড়িয়ে যায় একমুহূর্ত্তে। অতলার হাতখানা যেন ছিঁড়ে আসবে ওর দেহ থেকে...... ও' এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অশেষের দেহের ওপর।

—হেঁয়ালি রেখে বলতেই হবে আমাকে তোমার কথার অর্থ কি—বল'।"

......"ইঃ! লাগে ছাড়ুন, ছাড়ুন! না হলে আমি চেঁচিয়ে ডাকৃছি দিদিকে......" ওর স্বরে স্পষ্ট ভয়ের আভাষ পাওয়া যায়।

"কে রে, অতি নাকি! কি করছিস ওখানটায়—কি হয়েছে—একটা ছায়া এসে পড়ে খিলানের গোড়ায়,—ছায়াটাই যেন শব্দিত হ'ল।

বুঝতে বাকী থাকে না যে পেছনে সজীব মানুষ বর্ত্তমান। অতসী ছাড়া আর কেউ নয়!

অতলা ছিটকে এগিয়ে আসে ছায়ার দিকে; অশেষ বিব্রুত ভাবে পেছিয়ে বেরিয়ে পড়েন ওদিকের দালানে।

একলা অতি'ই ত'...আর কেউ নেই ?

অতসী একই সঙ্গে উঁকি মেরে দেখে এবং প্রশ্ন করে "তুই একলাই অমন করে' চেঁচাচ্ছিলি ? আশ্চর্য্য মেয়ে! আবৃত্তি করছিলি নাকি কিছু ?"

স্বেচ্ছায়, অথবা থতমত খেয়ে বেফাঁস ভাবেই হোক্ অতলা বলে' ফেলে, "না' একলা নয় ত,,—জামাই বাবুও ছিলেন।"

অতসীর মুখ গম্ভীর হ'য়ে আসতে থাকে।..."জামাই বাবু, তা' কোথায় গেলেন তিনি ?" —"পালালেন।"

অতলা ঢোক গিলে বলে' "হ্যাঁ পালালেন।"

ওর গলার স্বর এবং বলবার ভঙ্গী যেন একেবারেই হঠাৎ বদলে গেল। বাঁহাত তুলে এবং ডান হাত আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে' "দেখ ত' যখন তখন কেবল

ঐ বিয়ের কথাই। কোথাকার কে এলো না-এল,-বিয়ে করতে হবে তাকেই। আমি ভালবাসিনা ওসবকে—লজ্জা করে। কিন্তু জামাই বাবুর যেন লজ্জা নেই; এমনভাবে এনালিসিস্ করতে বসেছিলেন ...আমার দোষ কি, অসহ্য হ'লে কে না চেঁচিয়ে ওঠে!"

বসে একদিকে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে, অন্য দিকে গাল ঘষে' লাল করে তোলে।

অতসীর মুখের কঠিনতা তার মুখের ওপরই ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হ'য়ে যায়। গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে সে কি ভাবে এসে গাম্ভীর্য্যের বাইরে একটু দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসে।

একটু চুপ করে থেকে বলে, "এই কথা। সেই যে 'চায়ের কাপে তুফান ওঠা বলে একটা কথা নেই—তা'ই; তোর জামাই বাবুকে নিষেধ করে দেব; আর যেন কক্ষণো বিয়ের কথা না বলেন তোকে।"

হাতশুদ্ধ ওর চোখের আঁচল টেনে বলে, "তাই বলে কচি খুকির কাঁদতে হবে! কি যে জ্বালাতনে পড়েছি তোকে নিয়ে বাপু! আয় এখন আমার সঙ্গে; কদিন হ'ল টবের গাছগুলায় জল দেওয়া হয় নি......জলের ঝাঁঝরাটা কোথায় আছে অতি?"

"বড় টবটার পেছনে" বলে অতসী দিদির অনুসরণ করে। সিঁড়ির ওদিকের দালান থেকে এদিকের বারান্দা দেখা যায় না; কিন্তু একটুকু বড় করে' কথা বললেই শোনা যায়। অশেষ ওদের দুজনের প্রত্যেকটি কথা শুনতে পায়।

ওরা দুজন এদিকের বারান্দা দিয়ে চলে; অশেষ চলেন ওদিকের বারান্দা দিয়ে। (ক্রমশঃ)

নগেন্দ্র গুপ্তের ছোট গল্প

(২)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সরস্বতী, এম, এ

"ঘরের অলক্ষ্মী" ছোট গল্পটী অত্যন্ত করুণ।

১২৯৬ বঙ্গাব্দের "ভারতী ও বালকে" নগেন্দ্র গুপ্তের "ভৈরবী" নামক ছোট-গল্প প্রকাশিত হয়। উহা ঐতিহাসিক বা ইতিহাস মূলক। লেখক যে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই ছোট গল্পের ঘটনা-সংস্থান করিয়াছেন এবং ইহাতে যে রাণী চন্দার আজীমগড়ে ইংরেজদের সহিত বড় যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে কতটা সত্য আছে তাহা ইতিহাসবেত্তা পাঠক পাঠিকাই ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় অনেক ছোট-গল্প লিখিয়াছেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনামূলক ছোট-গল্পে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, ইহাতে ছোট-গল্প লেখকগণ ইতিহাসের মূল ঘটনার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে এত অবহিত থাকেন যে, তাহাতে ছোট-গল্পের ছোট গল্পত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং সেজন্য পাঠক-পাঠিকা সেই ছোট-গল্পের সুকুমারতা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ছোট-গল্প লেখক ইতিহাসের অমর্য্যাদা না-হয় বিবেচনায় কোনও চরিত্রকে রূপান্তরিত করিয়া ছোট গল্পোচিত করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাই ছোট-গল্পের একমুখিতা, স্বাতন্ত্র্য, করুণতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি বাদ পড়িয়া যায়।

রাণী চন্দা যেরূপ কার্য করিয়াছিল, তাহা বাড়ানো বা কমানো ছোট-গল্প লেখকের ক্ষমতা বহির্ভূত।

ঐতিহাসিক ছোট গল্পের আর একটি লক্ষ্যনীয় বস্তু, ইহাতে চরিত্রাঙ্কন সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইতে পারে না। এমন কি, ইতিহাস যে চরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য নাম বা বিকৃত নাম বা অন্য চরিত্রের উল্লেখ ছোট

গল্পলেখক করিতে পারেন না, কারণ তাহাতে ঐতিহাসিক ভুল বা অমর্য্যাদা হইয়া পড়ে !

তাই এই "ভৈরবী" ছোট গল্পে লেখক নগেন্দ্র নাথকে ছোট-গল্প লেখক হিসাবে বিচার করিতে পারা যায় না। রাণী চন্দা যে বীরাঙ্গনা ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। সে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে আজীম-গড় রক্ষার জন্য আমরণ লড়াই করিয়াছিল এবং পরিশেষে পরাজয়ের লাঞ্ছনার সম্ভাবনা বুঝিয়া বারাণসীধামে পলাতক হইয়াছিল। ইহাও বীরোচিত কার্য্য এবং সর্ব্বশেষে রাণী চন্দা গুপ্তচর মমতাজ আলির গোয়েন্দাগিরিতে ধরা পড়িয়া তাহার পশু প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যায় আত্মরক্ষা করিল, তাহা বাস্তবিকই অসীম বীরত্বের নিদান।

মমতাজ আলি এতবড় নির্ভীক বীরত্ব ব্যাঞ্জক হৃদয়ের কাছে, যাহা ব্রিটিশের নিকট অবনমিত হয় নাই, প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিল। রাণী চন্দার বক্ষ, যাহা অতি দুর্ভেদ্য ধাতুতে প্রস্তুত, তাহাতে সেই ইতরোচিত কাতর ভিক্ষা স্পর্শ করিল না, স্পর্শ করিল সেই সুতীক্ষ্ণ রক্ত পিপাসু ত্রিশূল-ফলক, ফলে মৃত্যু। কামুকের কামলালসা সেই বীরাঙ্গনার শোনিতে নিদারুণ শিক্ষা পাইল যে চরিত্রমণি স্বদুর্মূল্য ও পবিত্র এবং ইহা বলাই লেখক নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের উদ্দেশ্য।

চিরকুমারী—ভারতী ও বালক, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ

মুক্তি সাহিত্য ১২৯৮ বঙ্গাব্দ

১২৯৬ বঙ্গাব্দে ভারতী ও বালক প্রত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চিরকুমারী" নামক ছোট গল্প প্রকাশিত হয় এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় "মুক্তি" নামক ছোট গল্প মুদ্রিত হয়। ইহার শিরোনামের নিম্নে লেখক জানাইয়াছেন "মুক্তি" ইতিবৃত্ত। সুতরাং উহাতে যে "মুক্তির" "আমি" মহাশয়ের জীবনী বা জীবনীর কতকাংশ বিচিত্র আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

নূতন বাড়ী। সাহিত্য, ১২৯৯, বঙ্গাব্দ

১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "নূতন বাড়ী" ছোট গল্পটি প্রকাশিত হয়।

ইহাতে তিনি ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে তথাকথিত ভূতপ্রেতে অনাস্থাবান্ এবং অল্প বুদ্ধি মানুষেরা ভূতের বিষয় না জানিয়া শুনিয়া বৃথাই উহাকে বিশ্বাস করেন, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। অবশ্য এ কথা তিনি বলেন নাই যে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব একেবারে নাই।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "নূতন বাড়ীতে" প্রণয় ঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যত যুগে ছোট গল্প কি আকার ধারণ করিবে, ১২৯৯ বঙ্গাব্দেই তাহার একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় ছোট গল্প যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এই একই সময়ের মধ্যে ছোট গল্প লিখিয়াছেন। কেহ কাহারও দশ বিশ বৎসরের আগে বা পরে আবির্ভূত হন নাই। খুব আদিকাল ধরিলে অবশ্য ১২৮০ বঙ্গাব্দ হইতে অর্থাৎ যে বৎসর শ্রীপূঃ রচিত "মধুমতী" "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থের ছোট গল্পের আলোচনার কাল ধরিতে হয়। ঐ বৎসরের পর হইতে বহু অজ্ঞাতনামা লেখক কোন কোন বঙ্গাব্দে ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা উহাতে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তারপর যে বৎসর হইতে ধারাবাহিক ভাবে ছোট গল্প লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ১২৯৪ বঙ্গাব্দ এবং এই বঙ্গাব্দেই নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চুরি না বাহাদুরী" "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা হইলে সেই ১২৮০ বঙ্গাব্দ হইতে একেবারে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে পৌছা গেল। অবশ্য ১২৯১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘাটের কথা" ও "রাজ পথের কথা," "নবজীবন" ও সাধনা মাসিক পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর কোনও ছোট গল্প ১২৯৮—৯৯ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ১২৯৪ বঙ্গাব্দ হইতে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ক্রমিক প্রসার লক্ষিত হয়।

এই ১২৯৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে যে সমস্ত ছোট গল্প লেখক তাঁহাদের ছোট-গল্প সমূহ লিখিয়া বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাস বিশেষ লক্ষনায়; তাঁহারা এই তের বৎসর যাবৎ এইরূপ একত্র হইয়াই যেন ছোট গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের অগ্র-পশ্চাৎ বিভেদ করা কষ্টকর।

এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ হইতে বাংলা সাহিত্যে "রবীন্দ্রযুগ" আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগ-ধর্ম বোধ হয় এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায়ও প্রতিভাত হয়। তিনি ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত যেরূপ ছোট গল্প রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ হইতে ছোট গল্প অনেক উন্নত ধরণের রচনা করিয়াছেন, তাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "নূতন বাড়ীতে" এই পূর্ব্বকাল-ধর্ম্মের রচনা শক্তিই প্রতিপালিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যকান্ত রায় দরিদ্র সন্তান। ঘরে বিধবা মাতা, বিধবা পিসি, বিধবা ভগিনী। সকলের ভার তাহার উপর। সে কাজকর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছিল। সে ভাগ্য ক্রমে ধনী মহেন্দ্র নাথ চৌধুরীর সহিত ছেলে বেলায় একত্র পড়িয়াছিল। সেই ছেলেবেলাকার পরিচয়ের সুযোগে সূর্য্যকান্ত মহেন্দ্রনাথের নিকট একটি চাকরির উমেদারী করিতেছিল এবং যত প্রকারে মোসাহেবী করিয়া বা অন্য কিছু দ্বারা তাহাকে খুসী করিতে পারিত, তাহার আপ্রাণ চেষ্টা সে করিত।

এই সূর্যকান্ত ও মহেন্দ্রনাথের বাল্য বন্ধুত্ব বা সহপাঠিতা লইয়া এই ছোট গল্প রচিত নহে, রচিত মহেন্দ্রনাথ যে নূতন বাড়ী পল্লীগ্রামে বীরভূমে কিনিয়া ছিল, তাহার ঘটনার বিবরণ লইয়া এবং সেখানে গিয়া যে একটু প্রণয় ব্যাপার ঘটিয়া ছিল তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া।

"মহেন্দ্রবাবুর একটু কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আনন্দে অস্থির।

আঃ! বাঁচা গেল। এখানে কোন গোলমালই নেই। কেবল শান্তি, কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন সুন্দর।

বাগানে ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণীর ধারে চাঁপা, কামিনী, গন্ধরাজ ফুলের গাছ, কিন্তু যত্নের কোন চিহ্ন কোথাও নাই। বাগানের ধারে মালীর ঘর কিন্তু বাগানের সহিত মালীর কোন সম্বন্ধ আছে তাহা বাগান দেখিয়া বোধ হয় না।"

মহেন্দ্রনাথ সূর্যকান্তকে সঙ্গে লইয়া বীরভূমের নূতন কেনা বাড়ীতে পৌছিল এবং সানন্দে সেখানে বাস করিতে লাগিল।

"কয়েক মাস হইল মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। তিনি এপর্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই।"

মহেন্দ্রনাথের এইরূপ মনের অবস্থায় যে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্রনাথকে বিভ্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন করিল, সে সেই নূতন বাড়ীর মালীর বিধবা কন্যা, নাম মোক্ষদা।

"দিন কয়েকের মধ্যে মহেন্দ্রবাবুর আচরণে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। কিছু অন্যমনস্ক, একা থাকিতে ভালবাসেন। বেড়াইবার সময় আমাকে আর বড় একটা ডাকিতেন না, একা বেড়াইতেন।

দুই একবার বাগানে বা পুষ্করিণীর ধারে দেখিলাম মোক্ষদা দাঁড়াইয়া আছে, অথবা চলিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র বাবুও যেন সেইখানে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। হয়ত একটা কথা হইত, হয়ত কথা হইত না। দুইজনে দুইদিকে চলিয়া যাইত।

মহেন্দ্রনাথ এইভাবে অসবর্ণ প্রেমে পড়িল। উহার ক্রমিক বিবরণই লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই ছোট গল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মোক্ষদা মালিনীর প্রেম যেন সূর্য্যকান্তই বেশী কামনা করিত বলিয়া অনুমিত হয়।

"আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মোক্ষদা আর যাহাই করুক, আমার কোনও কথা কাহাকেও বলে না।"

এই "নূতন-বাড়ী" ছোট-গল্পে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একটি চমৎকার বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; সেটি বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তিনি মোক্ষদা মালিনীকে এখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

"মহেন্দ্রনাথ বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন.........ভালবাসায় আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি!"

এখানে মহেন্দ্রনাথ মোক্ষদা মালিনীকে দৈহিক ভোগ করিতে অনুরাগী হইয়াছিল:

"আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, তুমি কি আমায় তেমন ভালবাস!" সেই স্বর, মধুর মাত্রা কিছু বেশী।

'বাসি না; মোক্ষ! তবে তুমি আমার মন কিছুই জান না। আমি যে দিন হইতে তোমায় দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে ভালবাসি। আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি আমায় যন্ত্রণা দিও না। কি চাও তুমি; যাহা চাও, তাহাই দিব। আমাকে আর কষ্ট দিও না।'

মোক্ষদা কহিল—'আমি তোমা বই আর কাহাকেও কখনও ভালবাসি নাই, কখনও বাসিব না। কিন্তু মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন। আজ পর্য্যন্ত অধর্ম্ম করি নাই। প্রাণান্তেও ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।'

....'তবে তুমি আমার ধর্ম মতে ভালবাস না কেন !'

'কিরূপে !'

'আমায় বিবাহ কর।'

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন 'তুমি পাগল।'

মোক্ষদা পূর্ব্বের ন্যায় ধীর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল 'যদি তোমার কথা এখন শুনি, তাহা হইলে সত্যই পাগলের কাজ হয়। তোমার কি ? দুদিনের সখ দুদিন পরে মিটিয়া যাইবে। পাড়া গাঁয়ে একটা পুতুল কুড়াইয়া লইয়া দু দিন খেলা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সহরে চলিয়া যাইবে। তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই আমি ধর্মত্যাগ করিব না। আর অধর্মের কথাও শুনিব না।"

এই ছোট-গল্পের শেষে ইহা ঘটিল, মোক্ষদা ঐ দালান বাড়ীর দেওয়ালের গুপ্ত দরজার ভিতর দিয়া মহেন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিয়া, রাত্রিকালে ভূত সাজিয়া এবং উক্ত রূপ কথা বলিয়া মহেন্দ্রনাথকে অসবর্ণ বিবাহ করিতে পীড়ন করিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ মোক্ষদার প্রেমে পাগল হইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িল।

সূর্য্যকান্তও মোক্ষদা মালিনীর মনোভাব জানিত, তাই মহেন্দ্রনাথ উত্তেজনা-বশে মোক্ষদাকে বিবাহ করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িবে ভাবিয়া সূর্য্যকান্ত প্রভুকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল এবং এক রাত্রিতে ভূতবেশিনী মোক্ষদাকে ধরিয়া ফেলিল।

পরে মোক্ষদা নিজেকে অপমানিতা বোধ করিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল। মহেন্দ্রনাথ এই ঘটনার পরে আর নূতন বাড়ীতে থাকিল না, উহা পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যকান্ত-সহ কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সূর্য্যকান্তও মহেন্দ্রনাথের অধীনে চাকরি পাইল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "নূতন বাড়ী" ছোট গল্পটি বিশেষ জটিল। ইহাতে প্রেম, সমাজ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইলেও ইহা মনস্তত্ত্বমূলক। কিরূপে ইহার ঘটনা সমূহ পাঠক-পাঠিকার মনের উপর আঘাত করে, তাহাই বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের হিন্দু-সমাজের বিবাহ প্রথা ও আচার পদ্ধতির উপর কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, তাহা এই ছোট-গল্প পড়িয়া স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। মালিনী মোক্ষদা প্রেমের মূর্তিতে আসিয়া বিপত্নীক মহেন্দ্রনাথের তরল মনকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লেখক মহেন্দ্রনাথকে মোক্ষদার কাম-বহ্নিতে কিছুতেই ঝাঁপ দিতে দিলেন না। মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের দৃঢ়তা নগেন্দ্র গুপ্তের সামাজিক আচারানুষ্ঠানে একনিষ্ঠতা প্রমাণ করিল।

নগেন্দ্র গুপ্ত মনে করিলেন, মহেন্দ্রনাথকে মোক্ষদার সহিত মিলিত করিলে হিন্দুর উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের সহিত বিবাহ হইয়া সমাজে কু-আদর্শ স্থাপিত হইবে এবং পাঠক-পাঠিকা লেখককে দোষী সাব্যস্ত করিবে, ইহা তিনি সমাজস্থ হইয়া সহ্য করিতে পারিবেন না।

বাস্তবিক "নূতন বাড়ীতে" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; এই-ছোট গল্পটির অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক পাঠিকাকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর ভাষার বিষয় ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর "বন্ধু" নামক ছোট-গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা উত্তম ছোট-গল্প।

"রোশন ও মোহন বাল্য বন্ধু। উভয়ে জাতিতে আহীর। রোশন মোহনের চেয়ে কিছু বয়সে বড়। বাল্যকাল হইতে সে ব্যায়ামে পটু। মোহন বুদ্ধিমান কিন্তু বিশেষ বলবান ছিল না। দুইজনে একত্রে গরু চরাইত, জলে সাঁতার কাটিত, দুগ্ধ দধি বিক্রয় করিতে যাইত। আজ এই শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে গঙ্গাতীরশোভী কাননে উভয়ে গান গাহিতেছিল। সেই কাননের সহিত কত বাল্য ক্রীড়া কৌতুকের স্মৃতি বিজড়িত ছিল।"

* * *

"তাহার দুই হস্ত দূরে একটা গোক্ষুর সর্প যাইতে ছিল, সে দেখিতে পায় নাই। সম্মুখে মনুষ্য ও তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া সর্প ফোঁস ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল, ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেই রোশন দংশিত হইত। কিন্তু সর্প যেমন ফণা তুলিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে মোহন তাহার মাথায় লাঠি মারিল। চূর্ণ মস্তক হইয়া সর্প পতিত হইল। মৃত সর্প দেখিয়া রোশন হাসিল। মৃত্যু ভয় তাহারা জানিত না। কহিল মোহন, আমি একবার তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে।"

* * * *

গ্রামের বাহিরে একখানি চালা ঘরে সুভাগীয়া বাস করিত; কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানিত না। কিছুদিন পূর্বে গ্রামে আসিয়া জমি লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রকমে বোধ হইত অর্থের তেমন অভাব নাই। বিধবা বলিয়া পরিচয় দিত, কিন্তু তাহাদের জাতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহে কোন বাধা ছিল না।"

*　*　*　*

যখন আর সকলে উঠিয়া গেল, সুভাগীয়া তখন সাঁতরাইয়া গভীর জলে গেল। রোশন মোহনকে কহিল, আইস আমরাও যাই। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রোশন জল ঠেলিয়া সুভাগীয়ার অভিমুখে চলিল।"

*　*　*　*

"সে দিন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি পড়িতে ছিল। অন্ধকার হয় নাই। সুভাগীয়া আপনার দরজার ভিতর দাঁড়ানো। সম্মুখের এক বট গাছের তলায় রোশন দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সঙ্গে মোহন ছিল না। সেই অবকাশে রোশন একটা কাজরির এক কলি গাহিল:

'খোজত ফিরোঁ সারি বন বন,
কতহুঁ না মিলে যদুকে নন্দন
কওন সওয়ত বশ কিহ্ মোহন।'

সুভাগীয়া হাসিয়া তৎক্ষণাৎ পরের কলিতে উত্তর দিল:

'মোরা স্বজন হয় ফুল গুলাবী
মৈকলিয়া চম্পে কে স্বজন
কওন সওয়ত বশ কিহ্ মোহন।'

সেই বৃষ্টি-বাদলের সময় বিকি কিনি হইয়া গেল।

*　*　*　*

"সুভাগীয়া বুঝিল রোশন তাহার নিকট আছে বলিয়া মোহন দূরে থাকে। সে মনে মনে হাসিল। রোশনের সঙ্গেই সে চিরকাল কাটাইবে না কি?"

*　*　*　*

"রোশন সুভাগীয়ার কথায় বিশ্বাস করিয়া কোনওরূপ চিন্তা না করিয়া মোহনের মাথায় লাঠি মারিল।"

*　*　*　*

"দারোগা জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার ফরিয়াদ কি; মোহন বলিল 'কিছুই নহে।"

মোহনের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কিরূপে রোশনকে চির-জীবন বিপদের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া রক্ষা করিতে ছিল ইহা দেখিয়া পাঠক পাঠিকা স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই। সুভাগীয়া সর্পিনী ইহা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতে ছিল। রোশনের অশিক্ষিত যৌবন-বেগ পীড়িত মন সুভাগীয়ার যুবতী মূর্তিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে ছিল। তাই রোশন ডুবিল, কিন্তু সুভাগীয়া শয়তানী, সে রাক্ষসী। সে জন্য সে মোহনকে বশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মোহন শিক্ষিত হৃদয় ও সংযমী, তাই সে সুভাগীয়ার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল না। তাহাতেই যত গোল বাধিল।

সুভাগীয়া শয়তানী হইলেও বুদ্ধিমতী। সে রোশনকে মোহনের বিরুদ্ধে উস্কাইতে লাগিল। ফলে রোশন মোহনকে লাঠি মারিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রকৃতই ছোট গল্প লেখক। কিরূপে ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে হয়, তিনি তাহা বেশ জানেন। এই রোশনের মোহনের প্রতি লাঠি মারার চিত্র যদি তিনি উপস্থাপিত না করিতেন এবং মোহন দারোগার কাছে যদি সমস্ত ফরিয়াদ অস্বীকার না করিত, তবে মোহনের বন্ধুত্ব প্রমাণিত হইত না। শেষে আর একটা চিত্রে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মোহনকে অতি উচ্চে তুলিয়া দিয়াছেন, সে চিত্র, যখন রোশন সুভাগীয়াকে খুন করিয়া বিপন্ন হইল। রোশনের আদালতে তো ফাঁসি হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু মোহন ইহার ভিতর পড়িয়া এই খুনের ব্যাপার চুপ করাইয়া দিল, কারণ দেশে সকলেই তাহাকে তাহার সুবুদ্ধির জন্য মান্য করিত।

সেক্সপীয়ের বিখ্যাত Antonio ও Bassani র বন্ধুত্বের গল্প সকলের জানা আছে। সর্বদেশেই ঐ জাতীয় গল্পের প্রচলন আছে। লেখক নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের এই "বন্ধু" ছোট গল্পটিও অনেক বন্ধুত্বের আদর্শের গল্পের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে।

"বন্ধু" ঘটনা মূলক ছোট গল্প এবং তাহাতে বন্ধুত্বের আদর্শ আরোপিত করা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশ্য এবং সেই বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তিনি জীবন্ত তুলিকায় চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ছোট গল্প আলোচনার প্রারম্ভে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষার অনেক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ক্রমশঃ

প্রেম ও পাষাণ

শ্রীকণা দত্ত

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

(মন্দির-সংলগ্ন উদ্যান)

(এক প্রস্ফুটিত করবী গাছের তলে বনশ্রী আনমনে দাঁড়াইয়া আছেন।

হাতে ফুলের সাজি-ভরা ফুল।

অকস্মাৎ ফুলের সাজিটী হইতে মাটিতে ফুলগুলি ঢালিয়া দিলেন, পা দিয়া মাড়াইয়া মাড়াইয়া ফুলগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ভূমিতলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।)

বনশ্রী—কি হবে ফুল তুলে ? দেবতার পূজা ?

দেবতা কি চায় ? ফিরেও চায় না, ভুলেও কই হাতে তুলে দেখে না।

(বেদনা রঞ্জিত হাসিতে মুখখানি করুণ হইয়া উঠিল)

(পা দিয়া ফুলগুলিকে আবার নিষ্পেষিত করিলেন।)

ঠিক্ এম্নি করেই পায়ে দলে সে চলে যায়। সে কি আনমনা ? সে কি পাগল ? কি সে ?

ভাল লাগে না কিছু। কিই বা করি ? কাঁদবো ? কেঁদেই বা কি হবে ? যার জন্যে অন্তরে অন্তরে দিবারাত্রি কেঁদে মরছি, সে কি ফিরেও চেয়ে দেখে ?

(অন্তরালে একটী অতি পরিচিত সুকণ্ঠের গান শোনা গেলো)

বুঝেছি, সুকৃষ্ণা আস্ছে। ওই সুখী। মাটীর মানুষের মত ভালবাসতে পায়। ফিরে ভালবাসা চাইবারও ওর অধিকার আছে। আর আমি ?

(দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

(দূরের গান ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল)

গান

আপন ভোলা শিল্পী ওগো কবে,
আমার ব্যথার স্বপন ভীরু ভালবাসা
তোমার চোখের চাওয়ায় সফল হবে ?
রচিয়া পূজা তোমারি লাগি
কত বিরহের রজনী জাগি
দুরাশার এ তিমির কভু দূর হবে কি
তোমার আলোর রবে।
সইতে নারি বইতে নারি
মৌন বেদন ভার,
বারে বারে ব্যর্থ হোলো
আমার অভিসার,
মোর নৃত্যরসের ছন্দগীতি
কি মিনতি করে নিতি
(তবু) তোমার পাষাণ হিয়া হে আনমনা
(সেকি) চির নীরব রবে ?

(সুকৃষ্ণা আসিয়া বনশ্রীকে জড়াইয়া ধরিল)

সুকৃষ্ণা—দেখলি তো সই. কেমন মনের কথা জানি ?

বনশ্রী—সার্থক গলা তোর কৃষ্ণা ! মনে হয় জন্ম জন্ম ধরেই শুনি।

সুকৃষ্ণা—তোর পার্থ ? তার চেয়েও ভালো ?

বনশ্রী—যা যা ফাজলামীতে কাজ নেই, ও সব কথা রেখে দিয়ে আর একটা গান গা তো, যা তুই পারিস।

সুকৃষ্ণা—গাইবো না। তুই যতক্ষণ না বলবি। পার্থর চেয়ে আমি আরো ঢের ভাল গান গাই।

বনশ্রী—গাস, গাস্, গাস্। ওর চেয়ে তুই হাজার গুনে ভালো গাস্। হোলো তো এবার ?

সুকৃষ্ণা—উঁ হুঁ, এ তোর কিন্তু মনের কথা নয় ভাই।

(বনশ্রী রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

বনশ্রী—তুই সব জানিস্ ?

সুকৃষ্ণা—(তাঁহার আঁচল টানিয়া ধরিলেন) জানিই তো। শুনবি ? জানি কি না জানি। তবে দেখ্ ;

(আবার গান ধরিলেন)

ভাবি তোমায় বাঁধবো কিসের জোরে,
সাহস না পাই বাঁধতে বাহুর ডোরে ?

হঠাৎ কখন দূরের পানে
চলে যাবে নোতুন টানে
সেই ভয়েতেই দিবস রাতি
ভুবন ওঠে ভরে।
কোন্ সে নোতুন খেলার রঙে
রাঙবে তোমার মন.
হারাই কখন মোর জীবনের
একটী পরম ধন ?
স্বপ্নলোকের কল্প ছায়ায়
সেই ভাবনায় দিন কেটে যায়,
(কভু) তোমার দেখা না যদি পাই
রইবো কেমন কোরে ?

(সুকৃষ্ণা গান শেষ করিলে)

সুকৃষ্ণা—কি, হোলো তো ? বল্ এবার জানি কিনা ? তোর মনের আঁতি পাতি আমার মুখস্থ রে ? আমার কাছে লুকাবি, তুই ?

বনশ্রী—তোর গানের কথাই ভাবছি কৃষ্ণা। ঐ ছত্রটা "কোন্ সে নতুন খেলার রঙে রাঙবে তোমার মন" কিন্তু ভুল-ভেলার রঙেই যদি সে মাততো সে যার সঙ্গেই হোক্ না কেন, তবু মনে কিছু সান্ত্বনা পেতুম, যে ওর প্রাণ আছে ? আমার কিছু নেই তাই জাগাতে পারিনি। আর একজনের আছে। তাই সে ওকে জাগাতে পারলো। অনেক দুঃখের মধ্যে সেও একটা সান্ত্বনা থাকতো। পাথর দেখেছিস কৃষ্ণা ? ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে তাও ক্ষয় হয়।

সুকৃষ্ণা—তুই ওর চিন্তা ছেড়ে দে শ্রী। একটা অপদার্থ পাগলের পেছনে এমন করে জীবনটা ব্যায় করায় কি লাভ বল্ ?

বনশ্রী—লাভ। কেমন করে বোঝাব ? ব্যথা দেয় ? অবজ্ঞা করে, অবহেলা অপমান পাই। তবু মনে হয় তাঁর মত সুন্দর আর কেউ নয়। যত অনাদর করে তত তাকে ভালবাসি, তত বেশী করে চাই।

সুকৃষ্ণা—অসম্ভব ! তোকে বুঝানো আমার কর্ম্ম নয়। মরুগকে পার্থ ! এদিকের খবর শুনেছিস্ তো ? আমি যে চল্লুম !

বনশ্রী—(বিস্মিত বিস্ময়ে উৎসুক হইয়া উঠিলেন)
কোথায় ?

সুকৃষ্ণা—কোথায় আবার, যে পথে গিয়াছেন তিনি যাবো সেই পথে।

বনশ্রী—তার মানে, দীপঙ্করের সঙ্গে তুইও কি সন্ন্যাস নিবি নাকি ?

সুকৃষ্ণা—সন্ন্যাস বলিস না, বল্ মুক্তিব্রতে দীক্ষা নেবো।

বনশ্রী—কিন্তু ভগবান তো শুনেছি নারীকে নাকি মুক্তিব্রতে দীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক।

(সুকৃষ্ণার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল)

সুকৃষ্ণা—সে বাধা কেটে গ্যাছে ভাই। গৌতমের বিমাতা মহাপ্রজাপতির ঐকান্তিক আগ্রহ, আর মহাভিক্ষু আনন্দের আপ্রাণ চেষ্টা সে পর্ব্বত প্রমাণ বাধাকে আজ দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছে। ভগবান নারীকে প্রব্রজ্যা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। ভাই, তাই আজ আমার এ যাত্রা।

বনশ্রী—কিন্তু এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় ছিল না কৃষ্ণা ? শুনেছি রাজার প্রধান অমাত্য জয়ন্তও তোকে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করে দীপঙ্করকে বিবাহ করলি। দীপঙ্করের সঙ্গে এ ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করার চেয়ে সেই তো তোর পক্ষে আরও ভালো হোতো কৃষ্ণা। সমস্ত জীবন তোর পড়ে রয়েছে, এ ব্রত কি তোকে সাজে ভাই ?

সুকৃষ্ণা—আমায় কি সাজে আর না সাজে সে ভাবনা তো অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছি শ্রী। শুধু জানি, সে আমায় যে সাজে সাজাতে চায় কেবল তাই-ই আমার যোগ্য সাজ। আমার স্বামী সে। তবু সে তো আমায় একবার বলেনি তার সঙ্গে এ ভিখারীর জীবন যাপন করতে। তবু আমি যাবো। তাঁর রুচির সঙ্গে যদি নিজের রুচিটুকুই না মিলাতে পারলাম, তার চাওয়াকে যদি আমার চাওয়াই না করতে পারলাম, তবে আর ভাল বাসলাম কেমন খানটায় শ্রী ? কিন্তু দাঁড়াবার আর সময় নেই ভাই। যাবার আগে তোকে একবার ভারী দেখতে ইচ্ছে হোলো।

বনশ্রী—ধরে রাখবো কাছে, এত শক্তি কোথা

পাবো কৃষ্ণা? যে সুখ জীবনে পেলেম না, মরণেও পাবার আশা নেই সেই সুখ শান্তি যেন তোর জীবন ভরে বিরাজ করে, যাবার বেলা শুধু আমার এই কামনাটুকুই রইলো তোর সাথে সাথে।

(ক্ষণেক থামিলেন, পরে)—আমার জীবনে এক মাত্র তুইই ছিলি। মনের পাপপুণ্যের এতটুকু ইতিহাস যার কাছ হ'তে শুধু আড়াল করবার চেষ্টা করিনি।

তুইও চললি। আর আমার কি সান্ত্বনা বাকী রইলো বলতে পারিস কৃষ্ণা?

সুকৃষ্ণা—সখী! গভীরতম বেদনা অনুভূতিই একদিন তোকে পরম আনন্দ রসের পূর্ণপাত্র উজাড় করে ঢেলে দেবে। যিনি দুঃখ দেন, সান্ত্বনা দিতেও তিনি ভোলেন না। সুখ দুঃখ সমভাবে মিশ্রিত বলেই তো মানুষের জীবন এত রহস্যময়, এত সুন্দর। একটু বিশ্বাস রাখিস দুঃখ দুর্দ্দশা যিনি দেন, অক্লেশে বহন করবার ক্ষমতাটুকুও তিনিই যোগাবেন। ব্যর্থতা যদি এসেই থাকে জীবনে সান্ত্বনা আসতেও দেখিস্, দেরী হবে না মোটেও।

আমি আসি শ্রী। স্বামী হয়তো ব্যাস্ত হয়ে উঠেছেন।

(সুকৃষ্ণা চলিয়া গেলেন)

বনশ্রী (অস্থির ভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন) শান্তি, শান্তি, শান্তি। সকলেই পেলো শান্তির সন্ধান সুকৃষ্ণা পর্য্যন্ত, শুধু আমিই পেলাম না? কোথায় শান্তি, কোথায় সান্ত্বনা? ভ্রম, ভ্রম জীবন ব্যাপী। এ ভ্রমের কবল থেকে কে আমায় উদ্ধার করবে? জীবনের পাথেয় ফুরিয়ে আসছে ক্রমেই। কোথায় স্নেহ? কোথায় আশ্রয়? প্রতি পদে শুধু সংশয়, আর সন্দেহ! শুধু ব্যাথা! আর বঞ্চনা।

(ক্ষণেক থামিলেন)

সুকৃষ্ণা বেশ গায় কিন্তু! সেদিন যেটা শিখে নিলাম ভারী সুন্দর। কোত্থেকে যে জোটে ওর এত কথা কে জানে? ওকে বড় ভাল লাগ্‌তো, তবু তো কই বেঁধে রাখতে পারলাম না। কী জানি কী মুক্তির সন্ধান সে পেয়েছে।

(অন্তরাল হইতে বিধায়ক ডাকিলেন)

বিধায়ক—বনশ্রী! বনশ্রী!

(ডাকিতে ডাকিতে কাছে আসিলেন)

বিধায়ক—কী হচ্ছে এখানে? সেই কুচক্রীটারই অপেক্ষা বুঝি? কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

বনশ্রী—কেন বৃথা সন্দেহ করেন পিতা? সেদিনেও বলেছিলাম, তিনি নির্দ্দোষ, আজও তাই বলছি। অযথা এ নির্য্যাতন কেন আর্য্য?

বিধায়ক—(ললাটে ভ্রূকুঞ্চনের রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত পিষিলেন) শুধু নির্য্যাতন? নির্ব্বাসিত করে তবে আমার কার্য্য সমাপ্ত করেছি। চির জীবনের মত পথে পথে ঘুরবে। ভিক্ষুকের মত দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে শুধু উচ্ছবৃত্তি সম্বল করে ঘুরে বেড়াবে। অসহ্য পথশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত ললাটে, কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত পায়ে শুধু স্মরণ করবে, দেবতা হেলার জিনিষ নয়। দেবতার ভোগের সামগ্রী যে অপহরণ করে সেই লম্পটের একমাত্র শাস্তি নির্ব্বাসন।

(বনশ্রী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন)

বনশ্রী—নির্ব্বাসন? এ আপনি কি বলছেন পিতা? এতটুকু সামান্য কারণে,—বিনাদোষে,—ভবিষ্যতের যে রাজা তাকে আপনি নির্ব্বসনে প্রেরণ করলেন? না, না, এ সত্য নয়। অসম্ভব এ কাহিনী।

(উঠিয়া গাছের গুড়িটিকে আঁকড়াইয়া শরীরে বল সঞ্চয় করিলেন)

না, না এ কখনও সত্য হ'তে পারে না; বলুন পিতা! এ সত্য নয়?

বিধায়ক—হাঁ সত্য!

বনশ্রী—(নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল)

সত্য! এ কি সম্ভব পিতা? অকারণে এই নির্ম্মম দণ্ডবিধান?

বিধায়ক—(হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

অকারণ? একে তুমি অকারণ বল বনশ্রী? তোমার চিন্তাধারাকে সে কলুষিত করে দিয়ে গেছে। নতুবা মাটীর মানুষকে তুমি ভালবাসতে চাও? মাটীর মানুষকে ভালবাসা তোমার অন্যায় কি না, সে কথা জিজ্ঞেসা করতে সাহস পাও? আমি নিশ্চয় জানি বনশ্রী! তোমার এ

হীন অন্যায় আচরণের তলে যা প্রচ্ছন্ন আছে, তা শুধু ঐ দুবৃর্ত্তের প্রলোভনের প্রদর্শনী।

সেই তোমার মনে এমন পাপ ঢুকিয়েছে বনশ্রী, এ আমি নিশ্চয় জানি।

বনশ্রী—(দৃপ্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

মিথ্যা কথা। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা!

(বিধায়ক বনশ্রীর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন)

বিধায়ক—এতটুকু বয়স থেকে যাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, সত্য মিথ্যার ভেদাভেদ কি এবার তার কাছে শিখবো? যে দণ্ড পেলো, কই সে একটি কথাও তো বললে না। জানে যে সে দোষী। বিধায়ক যা জানে তাই এ জগতে একমাত্র সত্য! ধ্রুব সত্য! আলোর মত উজ্জ্বল। শরতের নির্মেঘ আকাশের মত উদার নির্ভুল সত্য! এতটুকু বয়স থেকে তোকে মানুষ করেছি, এ কথা মিথ্যা বলে তুই আমাকে ভুলাবি?

(অগ্রসর হইলেন)

বনশ্রী নির্ব্বাক শূন্য দৃষ্টিতে প্রেতায়িত ঘন অন্ধকার-রাশির পানে চাহিয়া রহিলেন)

বিধায়ক—সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, পাপের অঙ্কুর উদ্গমই তার ধ্বংস প্রয়োজন। আমার দেবতা তাই বলেন! আমার ধর্ম্ম তাই বলে। (প্রস্থান)

বনশ্রী—(মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতে নিজের কপাল চাপিয়া ধরিলেন)

স্বগত—তুমি পাপী? লোকে তাই বলে, কিন্তু সত্যিই কি তাই? নির্ব্বাসন দেওয়া হলো। তুমি নাকি একটি কথাও বল নি? কেন বলবে? যে মহৎ মুক্তির সন্ধান তুমি পেয়েছ, বুঝি নির্ব্বাসন কেন,—মৃত্যুও তার কাছে তুচ্ছ! দুটী মুহূর্ত্ত তোমাকে দেখেছিলাম। স্থির, অচঞ্চল মৌণ সে চোখের চাহনীতে কী সে নিবিড় সরল অনুভূতি। কী সে গভীর ভাষা।

তোমায় ভালবাসিনি, তবু তুমি আমায় মুগ্ধ করেছ। ভালবাসিনি—তবু হার মেনেছি তোমার সেই উজাড় করে দেওয়া সর্ব্বনাশা প্রেমের কাছে।

তোমার মুক্তিতে তাইতো আজ আমিও এক বৃহত্তর মুক্তিতত্ত্বের সন্ধান পেলাম। তুমিই আজ জানালে আমাকে, প্রেম প্রতিদান চায় না, শুধু অকৃপণ [illegible] নিজেকে বিলিয়েই সে সুখী হয়, সে সার্থক হয়।

(অল্পক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন)

পিতা বলেন মাটীর মানুষকে ভালবাসা পাপ। [illegible] দেবদাসী, তাই! পার্থও বলে সেইকথা, শুধু ব[illegible] —আবার তিরস্কার করে পর্য্যন্ত! গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ব[illegible]! কিন্তু, কেন আমি তাকে ভুলতে পারি না? সুকৃষ্ণা [illegible] ঠিকই বলে, কী সে, যে এত ব্যথা সয়েও তাকেই ভা[illegible] বাসতে হবে? কুমারকে শিক্ষা দিলাম! সে কত দুঃখি[illegible], আমায় ভুলে যান, মন সংযত করুণ কুমার! এ [illegible] অন্যায়! আর আমি নিজে? নিজেকে সংযত করবার শ[illegible] নেই অথচ পরকে উপদেশ দিতে যাই! ছি ছি ধিক্! [illegible] না। এ অসংযত মনোবৃত্তি। একে প্রতিরোধ করতেই হবে। নিজের মনকে বশ করতে পারবো না, এত দুর্ব্বল আমি, এত অসহায়!

না না এ অসম্ভব! পারতেই হবে।

(অন্তরাল হইতে বিধায়ক পুনরায় ডাকিলেন)

বিধায়ক—বনশ্রী! এখনও হোলো না?

বনশ্রী—যাই পিতা!

(লুণ্ঠিত অঞ্চল গুটাইয়া মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন)

(দৃশ্যান্তর)

(মন্দিরের বাহিরে পথ, রঞ্জন ও কুমার পথ চলিতেছেন)

(রূপকেতু রঞ্জনের কাঁধে হাত রাখিলেন)

রূপকেতু—একবার যাবো রঞ্জন! তাঁরই মনস্কামনা পূর্ণ হোলো! এ দুষ্টগ্রহ চিরদিনের মত তাঁর দৃষ্টিপথ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁর বারণ, তবু মন মানেনা! যাবার আগে তাঁকে গোপনে অন্তরালে থেকে শুধু একটীবার দেখে যাবো ভাই!

রঞ্জন—তাঁকে দেখে নেবে? একমাত্র তাঁরই জন্যে যে তোমার অকারণ নির্ব্বাসন বন্ধু!

রূপকেতু—নির্ব্বাসন! নির্ব্বাসন! না না—এরে নির্ব্বাসন বলো না ভাই, বলো আমার জীবনে পরমতম মুক্তি বলো এ চরমতম শুভক্ষণ। আঃ—ভাবতে পারো রঞ্জন, আর আমার সোনার তরবারি নেই, বাতাসে ওড়া এমন পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই, রাজা নেই, রাজত্ব নেই, অসীম মুক্ত

অবকাশ নিয়ে শুধু আমি ; শুধু আমি একা। জীবন আমার এবার সফল হবে কবি। একি কম আরাম ভাই। সোনার শৃঙ্খল নেই পায়ে জড়িয়ে, জয় পতাকা নেই বাতাসে উড়ে, এর চেয়ে আরাম কিছু ভাবতে পারো রঞ্জন ?

রঞ্জন—ভেবে পাইনা কেতু, সকলের সঙ্গে সবদিক দিয়ে কেন তোমার এত প্রভেদ। পাঁচজনে যা ভালবাসে, যা আকাঙ্ক্ষা করে তাতেই দেখি তোমার প্রবল বিতৃষ্ণা।

বলতে পারো কেতু! পাগল কে? তারা না তুমি? বলতে পারো আমায় ?

রূপকেতু—কে পাগল ? জানিনে ভাই! হয়তো তারা, হয়তো আমিই! (ক্ষণেক থামিলেন, গলার স্বর ঈষৎ ভারী হইয়া উঠিল) (রঞ্জনের হাত দুটী চাপিয়া ধরিলেন)

—রঞ্জন! আমার পিতাকে দেখো! আমার অসহায় দুঃখী আর স্নেহময় পিতাকে। এমন চরিত্র! এমন স্নেহ! এত ধর্ম্ম! এত ন্যায়! আর কোথায় পাবে? আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!

রঞ্জন—কেতু। আমায় সঙ্গে নেবে? তোমার পাশে পাশে ছায়ার মত ঘুরবো। দেশ হতে দেশান্তরে যাব হারিয়ে হারিয়ে।

(রূপকেতু হাসিলেন)—পাগল! আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি? আমি কি দেশ হতে দেশান্তরে ফিরবো ভেবেছ ?

রঞ্জন—তবে? তবে তুমি কোথায় যাবে ভাই ?

রূপকেতু—যে নিয়তি আজ আমায় গৃহহারা করে পথে বের করেছে আশ্রয়ও আমার সেই নির্দ্দিষ্ট করেদিয়েছে কবি।

রঞ্জন—কিন্তু! (ঢোক গিলিলেন) কিন্তু সে আশ্রয় কোথায়? কত দূরে কেতু!

রূপকেতু—আশ্রয়? কোথায়? বলবো?

(ক্ষণেক চিন্তা করিলেন)

না কবি, থাক্। তাতে আমার অনিষ্ট হবে ; এ কথা জানাজানি হলে বিভ্রাট ঘট্‌তে পারে বন্ধু।

(রঞ্জন আহত হইলেন)—কেতু আমাকে অবিশ্বাস!

রূপকেতু—(অপ্রতিভ ভাবে রঞ্জনের হাত দুখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন)

নাঃ—নাঃ—রাগ কোরো না রঞ্জন। কোথায় যাবো জানো? জেতবনের সঙ্ঘবিহারে।

রঞ্জন—(হাত ছাড়াইয়া চমকিত হইয়া দুই পা সরিয়া গেলেন।)

—অম্বরীষের পুত্র হয়ে জেতবনের বুদ্ধ বিহারে? এ তুমি কি বলছ কেতু ?

(রূপকেতু মৃদু হাস্য করিলেন)

ঠিকই বল্‌ছি ভাই? মহারাজ অম্বরীষ আমায় নির্ব্বাসিত করেছেন তাঁর রাজ্য হ'তে। তা কি ভুলে গেলে কবি?

রঞ্জন—কিন্তু কী আছে সেখানে যা তোমায় আকর্ষণ করছে, বলতে পারো আমায় ?

রূপকেতু—কী নেই কবি? প্রশান্ত আনন সদা হাস্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত সৌম্যমূর্ত্তি ভগবানই যে সেখানে বিরাজমান। অনির্ব্বচনীয় শান্তি, জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রীতি, স্নেহ—করুণা, ক্ষমা! কী নেই সেখানে বলতো ?

(আগাইয়া আসিলেন) কবি! শুনেছ কখনো? সে পবিত্র মহেন্দ্রক্ষণকে আপনার সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করবার সৌভাগ্য কী পেয়েছ কখনও? যে ক্ষণে—শত শত শ্রমণ, যতী ভিক্ষু, শত সহস্র আর্ত্ত অসহায়, দীনহীনের উদাত্ত স্বর, সেই অপূর্ব্ব দীক্ষামন্ত্রে আকাশ বাতাস মথিত করে ফেরে? আশ্চর্য্য দীক্ষামন্ত্র? শুনেছ কখনও কি তা?

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

ভগবানের মুখের স্বর্গীয় দিব্য ছটা দেখেছ কী কখনো কবি? দেখছ কি কখনো সেই মুখের শান্ত মধুর হাসি? তুমি পাগল হয়ে যেতে দেখলে। আর তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করতো না। মনে হোতো—কী হীন কুৎসিৎ জীবনে তুমি এতদিন বেঁচে আছো? কী জাগতিক মোহে অন্ধ হয়ে তোমার অমূল্য মানব জীবন এতদিন বৃথাই অতিবাহিত হয়ে গেছে ?

(অল্পক্ষণ থামিলেন)

তুমি তা দেখনি কবি! আমি দেখেছি। আমি দেখেছি,—স্নেহকরুণা, ক্ষমাশান্তিতে সে মুখে অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি। মুক্তি তপস্যা, অনন্ত মোক্ষ নির্ব্বাণে

সে চোখে অদ্ভুত বৈরাগ্য। আর তুমি ভাবতে পারো কবি? সে, রাজার কুমার ছিল? ভাবতে পারো তুমি? অসাধারণ রূপলাবণ্যশালিনী একটী নারী—দিনের পর দিন রাতের পর রাত, তাঁর চরণ সমীপে সৌন্দর্য্য-অর্ঘের আরতি সাজিয়ে বন্দনা করতো?

ভাব্‌তে পারো কবি? এক সোণার চাঁদ ছেলে, সারা স্বর্গের সুষমাটুকু নিয়েও তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না। কী তাঁকে ধরে রাখতে পারলো? রাজ্য নয়, নারী নয়, পুত্র নয়!! সে কী মানুষ? তুমিও কি তাকে ভণ্ড বলো রঞ্জন?

রঞ্জন—আমি বলি না কেতু! তোমার পিতা বলেন, বিধায়ক বলেন।

রূপকেতু—হ্যাঁ, আমার পিতা বলেন। ভুল বলেন তিনি রঞ্জন, আচার্য্য ও ভুল বলেন।

ভগবানকে তাঁরাও দেখেছেন কবি। কিন্তু সে নিজে-দের দৃষ্টি দিয়ে নয়।

আমার পিতার একান্ত সুহৃদ, অজাতশত্রুর হিংসা কুটীল দৃষ্টি দিয়ে। তাই তাঁরা এত ভুল বুঝেছেন।

কিন্তু এ ভুল একদিন ভাঙ্গবে কবি। মিথ্যা কি কখনও টেকে।

এ ভুল ধূলি ধূলি হয়ে ধরার ধূলায় মিলিয়ে যাবে বন্ধু। ভুলের সমাধি'পরে উঠবে চির সত্যের আকাশ চুম্বী বিজয় দুর্গ!

রঞ্জন, আমি সেখানেই যাব? হাতের কাছেও সব পেয়ে বিনা প্রতিবাদে ত্যাগ করা, এ পরম শিক্ষা আমি তাঁর জীবন থেকেই পেয়েছি কবি।

আমায় যেতেই হবে বন্ধু! যাবোও। কিন্তু যাবার আগে একটা অনুরোধ, আমার মনের মতন একটা গান শোনাবে?

রঞ্জন—গান? এমনি দুঃখ-সঙ্কট-ভরা মুহূর্ত্তে কী গান আসে কেতু?

রূপকেতু—সঙ্কট! বল আনন্দ মুহূর্ত্ত! বল চরম মুক্তি মুহূর্ত্ত। বিলম্ব কোরোনা রঞ্জন। পিতার আদেশ, আমায় যেতে হবে কবি!

রঞ্জন—তবে কী গাইতেই হবে? শোন তবে।

বিদায় বেলায় শুনিয়ে যেও
একটী শুধু গান,
সে নয় ব্যথা বিফলতা
নয় সে অভিমান—
সাঁজের আঁধার ঘনিয়ে আসে
একলা চলার পথের পাশে,
পিছন পানে ডাকে তোরে
কাহার সে আহ্বান?
একটী নামের জপমালা
তুলবে তোমার গলে,
শুধু দুটী চোখের প্রদীপ
জ্বলবে হিয়াতলে।
জাগবে তোমার স্বপন-নভে
একটী তারা সগৌরবে
তারি আলোয় দীপ্তি পাবে
তোমার অভিযান॥

(গান থামিল। রঞ্জন একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস রোধ করিলেন।)

রঞ্জন—জানোই তো কেতু, কবি মানুষ! জটিল কিছুর ভার সইতে পারিনে। তাই হাল্কাসুরে আলাপ করাই আমার অভ্যাস।

রূপকেতু—হ্যাঁ, একটা কথা কবি, জেতবনে আমার থাকার কথা। কাউকে বোলোনা যেন। পিতা হয়তো মনে আঘাত পাবেন।

রঞ্জন—চল ঐ পথ দিয়েই যাই, তাঁর দেখা মিললেও মিলতে পারে।

রূপকেতু—কিন্তু সাড়া দিওনা রঞ্জন! আমার উপস্থিতি যেন তিনি মোটে না টের পান। তিনি আমায় সংযত হতে অনুরোধ করেছেন, আড়াল থেকে তাই একটি মুহূর্ত্ত শুধু চেয়ে দেখবো, তার পর—তারপর, আমার এ অনুরাগের কথা চিরদিন মনের মাঝেই গুপ্ত থাকবে! হ্যাঁ চিরদিন, চিরকাল!!

(দুইজনে অন্যপথ ধরিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

(অন্ধকার আচ্ছন্ন মন্দির প্রাঙ্গন। দেবতার আরতিক্ষণ অনেকক্ষণ বহিয়া গিয়াছে। দূরে সোপানের পাদদেশে বনশ্রী একাকী বসিয়া গান গাহিতেছেন। কুমার ও রঞ্জন বৃক্ষের আড়ালে নিজেদের গোপন করিয়া রাখিলেন)

গান

আমারে শরণ দাও হে এবার তোমার চরণতলে
সকল জীবন হয়েছে বিফল বেদনা ও কোলাহলে।
মিথ্যার মরিচীকা অনুধাবনে
মৃগীসম ঘুরিয়াছি মায়াকাননে
দুরাশার দুঃসহ গভীর ব্যথায়
ভেসেছি নয়ন জলে।
কত আশানিরাশার দোদুল দোলায়
জীবনের দিনগুলি ঝরেছে ধূলায়;
রিক্ত এ জীবনের আর যত দিন
চরণ ধূলায় তব হয় যেনো লীন
সত্যের হে সারথি সকলি আমার
রাখিনু চরণতলে।

(গান শেষ হইলে আড়াল হইতে দুইটী ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেলো। একটী আশ্রয়হারা—আপনার নূতন নীড়টীর সন্ধানে। একটী ব্যথিত—আপনার চির পরিচয়ের আশ্রয় নীড়টীর অভিমুখে।)

(বনশ্রী কিছুক্ষণ স্বীয় করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন)।

(পরে বলিলেন—)

বনশ্রী—নাঃ, নাচে আর মন লাগে না। কি যেন আমার হয়েছে! শুধু মনে হয় কোথায় শান্তি, কোথায় বিশ্রাম! অচেতন এ মনোবৃত্তি নিয়ে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি শুধু দেবতাকে বঞ্চনা করছি। প্রতারণা! ছদ্মবেশে জীবনব্যাপী প্রতারণা করে চলেছি। সুকৃষ্ণা চলে গেছে, কিন্তু, আমিও তো যেতে পারি।

(হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন)

না—নাঃ পিতা ক্রুদ্ধ হবেন, দেবতার বুঝি অভিশপ্তা হবো আমি। সখী সুকৃষ্ণা নেই। কাজে মন লাগেনা; গান, গান, শুধু গানই আমার সাথী। শুধু গানেই আমার সান্ত্বনা! শুধু গানই গাইবো আমি, যতক্ষণ না ঘুম চোখ বুজে আসে, যতক্ষণ না তন্দ্রায় হারিয়ে যাই আমি।

(আবার গান ধরিলেন)

পথের পানে চেয়ে চেয়ে
দিনগুলি সব হোলো অবসান
মোর দেউলের দীপের আলো
হয়ে আসে ম্লান।
এবার সকল বাঁধন টুটে
বাহির পানে চলবো ছুটে
এ দুরাশায় জাগবো না আর
রাত্রি দিনমান।
কেমন করে করবো সুরু
করবো সমাপন
সেই ভাবনায় দুরুদুরু
কাঁপে তনুমন?
পিছন হোতে বাঁধন টানে
চলতে গেলে সমুখ পানে।
আকাশ হোতে কে যে আমায়
শোনায় আলোর গান॥

(আঁচলটী ভূমিতলে পাতিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইবার চেষ্টা করিলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

(সময় সন্ধ্যা, আরতিলগ্ন)

(আলোক উদ্ভাসিত মন্দির। বিধায়ক পূজায় বসিয়াছেন। পরিধানে রক্তাম্বর চেলী, উদার উন্নত লালাটে শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা।)

পূজা শেষ হইলে পর বহুক্ষণ প্রণামের ভঙ্গিতে নতজানু হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কী এক অজানা চিন্তায় তাঁহার সমস্ত সত্ত্বাটুকু যেন আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে এদিক ওদিক পায়চারী করিলেন। আবার দেবতার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন)

বিধায়ক—কই ? কোথায় হাসি ? কোথায় আনন্দ ? তোমার একমাত্র অপমানকারীকে চিরদিনের মত এ রাজ্য হতে বিতাড়িত, নির্ব্বাসিত করলেম, তবুও খুসী হলে না তুমি ? কি আর চাও তুমি, দেবতা ? আমার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ঐ পালিতা কন্যা, তাও তো তোমার চরণে চিরউৎসর্গ করে দিয়েছি।

আমার জীবন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব—সব বিনিঃশেষ করে তোমার পদপ্রান্তে সঁপে দিয়েছি।

তবু—তবুও কি তুমি সুখী হবে না ?

(পশ্চিমদিকে ধীরে ধীরে পার্থ প্রবেশ করিলেন)

পার্থ—আর্য্য !

(বিধায়ক চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন)

বিধায়ক—পার্থ দেখেছ কি তুমি ? দেবতার সদা প্রসন্ন বরাননখানি কী যেন এক অজ্ঞাত বেদনায় মলিন হয়ে গেছে। এ ক্রোধ কিসের ? বলতে পারো পার্থ ?

(ক্ষণেক থামিলেন)

বুঝেছি, বুঝেছি ! এর একমাত্র কারণ বনশ্রী !

(মাথা নাড়িলেন) হ্যাঁ ! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই !

হুঃ।

(আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন)

এদিকে আমার লক্ষ্যই পড়েনি। আমার দেবতা অবহেলিত অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

হুঃ। কি বলছিলে তুমি ?

পার্থ—বনশ্রী বলছিলেন, আজ আর নৃত্যারতি হয়ে উঠ্‌বে না, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

বিধায়ক—(আশ্চর্য্য হইলেন) অসুস্থ ? কে বললে ? আমি এইমাত্র দেখে এলেম, সে উদ্যানে একাকী বসে গান গাইছে ?

পার্থ—তিনিই আপনাকে এ কথা জানাতে বললেন। আজ আর নৃত্যারতিতে তাঁর মন লাগছে না।

বিধায়ক—মন লাগছে না ? এ কীছেলেখেলা ?

(কঠোর স্বরে ডাকিলেন)

বনশ্রী ! বনশ্রী !

(অন্তরাল হইতে)

বনশ্রী—যাই পিতা !

(আলুলায়িত কুন্তলা, পারিপাট্যবিহীন সাজে বনশ্রী আসিলেন। দেবতার আরতি নৃত্যের জন্য তিনি প্রস্তুত হন নাই। সারা মুখে উদ্বেগ, বেদনা ও চিন্তার গ্লানিমা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে)

বিধায়ক—(কঠোর স্বরে) দেখছি নৃত্য-আরতির জন্য প্রস্তুত হও নাই। বেশ ! তবে আজ ঐ বেশেই নৃত্যারতি হোক্।

(পার্থকে) পার্থ বীণা আনো।

(পার্থ চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে বীণাখানি আনিয়া প্রাঙ্গণ দ্বারে বসিলেন। মুহূর্ত্ত পরে মধুর স্বরে বীণা ঝঙ্কারিয়া উঠিল)

(বনশ্রী নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে চাহিলেও বিধায়কের ভয়ে নীরব রহিলেন)

(পার্থ গান ধরিলেন)

নৃত্যরসের নিত্য লীলায় গাহ বন্দনা গান
দেবতার পায়ে অর্পণ করি তনু-মন-লাজ-মান।
আরতির সুরে বাজাও কাঁকণ
বাজাও নূপুর মালা
লীলা ভঙ্গিতে আপন অঙ্গে
সাজাও বরণডালা।
সুরে সঙ্গীতে ছন্দ গন্ধে সকল চিত্ত ভরি
দেবতার পায়ে লভো চির অবসান ॥

একবার গাওয়া হইলে যন্ত্রচালিতের মত বনশ্রী নাচ সুরু করিলেন। পার্থ আবার গাহিলেন। কিন্তু গানের সুরের সঙ্গে বনশ্রীর নাচের ছন্দের সঙ্গতি মিলিল না।

বারে বারে ছন্দ পতন হয়, বারে বারে বনশ্রী ব্যর্থ চেষ্টায় ফিরিয়া নাচেন তবু হয় না। আশ্চর্য্য ! বনশ্রী যেন নাচিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।)

চির উদাসীন পার্থও বিস্মিত হইলেন, বিধায়কের মুখে ভ্রূকুটীকুটীল বিরক্তিচিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল)।

বিধায়ক—হুঃ! দেবতার আরাধনায় ত্রুটী! জীবন মরণের একমাত্র যে উপাস্য তোর, তার পূজায় আর মন বসে না, না? এ অনাচার, এ ব্যাভিচার।

পার্থ—গান না হয় নাই গাইলাম। আমি বাজাই; তুমি নাচো!

(সমস্ত শরীরে প্রাণপণ প্রয়াসে ছন্দ জাগাইয়া বনশ্রী আবার নাচিতে সুরু করিলেন। এবার যে নাচ নাচিলেন তাহা যেন মরণ নৃত্য! নাচিতে নাচিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে মাটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।)

বনশ্রী—যান্ যান্ যান্ আপনারা। মিনতি করি আমায় একটুখানি একা থাকতে দিন্। অশেষ দুঃখ কলঙ্কের ভারে এ ভারবহ জীবনের জন্য একটু সান্ত্বনা, একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে নিই তাঁর কাছে—যিনি আজ—

(বিধায়ক অত্যন্ত খুশী হইয়া বাধা দিয়া উঠিলেন)।

বিধায়ক—ঠিক্! ঠিক! এই তো তোর উপযুক্ত কথা মা। দেবতা মানুষ নন্ তো! কোনো অবহেলা, তুচ্ছ মনোবিকার, কোনো ক্ষুদ্রতম ত্রুটি পর্য্যন্ত তিনি সইবেন না জেনো। একনিষ্ঠ ব্যগ্রতায় শুভ্র নিষ্কলঙ্ক প্রেমে তাঁর জন্যে সাধনা করতে হবে মা। তোমার সব—সব যে তাঁকে দিতে হবে।

(বনশ্রীর মাথায় স্নেহস্পর্শ রাখিলেন)

ক্ষমা চাও মা তাঁর কাছে। চোখের জলে তোমার আজন্মের দেবতার দুখানি চরণ ধুইয়ে দাও মা। বল—মনের যত আবিলতা গ্লানি সব দিয়ে, সব দিয়ে তোমার ঐ নীলোৎপলসদৃশ পা দুখানি ভরিয়ে দিলেম দেবতা!

তোমার চরণস্পর্শের পুণ্যে মনের যত কালো, সব আলো হয়ে ফুটে উঠুক। যত ভুল সব ফুলে ফুলে ঐ চরণতল ছেয়ে দিক আজ!

(পার্থকে)

পার্থ! পার্থ, দেখ তো, প্রাঙ্গনের সব দুয়ারগুলি বন্ধ আছে কিনা।

(পার্থ চলিয়া গেলেন)

(বনশ্রীকে) সাংসারিক যত কোলাহল ভুলে যাও মা। তুমি দেবদাসী, নির্জ্জন অবকাশে শুধু তাঁকেই ধ্যান কর। অনুতাপ কর বনশ্রী; অশেষ পাপ তোমার ঐ অন্তরের নিভৃতে সংগোপন আছে। মুছে ফেল মা! দূর করে ফেলো সব। আমি যাই! দুয়ারটা বন্ধ ক'রে দিও বনশ্রী॥

(বিধায়ক চলিয়া গেলেন)

(বনশ্রী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন)

কেন ছন্দ জাগে না জীবনে, তুমি কি তা জানো দেবতা? কার সে ত্যাগের মহিমা প্রশান্ত সহাস মুখশ্রী, বারে বারে আমার এই মানসধ্যানের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

ওগো পাষাণ দেবতা সে তো তুমি নও। আমার রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা অবিরাম যাকে ঘিরে বন্দনাগান রচনা করে ফিরতো, সেই পার্থসারথি, সেও নয়। তার চেয়েও বৃহত্তর সুখের সন্ধান বনশ্রী পেয়েছে। কে তবে তিনি? দূর থেকে একদিন সে মহিমাময়কে দেখেছিলেম। মুগ্ধ হয়েছিলাম সে মহিমাময়ের স্বয়ম্প্রভ দিব্য আননের উদ্ভাসিত রূপ দেখে। সে কী রূপ? আগুনের মত উজ্জ্বল নিষ্পাপ তাঁর তনু। ত্যাগ আর করুণার মূর্ত্তিমান নিদর্শন। কী সে শান্তি! সে দুটী চোখের স্নিগ্ধ আলোয় যেন জীবন আমার জুড়িয়ে গেলো। মাথার উপরে হাত রেখে তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলেন! সেই দিব্য-দর্শন ভিক্ষু! যাঁকে সকলে বলে ভগবান তথাগত। একটী মুহূর্ত্তের স্নেহস্পর্শ!!

জীবন আমার বদলে গেলো যেন। তাঁর সেই এক পলকের চোখের চাওয়ায়, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলী পর্য্যন্ত কী এক অপূর্ব্ব পুলক-বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেলো।

সেদিন সুকৃষ্ণা ঠিকই বলেছিল, অদ্ভুত শক্তি তাঁর, তাঁর এক নিমিষের স্পর্শ আমায় এক নূতন জীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। নাচ গান! কী হবে নাচ গান দিয়ে? দেবতাকে তুষ্ট করবো? হাঁ তুষ্ট করবো আমার জীবন দেবতাকে, কিন্তু নাচ গান দিয়ে নয়। পরহিতব্রতে আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেবো। ঐ মুণ্ডিতমস্তক

ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মত আর্ত্ত অসহায়ের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াবো।

(ক্ষণেক থামিলেন)

কিন্তু! কিন্তু আমি যে উৎসর্গীকৃতা! সে পাপ কী আমার পিতাকে আঘাত করবে? না না, আমি জানি, আমি জেনেছি আমার জীবন দেবতা কী চান্! অনেক ভুল করেছি জীবনে—আর নয়!

(দুই পা অগ্রসর হইলেন)

এই-ই প্রশস্ত সময়। অন্ধকার আচ্ছন্ন বনপথ, পিতা হয় তো নিদ্রিত, পার্থও হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন! যাই! কিন্তু যাবার আগে—

(দেবতার সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিলেন)

—অজানা জীবনের সন্ধানে, নূতনতর মুক্তিসন্ধানী আমি! এ অপরাধ নয়, পাপও নয়, তবু যদি অপরাধ হয়, ক্ষমা কোরো দেবতা আমায়॥

(প্রস্থান)

স্বর্গত ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

শ্রীপ্রতিভা দেবী এম্-এ

ইংরেজী ২০শে নবেম্বর, বাঙ্গলা ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার নবমী তিথি, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের সময় পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় ৺দীনেশ চন্দ্র সেন সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ঘড়িতে কয়টা বাজে।" মৃত্যুর দু এক মিনিট পূর্ব্বে তিনি বলিয়া উঠিলেন—দরজা খুলে দাও, সব দরজা খুলে দাও। এই তাঁর শেষ কথা।

সেদিন বেলা দেড়টার সময় তিনি তৃতীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন 'দেখ সুবাস, ফুল আমার ভাল লাগে।' জীবনে তিনি ভক্ত কবি ছিলেন—তাঁহার গদ্য রচনার সুর কাব্যের সুরভি মাখা। মৃত্যুতেও তিনি কবির মতনই মারিয়াছেন। মুক্ত নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে যখন তাঁহাকে পুষ্পশয্যায় শায়িত করা হইল, তখন গরদের শুভ্র জোড় পরিহিত পুষ্পচন্দন বিভূষিত সেই প্রশান্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল 'মৃত্যু কি সুন্দর' তাঁহার হস্তাঙ্গুলী তখনও জপনিরত।

দীনেশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি দান করিয়া গিয়াছেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য নামক লুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে আমি আলোচনা করিব না। যোগ্য ব্যক্তিগণ সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমরা যে পরম স্নেহশীল পিতৃতুল্য শ্বশুরকে হারাইলাম সে দুঃখ কেমন করিয়া ভুলিব। সেই বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পদ্মপলাশ চক্ষের স্নেহভরা হাস্যময় দৃষ্টি যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। বিরাট বনস্পতির ন্যায় তিনি আমাদের সকলকে সংসারের সকল দুঃখ দৈন্য, রোগ প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া আপনার সুশীতল আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অভাবে বেদনা আমাদের আরও মর্ম্মান্তিক হইয়াছে।

এবার পূজার ছুটীতে আমি ভারতীয় কলাতীর্থ অজন্তা ও ইলোরা দেখিতে যাই। শ্বশুর মহাশয় পুত্রবধূদের দূরে রাখিতে ভালবাসিতেন না; কিন্তু আমার উৎসাহ দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন—চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"এই সকল স্থান দেখিতে সমস্ত ভারতবাসীরই আগ্রহ স্বাভাবিক। আমার শক্তি থাকিলে পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। যদি পার কতকগুলি ফটোগ্রাফ কিনিয়া আনিও। এ ব্যয় আমি বহন করিব।" এই চিঠিই তাঁহার শেষ চিঠি। চিঠিখানি আমি আমরণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সমাদরে রক্ষা করিব।

আমি ফিরিয়া আসিয়া আর সে ছবি দেখানর সুযোগ পাইলাম না। তিনি তখন মৃত্যু শয্যাগত। সর্ব্বদা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিতেন। কথা বলিবার বিশেষ সামর্থ্য ছিল না। আমার মনে সে দুঃখ চিরকাল থাকিবে।

তিনি আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। সরল সাদাসিধা জীবন যাত্রা ভালবাসিতেন। অথচ তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ প্রবল ছিল।

তিনি পূজার সময় নিজে পছন্দ করিয়া পুত্রবধূ, নাতি নাতিনী ভৃত্য দাসী প্রভৃতি সকলের জন্য কাপড় কিনিয়া আনিতেন। অষ্টমী পূজার দিন সে বস্ত্র বিভাগ হইত। তিনি নিজ হস্তে বণ্টন করিতেন। এ বৎসরও হাওড়া হাট হইতে নিজে গিয়া বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। নাতি নাতিনীদের এবং আমাদের বাগবাজারের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখাইতে নিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বভাবে একটা শিশুর মত সরলতা ও সরসতা ছিল। প্রত্যেক নাতি নাতিনীদের তিনি নিজে একটী করিয়া নামকরণ করিয়া লইয়া ডাকিতেন। তাহাদের নালিশ, অভাব অভিযোগ জানিতেন। তাহাদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, তাহাদের সঙ্গে শিশুর মত মিশিতেন।

তিনি বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালীকে যে কত ভালবাসিতেন সে তীব্র অনুরাগের কথা বলিয়া বোঝান যায় না। তিনি বারবার বলিতেন, আমি আবার এই বাঙ্গালা দেশেই জন্মগ্রহণ করিব, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কাজ সম্পূর্ণ না হইবে। ইহাই তাঁহার মনের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল।

তিনি বিলাতি, জাপানী খেলনার পক্ষপাতী ছিলেন না। রথ শিবরাত্রি ইত্যাদি পর্ব্ব উপলক্ষে মেলা বসিলে সেই মেলা হইতে বাঙ্গালী কুমোরদের গড়া মাটীর পুতুল অথবা কাঠের খেলনা বাড়ীর শিশুদের জন্য ঝুড়ি ভরিয়া কিনিয়া আনিতেন। মুড়িমুড়কী, বিন্নি ধানের খই, পাটালী গুড় আমসত্ব নারিকেলের চন্দ্রপুলী প্রভৃতি দেশী খাদ্য তাঁহার নিজের প্রিয় ছিল। তিনি মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। দেশী আহার্য্য দেশী বস্ত্র, কালিঘাটের পটুয়াদের আঁকা ছবি বাঙ্গলার নিজস্ব কীর্ত্তন গান প্রভৃতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। কত দিন আমি তাঁহার সঙ্গে কালিঘাট গিয়া এরূপ ঝুড়ি বোঝাই খেলনা পাথরের জিনিষ প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছি।

তিনি অল্প জিনিষ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার কথা বার্ত্তায় ভালবাসায় দানে সর্ব্ব ব্যাপারেই একটা অজস্রতা ছিল। তিনি লোকজনকে খাওয়াইতে বিশেষ ভালবাসিতেন। কোন উৎসব করিতে চাহিলে তিনি সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন "বাহুল্যের আনন্দ মানুষের মন সরস করিয়া রাখে। প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্রের শস্য দিয়া পালন করেন না, তিনি চক্ষুর আনন্দের জন্য শত শত ফুল ও তৃণ পল্লব সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

তিনি স্পষ্টবাদী নির্ভীক ও সত্যবাক্ ছিলেন। তিনি কৃতজ্ঞ স্বভাব ছিলেন। যাঁহার নিকট হইতে তিনি জীবনে যেটুকু সাহায্য পাইয়াছেন তাহা সর্ব্বদা স্বীকার করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বভাবে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ও তেজ ছিল যে কেহ অন্যায় করিলে তাঁহার নিকট ভীত না হইয়া পারিত না। বৃহৎ যৌথ পরিবারের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদিকে সমভাবে থাকিত। কে কি খাইতে ভালবাসে, কে কোন জিনিষ পাইল বা পাইল না সমস্ত তিনি নজর করিয়া খাবার, ফল, মাছ ইত্যাদি বহন করিয়া আনিতেন। বাড়ীর কাহারও অসুখ হইলে তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি থাকিত না। শিশুদের রোগ হইলে তিনি প্রতিদিন তাহাদের জন্য খেলনা কিনিয়া আনিতেন। বাটির পুরাতন দাসী ভৃত্য প্রভৃতির রোগে তিনি নিজে খোঁজ লইতেন। বাটীর পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন সকলের দিকে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি নিয়ত জাগ্রত থাকিত। তিনি আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহিতে প্রস্তুত ছিলেন। একদিন আমরা কয়েকজন নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে কোথাও যাইতেছিলাম। পথে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি দেখিয়া বাড়ী হইতে আমাদের ফিরাইয়া নিতে ট্যাক্সী লইয়া আসিলে তিনি নিজের আশ্রিত কোচোয়ান ও ঘোড়াকে বিপদে ফেলিয়া স্বয়ং মোটরে আসিতে কোন মতেই সম্মত হন নাই।

তাঁহার স্বভাবে দুইটী বিপরীত ভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ ছিল। তিনি একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমনি কোমল ছিলেন। কোন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলে কেহ

তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। অথচ স্নেহের ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য্য কোমল ছিলেন। ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে না হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, সামান্য ক্রটীও সহ্য করিতে পারিতেন না। বালকের ন্যায় পরম আত্মীয়দের উপর রাগিলেও তাহার কিছুক্ষণের জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না। কিন্তু তাহা একান্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল। মহতের রাগ সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়া থাকে যে তাহা খড়ের আগুনের ন্যায় দপ করিয়া জলিয়া উঠিয়া তখনই নিবিয়া যায়, তাঁহার ক্রোধও সেরূপ ছিল। এইজন্য তাঁহার আত্মীয় গণ তাঁহার এই সাময়িক ক্রোধের জন্য কখনও ক্ষুব্ধ হন নাই।

তিনি সর্ব্বসাধারণ হইতে একান্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মুখভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত। সেই কৌতুকফুল্ল স্নেহহাস্যে উজ্জল, আনন্দে উদ্ভাসিত সৌম্য দর্শন মুর্ত্তিখানি আমাদের মনে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

পুত্রবধূদের তিনি ঠিক কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে যে কত স্নেহ লাভ করিয়াছি তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

বাংলাদেশের মেয়েদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার শেষ বই এর নাম 'বাংলার পুরনারী।' ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী লইয়া এই বইখানি রচিত। তাঁহার চরিত্রে হৃদয়াবেগ প্রবল ছিল। প্রেমকে তিনি জীবনের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা গুলির নারীচরিত্র তাঁহাদের প্রেমের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। এই অমুল্য গীতিকাগুলির রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচারের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবিদের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। কীর্ত্তন শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত। বৈষ্ণব পদাবলী তিনি অজস্র মুখস্থ বলিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুত্রবধূ হইলেও আমি তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বাংলা এম, এ, পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াতে তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, ময়মনসিংহগীতিকা অথবা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন তখন তাঁহার মুখ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত; তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়া যাইতেন।

তিনি একান্ত নিরলস ছিলেন। শেষ রোগে পড়িবার দিন পর্য্যন্ত তিনি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তিনি একান্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বেশভূষায়, আলাপে, আচরণে খামখেয়ালী স্বভাবে, মুখশ্রীতে তিনি যে প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িত। নিজ জীবনে বহু সংগ্রাম করিয়া বড় হইয়া ছিলেন সেজন্য দরিদ্রের দুঃখ তিনি অন্তরে অনুভব করিতেন। চাষাভূষাদের সহিত তিনি অন্তরঙ্গের মতন মিশিতেন।

কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী মাহিগঞ্জের বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি হইয়া তিনি সে গ্রামে গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দরিদ্রের সঙ্গে মিশিয়া মুড়ি ও ডাব আনন্দ করিয়া খাইয়াছিলেন।

তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুভয়কে তিনি সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়বৎসর তিনি নিজের কর্ত্তব্য যথাসাধ্য করিয়া যাইতেন। যদিও বর্ত্তমান জগতের আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল কিন্তু বর্ত্তমানের ঘটনার সহিত তাঁহার আর অন্তরের কোন যোগ ছিল না। অতীত চিন্তা ও বাল্যস্মৃতি মনে মনে আলোচনা করিতেই তাঁহার বেশী ভাল লাগিত।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ গান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। দ্বিপ্রহরে কতদিন রামায়ণখানি পড়িতে পড়িতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

তিনি পল্লীমায়ের সন্তান। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যদিও সহরেই কাটিয়াছে কিন্তু সহরের প্রখর পাশ্চাত্য উপকরণবহুল সভ্যতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি সহরের সজীবতা পছন্দ করিতেন কিন্তু পল্লীর নিস্তব্ধ মাধুর্য্য তাঁহার মনকে বিশেষ আকর্ষণ করিত। কল্পনায় তিনি কেবলই জন্মভূমি সুয়াপুর ও মাতলালয় বগজুড়ী গ্রামের দীঘির ঘাটে ও ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম পথে বিচরণ করিতেন। বেহালার নিকটবর্ত্তী ঠাকুর পুকুর নামক স্থানে বেড়াইতে বিশেষ ভালবাসিতেন। দুপাশের উন্মুক্ত

প্রান্তরের সহিত যেখানে অসীম নীলাকাশ মিশিয়া দিগ্বলয়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তিনি ভাববিভোর দৃষ্টিতে দেখিতেন। বালীগঞ্জের লেক এবং নির্জ্জন তরুচ্ছায়া ঘেরা দীর্ঘপথগুলিও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

তিনি সংসারে থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তাঁহার উদ্দীষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে মানুষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ গরীয়ান্ করিয়া উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন আমাদের শ্বশুর মহাশয় তাহা কায়মনে বিশ্বাস করিতেন। 'সংসার মিথ্যা নহে, ইহাদের পশ্চাতে সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন।'

আজীবন তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন। শয্যার চারিপাশে পুস্তক সাজাইয়া তিনি যখন সমাহিতচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রচনা করিয়া যাইতেন, সেই ছাপটি আজ কেবল চোখে ভাসিতেছে।

দীর্ঘজীবনে তিনি দারিদ্র্য, রোগ, শোক, মিথ্যা অপবাদ, লাঞ্ছনা, বিদ্রূপ সমস্তই সহ্য করিয়াছেন কিন্তু এসব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি জানিতেন বেশীর ভাগ লোকই বাহিরের খোলসটাই দেখে, ভিতরের মানুষটীকে দেখিবার মত অন্তর্দৃষ্টি কয়জনের আছে। এজন্য বহুক্ষেত্রে অবিচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। তিনি কোন প্রকার ক্ষতিতেই বিচলিত হইতেন না কারণ তিনি সাধারণভাবে ক্ষতিকে দেখিতেন না; তিনি মনে করিতেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবনে ক্ষতিরও প্রয়োজন আছে। অর্থ তিনি বহুবার হারাইয়াছেন কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। মৃত্যুর মাত্র তিন চারি মাস পূর্ব্বে তাঁহার শেষ রচনার পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়। তিনি পরদিন হইতে আবার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সেই লেখা সমাপ্ত করেন।

তিনি অসময়ে যান নাই। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতি, নাতিনী, নাতজামাই প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়াছি।

আমাদের পরিবারের জীবন যাত্রার সমারোহ তাঁহাকে ঘিরিয়াই প্রবাহিত হইতেছিল। আজ তিনি নাই। চারিদিক শূন্য মনে হইতেছে। তাঁহার বৃহৎ পালঙ্ক আজ শূন্য, গৃহ আজ অন্ধকার।

তিনি আজ কোন আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেছেন জানিনা; আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার চরণে পৌঁছিতেছে কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

জীবনে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি যেমন আমাদের উপর নিয়ত বর্ষিত হইত, আজও তেমনি তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

চোর

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

"ছুঁয়েছি, ছুঁয়েছি…… ……তুমি চোর……পানুদা!"

একটি কিশোরী পিছন্ হইতে দুহাতে মনীশের কটি বেষ্টন করিয়া এই কথা বলিল।

কৌতুহলী হইয়া মনীশ তার দিকে চাহিল।

খোল আমার চোখ, তা না হলে আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না—

মনীশ রেখার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিতে, খুশীভরা গলায় রেখা কি বলিতে গিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল মনীশের দিকে…।

মনীশ কৌতুকভরা চোখে রেখার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে লজ্জারক্ত মুখে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

মনীশ তার ভগিনীপতির ভাইয়ের বিবাহে বরযাত্রি আসিয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে সে কখনও যায় নাই। এতদিন শুধু গল্প কবিতায় পল্লীর বর্ণনা শুনিয়া আসিতেছিল। গ্রাম দেখিবার তার সাধ ছিল। পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় নটার পর তাহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রাত্রে গাছে গাছে জোনাকীর শোভা আর ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া প্রহরে প্রহরে শৃগালের

চিৎকার ও শুনিয়াছে, কিন্তু গ্রামের কিছুই দেখিতে পায় নাই, তাই সকাল হইতেই সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বাগানের নিকটেই বরযাত্রীদের থাকিবার স্থান। বাগানের মধ্য দিয়া মনীশ বাসায় ফিরিতেছিল। এই সময় রেখা পিছন হইতে তার কোমর জড়াইয়া ধরে।

রেখার গমন-পথের দিকে চাহিয়া মনীশ দাঁড়াইয়া ছিল।

মনীন্দ্র আসিয়া বলিল—প্রকৃতির শোভায় মনের খোরাক মিললেও উদর জ্বালা মিটবে না!

মনীশ ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

—বেশ লোক! সেই কখন থেকে, আমি তোমাকে সারা গাঁ খানি খুজে বেড়াচ্ছি ··আর তুমি এই বাগানের মধ্যে দিব্যি হাওয়া খেয়ে পেট ভরাচ্ছ! না। গিয়েই তোমার বোনকে বল্‌তে হচ্চে, যে তোমার দাদাকে বিলেত না পাঠিয়ে, বাবাকে বল তার একটি বিয়ে দিতে·····তাতে যদি এ কবিত্ব রোগটা কিছু কমে।

হাসিয়া মনীশ বলিল—কবিত্ব বুঝি একটা রোগ?

—রোগ নিশ্চয়ই। তা না হলে কি ক্ষিধে পায় না। বাবা! আমার ত পেটের মধ্যে যেন লঙ্কা-কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। চলো আর দেরী করোনা।

—তুমি এতক্ষণ খেয়ে নাওনি কেন?

চোখ ছুটি বড় বড় করিয়া মণীন্দ্র বলিল—বল কী। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর দাদামণি। তোমাকে ফেলে, আমি আগে খাব। এ কথা শুনলে দীপা কি কখন আমার মুখ দর্শন করবে।

—আঃ—তুমি বড় অসভ্য।

হাসিয়া মণীন্দ্র বলিল—আরে ভাই। একটি বৌদি আসুক্ ত আগে···তখন আমার কথা আর খারাপ লাগবে না।

—যাও! আর ফাজলামী করতে হবে না। চলো বাসায় যাওয়া যাক্।

রেখা ছুটিয়া আসিতেই দরজার কাছে পানুর সঙ্গে তার মাথায় ধাক্কা লাগিল।

রাগিয়া পানু বলিল—বাব্বা মেয়ে! এমন দৌড়াচ্চে যেন কেউ ওকে ধরবে!

রেখা ছুটিয়া আসায় হাঁফাইতে ছিল। তার পানুর উপর রাগ হইল। ইহার জন্যই ত সে অপরিচিত একটি যুবকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেও ঝাঁঝের সহিত বলিল—বেশ করেছি ছুটে এসেছি, আমাকে চোর করে বাগানে একা ফেলে ক্যাই পালিয়ে এসেছেন···আমি মাসিমাকে বলে দেব।

—বলে দিলি তো বড় বয়েই গেল! আমি ও মাকে দেখাব যে তুই আমার মাথায় লাগিয়ে দিয়েছিস্! দেখ দিকি, কতখানি ফুলে উঠেছে!

পানুর মাথার দিকে চাহিয়া মমতাভরা গলায় রেখা বলিল —আ—হা···।

মুখ ভ্যাংচাইয়া পানু বলিল—আ-হা! আমার ব্যাথা যেন ওতেই সেরে গেল!

তোমার একারই লেগেছে নাকি! আমার বুঝি কিছুই হয়-নি! কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রেখার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

রেখাকে কাঁদিতে দেখিয়া পানুর মন নরম হইল। মিষ্ট-কণ্ঠে সে বলিল······কাঁদিস্‌নে, আয় ভাই, কোথায় লেগেছে দেখি।

অভিমানভরা গলায় রেখা বলিল—থাক্! আর তোমার দেখতে হবে না!

পানুর মা আসিয়া বলিলেন—তোরা এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

পানু বলিল—বাগানে খেলছিলুম।

—যা খেয়ে নিগে সব······

পাঁচ বছর পরের কথা······।

রেখার পিতা কন্যার বিবাহের জন্য ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। সেদিন রেখার মাসীমার বাড়ী কি একটা উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মমতার শ্বশুরবাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল দীপা।

দীপা মমতাকে বলিল—এই বুঝি তোমার মাস্‌তুতো বোন?

—হ্যাঁ, দিদি! এর কথাই আপনাকে বলছিলুম।

—ভারী-সুন্দরী-ত!

—সুধু দেখতেই যে ভাল তা নয় দিদি, ওর পেটে অনেক বিদ্যে ও আছে।

—তাই বুঝি।

—হ্যাঁ,—আপনাকে বলিনি, ও-যে এবার বি, এ পাশ কর'ল।

—বাঃ…বেশ! তোমার মাসিমা কোথায় থাকেন?

—পশ্চিমে।

—কলকাতায় কতদিন পরে এলেন?

—তা অনেক দিন। বোধ হয় বছর আষ্টেক হবে; নয় রে রেখা? বলিয়া মমতা রেখার দিকে চাহিল।

মৃদুকণ্ঠে রেখা বলিল—তোমার বিয়ের সময় এসেছিলাম আমরা।

—সে ত আর কলকাতায় নয়—আমাদের দেশের বাড়ীতে।

হাসিয়া রেখা বলিল—বাংলা দেশতো বটে।

দীপা মমতাকে বলিল—তোমার বিয়ের সময় এসেছিল বুঝি এরা?

—হ্যাঁ।

রেখা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মমতা বলিল—উঠলি যে?

—নীচে যাচ্চি মায়ের কাছে।

দীপা বলিল—কেন, এখানে ভাল লাগছেনা বুঝি?

—তা কেন…আপনারা গল্প করুন না।

—সে ত করছিই আমরা, তুমিই বা বাদ যাও কেন, ব'স না।

—মমতার কাছে শুনেছি তুমি খুব সুন্দর গান কর।

—মমতাদি আপনাকে বাড়িয়ে বলেছেন।

মমতা বলিল—মিথ্যে কথা বলিস্‌নি রেখা! তুই যে ভাল গান করিস্‌ তা সবাই জানে।

দীপা বলিল—যেমন জানো তেমনি গাওনা ভাই, আমি গান শুনতে বড় ভালবাসি।

—সত্যি বলছি আপনাকে, আমি ভাল গাইতে জানিনে।

মমতা বলিল—নে আর গুমোর বাড়াস্‌নে।

—গুমোর আবার কোথায় দেখ্‌লে?

—নে ঢের হয়েছে…আয়; আর খোসামদ করতে পাচ্চিনে বলিয়া মমতা রেখার হাত ধরিয়া অর্গানের পার্শ্বে বসাইয়া দিল।

দীপার দিকে চাহিয়া রেখা বলিল—কি গাইব বলুন?

—যা তোমার ইচ্ছে!

মমতা বলিল—কিন্তু ভাই, যেন কালোয়াতি, মালোয়াতী, গাস্‌নে!

দীপা বলিল—সত্যি। ও সব আমরা বুঝব না।

একটু হাসিয়া রেখা গান ধরিল।

"আজি সবার রঙে রং মিশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়"

গান শেষ হইলে হাসিয়া মমতা বলিল—তোর প্রিয় যে কোথায় রঙ্গিণ উত্তরীয় নিয়ে বসে আছে তার ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

দীপা বলিল—বসে কেন থাক্‌বে, এমন রত্নের জন্যে তপস্যা করছে বলো।

লজ্জারাঙ্গা মুখে রেখা বলিল—যান্‌ আপনারা ভারী ই'য়ে।

—কি এ রে? বলিয়া মমতা হাসিতে লাগিল।

—জানিনে যাও…বলিয়া রেখা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মমতা আর দীপা হাসিয়া উঠিল।

—মা তোমার ছেলের জন্যে ভারী সুন্দর একটি মেয়ে দেখে এসেছি।

কন্যার দিকে ফিরিয়া জননী বলিলেন—তাই নাকি! কোথায় দেখলি?

—আমার ছোটজার বাপের বাড়ী নেমন্তন্নে গিয়ে।

—কার মেয়ে?

—মমতার মাসীমার।

—মেয়েটি দেখ্‌তে কি খুব ভাল?

—হ্যাঁ মা, ভারী চমৎকার!

দীপার পিতা আসিয়া বলিলেন—কার কথা বলছ?

দীপার মা বলিল—দীপুর জায়ের মাস্‌তুতো বোনকে দেখে, ওর ভারী পছন্দ হয়েছে!

—তাই বুঝি!

দীপা বলিল—হ্যাঁ বাবা, ভারী সুন্দর মেয়েটি। আপনি যদি একবার দেখেন, তা'হলে বলবেন, এর আগে এমন দেখেন নি।

—আমার দীপামাকে দেখার পর ?

—হ্যাঁ বাবা। রেখাকে দেখ্‌লে বুঝবেন যে আপনার এ কথা কতখানি ভুল।

দীপার মা হাসিয়া বলিলেন—দীপা দেখছি তাকে দেখে মোহিত হয়ে গেছে···নিশ্চয়ই মেয়েটি যাদু জানে।

—বোধ হয় তাই, সেই জন্যেই আজ তোমাদের কাছে এলুম। তোমাদেরও তাকে দেখাতে চাই।

দীপার পিতা বলিলেন—আমাদের কি করে দেখাবি রে ?

—কেন—নেমতন্ন করে আনবো এখানে।

দীপার পিতা বল্‌লেন—থাম পাগলী। মেয়ে শুধু সুন্দর হলেই ত হবে না। তোর দাদা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, তার উপযুক্ত শিক্ষাও ত থাকা চাই !

তা না থাকলেই কি আমি দাদামণির বৌ করতে চেয়েছি ?

—কতদূর পড়েছে।

—বি-এ পাস। আর রেখা এমন চমৎকার গান করে বাবা, যে শুনলে সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না।

দীপার মা বলিলেন···তা হ'লে তুই আজ এখানে থাক··· কাল তাদের নিমন্ত্রণ করে আসিস্।

—আচ্ছা।

হাসিয়া মহেশবাবু বলিলেন—কিন্তু আগে থেকে যেন ওখেনে বিয়ের কথাটা বলিস্‌নে।

—আমি এমনি ছেলেমানুষ নাকি !

স্নেহ ভরে কন্যার মাথাটি নাড়িয়া দিয়া মহেশবাবু বলিলেন - তবে কি তুই বুড়ী !

দীপার নিমন্ত্রণে রেখা আর মমতা আসিয়াছিল। পিতাকে ডাকিয়া দীপা বলিল—বাবা, মমতার বোন রেখা এসেছে, দেখবে এস।

রেখা মহেশবাবুকে প্রণাম করিল।

তার মাথায় হাত দিয়া তিনি বলিলেন—থাক্ মা।

আহারাদির পর দীপার অনুরোধে রেখাকে গান গাহিতে হইল। তার মিষ্ট-কণ্ঠে সংগীতপ্রিয় মহেশবাবু মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

দীপার মাকে মমতা বলিল—রেখাকে দিদির খুব ভাল লেগেছে।

তোমার বোনটি ভাল লাগবার মতই মা। তোমার মাসীমা থাকেন কোথায় ?

—এলাহাবাদে।

মহেশবাবু বলিলেন—তিনি ডাক্তার না ?

—হ্যাঁ।

—বরাবর ওখানেই আছেন ?

—না, উনি সিভিল সার্জ্জন, বদলি হয়ে এসেছেন।

রেখা মৃদু গলায় বলিল—মা বলেছেন, একটু শিগগীর যেতে।

দীপা বলিল—আর একটু বসো, বাবাকে তোমার আর একটা গান শোনাও।

মহেশবাবু বলিলেন—হ্যাঁ-মা, তোমার গান আমার বড় মিষ্টি লেগেছে।

মুখ খানি নীচু করিয়া রেখা বলিল—আপনি একদিন আমাদের বাড়ী আসবেন, বাবা আপনাকে দেখলে ভারী খুসী হবেন। তিনি ও গান ভালবাসেন ; আমার শিক্ষা তাঁর কাছে।

—তাই বুঝি। তা হ'লে তো কালই গিয়ে উপস্থিত হব। দেখো মা, তখন যেন গান শোনাতে বিরক্ত হয়ো না !

একটু হাসিয়া রেখা বলিল—না, তা কেন হব !

—তবে আর এক খানি গান শুনিয়ে দাও।

রেখার গান শেষ হইলে দীপার দিকে চাহিয়া সে বলিল, —এবার বিদায় দিন—

চাকরকে ডাকিয়া দীপা ড্রাইভারকে মোটর ঠিক করিতে বলিল।

মহেশবাবু বলিলেন—তুমি যেতে চাইছ মা, কিন্তু তোমাকে ছাড়তে আমাদের একটু ও ইচ্ছে হচ্ছে না।

একটু হাসিয়া রেখা তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মনীশকে ছুটি লইয়া আসিবার জন্য মহেশ বাবু পত্র দিয়াছিলেন। নূতন চাকরী আরম্ভ করিবার পর এর সত্বর ছুটি লইবার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জননীর চিঠিতে বিবাহের কথা শুনিয়া তার তরুণ মনে এক অনাস্বাদিত সুখের দোলা দিয়া গেল। পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনে বাজিয়া উঠিল

"মাধবী রাতে মম মন-বিতানে,

মল্লিকা মঞ্জরি গুঞ্জরে হায়—

সে তোমারে চায়—সে তোমারে চায়"

সত্যিই আজ এই জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে মনীশের মন একটি সঙ্গিনী যেন চায়। এই বিরাট বাংলোটার মধ্যে সে একা! না; এ যেন আর ভাল লাগেনা। সে তখনই উঠিয়া গিয়া ছুটির দরখাস্ত লিখিতে বসিল।

মনীশ বাড়ী আসিলে, তার মা বলিলেন—আর পাঁচদিন পরেই বিয়ে।

—এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার তো একমাসের ছুটি।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু মেয়ের বাপের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে।

—ওঃ। বলিয়া মনীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তুই মেয়ে দেখতে যাবি তো?

—তোমরা ত সব ঠিক করেছ, এখন আমি দেখে কি করব!

—ওঁর আর দীপুর খুব পছন্দ হয়েছে।

—তবে আবার আমাকে দেখতে ব'লছ কেন?

—তোরা আজ কালকার ছেলে, শেষে ব'লবি যে আমাকে দেখাওনি...তাই তোর মত ও দরকার বইকি বাবা।

—কিন্তু তোমরা ত আমার মতের অপেক্ষা করনি, মা··

সে জন্যে তুই রাগ করিস্ নে মণি,···মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল। রূপে গুণে তোর উপযুক্ত বুঝেই আমরা ঠিক্ করেছি, জানি তোর অমত হবে না।

দীপা আসিয়া বলিল—তুমি একবার দেখলে বুঝবে, দাদা, দীপার কেমন পছন্দ—

মনীশ বলিল—ইস্। তোর যা পছন্দ আমার জানা আছে।

—কী জানো?

—সব কিছুই·········

কয়েকদিন পরে মনীশের সহিত রেখার বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশয্যার রাত্রে মনীশ রেখাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমায় বিয়ে করে সুখী হয়েছ রেখা? লজ্জারক্ত মুখে রেখা নীরব রহিল। মনীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাগানে সেবছর তোমার সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে? চাপাহাস্যে রেখা বকিল—পড়ে, চোরের!

বাংলার লৌকিক শিল্প

মহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম, এ

শিল্প দুই প্রকার—লৌকিক এবং অলৌকিক। উভয়েরই জন্ম শিল্পীর মানসলোকে, ধ্যানযোগে তার প্রতিকৃতির উপলব্ধি। উভয়েই এক জাতীয়, তবে স্তর ভেদ, রূপভেদ এবং ধর্ম্মভেদ। একটি সহজ, সরল এবং আদিম। অন্যটি দুরূহ, জটিল, এবং সুসংস্কৃত।

অজন্তার ছবি অলৌকিক আর আলপনার ছবি লৌকিক। লৌকিক শিল্পের জন্ম আগে; লৌকিক শিল্পকে অবলম্বন করে পূর্ণ বিকশিত শিল্পই অলৌকিক শিল্প। এ যেন বৃন্দা বিপীনের রাখাল কৃষ্ণের মথুরায় গিয়ে রাজগী পাওয়ার মত। রাজা তাঁর অসাধারণ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কিন্তু রাখাল সাধারণকে কেন্দ্র করে তবে চরিতার্থ।

বাংলাদেশটার ঠিকুজী বিচার করতে চাইলে দেখি, এদেশের মাটির সঙ্গে অসভ্য অনার্য্য, সুসভ্য দ্রাবিড় এবং সুসংস্কৃত আর্য্যদের অভেদ্ সাধনা ঘটে গিয়েছে। তার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য রয়েছে বাঙ্গালীর চেহারায়, মুখাবয়বে, ভাষায় এবং শিল্পে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এককালে উত্তর ভারতের যোগাযোগ পূর্ণরূপে ঘটেছিল এবং তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই তৎ তৎ অঞ্চলের শিল্পের আদর্শে এবং সৌসাদৃশ্যে; এবং সেই যোগসূত্র বাংলাদেশেও যুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। অজন্তা, সাচি এবং তক্ষশীলার অলঙ্করণ চিত্র এবং বাংলার আলপনা শিল্প তার নিদর্শন। বাংলার নৌকা গঠনের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার উরে প্রাপ্ত নৌকার মিল।

বিজিত এবং বিজেতা সভ্যতা কালক্রমে অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিলে গিয়েছে। এইজন্য পার্ব্বত্য এবং অসভ্য ওরাওদের গৃহ চিত্রনের সঙ্গে আল্পনার অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে আমার ধারণা হয়, আমাদের বাংলাদেশের আল্পনা-শিল্পটী অনার্য্য এবং সম্ভবত, দ্রাবিড় সভ্যতার শেষ চিহ্ন। * বাংলার বাহিরে দ্রাবিড়দের মধ্যে এই ধরণের আল্পনা চিত্রন বর্ত্তমান আছে কি না জানিনে কিন্তু প্রাচীন বৈদিক রীতিতে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন ছিল না, অনার্য্য দ্রাবিড়দের সংস্পর্শে এসে আর্য্যরা এই তান্ত্রিক সাকার পূজা মূর্ত্তি অবলম্বন করেন, আর এই আল্পনা হচ্ছে পূজার উপকরণ বা অলঙ্করণ শিল্প। আল্পনাগুলো সরল এবং বক্ররেখার যোগে উৎপত্তি লাভ করেছে, এবং কোথাও শুধু সরল রেখার গতি তির্য্যক রূপে কোথাও বা বক্র সরল রেখা মিলে নূতন চিত্র দেখা দিয়েছে। রেখার জ্ঞান সকল দেশেই ছিল, কি সুসভ্য কি অসভ্য জাতি সকলেই রেখা চিত্রের প্রতি অনুরক্ত, উল্কীর দাগ, তিলক চিহ্ন, মিশরীয় চিত্রলেখা (hiero glyehic) প্রভৃতি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আল্পনার অনুরূপ প্রতিমূর্ত্তির আমরা প্রাচীন শিল্পে সাক্ষাৎ পাই; আল্পনা না হলেও কতকটা আল্পনার মতই মণ্ডন শিল্পের দেখা পাই মেক্সিকোর মায়া জাতিদের পূজা পার্ব্বণে ব্যবহৃত দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই অসভ্য মায়া জাতিদের সঙ্গে একসময় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সহযোগিতায় ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান ঘটেছিল। শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ "বাংলার ব্রত" নামক গ্রন্থে মায়াজাতির লৌকিক পূজার সঙ্গে বাংলা দেশের

* রূপম্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে আল্পনা শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম, তিনিও দ্রাবিড় সম্পর্ক স্বীকার করেন। মাদ্রাজ অঞ্চলে বর্ত্তমানকালেও প্রতিদিন গৃহলক্ষ্মীরা লক্ষ্মীর শুভাগমনে আলিম্পন আঁকেন, তিনি দেখে এসেছেন। মাদ্রাজ অঞ্চলের আলপনাকে কোলাম বলে। তেলেগু এবং তামিলে দ্রাবিড় লোক-শিল্প সম্বন্ধে বই আছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস থেকে এই কোলামের কতগুলো ড্রয়িং বের হয়েছে, যাঁরা তুলনামূলক শিল্পের চর্চ্চা করছে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে দেওয়া উচিত।—মনসুরুদ্দিন।

লৌকিক পূজার সামঞ্জস্য ভারী সুন্দর ভাবে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়েছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দূর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছায়া নাট্য চিত্রের মুখাবয়বের সঙ্গে মায়াজাতির প্রাচীন শিল্পবস্তুতে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির সঙ্গে হুবহু মিল দেখা যায়। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা যদি একটু আলোচনা করেন তবে ভাল হয়।

আল্পনা শিল্প বাঙ্গালীর লৌকিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাঙ্গালীর মন এতে কোমল মধুর সুন্দর, এবং অনন্য ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা পরমাশ্চর্য্য বলে আমার মনে হয়, এবং এ বিকাশ নদী মেখলা, শস্য শ্যমলা, পলিমাটীর দেশ বাংলাতেই সম্ভব।

বাঙ্গালী নারীরা তাঁদের সমস্ত মাধুর্য্য, রস এবং শ্রদ্ধা নিয়ে এই অল্পনাগুলির জন্ম দিয়েছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি যেমন ভয়াবহ, রুদ্র, অ-সুকুমার—যথা কালী, সর্পবিলাসী শিব ও তার প্রতীক্ মনসা, আকার বিহীন শালগ্রাম এবং থাঁদা জগন্নাথ, বলরাম, তাতে এই অল্পনা আরো চমৎকার এবং অবাস্তবরূপে সুন্দর লাগে। বাঙ্গালীদের এই অল্পনাকে স্থায়ী রূপ দেবার প্রচেষ্টা দেখতে পাই গৃহপ্রাচীর চিত্রনে। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রূপদক্ষ বঙ্গলক্ষ্মীদের প্রচেষ্টায় দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং জীবনকে অধিকতর সুমধুর এবং সুউপভোগ্য করে তুলে। যে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রা নিরন্তর চলছে তাকে অধিকতর অন্তরঙ্গ রূপে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস দেখতে পাই এই অল্পনাগুলির মধ্যে। বাংলার কড়ি, শঙ্খ ধ্যান চুড়া, কলমীলতা, শঙ্খলতা, পদ্মলতা, দোপাটি লতা, মুক্তালতা, করঞ্চালতা, চাঁপাল তা, চউটিলতা খৈয়েলতা, খুন্তিলতা, দালানীলতা, তালগাছ, ফুলগাছ, অশথগাছ, সুপুরীগাছ, কদমঝাড়, বাঁশের ঝাড়, কলাছড়া, নদী, মাছ, নৌকা, রথ, গোলা, চন্দ্রসূর্য্য, এবং নানা প্রকার অলঙ্কার এই শিল্পের বিষয়বস্তু। বাঙ্গালীর ঘরোয়া জীবনের এমন নিগূঢ় চিত্র, তা মানচিত্রই হোক আর মণ্ডন বা অলঙ্করণ চিত্রই হোক, এমন ভাবে কোথাও ধরা পড়েনি, বাঙ্গালীর অনুশীলিত সাহিত্যে, বাঙ্গালার অন্তর্জীবনের যে ছবি পাই তা অস্পষ্ট এবং অসত্য কিন্তু এই আল্পনাতে বাংলার অন্তর রহস্যের সঙ্গে মুখোমুখী দেখাশুনা হয়। আধুনিক কালের যন্ত্রপাতি, সভ্যতা আমাদের নিভৃত আদরের এই সামগ্রীটীর টুটি চেপে ধরেছে। কতকাল এর পরমায়ু তা বিচার সাপক্ষ্য, তবে আল্পনা সত্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ বাংলার জীবন বাংলার প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এবং বাংলার প্রাণের সঙ্গে দুচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগাযোগ রয়েছে আল্পনার সঙ্গে। শিল্পী-বাদশাহ অবনীন্দ্রনাথ এর সম্বন্ধে বলেন "আল্পনা যে কত সুন্দর এবং কত রকমের তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্ট স্কুলে ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ মেয়েরা না শিখেই শিখেছে এবং সৃষ্টিও করছে। [বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ৫৮]

আল্পনা ব্যতিরেকে অন্যদিকেও লৌকিক শিল্পের নিদর্শনী বর্ত্তমান রয়েছে। এই শিল্পের মননধারাটি ভারি চমৎকার, সমস্ত জাতির শিল্পবোধের পরিচায়ক। জীবনের বিকাশ যৌবন, শিল্পেরও উৎপত্তি জীবন থেকে এবং ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং জাতিগত জীবনের মূল উৎস হতে। শিল্পে আবার যৌবনের লাবণ্যের সাক্ষাৎ পাই। জাতীয় জীবন রস নিষিক্ত, স্বচ্ছল এবং উন্নতিশীল হলে জাতির কাছ থেকে শিল্পাত্মক দ্রব্যের আশা করা যেতে পারে। এখন দেখা যাক, আমাদের জীবনযাত্রার উপকরণ হিসাবে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তার মধ্যে লৌকিক শিল্পের সাক্ষাৎ কতটা পাই। বঙ্গলক্ষ্মীরা স্বক্ষেত্রে একটী ভক্তিরসাল শিল্পের আনন্দ পরিবেশণ করছেন। কিন্তু তাদের আদরের খুকুমণিরা আমাদের লৌকিক শিল্পের কী রকম আদর করেন। দেখতে পাচ্ছি খুকুমণিরা শুয়ে আছে, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত পা নাড়া চাড়া করছে আর দোদুল্যমান শোলার খাঁচা, নানা রকম কারুকাজ করা রং চঙে ভরা, টুকটুকে দেখতে ভারী চমৎকার লাগছে। শিশুর খেলনা থেকেই আরম্ভ করা গেল। খেলনার আবার প্রকারভেদ আছে। শিশুর জীবনে খেলনার সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র বড়ই প্রয়োজনীয়। শোলার খাঁচা (কতকটা রথের আকার) ফুল থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ প্রাণী যেমন ঘোড়া, গোরু, হরিণ, যানবাহন, যেমন গাড়ী, নৌকা, রথ, প্রভৃতি নূতন করে তৈরী হচ্ছে

কাঠ থেকে, তারপর মাটির চাকা, ঘুঘু, মানুষ প্রভৃতি দিয়ে তার নূতন্ জগত পূর্ণ হয়ে উঠল।

আল্পনার মধ্যে যে সকল ছবি দেখলাম তাতে দেখেছি ফুটে উঠেছে পারিপার্শ্বিক জগৎ, কামনার মধ্য দিয়ে সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সোহাগ পূর্ণ হয়ে। এই শিশুর খেলনার মধ্যেও সেই সুকোমল বৃত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আল্পনার মত এই খেলানা আনন্দপূর্ণ এবং শিল্প রসাত্মক। শিশুর সামান্য লাল ফতুয়া অবলম্বন করে যে মাধুর্য্যে ও সোহাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমাদের হৃদয়, কোন গোরা সৈনিকের মূল্যবান ও মজবুত বুট দেখে তা জেগে উঠে না। তেমনি শিশুর খেলনাকে অবলম্বন করে যে অপরূপ রসের জগত গড়ে উঠে তার সাক্ষাৎ আমরা দৈনিক কারিগরের উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শ-থেকেও পাই না।

খেলনার প্রচলন অত্যন্ত আদিকাল থেকে চলে আসছে। মহেঞ্জোদারোর খনন কার্য্যে কতকগুলি খেলনা ছবি প্রকাশ হয়েছে। আমাদের বাংলার নিভৃত পল্লীতে যে সকল খেলনার সাক্ষাৎ পাই তদস্বরূপ সেগুলোও।

মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহার সুপ্রাচীন, সুসভ্য এবং অসভ্য সকলজাতির মধ্যে প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমানে। এই মৃন্ময় পাত্রে যে একটী পরম রমণীয় মণ্ডল শিল্প পদচিহ্ন রেখে গেছে তা বিস্ময়কর। ক্রেট (Crete) দ্বীপে প্রাপ্ত মাটীর পাত্রের উপরকার শিল্প কাজ উরে প্রাপ্ত নিদর্শনী এবং মহেঞ্জোদোরা হারাপার দ্রব্য একই রসনানুভূতির চমৎকার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং অতি প্রাচীনকালের শিল্পজগতের এমন একটী অখণ্ডরূপ, আত্মিক জগতের বার্ত্তা বহন করেছে যা বর্ত্তমানের অভি-শাপগ্রস্ত যুদ্ধমান জগতের পক্ষে একটা নূতন প্রাণের বাণী। এই মৃন্ময় পাত্রের আকার, ডৌলমণ্ডল কার্য্য ব্যবহার কর্ত্তাদের মনের, রুচির, সমাজের এবং দেশের অবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাইরের কথা ছেড়ে ক্ষুদ্র বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পাত্রের একটী সচিত্র তুলনামূলক আলোচনা করলে এ বিষয়টী সম্যকরূপে পরিস্ফুট হবে। বীরভূমে ব্যবহৃত কলসী, ভাঁড়, ঢাকার কলসী এবং ভাড় হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এত বিভিন্ন যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মাটীর নানারকম খেলনাও হয় এবং খেলনা তৈরীর ব্যাপারে বাংলার নিজস্ব একটী শিল্পরসের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচিত জগৎকেই অবলম্বন করে প্রয়োজনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মৃন্ময় শিল্পবোধের অবাধ যাত্রার রথ চলেছে পল্লীর মেলাতে মেলাতে, কুমারের পাড়াতে। মধু টীয়া, ইলিস মাছ, আম, মানুষ, নাড়ুগোপাল, গরু, মহিষ, ইঁদুর, বেড়াল, লক্ষ্মী ইত্যাদি। এর মধ্যে লক্ষ্মী পূজার সরার কারুকার্য্য বিশেষ করে ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর অঞ্চলের, বড়ই মনোহর। এমন একটী অমার্জ্জিত মাধুর্য্য রসসিক্ত যা দেখলেই শিল্পীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাংলার শিল্পবিলাসী মনের একটী পরিচয় পাওয়া গেল বলে আনন্দ হয়।

মাটীর পরে কাঠের কাজ। মাটীর চেয়ে কাঠ শক্ত এবং সহনশীল। কাঠের কাজে বাংলার শিল্পীদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। এই নদীমাতৃক দেশে শক্ত, নরম, টেকসই সকল ধরণের কাঠ পাওয়া যায়। এবং এই সকল কাষ্ঠের মধ্যে কাঁঠালের কাঠ শিল্পীর সোনার কাঠির স্পর্শে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উড়িষ্যায় দারুময় দেবমূর্ত্তি যে রূপ পরিগ্রহণ করেছেন তা সারাসেনদের কর্ডোভায় সিংহের মূর্ত্তিতে তেমনি, অক্ষমতা এবং অবাস্তবতা প্রত্যক্ষ। প্রয়োজন এবং উৎপন্নের জোগান চলেছে জীবনের সর্ব্বত্র একত্রে,—ভিটামিনের পরিণতিতে শেষ পর্য্যন্ত রক্ত বিন্দু। নানা রকমের ব্যবহার্য্য সামগ্রী, দেবদেবীর নানা সামগ্রী, শিল্পীরা অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে তৈয়ারী করেছেন, এবং এক্ষেত্রে আশে পাশের জগৎ চিত্রিত হয়ে উঠেছে। যে কোন বাঙ্গালী বনেদী ঘরের বাঙ্গালী কারিগরের তৈরী পালঙ্ক, জলচৌকি দেখুন, দেখতে পাবেন লতা পাতা, ফুল ফল নানাভাবে মোহন এবং প্রাণবান হয়ে উঠেছে, এবং গ্রাম্য সূত্রধরের অসামান্য দক্ষতায়, বাঙ্গালীর ভাবজাগ্রৎ চিত্রের নিগূঢ় পরিচয় দিচ্ছে। দরজা, আসন চৌকি, বাক্স, সিন্দুক, প্রভৃতি জিনিষে এখনও গ্রামে খুঁজলে এ সকল চমৎকার কারু-কার্য্যের সাক্ষাৎ মিলবে। বর্ম্মায় কাঠের কাজে যে একটী অপার্থিব, অপরিচিত, শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলায় সেটা সুশোভন, সুসম্পন্ন, এবং নয়নাভিরাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ

করেছে। সস্তা তাগিদের খাতিরে আমাদের এই মূল্যবান দারুশিল্পীদের মরণ হচ্ছে তিলে তিলে, জাতির জ্ঞানের অগোচরে।

এ বেলায়ও দেখছি ছোটদের জগৎ গড়ে উঠেছে খেলনার মধ্যে সহজ, সরল, কিন্তু সুকুমার রসে নিষিক্ত হয়ে। কাঠের খেলনা ছেলেদের বড়ই আদরের। মেয়েরাও এই খেলনা লাগাতে চান আপনাদের প্রয়োজনের ব্যাপারে, রাখেন তাতে সিন্দুর, পুঁতির মালা, লক্ষ্মীর মুদ্রা, ঝিনুক কড়ি।

বাংলায় লোক শিল্পের ব্যাপারে বাঁশের এবং বেতের কাজের উল্লেখ করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। বাঁখারীর তৈরী এমন চমৎকার ঘর দেখেচি—যা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে, তার সঙ্গে যেন একটী গভীর যোগ অনুভব করেছি। এমন সুন্দর সুন্দর "ফুল চাং" (নানান সৌখীন জিনিষ রাখবার জন্য অপরূপ বেতের এবং বাঁশের গড়া মঞ্চ বিশেষ) হয়ত ক্ষুদ্র একটী মঞ্চ, কিন্তু তা তৈরী করতে তাজমহলের মালমশলার ধৈর্য্যের এবং সর্ব্বোপরি সৌন্দর্য্যবোধের প্রয়োজন।

মোট কথা আমাদের লৌকিক শিল্প আমাদের নিজস্ব। এর এমন একটী দুর্ল্লভ স্বকীয়তা আছে যা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। বাংলার এই লোকশিল্প আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বাংলার তরুণ চিত্তের নিকট আমার আবেদন—তারা নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় সম্পদকে ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করবেন এবং এর একটী অভিনব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে সমাজের মহৎ কল্যাণ সাধন করবেন।

আমার তীর্থ

শ্রীমতী শ্রীলেখা চৌধুরাণী

কেউ বলে, "বউ সময় হল
দীক্ষা এবার নাও"
কেউ বা বলে, "তীর্থ-ধর্ম্ম
চাওনা কিগো তাও ?"
কারেও বলি, "সময় হলে
সবই হবে ভাই।"
হাসি কভু, দেখে' বা কেউ,
বলেন, "ধর্ম্ম নাই।"
আমার মনে যা আছে তা
আমিই শুধু জানি,
অন্তর্য্যামী জানেন, যিনি
দেখেন হৃদয়খানি।
দেবতারে খুঁজব কোথায়,
দুর্গম কান্তারে;
জড়িয়ে যিনি আছেন আমার
ছোট্ট এ সংসারে।
এরই সেবায় পাই যে তাঁরি
চরণ সেবার সুখ।
সবার হাসির মাঝে দেখি
তাঁরি হাসি মুখ।
সুখের মাঝে ভাবি,
এযে তাঁরি স্নেহের দান,
দুঃখে ভাবি এও ত দিলেন
আমার ভগবান।
পেলেম নাত কূল কিনারা
ভেবেই জনম ভোর,
গৃহ ছেড়ে স্বতন্ত্র হায়
ধর্ম্ম কোথায় মোর!
এরে ছেড়ে তীর্থে যেতেও
চায়না ত মোর মন,
হৃদয় বলে এরই মাঝে
আছেন নারায়ণ।
নিত্য হেথায় তুলসীতলায়
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা;
মধুর কত বুঝবে কে তা
কী অমৃত ঢালা!
হেথায় প্রতি ধূলিকণা
পবিত্র মোর কাছে;
জড়িয়ে যেন এরেই থাকি
য'দিন জীবন আছে।
সংসারেরই মাঝে যেন
স্মরি তোমার নাম,
সেই ত মহাতীর্থ আমার
পুণ্য কাশীধাম।

দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ শিল্প

CALCUTTA UNIVERSITY
Acc. No. ......
Book No. ......
LIBRARY

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ ধাতু মূর্ত্তির খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। চোল রাজাদের সময় নির্ম্মিত অসংখ্য পঞ্চ লোহের প্রতিমা-... ভারতের প্রতিমা-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই ...

নটরাজের মূর্ত্তি

দেশ বিদেশে রূপ-রসিকদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

চোল যুগের শ্রেষ্ঠ কল্পনা নটরাজের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির কল্পনার কাছে জগতের শিল্পীরা মাথা নত করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শিল্প শাস্ত্রে ব্রোঞ্জ ধাতুর নাম "পঞ্চ লৌহ" অর্থাৎ তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল ও রাঙ্গ মিশ্রণে গলিত হইয়া অপরূপ ধাতু-ই ব্রোঞ্জ।

শিল্প শাস্ত্র মতে ব্রোঞ্জ শতকরা ৮৫ ভাগ তামা, ১০

চন্দ্রশেখর—লর্ড কারমাইকেল সংগৃহীত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে।

ভাগ টিন, ২ ভাগ রাং, ২ ভাগ রূপা ও ১ ভাগ সোনা দিয়া প্রস্তুত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে তামা, পিতল ও রাং মিশ্রণে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হয়।

দক্ষিণ ভারতে ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ঢালাই করিবার প্রথা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথা দক্ষিণদেশের শিল্প শাস্ত্রে "সিয়ের পারডু" নামে খ্যাত। শিল্প শাস্ত্রে মোমের ছাঁচ করিবার নির্দ্দেশ আছে।

শিল্পী তাঁহার নিজস্ব সৃজনী শক্তির সাহয্যে শাস্ত্র সম্মত ধ্যান ও নির্দ্দেশ মত আদর্শ মোম দিয়া ছাঁচ নির্ম্মিত করিতেন। দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলি নিরেট। কিন্তু তিব্বত ও নেপালের মূর্ত্তিগুলি ফাঁপা।

দক্ষিণ ভারতে ধাতু মূর্ত্তির নিদর্শন অতি প্রাচীন সময় হইতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ জিলায় বুদ্ধবাণীতে বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি গুপ্ত রাজ্যকালের ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (মিঃ ও, সি গাঙ্গুলীর সাওথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জ গ্রন্থের ২য় পৃঃ)

শিল্প শাস্ত্র অনুসারে শিবের ষোড়শ প্রকার ঐশ্বর্য্য সম্বলিত ধাতু মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে প্রচলন দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে গঙ্গাধর ও চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব। এখানে নটরাজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মূর্ত্তিও দেখা যায়। এই নটরাজের মূর্ত্তি দেখিয়া অধ্যাপক উলিয়ম রদেন ষ্টেইল বলিয়াছেন— "কোন শিল্পীই নটরাজের সমান শিল্পমূর্ত্তির পরিকল্পনা করিতে পারেন নাই"

কেবল মহাদেবের নহে, উমা, গৌরী, পেরুমল (বিষ্ণু) বরদরাজ কৃষ্ণ, কালীয় দমন, নবগীত নৃত্য, কোদণ্ডরামের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি গুলি বড়ই রমণীয়। Southern Indian Bronzes গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় বিশদ ভাবে ইহা বিবৃত করিয়াছেন।

দিন দিন এই অপূর্ব্ব শিল্পধারার আদর ও নির্ম্মাণ শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

কুম্ভকোণমের নিকট স্বোয়ামী মালাই গ্রামে এখনও ব্রোঞ্জ ধাতু মূর্ত্তি গঠনের শিল্পীরা বসবাস করিতেছেন। এখনও পূর্ব্বধারায় গঠনকারী দুই একজন শিল্পী জীবিত রহিয়াছেন।

এই দক্ষিণ ভারতের ধাতুমূর্ত্তির স্থপতিরা কত জীবন ব্যাপি সাধনা, কত ধ্যান, কত সংযত চিত্ত, কত সুখদুঃখের পীড়ন সহ্য করিয়া এক একটী মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গের ভঙ্গিমা, রূপ বিকাশের ক্ষমতা, সৃজন শক্তির ভাব যোগে ধাতুকে রূপান্তরিত করিয়া অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত, নানা ভাবব্যঞ্জক, শরীর তত্ত্ব অনুযায়ী সজীব মূর্ত্তি গঠন করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা না দেখিলে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আমরা শিল্পীদের আদর ও শ্রদ্ধা করি না। শিল্পীরা দেশকে সুন্দর করিয়া তোলেন। দেশের হর্ম্ম্য, সৌধ, দেবদেউল যত মহান ও সুন্দর হইবে তত দেশের প্রতি মায়া বৃদ্ধি হইবে।

দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জ শিল্প তেমনি গরীমামণ্ডিত হইয়াছিল।

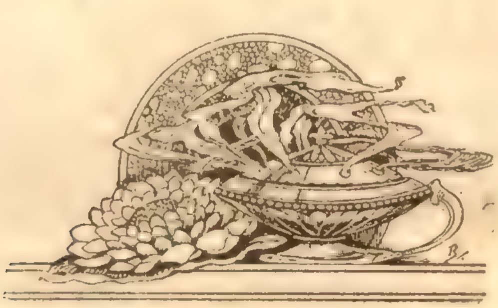

বাঙ্গালা সাহিত্যে আগমনীর রূপ

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লৌকিক গীতিগাথা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন পুঁথি-পত্রে শিব-দুর্গার ঘরকন্না, কোন্দল-কথা ইত্যাদি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে সবের সাথে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সংযোগ আছে এবং সেজন্ম সে সব কথা আমাদের নিকট এত মূল্যবান্। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্ব হইতে আশ্বিন মাসাবধি বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্র অল্প বিস্তর শিবের ছড়া-গানের প্রচলন আছে। গাজনের আকারের যে সকল ছড়া আমরা আবৃত্তি করিতে শুনি, সে সবের মধ্যে শিবই প্রধান উপজীব্য বিষয়বস্তু। শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ, তিনি সত্য এবং সুন্দর। বৈদিক রুদ্র পরবর্ত্তীকালে শিবের আকার প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে পূজা পাইয়া আসিতে লাগিলেন। কৃষিপ্রধান বাঙলা দেশ ক্রমে তাঁহাকে কৃষির দেবতা রূপে কল্পনা করিয়া লইল এবং তাঁহার দ্বারা অনেক চাষ-আবাদ করাইয়া লইল। রামেশ্বরের শিবায়ণ ও বাঙালার বিভিন্ন অঞ্চলের মনসা মঙ্গল গানগুলিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া শিব সাধারণ গৃহস্থের পর্য্যায়ে পড়িয়া গেলেন। ফলে, সাধারণ বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সহিত তাঁহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল না। কোন্দল-সম্বল নারদমুনি তাঁহার বিবাহের ঘটক হইলেন। কাজে কাজেই স্ত্রীর সহিত তাঁহার কলহ বৃদ্ধি লাগিয়াই ছিল। শ্রীদুর্গা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পত্নী হইলেও তাহার প্রতি সন্দেহ না করিয়া পারিতেন না—বুড়ো মানুষের দস্তুরই বুঝি এই রকম। শ্রীদুর্গাও ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। ভোলানাথ যে ফাঁক পাইলে "কুচ নগরে" যাতায়াত করেন, তাহাও তাঁহার জানা ছিল। ভোলানাথ যাহাই করুন না কেন, দুর্গাকে এক দণ্ড সম্মুখে না দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া যাইতেন। দুর্গাও তাঁহাকে লইয়া চড়কীপাক খেলিতেন এবং নানারূপ মায়া ধরিয়া ভোলানাথকে পরীক্ষা করিতেন। এ হেন দুর্গা বাপের বাড়ী যাইতে চাহিলে তিনি যেন দুনিয়া অন্ধকার দেখিতেন। কত রকম ওজর আপত্তি তাঁহার মনে আসিয়া যোগাইত। আত্মীয় বাড়ীতেও যাইবার জো নাই—দুর্গার কোন অভিলাষই যেন পূর্ণ হইবার নহে। এদিকে তাঁহার সঙ্গিনীরা বলে যে, তাহার কি ত্রি-সংসারে কোন আত্মীয়-স্বজন নাই! নহিলে একবারও অন্ততঃ খোঁজ লইত না কি! দুর্গা কিছু উত্তর দিতে পারেন না—তাঁহার বাপ যে বাতে পঙ্গু, উত্থান শক্তি রহিত, নহিলে খোঁজ অবশ্য লইতেন।

এদিকে জননী মেনকা একমাত্র কন্যা শ্রীদুর্গার কথা ভাবিয়া আকুল—স্বামী গিরিরাজকে কন্যা আনিবার কথা বলিয়া কোন ফল হয় নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম। বৎসরান্তে একবারের জন্যও তিনি দুর্গার দেখা পাইবেন না। এইরূপে দুর্গার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে উমা তাঁহার শিয়রে আসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন। মা মেনকার চক্ষু হইতে তখন অশ্রু ঝরিতেছে—এতদিন পরে কি সত্যই উমা তাঁহার মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন?

স্বপ্নে হেরি গিরি নারী দুঃখহরা মেয়ে।
চক্ষে ধারা তারা কারা তারা পানে চেয়ে॥
বলে—উমা! মা ব'লে কি ছিল মা তোর মনে।
ঘন ঘন ধারা বহে দুনয়নে॥
ক্ষীর সর সুরস মিষ্টান্ন স্বর্ণ থালে।
কোলে করি দেয় উমার শ্রীমুখ মণ্ডলে॥

(দাশু রায়ের পাঁচালী)

স্বপ্ন কাটিয়া যায়—তখন তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। ক্রমে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে পাগলিনীর মত গিরিরাজের নিকট যাইয়া উমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন

করেন। পরে অতি কষ্টে গিরিরাজকে গৌরী আনয়নের জন্য যাইতে হয়। পিতা তাহাকে লইতে আসিয়াছেন শুনিয়া গৌরী বিশেষ আনন্দিত হইয়া কাশীনাথের নিকট পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—ভোলানাথ বাঁকিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ভোলানাথের কখন কি হয় বলা যায় না—এমন সময় তাহাকে ছাড়া কি সঙ্গত!

তুমি সদয়া অচলে, আমার কিরূপে চলে
চলাচল শক্তি নাই ঈশানি।
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হ্রাস হচ্ছে পর পর
এর পর কি হয় না জানি॥

শেষকালে অতি কষ্টে শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌরীর পিত্রালয়ে যাইতে হয়। দশভূজা দুর্গা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌরী গিরিপুরে আগমন করিলেন। গিরিবাসিনী মেয়ের দল তাহাকে দেখিতে আসিল—তাহারা গৌরীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

গিরিবাসিনী যত মেয়ে, গৃহকার্য্য তেয়াগিয়ে,
পথ চেয়ে আছে পথ মাঝে।
মায়ের আগমন অমনি, হেরিল যত রমণী,
শঙ্কর-রমণী রণসাজে॥

শঙ্কর-রমণী শ্রীদুর্গার এরূপ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কেউ বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মায়ের এরূপে আগমনের সার্থকতা অবশ্য আছে। চারিদিকে অন্যায় অত্যাচার মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই অভয়দায়িনী অসুরনাশিনী মা নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত। কবি দাশরথি রায় মায়ের যে মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন,—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নূতন রূপ দিলেন—

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

আমাদের হৃদয়-মন্দিরে মায়ের আসন যেন অটুট থাকে। বাঙলা সাহিত্যে আগমনী গানের একটানা সুরের মধ্য হইতে দনুজ-দলনী মায়ের যে মূর্ত্তি আমরা পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে দেখিতে পাই, তাহাই মায়ের আগমনীর আসল তত্ত্ব-রূপ। পারিবারিক কলহের বাহিরে মা দশভূজার মূর্ত্তি সন্তানগণের একান্ত কাম্য। ইহাই নারীর ভিতরে শক্তির উদ্দীপনা প্রদান করিয়েছে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার হইতে ২১শে জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। নিম্নে সে গুলির কর্ম্মসূচী প্রদত্ত হইল। আশা করি, আপনি ও আপনার পরিবারস্থ মহিলাগণ এবং মহিলা-সমিতির সভ্যাগণ এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি।

বিনীতা
শ্রীহেমলতা দেবী
সম্পাদিকা।

১৫শ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব (১৯৪০)

কর্ম্মসূচী

১৫ই জানুয়ারী, সোমবার—মাননীয়া লেডী বার্কমায়ার কর্ত্তৃক অপরাহ্ণ ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় মহিলা শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রদর্শনী—বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা।

১৭ই জানুয়ারী, বুধবার—(১) মফঃস্বল মহিলা সমিতির প্রতিনিধি বৃন্দের সমিতির কার্যাবলী সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। বেলা ১টা হইতে ২টা। (২) "মহিলা সম্মেলন"—বেলা ৩টায়, সভানেত্রী—মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুহাসিনী বিশ্বাস, (৩) প্রদশনী—মহিলা-দিবস—বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা।

১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—(১) মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণের বিশেষ অধিবেশন। (২) প্রদর্শনী—বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা।

১৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার—"প্রার্থনা সভা" সকাল ৯টা, সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। (২) "পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সভা"—অপরাহ্ণ ৫টা। সভাপতি—কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন। মাননীয়া ঢাকার বেগম সাহেবা পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

২০শে জানুয়ারী, শনিবার—(১) মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণের অধিবেশন ও সাধারণ আলোচনা, প্রাতঃ ৮টা হইতে ১০টা।

"সরোজনলিনী বক্তৃতা" অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায়।

বক্তা—মাননীয় খান বাহাদুর আজিজুল হক, সি, আই ই।

বিষয়—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্রমোন্নতি।"

২১শে জানুয়ারী, রবিবার—প্রদর্শনী, বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা।

"নলিনী সপ্তাহ"—১৫ই জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারী।

প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য এক আনা। মহিলা সমিতির সভ্যাগণের ও 'মহিলা দিবসে' মহিলাগণের প্রবেশ মূল্য লাগিবে না।

কেন্দ্র সমিতির কথা—

প্রচার কার্য্য :—গত ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার—আসানসোল—উষাগ্রাম কলোনীতে মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌এর উদ্যোগে একটী মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কেন্দ্র সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার সরোজনলিনী নারী শিল্প শিক্ষালয়ের প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সহ প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা প্রদর্শনীমণ্ডপে মহিলাদের একটী সভা হয়; শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলা সমিতির গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর শ্রীযুক্ত সরকার ম্যাজিক ল্যাণ্ঠান সহযোগে মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি এবং শিশুপালন ও মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে মহিলা শিল্পপ্রদর্শনী

গত ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে নারীদের হস্ত নির্ম্মিত নানা প্রকার শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহামাননীয়া লেডী মেরী হার্ব্বার্ট মহোদয়া এই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন তিনি এই প্রদেশে নূতন আসিয়াছেন। এ দেশের নারীর অবস্থার সহিত পরিচিত নহেন, তথাপি কুটীর শিল্পের উন্নতি নারীর শ্রম ও দক্ষতার :উপর :বিশেষ ভাবে নির্ভর করে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এবং বঙ্গনারীর সুখসচ্ছন্দতা

বাণী ভবনে মাননীয়া লেডী হার্বাট

যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য লেডী হার্ব্বার্ট বিশেষ আগ্রহান্বিতা থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। এই প্রদর্শনীতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি শিল্প দ্রব্য প্রদর্শিত করিয়াছিলেন এবং দুইটী বিষয়ে জয়পত্র পাইয়াছেন। ব্রতচারী প্রথায় লেডী হার্ব্বার্টকে অভিবাদন করায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অখিল হিন্দু-মহিলা মহাসম্মিলন—কলিকাতার হিন্দুমহাসভায় বড়দিনের অবকাশে অনুষ্ঠানের সহিত দেশবন্ধু পার্কে অখিল হিন্দু মহাসম্মিলনের বিরাট অধিবেশন হইয়া আমেদাবাদের শ্রীমতী সুশীলা বাঈ সপ্তর্ষি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। এই সম্মিলনে প্রায় আট সহস্র মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এত অধিক পুরনারীর সাধারণ সভায় সমাবেশ পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক এম, এ, বি, টী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সভানেত্রী মহোদয়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন—ঘরের কাজ ছাড়াও মহিলাদের পক্ষে বাহিরের অনেক কিছু করিবার রয়েছে। বিশ্বের অবস্থা ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ সময় যদি মহিলাগণ পারিবারিক কার্য্য ব্যতিতও দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার উন্নতি সাধনে তৎপর না হন তবে ভারতের হিন্দু-জাতি ক্রমেই অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে।

তিনি দেশের প্রত্যেক মহিলাকেই কুটির শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। ভারতের নিরক্ষর স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রত্যেক মহিলারই প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বালিকা দিগকে সুগৃহিণী ও সুমাতা করিয়া তোলাও যে প্রধানতম কার্য্য তাহা আধুনিক পাঠ্যতালিকা-নির্দ্ধারকরা প্রায়ই ভুলিয়া যান। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন।

এক সময়ে ছয় সন্তান প্রসব—৫ই জানুয়ারী তারিখের 'ষ্টেট্‌সম্যান' সংবাদপত্রে এক অভিনব সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। ইরাকের এক রমণী এক ঘণ্টার মধ্যে পর পর ছয়টি সন্তান প্রসব করিয়া সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন।

এই পত্রিকা আরো প্রকাশ করিয়াছেন যে কাণপুরের নিকট এক হিন্দু গৃহের মহিলা পর পর ৪টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ৪টী সন্তানই জীবিত আছে।

সম্প্রতি ভারত সংবাদ পত্রে কাইরো হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেখানে এক মিশর রমণী ৪টি সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

কলিকাতায় গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কের নন্দী বংশের এক বধূ তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, তিনটী

সন্তানই ও প্রসূতি সুস্থ শরীরে সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। ইহা যখন গল্প নহে, বাস্তব সত্য তখন সংসারের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক যুবক যুবতীদের ভীত হইবার কোন কারণ দেখি না।

সুশীলা বাঈ সপ্তর্ষি—শ্রীমতী সুশীলা বাঈ সপ্তর্ষি বি এ আমেদনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার ওম্যান। নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ তিনি অখিল হিন্দু সভার সভানেতৃত্ব করিতে কলিকাতায় আগমন করেন। বাঙ্গালার মেয়েদের জাগরণ দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং বাঙ্গালার ঘরের বধূ ও কন্যাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেই জন্য শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ (মিসেস্ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ) তাঁহার ভবনে শ্রীমতী সপ্তর্ষিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক গণ্য মান্য আভিজাত্য ঘরের মহিলারা এই প্রীতি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পুনার শ্রীমতী জানকীবাঈ যোশী ও শ্রীমতী রমাবাঈ জুগ্‌লেকর ইন্দ্রাণী পাদন ; শ্রীমতী রমাঈ পাণ্ডে এই প্রীতি সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী সুশীলা বাঈ সপ্তর্ষি সকলের সহিত সরলভাবে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রীতি সম্মিলনের জন্য তিনি বোম্বাই যাত্রা এক দিনের জন্য স্থগিত রাখেন। তিনি সম্মিলনের অন্তে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হিন্দু মহিলা সংগঠনের জন্য আলোচনা করেন।

তারা নিজের হাতে গড়ে

চা তৈরী করা মেয়েদেরই কাজ। বিশেষ করে' আমাদের দেশের রান্নাবাড়া সম্পর্কিত সব কাজই মেয়েরা করতে ভালোবাসেন। সেইজন্য যখনই কোনো বাড়ীতে এক পেয়ালা সুস্বাদু চা আমরা খেতে পাই, তখনই বুঝতে পারি যে এ মেয়েদেরই হাতের তৈরী ; আর বুঝ্‌তে পারি যে মেয়েরা আজকাল চা তৈরীর কাজটাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন।

প্রধানত চা একটি পারিবারিক পানীয়। কাজেই ঘরের গৃহিণার চা তৈরী ও পরিবেষণ করা তাঁর পক্ষে নিত্য কর্ম হয়ে দাঁড়ানোই স্বাভাবিক। আর দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্যে চায়ের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিই বা হইতে পারে ?

পৃথিবীর সব দেশেই মেয়েরা চায়ের অনুষ্ঠানকে সংস্কৃতির প্রতীক বলে জানে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাবে নিহিত বলেই, তা'রা যখন বন্ধুবান্ধবকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করে, তখন বেশভূষায় পারিপাট্যে এবং অন্য নানাভাবে একটা সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনী সৃষ্টি করে' নিতে পারে।

বিলেতের পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য লেডি এস্টর্ কিছুদিন আগে এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। বিলেত ছাড়বার আগে বন্ধুবান্ধবদের তিনি যে চায়ের মজলিসে নেমন্তন্ন করেছিলেন, তাতে লেডি এস্টর্ নিজের হাতে চা পরিবেশণ করেছিলেন বলে' জানা গেছে। চাকর-বাকরদের তিনি চায়ের আনুষঙ্গিক খাবার পরিবেশণ করতে দিয়েছিলেন মাত্র—চা নয়। আর একজন বিদেশী মহিলা যে কি রকমে অসুবিধায় পড়েও তাঁর চা পরিবেশণের আনন্দময় কর্ত্তব্যের কথা ভোলেন নি—সে খবরও কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিলো। অনেকেরই বোধহয় মনে আছে ইংরেজ সাংবাদিক পিটার ফ্লেমিং-এর সঙ্গে কুমারী এলা মাইআর্ট চীন ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে তিন হাজার মাইল রাস্তা পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন। লণ্ডনের "সান্‌ডে ক্রনিক্‌ল্"-এর প্রতিনিধির কাছে তাঁর এসিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে' কুমারী মাইআর্ট্ বলেছেন :

"মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সমতল ভূমির মধ্যে পড়ে' আগুন জালাবার জন্য আমি শুক্‌নো গাছপাতা আর খড়কুটো সংগ্রহ করেছিলাম। তুর্কীস্থানের মধ্যে আরুল সমুদ্রের কাছে বরফ ছাওয়া মরুভূমিতেই পড়েছিলাম মুস্কিলে। সেই ভয়াবহ সপ্তাহ ক'টা আমি প্রায় শীতে জমে মরেই গিয়েছিলাম। বরফ গলিয়ে আমাকে চা করতে হয়েছিলো।"

আমেরিকার সুগৃহিণীত্ব প্রতিষ্ঠানের (Good Husekeeping Institute) পরিচালিকা বিকেল বেলাকার চায়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলেছেন :

"নেমন্তন্ন হোক্ বা ঘরোয়া মজ্‌লিসই হোক্ চা খেতে দিলে অভ্যাগতদের আনন্দ জমে উঠবেই। সামাজিকভাবে অনেক্ লোককে নেমন্তন্ন করে' এনে চা দেওয়া যেমন মানায়, দু'তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বেলাতেও তাই। চা খাবার সময় যে প্রশান্ত ভাব মুখের ওপর ফুটে ওঠে, সেই প্রশান্তি মনের মধ্যেও আসে। চা এবং তা'র সব আনুষঙ্গিক ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর একটা আরামের প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।"

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-সভা

C. H. ARAN & CO. CAL.

বঙ্গলক্ষ্মী

পঞ্চদশ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ | ৪র্থ সংখ্যা

উদ্বুদ্ধবাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের উৎসবদেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সবশেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্য সামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন যাতে লোকে তাঁকে না-মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু যিনি রাজার রাজা তাঁর কোন আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক—তাঁর কোন তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে সেই তাঁর পূজা করুক—এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা তাঁর কাছে কোন ভয় নেই। বিশ্বের আর সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোন ভয় নেই—[illegible] বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। এই যে আজ এত লোক-সমাগম—তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত! কিন্তু তাঁর রাজশাসন কোথায়? যাঁদের পদমর্য্যাদা আছে. এমন লোক হয়ত এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে থাকতেও পারেন। কিন্তু তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য্য তাঁদের ধারণ করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমেনি—সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই

ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রকৃতির দ্বারে যাঁরা দ্বারী তাদের কত ঘুষ দিয়ে থাকি, তাদের শাসনও সইতে হয়, কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পুজার অর্ঘ্য ভরছে না—তারই জন্য তিনি যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারবেন।

ক্ষতি হচ্ছে আমাদেরই। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত মানসম্ভ্রমের মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। যে তার বিষয়ী, যে তার জ্ঞানাভিমানী, তার কোন ক্ষতি হচ্ছে না—কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে যে তার অন্তরাত্মা। এই যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মগ্রহণক রেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব। সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছেন।

কিন্তু ভয় নেই, কোথাও কোন ভয় নেই। প্রভু বলছেন—আমি তো জোর করে চাইনে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙ্গবে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেকদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব—আমার হোল না, আমার হৃদয় ভরল না।

কিন্তু ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি—তবু বলা যায় না,—শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাইতো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন—তাঁর প্রেমের ডাক—যদি শুভক্ষণ আসে, যদি শুনতে পাই! সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি—এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলেনি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। "অসতো মা সদগময়" সত্যকে চাই। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার ধারা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী তটিনী দাস এম-এ

বর্ত্তমান যুগে রাজনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনার পরেই যে বিষয়ে আলোচনার প্রাধান্য লক্ষিত হয় তাহা স্ত্রী-শিক্ষা। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও নিত্যই হইতেছে বলিয়া, এই প্রসঙ্গের কিছু বলিতে গেলেই পুনরাবৃত্তি-দোষ অনিবার্য্য।

সহশিক্ষা ভাল কি না, নারী এবং পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয় এক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কি বিভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত অথবা শুধু গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ইত্যাদি বহু বিষয়েই বহু প্রবন্ধ লিখিত ও পঠিত হইয়াছে এবং এই সকল আলোচনা শুধু যে বচন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা যথার্থ কায কিছুই হয় নাই, একথাও সত্য নহে, কারণ গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বহু বিস্তার লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবু,—স্ত্রী শিক্ষার এই দ্রুত প্রসারের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও আজ একটী কথা মনে উদিত হইতেছে যাহা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবার ও স্মরণ করাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

লাটিন ভাষায় একটী ছোট নীতিবচন আছে যাহার অর্থ Hasten slowly অর্থাৎ ধীরগতিতে দ্রুতগামী হও। কথা দুইটী আপাতশ্রুতিতে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু সমগ্র বাক্যটীর অর্থ সুগভীর।

প্রগতির মত্ততায় আমরা দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্যভাবে অতীতকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হই এবং নিজস্ব সকল সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরের অন্ধ অনুকরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দ্রুতপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকি। তাহাতে অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরিণামে উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই বেশী হইয়াছে, কারণ অতীতকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টায় অতীতের যাহা ভাল তাহাও হারাইয়া যায়। এই জন্যই, প্রগতির মধ্যে সঙ্গতি না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহা[illegible] অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অধোগতি। ইহা অপেক্ষা, যিনি সম্য[illegible] পর্য্যালোচনার দ্বারা অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যাহা কল্যাণকর তাহার সযত্ন সংরক্ষণ পূর্ব্বক ধীরতার সহিত পরীক্ষিত পদক্ষেপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হন, আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার গতি মন্থর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনিই উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। সেই হেতু, প্রকৃত পক্ষে, প্রগতির পথে তাঁহার গতিই দ্রুততর।

আজ যে পুণ্যবতী মহিলার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার চরিত্রে এই নীতি[illegible] প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ যেমন প্রবল ছিল, ভারতের নারীর প্রাচীন আদর্শেও তিনি তেমনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। Progress with Conservation সংরক্ষণের সহিত সংস্কার—ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের মূল [illegible] ছিল।

সেই সৌভাগ্যশালিনী রমণী নিজের মন্ত্রসাধনের [illegible] হইতেও বঞ্চিত হন নাই, কারণ যাঁহাকে তিনি তাঁহার জীবন সঙ্গিরূপে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনেও এই একই আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া বহুকাল বিদেশে অবস্থান করিয়া এবং যে চাকুরীতে প্রবেশ করিলে একান্তরূপে প্রতীচ্য প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া অনিবার্য্য বলিয়া জনসাধারণের ধারণা, দীর্ঘকাল তাহাতে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও সেই মহানুভব ব্যক্তি কিরূপ স্বদেশের প্রতি সত্য থাকিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নয় এবং আমাদের দেশের [illegible] প্রায় গৌরব প্রাচীন নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পকে স্বস্থানে [illegible]

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার বিরামবিহীন প্রচেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বর্ত্তমান যুগে যখন আমরা প্রগতির উন্মাদনায় মত্ত হইয়া অন্ধবেগে ধাবিত হইতেছি, এই মহিমময়ী নারীর জীবনালোচনা যদি আমাদিগের চঞ্চলগতিকে কিয়ৎ পরিমাণেও সংযত করিতে সক্ষম হয় তবেই তাঁহার এই সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন সার্থক হইয়া উঠিবে,—নচেৎ, নিষ্ফল এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, অর্থহীন এই স্মৃতিপূজা। *

* সরোজনলিনীর পঞ্চদশ স্মৃতিবাসরে পঠিত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

সর্ব্বাগ্রে স্মরিয়া প্রাতঃ স্মরণীয়া
সরোজনলিনী নাম
আজ পুণ্য তিথি কার্যে হও ব্রতী
তাঁহারে কর প্রণাম।
সুদূর হইতে যাঁহার আহ্বানে জাগায় প্রেরণা প্রতি প্রাণে প্রাণে
কেন্দ্রীভূতা যিনি বসি যোগাসনে উজলি স্বরগ ধাম,
তাঁহারে কর প্রণাম।
জাগো জাগো ওগো বঙ্গবাসিনী!
ঘুমায়ে থেক না আর,
কোলে মরে ছেলে জঠর জালায়,
মরে পতি দুঃখে রজ্জু গলায়
সাজে কি সুপ্তি হেন অবেলায়
খোল গো কুটীর দ্বার!
পল্লীর বধূ পল্লীর মেয়ে
উঠ, উঠ সবে দেখ চেয়ে, চেয়ে,
রিক্ত হস্ত দারুণ অভাব
ক্ষিপ্ত মানব রুক্ষ স্বভাব
পতি-পুত্রদের হেরি এই ভাব
থেক না তোমরা নীরব হয়ে।
অলস অবশ দেহ মন নিয়া
লুকায়ে থেক না আর—
নাবিয়া আইস মুক্ত প্রাঙ্গণে
খুলিয়া কুঠীর দ্বার;
চারিদিকে শুন বিষাদের গীতি
নাই সে আনন্দ নাই আর প্রীতি,
অযুত কণ্ঠে উঠিতেছে নিতি
দেশ ব্যাপী হাহাকার,
রমণীর প্রাণে এ দারুণ গানে
সুর বাজে নাকি বেদনার?
তাই বলি আয় সকল ভগিনী
ধরিয়া হৃদয়ে বল,
অই দেখ রাজে সুনীল নীলিমা,
জাগিছে ভাস্কর হাসিছে চাঁদিমা,
ডুবিবে কি শুধু নারীর গরীমা
বঙ্গের যা সম্বল?
উদরে আমরা পাই না অন্ন
হৃদয়ে পাই না তৃপ্তি
লুপ্ত মোদের গৌরব আজি
নারীর উজল দীপ্তি।
বিলাসিতা ডোরে বাঁধিয়া নিজেরে
লভিয়াছি এই সুপ্তি,
কুড়েমি করেই গড়িয়াছি মোরা
পাব কিরে আর মুক্তি,
আয় দেখি মিলে সকল ভগিনী
করে দেখি সেই যুক্তি।
আমরা ত নই জড় পদার্থ
মানুষ মোদের নাম—
রক্ত মাংসে গড়া এই দেহ
বিশ্ব-কর্ম্ম ধাম
চেতনা বিবেক দিয়াছেন বিধি
চুপ করে কেন রব নিরবধি
সাধ্য শক্তি করিব প্রয়োগ
বাঁচাতে নিজের মান
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগিনী
হও সবে আগুয়ান।
দিন রাত খেটে এই দীন দশা
করিব আমরা দূর
ভর্ত্তার প্রাণে জাগাব উৎস
শিক্ষা ভূষণে সাজাব বৎস
কন্যারে দেব উৎসাহ আশা
হাসাতে অন্তঃপুর;
জগতের কাজে দেহ মন প্রাণ
পারি যেন মোরা দিতে বলিদান
এই আশীর্ব্বাদ কর ভগবান,
কর প্রাণ ভরপুর।

প্রেম ও পাষাণ

শ্রীকণা দত্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রাজবাটীর উদ্যান)

আকাশের পৃথিবীতে নিবিড় সন্ধ্যা নামিয়াছে। মহারাজ অম্বরীষ উদ্যানের একখানি আসনে শ্রান্ত ভাবে বসিয়া আছেন। সভাকবি রঞ্জন তাঁহার সামনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

অম্বরীষ। সে বোধহয় আমায় ঘৃনা করে গেল, না রঞ্জন ?

(কণ্ঠস্বরে নিবিড় বেদনা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।)

করবেই তো! নিষ্ঠুর নির্ম্মম পিতা তার।

(ক্ষনেক থামিয়া পরে বলিলেন)

কবি! অকারণেই তাকে নির্ব্বাসন দিয়েছি; ঘৃণা তো করবেই।

রঞ্জন। না রাজা, সে এখনও আপনাকে ভালবাসে। যাবার আগে আমায় বার বার করে বলে গেল, "রঞ্জন, আমার পিতাকে দেখো ভাই, বড় অসহায় তিনি।"

অম্বরীষ। বলে গেলো; বলে গেলো সে এই কথা; এ কী তুমি সত্যি বলছ রঞ্জন ?

রঞ্জন। হাঁ প্রভু! আরও বলে গেলো, এত ধর্ম্ম এত ন্যায় সে আর কোথাও দেখেনি।

(অম্বরীষ দুইহাতে নিজের মাথার চুলগুলি মুঠা করিয়া ধরিলেন। বেদনাপ্লুত কণ্ঠে কহিলেন)

অম্বরীষ। ধর্ম্ম। ন্যায়! ইচ্ছে হোচ্ছে ধর্ম্ম ন্যায় আর এই রাজ্যের বদলে শুধু আমার কেতুকে ফিরে যদি পেতেম আমার বুকে।

বিধায়ক কি বলেছিলেন জানো? কেতুকে না তাড়ালে আমার সুখের পৃথিবী নাকি ছারখার হয়ে পুড়ে যাবে!

(দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

শশ্মান! শশ্মান! আমার পৃথিবী শশ্মান হয়ে গেছে কবি! শুধু আমার কেতু নেই বলে। আমার কেতু; আমার একটি মাত্র সন্তান!

(গভীর স্বরে) আজ তার এ রাজ্যের রাজা হবার কথা সেই গৃহবিতাড়িত লাঞ্ছিত আশ্রয়হারা; না জানি কত ক... সয়েই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ রাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হয়ে হয়তো একমুষ্টি অন্নভিক্ষা করে দ্বার হতে দ্বারান্তরে বিতাড়িত হয়ে ফিরছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কবি,—রহস্য যবনিকার ঘন অন্তরালে, রাণীর চোখের দৃষ্টি ম্লান আর ব্যথাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে

রঞ্জন। কিন্তু, সে এমনি ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতো রাজা।

রাজার রাজদণ্ড আর সিংহাসন তার কাছে একটা শাস্তির সামিল বলে মনে হোতো। বড় কোমল বড় উদাসীন ছিল তার প্রকৃতি!

ভবিষ্যতের রাজার উপযুক্ত মনোবৃত্তি কী তার ছিল রাজা? আমার তো তা মনে হয়না।

(দ্রুতবেগে বিধায়ক প্রবেশ করিলেন)

বিধায়ক। ভাবতে পারো রাজা? ধারনা করতে পার তোমার পুত্র নির্ব্বাসিত হয়ে কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে?

(রঞ্জনের চকিত ভীত চাহনি)

রঞ্জন। লোকে অনেক মিথ্যা সংবাদও প্রচার করে থাকে আচার্য্য।

বিধায়ক। আবার সেই অকারণ ধৃষ্টতা! এ কথা মিথ্যা নয়। আমার প্রেরিত লোক নিজচোখে দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করে এসেছে

(পুনরায় রাজার পানে আগাইয়া আসিলেন]

ভেবে ঠিক করতে পারো মহারাজ?

অম্বরীষ। না আর্য্য, সে কোথায়—যদি একবার শুধু সেই সন্ধানটুকু পেতাম।

(কপালে করাঘাত করিলেন)

আমার রাজ্য, ধর্ম্ম, ন্যায় নিষ্ঠার সব কিছু দূরে ছুড়ে ফেলে শুধু আমার প্রাণাধিক কেতুকে বুকের ভেতর নিবিড় করে চেপে ধরতাম।

জানো রঞ্জন। মৃত্যুকালে রানী আমার হাতেই তাঁর নাড়ীছেড়া ধনটাকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন পরম বিশ্বাস ভরে, আর আমি কিনা—আর আমি কিনা—

(মাথা নাড়িতে নাড়িতে আসনে অপ্রকৃতিস্থ ভাবে বসিয়া পড়িলেন

বিধায়ক, আমার সুখের পৃথিবী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে।

বিধায়ক। (দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন)

হয়েছে কী আরো হবে, তোমার শস্যশ্যামলা রাজ্যে একটী অঙ্কুর ও বেঁচে থাবেনা জেনো। নাস্তিক এক ভণ্ড, শাস্ত্রের বচন বেদবিধি লঙ্ঘন করে যে, দেব দ্বিজ ব্রাহ্মণ গুরুকে যে উপেক্ষার চোখে দেখে, তোমার পুত্র তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। দেবতার প্রীত্যর্থে যে বলিদান অর্পণ করা হয় তার যে ভণ্ড বিরোধী, তোমার পুত্র তারই পরম সেবক হয়ে উঠেছে রাজা।

(ক্ষণেক থামিয়া)

আর শুধু তাই নয় অম্বরীষ—

আমার পালিতা কন্যা বনশ্রীকে পর্যন্ত প্রবুদ্ধ করে সেই প্রতারক নাস্তিকটা সঙ্ঘবিহারে টেনে নিয়ে গেছে।

বিশ্বাস হয় রাজা?

অম্বরীষ। কি জানি আমার জীবনে আবার কোন দুঃস্বপ্নের ছায়া ক্ষেপন করতে আপনার এ আগমন আর্য্য।

কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে

বেশ বলুন, কী হেতু আপনার আগমন।

বিধায়ক। কেন আগমন? তা কী বুঝানো প্রয়োজন নাকি? তোমার রাজ্য তোমার দেবালয় হতে দেবতার সেবাদাসী লুণ্ঠিত হচ্ছে আর সেই নাস্তিকটার ভক্ত সংখ্যা দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে। মহারাজ অজাতশত্রু তোমার পরম বন্ধু—একথা জানলে, কী হবে অনুমান করতে পার রাজা?

(অম্বরীষ কপাল টিপিয়া ধরিলেন)

অম্বরীষ। অজাতশত্রু! একমাত্র অজাতশত্রুর বন্ধুত্বের অনুরোধে এ রাজ্যে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি, আমার জীবনের প্রধানতম সর্ব্বনাশ এই যে শুধু তারই অনুরোধে আমি আপনাকেই প্রধান পুরোহিতের সম্মানিত পদে বরণ করে নিয়েছি।

সেই অজাতশত্রুরই অনুরোধে আমার রাজ্যের সীমানায় বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখলে যন্ত্রনায় পীড়িত করে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। অনেক অত্যাচার করেছি কিন্তু কেন করেছি কে জানে। নির্দ্দোষীদের অযথা পীড়ন করেছিলেম বলেই বোধহয় আমার এই দশা। মনে পড়ে রঞ্জন? একদিন অনাথপিণ্ডদকে খুটির সঙ্গে বেঁধে তার সামনে একসঙ্গে কুড়িটি ছাগবৎস বলি দিয়ে অকারণেই ঘরে ঘরে ছাগমাংস বিতরণ করেছিলাম।

—যন্ত্রণায় তার মুখ পাংশু পাণ্ডুবর্ণ ধরণ করেছিল। তার মুখের সামনে অট্টহাসি হেসে তার সেই কোমল করুণাকে শ্লেষের ফুৎকারে ছিন্নবিছিন্ন করে দিয়েছিলাম অকারণে—হুঁা। অকারণেই কত নিষ্ঠুর কায যে করেছি, তাইতো আজ আমার সোনার পৃথিবী পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো।

—আর ভাল লাগেনা রঞ্জন! নির্জ্জন বনে প্রাণপণে শুধু সেই পরমব্রহ্মের ধ্যানে জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে অতিবাহিত করে যাবো, মনে এই আশা ছিল, ছিল আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু—কিন্তু এই কঠোর দায়িত্বভার, এই রত্নখচিত সোণার শৃঙ্খল কে আর গ্রহণ করে আমায় অব্যাহতি দেবে? যে ছিলো সে তো আজ নেই।

(বিধায়ক অস্থির হইয়া উঠিলেন)

বিধায়ক—নিজের সুখ দুঃখই যে একমনে গেয়ে চলেছে রাজা। কিন্তু আমার?

আমার অভিযোগের কী মীমাংসা হলো?

অম্বরীষ—অভিযোগ। অভিযোগ। বৌদ্ধভিক্ষুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দেবতার অপমানের অভিযোগ। রাজকুমার, ভবিষ্যতের রাজা যে, তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ। অভিযোগের আপনার আর শেষ নাই আচার্য্য।

(বিধায়কের কণ্ঠে তীব্র আক্ষেপ বহ্নি ফুটিয়া উঠিল)

বিধায়ক—অকস্মাৎ জীবনে এত বৈরাগ্য ঘনিয়ে উঠল, ব্যাপারখানা কী অম্বরীষ। সেই জালিয়াৎ শয়তানটার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ? (রঞ্জন বিধায়কের এরূপ অভদ্র ব্যবহারে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন)

রঞ্জন—ঢের ঢের মানুষ দেখেছি আচার্য্য ! কিন্তু আপনার মত এমন মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বনাশ জীবনে দেখি নাই।

(ত্বরিত গতিতে রঞ্জন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন) (তাঁহার গমন পথের পানে চাহিয়া ক্রুদ্ধচোখে বিধায়ক মুষ্টিবদ্ধ করিলেন।)

বিধায়ক—অর্ব্বাচীন, বেয়াদপ, রাজপুরোহিতকে কতখানি সম্মান দিতে হয় সে বুদ্ধিটুকুও আজ পর্য্যন্ত ধাতে যোগাল না !

হবেনা কেন ? কার প্রিয় বন্ধু ?

অম্বরীষ—যাকে গৃহহারা করে পথে নির্ব্বাসিত করেছেন, অকারণে কেন তাকে টেনে আনা ?

বিধায়ক—নির্ব্বাসিত করেছি; তবুও তোমার পুত্র আমার পথ ছেড়ে দাঁড়ায়নি রাজা ! আমার কন্যা, শুধু তাই নয় দেবতার সেবাদাসীকে তার মহালক্ষ্যব্রত থেকে ভ্রষ্ট করে বিপথে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে এর প্রতীকার কর অম্বরীষ।

(অম্বরীষ মাথা নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

অসম্ভব ! আমার পুত্র সে রকম নয়। এ আপনার মিথ্যা সন্দেহ বিধায়ক! আপনার কন্যা যদি সেখানে গিয়েই থাকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বেচ্ছায় গিয়েছে।

বিধায়ক—আমার কথা মিথ্যা যদি প্রতিপন্ন হয় রাজা আমার এ অভিযোগ মিথ্যা, যদি বনশ্রী নিজের মুখে স্বীকার করে যে স্বেচ্ছায় সে আমার পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে গেছে, বিধায়ক জীবনের মত তোমার এ রাজত্ব ছেড়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যাবে। এই তার প্রতিজ্ঞা অম্বরীষ ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার মূল্য আছে জেনো।

অম্বরীষ—কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে বিধায়ক ?

বিধায়ক—তোমার লাভ ? নিজমুখে কুমারের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা আমি তুলে নেবো রাজা।

যদি আমার কথা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়, তোমার পুত্রকে তুমি আবার ফিরিয়ে পাবে। আমার সমাপ্ত মান সম্ভ্রমের পরিবর্ত্তে এই সর্ত্ত রইলো অম্বরীষ। আমি চল্লেম। অবিলম্বে যেন এ সন্দেহ ভঞ্জনের উপযুক্ত আয়োজন হয়।

আমি যাবো, তুমি যাবে, আমার শিষ্য পার্থসারথি ও যাবে। কিন্তু দেখো ঐ সভাকবি বেয়াদবটা যেন না যায়। ওকে দেখলে কী জানি কেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে।

(প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে করিতে আবার ফিরিয়া আসিলেন) অবিলম্বে যাত্রার উদ্যোগ কোরো রাজা, এর ফলাফলে আমার সততা আমার মান সম্ভ্রম নির্ভর করছে জেনো।

(চলিয়া গেলেন)

(অম্বরীষ আসনে বসিয়া পড়িলেন)

অম্বরীষ—সে বেঁচে আছে এই টুকুই পরম সান্ত্বনা। তার আশ্রয় জুটেছে।

সপ্তম দৃশ্য

জেতবনের সঙ্ঘবিহারে সন্ধ্যা নামিয়াছে। সঙ্ঘবিহারে উদ্যানে একটী বৃক্ষমূলে ভগবান গৌতমবুদ্ধ ধ্যানস্থ, পদ্মাসনে বসিয়াছেন। এক হস্ত কোলের উপর ন্যস্ত। অপর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ও তর্জ্জনী যুক্ত বাকী অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত এই মুদ্রা আঁকিয়া স্বস্তিবাচন ও শান্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। এমন সময়ে একটী নারী আসিয়া চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিল। গৌতম চোখ বুজিয়াই ছিলেন কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নারীটি ধীরস্বরে সম্ভাষণ করিল)

নারী—প্রভু !

(তথাগত নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিলেন)

বুদ্ধ—কী তুমি চাও বৎসে ?

(প্রশান্ত দুই চোখের দৃষ্টি হইতে অপরূপ দিব্য জ্যোতি, জ্ঞানের তীক্ষ্ণ আলো ও শান্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে)

(নারী মুহূর্ত্তকাল সেই অপরূপ জ্যোতির পানে স্থির অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি সুষমায় তাহার জীবন মন যেন অকস্মাৎ ভরিয়া গেল। নারী আবার আনত হইয়া তথাগতের চরনতলে প্রণাম রাখিলেন)

নারী—পেয়েছি প্রভু ! আমার জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের মীমাংসা আজ আপনারই চোখের আলোয় খুঁজে পেয়েছি। কী জ্ঞান কী শান্তি কী জ্যোতি। জীবন আমার জুড়িয়ে গেল প্রভু ! এ অভাগিনী পুরোহিত বিধায়কের আজন্মের পালিতা কন্যা বনশ্রী গোপালের চরণে চির উৎসর্গীকৃতা সেবাদাসী।

প্রভু! কিন্তু অশেষ কারনে মনের সম্পূর্ণ শান্তি হারিয়েছি। অপরাধিনী আমি আমার আরাধ্য দেবতার পাদপীঠ স্পর্শেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য। মনে শক্তি নাই জীবনে নাই শান্তি। শুনেছি দোষী নির্দ্দোষীর দুঃখী অনাথ পাপী পূন্যবানের একমাত্র আশ্রয় আপনার কাছেই কোন ভেদাভেদের বা উচ্চনীচের ব্যবধান নেই।

আশ্রয় দিন মহান! আপনার ত্যাগে আপনার পুন্যে, এ অভাগিনীর যত কলঙ্ক আজ স্খালন হয়ে যাক্ পিতা!

বুদ্ধ। তুমি কে; কী তোমার পরিচয় তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বৎসে, শুধু জানি তুমি মানুষ। মানবরূপে যে পৃথিবীতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তুমিও সেই রূপ নিয়ে সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি আমি সব এখানে সমান। কিন্তু, এ পৃথিবীর মানুষ বড় দুঃখী, বড় অসহায়! পদে পদে দুঃখ বেদনা, শোক, জরা মৃত্যু, তাপ, যন্ত্রণার উৎপীড়ন মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে—দগ্ধবিদগ্ধ করে। হিংসা, দ্বেষ, অন্যায় অধর্ম্মে মানুষ অসহায় ভাবে জড়িত হয়ে নরকের ক্লেদময় পঙ্কিল জীবন যাপন করে। তারা জানে না সত্যের পরম সন্ধানে কত শান্তি; কত অনির্ব্বচনীয় সুখ, অনন্ত মোক্ষ। সে সুখের শেষ নেই বৎসে; ছেদ নেই তাতে। মানুষ আর সেখানে অসহায় নয়, ক্লান্ত পঙ্গু নয়। সেখানে প্রতিপদে ব্যর্থতা অপমানে, মানুষকে অসহ্য দুঃখের দহনে জর্জ্জরিত হতে হয় না ধূলায় ধূসরিত দেহ নিয়ে স্বপ্ন সুখ কামনার আশায় সেখানে দূর দিগন্তের পানে ভিখারীর মত চেয়ে থাকতে হয় না? এ দুঃখ-জ্বালাময়ী ধরণীর প্রতিটী ব্যর্থ জীবন সেখানে উজ্জ্বল সোনার রেখায় ফুটে উঠবে; শান্তি সেখানেই বৎসে। দুঃখের নির্ব্বাণ শেষে অনন্ত মুক্তির সান্ত্বনা। তুমি আশ্রয় নাও?—সঙ্ঘমিত্রা—সঙ্ঘমিত্রা!

(সঙ্ঘবিহারের অভ্যন্তর হইতে সুকৃষ্ণা বাহির হইয়া আসিলেন। পরিচ্ছদ ভিক্ষুনীর বেশ, পূর্ব্বেকার সে লীলা-চপল কলরোল-উচ্ছাস শান্ত সমাহিত স্তব্ধতায় এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে) (অকস্মাৎ বুদ্ধদেবের চরণতলে নতজানু বনশ্রীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন)

সঙ্ঘমিত্রা—এ কী বনশ্রী, তুমি এখানে?

(বনশ্রী মৃদু প্রশান্ত হাসি হাসিলেন)

বুদ্ধদেব—কয়েকদিন পূর্ব্বে যে পথিক আশ্রয় প্রার্থনায় এসেছিলেন, তাঁকে কী দীক্ষিত করা হয়েছে, সঙ্ঘমিত্রা?

সঙ্ঘমিত্রা—না প্রভু! আগামী কোজাগরী পূর্ণিমায় আপনি নিজে কার্য্য সমাধা করবেন, ব্যবস্থা এইরূপই হয়েছে ভগবান।

বুদ্ধদেব—সঙ্ঘের নিয়মানুসারে এই নবাগতাকে একটা নূতন নাম দাও সঙ্ঘমিত্রা? আর একে বিহারের অভ্যন্তরে নিয়ে যাও।

সঙ্ঘস্থবির অতীশ যেন একে শূন্যবাদ এবং অহিংসা মন্ত্রের বাণী শোনান।

(সুকৃষ্ণা বনশ্রীর হাত ধরিলেন)

সঙ্ঘমিত্রা—নবনীতা! তুমি নূতন এসেছ কিনা তাই তোমার নাম হোক্ নবনীতা। শুনে আশ্চর্য্য হবে, রাজ কুমার রূপকেতুও শ্রীজ্ঞান নাম গ্রহণ করে এখানের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রই তাঁর দীক্ষা হবে।

(বনশ্রীর মুখে বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল)

বনশ্রী—জানি সুকৃষ্ণা, শুধু আমারই জন্যে, অকারণে তিনি আজ তাঁর নিজের রাজ্য হোতে নির্ব্বাসিত। আমার অপরাধের আর সীমা নাই।

বুদ্ধদেব। ভুল বৎস, এ জগতে কেহই কাহারও দুঃখ ভোগের নিমিত্ত দায়িক নয়। জন্ম হতে জন্মান্তরে ঘুরে ঘুরে মানব তার নিজেরই বিগত জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করে।

সঙ্ঘমিত্রা, অনাথ পিণ্ডদ, আনন্দ প্রভৃতিকে সংবাদ দাও। আমার ধ্যান সমাপ্ত হয়েছে। এ ক'দিনের কার্য্যাবলীর বিবরণ চাই। কত আহতকে সেবা করা হয়েছে। কত তণ্ডুল বিতরণ করা হয়েছে?

সঙ্ঘমিত্রা—যে আজ্ঞা প্রভু?

(বনশ্রীকে লইয়া বিহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন)

(তাঁহারা আড়ালে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, অনাথ রূপকেতু এবং আরও কয়েকজন ভিক্ষু আসিয়া বুদ্ধের চরণে প্রণাম নিবেদন পূর্ব্বক ভূমিতলে আসন গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুদের সকলেরই মুণ্ডিত মস্তক, ও গৈরিক বেশ। রাজ-কুমার রূপকেতু শুধু সাধারণ নাগরিকের বেশে সজ্জিত)

(বুদ্ধদেব হাতের শান্তিমুদ্রা দেখাইয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। মুখে সদা প্রসন্ন মধুর হাসিটী ফুটিয়া উঠিল)

বুদ্ধ—মঙ্গল তো ?

অনাথপিণ্ডদ—হাঁ প্রভু। আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

বুদ্ধ—তণ্ডুল, বস্ত্র ?

আনন্দ—সমান অংশে গৃহে গৃহে বিতরণ করা হয়েছে প্রভু।

বুদ্ধ।—আচার্য্যকে বোলো একসঙ্গে দুইটী জীবন সেদিন অমর মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে। শ্রীজ্ঞান তুমি। আর একটী নবাগতা নারী সঙ্ঘ নিয়ম অনুসারে তাঁর নাম নবনীতা। সঙ্ঘমিত্রা এ নাম ঠিক করেছেন।

রূপকেতু এ কথার উত্তরে আর একবার প্রণাম করিলেন)

রূপকেতু—স্নেহে ধন্য হলাম প্রভু।

(ধীর পদক্ষেপে অম্বরীষ, বিধায়ক ও পার্থসারথি প্রবিষ্ট হইলেন। অম্বরীষ ক্লান্ত, পার্থসারথি অন্যমনস্ক বিধায়ক বজ্র সঞ্চিত মেঘের মত নিরুদ্ধ ক্রোধে স্তব্ধ।)

ইহাদের আসিতে দেখিয়া শিষ্যগণ একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, সমবেত কণ্ঠে গভীর সুরে বাজিয়া উঠিল—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি!"

বুদ্ধদেব – নিমীলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন

'অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময় ?"

শিষ্যগণ আবার আবৃত্তি করিলেন

"সমবেত কণ্ঠে" "অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময় ?"

বুদ্ধদেব—আবৃত্তি করিলেন,

শূন্যতা বোধিতে বীজং
বাজাদ বিম্বং প্রজায়তে
বিম্বে চ ন্যাস-বিন্যাসম্
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রতীত্যজম্॥"

শিষ্যগণ গাহিলেন

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি॥"

(বুদ্ধদেব চোখ খুলিলেন—সম্মুখে আগন্তুকদের দেখিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন)

মধুর হাসিতে মুখখানি ভরিয়া গেলো ; ধীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন)—

বুদ্ধ—প্রয়োজন ?

(বিধায়ক ধম্‌কাইয়া উঠিলেন)

বিধায়ক—প্রয়োজন নয়, অভিযোগ !

(অনাথপিণ্ডদ আগাইয়া আসিলেন)

অভিযোগ! কিসের অভিযোগ ?

(বিধায়ক রূপকেতুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন।

বিধায়ক—আমার কন্যাকে আশ্রয়চ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত করে এনে এখানে উপনীত করেছে। হীন চরিত্র লম্পট !

বুদ্ধদেব—রসনা সংযত করুন ভদ্র! আপনার কন্যা! আপনি কি বিধায়ক ?

বিধায়ক - বিধায়ককে চেনোনা ?

(আনন্দ আগাইয়া আসিলেন)

হাঁ প্রভু, ইনিই বিধায়ক। আমি এঁকে চিনি।

বিধায়ক—তা আর চিনবে না ? খড়মের দাগ যে এখনও কপালে আঁকা আছে।

অন্যতম শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ, আপনারই স্নেহের দান ওটা।

বিধায়ক কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিলেন।

(অম্বরীষ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন)

অম্বরীষ—রূপকেতু !

রূপকেতু এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রূপকেতু মহারাজ!

(রাজাকে প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইতেই বিধায়ক বাধা দিলেন)

—এখনও কুমার নির্ব্বাসিত রাজা। সম্ভাষণ করা অনুচিত।

কুমার! আমার কন্যা কোথায় ?

রূপকেতু -সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ আচার্য্য।

বিধায়ক মুখ ভেঙ্গাইয়া উঠিলেন।

বিধায়ক—অজ্ঞ? ন্যাকা!

বুদ্ধদেব—আপনার কন্যা এখানেই আছে ভদ্র! সে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে।

বিধায়ক—মিথ্যা কথা, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা!

(বুদ্ধদেব অনাথপিণ্ডদকে বলিলেন)

বৎস! সঙ্ঘমিত্রাকে ডেকে দাও।

অনাথপিণ্ডদ—যে আজ্ঞা প্রভু!

(অনাথপিণ্ডদ চলিয়া গেলেন)

(ক্ষণপরে সঙ্ঘমিত্রা আসিলেন। ভগবানকে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন)

—ভগবান্ কি আদেশ?

(বিধায়ক দন্তে দন্ত নিপেষিত করিলেন, হাত মুষ্টিবদ্ধ)

ভগবান্ ভগবান্! না শয়তান্?

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া সিদ্ধার্থ হাসিলেন।

বুদ্ধ—অত অধীর হচ্চেন কেন ভদ্র? সঙ্ঘমিত্রা, নবনীতাকে আনো।

(সঙ্ঘমিত্রা চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে বনশ্রীকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন।

বিধায়ক—দুশ্চারিণী! আরাধ্য দেবতার পূজা ত্যাগ করে—শেষ পর্য্যন্ত এত অধঃপতন! এক যুবকের মোহে পড়ে তুই দেবতাকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে বাইরের পথে পা দিলি?

বনশ্রী—অধঃপতন নয় পিতা! এতদিনে আমি জীবনের মুক্তি মন্ত্রের অপূর্ব্ব তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। আমি বুদ্ধের চরণে শরণাগত পিতা! আগামী পূর্ণিমায় আমি দীক্ষা নেব।

অম্বরীষ—কে তোমায় এই অচিন বিদেশীদের আবাসে আস্‌তে প্রবুদ্ধ করেছে মা?

সে কি আমার পুত্র রূপকেতু? বল মা, তোমার ধর্ম্ম তোমার দেবতা সাক্ষী করে আজ এই সত্যটুকু সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার কর বনশ্রী! আমার জীবন, আমার পুত্রের সম্মান এর উপর নির্ভর করছে মা, সত্য বল মা! মিথ্যা নয়। যা যথার্থ তাই বল।

বনশ্রী—আগাইয়া আসিলেন (হাত জোড় করিলেন) আমার ধর্ম্ম সাক্ষী, যাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছি সেই ভগবান সাক্ষী, রাজকুমার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

স্বেচ্ছায় একাকী গভীর রাত্রে আমি মন্দির-দেবতাকে ত্যাগ করে এসেছি।

এমন কি, কুমার যে এখানে আছেন, সে কথাও সেদিন আমার নিকটে অবিদিত ছিলো।

বুদ্ধদেব—এ কথা সত্য বিধায়ক।

বিধায়ক—চুপ কর তুমি! তোমার মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করতে আমি এখানে আসিনি; এসেছি তোমার লাম্পট্যের লীলার নিদর্শন দেখতে। জ্ঞান সত্য আর ধর্ম্মের নামে পরের নারী হরণ করে এনে, দিনের পর দিন যে বিষময় বাষ্প বিষ আকাশ বাতাস ভরে ছড়িয়ে দিচ্ছ তুমি, সেই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে আমার এখানে আগমন। হাঃ হাঃ সিদ্ধার্থ, ঐ গৈরিক বেশ আর জটার জটিলতা যদি রাজপুত্রের লাম্পট্যদোষ ঢেকে দিতে পারতো, তবে সেই পাপে সাগর শুকিয়ে যেতো আজ। হিমাচল হয়ে যেতো সমতল। অসম্ভব! পাপ কখনো লুক্কায়িত থাকেনা। তাই আজ ধরা পড়েছ।

বনশ্রী, বল সত্যি করে, কে তোকে এখানে এনেছে?

বনশ্রী—আমি নিজেই এসেছি, পিতা।

বিধায়ক—তুই! তুইও শেষ পর্য্যন্ত আমাকে প্রতারণা করলি!

(মাথার চুল টানিয়া ধরিলেন) আমার সব গেলো। যে দেবতার প্রীতির জন্যে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমার কন্যা, আমার জীবন উৎসর্গ করলাম, যার প্রেমের গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে রাজা অম্বরীষের সঙ্গে আমার মান সম্ভ্রম, ব্রাহ্মণের সততা পর্য্যন্ত পণ রাখলাম, আমার মান কি তিনিও রাখলেন না? জগৎ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পদে পদে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে অপমানে ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ করে জর্জ্জরিত করে তুলেছ।

কিন্তু! (আকাশ পানে চাহিলেন) দেবতা আমার আমার সর্ব্বস্ব! তুমিও এ দুর্দ্দিনে আমার মান রাখলে না?

আমার সব গেলো। মান সম্ভ্রম, সততা, আমার দর্প, আমার তেজ সব আজ মাটীতে গুঁড়ো গুড়ো হয়ে মিশে গেলো।

(বনশ্রী আসিয়া পায়ে পড়িলেন)

বনশ্রী—আমায় ক্ষমা করুণ পিতা, আমার আবার আপনি গ্রহণ করুণ। যে জীবন আপনিই একদিন নিজ হাতে গ্রহণ করে আদর যত্নে বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট করে তুলেছেন, নিজের যত কষ্টই হোক্, সে জীবন আবার আপনার পায়েই সঁপে দিলাম।

বিধায়ক—দূর হ' দুশ্চারিণি, তোর মুখ দর্শনেও পাপ। রাজা, তোমার পুত্রের নির্ব্বাসন দণ্ড তুলে নিলাম। বিধায়ক আজ হেরে গেছে! নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে হেরে গেছে। এ মুখ—নাঃ না, এ মুখ আর দেখাবো না! জগতের কোলাহল হতে এ লজ্জা নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে বিধায়ক!

(দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান, বনশ্রীও অগ্রসর হইলেন)

বনশ্রী—ক্ষমা করুণ, ক্ষমা করুণ পিতা!

সঙ্ঘমিত্রা—কোথায় যাবে ভাই তুমি? দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হবার মহাব্রতে ব্রতী হবার যে সংকল্প তোমার মনে আবার উদিত হয়েছে, মাটীর মানুষের সামান্য ক্রোধ তিরস্কারেই কি তা ধুলি ধুলি হয়ে ধরার ধূলায় মিশিয়ে যাবে ভাই?

বনশ্রী—কিন্তু! কিন্তু পিতা যে আমায় বড় স্নেহ করতেন সুকৃষ্ণা, আমি মহাপাপী! তাই তাঁর মনে কষ্ট দিলাম।

সঙ্ঘমিত্রা—যে পুণ্যব্রত, যে সেবাধর্ম্মে নিজেকে সমর্পণ করেছ, তাতেই মনপ্রাণ অর্পণ কর নবনীতা! বিশ্বের নিপীড়িত মানব জাতি, অনাদৃত দুঃখী ক্লিষ্ট অসহায় তাদেরই দুঃখকে আপনার বলে বরণ করে নাওনা ভাই। সুখ তাতেই পাবে, দুঃখকষ্ট কোথায় যাবে উড়ে! তাতেই পরম মুক্তি নবনীতা! তাতেই শুধু পরম শান্তি।

(বনশ্রী বুদ্ধের চরণে পড়িলেন)

বনশ্রী—উঃ আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেম। ক্ষমা করুণ ভগবান, সেই অপূর্ব্ব প্রেমমন্ত্রের গুণে অশেষ যন্ত্রণায় জীবনের শেষে অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় সুখের অধিকারী হবো।

বুদ্ধ—শান্ত হও বৎসে, শান্তি আপনি মিলবে।

(অম্বরীষ সরিয়া আসিয়া পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

অম্বরীষ—বুকখানা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে কেতু! অক্ষম নিষ্ঠুর পিতাকে ক্ষমা করে রাজ্যে ফিরে চল বৎস! তোমার নির্ব্বাসন দণ্ড পুরোহিত নিজ সর্ত্তে রহিত করে দিয়ে গেছেন, এবার রাজ্যভার গ্রহণ করে, আমায় মুক্তি [illegible] বৎস।

(রূপকেতু আসিয়া পিতার চরণে পড়িলেন)

রূপকেতু—যে মুক্তিমন্ত্রে একবার দীক্ষা নেবার [illegible] করেছি, তা হতে আর আমায় ফিরাবেন না পিতা। [illegible] রাজ্যই দিতে চান্, অনুরোধ করি পিতা, আমাকে [illegible] বিশ্বের আর্ত্ত অসহায়ের সেবায় তা অর্পণ করুণ [illegible] এ আমার মিনতি।

(অম্বরীষ রূপকেতুকে বুকে টানিয়া লইলেন)

অম্বরীষ—চোখ আমার খুলে দিলি আজ বৎস। [illegible] জীবন অন্যায় অধর্ম্মাচরণে অমূল্য সময় বৃথাই অতিবা[illegible] করেছি। আর নয়। আর নয়। বিনিঃশেষে আমার [illegible] আমি দিয়ে দিলেম আজ দেশের দীন দুঃখী দীর্ণ ক্লিষ্ট[illegible] সেবায়।

তারা সুখী হোক্, তারা সুস্থ হোক্, মানব জীবনে[illegible] পরিপূর্ণ সুখশান্তিতে তারা আবার বেঁচে উঠুক।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, বনশ্রী ও সঙ্ঘমিত্রা সমস্বরে [illegible] উঠিল।

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি॥

শেষ দৃশ্য

(মন্দির প্রাঙ্গণে ঘনগাঢ় আঁধার নামিয়াছে। সুষুপ্ত বনানী, নিদ্রা আচ্ছন্ন পশুপক্ষী লতাপাতা সব নিঝুম নিস্তব্ধ!

দেবতার পাদমূলে শুধু একটী ঘৃতের প্রদীপ ভীরু [illegible] শিখায় ক্ষীণ আলোক বিকীরণ করিয়া পুড়িয়া সারা হইতেছে।

পার্থ ধীর পদক্ষেপে আসিয়া দেবতার চরণে প্রণাম নি[illegible] করিলেন। পরে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিলেন।

পার্থ—বনশ্রী কোথায় চলে গেছে, আমিই কী তাকে ব্যথা দিয়ে তাড়ালাম? কিন্তু তাই বা কেন, ইমানীং আমার পানে তো সে ফিরেই চাইতোনা, নিজের মনেই সব সময় কী যেন সে ভাবতো। কেন গেলো সে কে জানে! গুরুদেব; তিনিই বা আজ কোথায় গেলেন। রাত গভী[illegible]

হোতে চল্লো তবু তাঁর দেখা নেই। কী যে তার হয়েছে সদাই অস্থির, সদাই ক্রুদ্ধ। (দেবতার পানে চাহিলেন) তোমার পূজারতি আর সুসম্পন্ন হয় না, গান শোনাবো কী? গান শুনিয়েই কী এই নির্জ্জন মন্দির প্রাঙ্গণে তোমায় জাগিয়ে রাখবো?

(নিঃশ্বাস ফেলিলেন) বনশ্রী বড় ভালবাসতো আমার গান শুনতে। এখন শুধু দেবতা, তুমিই শ্রোতা।

(গান ধরিলেন)

পার্থ— গভীর রাতে গোপনে চরণ ফেলে
এস হে দেবতা কমল নয়ন মেলে
মন্দির বেদী হতে এস হে মনে
আমার ধেয়ানে রচা সিংহাসনে
চরণের ধূলি যত ধুইয়ে দেবো
বেদনার অশ্রু ঢেলে॥
সকলে গিয়াছে চলে আমারে ছলি
আপন পথে
তুমিও কী চলে যাবে আমারে দলি
বিজয় রথে॥
তাই যদি যাও তবে যাবার বেলা
শেষ করে দিও মোর জীবনখেলা
তব বিরহের চির অন্ধকারে
একাকী যেওনা ফেলে॥

(নিশাচর পেচকের মত অস্থির পদক্ষেপে বিধায়ক মন্দিরের প্রাঙ্গনে ঢুকিলেন। হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোখ দুইটী উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে॥

(দেবতার সম্মুখে আসিয়া ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী বক্ষে তুলিয়া লইলেন)

বিধায়ক—আমার দেবতা! আমার দেবতা!
যে মাটীর রঙে রসে তোমার পূজার ফুল
এতোদিন পেয়েছে জীবন—
সে মাটীরে যেতে হবে, ছাড়ি চিরতরে—
দূরে—দূরে—বহুদূরে।
এবার তোমার পূজা হবে মোর বুকের শোণিতে,
নয়নের তপ্ত অশ্রুজলে
তোমার আরতি হবে—
আমার ক্রন্দনময় বেদনার সুরে
নিভৃত নিশীথে,
হেথা হতে বহুদূরে।

জেনো, জেনো হে দেবতা
ধরণীর প্রতি প্রাণ যদি বা বিদ্রোহী হয়
তবু জেনো,
আমি একা রবো
যুগে যুগে তোমার সেবায়
একনিষ্ঠ পূজারীর মতো
চিরকাল আছিনু যেমন।
যেথা তব অপমান—যেথা তব পরাজয়
সে স্থান নরক—
লবো এর প্রতিশোধ করেছি শপথ
জীবনের পণে॥
শাপের বাড়বানলে পুড়ে হবে ছারখার
সোনার এ দেশ
প্রতি তৃণ হবে ক্ষয়
লোকালয় হবে মরুভূমি—
শ্মশানের মতো হবে রাজ্য রাজধানী
প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে মোর।
সে দিনের আর কত দেরী,
হে দেবতা,
এখনো নীরব রবে?
অপমান অন্যায় আর অত্যাচার
সহিবে নীরব রহি?
করিবে না প্রতিকার—কোনো প্রতিরোধ?
তুমি কী পাষাণ?
বেদনা আঘাত কভু বাজে নাকি প্রাণে
এ কী অকারণ অভিমান তব?
তোমারি পূজারী আমি, তোমারে ভুলাবো।
সকলের প্রবঞ্চনা, বেদনার বাণী
আমার একার পূজা বলে;
শতেক ভক্তের স্থান
একাকী রহিব ভরি সত্য সাধনায়
শত কণ্ঠে একা গাবো তব জয়গান
তোমার শূন্যতা আর গ্লানি
ঘুচাবো একাকী আমি জীবনের পণে—
হে দেবতা, মৌন কেনো?

কেনো কথা কহিছ না অতীতের মতো ?
আমার যা কিছু আছে
সকলি করিয়া পণ
বাঁচাবো তোমায়
শুধু এ মিনতি মোর—
তোমার চরণ তলে
চিরকাল ঠাই দিও
পূজারীর রূপে।

আমার জীবনদীপ
তোমার চরণ তলে জ্বলিতে জ্বলিতে
নিবে যাবে চিরতরে—এই বর দিও,
তোমারে বাঁচায়ে যেন ধন্য হয়
মোর তুচ্ছ জীবন মরণ

(পরম যত্নভরে বিগ্রহটীকে বুকে চাপিয়া নিস্তব্ধ গহন অন্ধকারে মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া দূর নিরুদ্দেশের, রুদ্ধ তিমিরে চিরতরে হারাইয়া গেলেন)॥

—শেষ—

দ্বৈত

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

স্থির প্রান্তরের পরে পন্থ যায় দূরে,
বক্ষে তার রাঙা ধূলি অপরাহ্নকালে
সকটের চক্র লেগে মহাশূন্যে উড়ে।
পথপার্শ্বে শুষ্ক জীর্ণ অশ্বত্থের ডালে
মাত্র দুটি শ্যাম পত্র জেগে আছে যেন
মৃত্যু বক্ষে জীবনের সত্য সাক্ষ্য হেন।

ক্রমে সন্ধ্যা আসে
দিনান্তের মায়া নিয়ে পশ্চিম আকাশে।
নির্ব্বাপিত প্রায় সূর্য্য দিগন্তের ভালে
বিদায়ের হেমরশ্মি স্মিত হাসে ঢালে।
অন্ধকার আসে ধীরে—আসে তারি সাথে
সহস্র বর্ত্তিকা জ্বালি তারা-দল রাতে।
স্তব্ধ রজনীর বুকে ছন্দে বাজে গান ;
পল্লবের মর্ম্মরিত সুর অভিযান।

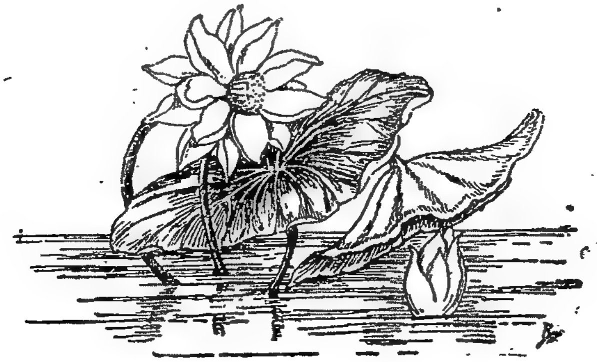

বাঙলার পাঁচালী সাহিত্য

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাঙলা দেশে ভাঙনের ও বিপ্লবের যুগ উনবিংশ শতাব্দী। মহাকালের নবীনতর লহরীলীলায় বাঙ্গালী তখন জীবনগঠনের প্রতি স্তরে স্তরে আহত হইতেছিল। কাজেই শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ও সাহিত্যের আসরে যে আমূল রূপান্তরের সূচনা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী সেই রূপান্তরিত যুগ। সেই বিরাট পরিবর্ত্তনে মহার্ঘ্য রত্ন প্রভূত পরিমাণে মিলিয়াছে সত্য, কিন্তু ঘরের যে দুর্লভ মণিকৌস্তুভসমূহ সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমরা হারাইয়াছি, আজ আবার নূতন করিয়া সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিকে চিনিতে হইতেছে—কোনও কোনও স্থলে আদৌ চিনিতে সমর্থ হইতেছি না। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের মধ্য হইতে এই ধরণের একটি অনাদৃত পরিচ্ছেদের আলোচনা করিব।

বাঙলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণ—অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তন এই অত্যল্পকাল মধ্যেই সাধিত হয়। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল কবিওয়ালা ও পাঁচালীকার বাঙলাকাব্যের ক্ষীণ স্রোত নানা খাতে ও নানা পথে প্রবাহিত করিয়া সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও পাঁচালীকার দাশরথি রায়-ই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিভাশালী সক্ষম প্রতিনিধি। ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ব্ব যুগের কবি হইলেও, তিনি পূর্ব্বযুগের সীমানির্দ্দেশক প্রাচীরের বাহিরে পা দিয়া নূতন যুগের গুরুগিরি করিয়াছিলেন।

পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াও নূতনকে জয়যাত্রার পথে উৎসাহিত করিবার তাঁহার সেই প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। দাশরথির মধ্যে নূতনের বার্ত্তা ছিল না। কিন্তু নিজের সীমানার মধ্যে পুরাতন বাঙলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমা ঘোষণাকার্য্যে সে প্রচেষ্টাকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এই পরিচয় দাশরথির সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। তিনি ছিলেন তাঁর দলের পাণ্ডা, লোকসাহিত্যের দরদী চারণ। বাঙলা দেশের মাটির সরল সহজ খাঁটী কবি। দাশরথী লোক-সাহিত্যের যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তেমন করিয়া আর কেহ পারে নাই। অপর দুইজন পাঁচালীকার সেই যুগে তাঁহার পরিপোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

দাশরথি রায়—১২১২—১২৬৪

রসিক রায়—১২২৭—১৩০০

ব্রজমোহন রায়—১২৩৮—১২৮৩

সংস্কৃত "পঞ্চালিকা" শব্দ হইতে পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি। পাঁচালী অর্থে গীতিকাব্যই বুঝায়। গীতিকাব্য বলিতে, যাহা সহজে মর্ম্মে আঘাত করিয়া প্রাণতন্ত্রীকে সুরে আলোড়িত করে ও একটা বিশিষ্ট ভাবলোকে পৌছাইয়া দেয়. এমনই আমরা বুঝি। পাঁচালীর ব্যাপক অর্থ এই গীতিকাব্য।

প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যের দীর্ঘকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী সাহিত্যের আবির্ভাব আকস্মিক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা আকস্মিক মনে হইবে না। প্রাচীন পুণ্যধর্ম্মী অপরিণত ভাবধারা অবলম্বনে ইহা একটি সমগ্র, পরিপুষ্ট, বাঙলার জাতীয় জীবনের রূপ।

সকল জাতির প্রথম অভিজ্ঞতা সাহিত্যে তাহাদের ছড়া ও গান। বাঙলা সাহিত্যে এই প্রকার ছড়া ও গানের পরই পাঁচালী সাহিত্যের প্রচলন।

এই পাঁচালীর রচনা সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধ যুগের শেষপাদে তাহার অবনতি সময়ে, যখন বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকত্ব এক দেহে জীবনলাভ করিয়াছিল ও বাঙালীর জীবনে অজস্র দেব-দেবীর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দেখা দিয়াছিল, তখন সামাজিক জীবনে সেই ধর্ম্মমঙ্গলের যুগে প্রচলিত কিংবদন্তী ও দেব-মাহাত্ম্যগুলি লইয়া খণ্ড-খণ্ডভাবে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা শনির পাঁচালী, চণ্ডী মাহাত্ম্য, ষষ্ঠীর পাঁচালী, মনসার ভাসান ও শীতলামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। ৺দীনেশচন্দ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বলিতেছেন,—"মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠি, সত্যনারায়ণ

দক্ষিণা রায়—ইঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত। বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত। ইঁহাদের ছড়া, পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। ইঁহারা সপ্তাহান্তে মাসান্তে খাঁটী বাঙালীর ঘরে পূজা পাইয়া থাকেন। এই সব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গৃহীত হইয়া কাল-সহকারে যুগে যুগে কবিগণের করস্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে।

এই সব ছড়া পাঁচালী শিশুর খেলনার ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপ উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আরম্ভ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতিবিধির একটা অপূর্ব্ব ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া 'নবশিক্ষা' লাভ করিবেন।

প্রাচীন ছড়া ও পাঁচালীগুলি বাঙলার সাহিত্যের ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ। বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রবণ জাতি—তাই তাহার সাহিত্যও সহজে ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই!

পরবর্ত্তী যুগে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্যের আমলে—শিবায়ণ, ধর্ম্ম পুরাণ ও চরিতামৃত গ্রন্থাবলী প্রাচীন পাঁচালী সাহিত্যের উন্নত সংস্করণ। এই কাব্য সৃষ্টির সর্ব্বত্রই আমরা সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। বস্তুত, সাহিত্যের উৎস বরাবরই পাঁচালী রহিয়াছে। অনুবাদ শাখার যুগে যে দুইজন মহাকবি মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর ঘরে ঘরে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, সেই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম তাঁহাদের অমর কাব্যকে পাঁচালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উপাখ্যানের শেষে কৃত্তিবাস ভনিতা দিয়াছেন,—

'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী।
রামায়ণ গাইল মার অদ্ভুত শিকলী॥'

কাশীরামের মহাভারতেও এই প্রকারের বহু ভনিতা আছে। এতদ্ভিন্ন বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাঁচালী বলিয়া পরিচিত। বটতলার সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষিত সে জনসাহিত্য এতদিন বাঙলার অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে আনন্দরস ও আদর্শ পরিবেশন করিয়া পাঁচালী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা গ্রন্থকারদের ভনিতা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উনবিংশ শতকের পাঁচালী সাহিত্য আকস্মিক নহে। যুগে যুগে কালে কালে প্রচলিত মূল উৎস শিক্ষিত পাঁচালীর পরিণত অবস্থা মাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে বাঙালীর একটা খাঁটী নিজস্ব রূপ ছিল। পাঁচালী আপামর জন-সাধারণের সাহিত্য, উহাতে পুণ্যধর্ম্মী বাঙালীমনের সুস্পষ্ট পরিচয় নিহিত। পাঁচালীকারগণ সাদাপ্রাণে সহজভাবে সাদামেঠো কথায় কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে পাণ্ডিত্যের বড়াই নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই, একেবারে সরল।

বাঙালীর প্রাণের ভাষা প্রাণের সাথে কথা কয়। ভারতচন্দ্র ও কবি রামপ্রসাদ অশ্লীলতা হইতে মুক্ত নহেন। কিন্তু উহাই কি কাব্যের যথেষ্ট পরিচয়? আর দীনেশবাবু পাঁচালীকারদের লেখায় সে অশ্লীলতা দেখিয়াছেন তাহা পল্লীআসরের শ্রোতার ক্ষণকালের কৌতুহল নিবারণ ও চিত্তবিনোদন হেতু প্রহসন রচনামাত্র, সমগ্র রচনার উহা অতি ক্ষুদ্র অংশ। কবির সৃষ্টিতে যুগ, দেশ ও পাত্রের প্রভাব থাকিবেই। 'বঙ্গবাসীর' লোকসাহিত্য-দরদী দুর্গাদাস লাহিড়ীর গ্রন্থ পাঠে উক্ত ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন,—'যিনি বাংলা ভাষায় সম্যক বুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।'

সাহিত্যিক অনাথচন্দ্র সরকার বলিয়াছেন,—যাঁহারা দাশুরায়কে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যরসাস্বাদনে অক্ষম নচেৎ দাশুরায়ের রচনা বিষয়ে অজ্ঞ। 'দাশুরায়ের ভাব ভাষাকে টানিয়া আনে, না, ভাষা ভাবকে টানিয়া আনে, বলা শক্ত।'

চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছেন,—'অশ্লীলতা ত নাই ই, পরন্ত উহা যে এত ভাল, পূর্ব্বে জানিতাম না।' আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য শিষ্য বিপিন বিহারী গুপ্তকে লিখিয়াছিলেন—'দাশরথীর পাঁচালী খাঁটী বাঙলার শেষ রচনা। দীননাথ সান্যাল বলিয়াছেন,—'দাশরথি খাঁটী বাঙলার শেষ কবি। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন

পূর্ণব্রহ্মভাব মিশ্রিত নায়ক নায়িকাভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন।

পাঁচলী সাহিত্য আসল বাঙলার খাঁটি জনসাধারণের সাহিত্য। গদ্য সাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্য-সাহিত্যে মধুসুদন ও হেমচন্দ্র যখন সাহিত্যে নবীন প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছিলেন তখন বাংলার অখ্যাত সরল অনাড়ম্বর পল্লীবাসীদের আসর জমকাইয়া বাংলার প্রাণশক্তির চিরন্তন আদর্শ ও পথের পাচালী গাহিয়া দাশরথি, ব্রজমোহন ও রসিকচন্দ্র প্রভৃতি পাচালীকারগণ বাঙ্গালী জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। ছড়া (ব্যাখ্যা মূলক আখ্যান্) ও গান (হৃদয়গ্রাহী ভাব ও আদর্শ) সংযোগে সে-যুগের পাচালী লোক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে।

ভারত-নারীর আদর্শ

শ্রীসরযু সেন

বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের উপর পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবকে আমরা স্বভাবতঃই অনেকটা মানিয়া লইয়াছি। ঐ প্রভাব ভালই হউক আর মন্দই হউক, উহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

একদা রক্ষণশীল সমাজ প্রাণপণ শক্তিতে উহার বিরোধিতা করিয়াছিল সনাতন আদর্শ হইতে ক্রমবিচ্যুতির পরিণাম কল্পনা করিয়া দ্বিধায় শঙ্কায় কণ্টকিত চিত্তে। কিন্তু, উহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই।

বাস্তবিক পক্ষে, যখন প্রথম প্লাবন আইসে, তখন লাভক্ষতি খতাইবার সময় নহে। বন্যার ঢল নামিয়া যাইলেই উহার সত্যকার হিসাব-নিকাশের অবকাশ মিলে।

প্রাচীন ভারত যে, সত্যই ঐ আকস্মিক উদ্বেলতায় ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই ইহা বুঝিবার মত প্রাকৃতিক প্রকৃতিস্থতা এতদিনে আসিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, পরিবর্ত্তন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মাত্র উপরের একটা পাৎলা স্তরেই। নিম্নের মূল ভূমিভাগ উহাতে এতটুকুও বিচলিত হয় নাই।

ক্ষতি হয়ত কিছু হইয়াছে, হয়ত ক্রমে সঞ্চিত বহুলতর উপকরণ বিসর্জ্জনের দুঃখ আমরা সহিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু, যাহা বিপ্লবের ধোলাইয়ে টেকে না, তেমন জিনিস থাকিবার সার্থকতাও অতি অল্প। বদ্ধ জলায় যদি বাঁধ ভাঙ্গিয়া পরিবর্ত্তন আসিয়াই থাকে, তাহাতে হাহাকার করিবার কি আছে? বরং প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতির যে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃত স্বরূপ আবহমানকাল ভারতীয় চরিত্রের মূল উপাদান যোগাইয়া আসিয়াছে, আমরা এই সংঘর্ষের শেষে তাহারই সন্ধান পাইতেছি। সেই সংস্কৃতি নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ বলিয়াই, বারংবার পরজাতি বা পরদেশী সংস্কারের সংস্পর্শে আসিয়াও যুগে যুগে আপন বৈশিষ্ট্য হারায় না, অধিকন্তু আপন বিশিষ্টতা দ্বারাই আগন্তুক ভাবপ্রবাহকে অনুরূপ করিয়া লয়।

আর্য্য সংস্কৃতির প্রাণধারা যে স্থান হইতে উৎসারিত হয়, সেই মর্ম্মস্থান হিমাদ্রি শিখরের মতো জীবপ্রেমে চির সমাচ্ছন্ন রহিয়া পুণ্য গঙ্গোত্রী প্রবাহকে নিয়ত ক্ষরণশীল রাখিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার আবেষ্টনীতেও আমাদের দেশে সরোজনলিনীর মতো একটী মহীয়সী মহিলার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

সিভিলিয়ানের কন্যা ও সিভিলিয়ানের পত্নীর মধ্যেও আমরা পাই একটী খাটি ভারতীয় নারীরই পরিচয়। ইঁহার বুদ্ধিদীপ্ত অন্তঃকরণে নারীজীবনের উচ্চ আদর্শ সহজেই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, নিরস্ত হইয়াছিল এই নারীর কঠিন বিচার-বোধের সম্মুখে সমুদয় উন্মার্গ বৃত্তি।

এই মনস্বিনী মহিলার প্রত্যেকটি আচরণে একটা গূঢ় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি

সমুদয় বিষয়েই বিচার করিয়া আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, অথবা আপন মনোনুকূল বিষয়ও বিচার দ্বারা ন্যায়ানুমোদিত প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বস্তিলাভ ঘটিত না।

স্বীয় সংসারে তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার পরিজন পরিচর্য্যায় কোনো ফাঁক ছিল না। কিন্তু, ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। যদিও গুণমুগ্ধ স্বামীর চক্ষে তাঁহার পারিবারিক প্রত্যেকটি গুণই অনন্যসাধারণ রূপ ধরিয়াছিল, তথাপি অনুকূল স্বামীকেও সর্ব্বাংশে সাহচর্য্য দ্বারা তৃপ্ত রাখা কোনো শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

নিতান্তই কোনো বিপরীত কারণ না ঘটিলে, স্বামী, পুত্র, আত্মীয়, পরিজনকে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল মেয়েই ভালোবাসে এবং সেই দুর্নিবার আকর্ষণেই তাদের শুভানুধ্যান করিয়া সমগ্র শক্তিতে সংসারটিকে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পায়।

কিন্তু, সরোজনলিনীর চরিত্রের মাধুর্য্যই হইল তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা, তাঁহার আত্মবিস্মৃতি,—যাহা সর্ব্বজনের সহিত তাঁহাকে অবাধে মিলাইয়াছে, জাগ্রত করিয়াছে সকলকার উপলব্ধিতে নিবিড়তম সংবেদন।

আপন পরিমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত স্বর্গের চেয়ে এই দুঃখ দৈন্য হতাশা পীড়িত বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল আত্মপ্রত্যয়হীন বহু বিস্তৃত বাস্তব জগৎকেই তিনি বেশী ভালোবাসিয়াছিলেন। নিঃসংশয়ে জানিয়াছিলেন সত্যকারের দেশকে, বুঝিয়াছিলেন ঐ সর্ব্বজন সংস্থিতার সেবার অধিকার জন্মায় তাঁহারি, যিনি সকলকার হাতে হাত মিলাইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন।

যদিও এই মেয়েটিকে বহু পরিজন অধ্যুষিত একান্নবর্ত্তী বৃহৎ সংসারে জীবন যাপন করিতে হয় নাই তবুও ইহাঁর চরিত্রে ভারতবর্ষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য সেই 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ' আত্মোৎসর্গের পরম নির্ব্বিকল্প রূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেরূপ সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মাতা বহুজনের ভার বহনের শক্তিতে উজ্জীবিত থাকিয়া নিয়ত কেন্দ্রসমাহিতা।

এই কমনীয় চরিত্রে একাধারে মাধুর্য্য ও দার্ঢ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। কেবল নারীত্বের মাপ কাঠিতে ইঁহাকে মাপা চলে না, এ যেন স্নেহ বিগলিত দাক্ষিণ্যের পিযূষবর্ষিণী [illegible] মাতৃমূর্ত্তি।

ভারতের আদর্শ এইখানেই, যুগ যুগ সাধনালব্ধ পরম [illegible] ইহাই। এখানে নারী শুধু নরের সহচরী নয়, সহধর্ম্মিণী [illegible] সমানাধিকারের দাবীদার নয়, সর্ব্বত্যাগিনী কল্যাণী কুলল[illegible]

অধুনাতন পন্থী পাশ্চাত্যের নরনারী যখন সমানাধিকা[illegible] দাবীর এক টুকরা মাংস লইয়া দুইটা ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের টানা[illegible] মত লোভে উলঙ্গ, প্রাচীন প্রাচীর দম্পতি তখন আত্ম[illegible] দাবী স্বীকার করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণ যজ্ঞে ব্রতী।

ব্যতিক্রম অবশ্য উভয়ত্রই অনেক আছে এবং তাহা ন[illegible] নয়। কিন্তু সমাজের ধর্ম্মাধিকরণে নৈতিক চরিত্র বি[illegible] মানদণ্ড এই বিভিন্ন আদর্শই জাতির লক্ষ্যকে দেখাইয়া [illegible] ব্যতিক্রমের ভালোমন্দে কিছু আসে-যায় না।

সরোজনলিনীতে সহধর্ম্ম এমন একটা রূপ নিয়াছিল, য[illegible] কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

স্বামীর অনুবর্ত্তিণী হইয়া স্ত্রী সমস্ত অনাচার ও উ[illegible] গামিতার সহকারিণী হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল [illegible] স্বধর্ম্ম দ্রোহিতার সমর্থন করিতে না পারিয়া স্বামীর সংশ্রব [illegible] রূপেই বর্জ্জন করে, এ ধরণের মেয়েও আমাদের দেশে [illegible] আছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রেম ও বাধ্যতায় স্বামীর অভি[illegible] অনুসরণ করিয়াও সেই প্রেমের বলেই স্বামীর সকল অ[illegible] রুচিতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ স্ত্রীর কথা আমরা ক[illegible] জানি।

এই পাবনী শক্তিই প্রকৃত সহধর্ম্ম। আজিও লোকান্ত[illegible] পুত আত্মার সেই বিস্ময়কর শক্তি তাঁহার স্বামীর ম[illegible] জনকল্যাণকামনা রূপে স্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মানু[illegible] করিয়া রাখিয়াছে।

অদ্ভুত দূর দৃষ্টি ছিল এই মেয়েটির। পরে কি দরকা[illegible] হইবে, তাহা তিনি অনেক আগেই বুঝিতে পারিতেন। অ[illegible] কাল ব্যাপক ভাবে জন শিক্ষার ব্যবস্থা ও সর্ব্বত্র কুটীর শি[illegible] উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি[illegible] কাছেই দেশনায়ক দিগের নিকট হইতে আহ্বান আসিতেছে যেহেতু জনে জনে আত্মচেতনার সঞ্চার না হইলে, স্বাবলম্বের সামর্থ্য না জন্মিলে স্বাধীনতার যোগ্যতাও জন্মাইবে না।

সরোজনলিনী কিন্তু অনেক আগেই—দেশের সর্ব্বত্র এই ডাক পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই—আপন অন্তস্থলের সাড়া পাইয়া কর্ত্তব্য সাধনে হাত বাড়াইয়াছিলেন।

দেশ যাদের মধ্যে পরবর্ত্তী সময়ে রূপ গ্রহণ করিবে সেই ভাবী মানবের যোগ্য অবতরণক্ষেত্রের সন্ধানে, পূর্ব্বাহ্নেই মাতৃজাতিকে পূর্ণাঙ্গ সন্তানের শক্তিশালিনী জন্মদাত্রী রূপে গড়িয়া তোলার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জানিতেন, যতক্ষণ না মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হইবে, ততক্ষণ দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্য যাহাই করা হউক না কেন, উহা ভিত্তিহীন প্রাসাদ রচনার মতই।

কেবল তাঁহার উজ্জ্বল বুদ্ধিতেই যে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মেও উহা প্রসার লাভ করিয়াছিল।

একটা আশ্চর্য্য সংগঠনী শক্তি লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন যেখানে থাকিতেন, তথায়ই এই শক্তি সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হইয়া উঠিত।

তাঁহার প্রাথমিক কর্ত্তব্যই ছিল সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে নিজে মিশিয়া তাহাদের পরস্পরে মিশিবার সুযোগ ঘটাইয়া দেওয়া—যেন তাহারা সহজেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পায় এবং গণশক্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সত্ত্বা সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠে।

সভাক্ষেত্রে প্রশস্তি পাঠ কালে যে পুরাতন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই সমত্ববোধের ছন্দই ছিল তাঁহার ধমনীর শোণিতপ্রবাহের তালে। তাই, সারা বাংলার নারী-শক্তিকে একটা বিরাট সমিতিতে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলা তাঁহাতেই সম্ভব হইয়াছিল। সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সংবদ্ধিত শত শত অন্তঃপুরিকার নিস্পন্দ চিত্তপটে একটা আত্ম-সংবিত জাগাইতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

আজ দেখিতে পাইতেছি পল্লী সমূহের প্রান্তে প্রান্তে দৃঢ় সংঘবদ্ধ নারীসমিতিগুলিতে শিল্পোপজীবিনীদিগের মেলা, অনুভব করিতেছি পরমুখাপেক্ষিত জীবনে নব জাগ্রত মর্য্যাদাবোধের প্রেরণা, কল্পনা করিতেছি নারীর স্বতন্ত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার—যেথায় তাহাকে পুরুষের শিক্ষা দীক্ষা ও জীবিকার্জ্জনোপায়ে প্রতিযোগিতা না করিয়াও জ্ঞানে ও কর্ম্মে পরিমার্জ্জনা লাভে সুযোগ দেওয়া হইতেছে—যে পরিমার্জ্জনায় নারী জীবন-যাত্রা-পথে পুরুষের ভার স্বরূপ না থাকিয়া আনন্দ দায়িনী সহকারীণীর যোগ্যতা পায়।

জীবে শিব জ্ঞান যে ভারতের মর্ম্মকথা, সেই ভারত কেমন করিয়া পরদেশী সভ্যতার বিলাসে গা ভাসাইয়া একেবারেই আত্মপরায়ণ হইয়া উঠিবে?

ভারতবর্ষের এই তরুণী মেয়েটীর অন্তঃকরণে মানব ধর্ম্ম সাড়া দিয়াছিল। উপকরণের অভাব না থাকিলেও পঞ্চভূতের, বোঝার স্বাচ্ছন্দ্যই সেখানে একমাত্র কাম্য হইয়া থাকে নাই। দেহাতিরিক্ত একটা সূক্ষ্মতর অনুভূতি তাঁহাকে বিশ্বাসের পথে নির্ভরের পথে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত করিয়াছিল। তাই তাঁহার অনাবিল জীবপ্রেম ধারায় ধারায় ধনী দরিদ্র খ্যাত অখ্যাত নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই অমৃত সিক্ত করিয়াছে।

তাঁহার সমস্ত কল্যাণ শক্তির মূল ঐ ভগবৎ বিশ্বাসেই নিহিত; সত্যকারের বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে নিষ্ঠা আসিতে পানে না এবং নিষ্ঠা না থাকিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কখনই ঘটে না।

আজ সরোজনলিনী-স্মৃতি-বাসরে তাঁহার সিদ্ধব্রতের সংকল্প গ্রহণ কালে সেই পরম সিদ্ধিদাতাকেই স্মরণ করিতেছি, যিনি এই পুণ্য চরিতা দেবীর তপস্যাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। *

---

* প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত।

জীবন ছবি

শ্রীইন্দিরা দেবী

মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই নিস্তব্ধ দুপুর!
ডাহুক-ডাকা স্তব্ধ কাজল-দীঘির কাকচক্ষু জলে
নিজের ছবিখানি বার বার করে দেখা,
পরম সুন্দর কৈশোর-যৌবনের মিলনক্ষণের ছবি।

চোখে ছিল অনন্ত পিপাসা
জানা-অজানাকে দেখবার!

বুকে ছিল আঁকা, সোনালি স্বপনের
মধুছবি। সে ছবি আমারই জীবনের।
কত দিন ভেবেছি
সন্ধ্যার স্তিমিত আলো-আঁধারে
আঁচল গলায় জড়িয়ে তুলসী তলায়
ভীরু দীপশিখাটি দেবো জ্বেলে—
প্রিয়জন শুভ কামনায়
শঙ্কিতবক্ষা পল্লীবধূর মত।

……হায়রে দুরাশা!

স্বপ্ন দেখলুম স্নিগ্ধ শান্ত মাটির ঘরে
জীবনটা দেব কাটিয়ে—স্নিগ্ধ শান্ত মায়ের কোলের মত
মাটীর ঘরে।

মাটির ঘর, ঘিরে রয়েছে
একটি শিউলি গাছ, একটি বকুল গাছ।
আর একটু দূরে কৃষ্ণচূড়া।

পল্লীজীবন হবে আমাদের—
উঠানের কোণে রবে পয়স্বিনী গাভী, গোলাতে রবে ধা
দু'টি প্রাণ বয়ে যাবে নদীর মত
অভিন্ন ধারায়।

……স্বপ্ন গেল ভেঙে!

মাটি নেই, কোথায় মাটি? কোথায় শ্যামলতা?
পেলুম প্রাসাদ—পাথর, পাথর আর
ইট-কাঠে তৈরী প্রাসাদ।
গুদামের মত। ড্রেসিং টেবিল আর রকিং চেয়ার,
মেহগ্‌নি খাট, আর রাজ্যের জঞ্জাল।
কোথায় মাটির ঘর?
টেলিফোন, গ্রামোফোন আর রেডিও
যন্ত্রের একাধিকার
আমার প্রাসাদে!
কোথায় সেই শেফালি, বকুল
আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ?
বিজলীর আলোয় চোখ গেল ঝলসে,
আঁধার হ'য়ে এল আমার কল্পলোক—
সোনার স্বপনে গড়া কৈশোর আমার।
কোথায় কাজল-দীঘির সেই কাকচক্ষু জলে
বার বার ঘুরে যৌবন সুষমা মাখা আমারই ছবি দেখা?
—আমার মনের ছবি?

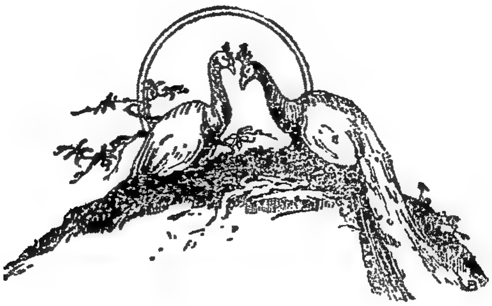

মনস্বী ও 'মনিষি'

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ, এড্ভোকেট্, হাইকোর্ট।

১৯১৪ কি ১৯১৫ সালের কথা। বড় দিনের ছুটিতে ফিরিয়াছি—বোলপুরের বাসায় আছি। বাবা বলিলেন, ন্দ্রবাবু তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, অনেক দিন দেখেন । তুমি কালই ভোরে উঠে শান্তিনিকেতন গিয়ে তাঁকে ম করে এস।'

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠেই শান্তিনিকেতন যাত্রা করিলাম। কাল, বোলপুর হ'তে শান্তিনিকেতন প্রায় দেড় মাইল রের ব্যবধান। সমস্তটাকেই আবৃত করে রেখেছে ঘন কুয়াসার আবরণী—অদূরের পদার্থ দেখা যায় না। রী লাল রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে দিত সূর্য্যের আভায় কুয়াসার মধ্যেও দৃষ্টি যৎসামান্য তই দেখি—'ভুবন' বাঁধের পার্শ্বে উপনীত হইয়াছি। ন্দ্রবাবু তখন থাকিতেন বাঁধের উত্তরে 'নামো বাঙ্গলায়।' পাশ দিয়া একটা সর্টকাট্ ছিল, লাল সড়ক হইতে দিয়া 'নামো বাঙ্গলার' বেড়া ভেদ করে বাগানের মধ্যে ান যাইত। ভাবিলাম, সেই পথ দিয়াই যাওয়া সুবিধা, সংক্ষেপও হইবে!

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল; পৌছিলাম বাঙ্গালার' বাগানে। অদূরে দীর্ঘাকৃতি কোনও চলন্ত অস্তিত্ব অনুভব করিলাম। কিন্তু তাহা কি—কুয়াসার বাধগম্য হইল না। অকস্মাৎ আবাল্যের পরিচিত উচ্চ র শব্দে চমকিত ও আনন্দিত হইয়া দেখি, সেই ছায়ামূর্তি স্থির এবং তাহা হইতেই এই উচ্চ হাস্যের অবিরল ধারা বহিয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, যাঁহাকে প্রণাম ত আসিয়াছি—ইনিই সেই মহর্ষিপুত্র ঋষি ও বিখ্যাত '—দ্বিজেন্দ্রনাথ।

তাড়াতাড়ি সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া প্রণাম তই তিনি আমার মস্তকে হাত দিয়া উচৈঃস্বরে বলিলেন, তুমি আমার সব ঘুলিয়ে দিলে।"

আমি সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি বোধহয় আমার ভাব বুঝিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে আমার এত আনন্দ হ'ল যে কতবার পায়চারি করেছি সব ভুলে গেছি। অনেকটা হেঁটে এসেছ এখন তুমি বারান্দায় গিয়ে খানিক জিরাও। আমাকে আবার প্রথম হতে গুণে গুণে পায়চারি কর্ত্তে হ'বে। শেষ হলে তোমার কাছে গিয়ে জুটছি।"

কত বড় বংশের ও কত বড় লোক আর আমার পিতামহ তুল্য বরণীয় পুরুষ! আমার ন্যায় একজন সামান্য বিদ্যার্থীর প্রতিও এত স্নেহ! এখনও সে কথা স্মরণ হলেই মনে হয় কই—আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে অন্য কেহ ত, কখনও এ হতভাগ্যকে দেখিয়া আনন্দে এমন উল্লসিত হন নাই! বারাণ্ডায় বসে এইরূপ কত কথাই ভাবছি।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি কখন আসিয়া আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ পাশ ফিরিতেই দেখি যে কি গভীর স্নেহের সহিত তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন—কতক্ষণ জানি না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমার স্কন্ধে হাত দিয়া মনস্বী বলিলেন—'বোসো, বোসো। অত ফরমালিটির কোন দরকার নাই।'

আমি বলিলাম 'আপনি বসুন, নইলে কি করে বসি?'

একটা ইজি চেয়ারে বসে তিনি বল্লেন, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলাম জান? তোমার বাবার ছাত্রাবস্থার আর তোমার পিতামহের ছবি তোমার মুখে। দেখেই মনটা যেন ছ্যাৎ করে উঠল। সে কতদিনের কথা হল,—তোমাকে দেখে অতীতের সেই সব অনেক কথাই মনে জটলা বেঁধে উঠল।' ইত্যাদি।

তারপর আমার প্রপিতামহ ও পিতৃদেবের সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া চলিলেন। বলিবার কালে তাঁহার সেই আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

বন্ধু জনের প্রতি বিশেষতঃ বহু কাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত আমার পিতামহদেবের প্রতি মনস্বীর কি গভীর অনুরাগ, স্নেহ বা শ্রদ্ধা!

পিতামহদেবের সম্বন্ধে অনেক কথার পর বলিলেন—'প্রতাপবাবুর মত বন্ধু আমরা জীবনে পাই নাই। তুমি শুনে থাকবে তিনি বাবা মহাশয়ের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্যই তো শান্তিনিকেতনের জমি আমরা তাঁর আর তাঁর ভাইদের কাছে পেয়েছিলাম। তিনি আমাদিগকে কি ভালই বাসতেন! আমার ভাইদের নামানুসারে তিনি তাঁর ছেলেদেরও নাম রেখেছিলেন! আমার ভাই জ্যোতি তোমার মেজ জেঠার নামও হ'ল জ্যোতি। আমার ভাই হেমেন্দ্রর নামে তোমার বাবার নাম হ'ল। আর তোমাদের গুরুদেবের নামানুসারে তোমার ছোট কাকারও নাম রাখা হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ। এ সবই ত সেদিনের কথা মনে হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর বাগানবাড়ীতে সর্ব্বদা ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হয়। তাই তাঁর ভালবাসা আর তাঁর সেই ইচ্ছা স্মরণ করেই তো তোমাদের হাটপুকুরের বাগান বাড়ীতে গিয়ে অনেক দিন বাস করেছিলাম। তখন তুমি ছোট এখানে পড়তে, তোমার মনে পড়ে?

আমি বলিলাম—'আজ্ঞে হা, কিছু কিছু মনে পড়ে। আপনি প্রথমে বাগানের উত্তর দিকের বাংলোতে ছিলেন। পরে দক্ষিণদিকে কাকার সদর বাড়ীতে থাক্‌তেন। আমি শান্তিনিকেতন হ'তে গেলেই আমাকে পাশে বসিয়ে আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেন আর গুরুদেবের গান কর্ত্তে বলতেন, আমার গান শুনতে আপনি কত ভাল বাস্‌তেন।'

তিনি বল্লেন—'তখনকার কোন গানটা আমি বেশি পসন্দ কর্ত্তাম, বল দেখি।'

আমি। আপনাকে অনেক গানই শুনাইতাম তবে বেশির ভাগ আপনি আমাকে গাইতে বল্‌তেন্ "মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ —এই রকম অনেক কথা মনে পড়ে।

আমার কথা শুনিয়া মনস্বী আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাঃ, এত দিনের কথা তোমার তো বেশ মনে আছে দেখ্‌ছি। ও গানটা কেন এত ভাল লাগত জান? আমি তখন 'সার সত্যের' আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। ঐ গানটায় মনের অনেক সায় পেতাম, গানটাও রবির [illegible] তাই অত ভাল লাগত। তখনকার আর কোন কথা [illegible] মনে পড়ে?"

আমি।—আপনি কাগজের অনেক রকম ভাঁজ [illegible], কাগজের কত রকম বাক্‌স, ব্যাগ ইত্যাদি অনেক [illegible] তৈয়ারী কর্‌তেন, চিত্র বিচিত্র করে ছবি এঁকে কবিত[illegible] চিঠি লিখ্‌তেন। আপনার পাশে বসিয়ে এক সঙ্গে খা[illegible] আর খাইতে খাইতে যেটি আপনার মুখে ভাল লাগ্‌ত [illegible] তুলে আমাকে খাওয়াইতেন। লোককে কথায় কথায় [illegible]তেন। আর এখন যেমন তখনও তেমনই দেখেছি[illegible] আপনার হাঁসির স্রোত। এমন হাঁসি আর কাউকে [illegible] হাঁস্‌তে দেখি নাই।

বলাও যা আর তা'র সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় সেই বিমল [illegible] ফোয়ারা খুলিয়া গেল, হাস্যস্রোতের ভিতর দিয়া আনন্দ[illegible] প্রবাহিত হইয়া সেই স্থানটিকেও যেন আনন্দে [illegible] করিল।

এই সকল কথালাপ কালে লক্ষ্য করিতেছিলাম যে [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী রোয়াকে ও তৎনিম্নবর্ত্তী অঙ্গনে এক, তার [illegible] এক বা দুই চারি করিয়া তদঞ্চলের যত প্রকার পশু [illegible] আদি আছে, তাহারা আসিয়া পাশাপাশি বসিয়া পড়ি[illegible] তাহাতে পর পর বহুতর লাইন বা সারি বাঁধিয়া স্থান[illegible] ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় [illegible] যেন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভদ্রজনগণ সারি বাঁধিয়া [illegible] গিয়াছেন।

ঠিক এই সময় মনস্বীর এক ভৃত্য কলাই করা দুইটি [illegible] এবং দুইটি চামচ আনিয়া ইজি চেয়ারের পার্শ্বস্থ একটি ছো[illegible] টেবিলের উপর রাখিল। একটি পাত্রে শক্তু (হোল[illegible] ছাতুর) প্রকাণ্ড একটি পিণ্ড, অপর পাত্রে দধি। ভৃত্য [illegible] গুলি টেবিলে রাখিতেই মনস্বীর যেন চমক ভাঙ্গিল, মু[illegible] ভাব এবং তৎসহ কথার ধারাও নিমেষ মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি ভৃত্যকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভাল করে [illegible] হয়েছে তো?" ভৃত্য "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া ভিতরে গেল ও [illegible] গ্লাস জল ও তোয়ালে আনিয়া রাখিয়া বাড়ীর মধ্যে [illegible] করিল,—আর ফিরিল না।

মনস্বী শক্তু পিণ্ড দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের [illegible]

আরো একটু জল মিশ্রণান্তে অপর ভাগের সহিত দধি মিশ্রিত করিতে করিতে তাঁহার সমাগত সেই জীবজগতের অতিথিবৃন্দের প্রত্যেকটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

দৃষ্টিতে তাঁর কি ছিল জানি না—কিন্তু যে যে সারিতে তাঁহার করুণ-নয়ন-পাত হইল সেই সারিটিই যেন সামরিক কায়দায় এক সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অতীব সন্নিকটে উপনীত হইল। এইরূপে সকল সারিই অগ্রসর হইয়া আসিল। সে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! কোন কথা বার্ত্তা নাই—যেন বিনা তারের সঙ্কেতে একটি সেনাদল নিঃশব্দে Forward March করিয়া অগ্রে আসিল। এতগুলি জীবজন্তু যে একত্রিত—তাহার মধ্যে কাক, চিল, পায়রা, পেঁচা, বিড়াল, কুকুর, কাঠবিড়ালী, গরু বাছুর, সবৎস ছাগ পরিবার আবার ভুবন ডাঙ্গার অতীতের স্মৃতিরক্ষাকারী একটা ছোট নেকড়েও, ইত্যাদি খাদ্য খাদক নির্ব্বিশেষে সকলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে ও নির্ব্বিবাদে নিঃশব্দে পাশাপাশি যেন কিসের আশায় বা প্রতীক্ষায় সমাসীন! দৃশ্য—অপূর্ব্ব!!

অনন্ত আকাশতলে দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর মধ্যে সম্পূর্ণ নীরব ও নির্জ্জন এই ঋষি-নিবাসের এই অতিথিবৃন্দ স্মরণ করাইয়া দিল কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের দুষ্মন্তমুখে আশ্রম বর্ণনার কথাগুলি—"শান্তমিদং আশ্রমপদং।"

সকল অতিথির অগ্রসর এবং মনস্বীর পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য শেষ হইলে তিনি একটি নাম ধরিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। এতদিন পরে সে নামটা সঠিক স্মরণ নাই, বোধসৌকর্য্যার্থে বর্ত্তমান নিবন্ধে তৎপরিবর্ত্তে "হারাধন" নামটাই ব্যবহার করিলাম। অনেকবার উচ্চৈস্বরে ডাকাডাকির পর কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া মনস্বী আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—"যাঃ, হারাধন ত কই আজও এল না!" "মনিষ্যি"! "মনিষ্যি"! হারাধন কোথায় শিগ্‌গির খুঁজে ডেকে আনো।" জানি না বাটীর ভিতর হইতে কে সাড়া দিল,—"আজ্ঞে যাচ্ছে"।

অনেকক্ষণ যাবৎ সব চুপ চাপ। মনস্বী ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন এবং আপন মনে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"হারাধন এখনও আস্‌ছে না তো!" শেষে আমাকেই বালকের ন্যায় সরল ও ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে সিংহশাবক! বলতে পারো, হারাধন কেন আসছে না?" আমি তো নিরুত্তর, ব্যাপার বোধাতীত, কি উত্তরই বা দিব?

কিছু পরে বলিলেন—ওহে একবার ভিতরে যাও দেখি; মনিষ্যি কোথায় দেখতো। তার দেখা পেলে শুধিয়ে এস হারাধন কখন আস্‌বে কি সন্ধান লাভ করলে।

আমি ভিতরে গিয়া দেখিলাম বড়মা রয়েছেন, প্রণাম করিলাম, তাঁহার কুশল প্রশ্নাদির উত্তর প্রদানান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনিষ্যি কে ও কোথায়?" তাঁর কাছে জানিলাম মনস্বীর পূর্ব্বদৃষ্ট সেই ভৃত্যই—"মনিষ্যি"—এবং সে রন্ধন-শালায় বর্ত্তমান।

তথায় গিয়া তাহাকে বলিলাম—"হ্যাঁহে তোমার বাবু যে তোমাকে ডেকে ডেকে সারা; কার খোঁজ করে আন্‌তে বললেন তার কি সন্ধান পেলে, সে কখন আসবে?"

মনিষ্যি দিব্য আরামে হুক্কাদেবীর সাধনায় তৎপর ছিল। বোধকরি সে অপরিচিতের এই অনধিকার চর্চ্চায় কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল—"আরে মশাই আপনিও যেমন। সে হারাধনটা হোল একটা ঠ্যাং ভাঙ্গা কাক। তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব? কোথায় সে মরতে গিয়াছে, সে আস্‌বে কি আর আসবেই না, তা কে বল্‌তে পারে? বাবু মশায়ের যেমন—একটা খোঁড়া কাক, তার জন্যে এত অস্থির!"

আশ্চর্য্য হয়ে আমি বল্লাম—"ওঃ সেটা একটা কাক? তা হলে তোমার বাবু মশায়ের এই সব অতিথিদের এক একটা নাম আছে বুঝি?"

মনিষ্যি। আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, তাও বুঝি আপনি জানেন না? আর জানবেনই বা কি করে—আপনাকে তো আজ দেখছি। সব দেখতেই পাবেন একটু পরে।

আমি। তা হলে তোমার বাবু মশায়কে গিয়ে কি বলব?

মনিষ্যি। আপনি বলুন মনিষ্যি সন্ধানে আছে, পেলেই পাঠিয়ে দেবে।

পাকশালা হ'তে বারান্দায় ফিরতেই মনস্বী নিজেই পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—'মনিষ্যির দেখা পেলে? সে কি বল্‌লে?

আমি মনিষ্যির কথা বলিলাম। শুনে তিনি আনন্দিত হলেন, বল্লেন,—'মনিষ্যিকে তাইতো ভালবাসি। সে আমার

বড়ই বাধ্য! সে সন্ধান আছে যখন, তখন হারাধন নিশ্চয় এসে পড়ল বলে।'

হারাধনের তো কোন পাত্তা নাই—বিশাল বিশ্বের কোন দৃশ্যের মধ্যে তিনি হারিয়ে গেছেন তার ঠিকানা নাই—কিন্তু মনিষ্যির উপর মনস্বীর এই অগাধ বিশ্বাস দেখে হাঁসব বা আশ্চর্য্য হব তাই নির্ণয়ার্থ ব্যস্ত আছি—ভাবছি, মনস্বীও মধ্যে মধ্যে ২।৪টা কথা বলিতেছেন,—ইতিমধ্যে মনস্বীর ঐ সরল বিশ্বাসকে সার্থক করিতেই বুঝি সত্যই আসিয়া পৌছাইল এক খঞ্জপদ বায়স বংশধর এবং আসিয়াই ইজিচেয়ারের হাতলের উপর নির্বিকার চিত্তে পরম আবদারের সহিত স্থানাধিকার করিতেই মনস্বী—হারান ছেলেকে পিতা যেমন বক্ষে ধরেন তেমনই—সস্নেহে এক হস্তে নিজ বক্ষে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন অপর হস্তে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কত আদর করিলেন, বল্লেন,—'কাল থেকে তুই কোথায় ছিলি?' তোর জন্যে যে আমি ভেবে সারা তা' কি তুই বুঝতে পারিস্ নি? না—না, পেরেছিস তাই তাড়াতাড়ি এত ছুটে এসে হাঁপাচ্ছিস? একটু জিরো—তোকে খাইয়ে তবে এদের সব খাওয়াব।

অতঃপর হারাধনের সঙ্গে মনস্বীর আরও নানা কথা বার্ত্তা হ'ল শুনে কেহ হাস্‌বেন না বা আমাকে মিথ্যাবাদী ভাববেন না। সত্যই হল—কিন্তু অতি অদ্ভুত ভাবে। যতই মনস্বী কথা বলেন শ্রীমান হারাধন ততই এমন ভাব দেখান যে সে সবই তিনি বুঝে নিয়ে পরম বিজ্ঞ হয়ে পড়েছেন আর এদিকে ওদিকে সমন্তাৎ নিজমুণ্ডপাত করে মনস্বীর মুখের ও চোখের দিকে চাহিতে চাহিতে নীরব অকথিত ভাষায় স্বীয় হৃদয় ও মনের কত ব্যথার নিবেদনই ভাবে অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন,—মনস্বীও তৎসকল বুঝিয়া কত উত্তর দিলেন ও প্রশ্ন করিয়া বায়সনন্দনের ভাবাভিব্যক্তি শুনিয়া পুনরায় নানা কথা কহিতেছিলেন এইসব মুগ্ধ চিত্তে একাগ্র ও আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ অতীত হইল বুঝিতে পারি নাই। নির্ঝরেরও যখন স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তখন চৈতন্যময় জীব বিশেষ আমারও অকস্মাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল যখন শুনিলাম মনস্বী তাঁহার হারানিধিকে বল্‌ছেন—'দেখ দেখি, তোর জন্যে এদের সকলকার আজ কত দেরী হয়ে গেল! নে, এবার কিছু খেয়ে নিয়ে তুই [illegible] কাজে যা, আমিও আমার কাজ করি।"

এইরূপে হারাধনের বিশ্রাম ও আপ্যায়ন লাভান্তে, [illegible] তাহাকে চামচে করিয়া এক ডেলা শক্তু খাওয়াইয়া [illegible] দিতেই মনস্বীর অতিথিশ্রেণীর মধ্যে একটি খালি জায়গায় [illegible] —সম্ভবতঃ তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ভূম্যাসন গ্রহণ করিল! [illegible] মনস্বী এক একটা নাম ধরে ডাকেন আর সেই অতিথি [illegible] মধ্য হইতে এক একটি তাঁর কাছে আসে, প্রত্যেককেই [illegible] এক এক চামচ শক্তু দিতেই সে ফিরিয়া গিয়া নিজ [illegible] বসিতে থাকে।

এবম্প্রকারে সকলকে খাওয়ান শেষ হইলে মনস্বী [illegible] জলে আচমন পূর্ব্বক তোয়ালেতে হাত মুছিয়া কি একটা [illegible] বলিলেন তৎক্ষণাৎ অতিথি বৃন্দের মধ্যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হই[illegible], অনেকে উড়িল, অনেকে ধীর পদবিক্ষেপে ফিরিল আবার [illegible] বা বক্ষে বা বহুপদে নিজেদের শরীরের গতিদান করিল, [illegible] কেহ বা বাংলোর সীমার বাহিরে গিয়া যে দিকে তার [illegible] সে দিকেই দৌড়াইল! তাহাদের প্রয়াণ কালেও কি [illegible] শৃঙ্খলা, কি চমৎকার পারস্পরিক বন্ধুত্বের বিনিময় দেখিল[illegible]

অতিথিগণ চলিয়া যাইবার পর মনস্বী আমার দিকে [illegible] চাহিয়া বলিলেন,—"এবার আমার ভূতযজ্ঞ শেষ হ'ল, [illegible] এস তোমার সঙ্গে আবার কথা বলি, আলাপ করি এস [illegible] এমন ভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন পূর্ব্বের ঘটনা গুলা [illegible] ঘটে নাই।

আমি বলিলাম,—"আমাদের হাট পুকুর বাগানে থা[illegible] তো আপনার এরূপ যজ্ঞ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

মনস্বী। —তখন তো এ সব ছিল না—ঠিক [illegible] পরে হয়েছে।

আমি। কখন হ'তে হল, যদি বলেন।

মনস্বী বলিলেন—"ওটার কথা শাস্ত্রে বহুপূর্ব্বে [illegible] ছিলাম। কিন্তু প্রথম মনে হয়েছিল তোমাদের হাটপুকুর বাগানে থাকতে তোমার কাকা রবীন্দ্রর ব্যাপার দেখে। অমাবস্যা রাত্রে সে তার কালী মন্দিরের পাশে খাবার হাতে করে 'শিবা' 'শিবা,' বলে ডাকৃত আর শেয়ালের দল তার হাত হতে খাবার খাইত। তারপর ক্রমশঃ অভ্যাসে হয়েছে।

আমি। শাস্ত্রে এর বিষয় কি বলে ?

মনস্বী। শাস্ত্রে বলে 'ভূতযজ্ঞ'। এ বিষয় বহু প্রকার া আছে।

আমি—আচ্ছা আপনি পায়চারি করে আস্‌বার পূর্ব্বেও ৪টা জীব বসেছিল। আমাকে দেখে সরে গেল। কিন্তু পনাকে দেখে সরে যাওয়া দূরে থাক আপনি চাহিতেই কাছে গিয়ে এল, নাম ধরে ধরে ডাকলেন, যাকে ডাক্‌লেন ঠিক সেই স আপনার হাত হ'তে খাবার লইল। এ সব কি করে ন তাই ভাবছি।

মনস্বী।—এ সব কি একদিনে হয়েছে? অনেক চেষ্টায়, নেক সাধনায় হয়েছে। আর দেখ জীবজন্তুরা মানুষের মনের ব বেশ বুঝতে পারে। তারা ভয় করে মানুষের মনের হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতিকে। যাদের মনে হিংসা নাই তা'দিকে া ভয় করে না। যারা ওদের সত্যই ভালবাসে, ওরা তাদের লবাসার প্রতিদান দিতে জানে ও দেয়।

আমি।—তা তো স্বচক্ষেই দেখে ধন্য হ'লাম! তা হ'লে অহিংস হতে পারলে পশু প্রাণীও বশ হয় ?

মনস্বী।—নিশ্চয়ই; কিন্তু তাহা ঠিক আন্তরিক হওয়া চাই, —"কায়েন মনসা বাচা"।

আমি।—আচ্ছা যাদের কখনও শক্তু খেতে দেখি নাই কি শুনি নাই, তা'রাও তো শক্তু খাইল দেখ্‌লাম। এটা কি করে সম্ভব হ'ল ?

মনস্বী।—ওহে, ওরা কি আসে শুধু খেতে? ওরা আসে ভালবেসে আমায় দেখতে, আমাদের পরস্পরের ভালবাসা বিনিময় কর্ত্তে। আর ওরাও জানে যে ইদানীং প্রাতে আমিও উহাই খাই এবং ওদিকেও ভালবেসে তাই দিই, তাই ওরা না খেলে আমি দুঃখ পাব বলেই সানন্দে উহাই খায়। ওদের মধ্যে যারা গব্যরসপ্রিয় তা' দিকে একটু করে দই মিশিয়ে দিই —ওরা তা' বুঝতে পারে।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুনে

এ, এফ, এম, ফজলুল হক

বন্ধু তোমায় ভালবাসি শুধু আমি,
প্রতিদান কভু চা'হিনিত তার তরে,
দীপ জ্বলে তার আলোর পরশ কামী,
শলভ শুধুই আগুনে পুড়িয়া মরে।

মোর ভালবাসা ঠিক সে শলভ সম,
বিলাইতে চায় আপনারে অকাতরে,
অন্তর যারে পূজা করে নিতি মম,
চুম্বন তার ফুল হয়ে পায়ে ঝরে।

কুসুমের কীট হয়ত ভাবিছ আমি,
দেখিতেছ মোরে কমল কাঁটার সম,
প্রাণের আকুতি নেহারি দিবস যামী,
ঘৃণা কর যদি সেও গৌরব মম।

ফাল্গুনে আমি কাল গুণে যাই একা,
তব দরশন মন চাহে নিরবধি,
অন্তরে হেরি তব নাম শুধু লেখা,
নয়নে বন্ধু বহে সে অশ্রু নদী।

নগেন্দ্রগুপ্তের ছোট গল্প

(৩)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সরস্বতী, এম, এ

১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "মিরিয়ম ও সোরাব" ছোট গল্পটি প্রকাশিত হয়। "মিরিয়ম ও সোরাব" নাম শুনিয়া অনেকের মনে সোরাব ও রুস্তমের কথা মনে পড়ে।

"মিরিয়ম ও সোরাবের বাসস্থান কাম্বোজ প্রদেশের দক্ষিণে মহাসাগর তীরে কেটী নামক গ্রামে। মিরিয়ম সোরাবের জ্ঞাতিকন্যা; মিরিয়মের বাপ মা কেহ ছিল না। সোরাবের মাতার কাল হইয়াছে, পিতা বর্ত্তমান, বয়স হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করে নাই। মিরিয়ম ও সোরাব একত্র প্রতিপালিত হইয়াছিল। মিরিয়মের বয়স সপ্তদশ বৎসর, সোরাব দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক। এই দুইজনে বিবাহ এক প্রকার স্থির ছিল।"

"বাল্যকালে সোরাব গ্রামের বালকদিগের দলপতি ছিল। সকল খেলার সেই নেতা। যেখানে সাহস ও বলের প্রয়োজন সোরাব সেখানে সকলের আগে যাইত। সেই অবধি মিরিয়ম সোরাবকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিত। বালুকা স্তূপের উপর বসিয়া অথবা সমুদ্র-সলিল বেষ্টিত পর্বতে বসিয়া সোরাব মিরিয়মকে যে সকল গল্প শুনাইত তাহাতে সে বালিকা বিস্মিত হইয়া সোরাবের দিকে চাহিয়া থাকিত। শঙ্কর বল্লাল নামক একজন বিখ্যাত বোম্বেটের গল্প করিতে করিতে সোরাব অত্যন্ত উৎসাহিত হইত। নাবিক দস্যু হইবার তাহার বড় সাধ। ডিঙ্গী করিয়া যখন সোরাব জাল ফেলিতে যাইত তখন কখন কখন মিরিয়ম তাহার সঙ্গে যাইত। ডিঙ্গী কখনও উল্টাইয়া যাইত, দুইজনে হাসিতে হাসিতে হংস-হংসীর ন্যায় সাঁতার দিয়া ডিঙ্গী ঠেলিয়া লইয়া তীরে উঠিত।"

* * * *

"মিরিয়ম সুন্দরী। সুবাদার সাহেবের হুকুম আছে, সুন্দরী কন্যা কেহ পাইলে তাহাকে আনিয়া দিবে।"

* * * *

"কয়েকদিন পরে ছত্রিশগড়ের নবাব সৈন্যসামন্তদি[illegible] কয়েকজনকে মিরিয়মকে লইয়া যাইবার জন্য পাঠাই[illegible] দিল।"

* * * *

"সোরাব ছত্রিশগড়ের নবাবের হাজত হইতে কোনও [illegible] পলায়ন করিল। সে বাহিরে আসিয়া ডাকাইতের দল [illegible] করিল এবং কিছুদিন পরে ছত্রিশগড়ের নবাবের বাড়ী ডাকা[illegible] করিয়া নগরের দ্বারবানকে বন্দী করিয়া মিরিয়মকে অশ্বে তুলি[illegible] পলায়ন করিল।"

* * * *

"সোরাব মাতালের হাসি হাসিয়া কহিল 'এ কি র[illegible] মিরিয়ম কহিল 'তুমি তো এ পর্য্যন্ত বিবাহ কর নাই।"

* * * *

"সোরাব বলিল, তোমাকে কখনও ভুলিতে পারি না[illegible] আমি তোমার অযোগ্য তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। তুমি স্বেচ্ছায় পতিত হও নাই।"

* * * *

"মিরিয়ম সমুদ্রতীরে গ্রাম প্রান্তে কুটিরে বাস করি[illegible] লাগিল। সোরাবের সহিত তাহার আর দেখা হইল না।"

যদিও "মিরিয়ম ও সোরাব" ছোট গল্পে দুইটি অনু[illegible] যুবক যুবতীর প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তথাপি [illegible] বর্ণনায় বস্তুতঃ এমন কিছু নাই, যাহা হিন্দু সমাজের অনুশাস[illegible] বা নারী-জাতির সতীত্বের বা শুচিতার বিরুদ্ধে কটাক্ষ পা[illegible] করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে সমাজ-ধর্ম-মূলক ব[illegible] গর্হিত হয় না। লেখকের ছোট গল্পস্থ দুইটি নায়ক-নায়িক[illegible] প্রেমের অভিনয় দেখানো যেমন উদ্দেশ্য, তাহাদের সেই প্রেমে[illegible] পরিণতি কি, তাহাও তাঁহার দেখাইবার প্রবল আকাঙ্খা।

সোরাব মিরিয়মকে ভালবাসিত, প্রাণের চেয়ে ভালবাসিত। মিরিয়মও সোরাবগতপ্রাণা হইয়া পড়িয়াছিল। সোরাবকে

মিরিয়ম সামাজিক বিবাহ না করিয়াও মনে মনে বিবাহ করিয়াছিল। তাহারা জাতিতে ধীবর, কিন্তু তাহাদের শিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণের চেয়েও খাঁটি। গ্রহ-বিপর্যয়ে যদিও মিরিয়মের অদৃষ্টে এরূপ লাঞ্ছনা, মুসলমানের করপীড়ন, যবনের হারেম-জাতা হওয়া ঘটিয়াছিল, তথাপি সে ধীবর হইয়া হিন্দু সমাজের আদর্শ ভুলে নাই।

যে ছত্রিশগড়ের সুবাদার মিরিয়মের সৌন্দর্যের লালসায় তাহাকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই ছত্রিশগড়ের সুবাদার তাহাকে অকলঙ্কিতা রাখে নাই, ইহা সত্য। আর তাহা না হইলেও নারী পর-পুরুষ স্পৃষ্টা হইলেই কলুষিতা হইল বলিয়া শাস্ত্রে লেখে। সেই মিরিয়ম সেই সোরাবের জন্যই সোরাবের অশ্বেই পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু মিরিয়মই শেষে সোরাবের সঙ্গে একত্র বাসের জন্য স্বীকৃতা হইল না, কারণ সোরাব দস্যুদের দলপতি হইয়াছে, সে এখন বহু নারীর মালিক, মাতাল, পরস্ত্রীগামী।

মিরিয়মের দুঃখ বড়ই মর্ম্মান্তিক। সেই জেলের মেয়ের জীবনই তো তাহার ভাল ছিল। কেমন সুন্দর সাগরের তীরে, প্রকৃতির কোলে সে প্রেমময় সহচরের সহিত স্বচ্ছন্দ ক্রীড়া করিত। সভ্যতার বার্তা সেখানে পৌছে নাই, হিংসা-দ্বেষ তাহারা জানে না। কি মধুর সরল জীবন। সোরাবও প্রকৃতির পুত্র। দ্বন্দ্ব করা তাহার স্বভাব ছিল না। মেঘে সিন্ধুতে কলহ দেখিবার তাহার সাধ ছিল, তাই সে কলহের মধ্যে যে কোলাহলের সৃষ্টি সে নিজে করিল, তাহারই ফলভোগ সে করিল।

যে হেতু সে ছত্রিশগড়ের নায়কদের ডুবিয়া মরার হাত থেকে বাঁচাইয়া উপকার করিয়াছিল, সে হেতু তাহারা সোরাবকে ফকির করিল। তাহারাই তাহার সাবলীল জীবনের মধুর গতির মধ্য হইতে মিরিয়মের দাবী করিয়া এই জীবন মরুময় করিল। আর সোরাব মিরিয়মকে হারাইয়া মানুষ রহিল না।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে মধুর চিত্র এই ছোট-গল্পটিতে আঁকিয়াছেন তাহা যে কি উপভোগ্য, তাহা না পড়িলে বোঝা যায় না।

তিনি বুঝাইয়াছেন, দৈহিক সুখে সুখ নাই। যদি মনকে ফিরাইয়া থাকিতে পার তবে সোরাব, তুমি আমায় বিবাহ কর। এই সাগরের কূলে নারিকেল বীথিতে বসিয়া, লুকাইয়া ছুটিয়া, শুইয়া আমরা যে শান্তি পাইতাম, যদি সেই পরম শান্তি এখন সোরাব আমরা আবার ফিরাইয়া পাই তবে এস আমরা মিলিত হই। নতুবা কেন; আর কেন? ভোগে সুখ নাই ত্যাগেই শান্তি; তাই যখন আর সম্ভব হইল না, তখন তুমি যাও, আমিও যাই, এ জন্মে এইটুকুই শেষ। বস্তুতঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই ছোট-গল্পটিতে যে শিশু-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পরম রমণীয় হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "রোসিনারা" ছোট-গল্প ১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহা খাঁটি ইতিহাসোক্ত চরিত্র কি না জানা যায় না।

বাদসাহ ফিরোক্সায়ার অবশ্য ইতিহাসের চরিত্র, কিন্তু আমীর-উল-উমারা-কুতুব-উল-মুলুক আবদুল্লা খাঁ নামে বাদশাহ ফিরোক সায়ারের প্রধান মন্ত্রী ছিল কি না, তাহা ইতিহাস-বেত্তাই জানেন এবং রাজা রতন চাঁদ প্রধান মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ব্যক্তি কে ছিলেন তাহাও ঐতিহাসিকেরা অবগত আছেন।

"রোসিনারা" ছোট-গল্পটি কেমন যেন "দৈব বল পরম বল" প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাসের তথ্য বলিতে উহা যেরূপ উদ্যোগী, দৈবশক্তি বলিয়া একটা জিনিস জগতে আছে, "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" একথাও যেন লেখক প্রকাশ করিয়াছেন।

"রোসিনারা" ছোট গল্পে ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেখাইয়াছেন, যখন দুর্ম্মতি, পাপিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রধান মন্ত্রী আবদুল্লা খাঁ যুবতী পর নারীদের ধর্ম্ম নাশ করিয়া করিয়া অত্যন্ত সাহসী ও লোলুপ হইয়া পড়িয়া রোসিনারা নাম্নী সুন্দরীকেও হরণ করাইয়া তাহাকে কামপূরণে আহ্বান করিল, তখন একটি ভগবৎ-প্রেরিত শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অদৃশ্য সহায়ই দৈব বলে বলীয়ান বীর, যাহাকে কেহ রোধ করিতে পারে নাই এবং যে সেই আবদুল্লা পাপাত্মাকে ও সেই পাপাত্মার সাহায্যকারী রাজা রতনচাঁদকে শাস্তি দিয়াছিল।

১৩০০ বঙ্গাব্দে লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "কাঠুরিয়া" ছোট-গল্প "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা একটি বৈদেশিক ছোট-গল্প হইতে অনূদিত বলিয়া লেখক

স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উহার আলোচনা হইতে বিরত হইতে হইল।

জাল কুঞ্জলাল। সাহিত্য, ১৩০০ বঙ্গাব্দ

লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "জাল কুঞ্জলাল" ছোট-গল্প ১৩০০ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা ডিটেকটিভ জাতীয় গল্প। ডিটেক্‌টিভ গল্পে মারামারি, হত্যাকাণ্ড, খুন ধরা, চাঞ্চল্যকর পলায়ন, রোমাঞ্চ, শিহরণ প্রভৃতি বর্তমান। কিন্তু ইহাতে ছোট-গল্পের ছোট গল্পত্বের অভাব। যদিও এই জাতীয় গল্প পাঠক পাঠিকার পড়িতে কৌতূহল হয়, কারণ উহা চাঞ্চল্যকর উপাদানে গ্রথিত, তথাপি উহা ছোট-গল্প নহে। একে উহাতে চরিত্রাঙ্কণ বা চরিত্র বিশ্লেষণ নাই, তাহাতে শুধু ঘটনার পরিবর্ত্তন ঘটায় গল্পের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। উহাতে পাঠক পাঠিকার মনে রোমাঞ্চ জাগতে পারে, কিন্তু সহানুভূতি জাগাইতে পারে না। ডিটেক্‌টিভ গল্পে যে ঘটনা-সমষ্টি দেখা যায়, উহার নাটকীয় প্রভাব অত্যন্ত কম। পাঠক পাঠিকা অতিবহুল ঘটনাংশকে নাটকোচিত ভাবে মনে স্থান দিতে পারে না।

ইহাতে আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে, উহা যেন মানুষের কল্পনাশক্তির সাহায্যে রচিত বলিয়া মনে হয় না।

ছায়া। ভারতী। ১৩০০ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "ছায়া" নামক ছোট গল্প ১৩০০ বঙ্গাব্দে "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা "জাল কুঞ্জলালের" ন্যায় ডিটেকটিভ গল্প না হইলেও একটি রহস্যপূর্ণ গল্প। এই জাতীয় ছোট গল্প পাঠকপাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ছোট গল্প বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র ধরণের।

নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের 'ছায়া' ছোট গল্পে চরিত্রাঙ্কনের নীতির বিশেষ অভাব এবং যে করুণ দৃশ্য উহার উপসংহারে বর্তমান আছে, তাহাতে পাঠক পাঠিকার হৃদয় আর্দ্র হয় না বরং ক্রোধে পূর্ণ হয়।

'ছায়া' চির অন্ধকারে আবৃত। উহা পড়িয়া মনে হয়, লেখক তাঁহার জীবনের নিবিড় গুপ্ত অভিজ্ঞতা ছায়ার আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যেন উহার প্রকাশ পছন্দ করেন না।

বাদলকে পাঠকের দেখিতে ইচ্ছা করিবে। সে ... কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল। সে বাঙ্গালীর মেয়ে ... পরদেশিনী, যুবতী না কিশোরী তাহা পাঠক নিশ্চয় ... পারেন না। সে সম্ভবতঃ মীরাণ যুবতী।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নায়ক বাঙ্গালী হইয়া পরদেশিনী বিবাহ করায় লেখকের অসবর্ণ, অপ্রাদেশিক, আন্তর্জা... বিবাহের প্রতি অভিলাস সূচিত করে, কিন্তু তাঁহার ... কোনও ছোট গল্পে এরূপ অদ্ভূত উক্তি বা যুক্তি ... যায় না।

কাহার ভ্রম, সাহিত্য, ১৩০০ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের 'কাহার ভ্রম' ছোট গল্প ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গল্প ত অল্প, ভারতী, ১৩০১ বঙ্গাব্দ

১৩০১ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'গল্প ত অল্প' 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। 'গল্প ত অল্প' ছোট গল্প নহে। ইহা চুটকি। ইহাকে দৈনিক সংবাদ ... 'রবিবারের রঙ্গ' শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

হীরার মূল্য, প্রদীপ, ১৩০৫

১৩০৫ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'হীরার মূল্য' নামক ছোট গল্প 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ইহা 'ছায়া' 'জাল কুঞ্জলাল' প্রভৃতি ডিটেকটিভ জাতীয় গল্পের মত।

'হীরার মূল্য' ডিটেকটিভ গল্পের বিষয়টি তো মাত্র ... যে, দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একখানি হীরক খণ্ড হারাইয়া যাওয়ায় তাহার সন্ধান কিরূপে করা হইয়াছিল ইহা ... করা হইয়াছে।

যদিও নবাব আসরফ জঙ্গের লয়লা বেগম বা জ... গুপ্ত প্রেম দেখানো লেখকের একটু ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা ... যায় তাহা হইলেও ইহা এই সি, আই, ডি-গিরির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে।

ইরাণী লয়লা যে ইরাণ দারার সহিত প্রেমাবদ্ধ ছিল, ... নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত এই ডিটেকটিভ গল্পটার উপসংহারে ... আভাস দিয়াছেন মাত্র। উহাতে ছোট গল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। এরূপ দুই একটি স্পর্শ ডিটেকটি গল্পেও বর্তমান ...

থাকে কিন্তু উহা ছোট গল্পে পরিণত হয় না। উহা ডিটেকটিভ গল্পকে সমৃদ্ধ করে মাত্র, কিন্তু নগেন্দ্র গুপ্তের বোম্বেটে, ১৩০৫ বঙ্গাব্দের প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহা পড়িয়া বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেবী চৌধুরাণীর" কথা মনে পড়ে। এ যেন ঠিক সেই প্রফুল্লর ডাকাত দলের অধিনেত্রীত্বের ঘটনা। সেই ছিপ, সেই ইউরোপীয়দের সাহায্য গ্রহণ, সেই সব।

সে যাহা হউক বাস্তবিক "বোম্বেটে"তে নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

চিত্রার চরিত্র, সাহসিকতা, কূট রাজনীতিজ্ঞান, দল গঠনে ক্ষমতা দেখিয়া মনে হয় যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাঙ্গালী নারীর ভিতর একটা স্বাধীনতার ভাব ও অন্যায়ের প্রতিকার করিবার কঠোর প্রেরণা আনিতে চাহিয়াছেন।

ইহা যেন বিদেশীয় প্রেরণা। নারী অবলা বলিয়া হিন্দুস্থানে যে গালি আছে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আপ্রাণ চেষ্টা লেখক এই ছোট-গল্পে করিয়াছেন।

বাঙ্গালী পুরুষের কাপুরুষতা প্রবাদ বাক্য এবং বাঙ্গালী নারীর অবলাত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং এ জাতি জাগিতে পারে না, এই অপমান নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের প্রতি শিরায় ও ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাই তিনি চিত্রাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চিত্রা সুন্দরী, সাধ্বী, সাহসিকা, ইহাই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর মেয়েদের মত পরনির্ভরা হইলে চিত্রার সেদিন কি বিপদ ঘটিত। বোম্বেটে জল দস্যুরা সে রাত্রিতে যখন চিত্রাদের নৌকা আটক করিয়া চিত্রার স্বামীকে বন্দী করিল, চিত্রার শ্বশুরকে আবদ্ধ করিল এবং চিত্রার নৌকারোহীদের হত্যা করিল, তখন তাহারা যদি চিত্রাকে ধরিতে পারিত তবে তাহাকে হত্যা না করিয়া কুলধর্ম নাশের চেষ্টা তাহারা সর্বাগ্রে করিত, এই বিপদ যেমন চিত্রার সম্মুখে গুরুতর, তেমন ঘোরান্ধকার নিশীথে উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল নদী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুবিয়া বাঁচাও তেমনি অসম্ভব কার্য্য ছিল, কিন্তু চিত্রা এই উভয় বিপদের ভিতর হইতে সেই স্রোত সমাকুল নদীতে লম্ফ দিয়া আত্মবিসর্জন বাছিয়া লইল, তবুও তাহার সতীত্বমণি রক্ষা হইবে।

তারপর চিত্রা সাঁতরাইয়া কূলে উঠিয়া পথের মালিককে স্মরণ করিতে করিতে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী পার হইয়া শ্বশুরের দেশে গিয়া পৌছিল। বিপদের কাণ্ডারী তাহাকে বিপদ উদ্ধার করিলেন।

কিন্তু বীরহৃদয়া চিত্রা নিজে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিশ্চিন্ত রহিল না, কারণ তাহার স্বামী, ও শ্বশুর শত্রুকরতলে রহিয়াছে।

সে অনুমান করিতে পারিল না, শত্রুদল তাঁহাদের উপর কি বিষম উৎপীড়ন করিবে, কিন্তু চিত্রা সমরকুশল সৈনিকের মত উহাদের উদ্ধারের পন্থা নির্দেশ করিতে লাগিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে পদ্ধতিতে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এখানে প্রস্তুত করিয়াছেন, এরূপ নারীর শিক্ষা এই দেশে থাকিলে আজ এ দেশ আর পরাধীন থাকিত না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

তিনি আদিত্য বাবুর ধ্বংসের কথা বলিয়া এখানে আর একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যেখানে নারীর অবমাননা হয় সেইখানেই প্রকৃতি ধ্বংস লীলা দেখিতে ভালবাসেন, কারণ প্রকৃতিও নারী। চিত্রার এরূপ অবমাননা করিতে আদিত্য বাবু অগ্রসর হইয়াছিল, তাই যেকোনও রূপে তাহার পতন হইল।

এই ছোট-গল্পের যবনিকায় যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তাহা পাঠক পাঠিকার চোখে জলবিন্দু না আনয়ন করিয়া কঠিন জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে। পাঠক পাঠিকা চায় যে এরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটুক, এ নৃশংসতা নহে, ইহা কাম্য ও কর্তব্য। সুতরাং 'বোম্বেটে' ছোট-গল্প করুণাত্মক না হইয়া বরং ভালই হইয়াছে।

এই জাতীয় ছোট-গল্পে যেরূপ ভাবোদ্দীপক ভাষার আবশ্যক নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাহা ইহাতে প্রয়োগ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাতে লেখক যে বলরামের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসঘাতকের চরিত্র।

প্রতিশোধ, প্রদীপ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ

নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের 'প্রতিশোধ' নামক ছোট-গল্প ১৩০৬ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইহা একটি চমৎকার ছোট-গল্প। ইহাতে যেন আর্ট বলিয়া একটা জিনিস প্রবেশ করিয়াছিল, তাই ক্রমেই ছোট গল্প মহত্তর উপাদানে গঠিত হইতেছিল বলিয়া লক্ষ্য করা যায়।

'প্রতিশোধ' ছোট-গল্পে যে উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বেশ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ্য করিবার জিনিস প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথমতঃ অতুলের পণ্ডিত মহাশয়ের এরূপ ব্যঙ্গচিত্র কাগজে অঙ্কিত করা উচিত হইয়াছে কি না। ইহার প্রকৃত উত্তর এই যে ছাত্র হিসাবে অতুলের পণ্ডিত মহাশয়ের ওরূপ ছবি কাগজে আঁকা ঘোর অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে একে গুরুজনের অপমান করা হিসাবে মহা পাপ, তাহাতে অতুলের পড়ার প্রতি অমনোযোগ প্রকাশ পায়। এই দেশের নীতি-বাক্য, 'মান্য করিবে, ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে।' ইহার অবমাননা আধুনিক যুগের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবল সংক্রামক ব্যাধিবৎ দৃষ্ট হয়। ইহার মূলে বর্তমানের শিক্ষায় দুর্নীতি পরায়ণতা, পাশ্চাত্য প্রভাব। এই প্রদেশের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, সে যুগে ছাত্রদিগের মধ্যে এরূপ অমান্যতা, অনাচার ছিল না। তাহারা শিক্ষককে শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু মনে করিত। শিক্ষকের কর্তব্যও তখন ছিল না যে ছাত্রকে দুই পৃষ্ঠা পড়া পড়াইলেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হইল। গুরু ছিলেন শিষ্যের নৈতিক জীবনে কর্ণধার স্বরূপ। শিষ্য কিরূপে চরিত্রবান, সংযমী ব্রতপালনক্ষম, স্বাস্থ্যবান হইবে, ব্রহ্মচর্য পালন করিবে, ব্যবহারিক জীবনে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে নিষ্ঠ হইবে, সত্য, ন্যায়, মর্য্যাদা, ক্ষমা দয়া, দানশীলতা প্রভৃতি সদগুণে ভূষিত হইবে, ইহার সমস্ত দিক লক্ষ্য করিয়া গুরুকে শিক্ষা দান করিতে হইত। আর আধুনিক কালে শিক্ষকদের সে সব কার্যের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাই ছাত্র শিক্ষকের পড়াইবার কালে শিক্ষককে ব্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া মাথায় পাগড়ি দিয়া পিছনে লেজ পরাইয়া বহুরূপী সাজায়। শিশুগণ ব্রততী সদৃশ, সরলমনা। বাল্যকাল হইতে তেমন আদর্শ আজকাল তাহারা সম্মুখে পায় না, যাহা ধরিয়া তাহারা সম্মুখ প্রশান্ত জীবনে উর্দ্ধে উঠিতে পারে। শিক্ষকদের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা নাই, সঙ্কল্প নাই, সত্যের মর্যাদা নাই, তাঁহারা অসংযমী, তাই ছাত্রেরা তাহাদের অনুকরণ করে না। তাহারা শিক্ষকদের শিক্ষাদানে রস ও আনন্দ পায় না, সে জন্য তাহারা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। শিক্ষক হইতে হইলে আদর্শ পুরুষ হওয়া চাই। অতএব অতুলের এরূপ কার্য করা ঘোর দূষণীয় এবং উহা বর্তমান শিক্ষা প্রণালীকে অবনতি করিয়া দেয় এবং উহা যে এই দেশের উপযোগী নহে তাহা প্রমাণিত করে। উহা প্রাচ্যকে হারাইয়াছে, অথচ পাশ্চাত্যের জিনিসও উহা নহে। খাঁটি পাশ্চাত্য শিক্ষা উচ্চ স্তরের এবং তাহা পাশ্চাত্য দেশেই দেওয়া হইয়া থাকে।

নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের এই ছোট গল্পের লক্ষণীয় বিষয় দ্বিতীয়তঃ অবিনাশের কার্য। ইহা সমর্থন করা যায় না এইরূপ বিভীষণতা, যাহা বোধ হয় শুধু বিদেশের মাটিতে জন্মায়, তাহা করা কর্তব্য হয় নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে বিশ্বাস ঘাতকতা এই দেশের অভিশাপ। সে কারণ অবিনাশ অপরাধী। যদি অবিনাশের সতীর্থ বন্ধুর উপকার করার বাসনা থাকিত, কেন অতুল পণ্ডিত মহাশয়ের পড়ানো না শুনিয়া বাজে কাজ করিতেছে, তবে সে নিজে অতুলের কার্যকে আড় চোখে দেখিয়া দেখিয়া উপভোগ করিত না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পণ্ডিত মহাশয়ের পড়ানো না শুনিয়া অমনোযোগী হইত না এবং সে ছবি অতুলের হাত হইতে হঠাৎ কাড়িয়া লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট না লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে নম্রভাবে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বলিত যে অতুল মহা অন্যায় কার্য করিতেছে, পড়ানো শুনিতেছে না, তাই অবিনাশ ঘোর দোষী। একে সে নিজে অন্যায়কারী, অধিকন্তু বিভীষণ জাতীয়।

তৃতীয়তঃ লেখকের ইচ্ছা যে ছাত্রদের ভিতর একটা একতা বন্ধনের স্পৃহা জাগরিত হউক, একতাই ছাত্রদের মূল নীতি হউক। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়। তাহারা যদি এই দেশের কল্যাণের জন্য বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে ভারত ভূমি ভবিষ্যতে পরাধীন থাকিবে না। শিক্ষকেরা তাহাদের সে শিক্ষা প্রদান করুক।

নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত এই দেশের ছিন্নভিন্নতা দর্শন করিয়া বোধ হয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাই তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের দিনে (যখন লর্ড কার্জনের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল) এই ছোট গল্পের মধ্য দিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশে এমন শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, দেশবাসী তাঁহার এই ছোট গল্প পড়িয়া স্বদেশী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ইহা যেন চারণ সঙ্গীত।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যে তিনটি ছোট-গল্প 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় এই ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, বাহির হইয়াছিল :—

১। নিষ্ফল অপরাধ। ২। মায়াবিনী। ৩। মৃত্যু। সেগুলি বোধ হয় খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে। সেজন্য ঐগুলির আলোচনা এই গ্রন্থে অকর্তব্য।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের পরে লেখক নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের নিম্ন লিখিত ছোট গল্প সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১। ব্রাহ্মবাদ। ২। টিকিয়া শাহ। ৩। চন্দ্রাপীড়ের ঐশ্বর্য। ৪। ফুটবল ফাইনাল। ৫। জমাল জমিল। ৬। ছোট বৌ। ৭। সুরজ কওর। ৮। দেবরাত ও প্রসেন। ৯। শ্যামের রাজ-অন্তঃপুর। ১০। খেলা ঘরে। ১১। নিস্তারিণীর রাজনীতি। ১২। লক্ষহীরা। ১৩। পূজার পোঁষাক। ১৪। মিলন। ১৫। মেহের জান। ১৬। মালবিকা। ১৭। পুটেরাম। ১৮। দুই বার। ১৯। শাহ নাওয়াজ।

১ চুলের কলপ। ২। কোঁচার কথা। ৩। বিভ্রাট, এই তিনটি চুটকি গল্প।

বিবর্ত্তনবাদ ও বর্ত্তমান সভ্যতা

শ্রীপুরঞ্জয় রায়

বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রায়ই শুনিতাম তাঁহার বেত্র যষ্ঠীর প্রভাবে তিনি নাকি অনেক গর্দ্দভকে অশ্ব শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন এবং বহু অশ্বকে মানব শ্রেণীতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। অবশ্য তিনি বুদ্ধির উৎকর্ষের অর্থেই ঐ কথা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কথা বাদ দিলেও আজিও বহু পণ্ডিত এ বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস নাকি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে জীবজগৎ তথা মানবীয় সভ্যতা ক্রম বিবর্ত্তনবাদের প্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। কবে কোন যুগে পৃথিবীর জন্ম কালে এই জীব জগৎ কোন আদিম অবস্থায় ছিল, বায়বীয় অনু পরমাণু হইতে উদ্ভিদ তথা হইতে জলজ তথা হইতে অণ্ডজ, তথা হইতে পশু-পক্ষী, ও তথা হইতে বন মানুষ; (Ape man) গুহাবাসী মানুষ বা (cave man) তথা হইতে অরণ্যচারী মানুষ, তথা হইতে সভ্যতালোক দীপ্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানমণ্ডিত মানুষের উদ্ভব হইল ইহা নাকি তাঁহারা দুরূহ অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা হাতে কলমে কষিয়া নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতা জ্ঞানে বিজ্ঞানে নাকি অতীতের সভ্যতাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া দুর্নিবার বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে।—কোন কোন মনীষি নাকি স্বপ্ন দেখেন যে অদূর ভবিষ্যতে নাকি এমন দিন আসিবে যে দিন জগতে থাকিবে না কোন হানাহানি, বিদ্বেষ, কুশ্রীতা, দ্বন্দ্ব। সে দিন নাকি বিশ্বভ্রাতৃত্বে, বিশ্ব মানবত্বে প্রতিষ্ঠীত এই জগৎ ধারণ করিবে অপূর্ব্ব শ্রী আর সে জগতে বাস করিবে শুধু মানুষ নয়, অতি মানুষের দল।

হয়ত ইহা আজ অসম্ভব মনে হইলেও একদিন সত্যই সম্ভব হইবে কিন্তু মন ইহাতে সায় দেয় না।—সে বলে গর্দ্দভকে যতই বেত্রাঘাত কর সে গর্দ্দভই থাকিবে অশ্ব শ্রেণীতে উন্নীত হইবে না, অশ্বও কোন দিন মানব শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইবে না, অত্যধিক চেষ্টার ফলে তাহার নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে মাত্র।—জগতে যাহা কিছু বৈচিত্র্য যথা পশু-পক্ষী উদ্ভিদ পর্ব্বত সাগর নদ নদী সৃষ্টির আদিম অবস্থা হইতেই আছে কেবল মাত্র কালপ্রভাবে কিছু কিছু তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।—সভ্যতালোক-দৃপ্ত জ্ঞান গরিমায় জগতের আজ অন্যতম জাতি ইংরাজ যে দিন গুহাভ্যন্তরবাসী অসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল সে দিনও ধরিত্রীমাতার ক্রোড় আলঙ্কৃত করিয়া অন্যান্য সুসভ্য জাতি তাহাদের সভ্যতার বিজয় নিশান উড্ডীন

করিয়া এমনই করিয়াই সদম্ভে জগতের নিকট নিজ শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান গরিমা প্রচার করিয়াছিল। যুগে যুগে এক এক রাষ্ট্রের পতন হইয়াছে আবার অন্য রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইয়াছে এমনই করিয়াই একদিন রোমান সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা' চৈনিক সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা, সারাসান সভ্যতা, কেল্টিক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল আবার এমনই করিয়াই এক এক সভ্যতার পতন হইয়াছে—। কোন কোনটী বা লুপ্ত হইয়াছে কোন কোনটী বা লুপ্ত হইবার পথে বসিয়াছে আবার কোন কোনটির বা নব জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা প্রমাণিত হয় না যে সে সকল সভ্যতা বর্ত্তমান সভ্যতা হইতে নিকৃষ্ট ছিল বরং আজ লুপ্ত গৌরবরাজির পুনরুদ্ধারের ফলে দেখিতেছি, কতক কতক ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই ছিল। বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র প্রয়োগে যদি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তবে হয়ত আজ সভ্যতা চরমে উন্নীত হইয়াছে কিন্তু যদি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব অর্থে মানব জীবনের চরম অনুভূতি দর্শন হয় তবে আমরা বহু পশ্চাতে চলিয়া আসিয়াছি! কবে কোন আদিম যুগে, যেথানের ইতিহাস আজ লুপ্ত, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের পুণ্যভূমে যে বেদ উপনিষদের শ্লোকাদি প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল, আজিও সেই অমূল্য সম্পদরাজিকে তুচ্ছ করিবার মত নব সভ্যতার বিদ্যুৎচ্ছটায় সে সম্পদ পাইলাম না।—জানি অনেকে আমার মনের প্রাচীনত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, ভুলিও না শুধু দর্শন নহে—প্রকৃতিকে জয় করিবার এমন দুঃসহ অভিযান কোন যুগে আরব্ধ হইয়াছিল?—শারীর বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও বৈদ্যুতিক শক্তির সন্ধানে কোন যুগ এত সফলতার দাবী করিতে পারে? আমি শুধু বিনীত ভাবে তাঁহাদের বলি, নিজেদের অহঙ্কার একটু কমাইয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া যদি অনুসন্ধান করি তবে হয়ত দেখিতে পাইব যে সত্যকার অহঙ্কার করিবার মত বেশী সম্পদ আমাদের হাতে আজ নাই।—আজ কালের প্রভাবে সবই লুপ্ত তবুও কালকে তুচ্ছ করিয়া স্থপতি শিল্পে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে, কাব্যে ও দর্শনে যে কয়টা নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে সেগুলি আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত করিবে। জ্যোতিষে যে গবেষণা হইয়াছিল বর্ত্তমানের গবেষণা তাহার তুলনায় শিশু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্রেও সে কালের গাণিত আজিকার তুলনায় তুচ্ছ ছিল না।—হায় আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিমা গিয়াছে বদলাইয়া তাই আমরা বাঁধা বুলি কপ্চাইতেই অভ্যস্ত। তাহার ফলে আমরা মৃত জাতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের ধিক্কার দিতেছি আর মৃত জাতি সমূহ জীবন্ত জাতির সৌভাগ্য লাভ করিয়া অতীতের ভস্ম লইয়া নূতন সৃষ্টির কার্য্যে জীবন করিতেছে।

অতীত দিনেও গুহাবাসী মানব ছিল, আজও আছে অনার্য্য, কোল, ভীল আজও বিশেষ উন্নত হয় নাই, মানব সভ্যতায় তাহাদেব কোন দান নাই। প্রকৃতির সন্তান নিজ প্রয়োজনের তাগিদে যুগে যুগে আনিয়াছে নবালোক, যুগে যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছে ধরিত্রীমাতাকে।—সে ভার পড়িয়াছে এক এক সময়ে এক এক প্রান্তে। এককে গৌরব দান করিতে অপরকে হীন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।—উত্থান পতনের মধ্যে দিয়াই চলিয়াছে সভ্যতা—ইহাই ধর্ম্ম। এ জগতে চরম বলিয়া কিছু নাই—আছে কেবল পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে সৃষ্টির নিজ প্রয়োজনেই ধ্বংস ও সৃষ্টি।—উত্থান ও পতন। ক্রম বিবর্ত্তনের ফলে সমগ্র মানব একদা অতি মানবে উন্নীত হইবে ইহাও যেমন ভ্রান্ত ধারণা আবার সমগ্র মানব সমাজ একদিন নরকের ঘৃণ্য জীবে পরিণত হইবে ইহাও তেমনই ভ্রান্ত ধারণা।—বৈষ্ণব কবি বলেন 'কোটিকে গুটিক হয়'।—ধরিত্রী মাতা নিজ প্রয়োজনেই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে রাষ্ট্রে সমাজে এমনই এক একটি বিশেষ মানুষের সৃষ্টি করেন যিনি সূচনা করেন নব যুগের।—আবার বলি সৃষ্টির চরম বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের সমস্ত চিত্ত মনকে যাহারা ধাঁধাইয়া দেয় তাহারা ওই যুগশঙ্খ প্রবর্ত্তক ভগীরথের দল। সৃষ্টির প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহারা কোন ভাবে আত্ম বিকাশ করেন তাহার হিসাব নাই।—এই পারম্পর্য্য রক্ষা করাই তাঁহাদের কায। —এতদ্ব্যতীত যাঁহারা চরম বাণী লইয়া আসেন তাঁহারা থাকেন লোকলোচনের অন্তরালে—তাঁহারাই দর্শনের জন্মদাতা, তাঁহারা স্বতন্ত্র।

কবি মাধব আচার্য্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

চণ্ডীকাব্যের ভিতর দিয়া দেবী-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যে সব কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে শক্তি সাধনার পথ দেখাইয়াছেন এবং বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করিবার নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালী চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। জাতীয় উন্নতি সাধনায় এই সব কবির দান অপরিসীম। চণ্ডীমঙ্গল সাহিত্যের অন্যতম কবি মাধব আচার্য্যের জীবনকথাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

চণ্ডীদেবীর প্রচার ও মাহাত্ম্য বর্ণনাই চণ্ডীকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মঙ্গলচণ্ডী কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোনও পুরাণ বা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, চণ্ডীকাব্য বাংলা দেশের নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীকাব্যে ব্যাধ কালকেতু ও বণিক ধনপতির দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল গীতিকা নারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীত মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথার ভিতর দিয়া প্রচারিত ছিল বলিয়া মনে হয়। রচনাকাল সঠিক জানা যায় এরূপ চণ্ডীকাব্যের মধ্যে মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলই প্রাচীনতম। ইহা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

"ইন্দুবিন্দুবাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত ॥
সারদা চরণ সরোজ মধু লভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ॥"

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা" অর্থ ১৫০১ শক অর্থাৎ ১৫৭৯ খৃঃ। মুকুন্দরাম ইহার পরে অন্যভাবে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।

"মাধব আচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭৯ খৃঃ) পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল; চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ষষ্ঠ সং ১৮৩পৃঃ চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে কবি কঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ হইলেও মাধব আচার্য্যই মুকুন্দরামের পথপ্রদর্শক। এমন কি, মাধব আচার্য্যকে মুকুন্দরামের গুরু বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন "মাধব আচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ণ করেন। ঊষার সিন্দুর বর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে, শেষ ক্ষীণালোকে আধ-মুদিত জগৎ দৃশ্যের ন্যায় মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে মাধুর চণ্ডীকাব্য বিকাশের পূর্ব্বভাগ দেখাইতেছে। তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে।"

মাধব আচার্য্য তাঁহার কাব্যে আপন পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"পঞ্চ গৌড় নামে পৃথিবীর সার।
একবার নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার ॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি ॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারা বহে জল ॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগে যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥
মর্য্যাদার মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে যুদ্ধে সম দেবগুরু ॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য ॥"

অর্থাৎ তাঁহার সময়ে বাংলাদেশ সম্রাট আকবরের অধীনে আসিয়াছিল। আকবর প্রতাপশালী প্রজারঞ্জক রাজা বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মাধব আচার্য্য সপ্তগ্রামের অধিবাসী এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল পরাশর। পিতা পরাশর দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পূর্ব্ববঙ্গে অধিক প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মাধব আচার্য্য জন্মভূমি সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়া ছিলেন।

মাধব আচার্য্য একজন উচ্চ শ্রেণীর রসিক কবি ছি... তাঁহার রচিত কালকেতু ভাড় দত্তের বর্ণনায় যে ... সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপভোগ্য। মঙ্গলচণ্ডী বিষয়ক ... ছাড়া কতকগুলি রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনা ক... প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে ... আচার্য্যের ন্যায় একজন গুণী কবির আবির্ভাবে আম... গর্ব্ব অনুভব করি।

মরীচিকা

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

লেডি ডাক্তার রোগিনীর ঘর হতে বের হয়ে আসতেই শান্তিবাবু অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেমন দেখলেন "মিস্ লাহিড়ী" ?

"ভালোই, উদ্বেগের কোনই কারণ নেই" মিস লাহিড়ী কর্‌করে কাগজের ফী গুলি ব্যাগে ভর্‌তে ভর্‌তে বল্‌লেন, "তবে শান্তিবাবু, এ পেন ফল্‌স্ নয়, ডেলিভারী আজই হবে—"

"আজ" ? ডাক্তারের সঙ্গে রাস্তা অভিমুখে যেতে যেতে নৈরাশ্যের সঙ্গে চমকে উঠে একটু ব্যথিত স্বরে শান্তি বাবু বল্‌লেন—"কিন্তু মিস্ লাহিড়ী, ফুল টার্ম্‌স্ যে নয়, পাঁচটি বারতো হয়েছে, এমন কখনও হয় নি—"

"তা নাই বা হলো—" মিস্ লাহিড়ী তাঁর স্বাভাবিক হাল্কা একটু মিষ্টি হাসি হেসে গাড়ীতে চড়ে বসে, সেল্‌ফ ষ্টার্ট দিতে দিতে বল্‌লেন, "প্রত্যেক চান্সে যে একরকম হবে তার কোনও মানে নেই শান্তিবাবু, এইট মান্থসেও অনেক ছেলে হয়—" গাড়ী পা পা করে চলতে সুরু করলো, তারই সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে শান্তিবাবু বললেন—তাই বলুন মিস্ লাহিড়ী—, আবার কল দিলে তাড়াতাড়ি আসবেন, পাঁচটা মেয়ের পর এবার ছেলে—গণৎকার বলেছেন,—বৃহস্পতি দশমে কিনা—"

ডাক্তারের গাড়ী তখন অনেকদূর চলে গিয়েছে, ... বাবুর দরজায় নহবৎ বাজ্‌ছিল, সেই সানাইয়ের ... তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো, মিস লাহিড়ীর কথায় তাঁর ... শুষ্ক প্রান্তে একটু প্রফুল্লতার হাসি ফুটে উঠছে—" ... কন্যা সন্তানের পর এইবার তাঁর পুত্র হবে, জ্যোতিষ ... কখনও ভ্রান্ত নয়, অভাবনীয় আশা, অনন্তসুখ, অপ... সার্থকতা। বংশে তার প্রদীপ জ্বলবে, পিতৃত্বের অ... বিক দাবীতে তিনি বঞ্চিত হবেন না, রিক্ত আত্মা তাঁ... হয়ে পথ প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে না। আত্মার কল... হবেই।

কিন্তু কোটরগত চক্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাঁর ... একটু বেদনার ইঙ্গীত; যদি, যদি এই অসময়ের ... —যদি,—যদি—"

যেটুকু পথ গাড়ীর সঙ্গে চল্‌তে চলতে অগ্রসর হ... মন্থর পদে আবার সেটুকু ফিরে এলেন, সদরে কিছুক্ষ... রইলেন, যে লোকটি অক্লান্ত শ্রমে বাঁশী বাজাচ্ছি... ফোলা গালের দিকে তাকালেন, শুভ বন্দনায় তখন ... রাগিণী মুখরিত হয়ে উঠেছে।

আজ তাঁর বড় মেয়ে সুষমার বিয়ে। তখন ... সুরু হয়েছে, আসন্ন লগ্নের কর্ম্মব্যাস্ততায় উৎসবের মি...

কিন্তু কেন এই আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন? কেন এই কর্ম্মমুখরতা, এই বিরাট চঞ্চলতা, এই প্রাচুর্য্যের সমারোহ, এই কেনর সঠিক উত্তর কেউ কখনও দিতে পারবে কি?

সম্ভবতঃ নয়। মন অথবা হৃদয় নিয়ে কারবার যে সমাজে প্রলাপের মত নিরর্থক, এই "কেনর" উত্তর সে সমাজে সুদূর স্বপ্নের মতই অন্ধকারের রহস্যেই চির আবৃত হয়ে থাকবে।

শান্তিবাবু তখনও বংশীবাদকের নিরবচ্ছিন্ন শ্রমশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন পাঁচটি কন্যা সন্তানের পিতা তিনি, সামান্য বেতনে সওদাগরী অফিসের যে কেরাণী,—সে পরিচয় এবং সে চিহ্ন তাঁর দীনতম চেহারার শীর্ণ আকৃতিতে স্পষ্ট ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বয়স চল্লিশের কোঠায়, কিন্তু মনে হয় ষাঠ উত্তীর্ণ হয়েছে; এমনই জীর্ণ স্বাস্থ্যের পঙ্গু পরিচয় তাঁর সর্বাঙ্গে ঘিরে রয়েছে। এরই মধ্যে বার্দ্ধক্যের ছাপে চুল হয়েছে শুভ্র, চিন্তা রেখায়িত শীর্ণ ললাটে, কুঞ্চিত চামড়ার ঝুলে পড়া গালে সেগুলি নেমে পড়ছে। চক্ষু কোন্ অতল গর্ভে যে প্রবেশ করেছে, লক্ষ্য করলে শুধু তার জ্যোতিক্ষীণ মণি দুটী ঈষৎ উজ্বল হয়ে ওঠে।

'বাবা, পিসিমা বল্‌লেন, দাইকে খবর পাঠিয়েছ তো? মার বড্ড কষ্ট হচ্ছে'—

'দিয়েছি রে' বাপ মেজ মেয়ের মুখের দিকে করুণতম দৃষ্টি মেলে তাকালেন। স্ত্রীর কক্ষে এইবার তাঁকে একবার যেতে হবে, সেই যন্ত্রণাআকুলিত মুতির দিকে চেয়ে শুধু মূক হয়ে তাঁকে বসে থাকতে হবে, সেই অব্যক্ত বেদনাকে দৃষ্টিতে গ্রাস করতে হবে। কোনও সান্ত্বনা নেই, প্রতিবিধান নেই'—

দ্বিতলে সিড়ি দিয়ে উঠে প্রথম ঘরখানায় তিনি প্রবেশ করলেন। কক্ষের এক প্রান্তে ক'নের বন্ধুরা সুষমাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল। নত আননে সুষমা একটী মোড়ায় বসেছিল, পিতার পায়ের শব্দে সজল চোখ দুটি তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, ডাক্তার কি বলে গেলেন, আজকেই কি খোকা হবে?'

'তাইতো বল্‌লেন'—দ্রুতপদে পিতা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, আসন্ন কন্যা সম্প্রদানের একটা অব্যক্ত বেদনায় তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে এসেছিল। প্রাণের পুতুলী স্বর্গের সুষমা, মনের সব মাধুরী উজাড় করা ওই মেয়েকে আজ অপরের হাতে সমর্পণ করতে হবে; অসহ্য! ত্রস্ত পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে তিনি কোঁচার খুটে চোখ মুছে ফেল্‌লেন, স্ত্রীর ঘর অভিমুখে চল্‌তে সুরু করলেন।

শান্তি বাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে, চন্দনে চর্চিত করছিল যে মেয়েটি সুষমার সুগৌর ললাটখানি, সে বল্‌লে—'এ সব ঝঞ্ঝাট মিটলে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করলে বেশ হোত, নয় সুষমা, এ ব্যাপার তো আর নূতন নয়, নিত্যি যে অসময় ছেলে মেয়ে জন্মায় এ কথা মাসীমার ভাবা খুবই উচিৎ ছিল, তাহলে উৎসবের মধ্যে আর এ অঘটন ঘটতো না; 'কিন্তু সে যে অসম্ভব হয়ে উঠলো। গোপা' একটু ম্লান হাসে। সুষমা বল্‌লে, অশোকের সঙ্গে আমি তো পালিয়েও যেতে পারি, প্রেমাস্পদের সাথে নীড় বাঁধতে কার না সাধ যায় বল্? এই বিশ্বাসই তো বাপ মার মর্ম্মমূলে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো'—

পালিয়ে যেতে? হঠাৎ অঙ্কনকার্য গোপার স্তব্ধ হয়ে উঠলো বান্ধবীর মুখে, বল্‌লে যে 'তুমি কি এতই ভালোবাসতে অশোককে সুষমা?'

'বাসতুম, বাসি, এবং ভালবাসবোও তাকে চিরদিন গোপা, ভেবেছিলুম চির অভিশপ্ত কৈশর প্রেম বুঝি আমাদের সত্যই মূর্তিমান সাফল্যের বিজয় মাল্যে ঝলমলিয়ে উঠবে, সব ঠিক ঠাক, অশোকের পরীক্ষার পর আমাদের বিয়ে হবে'—

'সেই রকম তো আমিও শুনেছিলুম,—তা ভাঙ্গলো কেন এ বিয়ে? বিস্ময়ের কণ্ঠে গোপা জিজ্ঞেস করলো। এ খবর জানিস নে তুই? সুষমা একটু শ্লেষের হাসি হেসে বল্‌লো,—'বাপ মার অদৃষ্ট নাকি বরাবর এই কথা বল্‌তো, পুত্র গৌরবে তাঁরা বঞ্চিত হবেন, সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন না, হঠাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র করলে সব বিপর্যস্ত, করলে ওলোট পালোট; জননীর গর্ভে এবারে কন্যা নয়, পুত্র—দশমে বৃহস্পতির সঞ্চার ফল এই অভাবিত পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত থেমে সুষমা বল্‌লো

'জানিস গোপা, পুত্র, বংশের মর্য্যাদা, পিতৃত্বের গৌরব, মাতৃত্বের আশা উৎসাহ; সেই ছেলে আস্‌ছে সংসারে সে কী কম্ আনন্দের কথা, সত্যই কি তবে পুত্রের দীপ্তিতে তাঁদের অনুজ্জ্বল বংশের স্তিমিত প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—পুলকে পিতা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন,—ছেলে; আর বংশের প্রতি নির্লিপ্ত হলে চল্‌বেনা, পুত্রকে বংশ মর্য্যাদার উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অশোকের সঙ্গে সুষমার বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, ওরা নীচু ঘর; কৌলিন্য ভেঙ্গেছে একদিন। জানিস গোপা, এই স্বার্থের সংঘর্ষে ভেঙ্গে গেল সুষমার ভালোবাসা, অশোকের প্রেম, বংশ সন্তানের কুঠারাঘাতে দুটি অঙ্কুরিত জীবন—

নম্র কোমল স্বভাবের মেয়ে সুষমার রক্ত আজ গরম জলের মত টগবগ করে ফুটছে, প্রাণের বাঁধন ওর খুলে গিয়েছে, বাক্যস্রোতে ও আজ হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। হয়তো ওর কথা আজ ফুরোত না, চিরমূক কণ্ঠের ভাষা মুখরিত হয়ে উঠতো, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আহত কণ্ঠে গোপা বল্‌লে, আর বেশী কথা বলিস্‌নে ভাই, ক্লান্তিতে মুখ যে কালো হয়ে উঠবে।"

'সাদা মুখের সার্থকতা কোথায়?' তবুও সুষমা জিজ্ঞেস করলো, সংস্কারের স্থান যেখানে স্নেহের চেয়ে উচ্চে সেখানেই কি?

ঠিক সেই সময় গোটা কয়েক তরুণী মেয়ে কলরব করতে করতে ঘরে প্রবেশ করলো, হাতে ছিল এক পাথরের পাত্রে দুধ, সেটি মেঝেয় নামিয়ে হিন্দু বিবাহের শুভ লক্ষণ স্বরূপ সেই দুধে 'মোনামুনি' দুটি ভাসিয়ে দিয়ে বর এবং ক'নের ভবিষ্যত ভাগ্য পরীক্ষা করতে ওরা অধীর আগ্রহে সেই দিকে ঝুঁকে পড়লো।

আশ্চর্য—দৈবের ইঙ্গিত বর ও কন্যা স্বরূপ মোনামুনি দুটি বিপরীত পথে যাত্রা সুরু করলো, এবং এই চিহ্নই যে তাদের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি এই কথা ভাবতেই মেয়েরা আতঙ্কে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো, তবু দৈবের এ ইঙ্গিত মানবে না বলে, দুধের স্রোতের সাহায্যে ওই মূর্ত্তিমান ভবিষ্যতের মতই টুকটুকে লাল পদার্থ দুটীকে এক মুখী করতে ব্যর্থ চেষ্টায় মন দিল।

পরিহাসের তরল একটা দৃষ্টি নিয়ে সেই দিকে সুষমা তাকিয়েছিল, হঠাৎ সে বিরক্তির কণ্ঠে মেয়েগুলিকে [illegible] উঠলো, "ফাঁকী নিয়ে কেন তোমরা মনকে [illegible] চাইছো বলত? যা হবার নয়, হতে পারে না' হতে [illegible] না কখনও, দুটো দেশাচার, সামাজিক অনুষ্ঠান নি[illegible] তা সম্ভব হতে পারবে কখনও, নির্মূল হয়েছে যে [illegible] মূল, বৃথা তাকে পত্রে পুষ্পে সুন্দর করে তোলবার [illegible] বাসনা তোমাদের।"

তখন আসন্ন সন্ধ্যার দিগন্ত ঘনায়মান অন্ধকারে [illegible] হয়ে আস্‌ছে, তারই সঙ্গে বিবাহ প্রাঙ্গন আরও মু[illegible] হয়ে উঠেছে, বরের অভিনন্দনে সানাই বাজ্‌ছে [illegible] আরও জোরে জোরে, কিন্তু গৃহের গৃহিনী তখন [illegible] প্রসব বেদনায় ছটফট করছেন।

এমনই সময় সুষমার মেজো বোন এসে বললে, "[illegible] অশোকদা এসেছেন, তোমায় একবার ডাকছেন—"

"অশোক!" ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে উঠলো সুষমার [illegible] বল্‌লো, আমায় ডাক্‌ছে কেন রে এখন—

"কি জানি বিশেষ কি দরকারী কথা আছে যেন-"

"না না সে এখন হয় না" সমস্বরে তরুণী মেয়েরা [illegible] উঠলো, এখুনি বর এসে পড়বে, মেয়েমানুষের নিন্দে উঠ[illegible] কতক্ষণ বল্?

উঠে দাঁড়িয়ে সুষমা বল্‌লে, "নিন্দে তোমরা [illegible] বল? অশোকের সঙ্গে দুটো কথা বলাকে? কোথায় আ[illegible] রে সে পুষ্প?

"নীচে বারান্দায় দিদি।"

সুষমা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লো [illegible] ঝলমলে সাজসজ্জায়; ও যেন রূপের আলোয় ফেটে পড়[illegible] চাইছে, কিন্তু ওর গতির ভঙ্গিমায় নেই নব বধূর সে [illegible] জড়িমা মধুরতম কুণ্ঠা, ও যেন সৈনিক, যুদ্ধে জয়ী হবে।

"এই যে অশোক, এখন কেন এলে বলত?"

অশোক দাঁড়িয়েছিল বারান্দার এক পাশে, ওর [illegible] চুলগুলি নিতান্তই অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, গায়ে একটী [illegible] ছিটের কামিজ। দু' মুহূর্ত্ত প্রসারিত চোখে সুষমার অ[illegible] সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে একটী ছোট্ট নিশ্বাস ফে[illegible] বল্‌লো, "জানো, সুষমা এ বিয়ে হতে পারে না, আমি ভে[illegible] দেব বলে এসেছি"

"না না পরীক্ষার শেষ মুহূর্ত্তে অত অধীর হয়ো না অশোক, কি হয়েছে বল ?"

শুনলুম বরের স্বভাব শুধু কলুষিত নয়, সে নাকি এক স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করেছে, সে বউ এখনও জীবিত।"

"তা হোক অশোক, ভাগ্যের সত্যি রূপ যে এমনই হয়—"

"না, জ্যেঠামশাই নিশ্চয়ই এত খবর পান্নি, আমি এ বিয়ে ভাঙ্গবোই সুষমা।"

"তোমার পায়ে পড়ি অশোক, তুমি শান্ত হও, এখন আর কেলেঙ্কারী কোর না, তুমি কি জানো না, আজ বিয়ে ভাঙ্গলে, সে বিয়ে হওয়া কত কঠিন, বাবা বরের এ সত্য পরিচয় জান্‌লেও, কন্যা সম্প্রদান করতে বাধ্য হবেন, কেন না এর বেশী তাঁর সামর্থের বাইরে, বাঙ্গলা দেশের পাঁচটী মেয়ের কেরাণী এবং কুলীন বাপ তিনি।"

"সামর্থের বাইরে" শ্লেষের একটু হাসি অশোকের অধর প্রান্তকে কঠিন করে তুল্‌লো, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ও বল্‌লো বেশ তোমার কথাই রইলো সুষমা, কিন্তু সামর্থের বাইরে বলে পিতৃত্বকে মিছে সম্মানিত করতে চেও না। তুমি বল সংস্কারের স্থান স্নেহের চেয়ে অনেক, অনেক উঁচুতে—"

"এ কি অশোকবাবু, যে, আপনি না বর ?" একটী ভৃত্য ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো—"না রে ভজা, বর আমি না; বদ্‌লে গেছে সে ব্যবস্থা, তুই জানিসনে—" ?

"না দাদাবাবু, আমি তো জানিনে কিছু, কেন এমন হোল—"ভজা ছোট লোক, সে ভৃত্য, মাত্র কয়মাস এ গৃহে কাজ করেছিল, তবু ওর চোখ দুটী সজল হয়ে উঠলো, ব্যগ্রতা অজস্র ধারে ঝরে পড়ছিল। ওর সে চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অশোক বল্‌লে, "জানিস্‌নে ভজা তুই, তোর বাবুর যে খোকা হবে, খোকা ; বুঝেছিস তো, ছেলে, আমার সঙ্গে তোর দিদিমণির বিয়ে হলে যে কুল ভেঙ্গে যাবে, খোকাকে কি কুল ভাঙ্গা বংশে অভিনন্দিত করা চলে কখনও ? বংশের গৌরব যে ক্ষুণ্ণ হবে, মর্য্যাদা খর্ব হবে।" ও স্থানটা মুখরিত করে উচ্চ কণ্ঠে অশোক হেসে উঠলো, ওর সে বিকৃত হাসি সানাইর শব্দে মিশে গেল।

তখন বিবাহ প্রাঙ্গনে শঙ্খ-উলুধ্বনির রোল উঠেছে, "বর এসেছে" তুমুল ধ্বনি আকাশ বাতাসকেও যেন বিদীর্ণ করছে। একটী মানুষ ভিন্ন বর আর কিছুই নয়, তবু এত কৌতুক, এত কোলাহল কেন— ?" অশোক ও সুষমার মনে এক সঙ্গে এই প্রশ্ন উঠলো, কিন্তু এ রীতি চিরন্তনী, এ কেনর কোনও উত্তর নেই।

অশোক ত্রস্ত পায়ে বাইরে চলে গেল, ওর পায়ের চিহ্নর দিকে তাকিয়ে সুষমা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, ধীরে ধীরে চোখ দুটী ওর করলো জ্বালা, হয়ে এল ঝাপ্‌সা, ক্রমে তা সজল হয়ে উঠলো, ঝরঝর্ করে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সে স্রোতে চিত্রিত চন্দন গেল ভেসে, পাউডার গেল ধুয়ে, ক্রিম মুছ্‌লো, "না না এ দুর্বলতা সে কারও কাছে প্রকাশ করবে না" ত্রস্তে সুষমা ওর বেনারসী শাড়ীর একটী প্রান্ত দিয়ে মুখটা ঘষে মুছে ফেল্‌লো, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও যেন আরও স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে উঠলো।

বিবাহ বাসর। অনেকক্ষণ হোল সুষমার সঙ্গে বিকাশের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিকাশের বয়স বেশী নয়, পঁচিশ অথবা ছাব্বিশ, স্বাস্থ্য সুন্দর, তারুণ্যের দীপ্তি ওর মুখ খানিকে আরও কমনীয় করে তুলেছে। কেউ ভাবতে পারে না কখনও এ রূপের অন্তরালে কলুষিত চরিত্রের বিষ প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবু থাকে, ভাগ্য বড় কৃপণ হয়, বোধ করি তাই সুন্দরের পাশে কুৎসিতের স্থান, অবারিত, অবাধ, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

উৎসব প্রাঙ্গণ প্রায় অস্তমিত হয়ে এসেছে, উচ্ছ্বসিত কোলাহল মুখরিত কলরব শান্ত হয়েছে, বাসর ঘরে কয়েকটী মেয়ে রাত জাগ্‌বে পণ করেও গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সম্প্রদানের পরই সুষমা জননীর ঘরে গেছ্‌লো, ওই একটী অজানা অচেনা পুরুষের পাশে বসে থাকার চেয়ে জননীর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা অনেক তৃপ্তিদায়ক হবে ; কিন্তু জননী তখন প্রসব শয্যায়, করুণ চোখে একবার কন্যার মুখের দিকে চেয়ে কাতর অনুনয়ে বাসর ঘরে যেতে তাকে অনুরোধ করলেন।

অঙ্কের নিভৃত অবসরে বর বল্‌লে বধূকে, তোমায় আমার খুব ভালো লাগ্‌লো সুষমা, তোমার ?"

"ভালো"

"স্বামীর কাছে লজ্জা কি, স্পষ্ট করে, ভালো করে, সুন্দর করে বল সুষমা।"

এর চেয়ে স্পষ্ট, সুন্দর, ভালো ভাবা যে আমার চিরমূক হয়ে রইলো বিকাশবাবু"

"আমি তাকে মুখরিত করে তুলবো সুষমা—

"অসম্ভব"

"সম্ভব, যুগে যুগে এই সত্যই সম্ভব হয়ে এসেছে যে—"

ঠিক এমনই সময় বাসর ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। অশোক প্রবেশ করলো, সুষমার দিকে তাকিয়ে বললো, মেয়ে, সুষমা, তোমার একটা বোন হয়েছে—

"মেয়ে? অশোক কি বললে, মেয়ে হয়েছে?" সুষমা বলে উঠলো, সত্যি এ কথা, তুমি আঁতুর ঘরে গিয়েছিলে?"

উত্তর না দিয়ে অশোক সুষমার পানে চেয়ে রইল।

CALCUTTA UNIV. Acc. No. ... Book No. ...

বিবি-কা-মকবারা

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

মোগল বাদশারা যেমন শৌর্য্যে বীর্য্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাদের শিল্পানুরাগ ও প্রেমানুরাগও প্রবল ছিল। দুইজন মোগল সম্রাট—সাজাহান ও আওরঙ্গজেব, তাঁহাদের প্রেমাস্পদের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া অপূর্ব্ব শিল্প ও স্থাপত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। প্রেমিক সাজাহানের পত্নী-প্রীতি তাজমহলের প্রতি প্রস্তর খণ্ডে ও প্রতি পরমাণুতে প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র বিশ্বের নর-নারী চিত্তে অপার আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। সেই রকম আওরাঙ্গাবাদে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্নীর স্মৃতিসৌধ 'বিবি-কা-মকবারা' সম্রাটের পত্নীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। 'বিবি-কা-মকবারা' তাঁহারই মাতার সমাধিসৌধ তাজের অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াস হইলেও ইহার গঠন ভঙ্গিমা ও স্থাপত্য কৌশল পরম প্রীতিকর এবং সুদৃশ্য।

আওরাঙ্গাবাদ নিজাম রাজত্বের একটি প্রধান রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সুদৃশ্য স্থান। সুদূর অতীতকাল হইতে এই স্থানটী হিন্দু-মুসলমান বীরদের লীলার স্থান। ইহারই চারিপার্শ্বে দেবগিরি, ইলোরা, দৌলতাবাদে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামিয়া বহু সাধকের সাধনার ক্ষেত্রের খ্যাতি দেশ-বিদেশের নর-নারীকে আকর্ষিত করিতেছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের অতি প্রিয় বাসস্থান এই নগরটী ১৬১০ খৃঃ মালিক আম্বার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে কার্কী নামে এই গ্রাম পরিচিত ছিল। মালিক আম্বারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ফতে খাঁ এই পল্লীকে 'ফতেনগর' নামে অভিহিত করেন। আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের

চাঁদমিনার—দৌলতাবাদ

রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন সেই সময় এই স্থানে তাহার রাজধানী ছিল এবং তখন এই জনপদের নাম আওরঙ্গাবাদে পরিবর্ত্তিত হয়।

ক্ষুদ্র পল্লী তখন ৭৫০০ বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল জনপদে পরিণত হইল। বহু বৎসর যাবত মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকিবার গৌরব এই আওরঙ্গাবাদ অর্জ্জন করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব তাঁহার সম্রাট হইবার পর এখানে বাস করিতেন এবং তাঁহার নশ্বর দেহ এখানেই সমাধিস্থ করা রহিয়াছে। তিনি এই নগরের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের সুদৃঢ় সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া সুরক্ষিত করেন। শিল্প ও স্থাপত্য কৌশলের ও ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন ষ্টেশন হইতে নিজাম রাজ রেলপথে ৭২ মাইল গমন করিলে আওরঙ্গাবাদ সহরে উপনীত হওয়া যায়।

আওরঙ্গাবাদের সহিত বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। এইখানেই দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বীরশ্রেষ্ঠ শালিবাহন রাজা পাইথন রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহারই রাজ্যাধিকার সময় হইতে শালিবাহন সাল প্রচলন হয়। এখনও বহু প্রদেশের হিন্দুরা এই সাল ব্যবহার করেন।

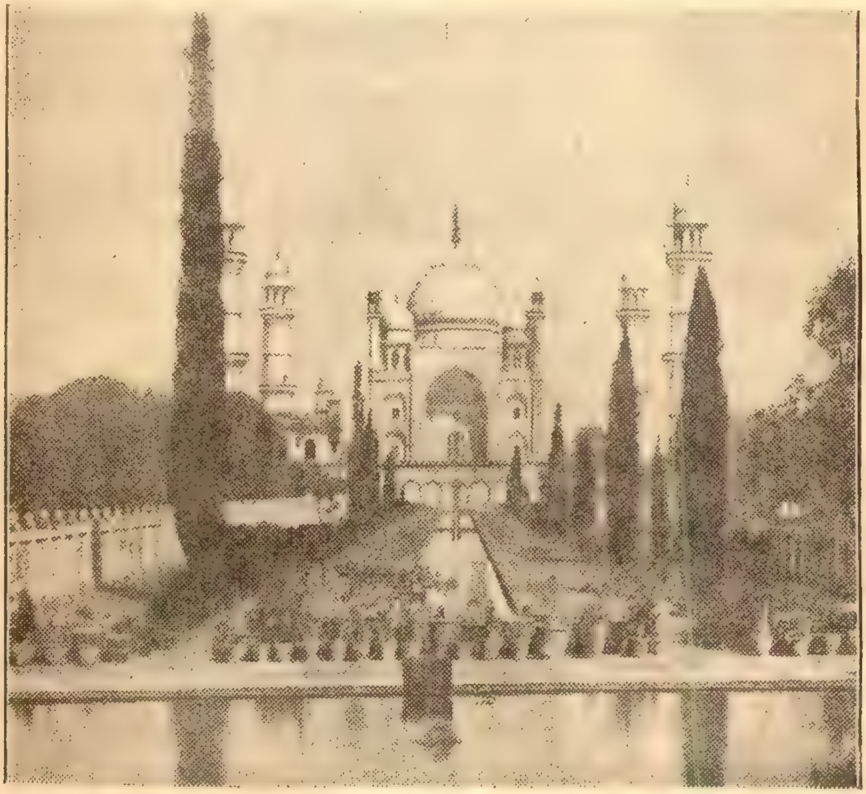

বিবি-কা-মক্‌বারা—ঔরঙ্গাবাদ

এখনও ইহার নগর তোরণ ও সৌধাবলীতে প্রতীয়মান হয়। 'মক্কা', 'জালনা', 'দিল্লী' ও 'পাইথ্যান' তোরণ এখনও মোগল সম্রাটের গরিমা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

যখন নিজাম এষ্টেটের ছোট ছোট রেলগাড়ী পার্ব্বত্য ভূমির ঢেউএর উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া আওরঙ্গাবাদের উত্তর দিয়া ছুটিয়া যায় তখন অতি মনোরম দৃশ্য চোখে ভাসিয়া উঠে। জি, আই, পি রেলের মানমদ

বর্ত্তমানে ইহারই সন্নিকটে দেবগিরির দুর্গম দুর্গ অবস্থিত। শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মুসলমানরা সেই দুর্গ দখল করিয়াছিলেন। মুসলমানরা তাহার পরই প্রথম দাক্ষিণাত্যের বিজয় অভিযান আরম্ভ করে। ভামিনী রাজগণের ইহাই প্রধান লীলার স্থল, পাঠান সম্রাট মহাম্মদ টোগলাক সেই দেবগিরিতে দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই দাউলতা-

বাদই মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজধানী হইয়াছিল। এই স্থানেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজাম ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল।

দৌলতাবাদ, রোউজা, ইলোরা, আওরাঙ্গবাদ কেন্দ্র করিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য ও শিল্প নিদর্শন বিরাজিত। দিল্লীর পরই আওরাঙ্গবাদ স্মৃতি সৌধের আকর। এইখানেই আওরাঙ্গজেব বাদসার সমাধি ক্ষেত্র। তাহা তৃণাবৃত ক্ষেত্র মাত্র, তাহার

দৌলতাবাদের দুর্গম দুর্গ

সমাধিস্থলে সম্রাটের আদেশে এপর্য্যন্ত কোন স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমানে নিজাম বাহাদুর এই স্থানটী মর্ম্মর প্রস্তরের জালির বেষ্টনী দিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন মাত্র।

আওরাঙ্গবাদ ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থান সহস্র সহস্র মুসলমান বীর, বাদশা, আমীরের সমাধিসৌধ বা তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট বক্ষে লইয়া রহিয়াছে। ষ্টেশন হইতে তিন মাইল গেলেই সেই সুদৃশ্য "বিবি-কা-মকবরা" সৌধ ও তাহার রমণীয় পুষ্পোদ্যান। এই সমাধি সৌধ সম্রাট আওরাঙ্গজেব সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাজের পরিকল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পত্নীরই স্মৃতি সৌধ বলিয়া খ্যাত। এই স্মৃতি সৌধটি কিন্তু তাহার কন্যা রবি-আ-দুরাণীর সমাধি সৌধ বলিয়া থিউফিলাস সাহেব লিখিয়াছেন। (I. S. R. M—Vol V1I Page 917)।

দূর হইতে ইহা তাজ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার গম্বুজ ও উপরি ভাগ মর্ম্মর প্রস্তরের কিন্তু নিম্নভাগ রক্তবর্ণ পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। সুসংস্কৃত ও সুরক্ষিত এই স্মৃতিসৌধ শিল্পানুরাগী মাত্রকেই আনন্দ প্রদান করিবে। ইহার জালির কার্য্য যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সুন্দর।

'বিবি কা মাক্‌বারার' ৪টী মিনার গগন চুম্বিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে উঠিলে আওরাঙ্গাবাদের চারি পার্শ্বস্থিত স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়! অদূরে পর্ব্বত গাত্রের গুহাগুলি যেন কপোত নীড়ের মতন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের স্থাপত্য ও নির্ম্মাণ কৌশল ইলোরার গুহাগুলির মতন নিপুণ শিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে।

আওরাঙ্গাবাদ ষ্টেশনের পার্শ্বে মড়োয়ারীদের বিরাট হিন্দু ধর্ম্মশালা আছে। বিজলী বাতি, জলের কল, পরিচ্ছন্ন ঘর যাত্রীদের নানা সুবিধা প্রদান করে। ৬৲ টাকা ভাড়া দিয়া একখানি মোটর গাড়ী লইলে ইলোরা, দউলতাবাদ দুর্গ, আওরাঙ্গজেবের কবরস্থান, বিবি-কা-মকবারা ও চাকীয়া জল প্রপাত দেখিয়া আসিতে পারা যায়। এখানে আতা ফল এবং পীচ আদি সুস্বাদু এবং স্বল্পমূল্য।

সীমা দেবী

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে অনেক তথ্যকথা বহুল পরিমাণে প্রবাদ, কিম্বদন্তী, উপকথা ও 'পৌরাণিক' কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় আমাদের ইতিবৃত্তের সবকথাগুলির উপর যথোচিৎ বিজ্ঞান সম্মত নিরেট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক সময়, অনুমান ও ঐতিহাসিক কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া কাঠামো প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাচীন কাহিনী বা পৌরাণিক আখ্যানের যদি কোনও পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায় তবেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা তাহাকে সম্ভব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্যথা তাহা ঐতিহাসিকের গ্রাহ্য হয় না। অবশ্য, যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাইলে, সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া কোনও দেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। ভারতের ইতিহাসের নানা তথ্য ও কাহিনী চীন দেশের প্রামাণিক ইতিহাসে নিবদ্ধ বিষয়-বস্তু হইতে অনেক পরিপোষক প্রমাণের বলে, সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে চীনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ও অলৌকিক তথ্য যাহা ভারতে কিম্বদন্তীরূপে প্রচলিত ছিল তাহা চীনের ইতিহাসের পাতায় সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসে য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ চীনের প্রাচীন প্রমাণাদি হইতে ভারত সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই প্রবন্ধে, বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ ঐতিহাসিক কথা আলোচনা করিব। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের কিম্বদন্তীতে সীমাদেবী নামক একজন রাণীর নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ মলয় প্রদেশের কোনও স্থানে তিনি রাজত্ব করিতেন। এই প্রদেশের নাম সম্ভবতঃ "কল-তান" কিংবা এইরূপ কোনও একটা ভারতীয় নাম হইবে। চীনের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া চীনের ইতিহাসে "হো-লো-তান" এই আকারে লিপিবদ্ধ আছে। যাহা হউক, খৃষ্টিয় পাঁচ শতাব্দীতে, এই ছোট রাজ্যটি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং এই রাজ্যের এক রাজা ৪৩০ খৃঃ অব্দ এবং ৪৫২ অব্দের মধ্যে, একাধিকবার চীন দেশের সম্রাটের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসের পাতায় তাঁহার নাম লেখা আছেঃ—শ্রীপদ্ম-দল বর্ম্মন। নাম দেখিয়া ভারতের ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হয়। বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ভারতের শৈলস্তব রাজবংশের, চালুক্য-রাজ বংশের অনেক ক্ষত্রিয় রাজ ও রাজকুমার মলয়দেশ, যবদ্বীপ, কম্বুজ-দেশ চম্পাদেশ প্রভৃতি নানা প্রদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং "কল-তান" বা ঐরূপ নামের রাজ্যের রাজা শ্রীপদ্মদল বর্ম্মন, ঐরূপ কোনও ভারতীয় রাজবংশের অবতংস ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই রাজ্যের আর একটী নাম ছিল হো-লিঙ্গ (সম্ভবতঃ কো-লিঙ্গ বা কলিঙ্গ)। বৃহত্তর ভারতের রাজারা অনেক সময়,—ভারতের বাহিরে এই সমস্ত উপনিবেশের নানাস্থান ভারতীয় নামে অভিহিত করিতেন। সাত শতকের চীনের ইতিহাসে প্রকাশ যে হো-লিঙ্গের শাসনে ২৮টী ছোট ছোট করদ রাজ্য ছিল—এবং এই ২৮টি রাজ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য ৩২ জন উচ্চ পদস্থ অধ্যক্ষ বা রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) নিয়োজিত ছিল; এই প্রতিনিধিগণের স্থানীয় শ্যামদেশী বা কম্বুজী নাম ছিল "খ্যামেৎ", অর্থাৎ শূর বা বীর। সুদূর আরব দেশ হইতে বণিকেরা জাহাজে করিয়া এইরাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যাহা হউক, ৬৭৪ অব্দে এই রাজ্যের রাজারা সীমা দেবীকে রাজ্যের রাণীর পদে বরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের কাহিনীতে প্রকাশ যে সীমাদেবী যেরূপ সুচারু রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা আর কোনও রাজ্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই কিম্বদন্তী এতকাল

কাল্পনিক গল্প বলিয়া উপহসিত হইয়াছে। সম্প্রতি চীনের ইতিহাসে এই কাহিনীর পরিপোষক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মা-তুয়ান-লিন্ নামক চীনের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থে নিম্নলিখিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছেঃ—"৬৭৪ অব্দে (চীনের কেতাবে অবশ্য চীন দেশের প্রচলিত তারিখ আছে) এই দেশের প্রজাগণ সীমা নাম্নী একজন মহিলাকে তাহাদের শাসক রূপে মনোনীত করিয়াছিল। এই রাণীর রাজ্য শাসন অতীব সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে। রাজপথে কেহ কোনও দ্রব্য ফেলিয়া গেলেও অন্য কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। আরব দেশের এক রাজকুমার এই রাণীর এইরূপ সুচারু রাজ্য শাসনের কথা শুনিয়া বিষয়টির সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য একটি থলে সুবর্ণ মুদ্রা বোঝাই করিয়া রাণীর রাজ্যের সীমানার মধ্যে, ঐ সোনার মোটটি লোক মারফৎ ফেলিয়া দিয়া আসেন। যে রাজপথে এই মোটটি ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেই পথে বহুলোক যাতায়াত করিত, কিন্তু পথিমধ্যে এই স্বর্ণস্তূপ সকলেই এড়াইয়া চলিত, কেহই স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে নাই। এই রূপে সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল ঐ মোহরের মোট পথের ধুলায় পড়িয়া রহিল। কোনও তস্কর, কিম্বা লোভী মানুষ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিত" একদিন রাজকুমার, যিনি ছিলেন রাজ্যের ভাবী রাজা,—তিনি ঐ মোহরের মোট পদদলিত করিয়াছিলেন। খবর শুনিয়া রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাণীর মন্ত্রীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া রাজকুমারের প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন বটে, কিন্তু রাণী রাজকুমারকে বলিলেন, তোমার নিজের মনে পাপ না থাকুক পাপটা তোমার পদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে সুতরাং প্রাণটা রাখিয়া পদদ্বয় ছেদন করিলেই চলিবে। মন্ত্রীরা আবার আসিয়া রাণীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর হুকুম হইল যে সমগ্র পাদযুগলের পরিবর্ত্তে পায়ের আঙ্গুলগুলো বলিদান দিলেই এ যাত্রা রক্ষা। তাই হইল কুমার বাহাদুর পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া জরিমানা দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এই আঙ্গুল কাটা রাজকুমার ভবিষ্যতের একটা দৃষ্টান্ত হইয়া রহিলেন। আরব দেশের রাজার এই রাজ্যটীর উপর একটু লোভ ছিল। নারীশাসিত রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করিবার একটা দুরভিসন্ধি ছিল। এই ঘটনার পর আর তিনি এই রাজ্যের কাছে ঘেঁসিতে সাহস পান নাই। বঙ্কিম চন্দ্রের সুবিখ্যাত গানের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয় "কে বলে মা তোমায় অবলে"। রাজ্ঞী সীমা দেবীর নারী হৃদয় হয়ত কুসুমের মত মৃদু ও পেলব ছিল,—কিন্তু তিনি যে 'বজ্রাদপি কঠিন' হৃদয় লইল, বজ্রমুষ্টিতে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিতেন, এই কথাটা এই ঐতিহাসিক আখ্যান হইতে সপ্রমাণ হইতেছে।

CALCUTTA UNIV
Sec. No ....
Book No ....
LIBRARY

দোঁহা

(তুলসীদাস)

শ্রীকৃষ্ণধন সিংহ

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন গজ
ইয়াকো একই আঁচ।
তুলসী ওয়াকো ক্যাগত্।
যাকো পিছে পাঁচ্।

অলী, পতঙ্গ মৃগ, মাছ আর হাতী
এক এক ইন্দ্রিয়াশক্তে নষ্ট হয় নিতি,
যে মানব পঞ্চেন্দ্রিয়ে দাস হয়ে রয়
তুলসীদাস ব'লে তাদের কি হবে উপায়।

পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম সম্বন্ধে মনীষিগণের মন্তব্য

(১)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পুরী বিধবাশ্রমের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

আমি তার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি কামনা করি।

ইতি ১২।১২।৩৯

স্বাঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

বিধবাশ্রম ও তৎসংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় আমার অভ্যর্থনার জন্য বেশ চমৎকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই দুইটী লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সরকার হইতে যথোচিত আর্থিক সাহায্য করিতে শুনিলে আমি অতীব প্রীত হইব।

বালিকা ও বিধবাদের হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মসম্মানবিশিষ্ট হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের যথেষ্ট সংস্থান করাই এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগ্নহৃদয়া ও নিজের সম্বন্ধে আস্থাহীনা নারীদের ন্যায় এই বিধবাদের মুখ বিষাদে ভরা। বিধবাশ্রমের উদ্দেশ্য—এই দুঃস্থা নারীদের মনে বিশ্বাস ও আশার আলোকসজ্জা করা—যাহাতে তাহারা প্রিয়তমের অভাবে অভিশপ্ত জীবন যাপন না করিয়া ব্যক্তিগত বেদনাকে মানবজাতির হিতকল্পে উৎসর্গ করিতে পারে এবং জানিতে পারে যে, যদি তাহারা সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সংস্কারে নিজদিগকে শিক্ষিত ও কর্ম্মকুশল করিতে পারে তবে বর্ত্তমান জীবনধারায় তাহাদের সচ্ছন্দময় স্থান আছে।

আমি এই দুইটী উদ্যমের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

স্বাঃ—সরোজিনী নাইডু।

২৯. ১১. ২৮.

(৩)

অদ্য অপরাহ্নে বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে বিধবাদের সাহায্যার্থে যে গৃহশিল্প ও হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সত্যই চমৎকার। পুরীর মত তীর্থস্থানে এবং ইহার শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য লেডী চাটার্জ্জি যে একটী বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। শিল্প বিভাগের যাহা কিছু উৎপন্ন দ্রব্য সবই উচ্চাঙ্গের। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, যিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ—যিনি বিধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য নানা কাজের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহার কাছে আমরা আজ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই শ্রেণীর অনেক প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশে এমনিভাবে গড়িয়া উঠুক্—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য।

স্বাঃ—শ্রীশ নন্দী।

মহারাজা, কাশীমবাজার।

২. ৫. ৩৩.

(৪)

পুরীর বিধবাশ্রম দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ভগবানকে উৎসর্গীকৃত যে কাজ তাহা ভগবৎ কৃপায়ই যেন সার্থক এবং সুন্দর হইয়া উঠে।

স্বাঃ—সি, এফ, এণ্ডরুজ্।

২. ১০. ২৩.

(৫)

অদ্য মধ্যাহ্নে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠানটী পরিদর্শন করিলাম। ইহা নির্ভুল প্রণালীতে পরিচালিত এবং হিন্দু সমাজের গভীর

সমস্যার সমাধানে যত্নবান। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

স্বাঃ—জি, এ, দেশপাণ্ডে।
সেক্রেটারী।
মহারাষ্ট্র প্রভিন্সিয়্যাল্ কংগ্রেস কমিটি।
পুনা।

(৬)

বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম এবং আশ্রমবাসিনীদের যে প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি পরিচালক সমিতির কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ—এম্ হের্‌লিংটন্ এম, এ
প্রিন্সিপ্যাল, গার্ল'স্ হাই স্কুল।
কালিম্পং, বেঙ্গল।

(৭)

আজ সকালে বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশ্রমে অনেক ভাল ভাল কাজ হইতেছে এবং আশ্রমটীও নির্ভুল উপায়ে পরিচালিত হইতেছে। আশ্রম আরও বড় হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং মূলধনের বৃদ্ধির আরও দরকার। ইহা সকলের সহানুভূতি লাভ করিলে আমি বড় সুখী হইব।

স্বাঃ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
কলিকাতা ১৫. ৪. ৩৯.

(৮)

আমাদের বিধবাদের শিক্ষার জন্য আশ্রমটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছে। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে সকল প্রকার সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। আশ্রমবাসিদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা তাহাদেরই যোগ্য বলিয়া আমি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেছি। যে শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার নমুনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবর্ষে এই প্রকার বহুসংখ্য[illegible] প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমে এই আশ্রমটী গড়িয়া উঠিয়া সাফল্য লা[illegible] করিয়াছে তাঁহারা সম্মানার্হ। আমি বিধবাশ্রমের উত্তরো[illegible] উন্নতি কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, ইহা যেন বহু দু[illegible] বিধবার মনে সুখ-শান্তি প্রদান করে।

স্বাঃ—সুভাসচন্দ্র ব[illegible]
৮. ৮. [illegible]

(৯)

আমরা বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া আন[illegible] হইয়াছি। আমরা সর্ব্বতোভাবে ইহার সাফল্য কামনা ক[illegible]

স্বাঃ—এন্, সিম্[illegible]
স্বাঃ—এস্. এন্. মল্লি[illegible]
স্বাঃ—আর সিন্[illegible]
২৭ ৪. [illegible]

(১০)

আমরা অদ্য অপরাহ্নে বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া [illegible] ইহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। আমরা [illegible] প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

স্বাঃ—সুখলতা রা[illegible]।
স্বাঃ—শৈলবালা দা[illegible]।
১৯. ৪. [illegible]

(১১)

আজ বিধবাশ্রম এবং তাহার কার্য্য শিক্ষার প্রণালী দেখি[illegible] আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। বিধবাদের সাহায্যকল্পে যা[illegible] কিছু করা হয় তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

আশ্রমটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক, ইহাই আমি কামনা করি

স্বাঃ—ডেভিস্
ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পু[illegible]।
১২. ৩. ৩৪.

(১২)

ভারতবর্ষে মহিলাদের উন্নতির জন্য আমি যখন কোন কাজের সূচনা এবং চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। যাঁহারা মহিলাদের উন্নতি বিধানে এরূপ মহৎ কার্য্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেনই—ইহাই আমি তাঁহার কাছে মনে প্রাণে আকুল প্রার্থনা জানাই।

স্বাঃ—(স্বামী) পরমানন্দ
২০. ৩. ৩৩

(১৩)

৩০শে এপ্রিল স্বর্গদ্বার বালিকা বিদ্যালয় এবং বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদান করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর। সে সময়ে আমাদের ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা এবং এজন্য আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে সেই সুন্দর অনুষ্ঠানটী শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমি এই প্রার্থনা জানাইলাম, আবার ফিরিয়া আসিয়া স্কুলের কার্য্যকলাপ আমি যেন দেখিতে পারি।

মিস্ মরোদ্দীকে লইয়া আমি ৫ই জুলাই পুনরায় স্কুল পরিদর্শন করিতে আসি। ছাত্রীগণের হস্তশিল্প যাহা দেখিলাম তাহা আমার কাছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁত ঘরে নানা প্রকার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীগণ যে হস্তশিল্পে এবং কুটীরশিল্পে এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতেছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আশ্রমে উড়িয়া ছাত্রীদের সংখ্যা আরও বেশী দেখিতে ইচ্ছা করি এবং ভবিষ্যতে বেশী হইবে বলিয়া আমি আশা রাখি। মিস্ গাঙ্গুলী ও তাঁহার সহকারী শিক্ষয়িত্রীগণ আমার যথারীতি আদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেজন্য আমি তাঁহাদের সকলের কাছেই চিরকৃতজ্ঞ। আমি ছাত্রীগণের কতকগুলি হাতের কজের জিনিষ ইত্যাদি ইংল্যাণ্ডের জন্য নিয়াছি এবং ভবিষ্যতে হস্তশিল্পের আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আমি আশা করিতেছি।

স্বাঃ—বি, হাবাক্।
উড়িষ্যার গবর্ণর-পত্নী।
৮. ৮. ৩৮.

(১৪)

আমি বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে কুটীরশিল্পের নানাবিধ কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। ইহা আশ্রয়হীনা হিন্দু বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না কয়েকজন সদাশয়া মহিলাদের কীর্ত্তিস্বরূপ। আশ্রমটী নিরাশ্রয়া ধর্ম্মপরায়ণা বিধবাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইহার সংলগ্ন বালিকা-বিদ্যালয়ে শিল্প বিভাগের এবং বাহিরের ছাত্রীদের যথারীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটীর উত্তরোত্তর উন্নতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের আভিজাত্য এবং শিক্ষিত অধিনায়কদের কাছে সকল প্রকার সহানুভূতি পাইবে বলিয়া আমি প্রার্থনা জানাইতেছি।

স্বাঃ—বি, সি, ভট্টাচার্য্য।
এম, এ, এফ, আর, জি, এস।
প্রফেসার—কাশী বিশ্ববিদ্যালয়।

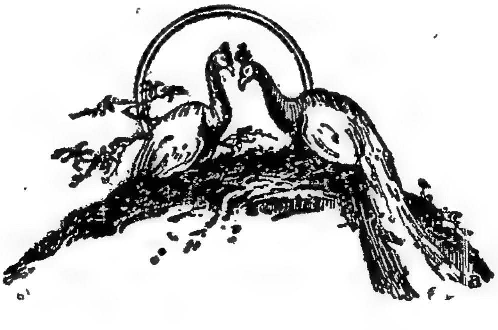

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পরলোকে প্রসন্নময়ী দেবী

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত মনীষি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্গবালা প্রসন্নময়ী দেবী। পাবনার হরিপুরে বিদ্যোৎসাহী জমিদার চৌধুরী বংশে তাঁহার জন্ম তাঁহার পিতা ছিলেন স্বনাম ধন্য দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁহার সাত পুত্র শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্যে, ধনে, মানে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জজ স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রাজনীতি বিশারদ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরী, অদ্বিতীয় শিকারী আইনজ্ঞ কুমুদ নাথ চৌধুরী, কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক সুহৃৎ চৌধুরী এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী অমিয় চৌধুরী মহাশয়গণ তাঁহার ভ্রাতা।

প্রসন্নময়ী ভ্রাতাদের সকলের জ্যেষ্ঠা, ১২৬২ সালের ১৪ ই আশ্বিন (ইং ১৮৫৬) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ সকলেই বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। সে যুগে আধুনিক শিক্ষার এমন সহজ ও সুগম ব্যবস্থা ছিল না এবং আভিজাত্য বংশের দুলালীদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের রীতি তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই জন্য বাল্যে প্রসন্নময়ী পিতার নিকটই তাহার বিদ্যাভ্যাস করেন। বংশের তদানীন্তন ধারা অনুসারে পাবনা গুনাইগাছার স্বর্গীয় কৃষ্ণ কুমার বাগচী মহাশয়ের সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হয়। তখন প্রসন্নময়ীর বয়স মাত্র দশ বৎসর; বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন। বাল্যে সুখে ও সমৃদ্ধির মধ্যে বর্দ্ধিত হইলেও যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি শোকের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন।

তাঁহার তাপিত হিয়ার শোকানল কিছু শান্ত হয় তাঁহার সাহিত্য সাধনার দ্বারা। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় কন্যার মর্ম্মবেদনা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সুশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ... শিখিবার জন্য মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছি... স্বয়ং কন্যার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ভার গ্রহণ ... ছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই প্রসন্নময়ী বাঙ্গলা সাহিত্য ... পটু হইয়া উঠেন।

'আধ আধ ভাষিণী' কবিতা পুস্তকটী তাঁহার ... বৎসর বয়সে ১৮৬০ খৃঃ, বাঙ্গলা ১২৭৬ সালে ... প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই তাঁহার কাব্য... বিকাশের আভাষ পাওয়া যায়। সে আজ সত্তোর ব... কথা—সে সময় বাঙ্গলার হিন্দু গৃহস্থ কন্যা যে এমন ... সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কম গৌরবের ... নহে। তখনও স্বর্ণকুমারী, গিরীন্দ্র মোহিনী, ... রায়ের যশগৌরব বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত হই... নাই।

তাঁহার এই পুস্তক পয়ার ছন্দেই অধিকাংশ লি... যথা—

> একেত অবলা নারী তাহে পরাধীনা
> কেমনে তোমারে পাবে এ সম্বলহীনা ॥
> শ্বশুর শ্বাশুড়ীগণ সবে প্রতিকুল।
> সতত থাকি হে নাথ ডরেতে আকুল ॥

তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'বনলতা' ১২৮৭ সালে ... খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া... এই বইখানির স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ... প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং আর্য্যদর্শন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন, ইণ্ডি... মিরর, ক্যালকাটা রিভিউ আদি প্রসিদ্ধ পত্রিকা... অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া ছিলেন।

প্রসন্নময়ীর তৃতীয় গ্রন্থ 'নীহারিকা'—প্রথমভাগ ... সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮১৮ শকাব্দে প্রকাশিত হ... কবির বিষাদময় জীবনের মর্ম্ম বেদনা এই বই দুইখা...

প্রতিছত্রে সেই করুণ স্বরই প্রবাহিত হইয়াছে। সংসারের সুখ দুঃখের ক্ষণিক হাসি-কান্নার মধ্যে কবি যে মঙ্গলময়ের করুণার ছবি আঁকিয়াছেন তাহা হিন্দু ললনার পক্ষেই সম্ভব।

প্রসন্নময়ীর অন্য রচনা অশোকা, উপন্যাসটি সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সিপাহি বিদ্রোহের ভয়াবহ চিত্র সে যুগের নর নারীর চিত্তে প্রভাব তখন বিস্তার করিয়াছিল।

তাঁহার আর্য্যাবর্ত্ত বইখানি একটি ভ্রমণ কাহিনী, 'পুর-কথা' পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র, 'তারা চরিত' একটী জীবনী, সবগুলি সর্ব্বজন প্রিয় হইয়াছিল।

তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং তিনি যে সাহিত্য সাধনার দ্বারা তাঁহার ব্যথিত হিয়ার তাপ ক্ষণিকের জন্যও উপশমিত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র তাঁহারই ন্যায় চির দুঃখিনী একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীকে শিক্ষাইয়া ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন।

প্রসন্নময়ী সাহিত্য সাধনায় এমনই এক নিষ্ঠ যে বৃদ্ধ বয়সে (আশী বৎসরে) যখন তাহার এক মাত্র অন্ধের যষ্ঠী স্বরূপ কন্যা প্রিয়ম্বদা পরলোকে গমন করিলেন, তখনও তিনি শান্ত চিত্তে কন্যার অপ্রকাশিত কবিতা গুলি সংগ্রহ করিয়া 'চটল ও পটল' নামে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া কন্যার স্মৃতি জাগাইতে প্রয়াস পান।

প্রসন্নময়ী দেবীর 'জন্মভূমি' কবিতাতে ও 'স্যার আশুতোষ জীবনী' (মাতৃভূমিতে মুদ্রিত) প্রবন্ধে তাঁহার স্বদেশ প্রেমের বিগত ৫০ বৎসর আগের সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র প্রকাশ পায়। তাঁহার কবিতা ও গদ্য রচনায় বিশ্লেষত্ব দেখা যায়। তাঁহার গদ্য লিখিবার ভঙ্গী বাঙ্গলা সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব প্রবীণা বিদুষী মহিলাদের কথা আজ কালকার লোকেদের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। যে মহিয়সী মহিলা ১৪ বৎসর হইতে সাহিত্য সাধনা করিয়া ৮৪ বৎসর বয়সে পরোলোক গমন করিলেন তাঁহার বিষয় সংবাদপত্রে বা পত্রিকায় তেমন উল্লিখিত হইল না।

আন্তঃ কলেজ বিতর্কে মহিলার কৃতিত্ব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজের উদ্যোগে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিষয় ছিল "সাতটী প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিদের পদত্যাগ সমিচীন কি না?" ইহার বিচারক ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, এস এন্ ব্যানার্জ্জি, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অধ্যাপক সুরাবার্দ্দি, এচ্ ডি বসু, নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি সন্তোষকুমার বসু, তুলসীচরণ গোস্বামীর ন্যায় কর্ম্মী ও সুধীজন। সিনেট হাউসে তর্ক সভায় ৪২ জন প্রতিযোগীতায় যোগদান করেন। তাহার মধ্যে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর ছাত্রী শ্রীমতী লীলা ইস্পেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আফজল ইকবাল নামে ছাত্রের সহিত সম নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছেন। গত বৎসর লাহোরের শ্রীমতী কমলা গুপ্ত প্রথম হইয়াছিলেন।

নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলন…

এ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রথম অধিবেশন লক্ষ্ণৌএ হয়। সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীমতী রেণুকা রায়, আর ইহার উদ্বোধন করেন মাননীয়া সরোজিনী নাইডু। ছাত্রীদের শিক্ষা পদ্ধতির এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা হয়। ছাত্রীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং মেয়েদের সংসার যাত্রা পুরুষ হইতে পৃথক থাকাই স্বভাবসিদ্ধ, গরীবদেশের মেয়ে-দের শিক্ষা অল্প ব্যয়ে হওয়া, অসাম্প্রদায়িক ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, মাতৃভাষার বাহনে শিক্ষা প্রদান করার প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

CALC
Acc. No ....
Book No ....
LIBR

অভিভাষণ

শ্রীসুহাসিনী বিশ্বাস

মাননীয়া মহিলাবৃন্দ ও অন্তরঙ্গ সখীগণ,

আজ যে বিশ্ববরেণ্যা মহীয়সী রমণীরত্নের স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলিদানের জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি তাঁহার গুণের কথা ভাষায় ব্যক্ত করিবার আমার সামর্থ্য নাই, তথাপি তাঁহার বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি ও মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রাখিয়াছি তাহারই যতটুকু বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব তাহাই আপনাদের কাছে বলিব। হৃদয়ের মহত্বে, প্রকৃতির মাধুর্য্যে, প্রীতির অনন্তপ্রসারে, পতিভক্তির পরাকাষ্ঠায়, জনহিতৈষণার উজ্জ্বল আদর্শে তিনি বঙ্গের, ভারতের, জগতের ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয়া। নারীজাতির দুঃখে ও তাঁহাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণের গভীর বেদনা তাঁহাকে যে কিরূপ আকুল করিত তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই নারী-মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠানটী। কিসে অসহায় নারীজাতি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও শ্রম ও শিল্পসাধনে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও আত্মীয় স্বজনের হিতসাধন করিতে পারে, সেই প্রচেষ্টাই তাঁহার জীবনের ব্রত ও চরম উদ্দেশ্য ছিল। ভগবান যেন তাঁহার পূত পবিত্র স্বর্গীয় আত্মার শাশ্বতী শান্তি বিধান করেন ইহাই, আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া সমপ্রাণে, সমস্বরে একাগ্রচিত্তে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি। যে রমণীকুলশিরোমণির উজ্জ্বল আদর্শে আজ সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত, যাঁহার নাম স্মরণ করিলে বঙ্গললনা মাত্রেরই প্রাণ গৌরবে ও [illegible] উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাঁহার জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য, [illegible] বৈচিত্র ও নারী জাতির একটি পরম সৌভাগ্যের ক[illegible] আজ আমি জীবন ধন্য জ্ঞান করিব। প্রাচ্য ও [illegible] দেশের কোথায় কবে কোন ভাগ্যবতী এম[illegible] করিয়াছেন যাঁহার স্বর্ণময়ী আনন্দ-প্রতিমা প্রিয়[illegible] হৃদয় মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত, চিরপূজিত ও চিরস[illegible] বিরাজ করিতেছে। ইহা পতিপ্রেম সাধনার চর[illegible] যাহাকে দেহান্তেও পতি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ চিন্তন করি[illegible] তাঁহার গৌরবগাথা অনন্তকাল সপ্তলোকে স্মৃত[illegible] প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও হইবে। পুরাণে সতীর [illegible] দেহ স্কন্ধে করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব উন্মত্তে[illegible] সারা বিশ্বে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, আর আজ [illegible] সরোজনলিনীর পতিদেবতা তাঁহার প্রাণময়ী মূ[illegible] করিয়া আত্মহারা প্রাণে সমস্ত জগতের সর্ব্বত্র ঘু[illegible] বেড়াইতেছেন। মর্ত্তে এ মধুর দৃশ্য অভিনব অ[illegible] অনির্ব্বচনীয়। মৃত্যু যে দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাই[illegible] নাই, আসুন আমরা সকলে আজ সেই চির অবিচ্ছিন্ন [illegible] যুগলের এই অনন্ত মিলনের কথা স্মরণ করিয়া জীব[illegible] জ্ঞান করি। *

* পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-সভার মহিলা দিবসে স[illegible] অভিভাষণ।

মহিলা সমিতি

পটুয়াখালী মহিলা সমিতির ১৯৩৯ সনের কার্য্য বিবরণী

বিগত ১৯৩৭।৩৮ সন হইতে সমিতিতে তাঁত বোনা, পাপোষ বোনা, দরজির কাজ, উলের বুনন ও নানাবিধ সীবন শিল্প শিখানো হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে ঐ সকল কাজ আরও ব্যাপকভাবে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে ক্যালিকো প্রিন্টিং শিক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐ কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এখনো উপযুক্ত জিনিস-পত্র কেনা হয় নাই। সেইজন্য ঐ শিক্ষা কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ করাও যায় নাই। আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচুর কাঁচা মাল আনাইয়া উক্ত শিল্পজাত জিনিস উৎপাদন করা যায়, সেইরূপ চেষ্টা করা হইবে।

সমিতির লাইব্রেরীতে বর্ত্তমান বৎসরে ৫০ টাকার বই কেনা হইয়াছে। অনেকগুলি পুরাতন পুস্তক বাঁধানো হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোন মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজ অর্থাভাবে রাখা হয় নাই। আগামী বৎসরে কয়েকখানি কাগজ রাখা একান্তই প্রয়োজন।

সমিতিতে এ বৎসর একটী খেলার বিভাগ খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি ১১ টাকার খেলার সরঞ্জাম কেনা হইয়াছে। আগামী বৎসরে ঐ বিভাগে আরও কিছু ব্যয় করিবার অভিপ্রায় আছে।

সমিতিতে সপ্তাহে একদিন দৈনিক সংবাদ পত্রাদির সার সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া একটি আলোচনা সভা হয়। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে বয়স্কা মহিলাদিগের জ্ঞানলাভার্থ ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বমূলক পুস্তকাদি পঠন পাঠন হইয়া থাকে। লাইব্রেরীতে আরও অন্যূন দুইশত টাকার পুস্তক ক্রয় করিতে পারিলে এই সকল ক্লাশ পরিচালনার অসুবিধা কতকটা দূরীভূত হইতে পারে।

বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে সমিতি একটি অবৈতনিক শিক্ষালয় পরিচালনা করিতেছে। প্রথমাবস্থায় উহার শিক্ষয়িত্রীও অবৈতনিক ছিলেন, সম্প্রতি যৎসামান্য বেতনের ব্যবস্থায় একজন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া ভালভাবে শিক্ষালয়ের কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।

বোর্ড, মাদুর, শ্লেট, পেন্সিল, বই ইত্যাদি শিক্ষালয় সংক্রান্ত জিনিসপত্র ক্রয় ও ঐ কাজের জন্য একখানি ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হওয়াতে যথেষ্টই খরচ করিতে হইতেছে।

ঐ শিক্ষালয়ে দরিদ্রবালিকারা (যারা কোন ক্রমেই অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল-পাঠশালায় পড়িতে সমর্থ নহে) এবং বয়স্কা নিরক্ষর মহিলাগণ (যাঁহাদের পক্ষে স্কুল পাঠশালায় যাওয়া অসম্ভব) শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পান।

অধিকাংশ দরিদ্রা ছাত্রীকেই সমিতি হইতে শ্লেট ও পুস্তকাদি ব্যবহার করিতে দিতে হয়। এই বিভাগে নিম্ন প্রাইমারীর উপযোগী বাংলা ও শুভঙ্করী এবং অবশ্য শিক্ষণীয় হিসাবে কয়েকপ্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

আগামী বৎসরে সমিতি উক্ত শিক্ষালয়ের ছাত্রীদিগের জন্য শিল্প শিক্ষার উপযোগী কাঁচামাল সম্পূর্ণ সরবরাহ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায় পোষণ করে।

ভবিষ্যতে খরচ চালাইতে পারিলে পটুয়াখালীর মধ্যে আরও ৩।৪টি ওয়ার্ডে সমিতি হইতে এইরূপ শিক্ষালয় খোলা হইবে নতুবা বিবাহিতা মহিলারা ইচ্ছা সত্ত্বেও দূরবর্ত্তী শিক্ষালয়ে অনেক স্থলেই যোগদান করিতে পারেন না।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মাত্র মাসিক দুই টাকা সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। অথচ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বুঝা যাইতেছে, এই প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন কত বেশী।

আগামী বৎসরে যাহাতে সমিতির সকল বিভাগের কার্য্যই উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা করা হইবে এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বিধবা ও অনাথা মহিলাদের শিল্প শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলে, আগামী বৎসর মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, প্রাথমিক সাহায্য, গৃহশুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য রেডক্রস সোসাইটি অথবা সেণ্টজন এ্যাম্বুলেন্সএর সহায়তা গ্রহণ করা হইবে।

সমিতির যে গৃহ আছে, তাহাতে সকল রকম কার্য্যের স্থান সংকুলান হয় না। শীঘ্রই ঘর বাড়ানো আবশ্যক। নানাদিক দিয়া যে ভাবে সমিতির কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এখন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। অথচ, এই দরিদ্র দেশে এজন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

সমিতির নিজস্ব আয় তেমন কিছুই নাই। যে সামান্য শিল্প দ্রব্য সমিতির ব্যয়ে উৎপাদিত হয়, তাহার লভ্যাংশ সমস্তই প্রস্তুতকারিণীকে দেওয়া হইতেছে। খরচের টাকার অতিরিক্ত আর কিছুই এখন পর্য্যন্ত সমিতিতে রাখা হয় না। লোকের আগ্রহ উদ্রিক্ত করিতে হইলে, প্রথমাবস্থায় সমিতিকে এইরূপ নীতিতেই চলিতে হইবে।

সমিতির অর্থ ভাণ্ডার সংক্ষিপ্ত বলিয়া অনেক শিক্ষার্থিনী নিজ ব্যয়ে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। তাঁহারা সমিতির তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সমিতির যন্ত্রপাতি ব্যবহ[illegible] কার্য্য করিলেও, মাত্র দরজি ক্লাশে মাসিক ।০ আনা [illegible] বেতন ও সেলাই কলে সেলাই বাবদ প্রত্যেকের নি[illegible] প্রতি জামায় দু'পয়সা ভাড়া ব্যতীত আর কোন কাছে কাহারও নিকট কিছু দাবী করা হয় না।

দরজিকে পারিশ্রমিক দিতে হয় ও সেলাই কলেরও ম[illegible] মধ্যে সংস্কারসাধন প্রয়োজন বলিয়াই এইভাবে স[illegible] কিছু আদায় করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপে কোন প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠি[illegible] হইতে পারে না। কেবল চাঁদা ও দানের উপর নির্ভ[illegible] করিয়া চিরকাল চলা অসম্ভব।

বর্ত্তমানে কেন্দ্র সমিতির এই সকল বিষয়ে বিশেষভা[illegible] দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন। আর্থিক সাহায্য, সৎপরাম[illegible] দান, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, শিক্ষাদানে সহায়তা করা ইত্যা[illegible] অনেক কিছুই করিবার ক্ষমতা কেন্দ্র সমিতির আছে।

আশাকরা যাইতেছে, পটুয়াখালী শাখা সমিতি উপযু[illegible] সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না।

সনেট

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

যখন জীবন কাঁদে অসীম ব্যথায়,
বিষাদ তমসা ঘিরে সুখের দীপালী ;
সেদিন তুমিও যেন নিওনা বিদায়
ভবিষ্যের পথে রেখো আশা-দীপ জ্বালি।
রঙ্গীন উত্তরী তব পূরবী আভায়
আমার চলার পথে বিজয় নিশান।
তুহিন-পঙ্কিল পথে শতেক বাধায়
তোমারে স্মরিয়া মোর হ'বে অভিযান।
পরাণে ছড়ায়ে দিও চৈতালী বাতাস,
ফুল রেণু ঝরে যেন যাত্রা-পথে মোর,
শীর্ণা নদী আনে যেন সুখের আভাস,
বসন্ত পরায়ে দেয় বনফুল-ডোর।
বাস্তবের ব্যথা যত পড়ে থাক দূরে
তোমারে যদিবা পাই রূপে রসে সুরে।

পুস্তক পরিচয়

দেহলি—(গল্প সংগ্রহ) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী প্রণীত। ১৬৫ পৃষ্ঠা, দাম ১৷০ প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা এবং তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। অভিজাত বংশের স্বভাবসুলভ উচ্চ হৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি ও মার্জ্জিত রুচি তাঁহার রচনাসম্ভারকে একটি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করিয়াছে, সে বৈশিষ্ট্য এত স্বচ্ছন্দ এবং স্বচ্ছ যে অপরের পক্ষে তাহা অনুকরণ করা একরূপ অসম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে সে বৈশিষ্ট্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বইখানিতে ছয়টি গল্প আছে ; 'চলাচল', 'দশমিকা-নবমিকা', 'চন্দ্রমণি', 'হাটতলা', 'সুদর্শনের সংসার' ও 'প্রসাদ'। ইহার মধ্যে প্রথম গল্পটিকে বড় গল্পই বলিতে হইবে। বইখানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। লেখিকা অভিজাতবংশীয়া হইয়াও বর্ত্তমান যুগের নানা সমাজকল্যাণ-কর প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মব্যপদেশে তাঁহাকে সমাজের নানা স্তরের মধ্যে ঘুরিতে হয়। এই ঘোরাফেরার মধ্যে তিনি গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছেন। সেই উপাদানগুলি তাঁহার মনের রংএ ও রসে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এগুলি কল্পনাবিলাসীর রচনা করা সমাজের রূপ নয়, তাঁহার দৃষ্টি ও কোমল হৃদয়ের প্রতিফলিত সত্য রূপ। বইখানিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ-ভারত পথে—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতার ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যতগুলি ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, জ্যোতিষ বাবুর "দক্ষিণ-ভারত-পথে'র সঙ্গে তাহাদের কোনটিরই তুলনা হইতে পারে না।

* * * *

তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তুল্যরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। একদিকে ভক্তির প্লাবন অপরদিকে ঐতিহাসিকের তথ্য বিশ্লেষণ, একদিকে ভৌগলিক খুটিনাটি, অপরদিকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিচার—এই এক খানি পুস্তক পড়িলে পাঠক দক্ষিণ-ভারত পথের মহিমা যেরূপ বুঝিবেন স্বয়ং বহু টাকা খরচ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি সে দেশটি তেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন না।

জ্যোতিষ বাবু জানাইতেছেন—"ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের পদতলে তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম তটে পম্পা সরোবর অবস্থিত। চারিদিকে পাহাড়, তাহাদের মধ্যে ভারতের পুণ্য সরোবর চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম 'পম্পা' সরোবর বিরাজিত। পুরাণে উল্লিখিত উত্তরে হিমালয়ের মধ্যে 'মানস সরোবর' পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরে 'বিন্দু সরোবর' পশ্চিমে কচ্ছ দেশে 'নারায়ণ সরোবরে'র ন্যায় মহীশূরে 'পম্পা সরোবর' পবিত্র ও বিখ্যাত। প্রাচীনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পম্পার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। সেখানকার সৌন্দর্য্য স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহা আমাদের মতন জীবকে প্রীতি প্রদান করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র কি? এখনও তুঙ্গভদ্রার কুল কুল ধ্বনি রাম নামেরই প্রতিধ্বনি করে। পম্পা সরোবর আয়তনে বিশ বিঘা। চতুর্দ্দিকে প্রস্তর সোপান মণ্ডিত।" (৩০০—৩০১) পৃঃ।

এইরূপ নানা তথ্য বহুল ভৌগলিক বর্ণনা অজস্র এবং প্রত্যেক বর্ণনীয় বিষয়গুলি পবিত্র ও উপাদেয় করিয়াছে।

দক্ষিণাপথে কোন কোন স্থানে বিবাহ রীতি বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখক বলিতেছেন,—

"সৎ ব্রাহ্মণ কুলজাত ব্রাহ্মণ কন্যার সমবংশের সমমর্য্যাদার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তনয়ের সহিত বিবাহ হইলে তাহাকে 'ব্রাহ্ম'

বিবাহ বলে। সালঙ্কৃতা হইয়া কোন কোন কন্যার যজ্ঞসঙ্কল্পকারী ঋত্বিকের সহিত পরিণয় হইলে 'দৈব' বিবাহ হয়। ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য কোন কন্যার নিকট গোধন পণ গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলে তাঁহাকে 'আশ্রম' বিবাহ বলে। কোন কন্যাকে তাঁহার পিতামাতা সৎপাত্রে সংসারধর্ম্ম ও সন্তানাদি উৎপন্ন করিবার জন্য সম্প্রদান করিলে তাহাকে 'প্রাজাপত্য' বিবাহ বলে।

পিতৃকুলের অসম্মতিতে নিজ শক্তিবলে অপহরণ করিয়া বিবাহ করিলে 'রাক্ষস' বিবাহ নামে অভিহিত হয়।" (৩৭-৩৮)

এই অংশ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে লেখক যে সমস্ত বিষয় লইয়া লিখিতে বসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বাদ দেন নাই।

*　*　*　*

"মনীষী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের শিল্প সাধনার নব অধ্যায় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গালী শিল্পীর স্থান শিল্পজগতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সেই প্রভাবে লাহোর আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র গুপ্ত, লক্ষ্ণৌ আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, কলিকাতা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মুকুল চন্দ্র দে এবং মাদ্রাজের আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে দেখিতে পাই। (৪০ পৃঃ)"।

মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ ও গৌড়ীয় মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান ও কর্ম্মে আশ্চর্য্য সফলতা দেখিয়া তাহাদের বর্ণনার প্রশংসার সুরে লেখকের বর্ণনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! দ্রাবিড়ের দারু শিল্প ও ধাতব ভাস্কর্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এরূপ চিত্তগ্রাহী হইয়াছে যে আমরা বারংবার তাহা পাঠ করিয়াছি।

তাঁহার তীর্থ সঙ্গিনী ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী হেমলতা দেবী, তিনি বয়োবৃদ্ধ ও দৈহিক নানারূপ জটিল রোগে তীর্থ পর্য্যটনের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই, কিন্তু এই গুরুতর অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তিনি যে সমস্ত দুর্গম তীর্থে যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন, তাহা কহিতে যাইয়া জ্যোতিষ বাবু বলিলেন, "কিছুতেই রামেশ্বর দর্শনের বাসনা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিল না। একেই বলে তীর্থের মহিমা, এমনই করিয়া যুগে যুগে ভারতবাসী নরনারীকে অনাদিকাল হইতে ভারতীয় তীর্থগুলি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।"

*　*　*　*

ঘন ঘন পাইকা অক্ষরে ৩৫৬ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। মারজিন একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত তত্ত্বপূর্ণ বৃহৎ পুস্তকে যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ও অনবধানতা থাকিবে না, তাহা বলা যায় না। সীমাচলমে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে চৈতন্যদেব এই মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কাল এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নৃসিংহদেবের নামাঙ্কিত তীর্থে পদার্পণ করেন। সুতরাং ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে দেহী চৈতন্য সেই স্থানে যান নাই—ইহা নিশ্চিত।

৺দীনেশচন্দ্র সেন

Bankim Chandra : His Life and Art

শ্রীমতিলাল দাস এম্-এ বি-এল প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। মূল্য আড়াই টাকা।

বঙ্কিম বাংলার নবযুগের স্রষ্টা। তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী আজিও রচিত হয় নাই। সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীযুত মতিলাল দাস মহাশয় ইংরাজী ভাষায় স্বল্প পরিসরের মধ্যে বঙ্কিমের জীবন ও প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেক নূতন তথ্য আছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বঙ্কিমের প্রতিভার নানা দিক লেখক সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমরা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রত্যেক বিদ্যালয় এবং পাঠাগারে এই পুস্তক একখানি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী

স্বপ্ন

শ্রীসুধীরকুমার রায়

এই পূর্ণিমার রাত্রিতেই সে আসিয়াছিল, ঠিক্ এই জায়গাতেই, যেন মনে হয় দুইজনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের আলো তার মুখের উপর পড়িতেছিল,—রুক্ষ চেহারা,—উস্ক-খুস্ক চুল—কতদিন হয়ত মাথায় তেল পড়ে নাই। পাঞ্জাবী গায়ে দিয়াছে সত্য, কিন্তু তার পেছন দিকটা নাই বলিলেই চলে, শত ছিন্ন! সদ্য পাট খুলিয়া গায় দিয়াছে, অথচ কাপড়খানি ময়লা।

আমি তখন স্বপ্নের কোন্ মোহময় সাগরে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম জানি না। তখন বাস্তব জগতের কাহারও পক্ষে বোধ হয় সম্ভব ছিল না যে আমার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে। শৈশব হইতেই উপন্যাসের কল্পনা-জগতের সোণার কাঠি, রূপার কাঠি আমাকে যে রঙ্গিন নেশায় রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম হয়ত বা সেই নেশাই সত্য আর এই যে বাস্তবতা, এই যে মাটীর জগৎ, এ সকলই বুঝি মিথ্যা! যে আশা আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সেই নেশার ঘোরেই আমি খুঁজিয়া বেড়াইতাম আমার মনের মানুষকে। ভাবিতাম, ঠাকুরমার রূপকথার মত একদিন জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে রূপকথা, কিম্বা উপন্যাসেরই এক রাজপুত্র পাতাল পুরী হইতে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইবে।

মনে মনে ভাবিতাম যাহাকে ভালবাসিব তাহাকে চক্ষের এক পলকেই চিনিতে পারিব। রূপকথার নায়িকার মত আমারও মনে সেই সুর ফিরিত। আমি জানিনা কোথায় আমি আমার মনের মানুষকে পাইব। কোথায় তাহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু আমি জানি, আমি নিশ্চিত জানি, সে আসিবে—এবং সেই আশার সুরে বাঁধা আমার জীবন-বীণার তার সেইদিন বাজিয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া আমার কল্পনার রথ কত দূর শূন্য বহিয়া ছুটিত; এই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া পাতালপুরীর রাজপুত্রের ঘরের দিকে……।

তাই যেদিন সে তাহার নির্ম্মল শুভ্র প্রাণের পবিত্র কামনা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক্ আমারই সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া—সাহস করিয়া সে আমাকে সেইদিন বলিল, "এস আমাদের দু'জনকে এক হ'তে দাও, আমরা আমাদের জীবন-যাত্রাকে সার্থক করে তুলি। তাহার কথায় কর্ণপাত করিবার মত সময় তখন আমার ছিল না; তাহার দিকে তাকাইবার তখন আমার অবসর ছিল না। প্রেম, তাহার স্নেহ তাহার ভালবাসা তাহার আগ্রহ সমস্তই সে আমার পাদমূলে অর্পন করিয়াছিল। মনকে শাসন করিয়াছি, চোখ রাঙ্গাইয়াছি, প্রবোধ দিবার ছলে কতবার বলিয়াছি ওরে মন, এযে তোর নয়! এ ভুল, এ স্নেহ, এ মমতা এ ভালবাসা, এ আগ্রহ, সব ভুল, এই ভুলের মোহ হইতে সাবধান হও বন্ধু, দূরে থাক, যদি একবার এই ভুলের মোহে পড়, যদি একবার ওর কথায় কাণ দাও তাহা হইলে একদিনের ভুলে জীবন ভরা ব্যর্থতা লইয়া চিরকাল কাটাইতে হইবে।

"আমার রাজপুত্র আসবে, হাত ধরে পাশে দাঁড়াবে—কথা কইবে, হাসবে কাঁদবে, আমি তার সমান ভাগ নেব"—এই প্রলোভনের মোহে তাকে সেদিন কতবড় আঘাত দিয়াছি, চিরদিন তাকে সেই ভাবেই আঘাত করিয়া আসিয়াছি। সে তাহার প্রেমার্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিল আমার পায়ে ডালি দিতে, সগর্ব্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি—তার অপরাধ? হ্যাঁ! অপরাধ ছিল বৈ কি, তার বাবা ছিল আমার বাবার প্রজা! আমরা তথাকথিত অভিজাত বংশের লোক, কলিকাতার বাসিন্দা। সে পাড়া গাঁয়ে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে। পাড়া-গাঁয়েই থাকে; আমি বি, এ পাশ করিয়াছি; এম, এ পড়িতেছি আর সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ছবি আঁকিতেছে। এগুলি কি অপরাধ নয়। নিশ্চয়ই অপরাধ, গুরুতর অপরাধ। অন্ততঃ বাবার কাছে ছিল সেগুলি মহা অপরাধ।

আঘাতের পর আঘাত পাইয়া তাহার কোমল প্রাণ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগল। তাহার প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের

আশা ব্যর্থ হইয়া তাহার হৃদয়কে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। যখন বড় অসহ বলিয়া মনে হইয়াছে এই ব্যর্থতার ব্যথাকে, তখন সে চলিয়া গিয়াছে এই মাটীর জগৎ ছাড়িয়া পাতাল পুরীতে; যাইবার সময় অস্ফুট স্বরে মাত্র তুইটি কথা বলিয়া গিয়াছে, তোমার কাছে ত আমি অনেক কিছু চাই নি! চেয়েছিলাম অল্প, সামান্য, কিন্তু সেই অতি অল্পও তোমার কাছে পেলাম না"—

সে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময়কার সেই অস্ফুট করুণসুর আমার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমার সেদিনকার গর্ব্বকে সেই সুর ছিঁড়িয়া কাটিয়া একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। সে যে আমাকে কতখানি পূর্ণ করিয়াছিল তার প্রেমে, স্নেহে তা আজ আমি তীব্রভাবে অনুভব [illegible] যখন দেখিলাম আর আমার রাজপুত্র আসিল না, [illegible] আরও পাগল হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন [illegible] আসল রাজপুত্র, মনে হইল যেন সে-ই বেশ ধরিয়া [illegible] পটুয়ার,—কাঙ্গালের,—ভাবুকের। সে পাতাল পুরীতে [illegible] গেল আগে। সব ঠিক করিতে, আমার যেন এতটুকুও [illegible] না হয় সেখানে। আমি ত তাঁকেই খুজিতেছিলাম, [illegible] সেই পাতালপুরীর রাজপুত্রকেই চাহিয়াছিলাম—[illegible] পাতালপুরীতে যাইয়াই বোধ হয় আমার জন্য [illegible] করিতেছে।

কিন্তু—"সেজন ফিরে না আর
যে গেছে চলে।"

তুমি পূর্ণিমা চাঁদ

বন্দে আলি মিয়া

শতেক তারার মাঝে যেন একা তুমি পূর্ণিমা চাঁদ
তোমার বক্ষে উথলি উঠিছে আমার মনের সাধ।
বিশাল সাগর নয় যে গো আমি—তোমায় কেমনে পাবো
নির্ঝরিণীর অঝোর ধারাতে শুধু তব গান গাবো।
দূর হতে তোমা দেখিব চাহিয়া তুইটি নয়ন ভরি'
তোমার পরশে ক্ষণে ক্ষণে আজ যাই মোরে বিস্মরি।

শোনো পূর্ণিমা চাঁদ,
ভালো লাগে তোমা বলো প্রিয়তমা মোর কী এ [illegible]!
তোমারে ঘেরিয়া কত গান আর কত সুর গুঞ্জরে—
কত জনা আসে তোমার তুয়ারে একটু প্রসাদ তরে।
তোমার মাঝারে নিখিল সুধার উৎস যেন গো রয়
তব রহস্য হেরিয়া গো রাণী মনে জাগে বিস্ময়।

তোমার আকাশ তলে—
সারা দিনে রাতে চারিদিক হতে মেঘ আসে দলে দলে।
মোর ভয় হয় যদি সেই মেঘ ঢাকে কম তনু তব
তোমার পানেতে দূর হতে প্রিয়া অনিমেষে চেয়ে র'ব।
আঁধারে ঢাকিবে আমার ভুবন—নামিবে বাদলধারা
পূর্ণিমা চাঁদ, সেই আঁধারাতে বারেক দিয়ো গো সাড়া।

কেন্দ্র সমিতি

পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

গত ১৫ই হইতে ২১শে জানুয়ারী পূর্ণ এক সপ্তাহব্যাপী সরোজনলিনীর পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মহোৎসবে যে সব উন্নতমনা নারীহিতৈষী জনগণ সর্ব্বান্তকরণে যোগদান করিয়া সমিতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

১৫ই জানুয়ারী সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ের ও মফঃস্বল মহিলা-সমিতিগুলির চারু ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয়া লেডী বার্কমায়ার। মাননীয় জাষ্টিস সি, সি, বিশ্বাস মহাশয় সমিতির পক্ষ হইতে অভ্যাগতগণকে সাদর অভিনন্দন জানান এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় লেডি বার্কমায়ার ও সমাগত অন্যান্য সভ্য-সভ্যাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেডী বার্কমায়ার এই প্রসঙ্গে বক্তৃতায় বলেন,—

"During this century the gradual awakening of women's consciousness towards the fuller realisation of their mission, and of their part in the life of their country has been spreading over the world no less in India, where the splendid work of social service among women is being ably carried on. A shining example is this Association and all the Mahila Samitis and other organisations of which it has been the fostering influence and inspiration. It is a work of utmost importance, for it all means progress, progress towords the achievement of an ideal and by it, women can take their part more and more in building a better India."

১৬ই জানুয়ারী শিল্প প্রদর্শনী সর্ব্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

১৭ই জানুয়ারী শিল্প প্রদর্শনী কেবল মহিলাদের জন্য খোলা থাকে। ঐ দিবস কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত মফঃস্বল সমিতির প্রতিনিধিবর্গের সমবেতভাবে এক সভায় নারী-উন্নতি বিধায়ক নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। অপরাহ্নে মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুহাসিনী বিশ্বাস মহিলা সম্মেলনের নেতৃত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণ বঙ্গলক্ষ্মীর বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল। যে সমস্ত মহিলা ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা তিন শতের কম হইবে না।

১৮ই জানুয়ারী সমিতির প্রতিনিধিবর্গের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়।

১৯শে জানুয়ারী সরোজনলিনীর মৃত্যু দিবস; ঐ দিন সকালে সরোজনলিনীর স্মৃতি-উদ্দেশে একটি প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ স্মৃতিবাসরে উপাসনা করেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ও তাঁহার পুত্র এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি এবং স্কুলের ছাত্রীগণ উপস্থিত থাকিয়া ঐ পুণ্যোৎসব সমাপ্ত করেন।

১৯শে জানুয়ারী অপরাহ্নে পঞ্চদশ বার্ষিক স্মৃতি সভা মহাসমারোহে অনুষ্ঠীত হয়। ঐ সভায় পৌরহিত্য করেন কলিকাতার মাননীয় মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয়। প্রথমেই মেয়র মহাশয় সরোজনলিনী সমিতির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট জনহিতৈষী স্বর্গগত মাননীয় মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি তৈলচিত্রাবরণ উন্মোচন করেন। ঐ তৈল চিত্রখানি মাননীয় মহারাজার পুত্র কুমার বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সমিতিকে দান করিয়াছেন।

চিত্র-উন্মোচন উৎসব শেষ হইলে প্রেসিডেণ্ট মাননীয় জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সমাগত ভদ্রগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

"আজকাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষা যেরূপভাবে প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশের নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে।" কলিকাতা কর্পোরেশনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে কর্পোরেশন এই সমিতির বাটী নির্ম্মাণের জন্য যে ভূখণ্ড দান করিয়াছেন তাহার জন্য সমিতির পক্ষ হইতে তিনি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর সমিতির সম্পাদক ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া এই সমিতি কিরূপ সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতেছে তাহা জানান।

কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায়, কেন্দ্র সমিতি প্রায় চারিশত মহিলা সমিতি বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করিয়াছেন। সমিতি কলিকাতায় একটি শিল্প শিক্ষালয় এবং পুরীতে একটি বিধবাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন। সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয় প্রায় ৪০,০০০ টাকা। কর্পোরেশন দেড় বিঘা জমি এসোসিয়েসনকে নামমাত্র খাজনায় দান করিয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্ট গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ডাঃ নিয়োগী সমিতির কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন এবং বিল্ডিং ফণ্ডের আরও ২০,০০০ টাকা প্রয়োজন, তাহা জানান। সভায় নিম্নলিখিত দানগুলি ঘোষিত হয়—

রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে···২৫০৲
মিসেস আর. এন., চোপরা ১০০৲
মিঃ এস, কে মিত্র ২৫৲
মিসেস এ, সি, উকীল ২৫৲
বাবু নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২০৲

ঢাকার নবাব বেগম সাহেবা স্কুলের ছাত্রিগণকে পুর... বিতরণ করিবেন, কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ... আসিতে না পারায় মিসেস চোপরা স্কুলের ছাত্রীদের পু... বিতরণ করেন। সভায় উপস্থিত জন-মণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজ... নাম নিম্নে দেওয়া হইল। মিসেস গ্রীণওয়েল, লেঃ কর্ণেল, ... এন চোপরা, মিসেস জে, সি, দে, ডাঃ পি, সি, সেন, ... আমিনুল হক, ডাঃ বিনয়কুমার সরকার, ডাঃ কে, পি, ... রায় মল্লীনাথ রায়, রায় শশীভূষণ দে, মিঃ ডি, এল, ... রায় বাহাদুর এইচ, এল, মুখার্জি, কুমার বি, এন, রায় ... মিঃ সতীনাথ রায়, মিঃ কিরণচন্দ্র দত্ত, মিস, এন্ বি, ... মিসেস তটিনী দাস, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ও অন্যান্য ব... নাগরিক।

২১শে জানুয়ারী, একটি প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হ... ঐ দিবস সমিতির হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ একত্র সমবেত হই... চা-পান ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করেন। সন্ধ্যা ... সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাননীয় খ... বাহাদুর আজিজুল হক, সি, আই, ই, সাহেব বার্ষিক "সরো... নলিনী বক্তৃতা" প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছি... "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"

১৫ই হইতে ২১শে পর্য্যন্ত পূর্ণ একটি সপ্তাহ "নলি... দিবস" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে যিনি য... ইচ্ছা সমিতির তহবিলে দান করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ঐ দানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১৬ টাকা।

প্রেসিডেণ্ট জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পি, নিয়োগী, সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও স্কুলের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোমের ঐকান্তিক যত্নে, ও সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্যে এই স্মৃতি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বাণীরূপা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কবিতায় তব বন্দনা লিখি,—এমন শক্তি কোথায় মাগো,
মোর কবিতার কুসুমের মালা ফুটাতে পারে না অঙ্গরাগও!
কুন্দতুষারহারধবলা! তব চরণের বর্ণবিভা
অশোক-পলাশ-আঁখির পাতায় কবিতা-আখরে সাজিছে কিবা!
নীলিমায় তব নয়নের দ্যুতি, অঙ্গলাবণি চন্দ্রিমাতে
মহাকাশবীণে বাজে বন্দনা কোমল তোমার দৃষ্টিপাতে!
আঁধার-আকাশে তারায় তারায় লেখা হয় তব কাব্যখানি,
বরষা-নিশিথে ধারায় ধারায় পঠিত হয় সে পরম বাণী!
নর-জীবনের নশ্বর আঁখি খুঁজিয়া ফিরিছে মূর্ত্তি তব,
অখণ্ড কাল আঁকিছে তোমার খণ্ড মূর্ত্তি নিত্য নব!

যাহার জীবনে বেজেছে তোমার বীণা একবার, হে বীণাপাণি,
সব ভুলে সে যে তোমায় চেয়েছে,—তোমায় চেয়েছে সত্য জানি
হে অরূপা, তুমি অপরূপা হ'য়ে জীবনে-মরণে জড়ায়ে আছো,
রূপপিপাসীর ব্যথার চিতায় তুমি যে অনল হইয়া বাঁচো!
মৃত্যুরে তুমি অমৃত করেছো, জীবনে করেছো কী লোভনীয়,
বিবর্ত্তনের বিস্ময় মাঝে তুমিই রয়েছো অদ্বিতীয়!
তোমায় পূজেছে কবি কালিদাস, বাল্মীকি, ব্যাস, বাদরায়ণও
তোমায় পূজিবে আগামী যুগের অনাগত শত মানবমন ও,
তবুও তোমার হয়নি মা পূজা, মূর্ত্তি তোমার হয়নি গড়া,
অমূর্ত্তা তুমি—তুমি বাণীরূপা, বাণী-হারাদের হৃদয় ভরা!

ওরাও ভালবাসে

অনেকদিন থেকেই চা যোদ্ধাদের খাদ্যের একটা অঙ্গ বলে গণ্য হচ্ছে। বহু পূর্ব্বে যখন দুর্দ্ধর্ষ তাতারেরা মধ্য এশিয়ার মরুভুমির ভিতর দিয়ে তাদের জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলো—তখনো তাদের সঙ্গে ছিল এই চা। আধুনিক কালেও যে যোদ্ধাদের পক্ষে চায়ের উপযোগিতা কমেনি তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন কার্ল রিথ্‌ম্যানের কয়েকটি কথা থেকে বোঝা যায়। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে যোদ্ধাদের আশ্চর্য ধৈর্য্য ও শক্তির সঙ্গে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি লড়্‌তে দেখে ক্যাপ্টেন রিথ্‌ম্যান্‌ অবাক হয়ে বলেছেন:

"এরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বটে, কিন্তু কখনোই এলিয়ে পড়েনি—এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে খেয়ে নিয়ে আবার তা'রা এগিয়ে চলেছে যুদ্ধ করতে।"

ষষ্ঠ জর্জ্জের অভিষেকের সময় বিলেতে ৩২,০০০ সৈন্য অভিষেকের কাজে নিযুক্ত ছিলো। এদের প্রত্যেককে সকাল বেলা এক পাঁইন্ট করে চা খেতে দেওয়া হয়েছিলো। এ ছাড়া যে ২০,০০০ পুলিশ সেদিন কাজে নিযুক্ত ছিলো, তাদের যে কত চা দেওয়া হয়েছিলো তা'র কোন ইয়ত্তাই নেই।

গত মহাযুদ্ধের সময় চা কত কাজ দিয়েছিলো তা' যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে তাদের সকলেরই মনে আছে। চায়েরই সাহায্যে সৈন্যেরা অমানুষিক কষ্টের সম্মুখীন হতে পেরেছিলো; তাদের মন যখন অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলো, তখন চায়েরই গুণে তা'রা মনের স্ফূর্ত্তি ফিরে পেয়েছিলো। সে-সময়ে সৈন্য-ভর্ত্তি কোনো ট্রেইন যখনই কোনো ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই দলে দলে কোমলপ্রাণা মেয়েরা তাদের গরম চা এনে খেতে দিয়েছে।

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.

৺স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহধর্ম্মিণী ৺সর্ব্বসুন্দরী দেবী

[প্রবাসীর সৌজন্যে

C. H. ARAN & CO., CAL.

বঙ্গলক্ষ্মী

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

পঞ্চদশ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৬ | ৫ম সংখ্যা

গান

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে না কি অন্ধকার,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার বীণা কি বাজিবে আর
হাসিটুকু নিয়ে গেছে রেখে গেছে হাহাকার!
ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে
কাহারে, কেমন আছ, শুধাইছ বারে বার॥ *

* পত্নী বিয়োগে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের মর্ম্ম বেদনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রথম পুত্র ৺দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬১ শকাব্দে ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৮৬১ শকাব্দের ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার জন্মের একশত বৎসর পূর্ণ হইল। তাঁর জীবনকথা ও রচনার সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক পাঠিকাদের আমরা যথা সম্ভব পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

পয়লা এপ্রেল

৺দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

ফুলের বাহারে যার
মন নাহি টলে আর
বৃথা কেন গায়ে তার
ফুল ছুঁড়ে মারো ;
কবিতার বণিতার
দ্বিজ নাহি ধারে ধার
পেট্‌টিই জানে সার
মোণ্ডা যাহে পায় লয়
গোণ্ডা দশ বারো। *

*নাতনি নলিনী দেবীর পয়লা এপ্রেলের রহস্য-পত্রের উত্তরে।

* * *

পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম পত্রিকা দেখিয়া বুঝা গেল, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৭৬১ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ২৯শ দিনে। সেদিন ছিল বুধবার, তিথি ছিল শুক্লানবমী। দিন হিসাবে যদি তাঁহার শতবার্ষিক অনুষ্ঠান করিতে হয় তবে করিতে হইবে আগামী ২৯শে ফাল্গুন, (১৩ই মার্চ্চ) বুধবার। আর তিথি হিসাবে করিতে হইলে ৫ই চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) সোমবার ফাল্গুন শুক্লা নবমীতে।

শ্রীক্ষিতি মোহন সেন

৭ই ফাল্গুন ১৩৪৭

অবতরণিকা

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনু দাদাজি,

পাইয়া যেদিন সাধের নাতি
ফুলিল দাদার বুকের ছাতি
সেইদিন আজ দেখা দিয়েচে।
দিনু দাদাজির গুণ অসীম
গানে তানসেন আকারে ভীম
চিরজীবী হয়ে থাকুক বেঁচে॥
আনন্দ দিয়া দাদার নয়নে
দলবল সাথে বসিবে ভোজনে
রবি যবে বসিবে পাটে।
মিটাইব সাধ তোমায় হেরি
শুভ কাজে হেন ক'র'না দেরি
কহিনু তোমারে সাঁটে।
যতদিন বাঁচি বরষ বরষ
এমন সুদিনে গজাইবে রস
নীরস শরীরে মোর
ইহারই আশায় দাদা এ তব
বছরের পর বছর নব
থাকিবে হরষে ভোর॥

ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, ও অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনের ইন্দ্র চন্দ্র এবং বায়ু এই তিন দেবতাকে কল্পনা মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া "আমার এই মনোরাজ্যের মানস পুত্রটিকে তোমাদের চতুর্থ ভ্রাতা রসাত্ম বরুণ বলিয়া ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ কর এবং সুখে থাক" এই বলিয়া দেবধামের তিন ভ্রাতার হস্তে পরম আনন্দের সহিত যুগপৎ সঁপিয়া দিলাম।

আমার এই মানস পুত্রটীর জন্মরহস্য।

আমার এই মনোরাজ্যের মানস পুত্রটী যখন বঙ্গ ভারতীর গর্ভে বিলীন ছিল, তখন সে বিধাতা পুরুষকে সংবোধন করিয়া বলিয়াছিল—

"ইতর তাপশানি যথেচ্ছয়া, বিতর, তানি সহে চতুরানন

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি

মা লিখ মা লিখ মা লিখ

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে—

চতুরানন

লিখো না লিখো না শিরে অরসিকে রস

নিবেদন"

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী জেঠা মহাশয়

মানস সরোবরের জলচর দ্বিজরাজ (Swan) অথবা মানস-সরোবরের পরমহংস

দ্বিজ শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা দ্বিজ শব্দের এক অর্থ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় অর্থ চন্দ্র, তৃতীয় অর্থ পক্ষী, এখানে দ্বিজ শব্দের অর্থ পক্ষী

বড়ো দাদা

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বড়ো দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্ক লইয়া স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ব বিকাশের পক্ষে বসন্ত বাতাসের মতো কাজ করিত। বড়ো দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়ো দাদার কবি-কল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবড়াল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়োদাদার লেখনী মুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্ন প্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পুর্ব্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম, তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবন-স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

রবীন্দ্র জীবন-স্মৃতি—পৃঃ ১২৮

বড়ো দাদা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

প্রাণ খোলা হাসি ছিল শুনি লোকমুখে,
সকলের একজন ছিলে সুখে দুখে।
লেখা পড়ি, ফটো দেখি, সাধনা-নিলীন
যেখানে কাটিয়ে গেছ শেষ ক'টি দিন
যাই সে আঙনে, দেখি ফলে ভরা গাছ,
ফুলে ভরা লতা, দেখি পাখীদের নাচ;
পায়রা শালিক ঘুঘু; দেখে পড়ে মনে
লোকমুখে শোনা কথা, এরাই কেমনে
একদিন কাছে গিয়ে কেড়েছে কলম,
ঠুকরে দিয়েছে চোখ, লাগিয়ে মলম
চোখ বেঁধে আবার সে মেতেছে খেলাতে,
শুধু কি এদেরি সাথে? বেলা অবেলাতে
ছুটে গিয়ে নিজে থেকে হয়েছ হাজির
পাড়া প্রতিবেশী গৃহে, জ্ঞানের সাজির
সদ্য কুড়ানো নানা ফলমূল নিয়ে;
বিচার করোনি কিছু পদ মান দিয়ে।
যাঁরা সে পেয়েছে প্রীতি বলে তারা আজ—
"আজও কাণে লেগে আছে হাসির আওয়াজ!"
খাবার জিনিষ আর খেলনার ভারে
শিশুদের মন কেড়ে নিতে বারে বারে।
কাণে আসে ছেলেদের প্রবাদ সেকেলে—
তোমার বকুনী খেলে খাওয়া শেষে মেলে।
এটা ছিল আশে পাশে সকলেরি জানা—
নিস্তার নেই তার যার পিছে হানা
দিত সে তোমার দূত, এনে দিতে পাশে—
ব'কে দিতে 'লোকে কেন দেরি করে আসে?'
শুধাতে কুশল পরে সুরু হোত কথা,—
কথায় কথায় মেতে বিলাতে অযথা
শুনি কত দুর্লভ মানসের মণি!
কী দিলে কী নিয়ে গেলে ফিরেও দেখো নি
তোমারে করে নি বড় পাকা দাড়ি ভুরু
কবি গুরু "গুরুদেব" তারো তুমি গুরু!
পরিয়েছে বাণী বটে যশের মুকুট,—
হৃদয়ে হৃদয় টানে ছোটো চিরকূট।
বিদ্যা বয়েস তাতে গেছে লেপে লেপে
শুভ্র হাসিটি শুধু আছে সব ছেপে।
ছবি মনে হোলে আগে দেখি সে ললাট,
ও যেন সে হৃদয়েরি উদার কপাট!
সাধন ভজন কথা শুনি খুবই বটে
ঈশ্বর আছেন কিনা (বলি অকপটে—
বুঝি না সে, তবে শুনি এই ইতিহাস—)
তোমারে দেখে সে না কি হোত:বিশ্বাস।
শুনি শুধু, জানি নাকো ছিলে কত বড়ো,—
পশুপাখী ছেলেবুড়ো করে গেছ জড়ো
তোমার স্মৃতির পাশে, শুধু দেখি এই;—
সেখানে ঘরোয়া ভাবে বাঁধা সকলেই!
আর, শুনি ঘরে পরে যত নামজাদা—
বড়োবাবু ভুলে আজ বলে বড়োদাদা।

মনস্বী ও মনিষ্যি

[শেষাংশ]

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ, এড্‌ভোকেট।

এই সময় 'মনিষ্যি' একটি ট্রেতে একটি পাত্রে শক্তু মণ্ড, অন্য একটি পাত্রে দধি, দুইটি খালি প্লেট এবং দুইটি বড় চামচ আনিয়া অন্য একটি ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল।

'মনিষ্যি'কে দেখিয়া একটা প্রশ্ন মনে অকস্মাৎ উদয় হইল। আগ্রহ চাপিতে না পারিয়া মনস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, আপনার এই ভৃত্যের 'মনিষ্যি' এই অদ্ভুত নাম হ'ল কেন ?

মনস্বী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন—"ও নাম আমিই ওকে দিয়েছি। লোকে চাকরদিকে মানুষ মনে করে না; চাকররাও ভাবে তবে সত্যই বুঝি তাহারা মানুষ নয়। কিন্তু আমি উহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি—দেখ তুই যে, আমিও সে। আমিও মানুষ, তুইও মানুষ। পাছে ও আমার হিতোপদেশ ভুলে যায় এই জন্যই ওর নামকরণ করেছি 'মনিষ্যি' কিনা "মনুষ্য"। আর ও যে মানুষ এ কথাটা ও যা'তে ভুলে না যায় তা'ই ওকে সর্ব্বদাই ডাকি "মনিষ্যি", তা' হ'লে কথাটা আর ভাবটা ওর চিত্তে সদা জাগরুক থাকবে, সর্ব্বদাই ও স্মরণ কর্ত্তে পারবে, চাই কি স্মরণ কর্ত্তে বাধ্য হ'বে যে ও মানুষ।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে সশ্রদ্ধভাবে একদৃষ্টে সেই শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র দেহ, আনন্দহাস্যপূর্ণ দীর্ঘ ললাট ও প্রশস্ত, উজ্জ্বল নয়ন বৃদ্ধ বরেণ্য পুরুষের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। শ্রদ্ধাভিভূত, বাক্যহীন আমি!

মানুষের মধ্যে, এমন কি ভৃত্যের মধ্যেও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আপ্রাণ প্রয়াস আগ্রহ! ভৃত্যকেও নিজের মতই মানুষ ভাবা ও ভাবিতে সর্ব্বদা শিক্ষা দান!—'ঋষি' আর কাহাকে বলে ?

ভাবছিলাম—এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে এখনও ভাবি —ইনি কোন্—"মহতী দেবতাহ্যেষ নররূপেণ তিষ্ঠতি" ? আজ তাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণ কালে তাঁহার উদ্দেশে মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করছি।

চমক ভাঙ্গিল—মনস্বীর উচ্চহাস্যে। তিনি বলছেন— "এস হে সিংহ শাবক! পরিহর চিন্তা—এগিয়ে এস। পরম নিশ্চিন্তে আজ তুমি আমার যজ্ঞ পূর্ণ কর।"

আমি—আমি, ক্ষুদ্র আমি, আপনার ন্যায় মহতের কি যজ্ঞ পূর্ণ কর্ব্ব ?

মনস্বী। মহৎ কেবল ভগবান, ও সব কথা থাক। দেখ, এত দিন মাঝে মাঝে মনে হ'ত দ্বিপদ চতুষ্পদ সবাই এলেন—আমার যজ্ঞে, এলেন না কেবল পশুরাজ সিংহ। তা' যখন চতুষ্পদ সিংহের আগমন হোলই না, এখানে আসবার কোনই সম্ভাবনাও নাই আর আজকার যজ্ঞকালে তুমি দ্বিপদ সিংহশিশু যখন স্বেচ্ছায় স্বাগত তখন তোমাকে দিয়েই পশুপতি সিংহের অভাবটা পূর্ণ করে নিই। 'বিলম্ব কি হেতু আর' ?

আমি। আমাকে কি আদেশ করেন ?

মনস্বী। একটু আগেই না তুমি বলছিলে যে তোমাদের বাগানে বাসকালে আমার যা খেতে ভাল লাগত তোমাকে তুলে দিতাম। অনেকদিন পরে আজ তারই পুনরাবৃত্তিতে আপত্তি আছে ? এই দেখ আমার বর্ত্তমান প্রিয় প্রাতরাশ মনিষ্যি পরিবেশন করে গেল—শক্তু ও দধি। এস প্রেমানন্দে আমরা উভয়ে ইহার রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হই।

বলেই তিনি এক প্লেটে শক্তু পিণ্ড এবং অপর প্লেটে দধি ও একটি চামচ স্বহস্তে আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং অন্য প্লেটদ্বয়ে নিজের জন্য কিছু শক্তু ও দধি

রাখিলেন। উভয়ে তাহা খাইলাম। গৃহে ও অন্য নানা দেশে তৎপূর্ব্বে (এবং পরেও) একই পদার্থ খাইয়াছি কিন্তু তেমন সুস্বাদু শক্তু কখনও খাইয়াছি, মনে হয় না। মন্দিরের ঠাকুরের প্রসাদের বিশিষ্ট "স্বাদ" হয় শুনেছি, অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছিও। এ শক্তু কি চলমান, জীবন্ত "ঠাকুরের", দেব তুল্য ঋষির—প্রসাদ—আর তাই বুঝি ইহার এত 'স্বাদ'!

ভোজন-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। অতঃপর ছোট টেবিলের নীচে হইতে একটা বই লইয়া দেখাইয়া বলিলেন—"এই বইটার বিষয় কিছু শুনেছ?"

আমি বইটার নাম মাত্র দেখলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার লেখা?"

মনস্বী। জার্ম্মানির প্রফেসর ডয়সনের। বইটার কথা একটা বিলাতী পত্রিকায় দেখে সম্প্রতি বিলাত হ'তে আনিয়েছি।

এই সময় একটা চিঠি পুস্তকের ভিতর হইতে নীচে পড়িয়া হাওয়াতে উড়িয়া একটু দূরে গেল। তিনি হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারিলেন না। আমি উঠিয়া গিয়া উহা কুড়াইয়া আনিলাম। তিনি বলিলেন—'এ বইটার মধ্যে আবার কি চিঠি এল—দেখ ত।'

আমি চিঠিটা পড়িলাম, পুস্তক বিক্রেতারা লিখেছেন যে ভারতবর্ষে ইহাই প্রথম কপি প্রেরিত হইল। বলিলাম—তা' হলে আপনিই যখন এ দেশে প্রথম ক্রেতা ও পাঠক তখন আমরা আর এর তথ্য কোথায় পাইব?

মনস্বী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সবটা এখনও পড়া শেষ হয় নাই। খানিকটা পড়া হয়ে গেছে, বাকীটা আজ শেষ কর্ব্ব মনে করছি। প্রফেসর আমাদের দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন।

আমি। কেমন দেখলেন? প্রফেসরের নাম শুনেছি মাত্র, তাঁর বই পড়ার সুযোগ হয় নাই।

মনস্বী—যতটা পড়লাম, অনেক স্থানে গভীর চিন্তা করেছেন, দেখলাম।

অতঃপর তিনি প্রফেসর ডয়সনের কতকগুলি মতামত ব্যক্ত ও সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিলেন। মনস্বী খুব বড় দার্শনিক পণ্ডিত, জানিতাম। কিন্তু তাঁহার মুখে দর্শনালোচনা শুনিবার সুযোগ হয় নাই। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব কি অপূর্ব্ব প্রাঞ্জল ভাষায় ও কত সংক্ষেপে বুঝাইতেছেন! আমি তাঁহার সেই অপূর্ব্ব দার্শনিক সমালোচনা কেবল শুনিলাম তাহা নহে, অবাক হইয়া তাহা শ্রবণে পান ও মনে উপভোগ করিতে লাগিলাম। তিনি আপন আনন্দে বলিয়া যাইতেছেন এমন সময় আমার মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে ও অকস্মাৎ কি একটা কথা ব্যক্ত হইতেই তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে ও সহর্ষে বলিলেন—"ওঃ তবে তুমি আমাদের দর্শনশাস্ত্র পড়েছ দেখছি।"

সন্ত্রস্ত হইলাম—দেশের এক প্রধানতম দার্শনিকবরের কথার মাঝখানে একটা কথা বলিয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি বুঝিয়া লজ্জিত ও ততোধিক সঙ্কুচিত হইলাম। বোধ হয় আমার অবস্থা ও ভাব বুঝিয়াই তিনি বলিলেন—"আমি বড়ই খুসী হয়েছি তোমার মুখে ও কথা শুনে।" আমার মনে নাই কি বলে ফেলেছিলাম তবে স্মরণ হয় যে তৎকালে মনস্বীর কথায় আশ্বস্ত হইলাম, বুঝিলাম অন্যায় বা অপ্রীতিকর কিছু বলি নাই যা হৌক।

অতঃপর নানা কথা হইল। অবশেষে তিনি বলিলেন—"ওহো এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার বাবা বলছিলেন তোমার দীক্ষা লওয়ার কথা। এ বিষয়ে তোমার মতামত কি প্রকার?

আমি বলিলাম—"সভয়ে বা নির্ভয়ে বল্‌ব?"

মনস্বী কহিলেন—নির্ভয়ে নিশ্চয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষতঃ এখানে ভয়ের কোনও কারণ কোনও বিষয়েই থাকৃতে পারে না।

আমি।—দীক্ষা বিষয়ে আমার দুইটি কথা মনে হয়। এক—গুরু কে হবেন, যিনি দীক্ষা দিবেন। দুই—দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

মনস্বী।—বেশ, বেশ। ঐ দুই বিষয়ে কি ভেবেছ?

আমি।—বাবা বলেছেন, আপনার কাছে দীক্ষা লইতে। আপনার কাছে দীক্ষা লইলে আপনাকে গুরু ব'লে স্বীকার ও মান্য কর্ত্তে হ'বে। কিন্তু জানেন যে বাল্যকালে শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকেই 'গুরুদেব' ব'লে স্বীকার করেছি, তাঁকেই অন্তরের ভক্তি দিয়ে রেখেছি এখন যদি অন্য কাহাকেও গুরু করতে হয় তবে উভয়

উপযুক্ত ও সমগ্র-ভক্তি যদি দিতে না পারি বা একের প্রতি ভক্তির তারতম্য হয়, তবে যে অন্তরের ভক্তিতে ব্যভিচার আস্‌তে পারে, তাই ভয় হয়। আমার বাবাকে বলে-ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ইহার মীমাংসা আপনি যা করে দিবেন তাহাই তাঁহারও সম্মত হবে।

মনস্বী ধীরভাবে শুনিয়া বলিলেন—"আর দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি তোমার মনের ভাব?"

আমি।—আমার মনে হয় যে আমার জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তার আয়োজন ত ভগবান আমার জন্মের পূর্ব্বে হইতেই করে রেখেছেন—আলো, জল, বায়ু, মাতৃদুগ্ধ অন্নাদি সবই। তেমনই যদি আমার জীবনে দীক্ষার প্রয়োজন থাকে তবে ভগবানই তার আয়োজন করে দেবেন। গুরুদেবকে গুরুরূপে তিনিই পাইয়ে দিয়েছেন, দীক্ষার ব্যবস্থাও ভগবানই করে দিবেন। সুতরাং তাঁরই নিয়ন্ত্রিত্বে নিজেকে ছেড়ে দিই না কেন?

মনস্বী অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দময় উচ্চহাস্য সহকারে বলিলেন—"এই বয়সেই তুমি এমন সুন্দর কথা ভাবতে শিখেছ, এতে আমি বড়ই খুসী হলাম।...আর শিখবেই না বা কেন—প্রতাপবাবুর নাতি, হেমেন্দ্রর ছেলে। তোমরা তো সব বাবা মশায়েরই আপন জন। তুমি নিজেও তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছ—হবেই তো।...... তুমি এই যা বল্‌লে ইহা খুব ভাল কথা, ইহাই সার কথা। জীবনে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে সর্ব্বদা এইরূপ বিশ্বাস রাখিও, তাঁর নিয়ন্ত্রিত্বে নিজেকে মিলিয়ে দিও, বিলিয়ে দিও। তিনিই তোমাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করবেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমার কল্যাণ হবে—তিনিই তোমার প্রাণে দীক্ষা দিবেন।"

মনে ভয় ছিল যে তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়া সম্বন্ধে স্বাভিমত ব্যক্ত করিলে না জানি তিনি কত দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন। বয়সের অনভিজ্ঞতা বা চাপল্যবশতঃ এ বিষয়ে যে ভাবে মত ব্যক্ত করিলাম তাহাতে মনস্বীর কোনই অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিলাম না। উপরন্তু তিনি আনন্দিত হইলে যে মহোচ্চস্বরে হাস্য করিতেন সেই চির পরিচিত তাঁহার স্বাভাবিক হাস্য দেখিয়া বুঝিলাম তিনি আমার কথায় ক্ষুণ্ণ না হইয়া সন্তুষ্ট ও আনন্দিতই হইয়াছেন। আমার সকল ভয় এক নিমেষে চলিয়া গেল—তাঁহার বিমল হাস্যের আনন্দ স্রোত আমার অন্তরে মুহুর্মুহু প্রবেশপূর্ব্বক আমার হৃদয়-মনকে অশেষ আনন্দে প্লাবিত আপ্লুত, করিল।

অনন্তর তিনি কয়েকটি উপদেশ প্রদানান্তে সস্নেহে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যে আশীর্ব্বাদটি পথে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে ফিরিলাম ও যাহা এখনও তাঁহার সেই উদাত্ত স্বরে অন্তরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হয় তাহা এই—"তোমার ভক্তি অব্যভিচারিণী হৌক, অচলা হৌক।"

অন্য আশীর্ব্বাণীগুলি অদ্যাপিও ভুলি নাই, কখনও যে ভুলিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তৎকালে তৎসকলের প্রতি তত মনোযোগ দিই নাই বা দিতে পারি নাই। "দুঃখের রাতে নিখিল ধরার" বঞ্চনায়, সংসারের নানা ঝঞ্ঝার আঘাতে যখন দেহ ও মন ভগ্ন ও ক্ষতবিক্ষত—তখন, জীবনের হয় ত এই সন্ধ্যা বেলায় সেই আশীর্ব্বাণী সকলের ক্রমশঃ পূর্ণতা দৃষ্টে এখন এই দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে সেই সরল, উদার, স্নেহশীল, ক্ষমাবান্ ঋষির বাণী ও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের ইচ্ছা দূর কালের ব্যবধানেও ব্যর্থ হইবার নহে, হইতে পারেও না। সত্যই "ব্যথা দিয়ে রাখেন তোর মান, তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

শাস্ত্রে বলে—সজ্জন সঙ্গলাভ সংসারে দুষ্কর। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন—"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।" সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে এইরূপ বা এই মহাজনের আবির্ভাবে তাঁহার বা তাঁহাদের পদ-ধূলিতে এই সমাজ ভবন তীর্থে পরিণত হইয়াছে। নিজের এ জন্মের কোনরূপ তপস্যাদির কথা জ্ঞাত নহি। সম্ভবতঃ পিতৃপুরুষগণের পুণ্যবলে এবং নিজ জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে হয়ত এই ঋষির সঙ্গ, তাঁহার বিমল চিত্তের প্রসন্নতা, তাঁহার স্পর্শ, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে এ দেহও পবিত্র ও তীর্থীকৃত হইয়াছে, আমি ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি। তাঁর উদ্দেশে তাই সকল হৃদয় লুটাইয়া বারংবার প্রণাম করি।

ঠাকুমার বুদ্ধি

(ইংরাজী হইতে)

শ্রীউমাশশী দেবী বি-এ

ঠাকুমা রান্নাঘরে আগুণের কাছে ইজিচেয়ারখানা আর একটু সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে "এম্‌লি (এমেলিয়া) আজ কদিন ধরে ভাবছি, ছেলেগুলোকে একটু সহরে নিয়ে তাদের খৃষ্টমাস্ উৎসবের জিনিষপত্রগুলো কিনে কেটে আন্‌লে কেমন হয় ?"

মিসেস্ রাগিন্‌স অর্থাৎ এমেলিয়া ঠাকুমার সামনে একটা চেয়ারে বসে একটা ছোট মোজা রিপু করছিল, না থেমে, বা মুখ না তুলেই বল্‌লে "কি করে হবে ঠাকুমা ! তুমি, আমি, এল্‌ফি, এমা, বেবি এই সব নিয়ে যাওয়া আসার গাড়ীভাড়াই ত এক শিলিংএর ওপর পড়বে। তা ছাড়া সহরের দোকানে জিনিষপত্রের যা দাম, আমরা তার কোনটাই কিন্‌তে পারবো না, অথচ কত জিনিষ যে আমাদের দরকার। অনর্থক কেবল পয়সা খরচ করে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হয়ে শেষকালে বাড়ী ফিরতে হবে, তার চেয়ে অন্যান্য বছর খৃষ্টমাসের সময়ে আমরা যেমন এখানেই কেনা কাটা করি, তাই কোরব।"

উত্তরে ঠাকুমা বল্‌লেন যে তিনিই সব যাওয়া আসার খরচ দেবেন। মিসেস্ রাগিন্‌স হাতের কাজ ভুলে হাঁ করে বুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার জীবনে ঠাকুমার পয়সার ওপর এমন তাচ্ছিল্য আর কোনদিন দেখেনি। বল্‌লে "কি ? তোমার আমার এল্‌ফির এমার বেবির সব্বাইকার গাড়ীভাড়া তুমি দেবে ?" বুড়ী গম্ভীর হয়ে বল্‌লে "হ্যাঁ সব্বাইকার এমন কি কাজিন এরোল্‌ড (হ্যারোল্‌ড) যদি যায় ত তারও ভাড়া আমি দোব।" মিসেস্ রাগিন্‌স্‌এর হাঁ আরও বড় হয়ে গেল বল্‌লে "ঠাকুমা তুমি হঠাৎ কি টাকাকড়ি পেয়ে গেলে না কি ?" বুড়ী বল্‌লে, না সে টাকাকড়ি কিছু পায়নি তবে চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করেছে। বুড়ীর এই চমৎকার বুদ্ধিটী শোনার জন্যে মিসেস্ রাগিন্‌স অনেক সাধ্য সাধনা করলে কিন্তু বুড়ী কিছুতেই তা বেফাঁস করবে না। কিন্তু ঠাকুমা ই যখন সব্বাইকার ভাড়া দেবে তখন সহরে যেতে আর কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কাজিন হ্যারোল্ড যে প্লাম্বারের কাজ করে সেও তার মনিবকে বলে কয়ে একদিনের ছুটী জোগাড় করলে। যাত্রার দিন সকালবেলা সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে এল। সে জানতো যে এই দলটির অভিভাবক হ[illegible] করা ছাড়াও কখনও ছেলে বইতে হইবে কখনও বা পোঁটলা মাথায় করতে হবে। সে সব কটার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এল। বুড়ী আগেই প্রস্তুত হয়েছে, প্রকাণ্ড একটা ছাতা নিতেও ভোলেনি। হ্যারল্ড ছাতা দেখেই অবাক সে তাড়াতাড়ি বুড়ীর হাত থেকে ছাতাটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে "এমন চমৎকার দিনে ছাতা কি হবে ঠাক্‌মা, দাও ওটাকে রেখে দি। ঠাকুমা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে খন্ খন্ করে উঠলো "যাও যাও আমার কাজ আমি ভাল বুঝি ; ছাতার দরকার কি শুধু বর্ষার দিনেই হয় ?" হ্যারোল্ড বেচারী চুপ করে সরে দাঁড়ালো। মিসেস্ রাগিনস্ জিজ্ঞাসা কোরলে 'ঠাক্‌মা ব্যাগটার ভেতর করে কিছু খাবার নিই— ছেলেরা আবার খাই খাই কোরবে।" ঠাকুমা আবার খন খন করে উঠলো "ছোটলোকদের মত রাস্তায় জিনিস বার করে খাবে ?—ছিঃ—আর কোথায় বসে খাবে ? বড় বড় দোকান যেখানে লোকের ভীড় তার ভেতরে ব্যাগ থেকে খাবার বের করে খেতে দেখলে গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেবে। খাবার জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না, চলো, সে ব্যবস্থা আমি কোরব এখন।" হ্যারোল্ড মিসেস্ রাগিনকে চুপি চুপি বল্‌লে "বুড়ী বলে কি ? সারাদিন না খেয়ে বাপু আমি থাকতে পারবো না।" মিসেস্ রাগিনস চিন্তান্বিত হয়ে বল্‌লে "আর ছেলেরাই কি চুপ করে থাকবে ভেবেছ ? তারা যখন খিদেয় চেঁচামেচি করবে তখন আমার ঘাড়েই সব পড়বে। বুড়ী কোথায় কোন আবার ভদ্রলোকের রেস্তরায় নিয়ে যাবে যেখানে নিঃশ্বাস ফেল্‌লেও দাম দিতে

হয়। আর তা ছাই খেয়েও কি পেট ভরবে। খ্রীষ্টমাস পার্ব্বণে খরচ করার জন্যে একটা একটা পয়সা করে যা সামান্য জমিয়েছি তা এই একবেলা খাবারেই উড়ে যাবে। হ্যারোল্ড সান্ত্বনার স্বরে বল্‌লে, দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। বুড়ী যে রকম ভালো মানুষের মত পিটপিট করে চাইছে, কে জানে আজ কি সর্ব্বনাশ বাধায়।" বাসে উঠে বুড়ী জাঁকিয়ে বসে বল্‌লে, আমরা হল এণ্ড জেম্‌সের দোকানে যাবো, বাস ষ্টপ থেকে বেশী দূরে নয় সুতরাং আমাদের বেশী হাঁটতেও হবে না।" দোকানের নাম শুনেই মিসেস্ রাগিনস্ চম্‌কে উঠে চোখ বুজ্‌লে।

খ্রীষ্টমাস উৎসবের জন্যে সহরের বড় বড় দোকানগুলি এত মনোরম করে সাজান হয়েছে, মিসেস্ রাগিনসএর আর দেখে আশ মেটে না। ঠাকুমা কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকেই না তাকিয়ে দুহাতের কুনো দিয়ে ভিড় ঠেলে দলের সকলকে দোকানের ভেতর নিয়ে গিয়ে বল্লে "এম্‌লি তোমরা ততক্ষণ ঘুরে ঘুরে দোকানের জিনিষ পত্র সব দেখে নাও, আমি চল্লুম, ঠিক এক ঘণ্টা পরে কেনার ঘরের সিঁড়ীর কাছে দাঁড়াবে।" মিসেস্ রাগিন্‌স্ জিজ্ঞাসা কোরলে "তুমি কোথায় যাচ্ছ ঠাকুমা?" ঠাকুমা খন্ খন্ করে বল্লে সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। তুমি ঠিক এক ঘণ্টা পরেই সিড়ীর কাছে দাঁড়াবে, ব্যস।" বলেই মিসেস বাগিনস্‌কে আর কথা বলবার অবসর না দিয়েই বুড়ী ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস্ রাগিন্‌স্ হ্যারোল্ডকে ডেকে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে করে সব ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লো। হ্যারোল্ড আর এল্‌ফি হাঁ করে একটা কলের গাড়ীর দিকে এমন করে চেয়ে আছে যে তাদের ফেরানই দায়। এমা আর বেবি প্যারাম্বুলেটার আর পুতুল গুলোকে গিলে খেয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এক ঘণ্টা যে কোথায় দিয়ে চলে গেল তা তারা জানতেই পারলেনা। মিসেস্ রাগিনস্‌এরই প্রথমে হুস হলো ঠাকুমার কথা। সে বেচারী অনেক অনুনয় বিনয় করে সবাইকে টেনে টুনে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে সিড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ছেলেরা এতক্ষণ ভুলেছিল খিদের কথা, এইবার—তা মনে পড়লো আর সকলে একসঙ্গে চেঁচামেচি সুরু কোরলে। মিসেস্ রাগিন্‌স্ হ্যারোল্ড এর দিকে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে "ঠাকুমার উচিত ছিলো আমায় কিছু খাবার আনতে দেওয়া, এখন এদের আমি কি করে সামলাই বলোতো? যদি রেস্তরায় যাই তারাও গলাকাটা দাম আদায় কোরবে, এদিকে না গেলেও এরা আবার না খেয়ে মরে। কি জানি ঠাকুমা আবার কখন ফিরবে।"

মিসেস্ রাগিনস্ এর কথা শেষ না হ'তেই ঠাকুমা এসে হাজির। হ্যারোল্ড এর দিকে চেয়ে বল্লে "তোমরা এসেছো ভালোই হয়েছে। ঐখানে এক মিন্‌ষে হাঁ-করে চেয়ে আছে আমার দিকে চোখ যেন আর ফেরাতে চায়না।" বলে বুড়ী একজন ছোটখাটো নিরীহ গোবেচারী মত ভদ্রলোকের দিকে একটা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হান্‌লে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চোখটা বুড়ীর দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। কতক গুলো মোজা হাতে করে নাড়াচাড়া কোরতে লাগলো। মিন্সের উপর ঠাকুমার রাগ আর কিছুতেই যায় না। বুড়ী হ্যারোল্ডকে উদ্দেশ করে ঐ নিরীহ প্রাণীটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগ লো "দেখেছ এরল্ড, আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে। গেরস্থঘরের মেয়ের মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করেনা? ওকে পুলিশে দেওয়া উচিত।" বলে রাগে গরগর কোরতে কোরতে বল্লে "চলো আবার একজোড়া মোজা কিনতে হ'বে।"

মিসেস্ রাগিন্‌স্ তাড়াতাড়ি বল্লে, আবার তুমি মোজা কিনবে ঠাকুমা, ছেলেরা যে এদিকে খিদেয় চেঁচাচ্ছে।" কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই ঠাকুমা একঝুড়ী মোজার ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে পছন্দমতো মোজা বাছতে সুরু কোরেছে। বিক্রয়কারিণী মেয়েটী ঠাকুমাকে প্রত্যেকটী মোজা তন্ন তন্ন করে দেখালে কিন্তু ঠাকুমার পছন্দ আর কোনটাই হয়না; কোনটা একেবারে ব্রাউন, কিংবা কোনটা একেবারে চক্‌চকে গ্রে, ঠাকুমা বল্লে যে তার ফনিবোস রং এর মোজার দরকার। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে বল্লে "না ম্যাডাম, আজকাল ও রং এর চল্ নেই।" ঠাকুমা ঠোঁট উল্টে বল্লে এখনকার লোকের কি আর কোন পছন্দ আছে?" তারপর তিনি হ্যারোল্ডকে উদ্দেশ করে সেই নিরীহ গোবেচারীটিকে শুনিয়ে বল্লেন "এরল্ড ঐ লোকটাকে বলো আমার দিকে যেন অমন করে চেয়ে না থাকে।" ভদ্রলোকটী এইবার চম্‌কে উঠে ঠাকুমার দিকে চাইতেই তার হাত লেগে বুড়ীর হাতের ছাতাটা মেঝেতে পড়ে গেল। বুড়ী সেটা তাড়াতাড়ি কুড়োবার আগেই সেই

গোবেচারী গিয়ে খপ করে বুড়ীর ছাতাটা দখল কোরলে এবং নিজের দিকে মুখ করে ছাতাটা বেশ করে নাড়া দিলে। উপস্থিত ক্রেতাদের বিস্মিত কোরে দিয়ে ঠাকুমার ছাতার ভেতর থেকে পড়লো একটা টাই, একজোড়া পশমের দস্তানা, ছোটছেলের একটা পিনাকোর, একটা মেয়েদের আণ্ডারওয়্যার আর একটা টুথ ব্রাস। বুড়ী খন্ খন্ করে গোবেচারীটিকে বল্লে, কুঁড়ে হতভাগা, পাজী বাঁদর।" তারপর জিনিষগুলোর দিকে চেয়ে বল্লে "কেমন এইবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লোত? লোকটা খুব বিনীত হয়ে বলে 'হাঁ ম্যাডাম, আপনি যে দোকানের এইসব জিনিষগুলি পয়সা না দিয়েই সরাচ্ছিলেন তাতে আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ হয়েছি। এ একেবারে Clear case of shoplifting এখন আপনি একবার ম্যানেজারের অফিসে চলুন।" ঠাকুমা চেঁচামেচি সুরু কোরলে। ইতিমধ্যে দোকানের সমস্ত ভীড় এই দুজন্‌কে ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে। ঠাকুমা তাদের উদ্দেশ কোরে বলতে লাগ্‌লো—তোমরা সব দেখো, শোনো এই হতভাগা মিন্সে সারাক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বলে 'চলো ম্যানেজারের অফিসে চলো।—বেরোও আমার সামনে থেকে তোমার মত পাজী লোক আমি ঢের দেখেছি।' মিসেস্ রাগিন্‌স্ এতক্ষণ লজ্জায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো—সে বল্লে ও সব জিনিষ চুলোয় যাক্ ঠাকুমা তুমি চলে এস।" বুড়ী খন্ খন্ করে বলে উঠলো "যাবো! কেন যাব? এই সমস্ত জিনিষ নিয়ে তবে আমি যাবো।' ইতিমধ্যে লোকটা জিনিষ গুলো সব কুড়িয়ে নিয়েছে ঠাকুমার ছাতাটা বগলদাবায় পুরে ম্যানেজারের অফিসের দিকে যাবার জন্যে যাই বুড়ীর হাত ধরেছে, বুড়ী এক ধাক্কা মেরে লোকটীকে সরিয়ে দিয়ে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বল্লে "দেখেছ তোমরা, লোকটা কি করে আমাকে অপমান আর হায়রাণী কোরছে।" তারপর লোকটীকে বল্লে, আচ্ছা চলো ম্যানেজারের কাছে, তুমি যে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়ে অপমান করেছ তার মজা দেখাচ্ছি। আমি গরীব বুড়ো মানুষ, আমায় কেউ রক্ষে করার নেই বলে? এইবার সমবেত জনতার সহানুভূতি ঠাকুমার দিকেই দেখা গেল!

ভদ্রলোকটী ঠাকুমাকে নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে চল্লো। সমবেত জনতাও তাদের পেছু নিলে। মিসেস্ রাগিনস চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলে তিনটীর হাত ধরে ঠাকুমার পেছন পেছন চল্লো। ছেলেরা তখন ভ্যাবচাকা খেয়ে গেছে; তারা খিদের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। কাজিন হ্যারোল্ডও ঠাকুমার এই বিপদে খুব কাছে কাছে রইল, যাতে বুড়োমানুষ এই বিপদে ঘাবড়ে না যায়। বুড়ী যত খন্ খন্ করে তত জনতা আরও বাড়ে।

দোকানের ম্যানেজার গোলমাল দেখে জিজ্ঞাসা কোরলেন "ব্যাপার কি? কিসের এত গোলমাল?" হাউস ডিটেক্‌টিভ সেই গো-বেচারী গোছের ভদ্রলোকটী বল্লে, এই স্ত্রীলোকটী চুরী করেছে স্যার।" ম্যানেজার একটু রেগে বল্লেন বেশত, তুমি চুপি চুপিই ত এঁকে আন্‌তে পারতে, এযে একেবারে পাড়া মাত করে আনছো।" ঠাকুমার চেহারা তখন দেখবার মত হয়েছে। মাথার চুলগুলো উস্কো খুস্কো, রূপে গরগর কোরছে। তিনি সিংহিনীর মত বল্লেন, তোমার ওই লোকটা আমাকে অপমান কোরেছে, আমায় ধাক্কা মেরেছে। ম্যানেজার কঠোর দৃষ্টিতে ডিটেক্‌টিভের মুখের দিকে চাইলে। ডিটেক্‌টিভ্ গম্ভীর হয়ে বল্লে—এই সমস্ত জিনিষ এঁর ছাতার ভিতর থেকে বেরিয়েছে স্যার—"বলে সে জিনিষগুলি ও ছাতাটা ম্যানেজারের সামনে রাখ্‌লে। ঠাকুমা বল্লে, তাতে কি হয়েছে? আমার জিনিষ আমি যদি কতকগুলো কাগজে মুড়ে না নিয়ে ছাতার ভেতর নিই তাতে কার কি বল্‌বার আছে?" ডিটেক্‌টিভ ম্যানেজারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে বল্লে, এ জিনিষগুলো কোনটাই মোড়া নেই স্যার, এ রকম ভাবে জিনিষ খদ্দের এ কেনে না। ঠাকুমা গর্জ্জে উঠে বল্লেন, কাগজে মুড়ে নিলে ছাতার ভেতর থেকে পড়ে যেত না মুখ্যু?" বুড়ী এইবার কাঁদো কাঁদো হয়ে রুমালে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লো। ম্যানেজার খুব মিষ্টিস্বরে জিজ্ঞাসা কোরলে, ম্যাডাম আপনি কি এই জিনিষগুলো দাম দিয়ে কিনেছেন?" ঠাকুমা খুব জোরের সঙ্গে বল্লে—নিশ্চয়ই কিনেছি এবং তার জন্যে আমি রীতিমত বিলও পেয়েছি।" ম্যানেজার আরও খুব মিষ্টস্বরে বল্লেন, আপনি সেই বিলগুলো একবার অনুগ্রহ করে দেখাবেন?" ঠাকুমা বিলগুলো তাঁর হাতের মুঠো খুলে ম্যানেজারকে দিলে। ম্যানেজার তাঁর চশ্‌মাটী ভালো করে মুছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিলগুলি পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন যে বিলগুলি সত্যই আসল। এই ভদ্র মহিলা প্রত্যেকটা জিনিষের দাম দিয়েই কিনেছেন।

তিনি ডিটেক্‌টিভের দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বল্লেন "তুমি ভয়ানক ভুল কোরেছ মিষ্টার ডকিং।"

ব্যাপারটা যে এইবার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিঃ ডকিং ও যেমনি বুঝতে পারলে ঠাকুরমাও তেমনি।—ডকিং খুব ঘটা কোরে ঠাকুমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো। এবার ঠাকুরমার পালা। বুড়ী ম্যানেজারের দিকে চেয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্লে "হ্যাঁ এইবার ত তোমরা ক্ষমা চাইবে, কিন্তু ঐ লোকটা দোকানের সমস্ত লোকের সামনে আমায় অপমান কোরেছে, আমার গা ছুঁয়েছে, আমার অপমানের আর কি বাকি রেখেছে ?" তারপর ঠাকুমা জনতার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্লে "ওরা সব মজা দেখার জন্যে হাঁ করে রয়েছে, কতক্ষণে আমাকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ টেনে নিয়ে যায় তাই দেখার জন্যে।" এবার ঠাকুমা রীতিমত কান্না সুরু করে দিলে, এল্‌ফি আর এমা, যদিও ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা কি, কিন্তু ঠাকুমার যে কিছু একটা হয়েছে তা তারা বুঝতে পেরেছে এখন ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে তারাও চেঁচিয়ে কাঁদতে সুরু করলে। বেবি দেখলে যে তারা সবাই যখন কাঁদছে তখন তারও সহানুভূতি দেখান আবশ্যক বলে সেও প্রাণপণে চীৎকার সুরু করলে।

ম্যানেজার দেখ্‌লেন ব্যাপার গুরুতর। দোকানের সম্ভ্রম রাখতে হ'লে বুড়ীকে আগে থামানো দরকার। তিনি বুড়ীর কাঁধ স্নেহের সঙ্গে আস্তে চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, চল সব আজ আমরা সব্বাই দোকানের খরচে লাঞ্চ খেয়ে আসি।" অর্থাৎ খাইয়ে দাইয়ে বুড়ীকে হাত করা। মিসেস রাগিনস্‌ এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনে, অর্থাৎ জেলের দরজা থেকে খাবার টেবিলে ফিরে আসায় এত খুসী হয়েছিলো যে সে ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে হাঁ করতেই বুড়ী ইসারা করে তাকে চুপ কোরতে বলে ম্যানেজারকে বল্লে "না তা কিছুতেই হবে না। আমার এই অপমান একটা লাঞ্চেই শোধ হ'বে না।" তারপর হ্যারোল্ড এর দিকে চেয়ে বল্লে, আমাদের এই ছেলেটী সলিসিটরের অফিসের কেরাণী ওই বা কেন ওর ঠাকুরমার এই অপমান সহ্য করবে।" হ্যারল্ড বেচারী সলিসিটরের ছায়াও কোনদিন মাড়ায় নি, সে লজ্জায় লাল হয়ে একটা ঢোক গিল্‌লে। এদিকে জনতা তখন প্রকাশ্যে বুড়ীকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। বিশেষ করে তারা যারা দোকানের "গলাকাটা" দামের জন্যে আগে থাকৃতেই দোকানের ওপর রেগে ছিল। তারপর ম্যানেজার বল্লেন "আ-হা হা, তা কেন ? তারপর তোমরা সকলেই এক একটা খৃষ্ট মাসের জন্যে কিছু উপহার পাবে। বুড়ী ভারী শক্ত ; বল্লে আমাদের যা-যা দরকার তা পাবোত ?" ম্যানেজার তাড়াতাড়ি হাঁ হাঁ বলে ফেলেই ভাব্‌লেন কাজটা ভালো হোল না, বুড়ী আবার কী চেয়ে বসে কে জানে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি আবার পাল্‌টাতে চাইলেন, "অবশ্য খুব বেশী দামের যেন না হয়।" বুড়ী আবার বেঁকে বস্‌লো, বল্লে আমার অপমানটাও সস্তা নয়, আমি যা চাই তা হ'চ্ছে এই যে আমি নিজের জন্যে বেশ ভালো একটা আরাম কেদারা, আমার বউ এর জন্যে একটা রূপোর চা এর কেটলী, ছেলেদের জন্যে একটা করে সাইকেল আর এরল্ড তুমি কি চাও ?" হ্যারোল্ড বলে যে তার একটা সুট চাই, বুড়ী বলে না—না—তোমার এক ডজন পোর্ট চাই। ম্যানেজার উপায়ান্তর না দেখে বলেন, আচ্ছা তোমরা যা চাও সবই পাবে কিন্তু লিখে দিতে হবে যে আমাদের firm এর ওপরে তোমাদের আর কোন দাবী দাওয়া রইল না। বুড়ী বলে, তাতে তার আপত্তি নাই। অতঃপর সকলে খাওয়ার ঘরে গেল।

ঠাকুমা পেট ভর্ত্তি করে মুরগী, হাঁস, হ্যামপুডিং খেয়ে সুগন্ধি কফিতে চুমুক দিতে দিতে বল্লে আঃ—

মিসেস রাগিন্‌স্‌ আস্তে আস্তে বল্লে "আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি কি এই প্ল্যান করেছিলে ?'

ঠাকুমা চোখ দুটো পিট পিট করতে করতে বলে, ঠিক এই প্ল্যান যদিও আমি করি নি তবে সকলেই এই কঠোর পৃথিবীতে একদিনের জন্যও একটুখানি আরাম চায়।

বীরভূমের কীর্ত্তন পদাবলী

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আপনি বা আমি বাঙ্গালা দেশকে জানি একথা কি বর্ত্তমানে মুক্তকণ্ঠে আমরা বলিতে পারি? বর্ত্তমানের জীবনযাত্রা ও রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্য হইতে আমরা কখনও অতীত বাঙ্গালার দিকে চোখ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছি কি?—অধুনা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন, আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে তাহার বড় অভাব। শিক্ষিত সমাজের অনাদরের জন্য দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগুলি বিলোপ সাধনের পথে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে থিয়েটার এবং সিনেমার প্রবল প্রতাপে বাঙ্গালার অনাদৃত কীর্ত্তন সঙ্গীত সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা দোষ লইয়া লজ্জায় পল্লীর নিভৃতপ্রদেশে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। সাধারণের রুচিজ্ঞান ও রসবোধের ক্রমবিকাশই যে ইহার কারণ, সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সরল গ্রাম্যজীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খা এই কীর্ত্তনগানগুলির ভিতরে প্রচ্ছন্ন রহিয়া আজিও গ্রামে গ্রামে কৌতুহলী নরনারীর অমার্জ্জিত রুচিতে রসের যোগান দিয়া আসিতেছে। আধুনিকতম শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটেও তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করিয়া সাম্যের গান গাহিয়াছে প্রথমেই বাঙ্গালার কীর্ত্তন পদাবলী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বীরভূম জিলার কয়েকজন কীর্ত্তনীয়া ও তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতের অবতারণা করিতেছি।

বীরভূম জিলার হেতমপুর নিবাসী কবি শ্রীনিবাস গাঙ্গুলী একজন স্বভাব কবি ছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্র নাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষেও তাহা দেখিতে পাই। তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি সাধারণতঃ সার টমাস নামক জঙ্গলে (বর্ত্তমান দেওঘরের নিকট) বসিয়া গান রচনা করিতেন।—তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"গৌর হয়ে হরি কাল হতে আর সাধ কেন,
গোরা রূপে কত মজা তবে তুমি কেন মলিন।
তুমি আমার কাঁচা সোণা, আমিত কাল জানিনা,
এক কালের কাল ঘুচিয়েছি কাল শ্রীঅঙ্গ করি মার্জ্জন॥
ঠাকুর যদি তুমি হও হে কাল, তবে কার কি হবে ভাল
আমার মনের কালী কে ঘুচাবে, ওহে কালীয়দমন।
এস আজ ঘুচিয়ে দিই তোমার কালী,
বাড়াই তোমার ঠাকুরালী,
দেখো অন্তে তোমার অচ্যুতে যেন ভুলো না॥"

এই বংশের কবি রাধানাথও অনেক কীর্ত্তনের গান রচনা করেন। তাঁহার রচিত "প্রার্থনা" নামক একটি গান এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।—

"এস রাধানাথ হৃদিপদ্ম কাননে
অনেক দিনের সাধ আছে হেরব নয়নে।
পরি এস পীতধড়া মস্তকেতে মোহন চূড়া
গুঞ্জবেড়া,
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে কিশোরী বামে॥
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর
মনোহর—
তুলসী মঞ্জরী দিব যুগল চরণে॥"

হেতমপুর গ্রামের কবি বিপ্রচরণেরও হরিনাম-কীর্ত্তনে সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিও পিতার ন্যায় কীর্ত্তন সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—

"ব্রজাঙ্গণার মাঝে বিরাজে রাধাশ্যামরায়
শ্যামজীমূতবেষ্টিত বিজলীসম গোপীকায়
হেরিলাম শ্রীরাসমণ্ডলবেষ্টিত গোপীমণ্ডল
জ্ঞান হয় মণিমণ্ডল বিধু কি কুণ্ডল
রাসসরোবর মাঝে, মদনমোহন বিরাজে
গোপিগণ সব হেমাম্বুজে ত্রিভঙ্গশ্যাম ভৃঙ্গতায়

মত্তময়ুর ডাকে "গড় গড়" কোকিল পঞ্চমে গাওয়ে
যত তরুকুল বিকসিতফুল খসি পড়ে পড়ে
দোঁহার গায়।"

বিপ্রচরণের কনিষ্ঠপুত্র কবি কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সখের কবির দল ছিল। শারদীয়া ও ৺সরস্বতী পূজার সময় তাঁহার রচিত গীতগুলি ঐ দলে গীত হইত। কবি কৃষ্ণচন্দ্র রচিত একটি গানের উল্লেখ করিতেছি।—

"মথুরা যাই পাঠলে রাই
দেখি অপার নদী কাঁদি কৃষ্ণ ব'লে॥
গোপীর বিচ্ছেদ অপার, কর বার বার শ্যাম পার
বিপদে পার কর এবার,
ভাসে তরঙ্গে জীবন তরী, তরাও ত তবেই তরি
নারী—যমুনা পার হতে নারি,
পারের কাণ্ডারী বংশীধারী হরি কোথা রহিলে॥
তুমি ভিন্ন উপায় নাই,
তোমার নাম নিলে যায় ওপারে
পারে লয়ে যেতে কে আর পারে?
কৃষ্ণ করুণা দান কর যারে
পারের ভয় কি আছে তারে?
নিদানে নাম নিলে কত পাপীতাপী তরে
আমার পারের বিধান, কর বংশীবয়ান,
নামে কলঙ্ক হবে হরি আমায় না তরালে॥"

এই বংশের মহিমানিরঞ্জনও কীর্ত্তনে অনুরাগী ছিলেন। ৺বৃন্দাবনস্থ মন্দির গাত্রে তাঁহার লিখিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি আজিও দৃষ্ট হয়।—

"সার হয়েছে আমার হয়েছে শুধু আঁখিজল।
আমার আশোবাসা ভেঙে গেছে মন হয়েছে বিচঞ্চল॥
ভবমরু মাঝে কল্পলতা সখা, ছিল স্নেহময়ী করুণা প্রতিমা,
ভাগ্যদোষে হায় হারাইয়ে সে মা, হেরি সব
শবপুরী জলস্থল॥
আজন্ম সুখে মত্ত হয়ে, মায়ের সোহাগে গেছে দিন বয়ে,
অকরুণ বিধি নিরমম হয়ে সাধে বাদ সাধি হরিল সম্বল॥
আছে সব কিন্তু শুধু মা বিনে, সব শূন্যময় নেহারি নয়নে,
মা মা বলি আঁখি ভাসে নিশিদিনে, মনমাঝে যেন
জ্বলে দাবানল
আর কেন ভবে কেঁদে কেঁদে মরি, মা মা বলি সদা
ফেলি নেত্রবারি,
মিনতি শ্রীহরি যেন শীঘ্র করি, করিহে শ্রীহরি
বলে হরি বোল॥

কবি কমলানিরঞ্জনও পিতৃপুরুষগণের ন্যায় কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহিমানিরঞ্জনের কনিষ্ঠ পুত্র।

"দেখা দাও হরি, গোলক বিহারী, অন্ধজনে করি করুণা,
সর্ব্বদা অস্থির, তিল নহে স্থির, দয়া কি হবে না—॥
না জানি ভজন আমি মূঢ়মতি, দয়া কি হবেনা
অধমের প্রতি,
ওহে শ্রীপতি!
নিজগুণে দয়া করি দাও পদছায়া—অন্যধন কিছু চাইনা।
তুমি সারাৎসার, সর্ব্বমূলাধার তোমায় ভজিতে
কি শক্তি আমার
আমি দুরাচার,
আসি হৃদ্‌পদ্মাসনে কমলার সনে "কমলায়" কি
দেখা দিবে না॥

হেতমপুরের কবি ক্ষুদিরাম একজন প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই, বাঙ্গলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব ইহাকে স্বভাব কবি আখ্যাদিয়াছেন। ইহার রচিত "পুষ্পাঞ্জলি" নামক একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ আছে। পুস্তকের প্রথম ভাগ মুদ্রিত করিয়াই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি গ্রন্থখানি হেতমপুরের মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর কে উপহার দেন। সেই ভক্তি উপহার কবিতাটির উল্লেখ করিতেছি।

"শ্রীরাধা বল্লভ পদে মানস মধুপ যাঁর
নিমগন, জ্ঞানযার হরিপাদ পদ্ম সার॥
যাঁর চিত্ত সদাশুদ্ধ ভক্তি প্রসূন সুবাসে।
পুঞ্জ পুঞ্জ ফলে যার গোকুল আনন্দ বাসে

কবি আশুতোষ ও কনিষ্ঠ শিবচন্দ্র অগ্রজ ক্ষুদিরামের ন্যায় গুণসম্পন্ন না হইলেও সঙ্গীতরচনায় তাঁহাদেরও বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়।

"আসিয়াছি ভবে যেতে হবে কবে
জানি না হে হরি কবে বা সেদিন
হল না ভজন, হল না সাধন,
ক্ষণে দিন দিন, তনু হল ক্ষীণ ॥
বাল্যকাল গত বাল্যচাপল্যেতে
যৌবন গেলযে রঙ্গতামাসাতে
প্রৌঢ়কাল গত বিষয় কর্ম্মেতে
বৃদ্ধকালে জরা কৈল শক্তিহীন ॥
আজকাল করি হলো না সাধন
হেলায় হারালেম অমূল্যরতন,
সেই গুরুদত্ত ধনের হলো না যতন,
মোহমায়া বশে হয়ে জ্ঞানহীন ॥
তব শ্রীচরণে এই আকিঞ্চন
ধনে জনে মম নাহি প্রয়োজন
দিও শ্রীচরণ হে রাধারমন
শেষের সেদিন বড়ই দুর্দ্দিন ॥"

কবি শিবচন্দ্রের গীত :—

"পদে রেখো জননী।
ভজন বিহীন জনে করুনা করি ঈশানী ॥
ধনজন পরিজন জীবন যৌবন মন
এসব দিয়ে বিসর্জ্জন সার করেছি পা দু'খানি ॥
পদের মহিমা কত শিব শবে পরিণত
পা তলে হয়ে পতিত হৃদে ধরেছে শিবানী ॥
বিপদে সম্পদে পদে রাখি মতি প্রতিপদে
অন্তিমে সে পেয়ে পদে পার হব ভবতটিনী

চক্রবর্ত্তীবংশের কবিকুলের কথা বলা হইল। তৎভিন্ন আরও দুই একজন কবি হেমতপুরে বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে কবি প্রতাপ চন্দ্র ও রমানাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রতাপচন্দ্র সুকবি ছিলেন। কবির গান রচনায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা দৃষ্ট হইত। প্রতাপচন্দ্র ১৩০০ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপ্রণীত একটী গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"নিমন্ত্রনে ব্রজগোপীর মনে, বাধাদিয়া যাব না
ব্রজের ভাব মধুর ভাব, মাধুর্য্য ভাব, ভাবের নাই তুলনা ॥
গোপাঙ্গণা গোকুল পানে, পশ্চাতে প্রেমরজ্জু টা[illegible]
আঘাত করে গোপীর প্রাণে যেতে পারি কই বৃন্দ[illegible]
মথুরায় যে মন চলে যায় পরাণ বলে যেওনা হে যে[illegible]

কাব্যরচনায় রমানাথেরও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমত[illegible] গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা [illegible] হাস্যোদ্দীপক কবিতা রচনায় ও ইনি তদ্রূপ সুনিপুন।

"আসার সংসারে শুধু শ্যামাপদ সার রে,—।
কিছু নাই আমার ভবে সব শ্যামা মার রে ॥
শ্যামা মুক্তি গতি, নিয়মনিয়তি শ্যামা ধাত্রী বিধা[illegible]
শ্যামা আধার আধেয়, শ্যামা জ্ঞান জ্ঞেয়
শ্যামা ময় ত্রিসংসার রে ॥
শ্যামা ধ্যান ধন, শ্যামা প্রাণ মন
শ্যামা বুদ্ধি অহঙ্কার রে।
শ্যামা সাধনের যন্ত্র শ্যামা সিদ্ধ মন্ত্র
শ্যামা সারতন্ত্র রমার রে ॥"

কাব্যরচনা ভিন্ন তিনি গদ্যরচনাতেও বিশে[illegible] ছিলেন।

ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমার রায় ও একজন স[illegible] ভিজ্ঞ ও সাধক পুরুষ ছিলেন, তাঁহার রচিত গানে তাঁহ[illegible] বিশেষ আভাস পাওয়া যায়।

"কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে ॥
উপেক্ষিয়ে মহাতত্ত্ব, ত্যজিচতুর্ব্বিংশতত্ত্ব
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে ॥
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে কুণ্ডলিনী জাগরনে ॥
শীতল হইবে প্রাণ পাইবে আপনে প্রাণ
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে ॥
কহে শ্রীনন্দকুমার ক্ষমা দে হরি নিস্তার
পার হবে ব্রহ্মদ্বার শিবশক্তি আরাধনে ॥"

এই প্রসঙ্গে মঙ্গলডিহি গ্রামের কবি গোকুল চ[illegible] কীর্ত্তন ও সবিশেষ্য উল্লেখ যোগ্য।

"উঠ বাপু ওরে নন্দের নন্দন প্রভাত হইল রা[illegible]
অঙ্গনে দাঁড়ায়ে রঞাছে সকল বালক তোমার সা[illegible]

মুখের উপর মুখখানি রাখি ডাকয়ে যশোদারানী।
কত মুখ পেঞা ঘুমায়েছ তুমি আমি কিছুই না জানি॥
নয়ন মেলিয়া দেখহ চাহিয়া উদয় হঞাছে ভানু।
ছিদাম ছিদাম ডাকে ঘনে ঘন উঠ ভেঁইয়া ওরে কানু
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিলা সত্বরে সুন্দর যাদব রায়।
বদন ধুইতে গোকুল চন্দ্রহি জলঝাড়ি লয়ে ধায়॥

কবি নয়নানন্দের কৃষ্ণভক্তির কথাও সর্ব্বজনপরিচিত।

"উঠ গোপাল প্রাতঃকাল মুখ নিহারি তের
রজনী অবসান ভেঁই কাম ভেঁই মের
উঠতো ভানু দেখতো কানু রজনী গেই দূর
বালক সঙ্গে খেলত রঙ্গে রোহিণেয় বলরাঁর
এই শ্রীদাম দাম সুদাম সঙ্গীগন তের
পুরতো বেনু ধাওতো ধেনু আঙিনা ভরল মের
নন্দরাণী পসারি পানি বালক লেই কোর
মুখ নেহারী দুঃখ বিসরী কিসে সুখ জানি ওর
শ্যামচন্দ্র চন্দ্রে উদিত নাশল হৃদি ঘোর
হেরিয়া বয়ান কহিছে নয়ান উঠহ কানাই মোর॥"

কবি জগদানন্দ কৃত গৌরচন্দ্রিকার ভনিতাটিও উদ্ধৃত-করিয়া দিলাম।

"শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র জয়জয় মন্দিরে শুভ আরতি।
গৌর অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন মাল্য চম্পক মালতী॥
হৃদয়ে উলসিত ফিরয়ে শচীমা দেখিয়া নিজসুত মাধুরী।
রমনী মোহনরূপ দরশন করে নবদ্বীপ নাগরী
ভাব নিজ নিজ ভক্তবাঞ্ছিত গৌর প্রেমরসে মাতয়ি।
মধুর কীর্ত্তন প্রেম নর্ত্তন তাল মৃদঙ্গ কি বাজয়ি॥
ভক্ত নব নব প্রিয় সখাগণ গৌর প্রেমরস বর্ষয়ি।
এসে প্রিয় ঠাকুর সুন্দর জগদানন্দকি গাওয়ি॥

কবি হরিকিঙ্কর ঠাকুর "বরাটিকা" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। বরাটিকার একটি গান—

"জাগহুঁ ব্রজরাজকুমার কানাই মেরা ভাই
নেহারত বোলত কত করে নবনীত মাই।
জাতি যূথি লতা তরু কুসুমিত
মুহুঃ কুহু রবে দিশা মুখরিত,
যমুনা স্নাত মন্দবাত গন্ধ সাথ বাওয়ই।
মন্থরাগতি ব্রজ আভীরি
যমুনাপন্থে কাঁখে গাগরি
রে—রে কা—কানাই ভা—ভ—ভাই শিঙ্গা
বাজত বলাই,
মথিতামৃত পয়োধি চন্দ
নিশি উপবাসী নয়নদ্বন্দ
কিঙ্করজনে দেরে দরশণে জীবন কানাই।"

এই যে

শ্রীহৈমবতী দেবী

বিশ্বভুবন মোহন করা
এই যে আমার পাওয়া এলি
দীর্ঘ জীবন দহন করা
রোদন ভরা চাওয়ায় ঠেলি;
তোমার তরেই কইনু কথা
জীবন-ভরে বইনু ব্যথা
শেষ জীবনের ব্যাকুলতা
তোমার তরেই দিনু মেলি।

বুকের পরে ছড়িয়ে পড়ে
নীরবে আজ নিবিড় সুধা,
সপ্ত সাগর ঢেউ তুলে যায়
মিটাতে কার প্রাণের ক্ষুধা,
ফুরিয়ে কথার কাণাকাণি
জীবনে আজ জানাজানি
চিরদিনের পাওয়ার বাণী—
চাওয়ার মুখেই বেড়ায় খেলি। *

* পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বে রচিত।

মানব জীবন

মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

মনুর অপত্য মানব, ইহা ব্যাকরণ সঙ্গত কথা। মনুর প্রজা যিনি অর্থাৎ মনুর শাসনে স্থিত তিনিও মানব। কারণ অভিধান বলেন "প্রজাঃ স্যাৎ সন্ততৌজনে" ঋগ্বেদে স্বয়ম্ভুব মনুর কথার ইঙ্গিতে আছে যে মনুকে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র যাবতীয় পদ্ধতি করিয়া দেন। মনুকে স্বর্গের কথা বলেন ইত্যাদি বাক্য হইতে মনুর শাসন পদ্ধতি থাকা জানা যায়। তাহাতে মানবের জন্ম সহ তিনটি ঋণ হয় এমত কথা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেব, ঋষি ও পিতৃ ঋণ বলিয়া অভিহিত হয়। দেবঋণ বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, ঋষি ঋণ ঋষিগণের দৃষ্ট-মন্ত্রাত্মক বেদের পঠন পাঠনে এবং পিতৃ ঋণ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণে ও পুত্রোৎপাদনে পরিশোধিত হয়। এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল যখন আর্য্য রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হইত না যখন আর্য্য সভ্যতা প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারেও বিস্তৃত হইয়াছিল যখন ভারতের পণ্য রোমে ও চীনে বিক্রয় হইত তখন আর্য্য পিতৃগণের পুত্রের প্রয়োজন অত্যধিক ছিল, তাই পুত্রোৎপাদন না হইলে পিতৃ ঋণগ্রস্তের মুখ দর্শনও দোষাবহ গণ্য হইত। এখনও কোন কোন স্থানে উহা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয়। "পুন্নামনরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুব।" বাক্যের কথা অনেকেই জানেন। পুত্র না হওয়ায় নরক অবশ্যম্ভাবী এজন্য যার পুত্র নাই সে ধ্রুব নরক যাত্রী, এজন্য তার মুখ দর্শন দোষাবহ। পুত্র কেন চাই, না "পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোর্নাম সঙ্কীর্ত্তণায় চ।" ইহার অর্থ—শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান, তর্পনের জলাঞ্জলি প্রদান, যে পরিবারে জন্ম তাহাদের দেব সেবাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ এবং নাম রক্ষার জন্য পুত্র চাই। স্বাধীন দেশে ইহার অর্থ পিণ্ড বা আহার্য্য সংগ্রহ, সেচের জন্য জলের বন্দোবস্ত করা, জাতিকে অন্তঃ শত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষণাদি ক্রিয়া, শিল্প বাণিজ্যাদি ক্রিয়ার জন্য পুত্র চাই। এতৎসহ জাতির গৌরব স্বরূপ নাম সংরক্ষণ ও প্রয়োজন বটে। অনেক দেশে উৎপন্ন ধান্যাদি দেশের ভরণপোষণে প্রচুর নহে, বিদেশ হইতে উহার সংগ্রহ করতঃ দেশের অন্ন সংস্থান করিতে হয়। যেমন ইংলণ্ডে যে গমাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে তৎদেশের মাত্র তিন মাসের অন্ন সংস্থান হয়, এজন্য কেনেডা, অষ্ট্রেলিয়া বা ইণ্ডিয়া হইতে গোধূম আমদানী করিতে হয়। ইংলণ্ডের শিল্প সমাগ্রী ঐ সকল দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করতঃ খাদ্যাখাদ্য ক্রয় করিয়া দেশের ধন দৌলত বৃদ্ধি ও অন্নের বা পিণ্ডের সংস্থান করিতে হয়। দেশে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহার জন্য ক্ষেত্রে জল সেচনের বন্দোবস্ত করা হয়, শিল্প সম্ভার নির্মাণ ক্রিয়া ও অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে দেশের রক্ষণ ক্রিয়ার জন্য শিল্পী ও সৈন্য চাই। ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি জাতীত্ব রক্ষণ-ই নামসঙ্কীর্ত্তণ। যেমন ফরাসী রাজনিতিকগণ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের পর দেখিলেন ফরাসী দেশে জন্ম হইতে মৃত্যুর হার অধিক হইয়া পড়িয়াছে, উহার কারণ যুবক যুবতীগণ বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে নারাজ। আমি কেন অপরের দাস বা দাসীর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইব। সব সমান স্বাধীন। অন্যের অধীনতা স্বীকারই বিবাহ। উহাতে স্বাধীনতার খর্ব্বতা ঘটে। তাই বিবাহিত জীবন স্বাধীনতা বা স্বৈরাচারের বিরোধী। অতএব বিবাহ করিব না, পণ হইল। ইহাতে স্বৈরাচার সহ ভ্রূণ হত্যার প্রাচুর্য্য ঘটে। তাই ঐ দেশে বিবাহ না করিলে যুবক যুবতীকে সুপার টেক্স দিতে হয়। এবং বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলে উক্ত টেক্স রদ হয় এবং পুত্রের শিক্ষার কতক ভার দেশ গ্রহণ করেন। তত্রাচ পুত্র চাই। নতুবা শিল্পী বা যোদ্ধার অভাবে দেশের, জাতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে। এই কারণ জার্ম্মাণীতে হিট্‌লার বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতেছেন। পুত্র চাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে এই সংসারে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব।

এ দেশেও ঐ সমান অধিকারের ধূয়া চলিয়াছে, বিবাহ করিতে অনেক হিন্দু যুবক যুবতী নারাজ। দেশে যে সংখ্যা গরীষ্ঠ এবং সংখ্যা লঘিষ্টের প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে চিন্তনীয় বিষয় বটে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের নাই বিশেষ তাহাদের মধ্যে কন্যার সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হইতেছে তাহাতে একজনের একাধিক বিবাহ করা আবশ্যক এবং তাহা দ্বারা জাতীয় জীবনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের উপায় হইতে পারে। দেশে অনাবাদী জমির পরিমাণে জন সংখ্যার অল্পতা বলা যায়। অহিন্দুসম্প্রদায়ের বহু বিবাহ সংখ্যাগরিষ্ঠের কারণ। আহার্য্যাভাব হয় নাই। তবে ছাপ্পান্ন ভোগ খাইবার পথ সংকীর্ণ হয় বটে। মোটা ভাত মোটা কাপড় মিলা দুরূহ হয় না। সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি সহ স্তন্য দুগ্ধাদির যেমন বন্দোবস্ত করেন উপনিবেশাদি দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ও অন্ন সংস্থান বিধান করেন। গৃহ-প্রিয়তা কোন ধর্ম্ম নহে। জনকাদি হল কর্ষণ করিতেন, বলরাম ও হলধর। হাল চাষ করিলে গার্হস্থ্য জীবন শোভনীয় হইবার বাধা দেখা যায় না। আমি ভদ্র অর্থ-আলস্যপরতন্ত্রতা নহে। ব্রহ্ম তত্ত্বই ভদ্রতা, তাহা না জানিয়া কেবল ধপ্‌ধপে ধুতি পরিধানে ভদ্রতা হয় না। মানব জীবনের দুইটী ধারা, একটী ব্যবহারিক ও অপরটী পারমার্থিক। ব্যবহারিক জীবনে মিশনরী, মিলিটারী, মার্চ্চাণ্ট বা মেনুয়াল লেবার এই চারি ভাগ সব সভ্য ও স্বাধীন দেশে হইয়া থাকে, সবাই নিরলস জীবন যাপন করে। পারমার্থিক পথের পথিক অতীব অল্প। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততিসিদ্ধয়ে, যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ॥ তাঁহাদের পথ দুরূহ, তাহাদের যমনিয়মাদি অতীব ক্লেশকর এবং সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে তাহা অসমিচীন বলিয়াই মনে হয়। জগতের জাতীয় জীবনের ও ব্যষ্টি জীবনের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া দেহপিণ্ডে অনাস্থা উপস্থিত হয় তাই বৈরাগ্যাবলম্বনে নিত্য যে ঈশ্বর তৎ চিন্তনে লোক শান্তি সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। পাদরীগণের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা বলেন যে-মন ঈশ্বরে অর্পন করা হইয়াছে তাহা বিবাহ জীবন আরম্ভ করিলে ভাগ করতঃ কতক ঈশ্বর হইতে উঠাইয়া আনিতে হয়, তাহা আত্মবঞ্চনা; এজন্য বিবাহ করেন না তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক। তেমন ঈশ্বর প্রেমিক যাঁহারা তাঁদের গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। মনুষ্য জীবন চারি ভাগে বিভক্ত করতঃ মনু বলিয়াছেন প্রথম ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে, দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসর গার্হস্থ্যে, তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থে এবং চতুর্থ ভাগ কেবল ভগবৎ চিন্তনে কাটাইবে। মনুর সন্তানগণ যদি মনুর এই বিধান পালন করেন তাহাতেই যথেষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারেন। বিশেষ একই জীবনে সকলে ধর্ম্মের ষোল কলা আদায় করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। অনেক জন্ম-সংসিদ্ধততোযাতি পরাং গতিং॥ দু'চার জীবনে সাধন শেষ করিয়া কৃত কৃত্য হইবার সংকল্প করিতে কোন বাধা নাই।

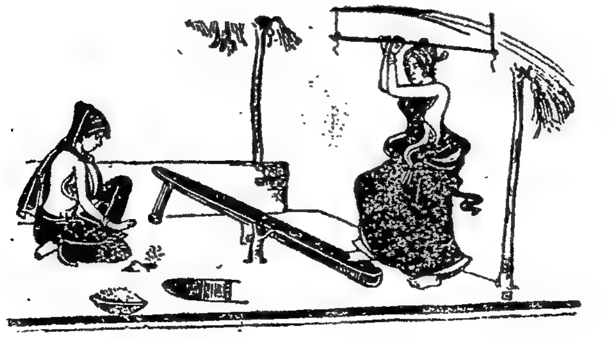

মেয়েলী ব্রত-ছড়ার বৈশিষ্ট্য

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে ব্রতপার্ব্বণের অন্ত নাই। পঞ্জিকার পাতা উল্টাইলে অনেক কিছু আমাদের চোখে পড়ে—ব্রত অনুষ্ঠান সে সবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ এ ব্রত, কাল সে ব্রত লাগিয়াই আছে। গৃহকর্ম্মের মাঝখানে মেয়েরা যে সব ব্রত করে, নিষ্ঠাবতী মহিলাদের সে-সবে-ই প্রধান পরিচয়। এ সব ব্রতের দ্বারা তাহারা যেন সংসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখি, মেয়েরা একস্থানে সমবেত হইয়া গালে হাত দিয়া কিংবা দূর্ব্বা হাতে নিয়া কথা শুনিতে বসিয়া যায়। ছেলেমেয়েরা ত্যক্ত বিরক্ত করে, ভ্রূক্ষেপ নাই। ব্রতকথা শুনিয়া তাহারা পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়। তাই অন্য কোনদিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিয়া মেয়েরা পুণ্য অর্জ্জন করে—বৈশাখমাসে এই ব্রত করিতে হয়। তখন মেয়েরা বলে—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা॥
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইএর বোন্ ভাগ্যবতী।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে॥

বৎসরের প্রথম হইতে মেয়েরা ব্রত করে। সম্বৎসর কিংবা জীবন-ভর ব্রত করিয়াও আপশোষ যেন মিটে না। বৈশাখ মাসে এয়োতি-যুবতীদিগের মধ্যে অনেকেই করেন ফলদানের ব্রত। ব্রতের উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিলে শুনি, তাহাতে নাকি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। ফলদানের ব্রত চার-বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। প্রথম বৎসর দান করিতে হয় পৈতা, দ্বিতীয় বৎসর কলা, তৃতীয় বৎসর আম, চতুর্থ বৎসরে নারিকেল। পুত্র-ফল লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাই পতি পুত্র লইয়া মেয়েরা সুখে ঘর-সংসার করিতে চায়। বসুমতীর ব্রতে মেয়েরা বলে—

বসোমাতা মাগো,
জল দাও, স্থল দাও,
পতি দাও, পুত্র দাও,
তুমি আমায় ঠাণ্ডা কর
আমি তোমায় ঠাণ্ডা করি।

পদ্মপাতার ব্রত করিয়া মেয়েরা স্বামীর ভালবাস কামনা করে। রাজরাণী সাজিয়া সংসার করিয়া ত গুণে সরস্বতী রূপে লক্ষ্মী হইয়া থাকিতে চায়। মে তখন বলে—

পৃথিবী আসছেন পদ্মপাতে।
শঙ্খ চক্র গদা হাতে॥
খাব চিনি, মাখব ননী
বসে থাকব রাজা রাণী॥
খাট পালঙ্গ দেব দালঙ্গ
বিদ্যা আশে পাশে।
রূপ যৈবন সবরে সখী
সোয়ামি ভালবাসে॥

মেয়েদের কামনার অন্ত নাই। সংসারের সেরা জিনি তাহারা ভোগ করিতে চায়। আদর্শের দিকে কিন্তু নজ আছে ষোল আনা। বৈশাখ মাসের দশ পুতুল ব্র মেয়েরা কত কামনা করে। মেয়েরা তখন দশটি পু আঁকিয়া ঘট স্থাপন করিয়া তাহার কাছে আম, সু হলুদ ইত্যাদি দিয়া কত কি বলে।

দশ পুতুল পূজে যে।
দশ ফল পায় সে॥
এবার ম'লে মানুষ হব।
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লব॥
সীতার মত সতী হব।
রামের মত পতি পাব॥
লক্ষণ দেবর পাব।

কৌশল্যা শাশুড়ী পাব॥
শিবের মত বাপ পাব।
দুর্গার মত মা পাব॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বোন পাব।
কার্ত্তিক গণেশ ভাই পাব॥
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
লক্ষ্মীর মত গিন্নী হব॥
বসুমতীর মত ধীর হব।
কলা বউ এর মত লাজুক হব॥
বাঁশের মত ঝাড় হব।
দুর্ব্বার মত লতিয়ে যাব॥
সাত ভাই এর বোন্ হব।
সাবিত্রীর সমান হব॥

হরি-চরণ পূজার শেষে মেয়েরা যাহা কামনা করে, তাহা বিশেষ উপভোগ্য। সেই ব্রতে মেয়েরা "সভাসুন্দর" পতি হইতে আরম্ভ করিয়া ধন দৌলত সব কিছু প্রার্থনা করে।

হরির চরণ হরির পা।
চুয়ো চন্দন দিয়ে পূজলাম পা॥
কোন্ ভাগ্যবতী পূজে পা?
সে ভাগ্যবতী কি চায়।
অমর বর চায়॥
× × ×
বাড়ী ভরা গোলা চায়।
আড়ি-ভরা সিন্দুর চায়॥
সভাসুন্দর পতি চায়।
রাজার মত পুত্র চায়॥
গোয়ালে গরু বাকারে ধান।
বৎসরান্তে পুত্র চান॥

বৎসরান্তে পুত্র চাওয়া তখনকার দিনে কামনার প্রধান বিষয়বস্তু হওয়া সম্ভব ছিল। এখনকার দিনে অতটা বোধ করি কাহারও অভিপ্রেত নয়। তখন প্রত্যেকেই গোয়ালভরা গরু, গোলা ভরা ধানে সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু এখনকার দিনে অনেক দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়। তারপর প্রতি বৎসর ছেলে হইলে ত কথা নাই।

উপরে আমরা যে সব ব্রতের ছড়া কথা বলিলাম, সে সব বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং সে সব পশ্চিম বঙ্গের দিকে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িতেই সন্তানবতীরা পুলকিত হন। পঞ্জিকা মতে তখন তাহারা পূজার আয়োজন করেন। ছেলে মেয়ে কাছে না থাকিলে মায়ের মনে কষ্ট হয়। ভোর হইতে না হইতে মেয়েরা যাবতীয় আয়োজন করিয়া সকলকে স্নানের জল লইতে ডাকিতে থাকেন। তখন "জৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা ষাধ্ ষাট্ ষাট্ শব্দ স্নানের ঘাট কিংবা গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত করে। এদিকে ছেলে মেয়ের দৌরাত্ম সহ্য করিতে হয়। কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই, ছেলেদের কিছু বলিলে মা ষষ্ঠী নাকি রাগ করেন। ষষ্ঠীমাতার বরেই ত ছেলে হয়, এবং তাহার বরে ছেলে বাঁচিয়া থাকে। রংপুরের পল্লী অঞ্চলে "ষাইটোর পূজার" সময় মেয়েরা বলে—

ষাট্ মা মোর ষাটিয়া।
কলা খায় মোর আটিয়া॥
ষাইটোর মায়ের বরে।
ছাওয়া পুল পুল করে॥

জামাইদের তখন জোর বরাত। শাশুড়ীর নিকট হইতে তাহারা কত তত্ত্ব পায়। ষষ্ঠী পূজার অন্তে মেয়েরা একস্থানে সমবেত হইয়া ষষ্ঠীর ব্রত কথা শুনে। কাহার "ছেলে হ'য়ে হ'য়ে মরে যায়, কিংবা ছেলে হয়না, ষষ্ঠির পূজা করে ছেলে হয়, বেচে থাকে" ইত্যাদি কত কথা কান পতিয়া শুনিতে হয়। অন্যমনস্ক হইবার উপায় নাই—অল্পবয়সী সন্তানবতী মহিলাদিগকে বৃদ্ধারা সজাগ করিয়া দেন।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে বেশী ব্রত নাই। তবে কোন সময়েই হাত খালি যাইবার উপায় নাই। মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত প্রায় মাসের মঙ্গলবারে অন্ততঃ একবার করিতে হয়। তারপর সোমবারের ব্রত। স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া মেয়েরা সারাদিন উপবাস করে। সূর্য্যাস্তের সময় অন্নগ্রহণ করিতে হয়। এ ছাড়া মঙ্গলবারের ব্রততেও আছে। মঙ্গলবারের ব্রত করিতে হইলে কম্বলে শুইয়া রাত কাটাইতে হয়। একবার মাত্র এক-ভাতে ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। এই ব্রত করিলে নাকি অপুত্রার পুত্র, নির্ধ-

নের ধন ও অল্পায়ু ব্যক্তির দীর্ঘায়ু হয়। যে নারী এই ব্রত করে, সে পতির ও আত্মীয়গণের প্রিয়-পাত্রী হয়। ভাদ্র মাসের তালনবমী ও জন্মাষ্টমীর ব্রত কথাও একেবারে উপেক্ষার নয়।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন মেয়েরা অঙ্গনের মাঝখানে পুকুর খনন করে। তাহার চারিকোণে ক্ষেত বানাইয়া মটর কলাই প্রভৃতি বপন করে। আর পুকুরের মাঝখানে ধান, মানকচু, কলমীলতা প্রভৃতিও রাখে। পুকুরটি জলে ভরাট করিয়া তাহার মধ্যে একটি জ্যান্ত চ্যাং মাছও ছাড়িয়া দেয়। শেষে পুকুর পূজা করিবার সময় মেয়েরা বলে—

যম পুকুরটি পূজন
সোনার থালে ভোজন।
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু।
শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
কালো কচু ধলো কচু লক্ লক্ করে।
যমের দুয়ারে আগল পড়ে॥

কোথাও আবার বলে—

হেলেঞ্চা কল্মি লক্ লক্ করে।
রাজার ব্যাটা পক্ষী মারে॥
মারে পক্ষী শুকায় বিল।
সোনার কপাট রূপার খিল॥
খিল খসাতে খসাতে হাতে গেল ছত্ত
আমার বাপ রাজা ভাই লক্ষেশ্বর॥

অন্য কোথাও আবার যম বুড়ীর ব্রতকথা শুনতে পাওয়া যায়। বরিশালের দিকে মেয়েরা গদ্য পদ্য মিশাইয়া যম বুড়ীর ব্রতকথা বলে। এখানে সামান্য কিছু উল্লেখ করিলে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে কি না জানি না।

এক বামন আর বামননী
মাঙ্গেন যাচেন খান-দান আছেন
কিছুদিন পরে তেনাদের ছেলে হইছে।
ছেলেডির ষষ্ঠী হ'ল,
অন্নপ্রাশন হ'ল,
পৈতা হ'ল, বিয়া হ'ল॥
বৌ করে যম বুড়ীর ব্রত।
শাশুড়ী কয়, আমারে খাবি, না আমার
পুতিরে খাবি?
বৌ বলে—ঠারণ লো ঠারণ।
তোমারেও খাব না, তোমার পুতিরেও খাব না॥
বাপ মায় যে বেত্য লওয়াইছে,
হেই বেত্য করি॥
শ্বাশুড়ী লাথয়ে ফেলায়ে দিছে
সে কান্দে কাটে।
কিছুদিন যায়।
আবৃশি বাড়ী গেইছে, সেখানে ফেলাইচে।
পড়শী বাড়ী গেইচে, সেখানে ফেলাইচে॥
কিছুদিন পরে শ্বাশুড়ী মরুল।
খালে ঝাপ দেয়, খাল শুকোয়।
বিলে ঝাপ দেয় বিল শুকোয়॥
চিলে আয় ঠোকরাইতে॥
কাউয়ায় আয় ঠোক্‌রাইতে॥
যম রাজা স্বপন ছাহালো।
তুই মা তোর বৌরে কইস্ বেত্য করতে॥
যম বুড়ীর বেত্য করে।
জল পাই জল খাই।
যম পুরীতে ঠাই পাই॥
হে করুল কি।
কপাটির ঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে রইল।
আমি খামু ও না নামু ও না
আমার একটা পিতিজ্ঞা আছে
এ যদি তুমি না শুন॥ ইত্যাদি।

প্রতিজ্ঞার কথা আর শুনিয়া লাভ নাই। আসল ক[illegible] হইল যম বুড়ীর মহিমা প্রকাশ করা। যমের মা বুড়ীর[illegible] লইয়া অনেক গল্প-কথা ছেলেমেয়েদের মনে স্থান পাই[illegible] থাকে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা যখন আধ-আধ বুলি[illegible] বলে, "যমের মা বুড়ী; খায় চারটা মুড়ী" তখন তি[illegible] কোন ভাবের সঞ্চার না হইলেও বেশ শোনায়। ছো[illegible] মেয়েদের মধ্যে "খুড়ী বুড়ী" খেলিতে দেখা যায়।

যাক্ সে সব কথা। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি হই[illegible] অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত মেয়েরা সাঁজ-পূজা[illegible]

ব্রত করে। সাঁজ-পূজানী-ব্রত নাকি ব্রতের সেরা। এ ব্রত না করিলে অন্য ব্রতের ফল লাভ করা যায় না। তাই, পশ্চিমবঙ্গের দিকে মেয়েরা বলে—

সাঁজ-পূজানী অরুন্ধতী,
এ ব্রত করে পার্ব্বতী ;
এ ব্রত কল্লে কি হয়,
সভাসুন্দর পতি পায়,
রাজচন্দ্র পুত্র পায় ;

খুলনা জেলায় "যম পুকুরের" ব্রতকে "কার্ত্তিক পুকুরের" ব্রত বলে। ব্রতের উপকরণ এক-ই রকম; তবে যম বুড়ী ও কাক চিলের মূর্ত্তি গড়িতে হয়—ইহাই বিশেষত্ব। ছড়ার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ছড়ার শেষের দিকে মাত্র বলে—

এক কোণা কা'টে দিলাম মা বাপ্‌রে।
আর কোণা কা'টে দিলাম শ্বশুর শাশুড়ীরে॥ ইত্যাদি॥

একদিকে যেমন "সভাসুন্দর" পতি পাইবার একান্ত ইচ্ছা, অন্য দিকে তেম্‌নি মুর্খের হাতে যেন না পড়িতে হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি। অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যা বেলায় এই ব্রত করিবার সময় খুলনা জেলায় মেয়েরা বলে—

সাঁজ পূজে সাজোতি
ষোল ঘরে ষোল বাতি
লক্ষ্মীর ঘরে ঘেরত বাতি
কেন লক্ষ্মী এত রাতি ?
—বাড়ীর ধারে কুচোই বন।
তাই ভাঙ্গতি এতক্ষণ॥
কুচোই কাচাই পোজন,
সোনার থালে ভোজন।
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু
শাখার আগে সোনার খাড়ু॥

কামনার সময় তাহারা বলে—

ওহে শিব শঙ্কর তুমি আমার নাথ।
কথ্‌নো পড়ি না যেন মুক্ষুর হাত॥
পাকা পান, মুর্ত্তিমান,
মোর স্বামী নারায়ণ॥ ইত্যাদি॥

অগ্রহায়ণ মাসের সকাল বেলায় খুলনা জেলার মেয়েদিগকে "তুরফল ব্রত" করিতে দেখা যায়। এই ব্রতের মধ্যে একঘেয়ে কামনাও যেমন আছে, তেমন রঙ্গ-রসের অভাব নাই।

তুরফল পূজে তুলফলি।
আগোন মাসে বয়োলি॥
সরু ধানে ভোল ভরে।
কালা পুতি কোল ভরে॥
বুড়ো স্বামী দুয়ারে বসে।
নাতি-বৌ খের খেরায়॥
* * *
শঙ্কর জিজ্ঞাসা করেন—
গৌরী, এ বেরত করলি কি হয় ?
খাটে আসে খাটে যায়।
চন্নন কাষ্টে রাঁধে খায়॥
আড়ি মাপা সিঁদুর পায়।
কোদাল কাটা ধন পায়।
যে কত্তি পারে—
সে ছত্রিশ পিরথিবীর রাজরাণী হয়॥ ইত্যাদি

অনুরূপ কামনার কথা আমরা আর একটি ব্রতের মধ্যে পাই। তাহার নাম "তারার" ব্রত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তারার ব্রতের কোট কাটিতে হয়, এবং পিড়ি পাতিয়া বসিয়া ব্রত করিতে হয়। আর তারা গুণিয়া ঘরে উঠিতে হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের দিকে এই ব্রতটি বিশেষভাবে প্রচলিত।

ষোল ষোল তারা তোমায় করি সাক্ষী।
ঘি দিয়ে করি আমরা পঞ্চগ্রাসী।
নেত করি রাত্রিবাস, দিনে করি অভিলাষ।
শঙ্কর জিজ্ঞাসা করেন, গৌরী,
এত ব্রত করলি কি হয়।
সীতার মত সতী হয়।
রামের মত পতি পায়।
আড়ি মাপা ধন পায়।
কোদালে কাটা মাটি পায়॥
এ বেতা যে করে
সে শতোদক পিরথিবীর রাজরাণী হয়॥

(খুল্‌না জেলা হইতে সংগৃহীত)

শীত পড়িতে পড়িতে পার্ব্বনের ধুম বাধিয়া যায়। তখন কের ঘরে ধান উঠিতে থাকে। এ সময় মেয়েরা পিঠা াইয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে সুখী হয়। ম্য গায়েনরা দল বাধিয়া গান গাহিয়া সকলের বাড়ীতে ভিক্ষা রিয়া বেড়ায়। তাহারা পৌষের আনন্দ সংবাদ সকলকে নাইবার জন্য ব্যস্ত। মেয়েরা এসময় করে তসোলা ব্রত। খানি মাটির সরা, গোবরের লাড্ডু, অশ্বত্থ ও বেগুন পাতা ল এই ব্রতের উপকরণ। এই ব্রতের অন্যান্য কথার সঙ্গে ঠের কথা ও আছে।

তস্ তসোলা কাঁধে ছাতি
কেন তসোলা এত রাতি।
তসোলা লো রাই,,
তোমার দৌলতে আমরা
ছুবরী পিঠে খাই।
ছুবরী পিঠে বড় মিঠে
গাঙ সিনানে যাই।
গাঙের বালি গুলি তুলে তুলে খাই॥

বাপমায়ের কুলকে উপলক্ষ্য করে মেয়েরা তখন বলে—

গরুর গোবর সরিষার ফুল।
পূজি মোরা বাপ মায়ের কুল।

পৌষ মাসের শীতল জলকে ও লক্ষ্য করিয়া মেয়েরা অনেক া বলে।

পৌষ মাসের শীতল পানি
শীতল শীতল ডাকে।
রবই উঠ্ছেন রাই উঠ্ছেন
বড় গঙ্গার ঘাটে॥
কার হাতে তেল আম্লা,
দাও গো রাই এর হাতে
রাই উঠ্ছেন রাই উঠ্ছেন
মেঝ গঙ্গার ঘাটে॥ ইত্যাদি।

পৌষ মাসে বন ভোজনের সাড়া পড়িয়া যায়। বাংলার য় সর্ব্বত্রই এসময় মেয়েরা বন-ভোজন করে। বাড়ী বাড়ী ক্ষা করিয়া তাহারা বন ভোজনের আয়োজন করে। :-ভোজন পর্ব্ব সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া ঘরে যাহাকে দেখে, তাহার সহিত আলাপাদি করে। কর্ত্তা থাকিলে ভাল হ... কিন্তু উত্তর দেন সাধারণতঃ ঘরের গিন্নীই।

ঘরে কেন্ আলো
—ভাতার পুতের ভালো।
গিন্নী গেছেন বন ভোজনে
সবাই আছে ভালো॥
দুয়ারে কেন কাঁটা?
ছেলে মেয়ে সব মাথায় ঝুটা॥ ইত্যাদি

মেয়েদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নাই। তাহা... পরকে যেমন করিয়া অতি সহজে আপন করিয়া লইতে পারে পুরুষেরা তেমন ভাবে পারে না। সই পাতান প্রথা অনে... মেয়ে মানিয়া চলে। আগেকার মেয়েরা সইএর নাম ধরি... ডাকিতেন না, সইকে তাহারা "গঙ্গাজল" বলিতেন। পৌ... মাসের সয়লা ব্রতে আমরা এই প্রথার বিশেষ নিদর্শন পাই। পৌষমাসে গ্রামের মধ্যে মেলা বসে তখন মেয়েরা সেখানে মিলি... হয়। পরিচিত অপরিচিতের মধ্যে কোন ভেদ তাহারা ক... না—সকলের সঙ্গে ভাব করিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হ... এমন কি বাগ্দীর মেয়ের সঙ্গে বামুনের মেয়ে সই পাতাইতে পারে—তাহার সহিত একপাতে বসিয়া খাইতেও বাধা... নাই। হুগলী জেলার পল্লী অঞ্চলে এই ব্রত সম্বন্ধে এক... কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

একটি মেয়ে তার বিয়ের আগে আর একটি মেয়ের সা... মনসা তলায় সই পাতায়। সেই মেয়েটি পরে তাহার খু... শাশুড়ী সম্পর্কের হইয়া পড়ে। একদিন উনুনের ভেতর মেয়ে... একটি সাপ দেখে। সাপ দেখিয়া শাশুড়ীকে ডাকিবার তাহ... ইচ্ছা। কিন্তু সে শাশুড়ী সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে পারে না আর ডাকিলে নাকি উনুনের সাপ কামড়াইবে। তখন ... খুড়ী শাশুড়ী সম্পর্কে না ডাকিয়া সই সম্পর্কে ডাকে। ... কোনও রূপ অনিষ্ঠ না করিয়া চলিয়া যায়।

সই এর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্য এই ব্রত ক... সই যে "ভালবাসা" বা "দেখন হাসি"—তাহার সঙ্গে ভাবে... আদান প্রদান চলে, কোন কথা তাহার কাছে গোপন থাকি... নাই।

পৌষের শীত মোষের গায় পর্য্যন্ত লাগিলে ও মেয়েরা পৌ... মাসকে ছাড়িতে চায় না। সেজন্য ছেঁড়া জুতা, ঝাঁটা ইত্যা...

টাঙ্গাইয়া রাখে। এজন্য ছড়ার অভাব নাই—একটা বাঁধিয়া দিলেই হইল।

এস পৌষ যেও না,
জন্ম জন্ম ছেড়ো না॥
ঘাটের পৌষ মাঠের পৌষ
ঘরকে এস॥ ইত্যাদি।

(হুগলি জেলা হইতে সংগৃহীত)

তথাপি পৌষমাসকে আটকাইয়া রাখা যায় না। সেও চলিয়া যায়। তখন কুয়াসায় ভরা মাঘ মাস দেখা যায়। সে মাসে সূর্য্যের মুখ খুব কম দেখা যায়। সেজন্যই বোধ করি মাঘ ব্রত বা সূর্য্য পূজার এত ঘটা। মাঘ-ব্রত অনেকদিনের প্রাচীন। এই ব্রতকে আমরা বেদের কাল হইতে টানিয়া আনিতে পারি। সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক গীত বা পুথি আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সেগুলির সাথে মাঘ ব্রতের তুলনা করিলে সাদৃশ্য বিষয়ে প্রতীতি জন্মে। মাঘব্রতকে মাঘ মণ্ডলের ব্রত বলা হয়। ইহা প্রান্তিক পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সকল স্থান ও দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা যশোহর জেলায় বিস্তারিত ভাবে প্রচলিত হইতে থাকে। আমরা এখানে তাহার বিশদ আলোচনা করিব না। মাঝে মাঝে দুই চারটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া ইহার বৈশিষ্ট দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ব্রত যখন করা হয়, তখন প্রকৃতি কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে। সূর্য্যের কিরণ তেমন ভাবে বিকাশ পায় না। ছোট্ট মেয়েরা ভোরে উঠিয়া সূর্য্যকে জাগাইবার জন্য ছড়া বলিতে থাকে। সূর্য্য যেন উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পরিতেছেন না। শীতের রাত পাইয়া সূর্য্যদেব আর ভোরের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। মেয়েরা যেন সূর্য্যের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তোলে।

উঠ উঠ সূর্য্য ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া
—না উঠিতে পারি আমি নিশির লাগিয়া,
নিশিরের পঞ্চবটি শিয়রে রাখিয়া,
সূর্য্য উঠবেন কোনখান দিয়া?
বামুন বাড়ীর ঘাট খন দিয়া।
বামুনের মেয়েটি বড় স্যায়ান্।
পৈতা যোগান বিয়ান বিয়ান। ইত্যাদি।

ক্রমে মাঘমণ্ডলের ব্রতের আয়োজনের কথা হয়। সূর্য্যের বিবাহ লইয়া উপভোগ্য রঙ্গ করা হয়। সূর্য্য কাহার মেয়ে বিয়ে করেন, যৌতুকাদি বা কি পান তাহার আলোচনা করা হয়। বিয়েতে যৌতুকাদির দাবী করাতে পুরুষের উপর দোষারোপ করা হয়; মেয়েরাও কিন্তু যৌতুকের কম পক্ষপাতী নন। তাহারা কাহার ছেলে বিয়ে করিয়া কি যৌতুক পাইল, তাহা লইয়া আলোচনা করেন, আবার অনেক সময় কৌতুল অনুভব করেন। যাই হউক, সূর্য্য ঠাকুর বিয়ে করিবার জন্য নানা দেশ ঘুরিতে থাকেন। শেষ কালে 'রাইল ঠাকুরের' ঝিকে বিয়ে করে আনেন। ইহার মধ্য হইতে আমরা অনেকটা প্রাচীন ভাষার নির্দ্দেশ পাই।

১। ঢাকা জেলায় প্রচলিত :—

লোকের পৌষ পৌষমাস
আমার পৌষ বার মাস॥

শ্রুতিভেদ

ব্যাওন ঘরে দুটি মেয়ে মেলে দিছে কেশ।
তা' দেখিয়ে সূর্য্যি ঠাকুর বেড়ান দেশ দেশ॥
বাওন ঘরে দুটি মেয়ে শুয়ে আছে খাটে,
তা' দেখে সূর্যি ঠাকুর নাঁও লাগালেন ঘাটে॥
বাওন ঘরে দু'টি মেয়ে মেলে দিলে দিছে শাড়ী।
তা' দেখে সূর্যি ঠাকুর বেড়ান বাড়ী বাড়ী॥
বাওন ঘরে দু'টি মেয়ে মল খাড়ু পায়।
তা' দেখে সূর্য্যি ঠাকুর বিয়ে করতে যায়॥

*

নাড়া বনে কাড়া বাজে, লোকে বলে কি?
সূর্য্যি ঠাকুর বিয়ে করে রইল ঠাকুরের ঝি॥
বিয়ে করলে সূর্য্যি ঠাকুর ব্যাভার পাইল কি।
ব্যাভার পাইলাম আমড়ার আঠি গামছা হারা হ'দি॥

(খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত)

সূর্য্যি ঠাকুর মহা সুখে ঘর-সংসার করিতে থাকেন। মেয়েরা যেন সূর্য্যের বাড়ীর খবর নিতে ব্যস্ত। তাহার পুকুরের মাছই তাহাদের ভাল লাগে। মাছ কুটিতে, কিংবা রাঁধিতে যাইয়া আর এক বিপদ। অন্য কাউকে সেই মাছ কুটিতে বা রাঁধিতে দিতে তাহারা নারাজ—তাহারা নিজেরাই সব কাজ করিবে। তাহারা পরের উপর নির্ভর করিতে চায় না।

সূর্য্যের পুকুরে ফেলাইলাম জাল।
তা'তে উঠল রাঘব বোয়াল॥
ঐযে আসে নেয়নি খালই হাতে কর্‌য়া।
যা যা নেয়নি ধাক্কা ধুক্কি খাইয়া।
নিজে নিমু যেমন তেমন কইর‍্যা॥

*

কুটলাম লো কুটলাম লো রাঁধবা কে?
ঐ যে আসে রাঁধুনী কড়াই হাতে কইর‍্যা।
যা' যা' রাঁধুনী ধাক্কা ধুক্কি খাইয়া।
নিজে রাঁধমু যেমন তেমন কইর‍্যা।
ইত্যাদি।
(ঢাকা জেলায় প্রচলিত)

সর্ব্বশেষে, ফুল দিয়া মাটির পুতুল সাজাইয়া চিত্রিত পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া তাহারা বেশ রঙ্গ ফলাইয়া ছড়া বলিতে থাকে।

আজ সাজরে কুম মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজ কন্যা তুলে দিব বিয়া॥
এপারে ওপারে কি সুর বাদ্য বাজে?
শ্বশুর বাড়ী বধু রাখিয়া শিতের কষ্টে মরে॥

কামনা-প্রসঙ্গে সংসারের সব কিছু সুখ ভোগ করিয়া তাহারা স্বর্গ লাভ করিতে চায়। সেখান হইতে আবার তাহারা মর্ত্ত্যের সুখ ভোগ করিবার আশা করে।

মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল বাপ রাজা ভাই লক্ষেশ্বর।
মা পাটেশ্বরী, আপনি বিদ্যাধরী॥
মাঘ মণ্ডলে ঢেলে ঘি,
আমরা বড় মানুষের ঝি॥
মাঘ মণ্ডলে ঢেলে লাড়ু॥
শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
সূর্য্য পূজব। স্বর্গে উঠব।
স্বর্গে উঠে মাগব বর, ধন ছত্র বড় ঘর।
জামাই আসুক লক্ষেশ্বর॥

এসব ছাড়া আবার মাঘী পূর্ণিমার ব্রত আছে। মাঘি পূর্ণিমার দিন মেয়েরা পাড়ায় ঘুরিয়া গান করিতে থাকে। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহা সূর্য্যাস্তের সময় রাঁধিয়া খায়। বরিশালের পল্লী অঞ্চলে এ সময় মেয়েরা সূর্য্যের গান করে। এ স্থলে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সূর্য্য বিয়ে করিয়া ফিরিতেছেন, গৌরী তাঁহার সঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে শ্বশুর সব কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছেন। বাপের বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে।

* ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চল্‌কে ওঠে পাণি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি মায়ের কাদন শুনিরে॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চল্‌কে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি আমি ভাইরে কাদন শুনি॥

* * *

তোমরা দ্যাশে যামুরে সূর্য্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু॥
তোমরা দ্যাশে যামুরে সূর্য্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি শাখারি বসামু॥
তোমরা দ্যাশে যামুরে সূর্য্যাই মা বলিব কারে।
আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে॥

ইহার ভাব গ্রহণ করিলে তখনকার বাল্যবিবাহ অনুমান করা চলে। সেজন্য ছোট মেয়ে গৌরীর বাপের ছাড়িয়া যাইতে এত কান্না কাটি এবং ওজর আপত্তি। রুচি বদলাইয়া গিয়াছে, আর কান্নাকাটির দরকার করে না।

মাঘ মাসের শেষের দিকে বসন্তের মৃদুল হাওয়া থাকে। তখন প্রকৃতিরাণী নব সাজে সজ্জিতা হন্। রাজের আগমনে কোকিল ডাকিতে থাকে। ফাগুন গুণ ফাগুনের ব্রত করিতে শুনি। তারপর, চৈত্রমাসের হইতে মেয়েরা করে "ভাটির পূজা"। ভাটি ফুল ফুলের নামান্তর মাত্র। রোগ শোক তাড়াইবার জন্যই আয়োজন। বর্ষীয়সী মহিলারা এ সময় করেন ঘণ্টাকর্ণ ভাটির পূজা ছোট্ট মেয়েরা বিশেষতঃ করিয়া থাকে। খুব ভোরে উঠিয়া ফুলের ডালা হাতে লইয়া বাগানের একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বনজাত ফুলগুলি থাকে। আর সমবেত সুরে গলা ছাড়িয়া গান থাকে।

এছলাই মাগীর ভেছরাই চুল।
তাই দে' পূজি মোরা ভাটির ফুল॥
ভাটি তুমি ডাল নেও।
কুলো সোয়ার জাগা দেও॥

ভাটি ফুলের গাছে এককালে খুব ফুল ধরে। গাছের ডাল গুলি ফুল ভারে নুইয়া পড়ে। দুষ্ট ছেলেরা বোধ করি গাছের ডাল ধরিয়া উপরে উঠিতে থাকে। মেয়েরা সাধারণতঃ কোমল প্রকৃতির। তাই, তাহারা ছেলেদিগকে গাছে উঠিতে যেন নিষেধ করে।

ও মামা ও মামা ডাল ভাঙ্গনা।
ডালে উঠে যাবে।
ছোট ঠাকুর চাইছে ফুল,
সাজি ভরে দেব।
ছোট ঠাকুর চাইছে ফুল।
কুলো ভরে দেব॥ ইত্যাদি*

ঘণ্টাকর্ণ পূজা ঘেণ্টু পূজা নামে পরিচিত।
তারপর যে যার বট, সাজি লইয়া বাড়ীর দিকে যাইতে থাকে। তখনো গান চলিতে থাকে। এই গানটি আধুনিক কালের বলিয়া ভ্রম হইবে; কিন্তু তাহা নহে। গ্রাম্য কবিরা কম ভাবুক ছিলেন না, ভাষার লালিত্যের দিকেও তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

বেলা দুইফরের কালে
বাঁশী বাজে রাই বলে॥

ও বাঁশী কি গুণ জানে,
মম প্রাণ ধরে টানে॥
প্রাণ খুলে সই শুন্‌তে পাইলে
আমি তখন পাকশালে॥
ঘরে ননদীর জ্বালা,
ও তা' জানে না কালা
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী,
বসে কদমতলা।
নন্দের বেটা কালো ছোঁড়া
কি দেখে তার মন ভোলে॥

(খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত)

কালার বাঁশীর স্বর শুনিয়া রাধিকা উন্মনা হইয়া পড়িয়াছেন, গানের মধ্যে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনের "বিরহ খণ্ডের" একটি পদের সহিত ইহার তুলনা করি না কেন?

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দিরই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মোর মন।
বাঁশীর শবদে মোর আউলালো রাঁধুন॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কেনে জনা।
দাসী হআ তার পায়ে মিশিবো আপনা॥
ইত্যাদি।

* বঙ্গ ভাষা পরিচয় ৺দীনেশ চন্দ্র সেন সঙ্কলিত

ঐ চন্দ্রেরি মত

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ধনু-বক্র রাঙা চন্দ্র শেষ রাত্রি কোলে
অন্ধকার মাঝে নত দিগন্তের পানে
রহস্যের স্নিগ্ধ ছবি—বেণু আড়ে দোলে
বাতায়ন দিয়ে আঁখি মোর, সেথা টানে।
সেও অতীতের কথা, দীর্ঘিকার পারে
নয়নে আমার পড়ে—আঁখি দুটি তার—
কক্ষে কুম্ভ, পূর্ণ দেহ—লাবণ্য-সম্ভারে—
যেতে ছিল ফিরে ঘরে শুধু—এক বার—
সলজ্জ ইঙ্গিতে
চাহি মোর পানে গেল,—গেল চলি দূরে,
রেখে রেশ তার মৃদু কঙ্কণ-সঙ্গীতে,
অপরাহ্ন শেষে এল সন্ধ্যা-শান্ত সুরে।
মনে পড়ে তার রাঙা গণ্ড, আঁখি নত,
নির্জ্জন আঁধারে আসা চন্দ্রেরি মত।

রাক্ষসী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

(ছোট গল্প)

অলকা যে বৎসর বিধবা হয় সেই বৎসর হইতেই জয়া দেবী একরূপ শয্যা গ্রহণ করেন। বড় মেয়েটিকে বেশ ভাল ঘরে ভাল বরে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য বিবাহ দিয়াছিলেন। জামাইটির সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্যও বলিষ্ঠ ছিল। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধে বসরা মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছিল এবং মোটা টাকা রোজগার করিত। কিন্তু চাকরির কঠোর পরিশ্রম তাহার স্বাস্থ্যে সহিল না। সে সেখান হইতে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া আসিয়া কিছু কাল ভুগিয়া অবশেষে মেডিকেল কলেজে মারা গেল। সে আজ—কয়েক বৎসর আগের কথা।

জয়া দেবী আজকাল জামাতার শোক অনেকখানি পাসরিতে পারিয়াছেন। সময়ে সবই সহিয়া যায়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, সুতরাং ধারণাও তাঁহার হিন্দুসংস্কারাপন্ন ছিল। হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের জন্য তাঁহার প্রায়ই ঝগড়া হইত। তিনি বলিতেন—"আমারই মেয়েটাই ছিল অপয়া, নতুবা অমন জামাইটাকে খেয়ে ফেলল!"

হৃষীকেশ জবাব দিতেন—"তোমার যত উদ্ভট কথা, যার কপালে যা লেখা, কপাল ভাল-মন্দে অন্যের কি হবে? অলকার বরাতে জামাই মরেছে, অসম্ভব কথা।"

পুত্র গুণেন্দ্র পিতার কথায় সায় দিত বলিয়া সে মাতার নিকট শক্ত তাড়া খাইত। "তুই ছেলেমানুষ, তুই বুঝিস কি? এসব কথায় বোলিস নে।"

গুণেন্দ্র আর কোনও কথা বলিত না। সে পিতাকে ভালবাসিত, মাতাকে ভয় করিত। এইরূপে এই ছোট্ট সংসারটি বেশ চলিত।

ইদানীং জয়া দেবী বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। তাই হৃষীকেশের একান্ত ইচ্ছা, গুণেন্দ্রের বিবাহ দিয়া এমন একটি বউ ঘরে আনিবেন, যে সংসারে আসিয়াই সংসারটি মাথায় করিয়া লইতে পারে, স্ত্রীর আর কোনও কাজ করিতে না হয়।

গুণেন্দ্র সরল স্বভাবাপন্ন ছিল। সে পিতামাতার মনোভাব বুঝিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল।

বিবাহ করিবার বিষয় সে যে মত পোষণ করিত সেরূপ বোধ হয় আজকালকার তরুণেরা এমন কি পূর্বের যুগের যুবকেরাও সেরূপ করিত না। আমি তাহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি—"দূর, ভাল লাগে না। ছেলেবেলা থেকে একা থাকতে শিখেছি, দূর! মেয়েদের সঙ্গে কথা কইব কি? তাতে মেয়েদের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে। দূর! আমার লজ্জা করে।"

এই বলিয়া গুণেন্দ্র পাগলের মত হাসিত। আমাদের অনেকে তাহার কথাগুলি শুনিয়া না হাসিয়া পারিত না, আর না ভাবিয়া পারিত না—ও কি একটা বোকা?

কিন্তু গুণেন্দ্রের এই উক্তিগুলির ভিতর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাইত, কথাগুলি বড়ই সরল, অকপট প্রাণের ভাষা। সে বর্তমান কালের বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্তদের মত "উঃ! কি দিনকাল, বিয়ে করে খাওয়াবো কি, নিজেই খেতে পাই না? বুড়ো মা পেরে উঠেন না; তাঁর সাহায্যকারিণী দরকার বটে। কিন্তু তাই বলে একটা কুৎসিত পেত্নী বিয়ে কর্তে পারি না" ইত্যাদি, ইত্যাদি বলিত না।

সেদিন বেলা দশটার সময় হৃষীকেশ ভট্টাচার্য একটা ছাতা হাতে, একজোড়া ঠনঠনে চটি পায়ে, চাদর একটু

এক কাঁধের উপর বাসায় প্রবেশ করিয়া ঘরে গুণুকে দেখিয়া বলিলেন—

"গুণু! তবে ভদ্র লোকদের কথা দিই?"

গুণু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে দাওয়া বাহিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—

"কি বাবা! কাদের? কি কথা? ওঃ, কাল রাতে যা বলে ছিলেন—মেয়েটি লক্ষ্মী? তা দেন বাবা! কিন্তু বাবা! বলুন, সে লক্ষ্মী আপনার কাছে থাকবে, আপনার সেবা কর্বে—পরে সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—

বাবা! আমাকে তো বিয়ে কর্তে হবে? সে কি করে হবে? না বাবা! আমার লজ্জা কর্বে।"

জয়া দেবী তখন গৃহমধ্যে ধ্যানরতা ছিলেন, ফস করিয়া হাঁক ছাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন,

আবার গুণু! এক কথা? ভদ্রলোকেরা কত দিন হাঁটাহাটি কর্‌ছেন, একটু তাতে লজ্জা হচ্ছে না? এমন কার্তিক! বিয়ে কর্তে লজ্জা! বোকা কোথাকার! ওঁর কাছে এ সব কথা বল্‌ছিস্ তাতে লজ্জা কর্‌ছে না? ফের, ঐ কথা বলিস্ তো মজা দেখাব।"

মাতার তর্জ্জন শুনিয়া গুণধর পুত্র চুপ মারিল কিন্তু কর্তা গিন্নীকে বলিলেন—

"তুমি চুপ করে যা কচ্ছ কর। মুখে বিড় বিড় কচ্ছো ধ্যান হচ্ছে। গুণু! আমার খড়ুম জোড়া দে, গামছাখানা দে।"

যাক! অচিরে গুণুর বিবাহ হইয়া গেল। সে অত্যদ্ভুত পরিণয় ব্যাপারের আর বিস্তৃত আলোচনা এখানে দিব না। বড়ই মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেদিন যেদিন গুণেন্দ্র কিছুতেই রাজী হইতেছিল না বিবাহের সময়ের কনের সংস্পর্শ তাহার গায়ে লাগাইতে কিন্তু উপায় ছিল না, বিবাহকালীন মন্ত্র পাঠের সময় হাতে হাত না লাগাইয়া।

বিধি দুর্লঙ্ঘ্য। যাহা করিবে না বলিয়া সে স্থির করিয়াছিল, তাহা সে করিল, তবে ইহা লক্ষ্যনীয়, সে বিবাহ করিয়াছে যাহাতে মা-বাবা ক্ষুণ্ণ না হন। লক্ষ্মীকে বিবাহ করিবার পর হইতে গুণেন্দ্র সর্বদাই একটা কথা মনে ভাবিত, "লক্ষ্মী" লক্ষ্মীই হইয়া থাকে।"

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য দরিদ্র হইলেও একেবারে অন্নহীন ছিলেন না। তিনি উঞ্ছবৃত্তি করিয়া বেশ দু'পয়সা জমাইয়া ছিলেন। গুণেন্দ্রকেও তিনি তাঁহার ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিয়া ঐ কার্যে শিক্ষা দিতেছিলেন। পুত্র কবিরাজীও পড়িতেছিল এবং তাহা প্রায় শেষ করিয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

গুণেন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পরে ভাবিয়াছিল বাংলা দেশের যখন এই অবস্থা তখন আই, এ, বি, এর পড়ার খাটুনিতে যাওয়া নিরর্থক, কারণ ঐ সমস্ত পাশ করিলেও চাকরি মিলিবেই না সুতরাং সে স্থির করিয়াছিল কবিরাজী করিবে ও বাপের যজমান কয়েক ঘর রক্ষা করিবে। তাহা হইলেই তাহার একরূপ ভবিষ্যৎ জীবন কাটিয়া যাইবে।

সেদিন বসন্তের প্রারম্ভ। বসন্তকাল আরম্ভ হইলেও ফাল্গুনের প্রথমেই যেন কলিকাতায় আগুনের হল্কা উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হৃষিকেশ মনে করিলেন, লেপগুলি আর কেন নীচে পাড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হয়, ওগুলি বস্তায় পুরিয়া রাখা দরকার তাহা হইলে খাটগুলিও পাতলা হইবে। তিনি সেজন্য গুণুকে ডাকিলেন, যে যে লেপগুলি বস্তায় পুরিতে হইবে দুই বাপ বেটায় অনেক পরিশ্রম করিয়া লেপ খোরার কাজ শেষ করিলেন। এই সময় পরিশ্রান্ত গুণেন্দ্র একটি কাসি দিল। ঝলক করিয়া কতকটা রক্ত তাহার কাসির সঙ্গে উঠিয়া মুখ ভরিয়া গেল; সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া মুখের থুতু ফেলিতে গিয়া রক্ত দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।

বাবা "ও কিছু নয়" বলিলেন; কিন্তু পুত্র দুই চারি বারই ঐরূপ রক্ত উদ্গীরণ করিল। শেষে তাড়াতাড়ি জলের কুলকুচা করিলে রক্ত তখনকার মত বন্ধ হইল। সেদিন আর বিশেষ রক্ত উঠিল না। বৈকালের দিকে গুণেন্দ্রের ঈষৎ জ্বর হইল এবং ঐ অবস্থায় দিন কতক কাটিল।

জয়া দেবী চিন্তিতা হইলেন। তিনি পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে মনস্থ করিলেন, লক্ষ্মীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। পুত্র পুত্রবধুর মাত্র মাস খানেক পূর্বে অর্থাৎ মাঘ মাসের ২রা বিবাহ হইয়াছে। গুণু দ্বিরাগমন সারিয়া বাড়ী পৌছিয়াছে মাত্র।

পিত্রালয়ে যাইবার পূর্বরাত্রিতে লক্ষ্মীর একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে সে একবার স্বামীর সঙ্গে একটি রাত্রি বাস করিয়া যাইবে। এ যাবৎ এক রাত্রিও স্বামী সহ বাস করিতে পারে নাই। যে কাজের জন্য তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে আসিয়া সে তাহাই করিতেছে। তাহাতে সে অসন্তুষ্ট ছিল না, যদিও তাহার বয়স যথোচিত না হইয়াছিল তাহা নহে।

লক্ষ্মী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে স্বামীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন দাঁড়াইল, তাহাতে জয়ার প্রতি-বেশিনী বর্গ বড়ই তাঁহাকে উৎপাত করিতে লাগিল।

"কেন বৃথা বউটাকে আটকে রেখেছ?" অর্থাৎ গুণ যখন বাঁচিবেই না তখন তাহার বউকে দূরে রাখিলে গুনুর বৌটারও দুঃখ থাকিয়া যাইবে, স্বামীর মুখখানা একবার সে দেখে নাই। চিনুক। বৌটার কপালেই ত সব হইল।"

যদিও এই সমস্ত গুণেন্দ্রের অসাক্ষাতেই হইত, তথাপি সে যেন দেওয়ালের ভিরে দিয়া শুনিতে পাইত তাহার আয়ুহীনতা পত্নীর অদৃষ্ট বশেই ঘটিয়াছে বলিয়া সকলে বলিতেছে। সে উহার প্রমাণ চাক্ষুষ দেখিত কারণ মাতা ত সর্ব্বদাই অগ্নিসমা হইয়া থাকিতেন, কোনও কিছুতেই জ্বলিয়া উঠিতেন আর দীর্ঘ নিংশ্বাস ফেলিতেন, এবং কটমট করিয়া স্বামীকে ইঙ্গিতে জানাইতেন।

"তাঁহার দোষেই, এই সব ঘটিয়াছে। কেন তিনি গুনুর বিয়ের আগে গণটা দেখেন নাই, নিশ্চয় উহার রাক্ষসগণ, ও মাগী রাক্ষসী।

আজ কত দিন যাবৎ কলিকাতায় বৃষ্টি হইতেছে। আকাশের মেঘের দৌরাত্ম্যে সূর্য্যদেব উঁকিটিও মারিতে পারিতেছেন না। সহরে সর্বদা জল জমিয়া রাস্তার লোক চলাচলের ন্যূনতা করিয়া ফেলিয়াছে। এ বাসায়ও তেমনি আগেকার মত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, পরিচিত অপরিচিতের আসা যাওয়া নাই।

গুণেন্দ্রের অবস্থা খুব খারাপ। যদিও সে বাবা তারকনাথের চরণে মন প্রাণ সঁপিয়া অন্য সমস্ত সাংসারিক কায়িক চেষ্টা হইতে কতদিন যাবৎ নিবৃত্ত হইয়া আছে বাবা তারকনাথ তবু তাহার যক্ষার অন্তিম অসাধ্য লক্ষণ গুলি পূর্ণভাবে প্রকটিত করিতেছেন। তাহার মা বাপ দোহাই বাবা তারকনাথ! দোহাই বাবা! রক্ষা কর, প মুছে ফেলে যাও অহর্নিশ বলিতেছেন। তাঁহারা আজকাল গুণেন্দ্রের নিকট পথ্যের সময় ভিন্ন বিশেষ যান না।

এই কয়দিন লক্ষ্মীই সর্বক্ষণ তাহার কাছে থাকিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে।

গভীর নিশীথ। নগরী কোলাহলবিহীনা। কৃষ্ণা চতুর্দশী। মেঘের অন্ধকার ও তিথির অন্ধকার একত্র জমাট বাঁধিয়াই কলিকাতার একটা গলিস্থিত ত্রিতল অপেক্ষাকৃত অন্ধকার বাড়ীর ছাতে একটি প্রকোষ্ঠে এই দুইটি প্রাণী প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া শুইয়া আছে। গভীর নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ বাহিরের ছাদে এক ঝাপ্টা বৃষ্টি ও একটা বাতাস আসিয়া দক্ষিণের দিকের বারাণ্ডা পার হইয়া দরজায় ধাক্কা মারিয়া ঘরের দেওয়ালগিরির আলো নিবাইয়া দিল গুণেন্দ্রের সহসা শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নহসা চমকিত হইয়া ঘুম ভাঙ্গিতেই সে অভ্যাস মত একটি কাসি দিল, আর একটি কাসি, আর একটি কিন্তু শেষে সে আর কাসি সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া কি বলিতে চেষ্টা করিল। লক্ষ্মীর বুকের সঙ্গেই তাহার মুখখানি ছিল এবং এইরূপ ভাবে মাত্র তিনটি দিন লক্ষ্মী এই বিবাহিত জীবন কাটাইতেছে হঠাৎ তাহার বুক খালি হওয়ায় সে ধর ধর করিয়া উঠিয়া দেখিল ঘরে সেই মিট মিট জ্বলা আলোটি নিবিয়া গিয়াছে। স্বামীর কাসিতে যেন প্রচুর রক্ত উঠিতেছে সে উহা অনুভব করিল বাহিরের অন্ধকারের যে আজো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার সম্মুখে।

লক্ষ্মী কি করিবে বুঝিতে পারিল না। সে তাহার স্বামীকে মাথা উঁচু করিয়া ধরিবে, না আলো জ্বালিবে, না বলিবে বাবা তারকনাথ! এ রাক্ষসীর প্রাণটা বাহির হইয়া যায়।"

সে চীৎকার করিয়া উঠিল। অবিলম্বে দোতলা হইতে শ্বশুর শাশুড়ী দুপ দাপ করিয়া হ্যারিকেন হস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারাও বিহ্বল ভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

গুনেন্দ্র তাহার মাতাকে বলিল

"মা আমার রাক্ষসগণ ; লক্ষ্মীর নরগণ না হইয়া দেবগণ হইলে ভাল হইত। দেবীকে তাহার কপালের দোষে জীবনে ছুঁই নাই মা! লক্ষ্মী রাক্ষসী নয়।

অস্ফুটস্বরে এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে গুনেন্দ্র কথার ওপারে চলিয়া গেল। লক্ষ্মী কিন্তু চিরকাল রাক্ষসী থাকিয়া গেল।

টিট্টিভ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিশার আকাশে তব আগমনী
উচ্চ তোমার কণ্ঠ হ'তে,
সুপ্ত পল্লীবাসীরে [illegible]
[illegible] ভীত ব্যাকুল স্বরে
জনহীন দূর মাঠের দীঘির [illegible]
[illegible] তোমাকে ডাকে;
[illegible] আঘাত হানা
[illegible] ভীতি লুকায়ে রাখে
শতাব্দী কত [illegible] চলিয়া
[illegible] নিখিয়েছে [illegible]
'ভরতী পক্ষী' [illegible]
[illegible] নির্ধারিত [illegible]
তোমার [illegible] প্রাণী
[illegible] সঞ্চারিত [illegible]
তোমার [illegible]
করিতে [illegible]

জলচর ? কণ্ঠে তোমার
"[illegible] যেন,
[illegible] বলের [illegible]
[illegible]
"[illegible] হ'তে এ কাহার উক্তি
[illegible] আকুল [illegible]
[illegible] প্রেমের অর্ঘ্য দাবী—
[illegible] ডাকিছে [illegible]
[illegible]
[illegible] প্রাণ [illegible]
সুদূর [illegible]
দূরে [illegible]

ক্ষুদ্র-ভীতির আবেগে বিভোর
কাহারে ডাকিছ বলিছ কি ?
উদাস-করা ও শব্দধারার
গভীর অর্থ বুঝ না নিজে।

অভিভাষণ

শ্রীসুহাসিনী বিশ্বাস

আধুনিক যুগ যন্ত্রসভ্যতার যুগ। সভ্যমানুষ আমরা সম্মিলিত হয়ে যন্ত্রের মতই অভিভাষণ পাঠ করি, শ্রবণ করি এবং আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। মানুষের মধ্যে যে ভাবগঙ্গার পুণ্য স্রোত বইচে, সেই স্রোতই আমাদিগকে চালিত করে কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সংঘাত সেই স্রোতকে ব্যাহত করে প্রায়শঃ, তাই যন্ত্র আমাদের পরক্ষণেই ক্রীয়াশীল থাকে না।

আজকার এই মহিলাসম্মিলনে আমাকে যে সম্মানের আসন আপনারা দিয়েছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি, এবং জানাচ্ছি যে আপনাদের এই পুণ্যপীঠে আমার স্থান মাটির মূর্ত্তির চাইতে বড় বলে আমি মনে করি না। নারীমঙ্গলের জন্য আপনাদের সাধনা আপনাদের অন্তরের উপাসনা দ্বারাই সাধিত হবে, সার্থক হবে, সিদ্ধ হবে।

এই বাঙলা দেশে কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে দুশ বছর পরে বাঙলার নারীগণ এমনি ভাবে সম্মিলিত হয়ে এক প্রাণে এক লক্ষ্যে আত্মোন্নতি তথা জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হবে। তখন অন্তঃপুরচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা নারীর একমাত্র মিলন-স্থান ছিল খিড়কীর পুকুরঘাট, আলোচনার বিষয় ছিল পরনিন্দা, পরকুৎসা। অবশ্য ভাল যে কিছু ছিল না, তা বলছি না। সে-দিনের নারীর যত গুণ ছিল, আজকার নারীরও সেগুলি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সে-দিন ছিল নারী কুণ্ঠিতা, গুণ্ঠিতা—আপনার দাবী জানাবার ভাষা সে পায়নি, আপনার মর্য্যাদা সে বোঝেনি, আপনাকে বিস্মৃত হয়ে ছিল।

তারপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম নিলেন রাজা রামমোহন রায়—বর্ত্তমান বঙ্গ নারীর মুক্তিদাতা। এই মহাপুরুষের সংস্কার সাধনায় সমাজের বহুযুগ সংঞ্চিত জড়ত্ব কেটে গিয়ে এল যে নবীনালোক, আজ তারই প্রভাবে আমরা নিজেদের স্বরূপ চিনতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, আমাদেরও করবার মত কাজ আছে, ভাববার মত বিষয় আছে, বলবার মত কথা আছে।

তাই আজ আমরা এখানে একত্রে সম্মিলিত হয়েছি এবং মিলিত হয়েছি এমন একটি স্থানে যেখানে পুণ্যবতী স্বাধ্বী সরোজনলিনীর নাম সগৌরবে বিঘোষিত। সেই মহাপ্রাণা নারী বঙ্গনারীর দুর্গতির কথা মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন,—আর আপনার সব শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন নারীর কল্যাণের জন্য।

আজ সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্র নারী তার [illegible] শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। গৃহ কোণ বদ্ধ জীবনের মাধুর্যের মধ্যেও সে বাহিরাকাশের শুভ্রালোক নিয়ে এসেছে, জগতের সভ্যতাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যা সে করেছে বা করছে তার মধ্যে ও বহু অকল্যাণকর বি[illegible] আসছে না তা' বলা যায় না। সনাতন ভারতের সনাতনী প্রথার গোড়া ভক্ত নাই হলেম, সেই সব জাতীয় প্রথাকে পরিমার্জিত করে নব পরিকল্পনায় শ্রীমণ্ডিত করে কি আমরা গ্রহণ করতে পারিনে!

গৃহ কোণবদ্ধা নারী যেমন আজকার দিনে আদর্শ নারী হতে পারেন না, তেমনি ক্লাব সিনেমা রেষ্টুরেন্ট গামিনী অত্যাধুনিকারাও ভারতীয় নারীর আদর্শ হতে পারেন না। ভারতীয় নারীর আদর্শ কি তা ভারত নারীর রক্তের মধ্যেই, তার বংশগরিমার মধ্যেই লেখা রয়েছে। কিন্তু এতৎসত্বেও মনে হয় যেন আমরা যান্ত্রিকভাবানুপ্রাণিত হচ্ছি, পরানুকরণশীলা হচ্ছি, পথভ্রষ্টা হচ্ছি।

এর জন্য কে দায়ী সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই স্রোতের প্রতিরোধ করা আবশ্যক হয়েছে। আজ নারীকে আবার স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে; তার সহস্রবর্ষ-সঞ্চিত ঐতিহ্য হারালে ভবিষ্যৎ বংশাবলী তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। আজ একথা ভাল করে ভেবে দেখবার দিন এসেছে। শিক্ষায়, শিল্পে, স্বাস্থ্যে এবং সৌন্দর্য্য চর্চায় আমরা যতই উন্নত হই না কেন, সে উন্নতির মুলে যদি আমাদের জাতীয়তার গৌরব না থাকে তা হলে গৌরব আমাদের কিছুই বাড়বে না।

এই সমস্ত কথা ভেবে অন্তরকে যান্ত্রিক স্বভাব মুক্ত করে মানুষের প্রেরণা আর কর্ম্মশক্তি নিয়ে আজ আমাদের অগ্রসর হতে হবে,—ঈশ্বর আমাদের যাত্রাপথ নির্দ্দেশ করুন।

জ্ঞানের মোহ

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

—বাবা আমাকে ডাকছেন?

কন্যার দিকে চাহিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—বিশ্বনাথ রাধাগোবিন্দের জন্যে কি এনেছে—

সাজি সমেত ফুল ঠাকুর ঘরের একপাশে রাখিয়া উষা বিশ্বনাথ মোদকের কাছে গেল।

—এই বাতাসা কখান্ ঠাকুরের পূজোয় দিও, মা—বলিয়া বিশ্বনাথ বাতাসার ঠোঙাটি উষার হাতে দিল।

পিতার কাছে একখানি রেকাবীতে বাতাসাগুলি রাখিয়া উষা চন্দন ঘসিতে বসিল।

জনার্দ্দন বলিলেন—বিশ্বনাথ চ'লে গেল নাকি?

—হ্যাঁ।

—তোমার ফুল তোলা সারা হ'য়েছে?

—হুঁ, শুধু মালা গাঁথলেই হয়।

—তবে দাও—আমি চন্দন ঘসে নিই, তুমি মালা গাঁথ।

—আপনি জপ করুন, আমার মালা গাঁথতে দেরী হবে না।

আর কিছু না বলিয়া জনার্দ্দন জপ করিতে লাগিলেন।

চন্দন ঘসা শেষ করিয়া উষা মালা গাঁথিতে লাগিল। দুগাছি মালা গাঁথিয়া ফুলগুলি এবং মালা পুষ্পপাত্রে সাজাইয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জপ সারিয়া জনার্দ্দন কন্যার দিকে স্নেহ-মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এই তাঁর সংসারের একমাত্র বন্ধন! উষার একরাশ কালো চুল হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল, চুলের আগায় একটি ছোট্ট ফুল। পরণে একখানি ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের রেশমের শাড়ী·········তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

উষা বলিল—আমি নৈবেদ্য আন্‌তে যাচ্ছি, বাবা—উষা চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন নিজের মনে বলিলেন—উষা আমার তার মায়ের মতই সুন্দরী হ'য়েছে। উষাকে নিয়েই এই সংসারের মায়ায় জড়িয়ে আছি! ওর বিয়ে হ'লে রাধাগোবিন্দের সেবায় নিজেকে একবারে ডুবিয়ে দিতে পারি। উষার বিয়ের শীগগীর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। জনার্দ্দন গীতার শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন।

ক্ষীণস্বরে একজন ভিক্ষুক বলিল—বাবা গো! বড় খিদে, কিছু খেতে দ্যান্—

বিরক্তি চক্ষে জনার্দ্দন তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

যুক্ত করে ভিক্ষুকটি বলিল,—দুদিন হতে কিছু খেতে পাইনি·········দয়া করুন্·········আমি বড় গরীব।

পূজোর সময় ইহার আগমনে জনার্দ্দন মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রুক্ষ স্বরে বলিলেন—গরীব হ'য়ে কেতাত্ত করেছ আর কি! খেতে দাও বল্‌লেই, সকাল বেলা খাবার নিয়ে ব'সে আছি কি না!

—এজ্ঞে কি করি বলুন, দুঃখীদের আপনারা ছাড়া আর কে আছে!

—মজুরী করতে পারিস নে?

—বন্যের জলে আমাদের গেঁয়ের সব যে ভেসে গেইছে ······কাজ পাবো কোথা!

—তোরা কি জাত?

—এজ্ঞে, মুচি।

জনার্দ্দন আসন ছাড়িয়া, তার সাম্‌নে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—মুচি!

—এজ্ঞে।

—মুচি হ'য়ে তুই ঠাকুর মন্দিরে এসেছিস্? ক্রোধে জনার্দ্দনের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল।

—রাগ করবেন্ না, বাবা···আমি এ গেরেমের নই··· বড্ডো দুঃখে পড়েই এইচি; আমারে ক্ষ্যামা করবেন।

—ক্ষ্যামা করবেন! বড় সোজা কথা নয়! নীচ জাত হ'য়ে ঠাকুর বাড়ী ঢুকিছিস্…তোকে ক্ষমা করব!

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ভিখারীটি বলিল—রাগ করবেন না, বাবা—দুটি খেতে পাব বোলেই. ঠাকুর মন্দির দেখেই এসেছিনু—

—বেশ করেছিলে! এটা কাশীর অন্নসত্র কি না! জমীদার বাড়ী যেতে পার নি?

—এজ্ঞে, এই রাস্তায় এয়েলাম—সেখান ত চিনি না।

—না চেন, কাউকে জিজ্ঞেস্ করগে—এখান থেকে যা—

—দশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এইচি, বাবা—আর চল্‌তে পারচি নি; খেতে না দিন্ একটুক্ বসি,—বলিয়া ভিখারীটি সেইখানে বসিয়া পড়িল।

—না—না—এখানে বসা, টসা, চলবে না—এ ধরমশালা নয়—বেরো এখান থেকে।

রাধা-গোবিন্দের ভোগের জন্য, ফল ও মিষ্টান্ন সমেত থালাখানি হাতে লইয়া উষা পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিখারীটি উষার হাতের থালার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আমি আজ দুদিন কিছু খাইনি! তোমার ঐ থালা হতে আমারে কিছু খাতে দাও নি মা!

তার কথায় জনার্দ্দনের ক্রোধের সীমা ছাড়াইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ওরে হতভাগা! দেবতার জিনিষে তোর লোভ! এখনও বেরো এখান থেকে—

ভিখারীটি তাঁর কথায় কিন্তু নড়িল না। সে উষার মুখের দিকে করুণ চোখে চাহিল।

থালা হইতে ফল লইয়া উষা ভিখারীটির হাতে দিল। বুভুক্ষের ন্যায় খাবারগুলি সে খাইতে লাগিল।

কন্যার কীর্ত্তি দেখিয়া জনার্দ্দন বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর গলায় ডাকিলেন—উষা!

—পিতার দিকে উষা চাহিল।

—নারায়ণের পূজোর ফল, তুমি একটা অস্পৃশ্যকে খাওয়ালে! তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গিইছি!

—অন্যায় ত কিছু করি নি, বাবা—

—অন্যায় কর নি! ঠাকুর পূজোর জিনিষ কি না খাওয়ালে একটা নীচ জাতকে! এর চেয়ে অন্যায় আর কী হ'তে পারে।

শান্ত পলাশ চক্ষু দুটি পিতার মুখের উপর স্থির রাখিয়া উষা বলিল—রাগ করবেন না, বাবা, এতে অন্যায় কিছুই হয় নি, বরং হ'ত, যদি এ অভুক্ত ফিরে যেত। মন্দিরের নারায়ণের ভোগের জিনিষ, দরিদ্র নারায়ণের সেবায় দিয়েছি—এতে তিনি খুসীই হবেন।

(২)

মুখের নলটি গড়গড়ার গায়ে ফেলিয়া দিয়া একটা হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া, জমিদার রাধানাথ ঘোষাল পুত্রবধূ আশা দেবীকে বলিলেন—এবার পড়া বন্ধ রা'খ মা—দে'খ দেখি অরুণকে আন্‌তে ষ্টেশনে গাড়ী গেল কি না?

শ্বশুরের কথায় চৈতন্য-ভাগবতখানি বন্ধ করিয়া আশা দেবী বলিলেন—নরেন ত অনেকক্ষণ মোটর নিয়ে গিয়েছে।

—তবে এত দেরী হচ্ছে কেন? ঘড়িটা দে'খতো, কটা বাজ'ল?

আশা দেবী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—চারটে বেজে পাঁচ মিনিট।

—চারটে বেজে গেছে! বড্ডো ভাবিয়ে তুল্লে দেখছি।

—আপনি অতো ব্যস্ত হবেন না, এখুনি আস্‌বে। বৃদ্ধ দেওয়ান দরজার বাহির হইতে বলিল।

—না বাপু! তুমি অন্য লোক পাঠাও না? সে কখন ফিরবে তার ঠিক কি!

—দেরী খুব বেশী হয়নি—

—কি জানি, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে; মনে নানা চিন্তা আসে।

—আমি একবার আস্‌'ব।

আশা দেবী মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন।

পরদা সরাইয়া, ঘরে ঢুকিয়া ঘোষাল মহাশয়কে নমস্কার

করিয়া গোপীনাথ বলিল—সাজদাপুরের প্রজাদের বিষয়ে একটু কথা ছিল।

বিরক্তি কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—শোন গোপী, পৃথিবীতে নেহাত না থাকলে নয়, তাই পড়ে আছি! কিন্তু বিষয় বন্দোবস্তের বয়েস আমার আর নেই, ও সব ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না—

কেশ বিরল মাথাটিতে একবার হাত বুলাইয়া লইয়া গোপীনাথ বলিল—জমীদারীর কাজ, পরামর্শের দরকার হ'লে কার কাছে যাই বলুন! আপনি মালিক, তাই আপনার কাছেই আসি।

—তোমার কথা ও ঠিক!

—আজ্ঞে, তাই মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে হয়।

—এবার তোমার সুবিধে হবে—অরুণ এসেছে, সেই এখন তোমাদের জমীদার। এই বিশ বছর তার বাপ যাওয়ার পর থেকে, তার বিষয় আমি আগলে ছিলাম।

—আজ্ঞে, তা আমি জানি।

—হ্যাঁ, তোমার অজানা আর কি আছে।

—তবে সাজদাপুরের ··

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—ও সব এখন থাক্। অরুণ এলে তার পর যা হয় করো। ষ্টেশনে কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও, গাড়ী আসতে আর কত দেরী।

—গাড়ীর সময় ত বেরিয়ে গিয়েছে!

—আমি ও ত তাই বলছি? বৌমা বলেন, বাবা ব্যস্ত হচ্ছেন? তুমি যাও গোপী শীগগির খবর নাও, অরুণ এখনও কেন এলো না।

—ড্রইভার ফিরে এলেই খবর পাওয়া যাবে।

—আপনি ভাববেন না, আমি দেখছি···বলিয়া গোপীনাথ বাহির হইয়া গেল।

ঘোমটা সরাইয়া আশা দেবী বলিলেন—বাবা, অতো ভাববেন না, সে হয়ত এ গাড়ীতে বেরোয়নি।

পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—ভাবনা হয় কি সাধ ক'রে, মা! আমি যে ঘর-পোড়া গরু!

শ্বশুরের ব্যথা বুঝিতে আশা দেবীর বিলম্ব হইল না। তাঁর স্বামী জমিদারী দেখিতে গিয়া, আসিবার কথা যে দিন ছিল, সে দিন ফিরিয়া না আসায়, সকলে ভাবিয়াছিলেন, বুঝি বা কাজের জন্যই আসিতে পারেন নাই, কিন্তু তার দুদিন পরে একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরিয়াছিলেন এবং সেই ব্যাধিই তাঁকে অকালে সংসার হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। অতীতের বেদনাময় স্মৃতি মনে আসায় শ্বশুর এবং বধূ উভয়েই ব্যথা ভরা চিত্তে মৌন রহিলেন।

অরুণ আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল।

চমকিয়া আশা দেবী বলিলেন—এত দেরী যে?

—গাড়ী লেট ছিল···বলিয়া অরুণ ঘোষাল মহাশয়ের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

সকল দুঃখ ভুলিয়া তিনি অরুণকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর দুটি চক্ষু হইতে আনন্দ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

আশা দেবী সেইদিকে চাহিয়া মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

অরুণের মাথায় পিঠে স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—তোর দেরী দেখে আমরা কত ভাবছিলাম, অরু,—

আশা দেবী বলিলেন—বাবা তোমার জন্যে খুব ভাবছিলেন, অরু—

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—বাঃ বেটী! শুধু—বাবাই ভাবছি'ল—তোমার বুঝি কোন ভাবনাই হয় নি?

আশা দেবী একটু হাসিলেন।

অরুণ বলিল—আপনি আমাকে বেশী ভালবাসেন কিনা, দাদু তাই একটুতেই ভাবেন—

—সত্যিই অরু! তোর জন্যে আমার যতো ভাবনা হয়, বৌমা বলেন, বাবা অতো ভাববেন না।

—মা তো সত্যি কথাই বলেন, দাদু! আপনার এত বয়েস হয়েছে, তার ওপর এ অসুস্থ শরীর, কোন চিন্তাই আপনার করা উচিত নয়।

—তা তো বুঝি ভাই! কিন্তু তুই যে আমার

শিবরাত্রির সল্‌তে, একমাত্র কুল প্রদীপ ? তোর কথা মনে হ'লে আমি যে ভগবানকে ও ভুলে যাই অরু।

আশা দেবী বলিলেন—কিছু খেয়ে দেয়ে তারপর বাবার সঙ্গে গল্প কর অরু। সেই কোন সকালে কল্‌কাতা থেকে বেরিয়েছ—

ঘোষাল মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—তাইতো! যাও ভাই—আমার এ কথা মনেও হয় নি! মা না হ'লে এ কথা আর কার মনে হবে ব'লো! মার কাজেই প্রকাশ পায়।

আশা দেবী স্নেহপূর্ণ চোখে পুত্রের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। এই সন্তান যে তাঁর কী, সে শুধু জানেন তাঁর অন্তর্যামী—! যৌবনে স্বামীর শোক চাপা দিয়াছিলেন এই ছেলের মুখ চাহিয়া। পুত্রহারা বৃদ্ধের আর পিতৃহীন শিশুর পরিচর্য্যায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

অরুণ উঠিয়া বলিল—তুমি খাবার আনো মা, আমি এখুনি স্নান ক'রে আস্‌ছি।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—এই অবেলায় নাইবে ?

—হ্যাঁ, দাদু! আমার দুবেলা স্নান করা অভ্যেস্।

আশা দেবী বলিলেন—খাবার কি তোমার এখানেই আন্‌'ব অরু ?

—হ্যাঁ মা। দাদুর জন্যে কলকাতা থেকে আমি অনেক ফল এনেছি। দাদুকে এনে দাও মা, বলিয়া অরুণ স্নানের ঘরে গেল।

(৩)

যদুর পুত্র রাখালের অসুখ। পুত্রের কাছে যদু বসিয়াছিল। একজন পাদরী তার ঘরে আসিয়া বলিল—

—কি হয়েছে টোমার ছেলের ?

যদু ইহাকে জানিত। মাঝে মাঝে সে আসিত।

রাখালের মা মোড়া আনিয়া পাদরীকে বসিতে দিয়া একটী বেতের চুবড়ী বুনিতে বসিল।

যদু বলিল—ব'স সাহেব।

—হাঁ, ব'সছি।

যদুর একটি অর্দ্ধনগ্ন কন্যা আসিয়া হাত চাটিতে চাটিতে পাদরীর দিকে চাহিয়া পিতার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

পাদরী তাহাকে বলিল—হামার কাছে এসো।

মেয়েটি ভয়ে যদুকে জড়াইয়া ধরিল।

ব্যাগ হইতে পাদ্‌রী একটি কাচের ফ্রক পরান পু[illegible] বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইল।

মেয়েটি পিতার মুখের দিকে চাহিল।

যদু বলিল—সাহেব দিচ্ছেন, নাও—

এক হাতে পিতার কাপড় ধরিয়া, অপর হাতে [illegible] পাদরীর কাছ হইতে পুতুলটি লইল।

পাদ্‌রী বলিল—ডেখো, ডেখো, কেমন্ পুটুল। [illegible] টোমার আছে ?

পুতুলটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আশ্চর্য্য চোখে দেখিতে দেখিতে মাথা নাড়িয়া ক্ষেমী জানাইল,—না—তা[illegible] ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল পুতুলটি সঙ্গিনীদের দেখাইতে।

পাদরী সেইদিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তার পর ব[illegible] —শোন যডু ঈশ্বরের কঠা—ব্যাগ হইতে বাইবেল্ বাহি[illegible] করিয়া চশমা খানি বাহির করিয়া মুছিয়া লইয়া পা[illegible] পড়িতে লাগিল।

যদু চুপ করিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া ব[illegible] রহিল।

পড়া শেষ হইলে বইখানি ব্যাগের ভিতর রাখিয়া পাদ্‌রী বলিল—শুন্‌লে বাইবেল, যডু ?

—হ্যাঁ, সাহেব।

—ডে'খ, টোমরা বড় কষ্টে ঠাক্, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'র[illegible] তোমাডের আর কোনো ডুখ্‌খু ঠাক্‌বে না।

যদু বলিল—তোমাদের ধম্মো নিলে, আমাদের [illegible] জাত যাবে, সাহেব!

—জাট্ যাবে ?

—খিরীশ্চেন হ'লে, জাত যাবে না ? আমরা [illegible] হাঁদু!

—টোম্‌রা হিণ্ডু ?

—হাঁ।

—টবে, টোম্‌রা হিণ্ডুর টেম্পলে যাইটে পাও [illegible] কেন ?

—ট্যাম্পল্ কি সাহেব ?

—টুমি জান না ? ঐ যেখানে মাটীর পুটুল থাকে!

—কুমর বাড়ী! সেখানে যা'ব কেন?

—উঁঃহুঁ……সে নয়—ঐ যে, যেখানে তোমাদের পাড়রীরা ঠাকে।

—আমাদের ত পাদরী হয় না।

—কী মুস্কিল্! টুমি কিছু বুঝিটে পার্‌ছ না। ঐ যেখানে ফুল নিয়ে ডেয় সব—ঐ পুটুলকে কী নাম আছে—রাঢা গোবিন্, সেখানে পাদরী আছে না টোমাডের?

—ও……আপনি মন্দিরের কথা বল্‌ছ?

—হাসিয়া পাদরী বলিল—হাঁ—হাঁ—মণ্ডির…আমার নাম মনে ছিল না।

যদু বলিল—সেখানে ত পুরুত ঠাকুর থাকেন!

—টিনি টোমাদের নিকট হামার মটন আসেন কি?

—না সাহেব……তা কেন আস্‌বেন! তিনি বেরামন্ আমরা হ'লাম ডোম্—

—টবে, টুমি কি ঐ মণ্ডিরে যাইটে পাও?

—আমরা ছোট জাত, ওখানে যাবো কি ক'রে!

—হামাডের ঢর্ম্মে ছোট বড় নেই! সব এক! গির্জ্জায় একসঙ্গে সব উপাসনা করে। টোম্‌রা একঠো পুটুলকে গড্ ব'লে মানো……এ বড়ো লজ্জার কঠা! বস্তির সবাইকে টুমি বুঝিয়ে হামাডের ঢর্ম্ম নিটে বল। হামরা টোমাডের সব কষ্ট দূর করবে। তোমাডের ছেলের অসুখ হামরা ওষুড ডিয়ে ভাল করবে। টাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বাবুর চাকুড়ী ডেবে। তোমার মেয়ের গায়ে জামা নেই, টোমার ইষ্ট্রি ন্যাকড়া পড়ে বেট বুন্‌ছে……এ সব কিছু করটে হবে না—হামারা খুব সুখে রাখবে—টোমাদের! বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে বসে টোমরা ভাল খানা খাবে।

ঊষা আসিয়া যদুর ঘরে ঢুকিল।

পাদরী বিস্মিত চোখে তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

যদুর স্ত্রী উঠিয়া বলিল—মা নক্ষী, এসেছ!

ঊষা বলিল—হ্যাঁ—রাখাল কেমন আছে?

—ডাক্তার বাবুর অষুধ খেয়ে, আগের চেয়ে অনেক ভাল।

—ডাক্তার কে, হারাধন ডাক্তার?

যদু বলিল—না মা নক্ষী! ইনি কলকাতার পাশ করা।

যদুর স্ত্রী বলিল—আমাদের মত গরীব লোকের ওপর ওনার বড্ড দয়া—

ঊষা রাখালের কাছে আসিয়া বলিল—রাখাল, হাঁ করত ভাই, ঠাকুরের চরণামৃত খাও—

রাখাল বলিল—মা নক্ষী! আমার জন্য ঠাকুরের পেসাদ এনেছ? তুমি যে সে দিন বোলেলে—

—এনেছি, আগে চন্নামৃত খাও…

—রাখাল হাঁ করিল।

ছোট একটি পিতলের গেলাস হইতে ঊষা তার মুখে চরণামৃত ঢালিয়া দিল। চরণামৃত খাইয়া রাখাল হাত পাতিয়া বলিল—এবার পেসাদ দাও,—

কলার পাতা মোড়া বাতাসা, ঊষা রাখালের হাতে দিল।

খুশী হইয়া রাখাল একখানি বাতাসা মুখে দিয়া বলিল—মা নক্ষী! তুমি রোজ পেসাদ নিয়ে এসো।

—রোজ কি আস্‌তে পারি ভাই! আমার যে অনেক কাজ থাকে।

—ক্ষেমী আসিয়া বলিল—মা নক্ষী! আমার পেরসাদ্?

তার মা ধমকাইয়া উঠিল—যাঃ! মা নক্ষীরে আর বিরক্ত করিস্‌নে…মা নক্ষী কি ঝুড়ি ভরে পেরসাদ্ নিয়ে এসেছে!

ঊষা বলিল—ওকে বকো না…আমি দিচ্ছি প্রসাদ্। অঞ্চল হইতে কলার পাতা জড়ান ফলের টুক্‌রো এবং বাতাসা ক্ষেমীর হাতে দিয়া ঊষা বলিল—এই না-ও।

যদু বলিল—আমি রাধা গোবিন্দরে মানত করেছি, রাখাল আমার ভাল হ'লে, পুজো দেব।

পাদরী বলিল—এই টো টোমাদের ভুল যদু! মাটির পুটুল কি কোরে অসুখ সারিয়ে ডিটে পারে?

—মাটির পুতুল, পুতুল বলো না, সাহেব! উনি আমাদের ঠাকুর।

—টাইট বল্‌ছি যদু! টোমরা শিক্ষা না পেয়ে একেবারে অণ্ডকারে আছ। টোমাডের জন্যে আমার বড় ডুখ্যু! আমাডের ধর্ম্ম নিলে টোমাদের মনের এই সব অণ্ডকার দূরে যাবে, নূটন্ আলোকের পট দেখতে পাবে।

তোমাদের আলোকের পথ তোমাদেরই থাক্ সাহেব। এরা অন্ধকারের জীব, অত আলো সইতে পারবে না—এদের অন্ধকারেই থাকৃতে দাও···বলিয়া অরুণ আসিয়া পাদ্রীর সামনে দাঁড়াইল।

উষাকে দেখিয়া অরুণ বিস্ময় মুগ্ধ চোখে চাহিল। নীচ হাড়ির ঘরে, অপরূপ সুন্দরী, কে এই তরুণী।

যদু বলিল—আসুন ডাক্তার বাবু—

যদুর স্ত্রী উষাকে বলিল—এনার কথাই তোমারে বল্‌ছিলাম, মা নক্ষী।

উষা, অরুণের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিল।

পাদরী বলিল—আপনি ডক্টর?

অরুণ বলিল—হাঁ্যা।

—এরা বড় অপরিষ্কার ঠাকে, টাই এটো অসুখে ভোগে

—আমি এদের পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা ক'রব, আর যাতে এ রকম রোগে ভুগতে না হয়, তারও ব্যবস্থা ক'রব।

—আপনার কটায় আমি ভারী আনন্দ লাভ করলাম, আমিও যদুকে সেই উপডেশই দিচ্ছিলাম।

—হাঁ—তা আমি জানি সাহেব, আপনাদের কাজই উপদেশ দেওয়া।

হাসিয়া পাদরী বলিল—জান্‌বেন বই কী ডক্টর। আচ্ছা গুড বাই···

পাদরী চলিয়া গেলে, অরুণ রাখালের কাছে গিয়া বলিল—দেখি, রাখাল, তোমার হাত?

রাখাল, হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

—জিভ দেখি?

রাখাল জিভ দেখাইলে, অরুণ বলিল—তোমার জিভে লেগে কি? কিছু খেয়েছ বুঝি?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

—কি খেয়েছ, বলো?

—ভয়ে ভয়ে রাখাল বলিল—পেরসাদ্।

রাখালের জননী বলিল—মা নক্ষী রাধা গোবিন্দের পেরসাৎ দিয়েছিলেন।

অরুণ ফিরিয়া দেখিল, উষা চলিয়া গিয়াছে। সে বলিল—তোমাদের এ মা নক্ষীটি কে?

যদু বলিল—উনি আমাদের ঠাউর মন্দিরের পু[illegible] ঠাউরের মেয়ে।

—ওঃ, ওঁর নাম বুঝি নক্ষী?

—এজ্ঞে না—ওনার নাম উষারাণী। গরীব লো[illegible]দের ওপর বড় দয়া—আমাদের ঘরে খাবার না থা[illegible] উনি দেন। কোন দুঃখে কেউ পড়লে নক্ষী ঠাকরুণের মত উনি তারে দেখেন, তাই আমরাই বলি মা নক্ষী!

যদুর স্ত্রী বলিল—আপনারে কী ব'লব, ডাক্তার বাবু, ওনার বড় গুণ! বামুনের ঘরের মেয়ে হ'য়েও আমাদে[illegible] ভালবাসেন, কিন্তু ওনার বাবার বড় কড়া মেজাজ।

অরুণ বলিল—তাই বুঝি—

—হাঁ্যা, বাবা।

যদু বলিল—রাখালেরে কেমন দেখলেন?

—ভাল—আর কোন ভয় নেই।

রাখাল বলিল—তবে আজ ভাত খা'ব, ডাক্তার বাবু?

হাসিয়া অরুণ বলিল—আজ ত তুমি পেরসাদ খেয়েছ, আজ আর ভাত নয়।

নাকি সুরে রাখাল বলিল—সে ত মোটে দুখান্ বাতাসা।

—আর কিছু নয়?

—উঁহু!—

—সত্যি ব'লছ?

—আর একটুকু মিছরি—

—এই দেখ, মিছরির কথা ত আগে বলনি। এই বলিয়া অরুণ হাসিতে লাগিল।

—ভুলে গিয়েলাম। ভাত খা'ব?

—আজ নয়।

—তবে কবে ভাত দেবেন?

—আরও দুদিন পরে

কান্না মিশ্রিত স্বরে রাখাল বলিল—আমার যে খিদে পেঁয়েছে—

—বেশ ত. পেট ভ'রে সাবু খাও।

—সাবু ভাল লাগে না।

রাখালের মা বলিল—চুপ কর্। ডাক্তার বাবু যা বল্‌ছেন, তাই শুন্‌তে হয়।

অরুণ যদুকে বলিল—রাখালের সাবু মিছরি আছে ত?

যদুর স্ত্রী বলিল—আপনি যা দিয়েছিলেন, আজকে চ'লে যাবে।

—আমি যেমন ব'লেছিলাম, তেমনি ক'রে রেঁধে দাও।

—হ্যাঁ, বাবা।

—আচ্ছা এই টাকাটা আরও নাও, দুধ একটু বেশী ক'রে কিনো।

কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যদু বলিল—আপনার কেরপাতেই এ যাত্রা রাখাল আমার বেঁচে উঠল।

তাকে বাধা দিয়া অরুণ বলিল—পাদরী সাহেব তোমাদের কি বল্‌ছিল?

—সায়েব বল্‌ছিল ওনাদের ধম্মো নেবার জন্যে।

—হুঁ—তারপর?

—আজ্ঞে, আমার ত একটুকুও ইচ্ছে নয়; তবে আমাদের পাড়ার অনেকে ওনার কথায় রাজী হয়েছে।

রাখালের মা বলিল—রাজী হয়েছে কি আর সাদে! প্যাটে খেতে পাবে, পন্নে কাপড় পাবে, ছেলেপিলেদের নেকাপড়া শিইকে চেকরী দেবে......এই সব শুনেই ত ওরা খিরিষ্টেন হ'তে মত করেছে।

অরুণ তাহার কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিল, সত্যই এরা বড়ই অভাগা! সে বলিল—ওদের ব্যবসাই ঐ! ঐ রকম কথা ব'লে লোক্‌দের ভুলিয়ে ওরা খৃষ্টান করে। এর জন্যে ওরা টাকা পায়।

যদু বলিল—তাই হবে—তাই ওনার অ'ত গরজ!

—তোমাদের পাড়ার কে কে খৃষ্টান হচ্ছে?

—আজ্ঞে—সুবল, ধনা, জগা—আরও যেন কে—কে আছে। আমি ত ছেলের অসুখ নিয়ে বেরুতে পারি নি, তাই জানি নে।

অরুণ বলিল—তোমাদের পাড়ার সবাইকে কাল বিকেলে এক জায়গায় জমা হ'তে বল। তাদের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। আমি এখন যাচ্ছি, রাখালের ওষুধ তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

(৪)

অরুণ বাহিরে আসিয়া দেখিল, কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঊষাকে ঘিরিয়া আছে। ঊষা অঞ্চল হইতে তাহাদের কিছু দিতেছে। ছেলেমেয়েরা আনন্দে খাইতেছে। একটি বালক বলিল—মা লক্ষ্মী, আবার কবে আস্‌বা?

ঊষা বলিল—তা তো এখন বল্‌তে পারিনে, যেদিন সুবিধে হবে, আবার আস্‌বো।

একটি বালিকা বলিল—তুমি রোজ এসো, মা লক্ষ্মী, পেসাদ নিয়ে—

ঊষা বলিল—রোজ কি আস্‌তে পারি ভাই! আমার যে ঠাকুরের কাজ করতে হয়......

—তাইলে দুদিন পরে এসো—

—আচ্ছা তা দেখা যাবে—

অপর একটি বালক বলিল—না তোমারে আসতিই হবে মা লক্ষ্মী! তোমার পেরসাদ আমরা খুব ভালবাসি!

তিন চারিটী বালক বালিকা একসঙ্গে বলিল—হ্যাঁ মা লক্ষ্মী! খুব বেশী বেশী পেরসাদ নিয়ে তুমি এসো,—আস্‌বে তো?

—আস্‌বো।

একটী বালক বলিল—তুমি যদি না আস, তাইলে, আমরা কিন্তু তোমার বাড়ী যাব পেরসাদ নিতে!

ঊষা বলিল—না, তোমাদের যেতে হবে না, আমিই আস্‌বো!

—আসবা মা লক্ষ্মী! বলিয়া ছেলের দল খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

অরুণ এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। ছেলেরা চলিয়া গেলে, সে ঊষার কাছে আসিয়া বলিল—আমরা যখন একপথের যাত্রী, তখন আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার অধিকার আমার আছে!

ঊষা অরুণের দিকে চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া লইল।

অরুণ বলিল—যদুর কাছে আপনার কথা শুন্‌লাম্—সত্যিই আপনি দেবী!

মৃদুকণ্ঠে ঊষা বলিল—আপনার গুণ ও তো কম নয়!

—আমার আর কী গুণ আছে?

—বিনা পয়সায় গরীবদের আপনি যে রকম চিকিৎসা করেন, তা কজন ডাক্তারে ক'রে থাকে!

—অপর কেউ করে কি না, তা বল্‌তে পারিনে, তবে আমার মনে হয়, বিদ্যাশিক্ষা শুধু পয়সার জন্যেই নয়!

—তাইত বল্‌ছি! আপনার গুণের তুলনা হয় না! এতদিন ত আমি দেখে আস্‌ছি, বিনা চিকিৎসায় এদের কতজনকে মর্‌তে! এমন গাঁ যে একটি ভাল ডাক্তার নেই! ডাক্তারের নাম নিয়ে একজন আছে, কতকগুলো পেটেণ্ট অষুধ ছাড়া সত্যিকারের ডাক্তারী বিদ্যে সে কিছুই জানে না।......তবু তাঁর দুটাকা ভিজিট, কাজেই বুঝুন, এদের বিনা চিকিৎসায় মরা ছাড়া আর উপায় কি?

—আপনার কথা খুব সত্যি। আপনার এদের ওপর এই দরদ, আমাকে মুগ্ধ করেছে!

—এরা আমার গাঁয়ের লোক। ছোট থেকে দেখে আস্‌ছি। এদের দুঃখ কষ্ট দেখে, আমার বুক ফেটে যায়, কিন্তু কী বা কর্‌তে পারি আমি!

— যা শুন্‌লাম, তাতে বুঝেছি, আপনি ত অনেক কিছুই করেন! আপনার তুলনায় আমার এ কাজ অতি তুচ্ছ।

উষা বলিল—না, তা নয়! আপনি ভিন্ন গ্রামের হ'য়ে যা করেন, তা আমার চেয়ে ঢের বেশী।

একটু হাসিয়া অরুণ বলিল—আমি যে এ গাঁয়ের নই, তা আপনি জান্‌লেন কি করে?

—এর আগে ত আপনাকে এখানে কখন দেখিনি—

—না—আমি কল্‌কাতায় ছিলাম।

—তবে কি আপনি এই গ্রামের-ই?

—হ্যাঁ।

—এখন এখানেই থাকবেন ত?

—সেই ইচ্ছেই আছে।

—বাঃ! শুনে বড় খুশী হলাম।

—আমি এখানে থাক্‌লে সত্যিই কি আপনি সুখী হন্?

—হ্যাঁ! আপনার মত একজন লোকের এই গাঁয়ে খুব দরকার হয়েছে, এই হতভাগাদের জন্যে! আপনি হয়তো কোন দিন চোখে দেখেন নি এদের দুঃখ, কিন্তু আমি দেখেছি! গ্রামে যখন মহামারী দেখা দেয়, তখন তার যত আক্রোশ যেন এদের ওপরই দেখা যায়। গরীব ব'লে এরা কোন রকমেই তার রাক্ষসী ক্ষুধা থেকে মুক্তি পায় না! চোখের ওপর যখন আমি এ সব দেখি, তখন দুঃখে বেদনায় আমার বুক ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু আমি নারী, কিছুই করতে পারিনে! সে সময় তাদের মুখে যে জল দেবো, সে স্বাধীনতা ও নেই! উষার কণ্ঠ বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল।

শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে অরুণ উষার দিকে চাহিয়া বলিল, —আপনার মত দেবীকে যদি আমার সহকারিণী পাই, তা হ'লে আমাদের এই দুঃখী ভাই বোনেদের দরিদ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারবো, আশা করি।

(৫)

যদুর কথায় বস্তির পুরুষেরা সকলেই মাঠে আসিয়া জমিয়াছিল। অরুণ আসিয়া বলিল,

—তোমরা সবাই এখানে এসেছ দেখে, আমি ভারী খুশী হলাম। তোমরা নিশ্চয়ই যদুর কাছে শুনেছ যে আমি তোমাদের সঙ্গে দু একটি কথা কইতে চাই—

ভীম বলিল—তাই শুনেই আমরা এখানে এয়েচি!

—যদুর বাড়ী তার ছেলেকে দেখতে গিয়ে, তার ঘরে একজন পাদরীকে দেখলুম। শুনলুম্ তোমাদের মধ্যে অনেকে নাকি খৃষ্টান হবে, ঠিক্ করেছ—এ কথা কি সত্যি?

ভীম বলিল—আমি তো এ কথা জানিনে।

একটি যুবক বলিল—তোমারে এখোনো এ কতা বলিনি, মোড়ল—কিন্তু হ্যাঁ, আমরা খিরীণ্টেন্ হবার সব ঠিক করেচি—

—তোরা কে কে শুনি?

—আমি, ভজা, জগা আর সুবল।

অরুণ বলিল—তোমরা হিন্দু হ'য়ে সাহেবদের ধর্ম্ম কেন নেবে?

—কেন নোবো না! জ'ম্মে পর্য্যন্ত শুন্‌ছি আমরা হাঁদু কিন্তক্ ককনো হাঁদুর মন্দিরে ও যেতে প্যালাম না, আর ঠাউর ও দ্যাখ্‌লাম না।

—ছেলেটীর কথা যে কতখানি সত্য, তা অরুণ ভাল রকমেই জানে, তাই তার জবাব শীঘ্র দিতে পারিল না।

সুবল বলিল—আপনি তো জানেন না, ডাক্তার বাবু! আমরা নীচ জাত বোলে, আপনাদের রাধাগোবিন্দর পুরুত ঠাউরের হুকুম, যে তেনার ঠাউর বাড়ীর দরজাতেও কেউ যাতে পাবে না। আপনি তো বল্লেন, আমরা হাঁদু, কিন্তুক্ গ্রামের ভালজেতেরা আমাদের কুকুর শেয়ালের মতই মনে করে। ছুলে বাগদী হ'লে ও আমরা তো মানুষ! এত হ্যানস্তা স'য়েই বা আমরা থাক্‌বো কেন! তাই সায়েবদের ধম্মো নেওয়া ঠিক্ করেছি।

ভজহরি বলিল—পাদরী সয়েব ব'লেছেন, আমরা খিরিষ্টান্ হ'লে, আমাদের প্যাটের জন্যি আর ভাবনা ভাবতে হবে না—ওনাদের কারখানায় আমাদের প্যাট চলা মস্কিল। একবেলা বই দুবেলা খাবার ঘরে রয়না তার উপরি যাদের বা একটু জমি জমা আছে, তার জমীদারকে খাজনা দিতেই পেরান বেরিয়ে যায়—আজ আপনি আমাদের দুঃখু বুঝে চিকিচ্চে কচ্চেন্ বটে, কিন্তুক্ সেই কতায় বলে, "নিত্যি নেই দেয় কে, থিত্যি রুগী দেখে কে"—আমাদের হয়েচে তাই!

অরুণ বলিল—কিন্তু আমি তো আর তোমাদের বলিনি যে অসুখ হ'লে আর দেখবো না।

—না, তা আপুনি বলেন নি, কিন্তুক আপনি আর এ গেরামে কতদিন থাকবেন! আমাদের দুঃক্কু কিন্তু চিরকেলে তাই জন্যেই আমরা পরাগস্য ক'রে ঠিক্ করেছি খিরিষ্টেন্ হবার!

ভীম বলিল—তোরা যে অবাক্ কল্লি ভজা! বাপ পিতেমোর ধম্মো ঐ পাদরীর কতায় ছেড়ে দিবি?

বাপ পিতেমোর ধম্মো নিয়ে কী ধুয়ে জল খাবো! বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমাদের অবস্তাড একবার ভাবো দেকি, যে ধম্মোর কতা ব'লচো—আমাদের ধম্মোডা কী তাই বলো দিকি?

—কেন, তুই জানিস্ না কী?

—না জানিনে! গেয়ান হ'য়ে শুনে আস্‌চি বটে যে হাঁদু ধম্মো কিন্তুক্ ঠাকুর দ্যাবতার দুয়োরে ঢুকতে দিয়েচে তোমার ঐ হাঁদুরা?

—তা নাই বা দিল—তা হ'লে ও তো আমরা হাঁদু!

—কীসের হাঁদু! মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দেখতে পাব না, তেনারে পূজো কত্তে পাব না—তবু বলবা হাঁদু!

—কি করবি বল্—মন্দিরে যাবার ভাগ্যি কি করিচি!

—তোমার এমন হাঁদু থাকার ভাগ্যিতে আমাদের কাজ নেই, মোড়ল—আমরা খিরিষ্টানই হ'ব! ওদের ধম্মে ছোট বোলে কেরুকে তেড়িয়ে দেয় না, সবাই একসঙ্গে ব'সে গির্জেয় পূজো ক'রে, পাদরী ব'লেছে।

অরুণ বলিল—তোমাদের কথা আমি বুঝেছি, ভজহরি! হিন্দু হ'য়েও তোমরা যে মন্দিরে যেতে পাও না, এ দুঃখ হওয়া তোমাদের কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু তোমরা যা করতে যাচ্ছ, সেটা হ'ল ঠিক যেন "চোরের ওপর রাগ ক'রে, মাটিতে খাওয়া।" মন্দিরে যাবার ইচ্ছে যদি তোমাদের থাকে, তা হ'লে এমন ক'রে ধর্ম্ম ছেড়ে চ'লে না গিয়ে যাতে মন্দিরে যেতে পারো তার ব্যবস্থা করাই তোমাদের উচিত!

—আমরা তার কী ব্যবস্তা কত্তে পারি?

—তোমরা না করলে তো তা হবে না কোন দিনই!

সুবল বলিল—আমরা মুরুখ্যু, কিচু বুজিনে। আপনি ব'লে দ্যান আমাদের, কী কল্লে আমরা মন্দিরে যেতে পাব? সত্যিই মন্দিরে ঢোক্‌বার আমাদের বড় ইচ্চে করে।

—বেশ তো! তোমরা ও গিয়ে বল যে আমরা ও হিন্দু, মন্দিরে যাবো ঠাকুর দেখতে।

—ওঃ বাবা! আপনি তো জানেন না, মন্দিরের পুরুত কে? তিনি তাইলে, আমাদের আস্ত রাখবেন না!

—কেন তোমরা ব'লতে পারবে না, যে দেবতা একা তাঁর নয়। ভগবানের ওপর তাঁর যেমন অধিকার, সে দাবী তোমাদেরও আছে! মন্দিরের পূজারী তিনি হলেও রাধা গোবিন্দকে দর্শন বা তাঁর পূজোয় বাধা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই, কারণ তোমরা ও ঐ ভগবানের সৃষ্টি!

নরেন আসিয়া বলিল—আপনি যে মহেশপুর যাব বলেছিলেন?

—আজ আর হ'ল না, নরেন।

—তা হ'লে কি গাড়ী গ্যারেজে রাখব?

—তাই রাখগে।

ভীম বলিল—জমীদার মশায়ের অসুখ কী খুব বেড়েছে?

নরেন বলিল—না।

—তবে যে ডাক্তার বাবুরে নিতে এয়েলেন?

হাসিয়া নরেন বলিল—ডাক্তার বাবুই যে তোমাদের জমীদার! তা বুঝি জান না তুমি!

—এজ্ঞে না—উনিই জমীদার! বিস্ময়ে ভীমের চোখ দুটি ফাটিয়া পড়িবার মত হইল।

—হ্যাঁ, আমাদের জমীদারের নাতি। কলকাতায় পড়তেন শোন নি?

—তা তো শোন্‌লাম্, কিন্তুক্ এনাকে দেকে একটুক্ বুজিনি যে তিনিই!

অরুণ নরেনের দিকে চাহিয়া বলিল—নরেন! তুমি এখন যেতে পার। এদের সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

নরেন চলিয়া গেলে, ভীম বলিল—আপুনি আমাদের জমীদার, তা না জেনে কত কতা বলিচি আমরা, ক্ষ্যামা করবেন।

অরুণ বলিল—ও কথা কেন ব'লছ, ভীম! তোমার এ কথা শুনে, আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হ'ল। আগে তোমরা যেমন ক'রে আমাকে তোমাদের সব মনের কথা বলেছ, তেমন করেই এখনও বোলো। তোমাদের কাছে আমি জমীদার নই—শুধু ডাক্তার বাবু!

ভীম বলিল—আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন, তকুন ব'লবো বই কি—কিন্তুক্ আজ আমার ভারী আনন্দ যে ডাক্তার বাবু আমাদেরই রাজা!

অরুণ বলিল—সুবল, ভজহরি তোমরা যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে আমি ভারী খুশী হই!

ভীম বলিল—ভজা, সুবো! তোদের আমি বল্‌চি—আমাদের রাজা যা বলেন, তা শুনতি হবে—

—শুনবো বই কী মোড়ল! কী বলচেন্ বলুন—আপুনি রাজা বাবু, বলিয়া সুবল অরুণের দিকে চাহিল।

—তোমাদের ঠাকুর দেখ্‌তে গেলে যা করা উচিত তা আমি ব'লেছি, এখনো কি তোমরা খৃষ্টান হবে? বলিয়া অরুণ সুবলের দিকে চাহিল।

—ও কথা তো শুনলাম্! কিন্তুক্ আসল হচ্চে আমাদের প্যাটের ভাবনা—কাজ কম্মো নেই বল্‌লেই হয়!

ভজহরি বলিল—আরো একটা কতা আচে আমাদের—

—বেশ, বলো—

—আমরা তো মুরুখ্যু আচিই, সেই জন্যেই আজ প্যাটের জন্যে এতো দুক্কু পাচ্চি—কিন্তুক্ ছেলেগুলোন ও যে ল্যাকা পড়া শিক্‌তে পাবে না, এই ভেবেই আরও আমরা ঐ ধম্মো নেবো ভেবেছিলাম। সাহেব বলেছেন, মিশ্‌নারী ইস্কুলে আমাদের ছেলে-মেয়ে গুনোরে পড়াবে—

অরুণ বলিল—আজ তোমরা যখন সরলভাবে তোমাদের দুঃখের সব কথা আমাকে বলেছ, তখন আমি যতদূর পারি তোমাদের এ সব অভাব দূর করবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তোমরা আমাকে কথা দাও যে—এ গাঁ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবে না বা অপর ধর্ম্ম নেবে না।

ভজহরি বলিল—আমরা যার জন্যি খিরিষ্টান হ'তে যাচ্চি, সে সব যদি নিজের ঘরেই পাই, তাইলে বাপের ভিটে ছেড়ে ভিন্ জায়গায় কেন যাব, রাজাবাবু!

আমি তো তোমাদের বললুম, আমার সাধ্যমত তোমাদের সুখী করবার চেষ্টা করবো, কিন্তু আমার এই অনুরোধ যে তোমরা কেউ খৃষ্টান হ'য়ো না—

—না—না—আমরা আর খিরিষ্টান হ'ব না।

(৬)

প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া, অরুণ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সূর্য্য উদয় দেখিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, উষা নদীতে স্নান করিতেছে। একটু পরেই সে স্নান শেষ করিয়া উঠিল। সামনেই অরুণকে দেখিয়া উষা বলিল, —আপনি এত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?

—বেড়াতে।

—রোজ যান না কি?

—হ্যাঁ। কিন্তু এই ভোরে নাইলেন্ যে?

—আমার অভ্যেস্।

—এত সকালে, একা ভয় করে না আপনার?

—না, ভয় কেন ক'রবে!

—কিন্তু ঘাটে তো আর কাউকে দেখছি নে?

—না, এখনও সকলের আসবার সময় হয় নি—

হাসিয়া অরুণ বলিল—কিন্তু আপনার তো হয়েছে?

—আমার যে পূজোর কাজ আছে।

—ওঃ! তাই এত সকালে আসেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এত ভোরে আপনার না আসাই উচিত—কোন বিপদ হ'তে তো দেরী লাগে না। একটু বেলা হ'লে এলেই পারেন?

—না, এখানে কোন ভয় নেই, আর বাড়ী আমাদের ঐ তো। তা ভোরের অরুণ-উদয়ের লোভটুকু ছাড়তে পারি নে—বলিয়া উষা একটু হাসিল।

—অরুণ দেবকে সৌভাগ্যবান ব'লতে হবে, যে উষা দেবী তাঁর আগমনের প্রতিক্ষা করেন। বলিয়া অরুণ হাসিতে লাগিল।

—আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি কোরে?

—আমি যে হাত গুন্‌তে জানি।

—আচ্ছা।

—বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনার? বলবো দু একটা কথা আপনার সম্বন্ধে আর ও?

—থাক্। আর ব'ল্‌তে হবে না কিছু। আমি বুঝেছি।

—কী বুঝেছেন?

—আপনি যদুদের কাছে খবর পেয়েছেন, সব—

—কিন্তু আমি যে জ্যোতিষ জান্‌তে পারি এ কথাই বা বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

হাসিয়া উষা বলিল—এ নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ কি। আপনি যে ডাক্তার, সেই তো সব চেয়ে ভাল। জ্যোতিষী হ'লে এর চেয়ে বেশী উপকার কি করতেন বলুন্ তো?

—জ্যোতিষ বিদ্যেটা আপনার পছন্দ নয় বুঝি?

—অপছন্দও নয়—আর অবিশ্বাসও করি নে, বরং, শ্রদ্ধা আমার খুবই আছে—কিন্তু আমি বলছিলাম, ডাক্তারে মানুষকে রোগের যাতনা থেকে মুক্ত করে, কিন্তু জ্যোতিষীরা ভূত ভবিষ্যৎ জেনেও তা পারে না।

—যাক। এ নিয়ে আর আপনার সঙ্গে মিছে তর্ক কর'ব না।

হাসিয়া উষা বলিল—সেই ভালো। আমারও ফুল তুলবার অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—এবার যেতে হবে—

উষা পিছনের দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিলে, অরুণ রাধা-গোবিন্দের মন্দিরের সামনে আসিয়া দেখিল, উষার পিতা উত্তেজিত কণ্ঠে তার নাম লইয়া তাদের দেওয়ানকে কিছু বলিতেছেন। জনার্দ্দন কি বলিতেছেন শুনিবার জন্য অরুণ সেইখানে দাঁড়াইল।

জনার্দ্দন বলিল—কাল সন্ধ্যের সময় তোমাদের নতুন জমীদার সব ছোট লোকদের সভা ক'রে না কি বলেছে যে ঠাকুর মন্দিরে তারা যেন জোর ক'রে ঢোকে।

গোপী বলিল—আমি এ সব কথা কিছু জানি নে বাঁড়ুয্যে মশায়।

—তুমি জানো কি—না, তা আমার শুনবার দরকার নেই। তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, গোপী—যে আমার অনুমতি বিনা মন্দিরে ঢুক্‌তে কেউ পাবে না।

—আজ্ঞে সে তো সত্যি কথা—কিন্তু তিনি হ'লেন গাঁয়ের জমীদার—

—গাঁয়ের তিনি জমিদারই হোন, আর রাজাই হোন্, আমার সে খবর জানবার দরকার নেই—কিন্তু আমার মন্দিরের কোন নিয়মে তাঁর হাত দেবার যে অধিকার নেই, তা জমীদার ভুলে গেলেও, আমি ভুলিনি। সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে ডেকেছিলুম।

—মাখনলাল পণ্ডিত দেওয়ানজীর সঙ্গেই ছিল। সে বলিল—আমরা শুনেছি, এ মন্দিরে জমীদারের কোন হক্ নেই—

—নেই-ই-তো। রাধানাথ ঘোষালের প্রপিতামহী আমাদের বংশে এই ঠাকুর সেবার ভার দেন। সেই থেকে এই নিষ্কর দেবত্তর সম্পত্তি আমাদের বংশেই চলে আস্‌ছে। এর সঙ্গে জমীদারের কোন সংস্রব নেই। এ মন্দিরের মালিক এখন আমি। মন্দির সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম স্বয়ং জমীদার পর্য্যন্ত চিরদিন মেনে আসছেন—

গোপীনাথ বলিল—আমি এসব জানি, বাঁড়ুয্যে মশায়।

—তা জান্‌বে বৈ কী—তুমি তো আর আজকের নও। ঐ জমিদারীর কাজে তোমার চুল পাক্‌লো—তা ছাড়া এখন তুমিই তো এক রকম জমীদার।

—অমন কথা বল্‌বেন না, বাড়ুয্যে মশায়! আমি তাঁদের চাকর!

—জনার্দ্দন শর্ম্মা সত্যি কথা বল্‌তে ডরায় না, গোপী! রাধানাথ ঘোষাল তো ক' বছর বাতে শয্যাগত, আর কমল কৃষ্ণর ছেলেটা ত নেহাৎ শিশু—সে জমীদারীর জানে কী! জানে মড়া কাটতে!

—কিন্তু তিনিই এখন মালিক্। তাঁর মতেই আমাকে চল্‌তে হবে—

—মাথা নাড়িয়া পণ্ডিত মশাই বলিলেন—তা তো বটেই,—

জনার্দ্দন বলিলেন—হুঁ! তাঁর মতে চল্‌তে হবে—তা হ'লেই তোমার জমিদারী চল্‌বে খুব ভাল! মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে তার ঘেন্না পিত্তি আর কিছু নেই, তাই যত ছোট জাতদের সঙ্গে তার কারবার! ওসব বিদ্যে শিখলে অমনিই হয়!

পণ্ডিত মশায় বলিলেন—অরুণবাবু ডাক্তার হ'য়ে কিন্তু গাঁয়ের লোকদের সুবিধে হয়েছে—বিনা চিকিৎসায় আর মরতে হবে না কারোকে!

—তোমার খোসামুদী বুলি রাখ তো পণ্ডিত! ঐ বিলিতি জলগুলো পেটে পড়লে, একবারে সব অমর হ'য়ে যাবে!

—যাই বলুন, আপনি, বাড়ুয্যে মশায়—চিকিৎসা ওঁর খুব ভাল—এ আমি একশো বার বল্‌বো!

—একশো বার কেন হাজার বার বলো তুমি! আমার তাতে কিছু এসে যায় না—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি তোমাকে—তোমাদের ডাক্তারটি আসবার আগে গাঁয়ের লোক কী সব মরে ভূত হ'য়েছিল?

—আজ্ঞে, তা তো আমি বলিনি!

—কবরেজ কালীপ্রসন্ন সেনের ওষুধ তুলসী পাতা আর মধুর সঙ্গে এক বড়ি খেলে কত সন্নিপাত পর্য্যন্ত সাবৃতে দেখলাম, এই বয়সে! আর আমি তো কখনও এক রাধা গোবিন্দর চরণামৃত ছাড়া কোন ওষুধই খাই নি।

—আপনার সঙ্গে অপরের কথা সাজে না। আপনি হলেন একরকম সন্ন্যাসী, আপনার মত ভক্তি আর বিশ্বাস সাধারণের কি আছে—কাজেই রোগ হ'লে, তারা ডাক্তারের ওপরই বেশী নির্ভর করে।

—হুঁ, তা বুঝেছি। শোন গোপী। তোমার জমীদারকে বোলো, তিনি যেন ছোটলোকদের নিয়ে আমার পিছনে না লাগেন তাহ'লে জমীদার বোলে আমার কাছে রেহাই পাবেন না।

গোপী বলিল—আমি এ সব কথা তাঁকে কিছু বলতে পারবো না বাঁড়ুয্যে মশায়।

—বেশ, তুমি না পার, আমিই তাকে বল্‌বো!

—কিন্তু আপনি তাঁকে জানেন না, বাঁড়ুয্যে মশায়। তিনি যা ভাল বোলে বোঝেন, কারও কথাতেই তা ত্যাগ করেন না—

—সে আমি বুঝবো—তার জন্যে তোমাকে চিন্তা ক'রতে হবে না। হিন্দু ধর্ম্ম ঘুচে গেছে কি না, তাই সে তার ইচ্ছে মত ছোট জাতদের মন্দিরে ঢোকাবে।

অরুণ আর সেখানে থাকা উচিত নয় বুঝিয়া জনার্দ্দনের সামনে আসিয়া বলিল—ওরা কী হিন্দু নয়, বাঁড়ুয্যে মশায়?

গম্ভীর মুখে জনার্দ্দন বলিল—সে কথা কেন?

—প্রয়োজন বোলেই।

—আমি তোমার এ কথার জবাব দিতে চাই নে।

—না চান্ সে আলাদা কথা। আমিও জোর করতে নে। তবে আমার ধারণা ছিল, আপনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ, এ কথার জবাব আমি পাবো।

জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিলেন।

—আচ্ছা সত্যিই কি আমাদের শাস্ত্রে ওদের হিন্দু বলে না?

জনার্দ্দন বলিল—শাস্ত্রে ওদের হিঁদুই বলে, কিন্তু জাতে যে ওরা ছোট!

—শুধু এই জন্যে ওরা মন্দিরে আস্‌তে পারে না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু দেবতা ত সকলেরই!

বিরক্তকণ্ঠে জনার্দ্দন বলিলেন—তাই ব'লে মুচি-মেথর সব এসে ঠাকুর মন্দিরে ঢুকবে! তাহ'লে তার পবিত্রতা থাকে কোথায়?

—শাস্ত্র যখন তাদের হিন্দু বলে স্বীকার করেছে, তখন তারা এলে মন্দির কখনই অপবিত্র হতে পারে না। দেব দর্শন থেকে তাদের বঞ্চিত করবার আপনার কিছু অধিকার নেই!

—আমার অধিকার নেই! আমি রাধাগোবিন্দর সেবাইত, তাঁর ভক্ত, দাস! আমার সম্পূর্ণ জোর আছে—

—একটু হাসিয়া অরুণ বলিল—অতো রাগবেন না—আপনি যে রাধাগোবিন্দর পুরোহিত তা সকলেই জানে, কিন্তু ঠাকুর আপনার একার নন্।

—তা না হ'লেও, তোমার ঐ হাড়ী বাগ্দীদের হিঁদু বোলে, মন্দিরে ঢুকতে আমি কিছুতেই দে'ব না, তা তুমি জেনে রেখো! আর তুমি শোন, জমীদার বাবু! আমি রাধাগোবিন্দর শুধু পুরুত নই—বৈষ্ণব সাধক! গ্রামের লোক আমাকে এই বোলেই জানে—

—কিন্তু আপনি অস্পৃশ্যদের এত ঘৃণা করেন কেন?

—কী করবো বলো বাপু! তোমার মত তো আর পেটে ইংরিজি বিদ্যে নেই! কিন্তু তুমি যদি এই ছোট জাতদের জন্যে মাথা না ঘামিয়ে, নিজের জমীদারীর কাজ গুলো শিখে নাও, তা হ'লে তোমার উপকার হবে।

—আমার ভালোর চিন্তা আপনাকে করতে হবে না, বাঁড়ুয্যে মশায়! জমীদারীর কাজ আমার যতটুকু জানা আছে, তাতেই চ'লবে! প্রজাদের আমি ভাইয়ের মত ভালবাসি।

—খুব ভা'ল করো! তাহলেই আদর্শ জমীদার হবে! তাই তো বলছিলাম্—শিখে নিও, গোপীর কাছে শিখে নিও! কেন বাপু! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াও! প্রজার কাছে জমীদারের নামে, বাঘের গরুতে এক ঘাটে জল খাবে—জমীদারকে তারা যমের মত ভয় করবে—তবেই তো জমীদার! তা নয়! প্রজারা হলো ওঁর ভাই!

—তেমন জমীদার হ'তে আমি চাইনে বাঁড়ুয্যে মশায়!

—তবে এই মুচি মুদ্দোফরাস্দের ভাই বোলে, গলা ধরে ব'সে থাক্তে চাও—বাঃ. বেশ—জমীদার বাবু চমৎকার। কিন্তু নিজের যা খুশী তুমি করতে পার, তাদের হাঁড়ীতে ভাতই খাও, বা দুঃখে কাঁদ, আমার তাতে কোন আপত্তিই নেই—কিন্তু আমার ঠাকুর বাড়ীর ওপর হাত দিতে এসো না!

—শুনুন্!

—না—আর আমার তোমার ও সব কথা শুনবার অবসর নেই। পুজোর বেলা হ'য়ে যাচ্ছে—বলিয়া জনার্দ্দন চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রেম

শ্রীমমতা ঘোষ

সেদিন গিয়েছে কেটে যবে মোরা দোঁহে
ছিলাম একান্ত পূর্ণ দোঁহার মাঝারে,
কেটেছে দিবস-রাতি কী মদির মোহে—
ডুবিয়া ছিলাম শুধু চিত্ত-পারাবারে।
আজিকে শতেক কাযে দেখি আপনায়,
তব লাগি' খুজি পন্থা সুখ-সুবিধার;
কাছাকাছি থাকা আজ অসম্ভব প্রায়,
কাযের লাগিয়া ওই ডাকিছে সংসার।

কত না সময়ে হয় মনান্তর কত
তুচ্ছ কারণেতে বলি অসুন্দর বাণী;
আরাম করিতে দান তখনো নিরত
আড়াল হইতে ব্যগ্র এ হাত দুখানি।
কল্পনার কিছু নাহি, মোহ কেটে গেছে,
তোমার সেবার লাগি' স্নিগ্ধ প্রেম এ যে।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্বশুর মহাশয়

শ্রীহেমলতা দেবী

পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় কি ধাতের মানুষ ছিলেন এক কথায় তার সম্যক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারা সহজসাধ্য নয়। তাঁর অসাধারণত্ব, গুণ ও শক্তির খণ্ড পরিচয় চারি দিকে ছড়িয়ে আছে এত বেশী যে সেগুলিকে একত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করে তোলা এক জনের পক্ষে অসাধ্য কাজ। যিনি যে ভাবে যখন তাঁকে দেখেছেন নিজের নিজের মনের দৃষ্টীতে তাঁর যে রূপ যখন তাঁদের কাছে যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে সেইটুকু যদি তাঁরা নিজের ভাবে ফুটিয়ে লেখেন তবে সেই খণ্ড পরিচয়গুলি একত্র হয়ে একটি সমগ্রতার রূপ নিতে পারে।

শ্বশুরমহাশয় যে ধাতের মানুষই হন না কেন তিনি যে সকল দিকে ষোলো আনা খাঁটি মানুষ ছিলেন, এতে কোনো ভুল নাই। তাঁর ঈশ্বরভক্তি ছিল খাঁটী, পিতৃ ভক্তি ছিল খাঁটী, ভাইদের ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ ছিল খাঁটি। স্বদেশপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ও জীবপ্রীতি ছিল তাঁর খাঁটি। দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণে অনুরাগ ছিল খাঁটি। কাব্যে প্রীতি ও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ ছিল খাঁটী। ভাষার এলোমেলো আলগা ব্যবহার সইতে পারতেন না একটুও।

তিনি সেজেগুজে বসে বাইরের ঠাট বজায় রাখতে জানতেন না আদৌ। সাজিয়ে কথা বলতে পারতেন না একটিও, তাই ঠকত না কেউ তাঁর কথায় ও কাজে কখনো।

তাঁর প্রকৃতির একটী বৈশিষ্ট্য ছিল ধ্যানপরায়ণতা। যেন সহজাত সংস্কারের মতো ধ্যানের অভ্যাসটি ছিল তাঁর আয়ত্তীভূত—এটি অনন্যসাধারণ। অতি সহজে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। অন্তরে তিনি ধ্যানী মানুষ কিন্তু বাহিরের কথা, কাজ ও ভাব ছিল ছেলেমানুষের বাড়া। আবদারে ছেলেমানুষের প্রতিমূর্ত্তি, অসহিষ্ণুতার অবতার বললে তাঁকে অত্যুক্তি হয় না। যখন যে জিনিষ চাই সেই মুহূর্ত্তে সেটী না পেলে বাড়ীর কারো রক্ষা ছিল না, হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলতেন তদ্দণ্ডে। শিশু প্রকৃতি শ্বশুর মহাশয়ের শখ ছিল সামান্য, তাই চাওয়াও ছিল তাঁর যৎসামান্য। খাতা-কাগজ, কলম-পেন্সিল, খানকতক তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, কাগজের বাক্স তৈরীর জন্য রাশখানেক ব্রাউন পেপার। এই ছিল তাঁর চাওয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তাঁর দিনযাত্রার এরাই ছিল সঙ্গী।

জ্যামিতির অনুশীলন ছিল তাঁর মস্তিষ্ক খাটানোর একটি দৈনন্দিন কাজ। জ্যামিতির মাপ ও হিসাব অনুসারেই তিনি বাক্স তৈরীর কাগজগুলি ভাঁজ করতেন। সুতরাং বাক্স তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্যামিতির অনুশীলন করাও হ'ত। জ্যামিতির হিসাব জড়িত থাকত ব'লেই সহজে কেউ বাক্স তৈরী শিখে উঠতে পারত না। জিওমেট্রির নামানুসারে তিনি বাক্স তৈরী কাজের নাম রেখেছিলেন "বক্সোমেট্রি"। এই ছিল তাঁর শখের একটা ব্যাপার। আর একটি শখ ছিল বাংলায় সাঙ্কেতিক অক্ষর (শর্টহ্যাণ্ড) সৃষ্টি করা। এই কাজের সূত্রে তিনি ছড়ার মতো যে সব কবিতা লিখে গেছেন সেগুলি বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। নমুনাস্বরূপ ল বর্ণের দুই ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

শিল্লীবধূ ফুলকুমারী
আলতা পরি পায়
কল্কা পেড়ে হলদে সাড়ী
বাগিয়ে পরে গায়
যেই শুনিল পাল্কী এল
অমনি তাড়াতাড়ি
ভেল্কিবাজী দেখতে গেল
বেলফুলের বাড়ী।

ছড়ার আকারের সেই কবিতাগুলি তিনি যে কত বার কত রকমে পরিবর্ত্তন করেছেন, বলে শেষ করা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর এই শখ মেটে নি। তিনি রেখাক্ষর সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। ভবিষ্যতে সেগুলি হয়ত কাজে হঠাৎ হুলস্থুল হাঙ্গামা, চেঁচামেচি, গোলমালের শব্দ শোনা গেল। চাকররা ছুটোছুটি করছে, শ্বশুরমহাশয়ের চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। তলব এল আমার কাছে, বাবামশায় ডাকছেন, শীঘ্র আসুন, তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালুম সামনে।

চার পুরুষ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ও প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাগাতেও পারে যদি কেউ বাংলায় সাঙ্কেতিক অক্ষরের প্রচলন ও উন্নতি করতে চান।

শ্বশুরমহাশয়ের বালকোচিত স্বভাবের বহুল দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এখানে দু'একটির উল্লেখ করি। দেখেই বললেন, চাকরদের কাণ্ড দেখ বৌমা, আমার জিনিসপত্তর কিছুই গুছিয়ে রাখবে না, সামলাবে না কোনো কিছু, কেবল উপরের দিকে চোখ তুলে শিব-নেত্র হয়ে ঘুম লাগাবে। টেবিলে হাত ঠুকছেন আর

বলছেন, আমার চশমাটা কোথায় গেল হাতড়ে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, বল তো এখন আমি কি করি, কি করে লিখি, কি ক'রে পড়ি, চশমা নইলে আমার এক দণ্ড চলবে না। চাকরদের কাণ্ড—দামী চশমাটা আমার হারিয়ে ফেলল, খোঁজ তো তুমি এক বার, যদি পাও। কাগজপত্তর খাতা ইত্যাদি উল্টে পাল্টে অনেক খোঁজা গেল; কোথাও চশমা নেই। শেষে বাবামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, চশমা তাঁর চোখেই লাগানো রয়েছে। সেদিকে কারো নজর পড়ে নি এতক্ষণ, তাঁরও সেটা খেয়াল ছিল না। মাথা হেঁট করে বললুম, বাবামশায়, চশমা আপনি চোখেই পরে আছেন। তাই নাকি! ব'লে হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক জায়গায় রয়েছে দেখে উচ্চৈঃস্বরে হাসি আরম্ভ করলেন। হাসির চোটে ঘণ্টাব্যাপী চেঁচামেচির ঝাঁজ মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত গেল উবে। খুশির হাল্কা হাওয়ায় ঘর উঠল ভরে। বল্‌লেন, আচ্ছা যা হোক! তোমাকে ব্যস্ত করে তুললুম; যাও সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ গে। যাই হোক, তুমিই ত শেষ পর্য্যন্ত চশমাটা খুঁজে বার কর্‌লে—ব'লেই আবার হাসি।

ভোরে স্নান করা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। জ্বর হয়েছে আগের দিন তাপযন্ত্রে উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী উঠেছে। সকলেই ব্যস্ত, বাবামশাই নিশ্চিন্ত, কবিতা আওড়াচ্ছেন, আমাকে ধরে বসিয়ে কবিতা লেখাচ্ছেন বেপরোয়া -ভাবে। ভোরের সময় স্নানটা সামলাতে হবে, সকলের সেই দিকে চিন্তা, নিষেধ করা চলবে না, তা'হলে জিদ বাড়বে। রাতে চাকরকে বলে রাখা হ'ল, দেখিস যদি ভোরে স্নানের জন্য উদ্যোগী হন, তাড়াতাড়ি খবর দিস, এসে পড়ে যদি থামান যায়, চেষ্টা করা যাবে। যথা সময়ে স্নানে উঠছেন, গতিক বুঝে তাড়াতাড়ি চাকর এল লুকিয়ে খবর দিতে। মানুষের সাড়া পেয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে জলভরা প্রকাণ্ড বড় একটি টবের মধ্যে ঝুপ করে গিয়ে ব'সে পড়লেন বাবামশায়, পাছে লোক এসে স্নানের বিঘ্ন ঘটায় ভেবে। স্নানশেষে কম্বল মুড়ি দিয়ে অভ্যস্ত নিয়মে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসলেন যেন অসুখের চিহ্নমাত্র নেই শরীরে, এমনিতর ভাবখানা। আমাদের মুখের ভীত ও চিন্তিত ভাব দেখে বললেন, রোগের জন্যে ভাবো কেন, আমি নিজের চিকিৎসা নিজে খুব ভাল জানি। বদ্যি ডেকে নাড়ী টেপাবার কোন দরকার নেই। ঔষধপথ্য সব আমার নিজের মতে চলবে। যাও খিচুড়ি তৈরি কর গিয়ে। চায়ের পেয়ালা বসাবার এক নূতনতর কা... ছিল বাবামশায়ের—এক খণ্ড কাঠের মাঝখানটা ... করে তাতেই পেয়ালা বসানো থাকত। পিরীচের উপ... পেয়ালা রেখে চা খেতেন না কোনো দিন। ভালে... লাগার এই সব নূতনত্ব ছিল তাঁর সকল ব্যাপারে। ভোরে... বেলা বেড়াবার সময় পা ফেলতেন সংখ্যা গুণে। সে... সময় সামনে গিয়ে কেউ কোনো কথা ব'লে সংখ্যা গণ... বাধা ঘটালে চটেমটে ব'লে উঠতেন, জ্বালালে দেখছি, আবার গোড়া থেকে গুণতে হবে। কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের, এ সময় আসিস্ কেন?

দু-বেলা খাবার সময় একটা না একটা গোলযো... লেগেই থাকত। কখন কি খুঁৎ বেরোয়, ভয়ে সকলে... তটস্থ থাকতে হ'ত। মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে গরম ম... গন্ধ পেলেই হুলস্থূল—কোথা থেকে কতকগুলো মাথা-মু... মোচার ঘণ্টে ঢুকিয়েছ। কিচ্ছু জান না কি করে রাঁধ... হয়। লেখাপড়া শিখেছ সব মাথা আর মুণ্ডু। আমা... ঠাকুরমা দিদিমা কি রকম মোচার ঘণ্ট রেঁধে খাইয়েছে... তেমনটি আর খেলুম না। তোমরা তেমন চ... কখনো দেখ নি।

বৈকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়ে... লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বললেন, এ কি লুচি, ঘি চপ... করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত সুদ্ধ নষ্ট হ'ল ... লেগে। লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে ব... যাও জল দিয়ে লুচি ভেজে আনো। ঘি দিয়ে বুঝি আ... লুচি ভাজে। লুচির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরের বা... এসে চাকরকে ঘি দিয়ে লুচি না বেলে দুটী শুকনো ম... দিয়ে বেলে লুচি ভেজে আনতে বলা হ'ল। চাকর ... নিয়ে এল লুচি। এবার ঠিক হয়েছে দেখা গেল। লু... গায়ে ঘি লেগে নেই একটুও। লুচি দেখে বাবাম... খুব খুশী, বললেন, এই তো ঠিক হয়েছে, দেখলে জল দি... ভেজে কেমন হ'ল। খাওয়ার শেষে আস্তে আ... বলতে হ'ল ফুটন্ত গরম জলে কাঁচা ময়দা বেলে ছেড়ে দি...

ময়দার কাই হয়ে যাবে, লুচি হবে না। ঘিয়েতেই লুচি ভেজে এনেছে সামান্ত একটু রকমফের ক'রে। বাবামশায়ের তখন হুঁস হ'ল, বললেন, তাই তো, গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কাণ্ড আমার, কি বলতে কি বলি, তোমাদিকে জ্বালিয়ে মারি। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর—ব'লেই সেই পাড়া-জাগানো হাসি আবার সুরু হ'ল।

এই ভাবের শ্বশুর নিয়ে সংসার করতে হয়েছে আমাদিকে। আত্মভোলা-মানুষের মর্ম্মকথা বোঝা গিয়েছে এই সব মানুষের সংস্পর্শে এসে। একটা বিষয়ে নিবিড় তন্ময়তা অন্য পাঁচটা বিষয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখত বাবামহাশয়কে সকল সময়। ধ্যানপরায়ণ চিত্তের এটি বাহ্য লক্ষণ বলা যেতে পারে। লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ঐকান্তিকতাতেও এরূপ ঘটে থাকে। সূক্ষ্মতত্ত্ববিচারে তাঁর মন কখনও অসতর্ক হ'ত না। নিখুঁতভাবে তিনি তত্ত্বনির্ণয়ে পারদর্শী ছিলেন। আশ্চর্য্য তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। যে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গে থেকেছে, মিলেছে সে এ কথার সত্যতা জানে।

এই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত পত্নীবিয়োগে কি নিদারুণ মর্ম্মব্যথা পেয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর রচিত দু একটি গানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়—

"গভীর বেদনা, অস্থির প্রাণ, করহে আমারে শান্তি দান"

গানটি তাঁর ঐ সময়ে রচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থের একটি সংস্করণে উক্ত গানটি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের ব'লে নির্দ্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গানটি পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের রচিত।

অসংসারী শ্বশুরের সংসারে সংসার করেছি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে। কর্ত্তৃত্বস্পৃহাশূন্য কর্ত্তার ঘরে বাস করেছি নিজের কর্ত্তা নিজে হোয়ে।

মৃত্যুর বছর দুই আগে তিনি নিয়ত ভগবৎ চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আলাপ করতেন কেবল ভগবৎবিষয়ে। দেহান্ত হয় তাঁর ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ। ঐ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, তিথি অমাবস্যা, কাল ৭-১৯-১৫ সেঃ মধ্যে অন্তরে তিনি একটি ঐশ্বরিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেন। যেন দেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল, আত্মা অনুভূত হলেন দেহ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে। সেইদিন জানলুম ঈশ্বরপরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, স্বভাব শিশু, বিষয়ভোলা, প্রকৃতির কোলঘ্যাঁসা একান্ত সরল মনের আশ্চর্য্য মানুষ বাবা মহাশয়

বাকী ফাঁকি

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জীবের তরেই জীবন মরণ
অ-জীবে সে বালাই নাই,
নিত্য তা'তে ভবের হাটে
জীবের যাওয়া-আসাই চাই।

লীলায় জীবন-মরণ খেলা
গড়ে কান্না হাসির মেলা
যদিন থাকি—"আমি"র মোহ
বাকী ফাঁকী উড়লে ছাই।

মরণ-কাশীর মুক্তি ছায়ায়
রঙ্গে জীবন-প্রবাহ ধায়;
কর্ম্মফলের তরঙ্গেতে
জীবের ডোবা ভাসা তাই।

মরণ-জয়ী মুণীন্দ্র কয়—
ভাবীর ভাবেই মরণ-বিজয়,
বিজয় চাঁদের আলোয় ভালোয়
ফাঁকীর পথ আজ দেখতে পাই।

ভারতীয় বিদ্যায় মহিলা ভারতী

শ্রীমতী নীহারিকা গঙ্গোপাধ্যায়

সব দেশের, সব জাতির ধর্ম্ম, সাধনা ও সভ্যতা এক একটি বিশিষ্ট রূপের বিশিষ্ট প্রকৃতির সাহিত্য গড়ে তোলে, যে সাহিত্য ঐ জাতির, বা দেশের বিশিষ্ট রূপ বা প্রতিমূর্ত্তি দর্পণে প্রতিফলিত রূপের মত সহজে আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা, নানা বিভিন্ন স্থানের প্রাচ্য জাতির নানা বিশিষ্ট সভ্যতার নিজস্ব ও স্বকীয় সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও অনুশীলন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই নানা প্রাচ্য দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠন ও অনুশীলনের এক একটী নামকরণ করিয়াছেন বিদেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, যথা, ঈজিপ্টের জাতীয় সাহিত্যের নাম 'ঈজিপ্টলজি' (লজি=জ্ঞান); আসিরিয়ার জাতীয় সাহিত্যের নাম আসিরিয়লজি; চীনের (সীন) জাতীয় সাহিত্যের নাম "সীনলজি" হিন্দুস্থান বা ভারতের বিশিষ্ট সাধনার সাহিত্য অনুশীলনের নাম "ইন্দলজি" ফরাসী পণ্ডিতেরা বলেন "ইন্দিয়ানিজম্"। সম্প্রতি মার্কিন পণ্ডিতেরা এই ভারতের ভারতীয় বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের নাম দিয়াছেন "ইন্দিকষ্টাডিস্।" অবশ্য ভারতের ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও শাস্ত্রবিদগণ, তাঁহাদের দেশের সভ্যতার নানা বিভাগের নানা বিপুল সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা ও অনুশীলন আবহমান কাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সত্য দৃষ্টির সঠিক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা ভারতীয় নানা বিদ্যার তত্ত্বানুসন্ধান, ও নিরপেক্ষ যুক্তির দৃষ্টিতে সঠিক তথ্যানুসন্ধান এবং তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সুসম্বদ্ধভাবে,—বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা যাচাই করিয়া উদ্ধার কার্য্য, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বিপুল পরিশ্রম ও

অনুশীলনের নাম "ভারতীয় বিদ্যা অনুসন্ধান বা ইন্দলজি।" এই ভারতীয় বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রথম পত্তন করেন দুই চার জন ইংরাজ, ফরাসী, ও জার্ম্মাণ পণ্ডিত। ভারতের ইতিহাস ও ভাষা তত্ত্বের আলোচনার প্রথম সূত্র-পাত করেন সর জর্জ্জ কণিংহাম। সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোচনার অগ্রদূত হইলেন সর উইলিয়ম জোন্স। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাধনার কথা লোকে ভুলিতে বসিয়াছিল। অশোক নামে যে একজন রাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট এদেশে রাজত্ব করিতেন, আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী একদিন তাহা সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়াছিল। কণিংহাম "অশোক" লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের তথা ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিলেন। অশোকের অনুশাসন পাঠের চাবি খুলিয়া দিয়া কণিংহাম্ বৌদ্ধ ও প্রাক-বৌদ্ধ সাধনার একটা পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টি ও ভারতের নানা সাধনার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অনুশীলনের রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে ভারতীয় সাধনার নানা বিকাশের তত্ত্বানুসন্ধান ক্রম পরম্পরা ও কাল নির্ণয় করণ বৈদেশিক পণ্ডিতগণের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যা বা "ইণ্ডলজির" প্রধান অবলম্বন ও শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও সত্যানুসন্ধানে নহে, শব্দ তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান বিভাগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদেশের পণ্ডিতেরা ভারতের নানা বহুমূল্য সাধনার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতের সাধনা ও জ্ঞানের এই বিভাগে জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা প্রথম পথ প্রদর্শক ও অগ্রণী। বিপুল বৈদিক সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে যদি কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পঠন ও অনুশীলন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ ভিন্ন আর কেহ নহে। অবশ্য বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্যে, ও পালী ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম প্রদর্শক হইলেন ফরাসী পণ্ডিত এমিল সেনার এবং পরে জর্ম্মণ পণ্ডিত অলদেনবার্গ। ভারতের প্রাচীন অক্ষর বিদ্যা ও লিপি বিদ্যার বৈজ্ঞানিক পথ প্রদর্শক হইলেন জর্জ্জ ব্যুলার, ভারতের পুরাতত্ত্বের ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের তথ্যাবিষ্কারক হইলেন দুইজন পণ্ডিত, কণিংহম্ ও ফর্গুসান। ফর্গুসানের লিখিত ভারতের স্থাপত্য বিদ্যার ইতিহাস অদ্যাপিও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া পঠিত হইতেছে। ভারতের নানা পুরাণ ও পৌরাণিক সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিলেন কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় মিঃ পর্জ্জিটর। পুরাণ যে ব্রাহ্মণদের লিখিত কাল্পনিক কাহিনী বা প্রবাদ মাত্র নহে, পরন্তু প্রত্যেক পুরাণে বহুমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পুরাণ হইতে বহুমূল্য ঐতিহাসিক ও অন্যান্য নানা তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে, পর্জ্জিটর সাহেব তাহা প্রথম প্রমাণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা প্রাচীন মুদ্রা ও তাহার উপর লিখিত নানা রাজার নাম ও সন ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্ধার করিলেন, কতিপয় মুদ্রাবিৎ পণ্ডিত; তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথ। ডাক্তার র‍্যাপ সন্ ও ডাক্তার গার্ডনারের নাম ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভারতের প্রাচীন শিলালিপি ও অক্ষর-লিপির ক্ষেত্রে একাধিক বিদেশী পণ্ডিত অনেক নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও রাজাদের রাজ্যকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য ইতিবৃত্ত উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্যুলার, হর্ণেল্ কীল্‌হর্ণ, ফ্লীট ও হুলট্‌স্‌কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালী ভাষা ও পালী সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক বিশেষজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত ভারতের সাধনার অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমিল সেনার ইউজেন বর্ণ্‌ফ্, ও গুস্তবার্থ লেয়ঁ ফীয়ের, লুইফিনো ও সিলভ্যঁ লেভীর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য*। বৌদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডাক্তার রীজ ডেভিদ্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুমূল্য দান করিয়াছেন। ভারতের ইস্‌লামীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ও একাধিক য়ুরোপীয় পণ্ডিত যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বহুমূল্য

---

* ভারতীয় বিদ্যায় ফরাসী পণ্ডিতগণের বিশিষ্ট দানের পরিচয় ৺সিলিভ্যঁ লেভী মহাশয় তাঁহার "ল্যান্দিয়ানিসিম্" নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তিকার বাঙ্গলা অনুবাদ স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় "প্রতিভা" পত্রিকায় (১৩২৬ সনের পৌষ সংখ্যা) "ফরাসী-দেশে ভাষাতত্ত্ব" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ব্লক্‌ম্যান, ডাউসন্, এবং হেনরি বেভারিজের নাম প্রসিদ্ধ। ভারতীয় সাধনার নানা বিভাগের অনুশীলন, গবেষণা ও আলোচনায় অসংখ্য জর্ম্মণ পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নাম উলেখ করাও এক প্রকার অসম্ভব। প্রায় এক্‌শত বৎসর ধরিয়া, অসংখ্য বিদেশী পণ্ডিত ভারতের সাধনা ধর্ম্ম, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষাতত্ব স্মৃতিশাস্ত্র সাহিত্য, অক্ষরতত্ব, অনুশাসন, লিপিতত্ব, পুরাতত্ত্ব শিল্পতত্ব, প্রভৃতি নানা বিভাগে গভীর গবেষণা ও সম্যক বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা একটা নূতন পদ্ধতির ভারতীয় সাধনার বৈজ্ঞানির বিদ্যার ("ইন্দলজি") একটা সুবিস্তৃত ও বিরাট সৌধ প্রস্তত করিয়াছেন। ক্রমশঃ, এই নূতন বিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকজন ভারতবাসী য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের পথ অনুসরণ করিয়া আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ভৌদাজী এবং স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তাহার পর, আধুনিক-কালে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ভারতীয় বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া, অনেক নূতন তত্বের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়া, প্রাচীন ভারতের সাধনার নানা বিভাগে নূতন জ্ঞানের আলোক সম্পাত করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে য়ুরোপের নানা বিদ্যার কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, এবং তাঁহাদের তত্বাবধানে বিজ্ঞান সম্মত পথে গবেষণার কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া নানা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। আধুনিক কালের ভারতীয় বিদ্যার ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী আইয়াঙ্গার, সর যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক, ৺রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রবোধকুমার বাগচী, ডাক্তার সুশীলকুমার দে, ডাক্তার রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার সুকৃথাঙ্কর, ডাক্তার লক্ষণ স্বরূপ, রায় বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত, ডাক্তার বেল্‌ভেল্‌কার, ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডাক্তার বি সি, লাহা, ডাক্তার নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আমার এই সুদীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের রাজ্যে বিদ্যা-অনুশীলন, আলোচনা, তত্বানুসন্ধান ও গবেষণার রাজ্যে, ভারতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিদুষী মহিলাদের কর্ত্তব্য আছে, এবং সহকর্ম্মিতার দায়িত্ব আছে। এই ভারতীয় সাধনার আলোচনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে, ইতিমধ্যে একাধিক য়ুরোপীয় মহিলা পথ দেখাইয়াছেন। ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ও তত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে মূল্যবান দানের দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি।

পালী ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, মিসেস কেরোলিনা রীজ দেভিড; মুসলমান ইতিহাসের ক্ষেত্রে মিসেস এনেট বেভারিজ; জৈন সাহিত্যের ক্ষেত্রে হেলেন জনষ্টন্ এবং মিসেস্ ষ্টিভেনসন; শ্যামের প্রাচীন সাহিত্যে মাদেমোয়াসেল সুজান্ কারপেলে; তিব্বতীয় সাহিত্যে মাদাম লালু বৃহত্তর ভারতের পুরাতত্বের ক্ষেত্রে, মাদাম্ জীন্ ল্যুবা এবং মাদাম্ শাপো মার্শাল; এবং ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ডাক্তার ষ্টেলা ক্রামরীস্ বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এই সব জ্ঞান বিজ্ঞান, তত্বানুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিদুষীরা বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। অনেক উজ্জল অরুন্ধতীর স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণ রস-সাহিত্যের ক্ষেত্র আলোকিত করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালের বিদুষী মহিলারা বেশীর ভাগ শিক্ষার আন্দোলন ও নারী-প্রগতির প্রচার কার্য্যেই সমধিক ব্যাপৃতা। বিদ্যাবতী ও উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্তা মহিলাদের অনেক সময় গ্রাসাচ্ছাদনের তাড়নায় স্কুল কলেজে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইতে হয়। কেবল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের পথে, ও সত্যের জন্যই সাধনার পথে গবেষণা ও নূতন তত্বের আবিষ্কারের সুযোগ ও প্রবৃত্তি তাঁহাদের প্রায় থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের আলোচনার জন্য সমস্ত

উপাদান, পুস্তকাদি উপকরণ সংগ্রহ ও যথেষ্ট সময় সুযোগ ও উপযোগী দীক্ষা লাভ করা ভারতীয় বিদুষী মহিলাদের পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হয়। এই জন্য, এই ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণ করা অনেক সময় মহিলাদের পক্ষে নানা কারণে দুরূহ ব্যাপার। তথাপি, ভারতীয় বিদ্যা ও সাধনার তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিদ্যাবতী মহিলা ইতি মধ্যেই বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজনের গবেষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) প্রথমেই নাম করিতে হয়, বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষের। ইনি স্বনাম ধন্যা ডাক্তার শকুন্তলা শাস্ত্রী, বেদতীর্থা এম্ এ ডি-লিট (অক্সফোর্ড)। ইনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক কৌমুদী-মহোৎসবের নূতন সংস্করণ ও অনুবাদ করিতেছেন। (২)। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ডাক্তার রমা বসু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। বিগত নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যার সঙ্গীতির ত্রিবান্দ্রামের অধিবেশনে "নিম্বার্কের ধর্ম্মমত" সম্বন্ধে তিনি একটী গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। (৩) ভারতের প্রাচীন ইতি-হাসের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ গবেষণা করিয়াছেন। দুইটী গবেষণা মূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান কালচার" পত্রিকার (অক্টোবর ১৯৩৮) সংখ্যায় তিনি সুঙ্গরাজাদের মুদ্রা আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে সুঙ্গরাজাদের এক শাখা পশ্চিম দেশে আধিপত্য করিতেন। (৪) পশ্চিম ভারতের একজন বিদুষী মহিলা, শ্রীমতী ধর্ম্ম, মূল রামায়ণ হইতে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব সঙ্কলিত করিয়া "ইণ্ডিয়ান কালচার" পত্রিকার (এপ্রিল ১৯৩৮) সংখ্যায় একটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটী কৃতবিদ্যা মহিলা শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন যথাঃ—"ভারশিব রাজবংশ সম্বন্ধে ডাক্তার জয়সওয়ালের মত ("ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রিকা এপ্রিল ১৯৩৫) "গুপ্ত ও বাকাটক রাজবংশ সম্বন্ধে ডাক্তার জয়সওয়ালের মত" (ইণ্ডিয়ান কলচার পত্রিকা, জুলাই, ১৯৩৫) গুপ্ত-বর্ষাব্দ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ (ইণ্ডিয়ান কলচার পত্রিকা" (জুলাই ১৯৩৬), কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেগণা করিয়া যিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তিনি একজন দক্ষিণ দেশের বিদুষী ব্রাহ্মণ মহিলা, তাঁহার নাম শ্রীমতী সি মিনাক্ষী পি-এইচ ডি। এম এ-ডিগ্রী লাভের পর ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসের গবেষণার বৃত্তি লাভ করিয়া পহ্লব রাজাদের সময় সামাজিক ও রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং এই পুস্তক মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পহ্লব রাজাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইনি নানা ঐতিহাসিক পত্রে নানা মৌলিক ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (জর্ণ্যল অফ ওরিয়্যাণ্টেল রিসার্চ, জর্ণাল মিথিক সোসাইটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি জর্ণ্যাল, নিউ-রিভিউ) বিগত প্রাচ্য বিদ্যার সঙ্গীতির ত্রিবন্দ্রাম্ সহরের অধিবেশনে তিনি পহ্লব রাজাদের সময়কার শিল্পকলা সম্বন্ধে একটী সচিত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মহীশূরের মহারাণীর মহিলা কলেজে (বাঙ্গালোর) ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপকের পদে ব্রতী হইয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে একাধিক বিদুষী মহিলা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসের নানা শাখায় গবেষণার কার্য করিতেছেন; সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তিনজনের নাম উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। ১। শ্রীমতী মৃণাল সেন-গুপ্ত এম্-এ। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ফার্ষ্ট ক্লাস বিভাগে এম্-এ পাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার বৃত্তি লাভ করেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তিন বৎসর, "ভক্তিবাদের প্রাচীন ভারতীয় মতবাদ ও তাহার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক পরিবেষ" সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯৩২ সালে তাঁহার গবেষণা মূলক নিবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "গ্রিফিথস্ মেমোরিয়াল পুরস্কার" প্রদান করেন। তাঁহার নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে

"ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়টার্লীতে" প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩০-৩২ সালের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) ২। শ্রীমতী সুনীলা গুহ, এম-এ। ইনি বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় পুরস্কার ও স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে (ফার্ষ্ট ক্লাস) উত্তির্ণ হইয়াছিলেন।

ইনি এই বৎসর হইতে বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বৃত্তি লাভ করিয়া ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বৈদিক সংস্কৃতি অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়ঃ—"গৃহ্য সূত্র ও গৃহ্য আচার ও অনুষ্ঠানাদি।" ৩। শ্রীমতী প্রভা সেন গুপ্ত এম্-এ। ইনিও বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তির্ণা হইয়াছিলেন। ইনিও ডাক্তার সুশীল কুমার দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে "অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রাক্-ধ্বনি পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। আশা করা যায়, এই সমস্ত বিদুষী মহিলা পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিদ্যার নানা বিভাগে, আমাদের জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত করিয়া দিবেন। কেবল মাত্র নিছক রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এবং শিক্ষকতার বিভাগে,—জ্ঞান সাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করা, এবং তা[illegible] অতি বিস্তৃত করিবার সুযোগ বড় থাকে না। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় যান্ত্রিক ভাবে মামুলী পথে চলিতে মানুষের মনিষার সম্যক্ প্রসারের সুযোগ হয়না। [illegible] বিজ্ঞানের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে গবেষণা দ্বারা নূতন [illegible] অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে ও নূতন সৌধ নির্ম্মাণে [illegible] মৌলিকতার আবশ্যক হয় ও নূতন চিন্তা শক্তির উদ্ভব [illegible] সাধারণতঃ বক্তৃতার মধ্যে ও সাধারণ মাসিক পত্রে [illegible] ও উপন্যাস রচনায় যে সস্তা খ্যাতি ও করতালি লাভ [illegible] যায় গবেষণা মূলক জ্ঞান অনুশীলন তাহার অনেক উ[illegible] অবস্থিত। বাঙ্গলার একাধিক মহিলা যে জ্ঞানের উ[illegible] প্রকোষ্ঠে উচ্চ আসন লাভ করিয়া মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে উপাস[illegible] অধিকার লাভ করিয়াছেন, বাঙ্গলার নারী-শিক্ষার ইতি[illegible] তাহা গর্ব্বের ও গৌরবের বস্তু।*

* এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহের জন্য একা[illegible] অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইয়াছি। এই আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

বিদ্যাসাগর বাণী ভবন ঝাড়গ্রাম শাখা

বিদ্যাসাগরের জেলায় মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নারী শিক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের শাখার উদ্বোধন, ১০ই ফাল্গুন হইয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণার মহামান্য স্যার জন হার্ব্বার্ট এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

প্রাতে 'লেডী রীড' গ্রন্থালয়ের সম্মুখের প্রাঙ্গনে বিশাল নাট মঞ্চ বৈদিক বিধানে প্রস্তুত হয়। বিস্তৃত প্রাঙ্গন ও যজ্ঞ ভূমি সুশ্রী শ্বেত আলিপনায় সুশোভিত ছিল। বরণ, পুষ্প, মাল্য, মঙ্গল, ফল, শ্রী ও অর্ঘ-পাত্র স্তরে স্তরে যথাক্রমে স্থাপিত হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতি মোহন সেন বেদ মন্ত্র ধ্বনিতে সমগ্র যজ্ঞভূমি পূরিত করিয়া [illegible] শ্রীমতী অমিয়া দেব ও শ্রীমতী সুরমা রায়ের নেতৃত্বে [illegible] গান দর্শকের হৃদয়ে অপার ভক্তি সঞ্চার করিয়া তু[illegible] ছিল।

লেডী অবলা বসু সহৃদয় বাণীর দ্বারা যখন গভর্ণ[illegible] এই হিন্দু বিধবাদের বেদনা জুড়াইবার আশ্রমের [illegible] জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, তখন সকলে অশ্রু [illegible] করিতে পারেন নাই।

সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু ঝাড়গ্রামের

কুমার নরসিংহ মল্ল দেবের বদান্যে ও মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিনয় রঞ্জন সেনের উদ্যোগে এই ভবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে জ্ঞাপন করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন।

রাজা সাহেব ও তদীয় ম্যানেজার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যে সকলেই মুগ্ধ, ৬৫ জন বিধবা রমণীর সাচ্ছন্দ বিহারে, উন্মুক্ত বায়ু সেবনে, তাহাদের প্রাণে আনন্দের ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে নারী শিক্ষা সমিতির পক্ষে মহারাণী সুচারু দেবী, রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, মিসেস্ এস আর দাস, শ্রীমতী মায়া বসু, শ্রীমতী সুনীতি সরকার, শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ, শ্রীমতী পূর্ণিমা বসাক শ্রীযুক্ত সুধাংশু মোহন বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ গুপ্ত ও ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

লাট পত্নী মাননীয়া লেডী মেরী হারবার্ট প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া আশ্রমিকাদের সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গনারীদের মনোভাব জ্ঞাত হইবার জন্য বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার প্রয়াস করিবেন। গভর্ণর বাহাদুর এই আশ্রমকে জয়যুক্ত করিবার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবর্ত্তন উৎসবে বঙ্গনারীর সম্মান

গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পাদিত হয়। চ্যান্সেলার সার জন হাবার্ট মহোদয় সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৮ সালের জন্য বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিকের জন্য "ভুবন মোহিনী" স্বর্ণ পদক শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমবার এই পদক শ্রীমতী মান কুমারী বসুকে প্রদান করা হইয়াছিল।

মহিলা গ্র্যাজুয়েট দ্বারা লিখিত উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা প্রবন্ধ জন্য 'মক্ষোদা সুন্দরী' স্বর্ণ পদক নীহার দাসগুপ্ত বি, এ (১৯৩৮) ও শরদিন্দু দেবী বিএ (১৯৩৯) কে প্রদত্ত হইল।

উষারাণী দত্ত বি, এ, 'নগেন্দ্র নন্দিনী' স্বর্ণ পদকটি পাইলেন। মহিলাদের মধ্যে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে 'কমলরাণী স্বর্ণ' পদক কমলা দেবী; ইংরাজীতে এম্, এর শ্রেষ্ঠ ছাত্রী মনীষা সেন 'উনিভার্সিটি স্বর্ণ পদক'; দর্শন শাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্ব উচ্চস্থানের জন্য সুবিনীতা ঘোষ বি, এ, 'গঙ্গামনী দেবী' পদক অশুতোষ কলেজের প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় বি,এ, 'পদ্মাবতী' স্বর্ণ পদক পাইলেন; ভিক্টোরিয়া দীপ্তি মিত্র বি, এ ও মনীষা বসু বি, এ, 'নগেন্দ্র' স্বর্ণ পদক ও 'সুজতা' স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

এবৎসর 'যোগমায়া' পদক সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহিলা গ্রাজুয়েট লারেটো স্কুলের নির্ম্মলা দে বি, টি, কে প্রদত্ত হইল।

বি, এস্, সি, তে বিদ্যাসাগর কলেজের রাণী বন্দোপাধ্যায় 'বাসন্তী দাস' পদক পাইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য জগৎতারিণী স্বর্ণ পদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বর্ত্তমান বৎসরে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমতী বিশালাক্ষ্মী মল

মাদ্রাজের গভর্ণার সমাজ সেবার জন্য শ্রীমতী বিশালক্ষ্মী মলকে কাইজার হিন্দ্ পদক দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

কেন্দ্র সমিতির কথা

বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্য

আরা মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বিহারের অন্তর্গত আরা জিলায় একটী মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। বিহারের গভর্ণর পত্নী মাননীয়া লেডী ষ্টুয়ার্ট প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুত সুধীর লাল সরকার সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের কতিপয় শিল্প দ্রব্য লইয়া তথায় যান। মাননীয়া লেডী ষ্টুয়ার্ট সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের ষ্টলটী বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করেন এবং শ্রীযুত সরকারের কাছে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তিনি মন্তব্য করেন যে এইরূপ সমিতি প্রকৃতই প্রশংসার্হ।

৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মহিলাদের একটী সভায় শ্রীযুত সরকার ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন সহযোগে মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য ও দেশের উন্নতি সাধনে মহিলাদের স্থান সম্বন্ধে বাঙ্গালায় একটী বক্তৃতা দেন। স্থানীয় হেল্‌থ অফিসার হিন্দীতে আবার তাহা বুঝাইয়া দেন।

বালিচক প্রদর্শনী :—

ফেব্রুয়ারী মাসেই অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী বালিচক প্রদর্শনীতে গমন করেন। প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় একটী শিশুস্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে পণ্ডিত শাস্ত্রী ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যবলীও বর্ণনা করেন।

জামালপুর মহিলা সমিতি—

জামালপুর শিল্প প্রদর্শনীর শিল্প দ্রব্যাদি বিচার করিবার জন্য আহূত হইয়া সরোজনলিনী শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যা মিস্ হেমনলিনী মল্লিক ও মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ তথায় যান। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় মহিলাদের একটি সভা হয়, সেই সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলা সমিমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ফলে তথায় একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। ঐ সভায়ই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা প্রভৃতি নির্ব্বাচিতা হন।

শ্যামনগর মহিলা সমিতি :—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত শ্যামনগর মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্তা সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী (মিসেস্ এ, সি, চ্যাটার্জ্জী) এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার, উপকারিতা ও নানাবিধ কুটির শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র সমিতি হইতে মিস্ হেমনলিনী মল্লিক ও প্যারীমোহন দে তথায় গমন করেন।

সীতারামপুর স্বাস্থ্য প্রদর্শনী (আসানসোল) :—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্র সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ও শ্রীযুত সুধীরলাল সরকার তথায় গমন করেন। ঐ দিন প্রদর্শনীর মহিলা দিবস পালিত হয়। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় একটি মহিলা সভার অধিবেশন হয়, শ্রীযুত ঘোষ প্রদর্শনীর উপকারিতা ও মহিলাসমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত সরকার অতঃপর

ছায়াচিত্রযোগে জাতির স্বাস্থ্য উন্নয়নে মহিলাদের স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শিউড়ী প্রদর্শনী ঃ—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত শিউড়ী কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষে কেন্দ্র সমিতি হইতে প্রচারক শ্রীযুত সুধীরলাল সরকার কেন্দ্র সমিতি হইতে কিছু শিল্প দ্রব্য লইয়া তথায় যান। স্থানীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ কেন্দ্র সমিতির শিল্প দ্রব্যাদি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত সরকার স্থানীয় দীননাথ দাস-হলে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

দ্বিজেন্দ্র নাথের বহুমুখী প্রতিভা

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বিগত শতাব্দীর তৃতীয়াংশ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নানা প্রতিভায় সমুজ্জল হইয়াছিল। রবীন্দ্র নাথের নব নব উদ্ভাসিত প্রতিভার খরোজ্জল রশ্মির প্রভাবে সাহিত্যে, দর্শনে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, সুকুমার কলায়, সঙ্গীতে, স্বাদেশিকতায় দ্বিজেন্দ্র নাথের সৃজন শক্তি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও তাঁহার মূল্যবান দানে বঙ্গদেশ মহীয়ান ও গরীয়ান।

একদিকে দ্বিজেন্দ্র নাথ যেমন বিজ্ঞ, ভগবৎতত্ত্ব অনুসন্ধানী চিন্তাশীল ছিলেন, তেমনি তিনি সৌজন্য ও সারল্যের অবতার। দ্বিজেন্দ্র নাথের শতবার্ষিক জন্মোৎসব কালে তাঁহার অবদানের ও প্রতিভার কথা স্মরণ করিলে এবং তাহাদের সহিত পরিচয় লাভ করিলে বাঙ্গালার নর-নারী মাত্রই ধন্য ও পবিত্র হইবেন।

দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সাহিত্য পুরিপুষ্টির জন্য যে সমস্ত প্রকরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদিন বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী থাকিবে ততদিন বাংলা দেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে। আজকালকার চাঞ্চল্যের যুগে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সর্ব্বকাল-উপযোগী তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

সেই জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী আদি প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব সম্পাদনের আয়োজন করিয়া দেশের ও দশের পরম উপকার করিতেছেন।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার জন্ম হয়। দীর্ঘ ৮৬ বৎসর মানব জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৩৩২ সালে পৌষ মাসে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

এই পুন্য মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবন যাত্রায় ধারা কয়েকটি আলোচনা করিলে, এই ঋষির বহুমুখী প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ হইতে পারে।

শিক্ষাব্রতী দ্বিজেন্দ্রনাথ

কঠিন কঠিন ব্রহ্মতত্ত্ব ও দার্শনিক গুহ্য রহস্য ভেদ করিতে করিতেও দ্বিজেন্দ্র নাথ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আত্ম নিয়োগ করিতেন। সর্ব্ব সাধারণের নরনারীকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে যে জাতির ও দেশের উন্নতি হইবে না তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই স্বয়ং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান করিতেন।

১৭৯৫ শকের ২৫শে মাঘ তদীয় ভ্রাতা জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত পত্রে তাহার শিক্ষাদান ব্রতর কথা জানা যায়।

"জ্যোতি—

স্কুলের বালকেরা টেঁকিতে পারিল না, আমি দুইপ্রহর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এবং পণ্ডিত সকাল বেলায় তাহাদিগকে পড়াইতেছি—ছেন। তাহাদের স্কুল অপেক্ষা ভাল পড়া হইতেছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ শর্ম্মণ"

এই সময়কার স্বর্গীয় গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে আর একখানি লিখিত পত্র হইতে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মেলার প্রতি মমতার কথা জানিতে পারা যায়।

"বালকদিগকে আমি সে প্রণালীতে পড়াইতেছি তাহাতে যদি জমিদারী কাছারির কার্য্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়, তথাপি সেই অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত পড়াইতেছি। কিন্তু তাহাদের পড়াইয়াও এত সময় থাকে যে জমিদারী কার্য্যের বিশেষ কোন ত্রুটী হইতে পারে না। এখানে তোমরা যখন আসিবে তখন প্রত্যক্ষ দেখিবে। দেখিয়া যদি তোমাদের মনোনীত না হয়, তবে তোমরা যে রূপ বলিবে তাহাই করিব। পরম পূজনীয় কর্ত্তা মহাশয়কেও (তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে) লিখিয়াছি তিনি কি আদেশ করেন তাহারও প্রতীক্ষা করিতেছি! সে দিন বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কুল বিষয় কথোপকথন করাতে তিনি আমার শিক্ষা প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ বিষয়, গুনু, চিন্তিত হইও না। শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া তোমার যদি হৃদবোধ না হয় তবে আমি, যাহা বলিবে তাহাই করিব।

মেলা পরিপাটীরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে। রস্তমজীর বাগানে হইয়াছিল। প্রবেশের টীকিট ॥০ ধার্য্য হইয়াছিল। লোক সমারোহ যেমন তেমনি—তবে কিছু কম হইয়াছিল।

জ্যোতির নাটক কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছি। আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গাম।

All right here. Billiard খেলিবার অবকাশ হয় না, কি করি।

Never mind.

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ শর্ম্মণ"

সঙ্গীত রসজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রনাথ

পরম দার্শনিক দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীত রসজ্ঞও ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার পারদর্শিতা বেশ ছিল। অনেকগুলি সরস সঙ্গীত রচনাও করেছেন। তাঁহার গান শুনিবার আকাঙ্খা শেষ বয়স পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হায়! বিষ্ণু নাই—কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।"

রায়পুরের রবীন্দ্রনাথ সিংহের শ্যামা সঙ্গীত তিনি একান্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন এবং ভগবানের মহিমার ভাবে অভিভূত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন। শান্তিনিকেতন মন্দিরের গায়ক শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে অনেকদিন সন্ধ্যায় ডেকে এনে গান করাতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে বাঁশী বাজাইতেন, তাহার সংবাদ তাঁরই একখানি পুরাতন চিঠিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "বিশ্বাসকে (মহর্ষির দেওয়ান প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস) একটী 'ডি'-মার্কাওয়ালা বাঁশী পাঠাইতে পুনঃপুনঃ লিখিয়াছি তাহা বিশ্বাস এখনও পাঠায় নাই। তদ্বিরহে আমি অধীর হইয়াছি। বাঁশীটি যাহাতে শীঘ্র পাই, তাহা করিতে পার? তাহা করিয়া আমাকে বাঁচাও, আর অধিক কি বলিব।"

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মোহন মুরলী ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই বাঁশী বাজাইবার আগ্রহ এত প্রবল তাঁর চিত্তে ছিল। বাঁশী বাজান তাঁহার যে এক সাধনা ছিল—তাহা ১৩৩২ সালের 'ভারতী' পত্রিকার মাঘ মাসের

দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"জানলার ফাঁকে কোনদিন দেখা যেত জ্যাঠামশায় বই লিখছেন, নয়তো গান রচনা করছেন—কিম্বা কালো রংএর একটা বাঁশী বাজাচ্ছেন।"

স্নেহশীল দ্বিজেন্দ্রনাথ

তিনি স্বজনের প্রতি যেমন স্নেহশীল ছিলেন, তেমনই পরিচারক, আশ্রিত এবং পশু পক্ষিদের প্রতি স্নেহবান ছিলেন। চড়ুই পাখী, কাঠ বিড়াল তাঁহার অঙ্গে নির্ভয়ে বিচরণ করিত।

তাঁহাকে যাহারা সেবা করিতেন তাহাদের নিকট এত নিচু হইয়া থাকিতেন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন তাহা যেন পঞ্চ বর্ষীয় বালকের ন্যায় সরল ও নির্ম্মলভাবে পূর্ণ।

শেষ বয়সে যখন তিনি একবারে অন্ধ হইয়া যান, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদিকা) তাঁহার নিকট সদাই থাকিতেন, তাঁহাকে স্নান করান, খাওয়ান ও শয়ন করান সমস্ত ভার হেমলতা দেবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাত তরকারি দিয়া মাখিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইত। হেমলতা দেবীর এই আন্তরিক যত্নে তিনি যে কত মুগ্ধ তাহা সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ করিতেন। একদা তিনি তাঁর মনের ভাব একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"বৌমা থাকেন কাছের গোড়ায়
যতনে তাঁহার পরাণ জুড়ায়
সুখের সুখিনী, দুঃখের দুখিনী
এখন আমার, তিনি একাকিনী"

(ভারতী, মাঘ ১৩৩২, পৃঃ ৭১০)

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা পাঠে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহার পরিবারের কত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায়।

ওঁ

কমলালয়, বালিগঞ্জ ২০শে

ভাইবোঠান, কাল রাঁচি থেকে ফিরে এসে একটু পরেই যোড়াসাঁকো থেকে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁর অসুখের কোন আভাস পাই নাই।

* * *

এক সময়ে ত সকলের যেতে হবে জানাই আছে, আর যত বয়স হয় দেখে শুনে সে সত্য মনে ক্রমেই বসে যায়। যে কোন দেশেই তাঁকে দীর্ঘজীবী বলবে—এ দেশেতে ত নিশ্চয়ই। তাই যত কম ভুগে ও ভুগিয়ে যেতে পারা যায় ততই ভাল। ইন্দ্রিয় শক্তি কিছু কিছু ক্ষয় হলেও মোটের উপর যে তিনি জ্ঞান, জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য স্ফূর্ত্তি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছিলেন, সেটা সকলেরই সৌভাগ্য।

তুমিও যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর যথোচিত সেবা করতে পেরেছ সেটা তোমার এক মস্ত সান্ত্বনা। তাঁর শত আবদার ও হাসিমুখে সহ্য করে আপনার কর্ত্তব্য পালন করেছ, তাঁকে ছেড়ে দুদিনের জন্যও কোথায়ও গিয়ে সুস্থির হতে পারনি; এতদিনে তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ ছুটি দিয়ে চলে গেলেন। তবুও দিন কতক তোমার খুবই খালি খালি লাগবে, যেন সংসারে আর কোন কাজ নাই।

* * *

স্নেহের—বিবি

সরসিক দ্বিজেন্দ্রনাথ

গভীরতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল দ্বিজেন্দ্রনাথ যে রসরসিক চূড়ামণি ছিলেন তাহা তাঁর অনেক সরস রচনাবলীতে দেখা যায়। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ তাঁর জীবনের আদর্শ। ভগবানের শক্তি যার নিকট প্রকাশিত তাঁর চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই মহাত্মাই, সরল সদানন্দ পুরুষ। শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতী মোহন সেনের উদ্দেশে যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সরস লেখার পরিচয়।

ক্ষিতীমোহন, প্রিয়দর্শন ভুঁড়িদর্শন হে
(তব) অঙ্কুশ কর চালিত কর চালিত কর্ হে
নেংটি ইঁদুর পরিবেষ্টিত (তব) আসনতল হে"

সন্তরণপটু দ্বিজেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রনাথ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কেবল নহেন, তিনি সাঁতারু দ্বিজেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের সন্তরণ নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। বরাহনগরের বাগানে বাসকালে তিনি গঙ্গা অবলীলাক্রমে সাঁতার দিয়া পারাপার হইতেন। তখনকার গঙ্গা সেই স্থানে বর্ত্তমান পরিসর অপেক্ষা অনেক অধিক প্রশস্ত ছিল।

এলাহাবাদে অবস্থান সময়ে তিনি তাঁহার বার্দ্ধক্য কালেতে যমুনা নদীও স্বল্পায়াসে সাঁতার দিয়া পার হইতেন। একথা দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজের হাতে ১৭৯৪ শকের ১২ই ফাল্গুন তারিখে লেখা একখানি প্রাচীন পত্রতে আছে—"সাঁতার দিয়া যমুনা নদী এপার ওপার হইয়াছি।"

প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতে শোনা গিয়াছে যে দ্বিজেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণের প্রকাণ্ড পুষ্করিণীতে জলের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দুই হাতে পিছু দিকে জল ঠেলিয়া বসে বসে পুকুর এপার ও ওপার সাঁতার দিতেন। এখনকার দিনে এমন অপরূপ সাঁতারুর পরিচয় ও ছবি হয়ত দেশ বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, দেশময় হৈ হৈ পড়িয়া যাইত।

স্বমতপ্রতিবাদ-সহনশীল দ্বিজেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বমত অতি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মতের প্রতিবাদ যখনই ঠিক বলিয়া বুঝিতেন তখনি তাহা গ্রহণ করিতেন, এমন কি তাহা যদি প্রথমে গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতে আদৌ বিলম্ব করিতেন না।

একদিন এক বিশিষ্ট সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন—তাহার আলোচনায় অনেক মনিষী যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তখন তরুণ। তিনি তখন এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের তাহা মনঃপুত না হওয়াতে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরদিন প্রাতেই হীরেন্দ্রবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হীরেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু সেইদিন হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া জড়বাদের জনকলরবের মধ্যে পরম দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ অসীমের মহিমার সন্ধান দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধ্বনি এখনও কর্ণবিবরে প্রতিধ্বনি করিতেছে এবং সেই সৌম্য মূর্ত্তি এখনও চক্ষে ভাসিতেছে। তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া কলিকাতার টাউনহলে দ্বিতলে সভাগৃহে লইয়া যাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আজও সেই স্মৃতি চিত্তকে আনন্দ দিতেছে।

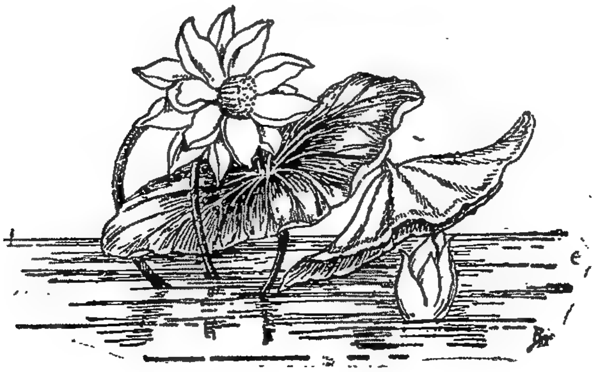

সাময়িকী

বঙ্কিম ভবন—গত ২৬শে ফাল্গুন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়া গ্রামে "বঙ্কিম ভবন"এর প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভায় পৌরহিত্য করেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়। সাহিত্য পরিষদের তরফ হইতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের বসত বাটীর ¾ অংশ সাহিত্য পরিষদের আয়ত্বে আসিয়াছিল। বাকি ¼ অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদকে দান করিয়াছেন। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্মৃতিরক্ষার এই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইলেন।

এতৎ সম্পর্কে মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস ভবনের কথা। সময়ে সজাগ হইলে দেশবাসী তাঁহারও বাসভবনটিকে স্মৃতি মন্দিরে পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু এভাবে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষিত না হইলেও পরিষৎ বিদ্যাসাগরের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিতেছেন, ইহা শুনিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—গত ২রা মার্চ্চ, ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠীত হইয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাবান বাঙ্গালীর জীবনকাল মাত্র ত্রিশ বৎসর। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনি যে বিপুল কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺কালী প্রসন্নের একখানি ক্ষুদ্র জীবনকাহিনী (মাত্র ৬৪ পাতার, মূল্য চারি আনা।) এই উপলক্ষ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকটির প্রত্যেকটি পাতা ৺কালী প্রসন্নের বিস্ময়কর জীবন কথায় সমুজ্জ্বল। পুস্তিকাটিতে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু কালীপ্রসন্নের বিশদ জীবনীও বাঙ্গলার পাঠকদের পাঠ করা উচিৎ।

মনস্বী কালীপ্রসন্ন কতগুলি কার্য্যে জড়িত ছিলেন ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তক হইতে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল—বিদ্যোৎসাহিনী সভা, রঙ্গমঞ্চ, সাময়িক পত্র পরিচালন, পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা। বদান্যতা সম্বন্ধে—শিক্ষা বিষয়ে দান, সাহিত্যের জন্য দান, সংবাদ পত্রাদির জন্য দান, দুর্ভিক্ষে দান, জনহিতকর কার্য্যে দান, সমাজ সংস্কারে দান।

ব্রজেন্দ্রবাবুর "বিচারক কালীপ্রসন্ন" প্রবাসী, চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। উহা সকলের পাঠ করিয়া দেখা উচিৎ।

কে বলে উপকথা ?

১৯৩৮ সালের ২২শে মে তারিখের 'স্টেটইটস্‌ম্যান্'-এ 'ট্যাটলার' ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক "চা—দেবতার বর" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে চা বিলেতে গিয়ে প্রথম কি ভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছিলো তাই বর্ণনা করে' লেখক বল্‌ছেন :

"তখন লোকে জান্‌তো যে চা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, অবসাদ দূর করে, যকৃৎ পরিষ্কার করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, জর আরোগ্য করে এবং ক্ষয়রোগে ওষুধের কাজ করে। একজন তো সুখ্যাতি করে' লিখেই ফেলেছিলো : চা রোগীকে তা'র অসুখের কথা ভুলিয়ে দেয়। রোগীর হৃদয়ে চা ফুর্তি আনে কিন্তু মস্তিষ্ক বিকল করে না ; চা বুড়োদের পায়ে আর ছোকরাদের মস্তিষ্কে বল দেয় ; মদ্যপের মাথা ঠাণ্ডা করে আর অতিশয় ঠাণ্ডা মাথা ছাত্রের মস্তিষ্কে উষ্ণতা সঞ্চার করে ; রুগ্ন লোককে আরাম দেয় আর স্বাস্থ্যবান্ লোককে শক্তি দেয়। খাইয়ে লোকেরা চা খায় ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য ; ফুর্তিবাজ লোকেরা খায় মদের নেশা কাটাবার জন্য ; পেটুকরা খায় পেটের অসুখের ওষুধ হিসেবে ; রাজনৈতিকেরা খায় মাথাঘোরা সারাতে ; রসিকেরা বিষন্নভাব কাটাতে আর বাবুরা তাঁদের চেহারা ভালো করবার জন্য। যাঁরা সাদাসিধেভাবে চলেন তাদের পক্ষে চা খাওয়াটা একটা প্রকাণ্ড আনন্দ, আর যাঁরা বিলাসী লোক তাঁদের পক্ষে একটা মহা তৃপ্তি। চা হচ্ছে কাজের লোকের সফলতার উপায়, আর অলস লোকের নির্দ্দোষ আনন্দ।"

'ট্যাটলার'-এর মতে আর কোনো পানীয়ই কোনোদিন এমন উচ্ছ্বসিত, এমন অসাধারণ প্রশংসা লাভ কর্‌তে পারে নি।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Good House keeping Institute-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী ক্যাথারিন্ ফিশার্ চা পানের বহুমুখী আনন্দ সম্বন্ধে "Good House keeping" পত্রিকায় লিখ্‌ছেন :

"চা পানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু শতাব্দীর লোভনীয় স্মৃতি। বহু শত বৎসর আগে চীনেরাই প্রথম চা খাওয়া সুরু করে। সে সব এত পুরোণো দিনের কথা যে চায়ের গোড়ার দিক্‌কার ইতিহাসের গল্প প্রায় সবই আজ উপকথার পর্য্যায়ে পড়ে। বহুকাল থেকেই চীন ও জাপানে চা-পরিবেষণ করাটা একটা সামাজিক আচার।

শিবের কালসংহার মূর্ত্তি।

সি, এইচ, আরান এণ্ড কোং

পঞ্চদশ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবিবারী সংস্করণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ হোলো রবিবার,—খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ;—যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ
যায় নিকো কোনোটার একটুও রং বাদ।
"বার্তাকু" লিখে দিল,—"গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবী গোয়ালায়।
বলে তারা গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড় ভূষি ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল মাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে ল্যাজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।"

"গদাধরে" রেগে লেখে "এ কেমন ঠাট্টা!"
"বার্তাকু" পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব ক'টা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি'।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো.

কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে
ঝড়িয়াকে করে দিক এক দম দেউলে।
সিনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
একদিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল দেওয়া মামলায়।
"বার্তাকু" কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে ল্যাপে ওরা কাজলে।
এ সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়।"

"গদাধর" কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, "ভায়া এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই।
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হোলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।"

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

রবি-বন্দনা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

তোমায় প্রণাম করি,—মানবের প্রণম্য মানব,
শুভ জন্মতিথি তব ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে—আসে,
অতীতের অন্ধকারে তব জ্যোতির্মালার উৎসব
অনাগত ভবিষ্যতে করুণা-কিরণ পরকাশে!
তোমায় প্রণাম করি, আর্য্যের আচার্য্যরূপচ্ছবি,
মন্ত্রপূতঃ হোমগন্ধী ভারতের আনন্দ-দুলাল,
তোমার সাগর মথি' অমৃতের উচ্ছল সুরভি
ভূত হতে ভবিষ্যতে নিশ্বাস টানিছে মহাকাল!
তোমারে প্রণাম করি হে ভাস্বর আদিম তপন,
নিত্য প্রাতে প্রাচীপ্রস্তে তব জলদর্চ্চিরেখা জ্বলে,
ঋতুতে ঋতুতে নব পত্র-পুষ্পে নন্দি' তপোবন
অগণ্য শিষ্যের কণ্ঠে ভাষা-গঙ্গা আপনি উথলে!
তোমায় প্রণাম করি হে সুন্দর, বরেণ্য, মহান,
আমাদের প্রাণে তুমি নিত্য লভ নব নব প্রাণ!

আমাদের এণ্ডরুজ সাহেব

শ্রীহেমলতা দেবী

আমাদের এণ্ডরুজ সাহেবের পরিচয় দেওয়ার কি আছে! জগৎজোড়া পরিচয়ে পরিচিত তিনি সকলের কাছে। ইউরোপ, এসিয়া, দূর আফ্রিকা, সুদূর আমেরিকা সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত মানববন্ধু ইংরাজ-সন্তান সি, এফ্, এণ্ডরুজ বলে। ভারতে তাঁর নাম দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। শান্তিনিকেতনে তিনি 'আমাদের এণ্ডরুজ সাহেব'। খাটো করে ধুতিপরা, ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে, অধিকাংশ সময় খালি পা কখনো মোটা এক যোড়া চটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাহেব সারা আশ্রম, সবাই দেখেছে। ছোট বড় সকলের কাছে তাঁর গতিবিধি একান্ত সহজ সকল সময়। কোথায় গিয়ে কখন কার কী প্রয়োজন মিটাচ্ছেন একে অন্যের খবর জানতে পারতো না একটুও। ছাত্র, অধ্যাপক, কর্ম্মী, পাচক, ভৃত্য সকলেরই ছিলেন তিনি সহচর, সঙ্গদানে সুখী করতেন সকলকে। মিষ্টভাষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। প্রতি কথার শেষে ছিল হাসি। "বড়ো দাদা," "গুরুদেব", ডাক ছিল তাঁর কী মধুর! গুরুদেবকে দিনের মধ্যে তিন চারবার না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না। দেখে যেন স্বর্গ পেতেন হাতে। "বড়ো দাদা" বুলিটি তাঁর কত ভালবাসা জড়িত ছিল, যারা তাঁর মুখে সে ডাক শুনেছে, তারাই জানে। নিজের জহরী বাবুর্চীকে তিনি প্রিয় বন্ধু জ্ঞান করতেন। সকলকে ভালবাসা ঢেলে দিতেন তাঁকে কে ভালবাসে না-বাসে না-ভেবেই। নিজের মা-বোন-ভাইদের প্রতিও ভালবাসায় তাঁর মন ভরে থাকতো সর্ব্বক্ষণ। দূরে থেকেও তাঁদের ভুলে থাকতেন না। আমাদিকে পড়াতে এসে মা-বোনেদের কথা বলতেন অনেকবার। অবিবাহিত বোন দুটিকে স্নেহ করতেন সাহেব খুব বেশি।

একবার খৃষ্টোৎসবের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় (খৃষ্টমাস ইভ্) শান্তিনিকেতনের মন্দিরে খৃষ্ট-স্মরণোৎসবে বসে নিজের মা'র কথা স্মরণ করে সাহেব বলেন—"মা আমার অনেকগুলি সন্তানের জননী। শৈশবে, ইংলণ্ডে,—এমনি এক খৃষ্টমাস ইভ্এ, ডিসেম্বরের দারুণ শীতে, আগুন জ্বালানো স্থানটির কাছ ঘেঁসে, সবগুলি সন্তান আমরা মাকে ঘিরে মায়ের মুখে ভগবান খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত শুনছিলুম একমনে। মা বললেন, "খৃষ্ট জন্মেছিলেন ঈষ্টে,—এখান থেকে অনেক দূরে, সে পূর্ব্ব দেশ। খৃষ্টের সেই জন্মস্থান, না-জানি কত সুন্দর, সেখানকার নদনদী, জলবাতাস, গাছপালা কত না-জানি সুন্দরতর। সেইখানে জন্মেছিলেন আমাদের প্রভু ছোট শিশু হয়ে আজকের দিনে। সেই ঈষ্ট্, সেই পূর্ব্বদেশ আমাদের কাছে কত পবিত্র, কত পুণ্যস্থান।" মায়ের মুখের সেই কথা শৈশবমনে, কল্পনায় কি আশ্চর্য্য সুন্দর দেশের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতো, মনকে ব্যাকুল করতো দেখার জন্য সেই সুন্দর দেশ, সেই পূর্ব্বদেশ। বড় হয়ে আজ পূর্ব্বদেশে এসেছি, কল্পনার সৃষ্টি সেই পূর্ব্বদেশকে আজ এতো কাছে পেয়েছি, তার কোলে এসে বসেছি, তাকে এতো ভালবেসেছি।"

সাহেবের ভালবাসায় পূর্ব্ব-পশ্চিম কত সহজে মিলে গেছে। সেদিনের সেই কথায় বেশ সুন্দরভাবে সেটি বোঝা গিয়েছিল। পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে কী ভালবেসে ছিলেন মিঃ এণ্ডরুজ, ভালবেসে সকলের বুক তিনি কতখানি ভরে দিয়েছিলেন—শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসী, ভারতবাসী, পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের অধিবাসী আজ সেটি উপলব্ধি করছেন তাঁর তিরোভাবে।

অতুলনীয় খৃষ্টপ্রেমের সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন মিঃ এণ্ডরুজ। নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন নিজেকে খৃষ্টের পন্থা অনুসরণ করে।

তাঁর সম্বন্ধে পূজ্যপাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমূল্য সত্য বাণী উদ্ধৃত করে একান্ত ভালবাসার সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, মানব-প্রেমিক, খৃষ্টির আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক, আমাদের এণ্ডরুজ সাহেবের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

"মানব কল্যাণের যে মহান আদর্শে মিঃ এণ্ডরুজ আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যের সে প্রভাব কখনও বিলুপ্ত হইবে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মৃত্যুতে উহা বিলুপ্ত হইবে না, সময়ও তাঁহার এই নিষ্কাম স্বার্থবলির আদর্শ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।"

"এই মানব প্রেম যীশুখৃষ্টের প্রেম ধর্ম্মের ফল। এণ্ডরুজ ছিলেন একজন যথার্থ খৃষ্টান। খৃষ্টধর্ম্মে এরূপ চরম উৎকর্ষতা আমি আর কোন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে দেখিতে পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যে স্বজনকে হারাইলাম, তাহা কখনও পূরণ হইবে না। ভগবানের বিধানেই উদার প্রেম লইয়া তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি যে ভারতকে ভালবাসিতেন ইহা তাঁহার মহত্ত্বের চরম নিদর্শন নহে, তিনি বিশ্বের মানব মাত্রকেই ভাল বাসিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণ সত্যই মহান উদার ছিল। তাঁহার অভাব আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে বিশেষভাবে অনুভব করিব। কিন্তু এই গভীর শোকেও আমরা এই আস্থা ও বিশ্বাসই পোষণ করিব যে, তিনি যে অবিনশ্বর দান করিয়া গিয়াছেন, কালের করাল স্পর্শে তাহা কখনও বিনাশ হইবে না। দরিদ্রের ও নির্য্যাতিতের দুঃখ মোচনে এবং তাহাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করায় তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রবল সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যতদিন বিশ্ব-প্রেমের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তাঁহার এই আদর্শও জাগ্রত থাকিবে।"

দ্বিজেন্দ্র-জন্ম শত-বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ঠিক একশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৪৬ সালে ২৯শে ফাল্গুন মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম। এই জন্য আজিকার দিনটি আমাদের পক্ষে পুণ্যতিথি। যেস্থানে আমরা সমবেত হইয়াছি এস্থানটিও পবিত্র, কারণ জীবনের শেষভাগটি তিনি এইখানেই কাটাইতেন। বড় পবিত্র দিনে বড় পবিত্র স্থানে আমরা সমবেত হইয়াছি। এখানকার মানুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা সব কিছুকে নিয়া তিনি একটি অপূর্ব্ব আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই আশ্রমটি ছিল তাঁর তপস্যার ক্ষেত্র। তাঁর তপোময় জীবনের যে শেষ আঠার বৎসর তাঁর কাছে থাকিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি।

তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রধান প্রমাণ তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। নানা বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় দেখিয়াছি তাঁহার জীবনে, বিরাট মাহাত্ম্য ছাড়া তাহা সম্ভব হয় না। অসীম সমুদ্রের মধ্যেই দেখা যায় জলের মধ্যে জলিতেছে বাড়বাগ্নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ শিশুর মত সরল হইয়াও ছিলেন জ্ঞানে প্রবীন, দার্শনিক হইয়াও ছিলেন কবি, ভাবুক হইয়াও ছিলেন গণিতজ্ঞ। তাঁহার মধ্যে ধ্যানরস অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্যে হরগৌরীর মত পরস্পরে যুক্ত ছিল। পশুপক্ষী বৃক্ষলতার সঙ্গে মিলিয়া থাকিতেন এমন প্রাকৃত মানুষ তিনি, অথচ সমস্ত ঋষিমহর্ষিদের সংস্কৃতিতে তিনি সস্কৃত। ধ্যানে, জ্ঞানে তিনি গম্ভীর, অথচ হাস্য পরিহাসে তিনি উচ্ছ্বসিত। বিরাট

ব'লয়াই তাঁহার চরিত্রে এত বিরুদ্ধতার সমন্বয় ঘটিতে পারিয়াছিল।

নিজেকে তিনি জানিতেন না। ভারতীয় সাধকদের মতে সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লক্ষণ হইল নিজের সম্বন্ধে অচেতনতা। পদ্ম যেমন পঙ্কের মধ্যে বাস করিয়াও নির্ম্মল

দ্বিজবিরামে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবার পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ

তেমনি চারিদিকের কোন প্রভাবই তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

নীর-ক্ষীর ভেদ সামর্থ্য আছে বলিয়া হংসদের সঙ্গে সাধককে তুলনা করা হয়। মলিনতার মধ্যে নির্ম্মল থাকেন বলিয়াই সাধকদের পরমহংস বলা হয়। হংস যেমন মানস সরোবরবাসী এই খানে আসিয়া কিছুদিনের মত বাস করে কিন্তু বাসা বাঁধে না, সাধকদের স্বভাবও তাই সেইরূপ। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই তাঁহাকেও পরমহংস বলা চলে। মানস সরোবরের ধ্যানেই তিনি ডুবিয়া থাকিতেন—সংসারের হিসাবে তিনি কাজের লোক ছিলেন না। সেই লোকের ইঙ্গিত পাইয়াই তিনি ইহলোক হইতে আনন্দে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই আনন্দের প্রমাণ তাঁহার শেষ কয়টি কবিতা।

কোন্ অধিকারে আজ আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতে আসিয়াছি? বিরাট বলিয়াই তিনি বিশ্বের ধন। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান আজ সমস্ত বিশ্বজগতের বস্তু, এই অধিকার বলেই শ্রীকৃষ্ণের গীতা অর্জ্জুনের মধ্য দিয়া আজ সমস্ত সংসারে পরিব্যাপ্ত এবং দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবিদ্যার উত্তরাধিকারী হইলেন অর্জ্জুন।

তাঁর মধ্যে যেমন নানা বিরুদ্ধতা সঙ্গত ছিল, তেমনি আজ তাঁহার জন্মদিনে তাঁহার মৃত্যুকেও যুক্ত করিয়া দেখিতেছি। তাঁহার পক্ষে জন্মমৃত্যু বিরুদ্ধ বস্তু নহে। ইহলোক এবং পরলোক পরস্পরে সুসঙ্গত।

তপস্যার বলে তিনি আজ তপস্বীদের তপোময় লোকে বিরাজিত। সেখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার চিন্ময় ঐশ্বর্য্য আমাদের চিত্তের সকল দৈন্য দূর করুন। আমাদের সকল ক্লৈব্য ও দৌর্ব্বল্য অপগত করুন। আমাদের ধ্যান ও জ্ঞানকে উদার ও প্রসন্ন করুন। আমাদের সকল অনৈক্য, সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল দরিদ্রতা তাঁহার চিন্ময় আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হইয়া উঠুক। পরলোকে তিনি যে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা দ্বারা আজ সকল সংসারকে ধন্য করুন।*

* দ্বিজেন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী-সভায় বিবৃত

পদ্যে উপনিষদ

প্রথম অধ্যায়

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মবাদীর শুনহ বাণী।
যাঁ হ'তে জনমে এ সব প্রাণী ;
জনমি যাঁহাতে জীবন ধরে ;
যাঁহে যায়, যাঁতে প্রবেশ করে ;
তাঁহারে জানিতে কর যতন।
তিনি ব্রহ্ম সনাতন॥
আনন্দ হ'তে সকলি হ'য়েচে।
আনন্দে ধরি বাঁচিয়া রয়েচে॥
ধায় সবে আনন্দের প্রতি।
আনন্দের ক্রোড়ে লভে গতি॥
রসরূপী তিনি, সে রস পিয়া
আনন্দে ভাসে জীবের হিয়া॥
মনের সহিতে না পেয়ে বাণী,
ফিরে যাঁহা হ'তে ক্ষান্ত মানি,
ব্রহ্মের সে আনন্দ যে জানে
ডরে না সে কারো সন্নিধানে॥
আনন্দরূপে ব্যাপিয়া আকাশ
না থাকিলে সেই স্বয়ং প্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ—
চলিত বলিত করিত কাজ ?
আনন্দামৃত জীবের প্রাণ
সব আনন্দ তাঁহারি দান॥
নাহি তাঁর রূপ নাহি আধার।
বাক্য মনের অতীত পার॥
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,
তখন তাহার না থাকে ভয়॥
মনের সহিত না পেয়ে বাণী,
ফিরে যেথা হ'তে ক্ষান্ত মানি ;
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার—
ভয় নাই হয় কদাপি তা'র॥
ইনিই জীবের পরম গতি।
পরম ধন পরম রতি॥
ইনিই জীবের পরম লোক
ইঁহারে হেরিলে না থাকে শোক॥
ইঁহারি আনন্দ সিন্ধু
ভুঞ্জে জীব বিন্দু বিন্দু॥

আর্য্য জাতির আদি বাসভূমি

মৌলভী একরামুদ্দীন

এ যাবৎ বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতগণ, আর্য্য জাতি কোন উত্তরদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী, স্বপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" এর প্রথম খণ্ড "ভারতবর্ষ"এ বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষই তাঁহাদের আদি স্থান। তাঁহার এই মত প্রচারের জন্য তিনি কোন অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মত যে ভ্রমাত্মক হইতে পারে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অপর মতের ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা দেখাইলেই তাঁহার মতের সঠিকত্ব প্রমাণিত হয় না, তাঁহার মতের সমর্থনে সারবান যুক্তি দেখাইতে হইবে। তবে তাঁহার মত এবং অপর মতের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা হেতু অপর মত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণিত হইত এবং তাঁহার মতের সার্থকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতীত হইত।

আমি তাঁহারই মতের ভ্রমাত্মিকতা প্রমাণ করিব। তাহাতেই অপর মতের সারবত্তা বুঝাইবে। তিনি আর্য্যজাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের কীর্ত্তি বিজড়িত রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের আধিপত্যে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষই যে তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত কারণে ভারতবর্ষই যে তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল, তাহা কখনই প্রমাণিত হয় না। অপর দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর এ দেশ হইতে তাঁহারা আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। সুতরাং একই হেতুবাদে যদি একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা হইলে একটিমাত্র সিদ্ধান্তও তো ভ্রমাত্মক হইতে পারে।

তাঁহার সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্পষ্ট প্রতায়মান করিবার জন্য আমি আরও যুক্তি প্রদর্শন করিব। ভারতের অসভ্যজাতি যাহারা "অনার্য্য জাতি নামে অভিহিত হয় এবং "দস্যু" বা "দাস" নামে আর্য্যেরা যাহাদের নিধন সাধন করিতেন বলিয়া বেদে উক্ত আছে, তাহারাও যে ভারতের আদিম অধিবাসী তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

তাহা হইলে ভারতের আর্য্যগণ ও অসভ্যগণ উভয়েরই ভারতে বাসস্থান সমসাময়িক। তাহা হইলে দুইজাতি আদি কাল হইতে এদেশে বাস করিতেছেন। কিন্তু এক দেশ বাসী সমসাময়িক বিভিন্নজাতির আকার, ধর্ম্ম, আশা ও আচার ব্রত কিছু না কিছু সাদৃশ্য যে নিশ্চয় থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিম ভারতবাসী আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে এই সাদৃশ্য কিঞ্চিমাত্র আছে কিনা এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

ভারতীয় অনার্য্য জাতি বলিলে অসভ্য জাতি সাঁওতাল, কোল, ভীল, কোঁজ ইত্যাদিকে বুঝায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন জাতির সহিত আর্য্যজাতির আকার গত কোন সাদৃশ্য আছে কি? আর্য্যগণ সুন্দর শ্বেতবর্ণ পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং এখনও তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে ঐ বর্ণের পুরুষের অভাব নাই; কিন্তু ভারতের বর্ব্বর জাতিগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এখন যদিও আর্য্য বংশধরগণের মধ্যে কৃষ্ণকায় পুরুষ বিরল নহে, কিন্তু তাহা ভারতের জলবায়ুর গুণে। কালে সকল আর্য্যবংশধরগণই কৃষ্ণকায় হইতে পারেন। আনার্য্য মধ্যে আকার গত সাদৃশ্য আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের কথা। আর্য্যগণ এক দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকেন এবং অনার্য্যগণের দেবতা বিভিন্ন। আমি সরকারী কার্য্যের নানা স্থানে অনার্য্যের মধ্যে বেড়াইয়াছি। দেখিয়াছি উভয়ের পূজা পদ্ধতিও এক নহে।

তৃতীয়তঃ ভাষা। কেহ কি বলিতে পারেন উভয় জাতির মধ্যে ভাষার কিছু সামঞ্জস্য আছে কিম্বা মূলতঃ কখন ছিল? অনার্য্যদের সহিত মিশিয়া বা ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে হয়।

সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণকে প্রধান প্রধান অনার্য্য ভাষায় পরদর্শিতা লাভের জন্য উচ্চ পুরস্কার দিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ আচার। আচারেও উভয় জাতির মধ্যে কোন সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। জাতকর্ম্ম, বিবাহ পদ্ধতি, অন্তেষ্টিক্রিয়া, ও নিত্যকর্ম্ম, এই চারি বিষয়ের কোন এক প্রথা একের সহিত অন্যের মিল নাই, একের প্রথা হইতে অন্যের প্রথা বিভিন্ন।

সুতরাং দেখা যায় যে উভয় জাতির মধ্যে আকার, ধর্ম্ম, ভাষা ও আচারগত ভেদ বিশেষ। তবে কিরূপে বলিব যে আদিকাল হইতে উভয় জাতিই এক দেশের অধিবাসী? তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে এক জাতিই যে আদিম নিবাসী এবং অন্য জাতি আগন্তুক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য্যজাতি যদি ভারতের আদিম অধিবাসী হন্, তাহা হইলে অনার্য্যগণ আগন্তুক এবং অনার্য্যগণ আদিম অধিবাসী হইলে আর্য্যগণ আগন্তুক হইবেন। এখন দুই জাতির মধ্যে কোন্ জাতি আগন্তুক হওয়া সম্ভব তাহাই দেখিতে হইবে। আর্য্যগণের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় আর্য্যেরা যে অনার্য্যের নিধন সাধনের প্রয়াস পাইতেছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে যে আগন্তুক আর্য্যজাতি আদিম নিবাসী অনার্য্যদের দেশ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাহাই বুঝায় না কি? এক্ষেত্রে আর্য্যজাতিই যে আক্রমণকারী এবং অনার্য্যগণ আক্রান্ত, তাহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে কি? নচেৎ আক্রমণকারী অনার্য্য জাতি, আর্য্যগণকে তাঁহাদের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ থাকিত না কি? যখন তাহা নাই, তখন আমরা উপরোক্ত ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না।

অতএব আর্য্যজাতি যে আগন্তুক নহেন, লেখকের এই ভ্রান্ত মত অবশ্যই কেহ স্বীকার করিবেন না।

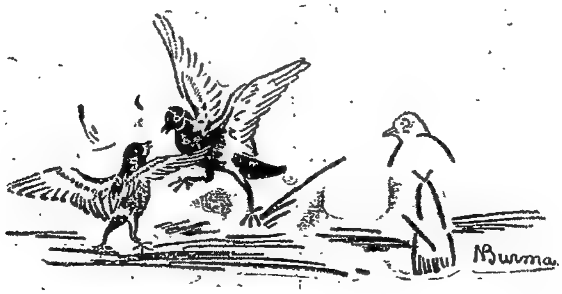

দাও চোখ খুলে

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

প্রেমঘন, রসঘন, আনন্দস্বরূপ
রাসের রসিক তুমি অমৃত মধুর ;
প্রিয়তম মধুব্রহ্ম তোমারি সন্ধানে
হয়েছি বাহির আজ রিক্তসর্ব্ব হ'য়ে !
খুঁজিতেছি পথে পথে নগরে বিপিনে,
চোখের মনের দোষে নাহি পাই দেখা ;
রসময় রাসেশ্বর হৃদি-বৃন্দাবনে
সতত বিরাজ কর যদিও গোপনে !

অচিনে চিনি না ব'লে আছ অচেনাই
চেতন হ'য়েও যেন আমি অচেতন ;
প্রেমময় প্রেমে কর চেতনা সঞ্চার
তোমার প্রেমের রাজ্যে দাও দীনে স্থান ।
অফুরন্ত প্রেম-উৎস, দাও চোখ খুলে,
রসের নাগরে দেখি রসতরু-মূলে !

দম্পতি

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

(১)

নবীনবাবুর একমাত্র কন্যা ফেকুর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে একটি ছোট গ্রামে। মালিয়াট গ্রামের জ্যোতিবাবুর পুত্র বিনোদের সহিত বিবাহ হইয়াছে। নবীনবাবুর এই একটিই কন্যা ; সেইজন্য তিনি যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে কন্যা পক্ষের দান-পণ নাকি তাহাদের পছন্দ হয় নাই। তাঁহারা ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কন্যাপক্ষের দানপণ কোনওদিনই বরপক্ষের মনোনীত হয় না, সুতরাং নবীনবাবু হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাদের মন পাইতেন না। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিল। পূর্ব্বে তিনি জামাতার ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে অনেক আশাজনক কথা শুনিয়াছিলেন ; তাহাদের অনেক জমিজমাও আছে জানিয়া এই বিবাহে মত দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন সে সব কথা ভুয়া—তাহার কোন সত্যতা নাই। তবে একটা কথা তাঁহারা সত্য বলিয়াছিলেন—জামাতা ম্যাট্রিক পাশ।

জামাতা গ্রামেই থাকে, জমিজমা যৎসামান্য আছে তাহাই দেখে। পিতা জ্যোতিবাবু বিদেশে চাকরী করেন, বৎসরে একবার দেশে আসেন। তাঁহার চাকরীর মাহিনা অতি অল্প, সুতরাং অভাবের সংসার কোনো রকমে কাটিয়া যায়। ইহাদের যে এরূপ অবস্থা তাহা জানিলে নবীনবাবু কখনই এ বিবাহ হইতে দিতেন না। সকলই অদৃষ্টের পরিহাস জানিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছেন।

ফেকুর বয়স তেরো বৎসর। এই বৎসরেই সে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়াছে। পড়াশুনায় সে বরাবরই খুব ভাল—তাহার আরো পড়িবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পিতা, মেয়ে মানুষের আরো পড়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে বন্দী করিলেন। ফেকুর বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না এত শীঘ্র বিবাহ করিতে। এত সত্বর পিতা

কোল ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সায় দিতে ছিল না। তাহার আন্তরিক কামনা ছিল যে অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ করিবে, কিন্তু সে কামনা ত্যাগ করিয়া তাহাকে অচেনা পল্লীগ্রামে অচেনা লোকের সহিত জীবনযাপন করিবার জন্য আসিতে হইল।

নূতন জায়গায় আসিয়া প্রথম প্রথম মনের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিত—মনে পড়িত পিতার আদর, মনে পড়িত মাতার সেই স্নেহভরা অন্তরখানি। এখানে থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হইত না। কবে আবার সেই চিরপরিচিত জায়গায় যাইবে তাহাই ভাবিত। তাহার মন এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিত।

স্বামী যে খুব ভাল ব্যবহার করিত তাহা নহে; একেই তো দানপণ অপছন্দ হইয়াছিল বলিয়া মনে রাগ ছিল। তাই সে স্ত্রীর প্রতি কোনও যত্ন লইত না, সর্ব্বদাই তাহার ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিত। কোন ত্রুটি বাহির করিতে পারিলে মোটেই ক্ষমা করিত না। ফেকু যখন মনের কষ্টে কাঁদিত তখন সে হৃদয়হীন ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িত না।

দিন সকলেরই যায়, সুতরাং ফেকুরও যাইতে লাগিল। এরূপ দারিদ্র্যের কশাঘাত সে পিত্রালয়ে থাকিতে কখনো সহ্য করে নাই। একদিকে দারিদ্র্য অপর দিকে ইহাদের তিরস্কার তাহার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিল। সংসারে অনেক কাজই তাহাকে করিতে হয়, তবু শাশুড়ীর খোঁটা সহ্য করিতে হয়—"আহা, লেখাপড়া জানা বউ! ধ্যাকার দেখ না! আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের মানবে কেন?"

ফেকু সজলনয়নে বলে, "কই মা, আমিতো কিছু বলি নি। তোমাকে কি আমি তুচ্ছ করতে পারি? আমার সে সাহস যেন কখনো না হয়।"

শাশুড়ী বলেন, "তুচ্ছ ক'রলে নাই বা কি দিয়ে? দেখানো হয় যে সব বিষয়েই তুমি সব জান। আমরা সেকেলে মানুষ বলে যেন কিছুই জানি নে। আবার ব'ল্লে তো চোখের জল বেরিয়েই থাকে।"

ফেকু আনতমুখে সহিয়া যায়। প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই। মাতার মুখে মেয়েলী শোলোক শুনিয়াছিল, "যাকে দেখতে না পারি, তার চলনও বাঁকা" এখন দেখিল যে তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। সে যে কবে ইঁহাকে অপমান করিল, লেখাপড়া জানে বলিয়া কবে যে অহঙ্কার দেখাইল, তাহা ভাবিয়া পায় না।

বিনা দর তো কাজ নাই। পাড়ার ছেলেদেব সঙ্গে আড্ডা দিয়া বেড়ান তাহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। দুপুরে এবং রাত্রে শুধু আহারের সময় ছাড়া আর কোনও সময় তাহার দর্শন মিলিত না। বন্ধু-বান্ধবেরাও সব সেই রকম জুটিয়াছিল। তাহারা সকলেই এইরূপ বসিয়া বসিয়া পিতৃদত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিত।

বৎসরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। ইহাদের মনের ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইরূপ পূর্ব্বের মতই সমানে অত্যাচার চলে। ফেকু মুখ বুজিয়া সহ্য করে।

তাহার শাশুড়ী বিমলার পাড়া বেড়ান অভ্যাস খুব প্রবল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, পাড়ার মধ্যে গিয়া হাতপা নাড়িয়া খানিকক্ষণ গল্প না করিতে পারিলে তাহার ভাত হজম হইত না। সেদিনও আহারের পর পাড়ায় বাহির হইলেন—হাতে কাঁথার ডালা লইয়া। কাঁথা সেলাইও চলিবে সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিবে। তাঁহার গন্তব্য স্থান ক্ষ্যান্তর পিসীর বাড়ী। ক্ষ্যান্তর পিসীর বাড়ীতে আরো পাড়ার অনেক গৃহিণী পদবাচ্যা মহিলা উপস্থিত হইয়াছেন। কাহারও হাতে পৈতা কাটিবার টাকু। কাহারও সঙ্গে কাঁথা। এখানে যে কত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিমলা এখানে পৌছিয়া আপন স্থান অধিকার করিলেন। খেঁদীর মা বলিলেন, "ও পাড়ার সিধুর বৌ আজ যা বিপদে পড়েছিল তা কি বলব!" চারিদিক হইতে সকলের নয়ন উৎসুক হইয়া উঠিল।

খেঁদীর মা বসিয়া বলিলেন, "বাবাঃ! ইলিশ মাছ খেতে গিয়ে এত বড় কাঁটা ফুটেছিল গলায়। সে কি কিছুতে নামতে চায়। ওঃ! কত বড় ফাঁড়া গেল ওর আজ!"

আন্নার মাসী বলিলেন, "আর এও বাপু বলতে হবে, ওর এত তাড়াতাড়ি ছিল কিসের। বৌ মানুষ—অত তাড়াতাড়ি ক'রে গেল্‌বার কি দরকার? ওর কি ধান ডুবে যাচ্ছিল নাকি?"

খেঁদীর মা বলিলেন, "তবে আর আজকালকার মেয়ে বলেছে কেন? ওদের তো সব কাজেই ঐ রকম। কাজের কি কোনও ছিরি আছে?"

ক্ষ্যান্তর পিসী বলিলেন, "আজকালকার মেয়েরা ভাবে যে সব কাজেই তারা পণ্ডিত; সব তাতেই বাহাদুরী করতে যায়। আমাদের মত প্রাচীনাদের গ্রাহ্যই করে না।"

বিমলা বলিলেন, "যা বলেছ ঠিকই বলেছ। আমার এক বউ হয়েছে, সে সারাদিন ঠ্যাকারের উপরই থাকে। আমাকে মানতে চায় না। আর লজ্জাসরম ব'লে কিছুই নেই, বিয়ে হ'য়ে এখানে এসে তার পরদিন থেকেই এতটুকু ক'রে ঘোমটা দিতে লাগল।"

আন্নার মাসী বলিলেন, "শুধু ঘোমটার কথা কি বলছ ভাই, আরো কত কি নতুন হচ্ছে। মেয়েরা আবার আজকাল সব সময় সেমিজ গায়ে দিয়ে থাকে।"

খেঁদীর মা বলিলেন, "তবে শোন ভাই বলি। সেবার ক'লকাতায় গেলাম, দেখি মেয়েরা সব জুতো পায়ে ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে; মাথায় তো ঘোমটা ব'লতে নেই। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।"

ক্ষ্যান্তর পিসী বলিলেন, "অবাক হবার কথাই তো বটে ভাই। কলির শেষ—তাইতে এই সব ব্যাপার হচ্ছে। পাপের ভরা পূর্ণ হ'য়েছে কিনা।"

বিমলা বলিলেন, "তাইতো ভাবি যে আমাদের সময় কি দিনটাই গিয়েছে। শাশুড়ীকে তো যমের মত ভয় ক'রতাম।"

ক্ষ্যান্তর পিসী বলিলেন, "আমাদের সময়ের শাশুড়ীর মত শাশুড়ীর হাতে এরা পড়ত, তাহলে এসব ধিঙ্গীপনা কবে ঘুচে যেত।"

বিমলা বলিলেন, "আমরা তো একেবারেই কিছু বলিনা কিনা তাইতে একেবারে পেয়ে বসেছে।"

এইরূপ পরনিন্দা পরচর্চ্চায় প্রায় বেলা সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেল. সুতরাং আলোচনায় ক্ষান্ত দিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফেকুর নিকট স্বামীর সংসার অসহ্য মনে হইতেছে। কয়দিন হইতে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কেবলই মনে পড়ে পিতৃগৃহের সেই শান্তিপূর্ণ জীবন। তাহার সহিত তুলনা করিয়া এ জীবন এমন তিক্ত লাগিতেছে যে সে ইহার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিতেছে না।

শাশুড়ী সংসারের কোনও কাজ করেন না, পুত্রবধূকে দিয়াই সমস্ত করাইয়া লইবার ইচ্ছা। তিনি অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক। কিন্তু পুত্রবধূ এক বিন্দু সময় বসিয়া থাকি[illegible] তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি উপযু[illegible] কাজ বাহির করিয়া তাহাতেই পুত্রবধূকে নিযুক্ত করিয়া দেন।

এই কি স্বামীগৃহের সুখশান্তি! জীবনের শেষ দিন প[illegible] এই সুখভোগ করাই কি তাহার বিধিলিপি? তাহার চিত্ত [illegible] সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। এরূপ জীবন যাপন ক[illegible] তাহার কর্ম্ম নয়; সে ইহা সহ্য করিতে পারিবে না। মা[illegible] মাঝে মনে দুঃখ হয় যে কেন লেখাপড়া ছাড়িয়া সে এই অচে[illegible] প্রদেশে আসিল। লেখাপড়া করিতে পারিলে আজ তাহা[illegible] মত সুখী কে?

চিন্তার অন্ত নাই। কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে ফে[illegible] সে দিন যে কাণ্ড বাধাইয়া বসিল তাহার পরিণাম ভাবিয়া [illegible] শিহরিয়া উঠিল। সেদিন রান্না করিবার সময় বোতল হই[illegible] তেল ঢালিতে গিয়া এক বোতল তেল মাটিতে ঢালিয়া ফেলিল [illegible] বুঝিল যে আজ আর নিস্তার নাই। শাশুড়ীর শ্যেনদৃষ্টি কখন[illegible] এড়াইতে পারিবে না। সুতরাং কপালে নিশ্চয়ই দুঃখভো[illegible] আছে।

যথাসময়ে শাশুড়ী সেখানে দর্শন দিলেন। মাটিতে তে[illegible] ঢালিয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রথমেই তাঁহার নজরে পড়িল। তখ[illegible] তাহার কাংস্যকণ্ঠে বাক্যস্রোত ছুটিল—"তুমি দেখছি আমাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে এসেছ। এতখানি বয়েস হয়েছে এখনও সাবধানে কোনও কাজ করতে শিখলে না। আমি মনে করি কিছু বলব না, যা করছে করুক; দিন দিন আপনি[illegible] শিখবে। কিন্তু তুমি যে দিনকের দিন বেড়েই চলেছ এতো তোমার বাবার বাড়ী নয় যে যেমন খুসী ঢালবে ফেলবে আমরা তো আর তোমার বাবার মত অত বড়লোক নই [illegible] এত জিনিষ পত্রের ধ্বংস সহ্য করব।"

সেদিন যদি সমস্ত ব্যাপারটা এই বকুনির উপর দিয়া[illegible] যাইত তাহা হইলেও না হয় হইত। কিন্তু ব্যাপারটা একটু বেশীদূর গড়াইল। শাশুড়ী রাগের ঝোঁকে একটি গুরুতর কাণ্ড করিয়া বসিলেন। যাহাতে পুনরায় এইরূপ জিনিষপত্র নষ্ট না হয় তাহা স্মরণ করাইয়া রাখিবার জন্য পুত্রবধূর চুলে ধরিয়া বেশ ঘা কতক বসাইয়া দিলেন। ফেকু নীরবে সহ্য করিল, তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সহ্য করিতেই তো স্ত্রীলোকের জন্ম।

কিন্তু প্রহার সহ্য করিয়া ফেকুর মনে গুরুতর অভিমান হইল। বাড়ীতে সে বাপ মায়ের কাছে কোনোদিন মার খাইয়াছে কিনা মনে পড়ে না, আর শেষে কিনা এই বয়সে এখানে আসিয়া মার খাইতে হইল। পিতার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের মেয়ে সে, তাহার এই অবস্থা! সমস্ত দিন তাহার মনের মধ্যে গভীর বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

শেষে সে ঠিক করিল, "আর সহ্য করা হইবে না। কপালে যাহা হয় তাহাই হইবে, আর ইহাদের নিকট থাকিব না। এখনে থাকিলে আর বাঁচিতে পারিব না; এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া আবার সেই জন্মভূমিতে পিতামাতার কোলে ফিরিয়া যাইব। সেখানে গিয়া যাহা হয় করিব, কিন্তু এখানে আর নয়।"

পরদিন একখানা কাগজে সে লিখিল, "মা! আমি তোমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। এখানে থাকা আর অসহ্য হইয়াছে। পিতার নিকট চলিলাম। ইতি

তোমার অবাধ্য পুত্রবধূ।"

তারপর সন্ধ্যাবেলা ট্রেণের টিকিট কাটিয়া গন্তব্যস্থানে যাইবার জন্য রেলগাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

(২)

গোপালপুর ষ্টেশনে পৌছিয়া ফেকুর আনন্দ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। গেটে টিকিট দিয়া সে গৃহাভিমুখী রাস্তা ধরিয়া চলিল! পরিচিত দৃশ্যাবলী তাহার হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। এই তো তাহার চিরপরিচিত স্থান। এখানকার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতাপাতার সহিত তাহার হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহার সহিত তাহার কত স্মৃতি বিজড়িত আছে তাহা কি সে কোনওদিন ভুলিতে পারিবে? এখানে বাস করায় যে শান্তি, সে তো স্বর্গসুখের সমান।

ফেকু বাড়ীতে পৌছিলে, তাহার মাতা তাহাকে দেখিয়া যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। এ সময় তাঁহার কন্যা কোথা হইতে আসিল? মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এলি কোথা থেকে? আসার আগে কি চিঠিপত্র দিতে নেই? এ রকম হঠাৎ চ'লে এলি কি মনে করে?"

ফেকু বলিল, "মা, ওদের ওখানে আর থাকা যাবে না। আমি ও বাড়ীতে থকতে পারব না। অত নির্য্যাতনের মধ্যে থাকলে মানুষ কখনো বাঁচতে পারে না। তাই আমি পালিয়ে এসেছি।"

মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে, ছেলে মানুষী ক'রে কি করেছিস? অত্যাচার করুক, অবিচার করুক, সেই তো তোর এখন একমাত্র আশ্রয়। বিয়ের পর থেকে স্বামীর ঘরই তো আপন ঘর হয়। তোর হঠাৎ এ রকম দুর্ম্মতি কেন হল তাইতো ভাবছি। এ রকম ভাবে চ'লে এলি, শেষে কি হবে?"

ফেকু বলিল, "যা হয় হোক্। আমি আবার পড়াশুনায় লাগব। আমি এবার থেকে জীবনের সমস্ত সময় একমাত্র পড়াশুনায় অর্পণ করব।"

পিতা আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। দুঃখিত হইলেন এই ভাবিয়া যে ইহা তাঁহারই অবিবেচনার ফল। যাহা হউক, তিনি আর কন্যার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন না! গোপালপুরের গার্ল'স হাইস্কুলে কন্যাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ফেকু আবার পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে একখানি পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে ফেকুকে ধমকাইয়া অনেক কথাই লেখা ছিল। এরূপ মেয়েকে বাবা যে ঘরে স্থান দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। এরূপ মেয়েকে নাকি ঘর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়াই শ্রেয়। এই পত্র পাইয়া সকলেই বুঝিল যে পুনরায় স্বামীগৃহে যাওয়া ফেকুর পক্ষে নিরাপদ নহে।

ক্রমে ক্রমে সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ফেকু যেরূপ মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। সুতরাং যখন সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল তখন তাহার পাশের জন্য কাহারও মনে কোনও চিন্তা রহিল না।

যথাসময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে ফেকু প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। এ সংবাদে পিতামাতা অত্যন্ত সুখী হইলেন। ফেকু তাহার কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। এই ঈশ্বরই বিপদের সময় তাহার বাহুতে বল দিয়েছেন; দুঃখের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য দিয়াছেন। তাঁহার উপর স্থির বিশ্বাসই এই সফলতা লাভের কারণ। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদই তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

এই সময় একটি অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিয়া গেল। গোপালপুরে একটি প্রাইমারী গার্লস স্কুল ছিল। তাহার হেড মিষ্ট্রেস ললিতা দেবী হঠাৎ একটি ভাল কাজ পাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ফেকুকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। ফেকু ইহা ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিল। স্কুলের কাজে নিযুক্ত হইয়া তাহার দিনগুলি বেশ ভাল ভাবেই কাটিতে লাগিল। মেয়েদের সংস্পর্শে সময়টুকু বেশ সুন্দরভাবে কাটিয়া যায়। অধ্যাপনার কাজ করিতে তাহার খুব ভাল লাগে। এই কাজ করিতে ব্যস্ত থাকায় তাহার নিজের কোন কথাই মনে হইত না। তাহার পড়াইবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এমন এক একজন লোক দেখা যায় যাঁহাদের নিজেদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ হইলেও পড়াইবার কাজে নিতান্ত অপটু। কিন্তু ফেকুর পাণ্ডিত্য যাহাই হউক তাহার পড়াইতে সমকক্ষ খুব কমই দেখা যায়। ইহা ছাড়া তাহার অন্তরের মাধুর্য্য দ্বারা মেয়েরা বেশী আকৃষ্ট হইত।

স্কুলের মধ্যে সেই একমাত্র মহিলা অন্যান্য সকল শিক্ষকই পুরুষ। হঠাৎ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদ খালি হইল। খবরের কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপা হইল। চারিদিক হইতে রাশি রাশি আবেদনপত্র আসিয়া হাজির হইল।

একখানি দরখাস্তের একটু নূতনত্ব ছিল। সেখানিতে কর্ম্মের জন্য প্রার্থনা, নিজের যোগ্যতার কথা ছাড়াও ব্যক্তিগত কথা ছিল। দরখাস্তকারীর পিতা হঠাৎ মারা যাওয়ায় নাকি অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই চাকরী না হইলে অনাহারে প্রাণত্যাগ ভিন্ন উপায় নাই। ফেকু দরখাস্তের শেষপ্রান্ত লক্ষ্য করিয়া চমকিত হইয়া গেল। তারপর ভাবিল যে যাহা ভাবিয়াছে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। দরখাস্তটী যত্নে রাখিয়া দিল।

সেদিন রবিবার সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইবার জন্য যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে একে একে interview হইতেছে সকলে যাইবার পরে সেই পূর্ব্বোক্ত দরখাস্তকারী দেখা দিল। বয়স আন্দাজ সাতাশ, চিন্তামলিন মুখ, দেহের বেশভূষায় মোটেই পারিপাট্য নাই। চুলগুলি অবিন্যস্ত।

প্রবেশ করিয়াই সে সবিনয়ে নমস্কার করিয়া নতমুখে বলিতে আরম্ভ করিল, মিসেস্ মজুমদার আমার বিষয় তো আপনি সবই জানেন—যাতে আমার উপকার হয় তাই যদি করেন তবে সেকথা আমি আজীবন মনে রাখব। আমার অবস্থা যা হয়েছে এতে আর কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। কথা শেষ করিয়া মিসেস মজুমদারের মুখের দিকে তাকাইয়া সে থতমত খাইয়া গেল।

সে চিনিল যে মিসেস মজুমদারই হইতেছে ফেকু। ফেকু বুঝিতে পারিল যে এ বিনোদ মজুমদার—তাহার স্বামী। তারপরে নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। গত চারি বৎসরের ইতিহাস সমস্ত আলোচিত হইল। একমাস গত হইল তাহার স্বামীর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা সঞ্চয় কিছুই রাখিয়া যান নাই ; উপরন্তু শ্রাদ্ধের ব্যয়ের জন্য কিছু দেনা হইয়াছে। সেইজন্য সে উপায়ান্তর না দেখিয়া এইখানে দরখাস্ত করিয়াছে। ফেকু আশা দিল যে কমিটি যাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করে সে বিষয়ে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। স্কুল হইতে যাইবার সময় ফেকু বিনোদকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী গেল।

বাড়ীতে যাইয়া সে সমস্ত ঘটনা বাবাকে বলিল। নবীন বাবু সমস্ত শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বলিলেন, "বুঝেছি, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা এই রকমেই প্রকাশ পায়। তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলেরই জন্য। তাঁর রাজ্যে অবিচার নাই। এখন বাবাজীর চাকরীটা হয়ে গেলে সব দিক থেকে মঙ্গল।"

দিন পাঁচেকের মধ্যে বিনোদ সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া গেল। এখন আর সে সর্ব্বদা স্ত্রীর দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় না। স্ত্রীও তাহার ব্যবহারে হৃদয়হীনতার আভাস পায় না। তাহারা এখন সম্পূর্ণরূপে সুখী দম্পতী।

নব বর্ষ

৺প্রসন্নময়ী দেবী

আবার বরষ আসে তরু পত্র লতা হাসে
পুষ্পিত শোভায়
সবুজে ঘেরিয়া দেশ কচি কিশলয় বেশ
ধরণীর গায়,
প্রকৃতির মহোৎসব চৌদিকে মুখর সব
গীত গন্ধে ভরা,
তরু শিরে গায় পিক ঝঙ্কারিয়া দশদিক
মোহ মুগ্ধ ধরা,
মিলন বারতা আনে, কোকিলের মধু গানে,
চিতে আশা নব,
অতীত মুছিতে নারে পুরাতন বারে বারে
স্মৃতি আনে সব,
হৃদয়ের পাতে পাতে যে চিত্র নিশীত রাতে
নিত্য উঠে জাগি,
তারে নাহি ভুলা যায় নূতনের মমতায়
তিলেকের লাগি'।

তরুণের ভালবাসা নব দিবসের আশা
কল্পনা জাগায়
মনে মনে কত চাই বরষে কভুনা পাই
তবু ভ্রান্ত হায়;
নবীন দেখিলে পরে আকাঙ্ক্ষায় চাপি ধরে
বর্ষ আগমনে,
যে যায় তা' একেবারে বিরহের পারাবারে
বিসর্জ্জন সনে,
স্মৃতি জাগাইয়া তুলি আনে প্রিয়মুখ গুলি
কত প্রেম প্রীতি,
পুরাতনে পূর্ণবিশ্ব, মুহূর্ত্তের নবদৃশ্য
আনে না বিস্মৃতি,
ভাবি আজি তারি কথা অন্তর ভরিয়া ব্যথা
সব শূন্যতায়
আঁখি পাতা আসে ভরি, অতীত স্মরণ করি
নূতনে কি পায়?

১লা বৈশাখ ১৩৩০ সাল।

রূপ-শ্রী

শ্রীরাধাকান্ত সাহা

দেবী—ধাত্রী স্বরূপিণী,
শিক্ষাদাত্রী, জ্ঞানদাত্রী ত্রিলোকপালিনী;
জঠরেতে দিয়া স্থান,
বক্ষরক্ত করি দান,
যতনে পালন করি' সন্তানে আপনি;
"মাতৃ" রূপে প্রকটিতা বিশ্বপ্রসবিনী।
সখী—বাল্য-সহচরী,
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, স্নেহপাশে ঘিরি;
একই গর্ভে জন্ম নিয়ে,
একই স্তনে স্তন্য পিয়ে,
শুভচিন্তা হৃদে সদা ধরি শুভঙ্করী;
"সহোদরা" রূপে তোমা হেরি মহোদরী।
প্রিয়া—জীবন সঙ্গিনী,
ধরমে করমে সদা—সহগামিনী
এ সংসার মরুস্থলে,
প্রেম শান্তি বারি ঢেলে,
উৎসবে ব্যসনে হয়ে সমভাগিনী,
"জায়া" রূপে শিবজায়া অশিবনাশিনী।
দাসী—সেবিকা সমান,
সেবা, যত্ন শ্রদ্ধা, ভক্তি সদা করি দান;
রোগ, শোক, দুঃখ, তাপে,
অনাহারে নিশা যাপে,
শান্তি, সুখ, কাম্য সদা—নাহি অন্য ধ্যান;
"সুতা, স্নুষা" রূপে মাতা সাধিছ কল্যাণ।
নারী—ভুবনমোহিনী,
অঙ্গে খেলে সৌদামিনী, কটাক্ষে অশনি;
ধরিয়া রূপের ডালি,
বেশ, ভূষা, রঙ্গে ছলি,
সন্তানে পরীক্ষা কর সাজি কুহকিনী;
"কাম"-রূপী মহামায়া কামঘ্ন কামিনী।

জ্ঞানের মোহ

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(৭)

অরুণের বাড়ী আসিতে অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আশা দেবী বলিলেন—

—সেই কোন ভোরে বেরিয়েছিলি, এতক্ষণে ফিরলি—কতক্ষণ থেকে তোর চায়ের জল নিয়ে মনোহর ব'সে আছে!

অরুণ বলিল—আজ ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে।

—কতদূর গিইছিলি?

—বেশী দূর নয়।

—তবে এত দেরী হ'ল যে?

মায়ের দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল—তোমাদের রাধাগোবিন্দর পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম।

—তাই বুঝি! যা কাপড় ছেড়ে আয়—আমি তোর চা, খাবার দিতে বলি—

অরুণ চা পান শেষ করিয়া কাছাড়ীর দিকে গেল। তাহাকে দেখিয়া গোপী বলিল—খাতা দেখ্‌বেন কি?

বসিয়া অরুণ বলিল—না, আপনার কাজ দেখতে আমি আসিনি—

—তবে?

—কিছু টাকার আমার দরকার—তাই আপনাকে বল্‌তে এসেছিলুম্।

—এখুনি চাই কি?

—না। আপনার খাজনা পাঠাতে হবে কবে?

—তার এখন দেরী আছে।

—তবে কিছু বেশী টাকা আমার জন্যে রাখ্‌বেন আপনি।

—কোন মহাল কিনবেন কি?

একটু হাসিয়া অরুণ বলিল—জমিদারী কেনা ছাড়াও টাকার প্রয়োজন হয়!

—তা হো বটেই!

—আমাদের গ্রামে একটি ম্যাট্রিক স্কুল, আর হাস্‌পাতাল করবার আমার ইচ্ছা আছে।

—আপনার এ সঙ্কল্প খুব ভাল। একটা হাই স্কুল না থাকায় ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়া আর সকলের হ'য়ে ওঠে না, আর হাঁসপাতালেরও সত্যি খুব দরকার। গাঁয়ে আদ্দেকের বেশী গরীব, তার ওপর যে সব নীচ জাতরা আছে, তাদের তো কথাই নেই—কাজেই রোগ হলে তার চিকিৎসা করা কারও সাধ্যে কুলোয় না!

অরুণ বলিল—আমি গাঁয়ে এসে নিজের চোখে এ সব দেখেই তো তা বুঝলুম! ছোট বস্তির গরীবদের জন্যে, আমি কোন কাজ দিতে চাই, যাতে তাদের পেট ভরে।

—এ সব খুব ভাল কথা! আপনি গাঁয়ের জমীদার—আপনি যদি প্রজার দুঃখ না বুঝবেন তবে বুঝবে কে?

—কিন্তু তা বোঝা যে আমার অন্যায়, তা শুনেছেন তো সকাল বেলায়! বলিয়া অরুণ গোপীনাথের দিকে চাহিয়া হাসিল।

—ওঁর কথা ছেড়ে দিন্! চিরদিন ঠাকুর নিয়ে আছেন, সংসারের দিকে ওঁর অমনিই মনের ভাব!

—যাক্, সে কথা! এখন আমাদের কাজের কথাই হোক্—এই যে স্কুল আমি করবো, এতে সব জাতের ছেলেই পড়বে, আর যুগী, ডোম্ ক্যাওট, অর্থাৎ এই সব জাত অতি গরীব—তাদের ছেলেরা চার ক্লাস পর্য্যন্ত ফ্রি পড়বে, তারপর ভাল ছেলে হ'লে, তাকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ান হবে।

খাজাঞ্চি এতক্ষণ নিজের কাজ করিতেছিল, আর সব শুনিতেছিল। অরুণের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—ছোট জাতের ছেলেরা আপনার স্কুলে পড়বে বললেন, তাহলে কিন্তু গাঁয়ে অন্য লোকরা ছেলে পাঠাবে না!

—কেন?

—আপনি তো পাড়াগাঁয়ের কথা সব জানেন না—ছোট থেকে কল্‌কাতাতেই ছিলেন।

—আপনার কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু সে সব গোল, যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করবো। এখন আর একটা কথা আমার আছে, দাওয়ানজী মশায়!

—বলুন?

—গাঁয়ের এই জঙ্গলগুলো কাটাতে হবে, আর যে সব পুকুর অপরিষ্কার আছে, সেগুলো পরিষ্কার করাতে হবে। এ সব কাজ করবে আমার ঐ গরীব প্রজারা, কিন্তু তাদের ন্যায্য মজুরী আমার তহবিল থেকে আপনি দেবেন। কাল থেকেই এ কাজ যেন সুরু হয়।

গোপী বলিল—যে আজ্ঞে!

(৮)

ছেলের দিকে চাহিয়া আশা দেবী বলিলেন—কাছারি-বাড়ীর গিইছিলি বুঝি?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, কাজ দেখ্‌তে আমি যাইনি!

হাসিয়া আশা দেবী বলিলেন—তবে কাছাড়ীর চেহারা দেখ্‌তে গিইছিলি বুঝি?

—না—তা ও নয়! যে জন্যে গিয়েছিলুম, তা শুনলে, তুমি কিন্তু নিশ্চয় খুসী হবে মা!

—খুসীর কথাটা কী শুনি তো আগে—

—তোমার নামে এখানে আমি একটা হাঁসপাতাল করবো!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আশা দেবী বলিলেন,—হাঁসপাতাল ক'রবে ভালই, কিন্তু আমার নামে নয়, অরুণ!

—কেন মা?

—এ সাধ যাঁর ছিল, তাঁরই নামে তুমি করো অরু!

—বাবার ও কি এই ইচ্ছে ছিল মা?

—শুধু এই নয়, অনেক সাধই তাঁর মনে ছিল! কিন্তু কিছুই হ'তে পে'ল না—অসময়ে ডাক্ আসায়! আশা দেবীর চোখ দুটি অশ্রু বাষ্পে ভরিয়া আসিল।

—তাই হবে মা! হাঁসপাতাল আমি বাবার নামেই করবো, আর তোমাকে বলা হয়নি, একটা স্কুলও করবো ভেবেছি—সেটা কিন্তু তোমার নামেই হবে!

—তোমার আশা পূর্ণ হোক্ বাবা!

—তোমার আশীর্ব্বাদ আমার সবচেয়ে বড় সম্বল মা, আজ আমার এত আনন্দ হ'য়েছে, তোমার কথা শুনে বাবারও এই ছোট গাঁ খানির দুঃখে প্রাণ কেঁদেছিল ব'লে, কিন্তু আমি অতি দুর্ভাগা যে শিশু বয়েসেই তাঁকে হারিয়েছি—

—তুমি দুঃখু করো না, অরু! তিনি তোমার সামনে নেই, কিন্তু তাঁর এই জন্মভূমির মধ্যে তিনি আছেন—এ আমি জানি, বাবা!

—বাবার কোন কথাই আমার মনে পড়ে না, মা, কিন্তু তোমার মধ্যেই আমি তাঁকে পাই, তবু জানিনে কেন, আজ তাঁর অভাব বড় বেশী ক'রে আমার মনে হ'চ্ছে।

—বলিছি তো অরু! দুঃখু তুই করিস্‌নে, বাবা—তাঁর ইচ্ছেই তোর মধ্যে তিনি দিয়েছেন! তোর এ সব সাধ বাবাকে বলেছিস্? বলিয়া আশাদেবী পুত্রের দিকে চাহিলেন।

—হ্যাঁ!

—কখন?

—সন্ধ্যের সময়, তুমি তখন জপ করছিলে। আমি দাদুর কাছে যাচ্ছি—বলিয়া অরুণ উপরে গেল।

তাহাকে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—এসো অরুণ! আজ কি এতক্ষণে বে'ড়িয়ে এলে না কি?

—না দাদু! আজ আমি একটু কাছারি বাড়ী গেছিলুম। কাল সন্ধ্যাবেলা আপনাকে যে কথা বলেছিলুম, তার টাকার জন্যে দেওয়ানজীকে বলতে।

—গোপী কি বললে?

—তিনি আর কি বলবেন!

—টাকায় তোমার কুলুবে তো?

—হ্যাঁ! টাকা তো যথেষ্টই জমা রয়েছে!

—খরচ ত আর বিশেষ কিছুই হয়নি এতদিন, জমাই তো উচিত। জমীদারী ও তো নেহাত ছোট খাটো নয়! সে যদি থাকৃত! আজ জমীদারী আরও কত বাড়িয়ে

তুল্‌তো। পুত্রের কথা মনে হওয়ায় ঘোষাল মহাশয়ের কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল।

—সে কথা ভেবে আর দুঃখ পাবেন না, দাদু

—দুঃখই যে সংসারের কাছে আমার পাওনা তা ভুলবো কি ক'রে ভাই!

—কিন্তু পৃথিবীতে যতক্ষণ থাক্‌তে হয়, তা না ভুললেই বা কি ক'রে চ'লে—

—সবই চ'লে, দাদা! এ ভুলবার নয়! বলিয়া ঘোষাল মহাশয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

—কিন্তু চেষ্টা তো করা উচিত!

—তার কসুর তো আমার নেই—অতি বড় পাপী পুত্র শোক পায়—

—অমন কথা বলবেন না দাদু! আপনার মতো পুণ্যবান ক'জন আছে! সংসারে থেকেও আপনি সন্ন্যাসী!

—মাথা নাড়িয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—না দাদা! অমন কথা ব'লো না।

—কেন ব'লবো না? সংসারের সকল বাঁধনই তো আপনি কাটিয়েছেন! ধর্ম্মগ্রন্থগুলিই আপনার সাথী?

—বাঁধন আর কাটাতে পেরেছি কই, ভাই! তোর মায়ায় যে জড়িয়ে আছি, তা কী বুঝিস্‌নে অরু!

আশাদেবী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্বশুরের কথাগুলিতে দুঃখে তাঁর ও প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি ঘোষাল মহাশয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন,—আপনার দুধ এনেছি বাবা—

বধূর দিকে ফিরিয়া রাধানাথ বাবু বলিলেন—তোমার পূজো হ'য়েছে, মা?

দুধ খাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে রাধানাথ বাবু আশাদেবীকে বলিলেন—বেলা অনেক হয়েছে, তুমি ও একটু জল খাবে মা!

—আজ একাদশী। শ্বশুরের সামনে এই কথাটি বলিতে আশাদেবীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল।

—ওঃ—বলিয়া ঘোষাল মহাশয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মৌন রহিলেন।

শ্বশুরের সাম্‌নে হইতে আশাদেবী অপরাধিনীর ন্যায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অরুণ ও বিমনা হইয়াছিল।

পিছন হইতে আশাদেবী বলিলেন—অরু, স্নান ক'রতে যাও, বেলা হয়েছে—

—যাই মা! বলিয়া অরুণ জননীর দিকে চাহিল।

ম্লান একটু হাসিয়া অরুণের দিকে চাহিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—দেখলি তো ভাই! তোর দাদু কেমন তপস্বী!

—কেন?

—বলে—"আমার ষোল আনা প্রাণ সংসারেতে টান, শুধু লোক দেখা'ন হরি ডাকি দয়াময়"! বৌমার আজ উপোস্‌ শুনেই, মনটা আবার সেই সংসারের ব্যথায় কাতর হ'য়ে উঠলো।

—কিন্তু একবারে মায়া ত্যাগ করলেই বা চলবে কেন, দাদু! আমরা ও তো আপনার স্নেহের দাবী করি!

—তা তো করিস্‌ ভাই! কিন্তু একেবারে ছেড়ে—একটু ও তো ছাড়তে পারছি নে।

—ছাড়বার আপনার দরকার নেই। এখন বলুন দেখি আমি যে সব করবো ঠিক করেছি, তাতে আপনার মত আছে কি না?

—সে কথা তো কালই বলেছি তোমায়! তুমি আমার বংশের একমাত্র কুল প্রদীপ! তোমার জন্মভূমিকে তুমি ইচ্ছে মত ক'রে সাজাও অরুণ!

৯

অরুণ বলিল—মা তোমার সন্ধ্যে করা হয়েছে?

—হ্যাঁ, কেন?

—চ'ল, আজ তোমাকে স্কুল বাড়ী কেমন তৈরী হচ্ছে দেখিয়ে আনি! না, এমনি ক'রে তুমি চার মাস ফাঁকি দিচ্ছ? আজ তোমাকে যেতেই হবে।

—তবে চল্‌ বাছা! তোর ইস্কুল কেমন হচ্ছে দেখেই আসি—বলিয়া আশাদেবী আসিলেন।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—সত্যি বৌমা! তোমার ভারী অন্যায় বাছা! ছেলে তোমার কবে থেকে বল'চে কিন্তু তুমি একদিন ও গেলে না! কী করবো, আমার

যে হাঁটবার শক্তি নেই, তা না হ'লে আমারও ইচ্ছে হয় যে দেখে আসি।

খুশী ভরা কণ্ঠে অরুণ বলিল—আপনি যাবেন দাদু? চলুন্ না। হাঁটতে তো আর হবে না আপনাকে—মোটরে যাবেন।

—না, আজ বৌমাকেই নিয়ে যাও। পূর্ণিমে কাছে, আমার বাতের ব্যাথাটা বেড়েছে—আমি একদিন দিনের বেলায় যা'ব।

—তবে থাক্, স্কুলের উদ্বোধন আপনাকে দিয়েই করাবো।

—তোমার যদি সে ইচ্ছে থাকে, তাই হবে।

—তবে চলো মা, বলিয়া অরুণ জননীর দিকে চাহিল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—কিসে যাচ্ছেন বৌমা?

অরুণ বলিল—মোটরেই নিয়ে যাব—

—আশাদেবী বলিলেন—গাড়ীর দরকার কী অরু! রাধা গোবিন্দের মন্দির তো বেশী দূর নয়। তার কাছেই বলিলি না?

—হ্যাঁ।

—তবে আর কি! এমন সুন্দর চাঁদের আলো অনেক দিন তো রাস্তায় বেরুইনি, আমি হেঁটেই যাব।

খুসী ভরা গলায় অরুণ বলিল—তাই চলো মা। চাঁদের আলোয় রাস্তা হাঁটতে ভারী ভালো লাগে।

—কিন্তু বৌমার তো রাস্তা হাঁটা অভ্যাস নয় অরু। বলিয়া ঘোষাল মহাশয় অরুণের দিকে চাহিলেন।

—বেশী দূর তো নয় দাদু, আমাদের বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে খুব কাছে পড়ে।

—তবে আর রাত করো না, আর রঘুবর সিংকে সঙ্গে না-ও।

—কেন?

—রাত্রিকাল বৌমা যাবেন।

হাসিয়া অরুণ বলিল—তাতে ভয় কী দাদু! আপনার আরুণ কি এমনি অকর্ম্মণ্য যে যদি কোন বিপদ হয় তো সে তার মা'কে রক্ষে করতে পারবে না! কোন ভয় নেই দাদু! আপনার নাতির হাতে এ জিনিষটি থাকলে কারও সাধ্যি হবে না যে তার মার একগাছি চুলও ছোঁয়!

—তুমি লাঠি খেলতে শিখেছ না কী?

—কিছু কিছু—

—শুনে ভারী আনন্দিত হলুম অরুণ। একদিন তোমার দাদুর ওটা খুব সখের জিনিষ ছিল আর শক্তিও কিছু কম রাখত না; আজকাল এর চর্চ্চা না থাকায় নিজের মা বোনদের রক্ষে করবার সাহসও সব গেছে। প্রায়ই কাগজে শোনা যায় অমুক মেয়েকে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গেছে, যেন তাদের বাপ ভাই কেউ নেই! নিজের মা বোনদের যারা রক্ষে করতে পারে না তাদের বেঁচে থেকে লাভ কি!

—আপনার কথা খুবই সত্যি দাদু! আমাদের ছেলে মেয়েদের ওপর এই অত্যাচার যেন ব্যাধির মত ছেয়ে পড়ছে, অথচ তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না।

—এ আজ নূতন নয় অরুণ। আবহমানকাল থেকে দুর্ব্বল নারীর ওপর এই অত্যাচার হয়ে অসছে। আগে দৈত্য দানবরা ছিল এখন এই সব মানুষের মধ্যে তারা রূপ বদলে এসেছে। কিন্তু যারা এই লাঞ্ছনার হাত হতে উদ্ধার করতে পারত তারা নিজেদের দোষে সে শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এখনও যদি পুরুষরা লাঠির মর্য্যাদা বোঝে তাহলে এই দুর্বৃত্তদের অত্যাচার কমে যায়। কাগজের কথাগুলো যখন শুনি আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে অরুণ, মনে হয় আমাদের দেশের যুবকরা করছে কী! কবে তাদের এদিকে খেয়াল হবে!

—আপনি সত্যি কথা বলেছেন দাদু? আমাদের এমনি দুর্ভাগা দেশ যে অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেয়! এই কথা জেনেই গুণ্ডাগুলোর সাহস বেড়ে গেছে কিন্তু এই লাঠি যে আমাদের কত বড় অস্ত্র তা ভুলে গেলে চলবে না। আমার প্রত্যেক প্রজাকে লাঠি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করবো, আর অন্যান্য জায়গায় যাতে এর পূর্ব্ব গরিমা ফিরে আসে তারও চেষ্টা করবো।

—তোমার এই সব কথাগুলিতে আমাকে যে কত আনন্দ দিলে অরুণ তা মুখে বলতে পারছিনে।

—কলকাতায় দুজন হিন্দুস্থানীকে আমি জানি তারা খুব ভাল লাঠি খেলা জানে—তাদেরই একজনকে আমি আনাবো।

—তার দরকার কি ভাই! এতদিন এই জমিদারী

যাদের লাঠির জোরে চলে এসেছে তাদের বংশের লোকই পাবে এই গাঁয়ে—

—তার নাম কি দাদু ?

—ধনঞ্জয় ; গাঁয়ের শেষে নদীর ধারে তার ঘর। নাম-জাদা লেঠেল সে, এখন বুড়ো হয়েছে—

—তার চলে কি ক'রে ?

—পেনসেন সে আমাদের কাছ থেকে কিছু পায় তাছাড়া শুনেছি সব ছোট ছেলেটি বুঝি বেঁচে আছে, সে কিছু করে।

একখানি খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়া আশাদেবী আসিয়া বলিলেন—আমাকে তো একক্ষণ তাড়া দিচ্ছিলি। এখন তো নিজেই গল্প নিয়ে বসেছিস্ দেখছি !

—কিন্তু আমার ত দেরী নেই, চলো না তুমি। বলিয়া অরুণ দাঁড়াইল।

১০

রাধা গোবিন্দের সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়া গেলে, জনার্দ্দন বলিলেন—অনেকদিন তোমার গান শুনিনি উষা একটা গান করো—

শোবার ঘর হইতে সেতার আনিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া উষা বলিল—

—কি গাইব, বাবা ?

—জয়দেবের সেই গানখানি তোমার মুখে বড় সুন্দর লাগে...চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর...

অরুণের স্কুল রাধা গোবিন্দর মন্দিরের কাছে। জ্যোৎস্না উদ্বেলিত রাত্রি, গ্রামের ছোট্ট নদীটি পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে চাঁদের আলোয় নদীর অপর পার পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া আশাদেবী দাঁড়াইয়া ছিলেন। সঙ্গীতের সুর কাণে আসিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—কাছে তো কারো বাড়ী দেখছিনে এমন মিষ্টি, গান কোথায় হচ্ছে ?

—মন্দিরে বোধ হয়, যাবে মা ?

—এত কাছে যখন এসেছি তখন যাব বই কি বাবা ! অনেক দিন ত আসিনি।

—কতদিন আসনি ?

—তা হয়তো এক যুগই হবে। বলিয়া আশাদেবী হাসিলেন।

—এতদিন তুমি ঠাকুর দেখনি মা !

—কই আর দেখেছি বাবা—

কথা কহিতে কহিতে মাতা পুত্রে ঠাকুর বাড়ী প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে তাহারা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উষার গান শুনিতে লাগিল।

উষা গান শেষ করিয়া সেতারটি কোলের কাছে নামাইয়া আঁচলখানি গলায় দিয়া সেইখানে প্রণাম করিল।

জনার্দ্দন ভক্তি প্রেমপূর্ণ চোখে, বিগ্রহের দিকে চাহিয়াছিলেন।

উষা উঠিয়া সম্মুখে আশাদেবীকে দেখিয়া বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিল।

আশাদেবী তার কাছে সরিয়া বলিলেন—বড় মিষ্টি গলাটী মা তোমার !

জনার্দ্দন ফিরিয়া আশাদেবীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আপনি !

মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া আশাদেবী বলিলেন, —অরুণেরই স্কুল দেখতে এসেছিলুম, ঠাকুর দেখবার লোভটা আর সামলাতে পারলুম না।

—আসুন ভেতরে।

—এটি আপনার মেয়ে ?

—হ্যাঁ—ঐ আমার একমাত্র বন্ধন। উষা প্রণাম কর।

—নত হইয়া উষা প্রণাম করিতে যাইতেই আশাদেবী তাহাকে ধরিয়া বলিলেন—থাক্-মা। ঠাকুরের সামনে আর কারও প্রণাম নেবার অধিকার নেই।

জনার্দ্দন বলিলেন—উষাকে আমার আশীর্ব্বাদ করুন আপনি, যেন সে যোগ্য পাত্রে পড়ে।

—আপনার মেয়ে রাজরানী হবে বাড়ুয্যে মশায় !

—গরীব ব্রাহ্মণের এ দুরাশা ! তা আমি কোনদিনই করিনি, তবে একটি ভাল ছেলের হাতে দিতে পারলে, নিশ্চিন্ত হই।

অরুণ এতক্ষণ চুপ করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, মাঝে মাঝে ঊষাকে দেখিতেছিল। সে বলিল—মা, তোমার ঠাকুর দেখা হ'য়ে থাকে তো চ'ল এবার—

—তুই ভেতরে আয় না, অরু।

—না মা! তাহ'লে এখুনি উনি রাগ করবেন।

—রাগ আবার কে করবে?

—যাঁর ঠাকুর!

—ঊষা মুখ তুলিয়া একবার অরুণের দিকে চাহিল। অরুণ একটু হাসিল।

আশা দেবী বলিলেন—কী বল্‌ছিস্, পাগলের মত! রাগ ক'রবেন কেন?

—আমি যে সব জাতকে ছুঁই, মড়া ঘাঁটি, মন্দিরে ঢুকলে অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে যে।

—তুই নেহাত্ ক্ষ্যাপা, অরু! বলিয়া আশা দেবী হাসিতে লাগিলেন।

—হাস্‌ছ যে?

—তোর কথা শুনে

—কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি, মা! জিজ্ঞেস্ ক'র ওঁকে।

—থাক্! ওঁকে আবার জিজ্ঞেস্ ক'রব কি! উনি তো তোর মত পাগল নন, মস্ত বড় পণ্ডিত! ঠাকুর মন্দির পবিত্র জায়গা—সেখানে কেউ এসে অপবিত্র ক'রতে পারে না—সে কথা তোর চেয়ে, উনি বেশী জানেন!

—কিন্তু তা তো উনি স্বীকার করেন না—

—কে ব'লেছে করেন না?

—যদি বলি ওঁর মুখেই শোনা।

—ও কথা আমি বিশ্বাস করিনে, অরুণ! নে—আর বাজে বকিস্ নে—

জনার্দ্দন, অরুণকে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়াছিলেন, তার কথা বার্ত্তায় মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। কন্যাকে বলিলেন—ঊষা প্রসাদ দাও।

আশাদেবী, ঊষার মুখটিতে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন—এখন আসি মা, রাত অনেক হ'ল, তোমার গান আমার বড় ভাল লেগেছে, আর একদিন শোনাতে হবে, কিন্তু!

ঊষা শাল পাতের ঠোঙ্গা করিয়া আশাদেবীকে প্রসাদ আনিয়া দিল। তার হাত হইতে প্রসাদ লইয়া আশাদেবী জনার্দ্দনকে বলিলেন—আপনার মেয়েকে, কিন্তু একদিন আমি নিয়ে যাব, পাঠাবেন ত?

—আপনি নিয়ে যাবেন, তাতে কি আমার অমত থাকতে পারে! তবে ওর অনেক কাজ থাকে—

—তা থাক্—একদিন আমার ওখানে গেলে কাজের কোন ক্ষতি হবে না! বলুন্ পাঠাবেন?

—আপনারা জমীদার, আপনার কথায় কি না বলা সাজে!

—এ কথা যদি ভাবেন তা হ'লে কিন্তু পাঠাবেন না।

—না, আপনি কিছু মনে করবেন না—যেদিন ইচ্ছে হবে, নিজের মেয়ে মনে ক'রেই নিয়ে যাবেন। আসুন, তুলসী পাতা-দি—

জনার্দ্দনের পিছনে আশাদেবী ঠাকুরের চরণ-তুলসী লইতে গেলেন।

ঊষা অরুণের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি যে জমীদার এ কথা তো বলেন নি কোনদিন!

হাসিয়া অরুণ বলিল—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে আপনার!

—বাঃ! জমিদার না জেনে কত আবোল তাবোল বকেছি!

—তা তো ভালই করেছেন। কিন্তু এখন জমিদার শুনে যদি তা বন্ধ করেন' তাহ'লে কিন্তু আমি ভারী দুঃখিত হ'ব!

—কিন্তু জমীদারের মান রেখে চল্‌তে হবে ত!

—না তার দরকার নেই। আপনার কাছে আমি জমীদার নই, স্বধু অরুণ!

(ক্রমশঃ)

পল্লীকবি-মোবারক আলি

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলায় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের রচিত গীতি-কবিতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু গান ও ছড়া প্রচলিত আছে। এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে দৈনন্দিন সমাজচিত্রেরও বহুল উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শিক্ষিত সমাজের অনাদরে এই সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই ছাড়াগুলি এমন ভাবে সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া রচিত যে অতি সহজেই আবালবৃদ্ধবনিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই গীতি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষার স্বাধীনতা ও ভাবের মাধুর্য্য।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলাকে আমরা কয় জনে জানি? পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত সহরের কর্ম্ম কোলাহলের মধ্য হইতে আমরা কি কখনও চোখ ফিরাইয়া লইয়া সুদূর ঢাকার পল্লীর দিকে বিভোল দৃষ্টিতে চাহিতে পারিয়াছি?—আধুনা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহারই একান্ত অভাব। শিক্ষিত সমাজের এই অনাদরের জন্য শুধু অমূল্য সাহিত্য সম্পদ নহে,—অগণিত সাহিত্যিক প্রতিভা লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া চির আত্মগোপন করিয়া বনফুলের মত বনেই শুকাইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে।—সরল পল্লী জীবনের সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য হইতে কোন সন্ধানী পুরুষ আজ তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিবে?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঢাকা জিলার একজন পল্লী কবির রচিত গীতি কবিতার অবতারণা করিতেছি।—

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বাড়াইভিকরা গ্রামের মোবারক আলি খাঁ একজন স্বভাব কবি। নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশার প্রবল পীড়ন ইঁহাকে কাব্যরসের মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম ও ভারত চন্দ্র রায় সর্ব্বগুণাকরের সাহিত্য রচনার সূচনা ও এই একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কবি হে... সত্যই বলিয়াছিলেন,—

> "হায় মা ভারতি চিরদিন তোর
> কেন এ কুখ্যাতি ভবে।
> যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
> সেই সে দরিদ্র হবে"॥

পল্লীর দরদী মরমী কবি, সর্ব্বহারা চাষীর দুঃখে বি... হইয়া দেশের নেতাদের আহ্বান করিয়া যে গান ... করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর নহে, অধিকন্তু ... প্রাণতার চরম পরাকাষ্ঠা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—

> "জরাজীর্ণ বুকে লয়ে তারা ডাকিয়া যে হয়রাণ,
> তাদের কান্না শুনে না ত কেহ দেয় না তাহাতে কা...
> কত মহামারী ম্যালেরিয়া আর কলেরা বসন্ত জ্বরে!
> প্রতি বছরে যে বাংলা হইতে কোটী কোটী লোক ম...।
> হয়ে অসহায় শুধু হায় হায় করিছে বাংলাভূমি,
> সকল দেশের সকল জাতির নিম্নে গিয়েছে নামি।
> বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে কত অগণিত নর-নারী,
> হায়াৎ থাকিতে স্বাস্থ্যহারা বাংলা যায় গো ছাড়ি॥

এতক্ষণ কবি বাংলা দেশের জন্য আক্ষেপ করিলেন অ... নিজ নিবাস গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অসহায় অ... শোচনীয় কাহিনী বিবৃত করিতেছেন,—

> "ঢাকার পল্লী বাড়াইভিকরা সুয়াপুর রৌহাগ্রাম।
> খালি করে গেছে দুইতিন মাসে ম্যালেরিয়া যার না...
> এক ফোটা করে কুইনিনগুলো জোটে না তাদের ভা...
> দিনে দিনে হায় মরণের পথে এগিয়ে তাহারা চ...

"তেলা মাথায় তেল ঢালিবার" পক্ষে কবি অত্যন্ত খ... তাই আক্ষেপ ভরে বলিতেছেন,—

> "রাজ সরকার, যেখানেতে আর না হলে পরেও চ...
> সেইখানে তার দাতব্যালয় দিয়াছে কতই খুলে॥"

গরীবের অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। বিলাপ করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকা দীনদুঃখীর একমাত্র অবলম্বন। মরমী কবি মোবারক আলী সত্যই বলিয়াছেন,—

"সুপারিস হলে খুলিবে কপাল আমাদের তাহা নাই।
আমরা গরীব আমরা মূর্খ উপায় কোথায় ভাই ?"

কবি শুধু নিজের ও নিজের দেশের জন্য কাতোরক্তি করিতেছেন না, সারা বাংলার যাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ জাতির ভবিষৎ নেতার নিকট আরজী পেশ করিতেছেন,—

"এইরূপ আরো কত শত জেলা কত শত পাড়াগাঁয়
অভাগার দল মরিছে নিত্য কে দেখিবে হায় হায়,
তাই বলি কবি, করুণা আধার করুণা করিতে দান
যারা অসহায় তাহাদের লাগি কাঁদে নাকি তব প্রাণ ?
দুঃসহ রুগ্ন সব হারাদের মুছায়ে দাও না চোখ ?"

সারা বাংলায় আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছাইয়াছে কিন্তু এই দীন মুসলমান কবি সুদূর ঢাকার পল্লীতে বসিয়া যে গান গাহিয়াছেন, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মাত্রেরই তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা কর্তব্য নহে কি ?—প্রকৃত কবি দরদী—মরমী। ক্ষুদ্র স্বার্থের বা সম্প্রাদয়গত কুক্ষির মধ্যে তাঁহার দিগন্তবিশারী কল্পনা কখনও অবস্থান করিতে পারে না। কবি বলিতেছেন,—

শতেক বরষ ব্যাপিয়া যাদের বুকের উপর দিয়া
চলেছে হাজার ব্যথা-নিপীড়ন দীর্ণ করিয়া হিয়া
আধমরা হয়ে রয়েছে বাঁচিয়া যাহারা সহায় হীন
কে আছ দয়াল তাদের পরাণে বাজাও আমার বীণ ?
যুগ যুগ ধরি যাহারা জীর্ণ যাহারা পঙ্গুপ্রায়
হে দীনতারণ তোমার দৃষ্টি সেদিকে ত নাহি ধায় ?

অতঃপর কবি সহসা যেন জাতির নব জীবনের ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন। বিস্ময়চিত্তে তাই কবি গাহিলেন,—

"আকাশ বাতাস মথিত করিয়া বাজে কার জয়গান ?
হিঁদু মোসলেম সবার আজি নাচিয়া উঠিছে প্রাণ।
মনে হয় আজ ঘুমন্ত জাতির চেতনা এসেছে ফিরে।
শতেক বছর আছিল যাহারা মহানিদ্রায় ঘিরে॥
ওই বুঝি আসে কোন মহাপ্রাণ জীবনের বাণী নিয়া।
নব কামনায় নব বাসনায় দিতে সব জাগাইয়া॥
বাংলার দীন বাঙালীর আজি তোমারেই প্রয়োজন।
হে দীন দরদী জিয়াইয়া তোল পল্লীর নিকেতন॥
মরমী দরদী বন্ধু সবার বুকের দরদ দিয়া।
দীন দুঃখীর কিনে নিয়ে যাও ব্যথা নিপীড়িত হিয়া॥"

'ঢাকার গ্রাম্যস্ত্রীর পত্র' শীর্ষক গীতি কবিতাটি সত্যই কবির এক মর্ম্মন্তুদ বিরাট সৃষ্টি। স্বামী বিদেশে অন্নের দায়ে বহুদিন চাকরী করিতেছে। অথচ বাড়ীতে তার দুঃস্থা গৃহিণীর সে কী উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন।—কবি গৃহিণীর পত্রে সেই বিলাপ পরিস্কার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

অসেক দিন ত্ অইল তুমি গ্যাছ এহানথ্যা,
ভুইল্যা গ্যালা হগ্‌গল কথা মনেই নাইক্যা॥
ভাদ্দর মাস জল ক্যাদাতে চলন ফিরন দায়।
আট বাজার ভাইষ্যা গেছে দোকান বসে নায়॥
মাচায় চইর‍্যা রান্দাবারি কচি ছাওয়াল লইয়া,
কেমনে থাকি কষ্ট কত একবেলা ভাত খ্যাইয়া।
হ্যাদিন খোকা জলে পইর‍্যা চুবান খাইচ্যাল বড়,
দুষ্টু বিজায়, জলে খ্যালায় ভয় করে না কারও।
ফেরি লইয়া নিত্তি আহে মুণ্ডা মিঠাইর নাও,
খোকা দেইখ্যা কান্দে কিন্যা দিব ক্যাডা কও ?
সালোর গামছা দিছিল্যা যেডা আরাইয়্যা হেডা গ্যাচে।
তোমার ছোট বইনে কাইলক্যা আমাগো এনে আইচ্যে॥
তার দামান্দে আইস্যা দিয়া চইল্যা গ্যাছে বাড়ি।
ভরা বাইষ্যা এম্যোন দিনে ক্যামনে বা কি করি॥
যে কয় ট্যাহা দিছিল্যা তুমি ফুরিয়ে গ্যাচে তা,
অহন টাকা না দিলে আর চলন যাইব না—।
আমারে তুমি কইয়্যা গ্যালা কইলকাত্তা যাইয়্যা।
লাল সাড়ী আর কাণের গয়না দিমু পাঠাইয়্যা॥
কয় মাস অইল্ অহন্ তরি কিছুই দিলা না॥
না দিলা মোর দুক্কু খালি তুমিও আইলা না॥
পূজার সময় আইস কিন্তু যাইকো না আর ভুইল্যা।
আইজক্যা আমি করলাম ইতি কান্দবার লাগচে ছাইল্যা॥

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন মুসলমান গৃহিণীও পূজার সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখানে প্রবিষ্ট হয় নাই। মোবারক আলি প্রকৃতই দরদী ও

মরমী পল্লী কবি। প্রাণের ব্যথা টানিয়া আনিয়া সন্ত্বনার প্রলেপদানই যেন তাঁহার ব্রত; পল্লী বিরহিনী নামক একটি গীতি কবিতা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

"ভাঙ্গন ধরা ঐ যে নদী ভাঙ্গা তাহার পাড়ি।
ওই ও পাশে তীরটি ঘেঁসে দেখা যায় যে বাড়ি॥
ঐ বাড়িরই মেয়ে ভাই বইয্যা ঘাটের পর।
ওই ওপারে যায় যে দেখা ঐ যে বালুর চর॥
চখাচখি মিলে আইয্যা ঐ না বালুর চরে।
উদাস চোখে ঐ মেয়েটি মিলন তাদের হ্যারে॥
পাল তুলিয়া সারি গাইয়া যায় যে বাইয়া তরী।
কন্যার আঁখি ভাইষ্যা যায় (ঐ) বাদামের নাও হেরি॥
ওর মনে পইড়্যা যায়,—।
অম্‌নি তরই বাদাম দিয়া সে ও গেছিল নায়॥
কাঠ কাটিতে গড় করিতে যায় ত কতই জনে।
তার যাওয়া যে শেষ যাওয়া হায় জানত কে তা মনে॥
যাইবার আগে জানতাম যদি আমি অভাগিনী।
করতাম মানা ধরতাম কাইন্দা তাহার হস্ত খানি॥
আছাড় খাইয়া পড়তাম আমি তাহার পায়ের তলে।
যাইত না সে তুইল্যা লইত তহন মুরে কুলে॥
ভাটির জলে ভাইষ্যা গেল এল না সে আর।
এমনি লেখাই দারুণ বিধি লিখলে ভালে তার॥
ঢেউয়ের ঘায়ে কাঁপছে আজো ভাঙ্গা নদীর কূল।
ফুটছে আজো নদীর পারে তেমনি সরসে ফুল॥
কান্দে কন্যা নিরবধি গাঙ্গের পানে চাইয়্যা।
কয় নীরবে জল তুমি ভাই কইও তারে যাইয়া॥
ধর বন্ধু ? ধর তুমি মোর চোখের এ জল।
কইও তারে তোমার লাইগ্যা কান্‌ছে অবিরল॥"

কবির ভাব বৈচিত্রের আন্তরিকতায় ও নিপুণতায় মেঘদূত ও হংসদূতের কবিকে মনে পড়িয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কবি মোবারক আলী বিরচিত "মাণিক মাঝির নায়" কবিতাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিরহে বিরহিণী দয়িতার সেই চিরন্তন বিলাপ কবির লেখনীতে এক নূতনভাবে মূর্ত্ত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

মাণিক মাঝির নায়,—
আশ্বিন মাসে গাঁয়ের লোকে ছোন কাবারে যায়।
হেবার ডাইক্যা কইল আজ্‌গর—"ওগো মাঝির পো
তোমার নায়ে লইও মোরে "হাতে থামো হো।"
মায় হুইন্যা কয়,—"কাজ কি বাপু দ্যাশেই মজুর ভাও
এইত আমরা বাহার আছি বেশ চলে যা পাও।"
বউ হুইন্যা কয়,—নিষ্ঠুর তুমি, তোমার মায়া নাই
কত শান্তি দিনড্যা বাদেও তোমার দেহা পাই।
ধরি তোর পায়—
মনডা আমার ক্যামোন করে যাইও না ও নায়।"
কেঐর কতায় কান দিলনা মাণিক মাঝির নায়।
সবার সাতে আজ্‌গর আলী ছোন কাবারে যায়॥
ছোনের বাদায় দিনড্যা ভইরা কাটে সবাই ছোন।
বাড়ির লাইগ্যা আজ্‌গর আলীর ক্যামন করে মন॥
মনে পড়ে মায়ের মানা আজিমনের মুখ।
মোর বিরহে আজিমন আজ সইতেয়াছে দুখ॥
দিনের হকল কাজ সাইর‍্যা হয়তো এতক্ষণ।
ভাব্‌তাছে হায় গাঙ্গের কূলে বইস্যা আজিমন॥
যে পথ দিয়া আইচি মোরা দেখ্‌তে আছে চাইয়্যা।
ভাটির জলে গাঙ দিয়া যায় নাইয়্যারা নাও বাইয়্যা।

কবিতাটি বহু অনুসন্ধান করিয়াও শেষের অংশটুকু পাওয়া যায় নাই, বা কবি লিখিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই সকল পল্লী কবিগণ সাধারণতঃ অবসর বিনোদনকল্পেই যা দুই একটি গীতি কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হন, অনেক সময় উই, আগুন, ঝড়জল ও সর্ব্বোপরি বেসমজদার বংশধরের হাতে পড়িয়া সেই সমুদায় সমূলে বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইলেও ৺দীনেশ চন্দ্রের ভাবায় বলিব,—"আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা হীরকমুষ্ঠি।"

"দুঃখের ভাগী" নামক একটি গীতি কবিতায় কবির হৃদয়ের যে বেদনসুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা যেমনই মর্ম্মস্পর্শী, তেমনই হৃদয় বিদারক ও আধুনিক যুগোপযোগী গরীবের বুক ফাটা আর্ত্তনাদ।

"ভগবান, ভগবান,—
খেটে খেটে আর পারি না খাটিতে হয়ে গেছি হওরাণ।
মনে পড়ে মোর বাবার অসুখে পথ্য ছিল না ঘরে।
চাউলের গুড়ো মিছরীর সাথে খায়াতো চাম চ করে॥

অনিয়ম আর অনশনে জ্বলি সেদিন ওপারে যান।
মায়ের কাঁদনে প্রতিবেশীদের বধির হইল কান॥
সম্বল নাই—শুধু আমি ছাড়া আমারে জড়ায়ে বুকে।
সেদিন তাঁহার নিঃস্ব হিয়ায় সান্ত্বনা এলো শোকে॥
চাকুরী করিতে মহানগরীতে—মহান সে মহাজন।
আমার বাবার তপ্ত শোণিতে সঞ্চয় করে ধন॥
দিবসে ও রাতে আঠারো ঘণ্টা খাটুনি লভেছে যার।
সাড়েবার টাকা বেতন দানিয়ে দেখায়েছে দয়া তার॥
সাড়েবার টাকা কি করি না করি, এই আছে এই নাই।
জীবন ভরিয়া খাটিয়াছে শুধু কাঙাল গরীব তাই॥
সে গদীতে বাবা খেটে খেটে তার অস্থি করেছে চুর।
কাগজ গাদার উষ্ণ বাতাসে রচিল মরণ ভুর॥
মাসে মাসে যার বিধবা মায়েরে খোরাক না দিলে নয়।
তার কি গো চলে ভাল ও মন্দ মরণে করিলে ভয়॥
নিদ্ সে আসে না হায়।
পল্লীর সেই আঁধার কুটিরে শুয়ে আছে মোর মায়,—
এমনি ভাবেই একটানা গতি ঘানির গরুর মত।
পঁচিশ বছর খেটে এসে আজ হয়ে গেছি ভাই হত॥
মা ত নাই আজ আমার বেদনা কহিব কাহার ঠাঁই।
মাসের শেষেতে গিন্নির লেখা কড়া কড়া চিঠি পাই॥
হায় ভগবান বাঁচে না পরাণ কবে বা মরণ হবে।
মনিব ছাড়িলে যম ত নেবে না কোথায় দাঁড়াব তবে?
গরীবের লাগি পৃথিবী নহে গো গরীব পৃথিবী লাগি।
সুখ ভাগ নিতে নহে রে কাঙাল—কাঙাল দুখের ভাগী।

স্বামী বিরহে বিরহিনী স্ত্রীর মনে সহসা অভিমানের ভাব জাগিয়া উঠে। অভিমানিনী স্ত্রীর অন্তরের গোপন বেদনা ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে।—স্বামী তার সুদূর প্রবাসে; তার অধীর চিত্ত তার স্বামীর চিন্তায় আরো চঞ্চল হয়ে উঠে। তবুও স্বামীর কুশল সংবাদ পতি প্রাণা স্ত্রীর নিকট গিয়ে পৌছায় না। তাই স্ত্রীর মনে ক্ষনেক অভিমান ক্ষণেক ব্যগ্র ব্যাকল চঞ্চলতা নিবিড় করিয়া তুলিতে থাকে। আত্মবিভোল মুগ্ধ দরদী প্রেমিক কবি-মোবারক আলীর তুলিকায় সেই মর্ম্মস্পর্শী বিলাপ অভিমানিনীর অন্তরের বেদনা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"এত করে কয়ে তারে দিছি বার বার।
আজো ডাকে চিঠি কই এলো না ত তার॥
এক নয় দুই নয় সাত দিন যায়।
তবে কেন চিঠি মোরে দিল না সে হায়॥
পই পই করে আমি দিছি তারে কয়ে।
কি মানুষ ভুলে গেছে সেখানেতে যেয়ে॥
পথপানে চেয়ে আমি থাকি রোজ রোজ।
কি ভাবে সে গেল পথে নাই কোন খোঁজ॥
বেশ আমি আজ থেকে ভাবিব না আর।
বয়ে গেছে রাতদিন বসে ভাবিবার॥
দেখে নিব এর পরে যত চিঠি দিক—
যদি আমি পড়ে দেখি দিও তবে ধিক্॥
এমনি সে মোর সাথে কয়ে বারবার।
দেখে নিও আমি চিঠি লিখিব না আর॥
দেখো সখি শেষে নিজে দিয়ে মোরে দোষ।
লিখিবে যখন চিঠি করে আফ্‌শোস॥
কিছুতেই আমি তার দিব না জবাব।
বসে রব তারি মত বেশ চুপ চাপ॥
কি বল্লি, বেলা গেছে, সাঁজ হয়ে এলো?
আসুক সে কোন কাজ লাগে নাক ভাল॥"

নারী হৃদয়ের কি ব্যাকুল বিলাপ কবির ভাবনৈপুণ্যে সুন্দর ভাবে মূর্ত্ত হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত কবির রচিত বিলাপপূর্ণ গীতিকবিতাগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু এবার দেখিতেছি, কবি দুঃস্থ বা নিরন্ন হইলেও জগতের অন্তস্তরে ঘোরাফেরা করেন। তিনি আপনার অবস্থাতেই আপনি সন্তুষ্ট। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দুইটি পংক্তি মনে পড়ে।

হাস্য মধুর দুঃখ রস সব হাস্য মুখেই বয় গো,
কাব্য দেখে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।

পল্লী কবি মোবারক আলীও ঐ একই সুর তাঁহার কাব্যে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন,—

"আমি চাষা ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র অতিশয়;
হোক সে হেয় ভদ্রদিগের,
আমি শুধু আমার নিজের,
তৃপ্তি যাতে তাই ভাবি ঢের,
অন্য কিছু নয়।

আমার আশা মাঠে যেন শস্য আমার হয় ॥
আমার গোঠের গরুর যেন জমা থাকে ঘাস ;
রোজ বিহানে উইঠ্যা আমি,
চষতে যাব মাঠের জমি,
দুপুর বেলায় ডাঙ্গায় নামি ধরব খাইবার মাছ।
আমার আশা এমনি করে কাটাই বারোমাস ॥
শনি কিম্বা মঙ্গলবারে হাটের বেলার আগে,
গিন্নি এসে বলবে ওগো,
ঘরে যে তেল নুন নেই গো
সব ভুইল্যা বইস্যা থাকো মনে যেন থাকে।
বেগুনগুলি বেচতে হবে গাছেই গেল পেকে ॥
দারুন হুকুম পাও ফেলিয়া যখন যাবে চলি,
বলব ডেকে ওরে কুলি,
তুলে দেত বেগুনগুলি,
ভাত দিয়ে যাও খেয়েই চলি হাটের সময় যায়।
হাসিমুখে ভাত বাড়িয়ে আইস্যা কুলির মায় ॥
আষাঢ় মাসে আইষ ধানে ভরবে বাড়ী ঘর।
মড়াই বেঁধে ধান রাখিব,
ঘরগুলি সব পালা দিব,
ঘাটের নৌকা পাঠাইব সোনা গনের গড়।
ফিরে এলে সেই কাঠেতে তুলব আমি ঘর ॥
বর্ষা এলে ডুববে যখন গাঁয়ের চারিধার।
গিন্নি আসি বিনয় করি,
বলবে,—"তোমার পায়ে পড়ি,
এবার আমায় বাপের বাড়ী পাঠাও একটিবার।
সাধ হয়েছে দেখতে আমার ভায়ের বাড়ীঘর ॥
এমনি করে বলবে মোরে কুলির বিয়ের কথা,
আমি দেখব জামাই আমার,
আমার মতই করে খামার,
বাবুগিরি নাইক যাহার বড় বড় কথা।
তারেই আমার মেয়ে দিব আমি কুলির পিতা ॥
দানধর্ম্মে থাকবে আমার সত্যপথে মন,
ভক্ত মতন উপাসনা,
করব সদাই ভুল হবে না,
তত্ত্ব কথার আলোচনা করবো কিছুক্ষণ।
এর বেশী আর সুখী হতে চায় না আমার মন ॥"

বাস্তবিকই এই সমুদয় আত্মভোলা অল্পে সন্তুষ্ট পল্লী কবিদের কাহিনী শুনিলে স্বভাবতঃ মন যেন অতীত যুগে ফিরিয়া যায়! ঢাকার পল্লী অঞ্চলে গীতিকবিতা ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত ভ্রমণকালে আমরা এই দীন কবি মোবারক আলির গৃহে গিয়াছিলাম। দারিদ্র্যের একখানি নিখুঁত ও জীবন্ত চিত্র নয়ন সম্মুখে প্রতিফলিত হইলেও সেই নিরন্ন দুঃস্থ পল্লী কবির নিবিড় আন্তরিকতায় আমরা বিমুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। কত কাল পূর্ব্বে অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই সমুদায় গাথা প্রাণের আবেগে মোবারক আলির তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করায় শুধু তাহার জীবনের অদম্য কৌতূহল ও নিদারুণ অভাবের কাহিনী শুনিয়া সত্যই অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। শুনিলাম মোবারক আলী সাহেবের কলিকাতার "বৈঠকখানায়" একখানি সামান্য দোকান ছিল। কবির রচিত "পূর্ব্ববঙ্গের দোকানদার" নামক একটি গীতি কবিতায় আজও সেই স্মৃতি জাগিয়া রহিয়াছে ;—

"অইরে তোরা এ্যামন কইর্যা কাইজ্যা করস্ ক্যান
আয় এহেইনে হোন আমি কই পাইত্যা দুইড্যা কান ॥
দুইড্যা এ্যাকটা কতা লইয়্যা এ্যামন করলে পরে।
ক'ত দেহি ক্যামনে তরা থাকপি একই ঘরে
দ্যাখ্‌ত চাইয়্যা বিদ্যাশের আইশ্যা কতইজন।
একই ঘরে রইছে তারা সব্বাই এক মন ॥
তগোর মতন অইলে কিরে বিদ্যাশ করণ যায়।
আইবার সমায় আমারে যে কইয়্যা দিস্যাল মায় ॥
দ্যাহ বাপু ধন !—
বিদ্যাশ যাইয়্যা থাইক্ তুমি বুইজ্যা সবার মন ॥
পয়লা যেবার আইলাম আমি পরাণ চাচার ঠাঁয়।
হেই আমারে এ্যাহান্‌কার সব পথ চিনাইয়্যা দেয় ॥
হেই আছিল এই গদিতে মালিক হেমুমকার।
দশটা বছর ছিলাম আমি তারই খাদেমগার ॥
পরাণ চাচা অকৃনাহাকে বকৃত কতই মোরে।
আইজ তক্ওক্ত তবু আমি দোষ দেইন্যা তারে ॥

হেইত মোরে মানুষ কইর‍্যা থুইয়্যা গ্যাচে ভাই।
তার পর্‌তাবে আইজক্যা আবি দুইড্যা পয়সা পাই ॥
ত্তহন্ যদি ত'গোর মত দুই এ্যাক কতা লইয়্যা ॥
যাইতাম আমি কাজ কাম সব্ ফ্যালাইয়্যা থুইয়্যা ॥
তা হইলে কি আজ আমারে পাইত্যা কেহই অ্যানে।
কি আচিলাম কি অইয়াছি বুইজ্যা দ্যাহ মনে ॥
চাহর আমি আচিলাম ভাই এই দুহানের পর।
আইজক্যা কিনা হেই আসিতিং নিজি দুহানদার ॥"

প্রকৃত পক্ষে ভাব ও ভাবুকতার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে পল্লীর এই সমুদয় অজ্ঞাত নামা কবিদের রচিত গীতি কাব্যগুলিকে কোনক্রমেই অবহেলা করা যায় না। দুঃখের বিষয় বাংলার লক্ষ লক্ষ পল্লীতে আজ কবি মোবারক আলীর মত কত অগণিত অজ্ঞাত কবিদের প্রতিভার দানগুলি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে! বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কি এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পল্লীকবিদের অস্তিত্ব রক্ষার পথে সহায়ক হইবেন।

অরুন্ধতী

শ্রীমতী শ্রীলেখা চৌধুরাণী

নিশার সুনীল বাস ধরণীরে দেয় যবে ঢাকি,
নক্ষত্র খচিত নভে তব আশাপথ চেয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে তব ক্ষীণ জ্যোতি,
পতি বশিষ্ঠের পাশে, অয়ি অরুন্ধতি!
তব পুণ্যগাথা ওগো ধীরে জেগে ওঠে মম মনে,
পতি সাথে তপোরতা ছিলে যবে নিবিড় কাননে,
সুখে ছিলে সাথী তাঁর পুণ্যের সঙ্গিনী,
ধর্ম্মের সহায় ছিলে শক্তি স্বরূপিনী।
বিশ্বামিত্র ঈর্ষানলে শত পুত্র হারাইলে যবে;
বশিষ্ঠের পিতৃপ্রাণ কেঁদেছিল হাহাকার রবে ;—
অসহ ব্রহ্মণ্য তেজ ছুটেছিল দহিতে সংসার,
সেদিন শিখালে তাঁরে ব্রাহ্মণের ক্ষমাগুণ সার।
দুঃসহ সন্তান শোক রুদ্ধ করি হৃদয়ের মাঝে,
পতিরে করিলে শান্ত মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনার সাজে।
ধরিত্রী সমান স্থৈর্য্যে নারীধর্ম্মে আদর্শ রমণী;
তোমার চরণস্পর্শপূত সতি! করিলে ধরণী।
বিস্মিত অমরাবতী মুগ্ধ চোখে চাহি তব পানে;
মুখরিত হয়েছিল দিকে দিকে তব জয়গানে।
যেদিন তোমারে অয়ি সতীকুলরাণি!
সতীত্ব মহিমামুগ্ধ দেব বজ্রপাণি;
স্নেহভরে পুছিলেন তোমার অন্তর অভিলাষ;
সেদিন করনি তুমি শত পুত্র জীবনের আশ,
চাহনি অক্ষয় স্বর্গ, সুখ অমরার;
স্বর্গীয় পবিত্র প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার;
মাগি নিল ভক্তিভরে সুরেন্দ্রের পাশে,
অটুট আসন তব নিজ পতি পাশে।
সেইদিন পতিব্রতে! স্বীয় পুণ্য ফলে,
হয়েছিল স্থান তব সপ্তর্ষি মণ্ডলে।
আজিও সপ্তর্ষিলোকে বশিষ্ঠের পাশে;
শোভে তব পুণ্যজ্যোতি নিশীথ আকাশে।
ভারতরমণী আজও তোমারে গো চির আয়ুষ্মতি!
স্মরিয়া ভকতি ভরে মাগে পদে অক্ষুন্ন আয়তী।

মন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীসুধাংশু বসু

সদাশিব চৌধুরী বড়লোক হইলেও তাঁহাকে জমিদার তালিকাভুক্ত করা যায় না। তাহার বাপ-পিতামহের বরঞ্চ কিছু জমিদারী ছিল, নাম ছিল না। সদাশিবের জমীদারী নেই, নাম আছে। তাঁহারা বাড়াইয়া গুছাইয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সদাশিব ক্রিয়াকর্ম্ম যজ্ঞ যাগে এবং দান ধ্যানে তাহা ফুঁকিয়া দিয়াছেন পরিবর্ত্তে কিছু নাম কিনিয়াছেন। কিন্তু দাম যাহা দিয়াছেন নামের বহরে সে পরিমাণ বাড়ে নাই—হ্যাঁ, তবে পিতার তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। পিতা শুধু সঞ্চয় করিতেই জানিতেন ব্যয় করিতে জানিতেন না। সদাশিবের আয়ের অঙ্ক শূন্য কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক ছিল মোটা, তাহা প্রথম প্রকাশ পাইল পিতার শ্রাদ্ধে যখন ব্যাঙ্ক হইতে ২৫০০০৲ বাহির হইয়া আসিল। যাহা হউক, পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটিয়া লাভ নাই আর তাহার আবশ্যকতাও নাই। সদাশিবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তাহাই বলি।

সংসারে যাহারা অপুত্রক প্রায়ই তাহারা কৃপণ হইয়া থাকে। কিন্তু সদাশিবের ঘরে তাহার পুষির মধ্যে ছিল বাপের আমলের পুরাতন ঝি মোক্ষদা, তামাক সাজার ছোট্ট চাকর বাবুলাল আর প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র জগদীশ কলিকাতায় থাকিয়া এম, এ পড়িত এবং মাসে অন্তত একবার আসিয়া জেঠা মহাশয়কে দেখা দিয়া যাইত। সদাশিবের ছোট্ট ভাই সাধুচরণ ছিল, চরিত্রের দিক দিয়া অনেকটা অসাধু এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই পৈত্রিক সম্পত্তির খানিকটা হারাইয়াছিল অর্থাৎ উইলের সংঘাতে সম্পূর্ণ ভোগ দখলে আনার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল নগদ টাকা সম্পূর্ণ দাদার কবলে যাইতে দেখিয়া এবং পৈত্রিক আচরণে কতকটা অভিমানহত হইয়াই বোধ করি সাধু চরণ পিতৃ শ্রাদ্ধের পরের দিনই তাহার সংসার পৃথক এবং সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিবার জন্য দাদার নিকট পরওয়ানা পাঠাইলে সদাশিব বিচলিত না হইলেও ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধুচরণ তাহা শুনে নাই। সে সেই দিন হইতেই এক বাটী ভাগ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া পশ্চিমের অংশে নিজে স্ত্রী ও চার কন্যা লইয়া বাস করিতেছে। জগদীশের পড়িবার খরচ সদাশিব বহন করিতেন এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে আবাল্য তাহাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, জ্যেঠা-মহাশয়ের স্নেহের আবেষ্টনী হইতে তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে সাধুচরণ ইচ্ছাও করে নাই সাহসও করে নাই। এ সংসারে জগদীশই ছিল সদাশিবের একমাত্র মুখাবলম্বন। বিবাহের এক বৎসর পরেই নৌকাডুবিতে স্ত্রীর মৃত্যু হইবার পর হইতেই তিনি একাহারী আছেন, আর বিবাহ করেন নাই।

সদাশিবের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। রাত জাগিয়া রোগীর সেবা করিতে, মড়া পোড়াইতে এবং হরিসংকীর্ত্তনের খোল বাজাইতে তাহার জোড়া ছিল না। এ পর্য্যন্ত কোন প্রার্থী তাহার কাছে একেবারে কিছু না পাইয়া ফিরিয়া যায় নাই। ম্যালেরিয়াগ্রস্থ বহু স্ফীতোদর তাঁহার অর্থে স্বাভাবিক দেহ ফিরাইয়া পাইয়াছে। তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কর্ত্তব্যবোধে লোকের সঙ্গে যেমন মিশিতেন। তেমনি আবার নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখিতে জানিতেন। এ্যারিসটোক্রেসী অর্থাৎ বড়লোকী ভাবটুকু তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া যখন আলবোলায় তামাক টানিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত—হ্যাঁ, ইনি জমিদার বটে! এক কথায় চরিত্রের দিক দিয়া কলঙ্ক আরোপ করিবার মত ত্রুটি তাহার শত্রুর চোখেও কখনও পড়ে নাই। যাহা হউক পিতার মৃত্যু পর হইতে সংসারের দিক দিয়া সদাশিব শান্তিতে কাটাইতে ছিলেন

না। সামান্য সামান্য কারণেই সাধু চরণের সহিত খুটিনাটি টুক্‌টাক্ ঝগড়া প্রায় লাগিয়াই থাকিত। অবশ্য ঝগড়া তিনি পারত পক্ষে এড়াইয়াই চলিতেন, কিন্তু কখনও কখনও ব্যাপার এমনও গড়াইত যে নীরবে কাটান সম্ভব হইত না। কোন দিন ঝি মার খাইয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কোনদিন গরুটা বেগুনের চারা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া কটু বাক্য শুনিলেন, কোনদিন কাকের উপদ্রব হবার অজু হাতে পেঁপে গাছটিকে ভূতলশায়ী দেখিলেন এবং কোনদিন বা শুনিলেন তার সকালের গীতা পাঠ ভণ্ডামী এবং কন্যাদায় গ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য দান ইত্যাদি সকলই নাম কিনিবার ফন্দী, সাধুচরণ বিষদ ব্যাখ্যা করিয়া আপনার বন্ধুগণকে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। কিন্তু এ সকলে সদাশিব বড় একটা মন দিতেন না, বিচলিতও হইতেন না। শেষে একদিন যখন তের বছরের চাকর বাবুলাল, ভাগের পুকুরে পুঁটি মাছ ধরিতে যাইয়া ধাক্কা খাইয়া একেবারে জলের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল এবং হাবু-ডুবু খাইয়া, এক পেট জল খইয়া সীতে বৈরাগীর স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিল তখন সদাশিব রাগে একেবারে কাঁপিতে কাঁপিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন—"ওরে সাধু, তুই ভেবেছিস্ কি? আমাকে এখানে টিকতে দিবি না ভিটেমাটি ছেড়ে পালাব, তুই একাই সমস্ত পৈত্রিক ভিটেয় রাজত্ব করবি?" অন্য পক্ষ হইতে ইহার কোন জবাব আসিল না দেখিয়া হাত দুখানি পিছনের দিকে একত্রিত করিয়া সারা উঠান খানিকটা পায়চারি করিয়া নিজেই শান্ত হইলেন।

সদাশিবের বড় বোন নিস্তারিণী দেবী বিধবা হইয়া অবধি কাশীতে বাস করিতেছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ উৎকট রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া এবং তাহার মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া সাধুচরণ অযাচিত সেখানে ঘুরিয়া আসিয়াছিল। কারণ সাধুচরণের বিশ্বাস ছিল দিদির হাতে কিছু টাকা আছে। কিন্তু সাধু যতবারই সে সম্বন্ধে কথা পাড়িয়াছে ততবারই বৃদ্ধা তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইয়া উপসংহারে বলিয়াছেন তুই সদাকে একবার পাঠিয়ে দিগে, তারপর সদাশিব যখন দিদির অন্তেষ্টি ক্রিয়া করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং দিদির একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার তোড় জোড় আরম্ভ করিয়া দিলেন, সাধুচরণ তখন বুঝিল টাকাগুলি দাদার হাতেই পড়িয়াছে। টাকা পয়সার বিষয়ে সাধুচরণ দমিবার পাত্র নয়। সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া সদাশিবকে বলিল, দাদা! বুঝতে পারছি বাবার উইলের বাবদ যে দশ হাজার টাকা দিদি পেয়েছিলেন, তা আপনার হাতেই এসে পড়েছে। আমাকে তার অর্দ্ধেক অংশ দিতে হবে?

অন্য সময় হইলে হয়তো সদাশিব এ টাকা অনায়াসে ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু বাবুলালকে পুটিমাছের জন্য ঠেলিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবার পর হইতে তিনি সাধু চরণের উপর অত্যন্ত চটিয়া ছিলেন। তিনি বেশ ক্রোধ-ব্যঞ্জকভাবে জবাব দিলেন—টাকার অর্দ্ধেক অংশ তুমি দাবী করছো কোন্ আইনের বলে? সাধুচরণও দৃঢ় স্বরে বলিল, দিদির শ্বশুর বাড়ীর টাকা এ নয়, বাবার উপার্জ্জিত টাকা। ওর অংশ আমারও।

বেশী কথা বলিবার লোক সদাশিব নয়। "অংশ আমি দেব না," এই কথা বলিয়াই তিনি ঘরে যাইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। সাধুচরণ মুহূর্ত্ত কয়েক উঠানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিল, তারপর দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে জগদীশ বাড়ী আসিবে মনে করিয়া সদাশিব লোকজন ডাকিয়া বাড়ীর উঠানের এবং আশে পাশের জঞ্জাল, ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করাইবার এবং পুকুর হইতে কিছু মাছ ধরাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় জগদিশের নিকট হইতে এক পত্র আসিল। পত্রে জগদীশ লিখিয়াছে :—

শ্রীচরণেষু

জ্যেঠামহাশ,

বাড়ী যাইবার সমস্ত আয়োজনই ঠিক ছিল কিন্তু যাওয়া হইল না। বাবার পত্রে আপনার আচরণ সম্বন্ধে অবগত হইলাম। আপনার চরিত্র দেবোপম। সেখানে এতটুকু কাল দাগ পড়িয়াছে, এমন সংশয় আমার মনে আসিবার পুর্ব্বে মৃত্যুই আমি বাঞ্ছনীয় মনে

করি। মানুষকে দান এবং দয়া করিবার একটা অসংযত দুর্ব্বলতাই যে আপনাকে একদিন সীমার বাহিরে পরিচালিত করিবে এ ভয় আমার ছিল। শুনিলাম ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত ছোট লোকদের সঙ্গেই আপনি মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছেন। উহাদের সঙ্গে ওঠাবসা তাস-দাবা খেলা, মড়া পোড়ান, হরিসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি কাজ এমন উৎকট ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন যে বংশের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইতেছে। আপনি যাহাই করুন তাহা চৌধুরী বংশের মর্য্যদার অনুরূপ হওয়াই উচিত ছিল। মহাত্মা গান্ধী হরিজন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের মর্য্যাদাহানীকর কোন কাজই তিনি আজ পর্য্যন্ত কখনও করেন নাই। শুনিলাম বিশ্বম্বর মালোর গাঁজার আড্ডায় এবং শশাঙ্ক তেলীর তাড়ীর আডডায়ও নাকি লোকে আপনাকে দেখিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে কতখানি বেদনাদায়ক তাহা আপনিই চিন্তা করিবেন। আপনাকে উপদেশ দিবার সাহস থাকা আমার অন্যায়। কিন্তু আপনি আমাকে যে স্নেহ করেন এবং আপনার চরিত্রই আমার জীবনের আদর্শ ইহা চিন্তা করিয়া আপনাকে এইটুকু না লিখিয়া পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি

আপনার একান্ত স্নেহানুগত—

শ্রীজগদীশ চৌধুরী

সদাশিব মাছধরা বন্ধ করিয়া দিলেন। জঙ্গাল পরিষ্কার অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। লোকজনদের টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। কি ঘটিল কেহই বুঝিতে পারিল না, যেন কোথা হইতে একটা ঘুর্ণি হাওয়া আসিয়া সমস্ত ওলট্ পালট করিয়া দিয়া গেল। তবে বাবুলাল দেখিল বাবুর তামাক খাওয়া অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—মুহুর্মুহু তিনি তামাকের অর্ডার দিতেছেন। বিকাল বেলায় কেহ তাহাকে আর নিজ হাতে ফুলের গাছে জল দিতে দেখিল না। ভুলু কুকুরটাকে নিয়ে একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন তাহারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ভুলু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য দোরগোড়ায় হামা দিয়া মাঝে মাঝে একপ্রকারের করুণ স্বর বাহির করি[illegible] বলিতে লাগিল সে ভাষা দুর্ব্বোধ্য।

কয়েক দিন বাদে সদাশিব আবার স্বাভাবিক কা[illegible] মন দিলেন। মিস্ত্রী ডাকিয়া মন্দিরের নির্ম্মাণ [illegible] আরম্ভ করাইয়া দিলেন। মন্দির আরম্ভ হ[illegible] গেল অথচ টাকার অর্দ্ধাংশ হাতে আসিল না [illegible] সাধুচরণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। সে [illegible] সদাশিবকে গিয়া বলিল, দাদা টাকার অংশ আমাকে দে[illegible] কি না জানতে চাই।

"সে তো একবার তুমি জেনেই গেছ।"

সাধুচরণ এবার চেঁচাইয়া বলিল, দেখ দাদা, টা[illegible] ভাগ যদি তুমি না দাও জগা বাড়ী এলে উৎপাত [illegible] তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে তবে ছাড়বো।

সদাশিব ইহার কোন জবাব দিলেন না; একবা[illegible] একটু হাসিলেন। তারপর নীরবে দাঁড়াইয়া র[illegible] সাধুচরণ গলার স্বর আর এক পর্দ্দা উপরে চড়াইয়া বলি[illegible] তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, সে কথা সবাই জেনে[illegible] চৌধুরী বংশে তুমি যে কালি লেপে দিচ্ছ, তা জগার [illegible] পর্য্যন্ত গেছে।

"চোপ্‌রাও বেইমান। জুতিয়ে…" বলিয়া পায়ের [illegible] খুলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেছিলেন। জোগাড়েদের ম[illegible] হইতে নিক্ষিপ্ত খানকয়েক ইট তাহার পায়ের ক[illegible] পড়িয়া ছিল। তাহাতে বাধিয়া তিনি মাটীতে প[illegible] গেলেন এবং আহত হইয়া সজ্ঞা হারাইলেন। কপা[illegible] একধার কাটিয়া অজস্রধারায় রক্ত পাত হইতে লাগি[illegible] সেই অবস্থায় বাবুলাল এবং ঝি তাহাকে শুশ্রূষা করিতে[illegible] দেখিয়া সাধুচরণ সরিয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া সদাশিব বাবুলালকে ডা[illegible] বলিলেন, হারে, জগার গলা শোনা যাচ্ছে নারে?

"হা বাবু, তিনি ত কাল রাত্তিরে আইছে।"

'অ্যা, আইছে? তা আমারে দেখে গেল না?

'না বাবু, তেনারে তো বললাম, তিনি তা গেরা[illegible] করলো না।'

'আমার মাথা কেটে গেছে সে কথা বলেছিলি ?'

'আজ্ঞে বাবু',

সদাশিব ধমক দিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে বাবু"। তারপর বলিলেন ওরে নারে হতভাগা! তুই বলতে ভুল করেছিস। যা শীগগির যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর একপ্রকার নিজের মনেই বলিলেন—হ্যাঁ একটু অভিমান তার আছে তা জানি, নইলে সে তো আমার এখানেই উঠতো। ওখানেই বা—

বাবুলাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাবু তিনি আসতি পারবেন না! ছোট মা বললে—তার অসুখ করিছে। সদাশিব শুধু মাত্র উচ্চারণ করিলেন 'হু'। বাবুলাল চলিয়া গেল।

মন্তেসরি শিক্ষালয়ের পাঠ্যতালিকা

শ্রীমায়া সোম

মন্তেসরি শ্রেণীর শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সে শিক্ষালয়ে কি করে, তার উত্তর—খেলে। কাজেই অভিভাবকদের মনে এ কথা ওঠাই স্বাভাবিক শিক্ষালয় পাঠ অভ্যাসের জন্য। খেলবার সুযোগ বাড়ীতেও হ'তে পারে কিন্তু এ কাল খেলবারই, জীবন ভোরই পড়ে আছে তার পাঠের জন্য, এত তাড়াতাড়ি কেন? বরং আরও কিছুদিন খেলে নিক, হাতে খড়ির পর দেখা যাবে। পাঁচ বছরের আগেও যে খেলাধূলার ভেতর শিক্ষা দেওয়া যেতে পার এর সার্থকতা আমাদের দেশের খুব কম লোকেই উপলব্ধি করেন, কাজেই শিশু শিক্ষালয়ের অভাব এ দেশে বড় বেশি। সাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে এর প্রসার হতে পারে। মন্তেসরি শ্রেণীতে কি ভাবে পাঠ্যতালিকা নির্দেশ করা হয় এবং সেখানে শিশুরা কি শিক্ষা করে সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রকাশ করা হলো।

মন্তেসরি শিশুর জন্য আদর্শ বয়সই হচ্ছে তিন কিংবা চার বছর। এ সময় শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত প্রখর থাকে, তাই ও গুলোর সাহায্যে শিক্ষার সুরু করা হয়। দেরিতে ভর্তি হলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি লাভের জন্য যে সব প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা হ'তে সে বঞ্চিত হয়, কাজেই সে গুলোর ত্রুটি থেকে যায়।

মন্তেসরি পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে কাজের ভেতর দিয়ে তার সকল কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। পাঠে শিশুর উন্নতি বা অনুন্নোতি তারই ওপর নির্ভর করে। শিক্ষয়িত্রী সেখানে নামেই থাকেন। তবে কোন্ শিশুর জন্য কি দরকার তা তিনি ভাল করে ব্যবস্থা করেন ও শিশুকে তা সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে সুযোগ দেন। শিশুর কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করেন না; সে যদি কোন ভুল করে তবে সাহায্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু করা হয়; তাকে জানতে দেওয়া হয় না যে কেউ তার কাজ কর্ম গতিবিধি লক্ষ্য করছে, তাই শিশুও একমনে নিজের ইচ্ছে মত কাজ করে যেতে পারে। এভাবে কাজ করতে পেয়ে শিশুর আগ্রহ যেমন দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে, তেমনই আবার সে অধিকতর কঠিন কাজ করতেও অভ্যস্ত হয়। এসবে তার কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতা সহজেই পরিপুষ্ট হতে পারে।

শিশু কি কাজ করবে সে নিজেই ঠিক করে; তাই সে নিজের পছন্দমত খেলনাটি বেছে নেয়। কখনও সে অপরের দেখে খেলতে চেষ্টা করে আবার কখনও বা সে নিজে নিজে খেলতে থাকে, যদি ও-ভাবে সে খেলতে না পারে তখন সেটিকে রেখে আর একটি নেয়। ঐ সময় তার মনোমত খেলনাটি যদি অপর কোন শিশুর কাছে থাকে সে ধৈর্য ধরে তার অপেক্ষায় থাকে যে পর্যন্ত তার খেলা শেষ না হয়। ঐভাবে সে ধীরে ধীরে তার উন্নতির পথে এগিয়ে চলে।

শিশু কোন সময় কি কাজ করবে শিক্ষয়িত্রী তা নির্দেশ করেন না অথবা কোন্ খেলনাটি নিয়ে সে খেলবে তাও বলে

দেন না। যা কিছু ঠিক করবার শিশু নিজেই করে, তাই নোতুন ভর্তি হয়েছে এমন শিশুর মনে জানতেও বেশি সময় লাগে না যে সে-ও অপর শিশুর মত ও-সব কাজ অবাধে ক'রে আনন্দ পেতে পারে। সে নির্ভয়ে তাকের কাছে এগিয়ে তার পছন্দ মত জিনিষটি নিয়ে খেলতে থাকে।

মন্তেসরি শ্রেণীর সব জিনিষ পত্তরগুলো হালকা সুন্দর ও শিশুর ব্যবহারের উপযুক্ত। তিন বছরের শিশুও সেগুলো নিয়ে সহজে নাড়াচাড়া করতে পারে। ওগুলো রাখবার ভার শিশুর ওপরই থাকে। শিশু যেখান থেকে যে খেলনাটি নিয়ে খেলে, খেলা শেষে তাকে ঠিক ওভাবে গুছিয়ে রাখে, আর এ ভাবে রাখতে সে ভালও বাসে। এ ভাবে শিশুদের সৌন্দর্য্যবোধ ও শৃঙ্খলা শেখান হয়। তাই খেল্‌তে খেল্‌তে খেলনাগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায়, তার জায়গায় নোতুন খেলনা রাখা হয়।

শিশুরা যাতে নিশব্দে ও নিস্তব্ধে নিজের নিজের কাজ করে যেতে পারে সে বিষয় বিশেষ ভাবে দেখা হয়। শিক্ষয়িত্রী যেমন কোন শিশুর কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, তেমনি শিশুকেও অপরের কাজে হস্তক্ষপে করতে দেওয়া হয় না। এ নিস্তব্ধতা রক্ষার জন্য প্রতিদিন পাঠের আগে শিশুদের মৌনাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুরা যে কোন সময় শিক্ষয়িত্রীকে নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে ব'সে কিংবা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখায় তারাও নিজের থেকে ওভাবে স্থির ও সংযত হয়ে যায়।

খেলনাগুলো যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হ'য়েছে ঠিক ও ভাবেই খেলান হয়। তা নিয়ে শিশু নিজের খুশীমত খেল্‌তে পারে না, যদি বা সে কখনও খেলে সে নিজেই অপরের দেখে বা সামান্য সাহায্যে ঠিকভাবে খেল্‌তে চেষ্টা করে। একটি খেলা নিপুণভাবে শেখবার পর সে আর একটি নিয়ে খেল্‌তে থাকে। খেলনার ব্যবহার একবার দেখিয়ে দিলে বার বার দেখাবার দরকার হয় না। শিশু খেল্‌তে ভুল করলেও নিজেই নিজের ভুল বার করতে পারে। ওগুলোতে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়। তার উপযোগী যথেষ্ট কাজের ব্যবস্থা থাকে তাই শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। এতে কেউ বা দ্রুত কেউবা ধীরে শিক্ষালাভ করে। শিক্ষা তার কাছে ভার স্বরূপ বা ভয়ের কারণ হয় না। শিশু ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করতে বা ঘুমোতে পারে। কিন্তু খেলনাগুলোর এমন মোহিনী শক্তি যে একই খেলা বার বার খেলতে থাকে যতক্ষণ সে তৃপ্ত না হয়, তারপর সে পরিতৃপ্তির আনন্দে তাকাতে থাকে যেন সবে ঘুম ভেঙেছে। তাই ডাঃ মন্তেসরি বলেন—যতবেশি শিশুর মন একাগ্র হয় ততই তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো স্থির ও তীক্ষ্ণ হয়।

মন্তেসরি শিশু তার কাজের জন্য তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চায় না। কাজ করতে পারাই তার আনন্দ। ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের ভেতর সে ক্রমে নিয়মাধীন হ'য়ে পড়ে, শিক্ষয়িত্রী তাকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে দেন ডাঃ মন্তেসরির উদ্ভাবিত খেলনা ও পাঠ্যতালিকার সাহায্যে। ছেলেগুলো স্বাধীনভাবে খেলতে পেয়ে এমন নিয়মে এসে যায় যে তাকে শাসন ক'রবার দরকার হয় না।

অনেকে মনে করেন শিশুকে এভাবে শিক্ষা দিলে তারা মিলে মিশে এক সঙ্গে কাজ না করে বরং স্বার্থপর ও একালষেঁড়ে হয়ে যায়। শিশু যে কাজটি করে সে কেবল নিজের জন্যই করে না। খেলনাটি সে নষ্ট করে না পাছে তার অপর বন্ধুটিও খেলতে না পায় তাই সে খেলনাটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখে। কোনও কাজ করবার সময় তাকে যথেষ্ট সতর্ক হোতে হয় এবং কেউ যদি কোন কাজ করতে না পারে সে তৎপর হয়ে তাকে সাহায্য করে। দুটি শিশুর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। একবার একটি শিশু তার জুতোর বোতাম (Buckle) কিছুতে লাগাতে পারছিল না দেখে আর একটি শিশু ছুটে এগিয়ে যায় তাকে সাহায্য করতে কিন্তু সেও অপারক হয়। এরূপ দুজনকে প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টা করতে দেখে কি ক'রে লাগাতে হয় একটু দেখিয়ে দিতেই তারা পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখও আনন্দে ভরে যায়।

শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর পরিপুষ্টির জন্য দৈনিক জীবনের কাজগুলো, জিনিষ পত্র ধোয়া ও মোছা কাপড় পরা, খোলা, পরিবেশন গাছপালার যত্ন জীবজন্তুর লালন পালন ইত্যাদিকে পাঠ্যতালিকার ভেতর রাখা হয়েছে। এগুলো করতে শিশু আনন্দ পায় তা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এ গুলো আবার শিশুদের স্বাবলম্বী হবার জন্য ধাপে ধাপে করান হয় ও তার জন্য যদিও কষ্ট দরকার হয় না তবুও শিশুর স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম অটুট থাকে। এসব কাজে একবার অভ্যস্ত হলে সে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে-ও তাই তার উত্তর হয়, সে শিক্ষালয়ে যেতে

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার গোড়াপত্তন

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধা-অসুবিধার বিষয় আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বা উচ্ছ্বাস করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে এখানে কয়েকটি তথ্য সমাবেশ করা হইল মাত্র। ভারতে হিন্দু ললনারা সকল যুগেই শিক্ষিত হইত। হিন্দু জাতির সংস্কৃতি ও সাধনা এত সমুজ্জ্বল হইত না যদি তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা অশিক্ষিত থাকিত। তবে সকল জাতির ও সমাজের শিক্ষা দীক্ষার মান বিভিন্ন প্রকারের। পাশ্চাত্য দেশের মহিলাদের শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতি আমাদের দেশের হইতে ভিন্ন। তাই অনেকের ধারণা আমাদের দেশের নারী অশিক্ষিত। যে সমস্ত শিক্ষা নরনারীকে মনুষ্যোচিত সম্মানে উন্নতি করে, যে শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে মানুষ বিশ্বের সৃষ্টির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, যাহার গুণে নর নারী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়, যাহার সাহায্যে পৃথিবীর সকল জীবের কল্যাণ সাধিত হয়, যাহার বলে নর-নারী পুত জীবন যাত্রা যাপন করিয়া সর্ব্ব জীবের সম্মানার্হ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষায় ভারত-ললনারা চিরকাল শিক্ষিত হইতেন।

ইংরাজ সরকার যখন বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বর্ত্তিকা এদেশে প্রজ্বলিত করিবার জন্য উদ্যোগ করেন। এ দেশের যুবকরাও তাহা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার ও বিলাতের জনসাধারণ ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক প্রদান করিবার নানাবিধ পথ ও মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রথম হইতে সরকার উদাসীন ছিলেন। ১৮৫৪ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ডেসপ্যাচ লিখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রী শিক্ষা প্রদানের কোন প্রকার ব্যবস্থা বা সাহায্য করিতে সরকার সম্মত ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ ইংরাজদের বিশ্বাস স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলে ভারতবাসীর ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে।

১৮৪৯-৫০ সালের বাঙ্গলার জনশিক্ষার সরকারী বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে—Female Education is known not to be opposed to any of the Religious doctrines of the Hindus, indeed, in the early days of her prosperity, Hindusthan could boast of her learned and virtuous females; whose fame was as far spread as that of any eminent European lady of ancient or modern times.

সেই ডেস্প্যাচে সরকারকে বাঙ্গলার ও ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এবং দেশীয় জন সাধারণও স্ত্রী-শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করিবে ইহাও জানান হয়।

Such being the case, the Council confidently rely on the cordial support of all liberal and enlightened natives of India, in a measure from which they may in a short time, reap the greatest and most enduring advantages.

তথাপি তদানিন্তন শাসনমণ্ডলী ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রদানের ভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এখন শিক্ষিত নারীর হার অতি অল্প ও নিরক্ষরা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এই অজুহাতে স্বায়ত্ত শাসন দিবার জন্য বিলম্ব করা আদৌ সমিচীন নহে। ১৮৩২ সালে হাউস অব্ কমন্সের নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটীর সাক্ষীদের মন্তব্য পাঠে জানা যায় যে, সেই সময়ে ইংরাজ রাজপুরুষরা

স্ত্রীলোকদের শিক্ষা প্রদান করিলে তাহাদের সামাজিক রীতি-নীতির উপর হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে ভীত হইতেন।

১৮৩২ সালের Fisher's Memoirএ দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে একটী নারী শিক্ষা সমিতি (The Calcutta ladies' school for Native females) দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য সরকারের নিকট ১০,০০০৲ প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে শাসন মণ্ডলীর সভ্য হরিংটন ও ফেগুল সাহেব এই অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিবার পক্ষে মত প্রদান করেন। কিন্তু তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল জানাইলেন যে এই প্রকারে যদি স্ত্রী শিক্ষা দানে সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে দেশীয় জনসাধারণ মনে করিবেন সরকার তাহাদের সমাজিক অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন এবং তাহাদের ললনাদের খ্রীষ্টান করিবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য অন্তরনিহিত রহিয়াছে। এই রূপে ইংরাজ সরকার অপ্রিয় হইবেন এবং দারুণ প্রতিকুল সমালোচনা হইবে। তাঁহার এই মত সমর্থন করিয়া E. I. Co. court of directorগণ এই অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিলেন না।

সরকারকে স্ত্রী শিক্ষাদানে উদাসীন থাকিতে দেখিয়া, কতগুলি বিদেশীয় ভারত বন্ধুদের এবং দেশীয় সম্ভ্রান্তগণের সহযোগিতায় আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে The Calcutta School Society ভারতবাসীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়, সেই সমিতি মেয়েদের শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা তাহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রূপে পরিগণিত করেন। ১৮২১ সালের ২রা মে Rev. Mr. Keith—দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে যে মন্তব্য করেন তাহাতে উল্লেখ করিয়াছেন The Chief Justice stated that he had the gratification to know that some natives were to be found of the highest respectability, who were giving their attention to the subject; and in some instances privately endeavouring in their Circles to give effect to these designs for the instruction of their females.

১৮২০ সালে পাঁচটি স্কুল স্থাপিত হয়। আরপুলীর স্কুল হেয়ার সাহেবের ব্যায়ে চলিত।

স্বর্গীয় প্যারিচরণ মিত্র লিখিত ডেভিড হেয়ার সাহেবের জীবন চরিতে লিখিত আছে—"We have alluded to the Calcutta Juvenile Society for the establishment and support of Bengali Female Schools. It was establish-ed befor 1820. There was great difficulty iu getting native Teachers." তথাপি ইংরাজ পাদরী ও দেশীয় সুধীজনের সমবেত চেষ্টায় কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। উক্ত সমিতির—সভাপতি Rev: W. H. Pearce লিখিয়াছেন যে ১৮২০ খৃঃ এপ্রিল মাসে একটী সুদক্ষা শিক্ষয়ত্রী পাওয়া গিয়াছে এবং ত্রয়োদশটী ছাত্রীও সংগ্রহ হইয়াছে। সমিতি জানবাজার, শ্যামবাজার ও ইণ্টালীতে বালিকা পাঠশালা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" নামে একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি সমিতিকে মুদ্রিত করিবার জন্য প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা'য় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইহার লেখক গৌর মোহন বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছেন—কিন্তু Richey's Selections from Educational Records পুস্তকে—কেবল লেখা আছে —About this time Raja Radhacant Deb Bahadur offered the society the manuscript of a pamphlet in Bengali "Stri Sikha Vidhayak" on the subject of female education. এই পুস্তিকাতে উচ্চকুলের কুলবতীরা চিরকাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই হিন্দুর রীতি ও সামাজিক ধারা এবং বহু হিন্দু ললনার সংস্কৃতি, গুণপানা, শিক্ষা-দীক্ষা, দেশাত্মবোধ, উচ্চজ্ঞান, পুত চরিত্র, দানশীলতা এমন কি বীরত্বকাহিনী যাহা যুগে যুগে গীত হইতেছে

তাহারই পরিচয় এই পুস্তিকায় লিখিত ছিল। এই সমিতি (Calcutta Juvenile society) সেই পুস্তিকার খসড়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা মুদ্রিত করিতেও মনস্থ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার মুদ্রিত খণ্ডর সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ধান পাইলে সে যুগের শিক্ষিতা নারীর বিষয় অনেক কিছু জানা যাইত। সমাচার দর্পণে ৬ই এপ্রিল ১৮২২ সালে লিখিত আছে—"এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন।"

রাজা রাধাকান্ত দেব শুধু এই প্রকার পুস্তিকা প্রকাশে নিরস্ত ছিলেন না। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। তাহার প্রাসাদে ঋতুতে ঋতুতে বালিকাদের পরীক্ষা গ্রহণ স্বয়ং করিতেন এবং পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রাজা একটি রিপোর্টে স্বয়ং লিখিয়াছেন—Several Native girls educated by the Female Society were also examined, whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure, and the whole conduced very much to the satisfaction of the Company. এরূপ পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৮২৪ খৃঃ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই বৎসর হইতে হিন্দু বালিকারা রাজবাটীর পরীক্ষায় আর উপস্থিত হয় নাই।

যুভেনাইল সোসাইটী কয়েক বৎসর দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা প্রদান করার পর তাহাদের বিদ্যালয়গুলি Bengal Christian school societyর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। নূতন সমিতি—ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী ভারতীয় খৃষ্টিয় বালক বালিকাদের ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হয়। তৎপরে তাহারা হিন্দু বালিকাদেরও শিক্ষা প্রদানের জন্য তাহাদের বিত্ত ও চিত্ত নিয়োগ করেন। তখন সেই সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া Ladies Society for Native Female Education রক্ষিত হয়। ইহার পরিচালনের ভার পাদরীদের হস্তে থাকিলেও অনেক সুধী, ধনী ও প্রতাপশালী হিন্দু ভদ্র মহোদয় এই সমিতিকে সহযোগীতা করিতেন। ডেভিড হেয়ার ইহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

উপযুক্ত শিক্ষায়ত্রী অভাবে সমিতির কার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না—সেই জন্য British and Foreign School Socity of London—কলিকাতা স্কুল সোসাইটীকে মিস কুক নামে এক মহিলাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্কুল সোসাইটীর অর্থ ভাণ্ডার এমনই স্বল্প যে তাহারা মিস্ কুকের ব্যয় ভার বহন করিতে আদৌ সমর্থ নহেন।

তখন মিশনারী সোসাইটী এই সুযোগে মিস কুককে মিশনারীদের বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মিস কুকই অতি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে ভারতীয় বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা দিবার ব্রত গ্রহণ করেন। মিস কুকই আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার গোড়া পত্তন করেন। তাহারই উদ্যোগে কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

Priscilla Chapman তাঁহার Hindu Female Education" নামক পুস্তকে (যাহা লণ্ডনে ১৮৩৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়াছিল) লিখিয়াছেন "In 1823 the number of school (in Bengal) was increased to twenty two, and of scholars to four hundred. The Marchioness of Hastings afforded great encouragement to the establishment of these schools. লেডী হেষ্টিংস ভারতীয় বালিকাদের আধুনিক প্রণালীতে বিদ্যা শিখিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেন, স্বয়ং স্কুল পরিদর্শন করিয়া ছাত্রীদের লেখাপড়ার অগ্রগতির জন্য প্রশংসা করিয়াছেন এবং পুরস্কার প্রদান করিতেন। সমাচার দর্পণে আছে।

"সমাচার দর্পণ"—৮ মার্চ্চ ১৮২৩।

বালিকা পাঠশালা—কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি

তারিখে পাদরি শ্রীযুক্ত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস্ কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকা পাঠশালা ছিল; তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজার খান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন কোন পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।"

লেডী আমহার্ষ্ট নবগঠিত সমিতির পৃষ্ঠপোষিকা হইতে সম্মত হন, এই সমিতি ১৮২৪ সালের মার্চ্চ মাসে গঠিত হয়—Church Missionery Society জুন মাসে দেশীয় মহিলাদিগের শিক্ষাদানের ভার নব গঠিত Ladies, Societyর উপর প্রদান করিলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধানের যাবতীয় ভার Church Missionery Society কর্ত্তৃক নিযুক্ত মিস কুকের উপরই ন্যস্ত রহিল। মিস কুক Rev Willson কে বিবাহ করেন, বিবাহ করিবার পর স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিত হইয়া বালিকা বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন করেন। ১৮২৪ সালে ডিসেম্বর মাসে বালিকা বিদ্যালয়গুলির দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বালিকাদের শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া পারিতোষিক বিতরণ সভায় ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হন। মেয়েদের সূচীকর্ম্ম ও হস্তাক্ষর প্রদর্শিত হয় তাহার জন্য বালিকারা উপযুক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই প্রদর্শিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এত হইয়াছিল যে পারিতোষিক প্রদান করিয়া কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপনের জন্য অর্থ নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়।

"সমাচার দর্পণ—৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫

পরীক্ষা—২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরাণ গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি অনেক সাহেব লোক ও শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতু দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুক্ত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর এই পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।......"

মিসেস্ উইলসন যে কয়টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষার ধারা ও মান এক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় পরীক্ষা মণ্ডলী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এবং তাহারই চেষ্টায় হেদুয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে কেন্দ্রীয় স্কুলের গৃহের ভিত্তি স্থাপন ১৮২৬ সালের ১৮ই মে তারিখে সম্পাদিত হয়। একটি পিতল ফলকে এই দিনের অনুষ্ঠানের বিষয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহা প্রাচীর গাত্রে প্রোথিত ছিল। সেই ফলকে নিম্নলিখিত বাক্য উৎকীর্ণ হয়—

"Central School for the Education of Native Females, Founded by a Society of Ladies which was Established on March 25, 1824.

Patroness

The Rt. Hon. Lady Amherst.
George Balland Esq. Treasurer.
Mrs. Hannah Ellerton, Secretary.
Mrs. Mary Ann Wilson, Superintendent.

This work was greatly assisted by a Liberal donation of Sicca Rupees 20,000 from Raja Boidonath Roy Bahadur.

The foundation stone was laid on 18th May, 1826, in the seventh year of the reign of His Majesty King George IV.

The Rt: Hon'ble William Pitt, Lord Amherst, Governor General of India.

C. K. Robinson Esq. Gratuitous Architect."

সমাচার দর্পণ—২০মে ১৮২৬ মুদ্রিত হইয়াছিল

ফিমেল স্কুল—কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন।

১৮২৮ সালের ১লা এপ্রিল মিঃ ও মিসেস উইলসন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গৃহ দখল করেন এবং ৫৮টী ছাত্রী বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিল। ১৮২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা হয়। সেই সময় প্রায় ২৫টী বিধবা বা স্বামীপরিত্যক্তা রমণী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। মিসেস উইলসনের চেষ্টায় তাঁহারা শিক্ষিত হন।

"There was one class of teachers or monitors consisting of twenty five native females; young as they were, they were all either widows or forsaken by their husbands. They had been educated in the schools of the Society, & whene they became destitute, they had recourse to Mrs. Wilson, who was thus able to employ them in the service of their country women" (S. E. R.)

এই প্রকারে শত বর্ষাবধি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যক্তা খৃষ্টীয় রমণীর দ্বারাই বাঙ্গলা হিন্দু ললনাদের শিক্ষা প্রদান হইতেছে। প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে পাশ্চাত্য হাব-ভাব আমাদের অন্তঃপুরচারিণীদের অভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ আমরা ধর্ম্ম ও নীতিবর্জ্জিত শিক্ষা পাইয়া—বঙ্গদেশোপযোগী সমাজে থাকিতে পারিতেছি না। যদিও আমরা—আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টীয়-রমণীদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

হেদুয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে মিশনারীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আজও যে বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছে, তাহার ত্রিতল হর্ম্মের সর্ব্ব নিম্নতলের হলে একখানি কাল বর্ণের প্রস্তর ফলক এখনও প্রোথিত আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই স্কুলটিতেই ভারতের মিশনারীদের সর্ব্বপ্রথম আধুনিক বালিকা বিদ্যালয় পত্তন হয়।

> এই
> মাধ্যমিক পাঠশালা
> এতদ্দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার্থে
> সম্ভ্রান্ত খৃষ্টীয় স্ত্রী সমূহের
> এক সভামণ্ডল কর্ত্তৃক
> স্থাপিত হইল
> তন্নিমিত্ত
> শ্রীমান রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর
> অতি সচ্ছলরূপে বিংশতি সহস্র মুদ্রা
> সাহায্য করিয়াছেন
> এবং ইহার প্রয়োজনে সকলেরা তদারিক্ত সাধনা
> ও অর্থের সাহায্য দেন
> শ্রীল শ্রীযুক্ত চার্লস নোওলেস রবিনসন সাহেব
> এই গৃহের পাণ্ডুপ্লানও গৃহ নির্ম্মাণ করেন
> ১৮২৮

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিস্ ওয়ার্ড (Miss Ward) নাম্নী আর একটি ইংরাজ মহিলা ভারতে মিসেস্ উইলসনকে স্কুল পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য আগমন করেন। উইলসনের অনুপস্থিতিতে মিস ওয়ার্ড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন। সে সময় স্কুলের দৈনিক উপস্থিত ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০—২০০ হইত। Divided into twenty classes, four of which comprising fifty girls, are reading the Acts, St. Mathew's Gospel & Pearce's Geography, they also write upon slates from dictation; Six other classes containing sixty girls, read the Bible History

& other elementary books ; the other ten classes spell on cards, & learn the alphabet.

কেন্দ্রীয় স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে তখন কলিকাতা ও সহরতলিতে নিম্নলিখিত ৪টী স্কুল পরিচালিত হইত।

মির্জ্জাপুর—মিসেস্ সেণ্ডীজের তত্বাবধানে—৫০ বালিকা।
সার্কুলার রোড এসোসিয়েসন (প্রধানতঃ মুসলমান বালিকার জন্য)—৯০ বালিকা।
হাওড়া—মিসেস্ হাম্পটনের তত্বাবধানে—৯০ বালিকা।
কালনা—মিসেস্ এলেকজেণ্ডার—৮০ বালিকা।

কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়গুলি উপযুক্ত তত্বাবধানের অভাবে বন্ধ হইয়া যায়। বর্দ্ধমানের মিশনারীদের আড্ডায় মিসেস্ Weitbrecht ৪০টী আদিম জতির রমণীদের সংগ্রহ করিয়া প্রাতে শিক্ষা প্রদান করিতেন। বেনারস ও এলাহাবাদে এই সময় দুইটী বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন হয়, বেশীর ভাগ নিম্ন জাতির বালিকারা অধ্যয়ন করিতেন। শ্রীরামপুর মিশনারীরা বহু পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেও একমাত্র ১০০ অসভ্য জাতির বালিকাকে শিক্ষা প্রদান করিত। Rev. W. I. T. Pearce এই স্কুলের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

W. Adam ১৮৩৫ সালে সরকারের নিকট বাঙ্গালার স্ত্রী শিক্ষার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কলিকাতায় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের নানা অসুবিধা বহু বাধার কথা লিখিয়াছেন।

Subsequently the number of schools was increased to 30, and that of the Pupils to 600, but instead of still further multiplying the number of schools, it was deemed advisable to concentrate them, and a central school was built & occupied in 1828, since which the efforts of the Ladies' Society have been chiefly confined to that sphere of labour. An allowance is made of a pice a head to women under the name of "Hurkarees", for collecting the children daily and bringing them to school, as no respectable Hindu will allow his daughter to go into the street except under proper protection. The school numbers 320 ... scholars, besides 70 Christian Girls who live on the premises......... In connection with the Ladies, Society in Calcutta, there is also a girl's school on the premises belonging to the Church Missionary Society in Calcutta. The Number of Pupils fluctuates between 50 & 70. Spelling, reading, writing, needle work, and religion are the Subjects in which instruction is given. Many of the scholars have become teachers. Native Ladies of the most respectable caste in society have both sent their daughters and in some instances have themselves expressed anxiety to obtain instructions. The system of instruction pursued is also stated to have met the express concurrence and approbation of some of the most distinguished among the Native gentry and religious instructors. The majority of the more respectable Natives however still continue to manifest great apathy concerning the education of their daughters. [S. E. R. P. P. 40-41

তখনকার কালেও বাঙ্গালীর উচ্চ বংশীয় কুলবধূরা যে শিক্ষায় বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন তাহা উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায়, তাহারা স্ব স্ব কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন কেবল তাহা নহে—নিজেরাও শিক্ষা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেই জন্য তখনকার মিশনারীরা দেশীয় মহিলাদের শিক্ষা প্রদানের তিনটী প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

(১) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, (২) অনাথ বালিকাদের ছাত্রী আবাসে রাখিবার ব্যবস্থা, (৩) মধ্যবিত্ত ও উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকদের গৃহে গৃহে গমন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ।

ক্রমশঃ

ঢেউ

শ্রীকণা দত্ত

*** ঢেউই তীর ভাঙ্গে, আবার ফিরে তীর রচনা করেও সেই ঢেউ! নদীর একপার ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে তলিয়ে দেয়, আর ওপারেই নদীর কোল ঘেঁষে জাগিয়ে তোলে সোণা-ফলানো পলিমাটীর চর! সেখানে আগুন-রঙা সরষে ফুল ফোটে! ফোটে আকাশের রঙে রঙ মিলিয়ে তিসি ক্ষেতের তিসি ফুল !!

১

*** অনেক দিন পরে জগদীশ আজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলো? অনেকদিন বেকার নাম নিয়ে ঘোরাঘুরির পর এইমাত্র তার চাকরী মিলেছে। দি সিটী হাই স্কুলের মাষ্টারের সেই চাকরীটা।

ইণ্টারভিয়্যু বেলা একটার আগেই সারা হয়ে গিয়েছে? স্কুলের অফিস-রুম থেকে চাকরী মঞ্জুরের চিঠিটা হাতে করে জগদীশ বেরিয়ে যাচ্ছিল এবার, টিচার্স-রুম থেকে হেড মাষ্টার অনন্তবাবু দেখ্‌তে পেয়ে ডাক দিলেন। নিজের পাশের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে, জগদীশকে অনন্তবাবু কাছে বসালেন। তারপর ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে জগদীশের আপাদমস্তকটা বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললেন,—

"এই চাকরীটুকুর জন্যে কত উমেদারই তো এলো গেলো দেখলাম! ইতিহাস, বাঙ্গলা আর সংস্কৃতে ট্রিপল্ এম, এর পুচ্ছ ঘাড়ে করেও তো এসেছিলেন একজন। তাহলে শেষ পর্য্যন্ত তুমিই জিতলে, কি বল?"

অপ্রস্তুতভাবে জগদীশ সায় দিলো, বললো,—

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অনন্তবাবুর ঘন ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে এক টুকরো হাসি বিকীর্ণ হলো! তারপর প্রশ্ন করলেন,

"মাইনে কী শুনলে? ঐ চল্লিশ টাকাই তো?"

এবারে ভীরুভাবে জগদীশ একটু মাথা নাড়লো, বললো,

"আজ্ঞে না, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল আশী টাকা।"

অকস্মাৎ অনন্তবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বললেন,—

"আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো? বিশ বছরের সার্ভিস পুরিয়েছি আজ। এখেনের ঐ নিয়ম। আশী টাকার অঙ্কের তলার রেভেনিয়্যু ষ্ট্যাম্পটাতে তোমার নাম সই করতে হলেও, হাতে ঠিক চল্লিশ টাকাই পাবে বাপু! তবে এ কথা ঠিক জেনো যে মাইনেটা ঠিক্ পয়লা তারিখেই পাবে। নইলে অন্য ঢের জায়গাতেও শুনেছি তো, মাসের পর মাস ফুরিয়ে যায় টাকার সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎটী থাকে না।"

আশী টাকায় সই করে চল্লিশ পাওয়া যাবে। মনটা দমে এলো জগদীশের! ওর আশাহত মুখের পানে চেয়ে অনন্তবাবুও যেন সেটা স্পষ্টই অনুভব করলেন। ঘোলাটে দৃষ্টিটাকে একটু উজ্জ্বল করে, গলার স্বরে খানিকটা আশ্বাস ঢেলে অনন্তবাবু জগদীশের পিঠটা চাপ্‌ড়ে দিলেন এবার। বললেন,—

"মাইনে কম, তাতে আর ক্ষতিটা কী হে? কত লোক কত দিন ঘুরে যে এও পেলো না। তোমার চেয়ে তাদের অনেকের যে ঢের বেশী মেরিট্ ছিল।"

জগদীশের মনটা হাল্কা হয়ে আসছে। সত্যিই তো আজকালকার দিনে এই বা কোথায় পাওয়া যায়। মনে পড়লো বাড়ী থেকে আসবার সময় উত্তেজনায় কিছু খেয়ে আসাই হয় নি। কঙ্কাবতী হয়তো ভাতের থালা কোলে করে শুক্‌নো মুখে বসে আছে, জগদীশ ফিরে গেলে, আর ভাত খেলে তবেই সে খেতে বসবে। জগদীশ উঠে দাঁড়ালো। অনন্তবাবুকে একটা নমস্কার করে বললো—

"আচ্ছা, আসি তাহলে।"

অনন্তবাবুও গোঁপের তলায় হাসলেন—

"হ্যাঁ এস, এবার তো দেখা হবে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে। মানে যতদিন না আমরা দুজনের একজন মরি, ততদিন অবধি সর্ব্বক্ষণ। কি বল এ্যাঁ?"

জগদীশও হাসলো। বেশ লোকটী এই অনন্তবাবু। সুন্দর করে কথা বলতে জানেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে স্কুলটার লোহার ফটকের ওপরে বড় বড় হরফে লেখা নামটা, জগদীশ আবার ভাল করে একবার দেখে নিলো? "দি সিটী হাই স্কুল।"

নামটা দেখেই জগদীশের বুকের ভেতরটা আর একবার তোলপাড় করে উঠেছে। হুঃ! ঐ নামেরই যা কিছু বহর। ইস্কুল না হাতী! ডবল এম্ এ মাষ্টার রাখবে তাও মাত্র চল্লিশ টাকা দিয়ে।

বাড়ী ফেরার মুখে পথ চল্‌তে চল্‌তে কত কথাই যে জগদীশ ভাবলো? এত পরিশ্রম ক'রে ডবল এম-এ পাশ ক'রে যে শেষ পর্য্যন্ত তাকে চল্লিশ টাকার চাকরীতে এসে থম্‌কে দাঁড়াতে হবে, এমন কথা কে কবে ভেবে রেখেছিল? আচ্ছা এম-এর সার্টিফিকেট দুটো ছিঁড়ে ফেল্‌লে, কেমন হয়? কিম্বা আগুনে পুড়িয়ে? জগদীশের মনে হচ্ছে ওই দুটোকে দূর ক'রে দিতে পারলেই বোধ হয় মনের সব গ্লানি সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। তখন হাসিমুখে ঐ চল্লিশ টাকা মাইনেই জগদীশ হাত পেতে তুলে নিতে পারবে। অন্তরের গভীর গোপনে কোথাও তখন আর এতটুকু এই কাঁটাটা খচ্ খচ ক'রে বিঁধবে না বোধ হয়? কিন্তু তা হয় না, তা হবে না জগদীশ! তোমার ভাগ্য তোমার বিধিলিপিই এই? ডবল এম-এ পাশ করলেও তুমি চল্লিশ টাকা মাইনেই পাবে? আর তা থেকে তোমার যা খুসী খরচ করনা কেন। কেউ বাধা দেবে না তাতে। মোটে চল্লিশটী টাকা! তার থেকে কিছুটা বাড়ী ভাড়া দাও, কিছুটা পেটে খাও, আর তোমার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণ করতে, তাকে ভালবাসতে, তার প্রতি কর্ত্তব্য করতে, তাকে কিনে দাও শাড়ী? তারপর রোগ দৈন্য? তারপর ঈশ্বর আছেন, তিনিই তো দেখে নিতে পারবেন জগদীশ?

কলুটোলার মোড়ে প্রায় মোটার চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল জগদীশ। আজ কোনমতেই সে মরতে চায় না। অন্ততঃ এই একটী দিন ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখুন এই একটী দিন; যেদিন ও বাড়ী ফিরে গিয়ে ওর চাকরীটা পাবার কথা জানাবে কঙ্কাকে। সুদীর্ঘ ছয় বছরের অপেক্ষা আর নিরাশার পরে কঙ্কা আজ যে তৃপ্ত হাসিটুকু হাসবে, শুধু সেইটুকু দেখবার জন্যে ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখুন আজকের দিনটা। অন্যমনস্ক জগদীশ এবার একটু তিক্ত হাসি হাস্‌লো। ঈশ্বর! ঈশ্বর কী আছেন? এই তো কয়েক বছর আগের কথা! কত সেজে গুজে জগদীশ সেদিন বিয়ে করতে গিয়েছিল! কত সে আশা, কত স্বপ্ন! কঙ্কাবতীর বাপের বাড়ীর পাড়ার মেয়েরা জোর গলায় সেদিন কতই বলাবলি করেছিল "ডবল এম-এ পাশ, কার্ত্তিকের মত চেহারার বর রে! কঙ্কার ভাগ্য এবার ঠেকায় কে?"

আর তাই কী এই সুদীর্ঘ ছয় বছরের আশা, নিরাশা, সংঘাত আর সংগ্রামের শেষে, কঙ্কাবতীর স্বামীর ভাগ্য থমকে দাঁড়িয়ে গেলো, এই চল্লিশ টাকার সার্ভিসে! জগদীশের রাগ হচ্ছে! কিছুক্ষণ আগেই যে জগদীশ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, এখন ভুলে গেল সে কথা! অনন্তবাবুর শেষ কথাগুলোও ভুলে যাচ্ছে জগদীশ, যে, পৃথিবীতে ওর চেয়েও হাজার হাজার হতভাগ্য প্রাণী আছে। বাকী সমস্ত রাস্তাটা ও শুধু ভাবলো বিধাতা ওর সঙ্গে শত্রুতা করছেন। ভাবলো জগৎটা মিথ্যা! মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা একটা পরিহাস বৈ আর কিছুই নয়।

২)

* * * ৬ই জানুয়ারী আজ! জগদীশের চাকরীতে জয়েন করার ডেট। কঙ্কাবতী কালো হলেও যে কাজের মেয়ে, তা স্বীকার করতেই হবে! বেলা ন'টা বাজতে না বাজতে জগদীশ আজ ভাত পেলো! না না শুধু ডাল ভাত নয়। আলুভাতে বেগুন পোড়া আর পাতে একটু ঘি। তাড়াতাড়ি ক'রে এক টুকরো মাছও বুঝি কঙ্কাবতী ভেজে ফেলেছে!

স্নান সেরে এসে খেতে বসতে গিয়ে জগদীশের

হঠাৎ মনে হোলো, সেদিনের যত গ্লানি যত অভিযোগের ক্ষুদ্রতম কণিকাটী পর্য্যন্ত, অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েই কোথায় মিলিয়ে গেছে! বেশ খুসামনেই জগদীশ ভাত ভাঙ্গতে সুরু করেছে। আজকালকার বাজারে চল্লিশ টাকা। তাই বা মন্দটা কী? পোষ্য তো শুধু কঙ্কাবতীই। না—আরও একটা প্রাণী বুঝি শীগগির আসছে? তা হলেও কুলিয়ে যাবে বোধ হয়! জগদীশ মনের ভেতর আবার একটা আনন্দ অনুভব করছে। বেগুন পোড়া থেকে কাঁচা লঙ্কার টুক্‌রোটা ভাতে ড'লে নিয়ে জগদীশ কঙ্কাবতীকে উপদেশ দিল,—বললে "আমার বিয়ের পণের জমানো টাকাগুলো খরচ ক'রে ক'রে যদি শমে এসেই ঠেকে থাকে কঙ্কা, আর একটা মাস কষ্টে সৃষ্টে চালিয়ে নিও! এই মাসটা কেটে গেলেই তোমার হাতে কর্‌করে চল্লিশটী টাকা এনে দেবো!"

আশী টাকার চাকরীটা পাওয়ার কথাই কঙ্কাবতী জান্‌তো। সেটা যে বাস্তবে চল্লিশে নেবে যাবে, এমন কথাটা জগদীশ ইচ্ছে করেই ওকে শোনায় নি। কঙ্কাবতী তাই আশ্চর্য্যই হোলো, শুধালো,—

"তবে যে তুমি বিজ্ঞাপনে দেখেছিলে গো, ওখানে মাইনে হবে আশী টাকা?"

ভাজা মাছের কাঁটাটা পরম পরিতোষের সঙ্গে চিবিয়ে তার সব রসটুকু নিঙ্‌ড়ে নিয়ে জগদীশ বললো,—

"অল্প পেয়েই সন্তুষ্ট হতে শেখো কঙ্কা! এরা আশী টাকার আঁকে সই করালেও নগদ চল্লিশ টাকাই মাইনে দেবে? আজকাল অনেক জায়গাতেই এমন এডভার্টাইস্ করে। ওটা যে একটা মস্ত চাল কঙ্কা। আর ঐ ফাঁকা চালের জোরেই তো গোটা দুনিয়াটার চাকা ঘুরছে। ঘুরছি আমি, তুমি, ইহকাল পরকাল ভূত ভগবান সবাই।

বিধাতার বিরুদ্ধে যত নালিশ ছিল জমা, সব হারিয়ে গিয়ে এখন জগদীশের বুকটা রীতিমত হাল্কা লাগ্‌ছে। অল্প আয় করাই ভালো; জীবনে যত বেশী ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর, দুঃখ জটিলতার ক্লেদও ততই বেশী রকম জমে।

জগদীশ বেশ খুসী মনেই ভাতের গ্রাসটা চিবুতে লাগলো। বড় সাধাসিধে মেয়ে এই কঙ্কাবতী। অনুরাগ বিরাগ লুকিয়ে রেখে কারবার চালানোর ধার দিয়েও ও হাঁটে না। জামবাটীতে ডালের ধুমোয় পাখার দোলা দিয়ে ও সোজাসুজি বলে ফেললো—

"তবে এটা একদম বাজে ইস্কুল বল!"

—"বাঃ! গরম ডালটা খেতে কিন্তু চমৎকার লাগছে!" ডালের বাটীটায় সুদীর্ঘ খানিকটা চুমুক দিয়ে জগদীশ কঙ্কাবতীকে বাধা দিলো। চল্লিশ টাকা মাইনের উপর আজ এই মুহূর্ত্তে জগদীশের আর এতটুকুও বিরাগ নেই। কঙ্কাবতীর কথায় তাই ওর প্রবল আপত্তি প্রকাশ পেলো। বললো—

"না, না, বাজে ইস্কুল বোলোনা কঙ্কাবতী! কত জায়গাতেই তো ঘুরলাম এতদিন। এঁরা খুব ভালো। চাকরী তো দিলেনই, আবার ঠিক সময়ে মাইনেটাও দেবেন শুনছি।

এবার কঙ্কাবতীও খুসী হলো। হলোই বা কম মাইনে, জগদীশের মুখে হাসি ফুটলেই ও খুসী থাকে!!

আঁচিয়ে উঠে আজ কঙ্কাবতীর হাতের পানটাও যেন অনেকদিন পরে বেশ আয়াস ক'রে খাওয়া গেল।

—"দেখ, ধুতিটা কিন্তু বড্ড পুরোনো। ধুয়ে ধুয়ে কেমন ছোপ ধ'রে গেছে না?"

সাবধান ক'রে ধুতিটা জগদীশের হাতে তুলে দিয়ে কঙ্কাবতী কথাটুকু শেষ করলো—

"প্রথম মাসের মাইনেটা পেলেই আগে ধুতি একজোড়া কিনতেই হবে। আর দু' এক পাউণ্ড—সলজ্জ সঙ্কোচে কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে কঙ্কাবতী কথাটা বলেই ফেললো—

"আর দু' এক পাউণ্ড ভালো পশম কিনে দিও। সোয়েটার, মোজা এ সব বুনে রাখ্‌বো; শীগগিরই তো দরকার হবে।"

জগদীশ কাপড়টা হাতে নিয়ে কঙ্কাবতীর আশাদীপ্ত মুখখানার পানে একবার চেয়ে দেখলো। হ্যাঁ, কঙ্কাবতী মা হবে শীগ্‌গির!

ওদের প্রথম সন্তান। জগদীশ আর কঙ্কাবতীর! কেমন সে দেখতে হবে কে জানে! হয়তো কালো, হয়তো ফর্সা!

*** সুখের স্বপ্ন চকিতেই মিলায়। এ স্বপ্নও সরে

গেল। ইস্কুলে প্রায় চল্লিশটী ছেলে আজ জগদীশেরই অপেক্ষা করে বসে আছে। দেরী হলে চল্‌বে না। হাতের ধুতিটার দিকে জগদীশ এবার মন দিলো।

এ কী ধুতি !! ওর মনের ভেতর যেন আবার একটা অস্বোয়াস্তি উঁকি মারতে সুরু করেছে। ধুতিটায় সত্যিই তো লালচে ছোপ ধরা। নতুন জায়গা। কত শত নূতন ছাত্র। ছেলেগুলো জগদীশের পরিধেয় দেখে টিট্‌কিরী দেবে না তো? কিম্বা মুখ টিপে হাসাহাসি? যা সব ফাজিল ছেলেমেয়ে এই বিংশ শতাব্দীর, মুখের ওপর ঠাট্টা করতে তো ওদের এতটুকুও বাধবে না।

ধীরে ধীরে জগদীশের মন আবার রীতিমত তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। তারও যেমন কপাল! ভদ্র জায়গায় ভদ্রলোক সেজে যাবার মত একটা ধুতি পর্য্যন্ত নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই একটা ল্যাঠা। বিষম বদারেশান্ এর প্রতিটী সংক্ষিপ্ত মূহূর্ত্তে!!

৩

*** তার আগের দিনই কঙ্কাবতীর একটা মেয়ে হয়েছে। স্কুলে টিচারদের মধ্যে যে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা জগদীশ করে নি। তবু ছড়িয়েই গেছে কথাটা! ক্লাশ এইট্‌এর ফর্ম টিচার সিতিকণ্ঠর সঙ্গেই জগদীশের মাখামাখিটা হয়েছিল বেশী। কাল নিজের শেষ পিরিয়ড দুটো তার কাছে গছিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবার মুখে জগদীশ কথাটা উচ্চারণ করে ফেলেছিলো। না, ঠিক যে সিতিকণ্ঠকে বলবে বলেই, তা নয়। আকস্মিক ভাবে বলে বসে, কঙ্কাবতীর হাতের ভাঙ্গাচোরা দুছত্র লেখা যখন ও পেলো, তখনই যুগপৎ আনন্দ আর উত্তেজনায় কথাটা যাহোক বেরিয়েই পড়েছিল মুখ থেকে।

আর তুমি সিতিকণ্ঠ! তুমি যে জগদীশের সেই দুর্ব্বলতার সুযোগটুকু নিয়ে স্কুলময় এ কথাটা রটিয়ে বেড়াবে, কে তা জান্‌তো বল?

পরদিন রুক্ষ পরিশ্রান্ত চেহারা নিয়ে জগদীশ স্কুলে ঢুক্‌ছে। কাল সমস্ত রাত্রি কঙ্কাকে নিয়ে তাকে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তগুলি একাই কাটাতে হয়েছে। আজও মনটা ভাল নেই? কঙ্কাকে সে অত্যন্ত অসুস্থ দেখে এসেছে। স্কুলে ঢুক্‌তেই তাকে দেখে হেড মাষ্টার অনন্তবাবু হে হে করে খানিকটা হেসে নিয়ে তারপর পিঠটা চাপ্‌ড়ে দিলেন। বললেন,—

"লাকি চ্যাপ, ছেলের বাপ হয়ে গেলে হে, চাকরী হলো, আর কেন? সন্দেশ অর্ডার দাও?"

জগদীশও ম্লান একটু হাসলো।

বি, বি, দাস মানুষটী কম কথার? কথাটা তাঁর কাণ এড়ায় নি। হ্যাণ্ডসেকের প্রবল ঝাঁকুনীতে জগদীশের হাতটা প্রায় মুচ্‌ড়ে দিলেন। মুখে শুধু বললেন,—

"মাই হার্টি কন্‌গ্রেচুলেশান্ সোম!"

জগদীশ আবার একটু শুক্‌নো হাসি হাস্‌লো।

জি, কর কথার ধার দিয়েও গেল না, বললো,—

"তোমার এ্যাকাউণ্টেই সন্দেশ আন্‌তে চল্‌লাম, সোম!"

বাধা দেবার আগেই সে দ্বারিকের দোকানে চলে গেছে।

মনে মনে হিসেব করে জগদীশ কঙ্কাবতীর বরাদ্দ উলটা কেনাই স্থগিত রাখলো। এঁদের যখন এড়াবার কোনো উপায়ই নেই, কঙ্কাবতীকে মোজা সোয়েটার ত...ন দু' মাস পরেই বুনতে হবে।

সেদিন টিফিন পিরিয়ডে নিজের টাকার ফিষ্টের মাংসের সিঙাড়াটা হাতে তুলেই জগদীশ কেমন একটু থমকে গেল।

মেয়েটা হবার আগের হপ্তাতেই কঙ্কাবতী একটা মাংসের সিঙাড়া খেতে চেয়েছিল। ওকে খাওয়াতে পারে নি জগদীশ! মাসকাবার ছিল, ছিল টানাটানি।

জগদীশ অনুভব করলো, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশটা আবার ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠ্‌ছে।

হাতের শিঙাড়াটা জগদীশ নামিয়েই রাখলো। কঙ্কাবতী যেদিন খেতে পাবে সেদিনই জগদীশ খাবে। তার আগে নয়। বাইরে রোদ-ঝল্‌সানো ধূসর পৃথিবী! জগদীশেরও মনের ভেতরে একটা তিক্ত অনুভূতি!

জে, সি, নাগ মুখভরা সন্দেশ নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—

"এবার বাপ হয়েছ জগদীশ? এ একটা মস্ত রেস্‌পন্সিবিলীটি! হুঃ ছেলেকে মানুষ করা চাই। গরু ছাগলের মত শুধু বড় করলে চলবে না, মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে।"

ও'দিক্ থেকে টি, কুমার হাঁক্‌লেন,—

"ম্যুড্‌ বি এ ম্যান্ ইন্ দা ট্রুয়েষ্ট সেন্স অফ্ দি ওয়ার্ড।"

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে জগদীশ পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো। নিজের মনেই বিড়বিড়্ করে বললো—

"হ্যাঁ আমার হবে ছেলে! ছেলে না আরো কিছু। এতটুকু কালো কুত্‌কুতে একটা মেয়ে হয়েছে। বিয়ে দিতে গিয়েই জিভ্ বেরিয়ে যাবে'খন।

মনের মধ্যে জগদীশ স্পষ্ট অনুভব করছে মেয়ে হওয়াতে ওর এতটুকুও আনন্দ হয় নি।

৪

* * * মেয়েটা হবার পর থেকেই কঙ্কাবতী কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। ওর এতদিনের আকাঙ্খা আর স্বপ্ন দেখার পরিণতি, ঐ একরত্তি মেয়েটা। শয্যাপ্রান্তে লীন কঙ্কাবতী ক'দিন অনিমেষেই শুধু মেয়েটার মুখের পানে চেয়ে রইলো। তারপর একদিন পরিশ্রান্ত কঙ্কাবতী যখন চোখ বুজলো, সে চোখ সে আর খুললো না।

জগদীশের মেয়ে হবার খবর রটিয়েছিল সিতিকণ্ঠ। কঙ্কাবতীর আকস্মিক মৃত্যুর খবরও সেই সকলকে জানালো। সিতিকণ্ঠ বেড়াতে গিয়েছিল জগদীশের বাড়ী।

পরদিন কঙ্কাবতীর বিধবা বোন্ এসে মা মরা মেয়েটার ভার নিলেন। জগদীশ গেলো স্কুলে।

স্কুলের টিচাররা যাঁরা সেদিন এনেছিলেন হার্টি কন্‌গ্রেচুলেশান্ আজ তাঁরা সান্ত্বনা আন্‌লেন। অর্দ্ধচেতন স্তব্ধ জগদীশ মুখ নীচু করে বসে বসে সব শুন্‌লো আর চুপ্ করে রইলো?

গুপ্ত স্যাব্ বিজ্ঞ লোক। বুঝিয়েই বললেন,—

"মাটীর মানুষ সোম! প্রত্যেকেরই ঐ এক পরিণতি। ডাষ্ট টু ডাষ্ট রিটার্ণেথ।"

কে, পাক্‌ড়াশী এসে জগদীশের কাঁধে সহানুভূতির স্পর্শ রাখলেন, বললেন,—

"সবই ভগবানের দান ভাই! তাঁর দান তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন। যে মহান্ দুঃখ দেন্ সান্ত্বনাও আসে তাঁর সেই জ্যোতির্লোক থেকেই। ভগবানের কী ইচ্ছা—দয়াময়! তাঁর ইচ্ছাতেই সব!

আবার জগদীশ উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। মুখ ভেঙ্গিয়ে বল্‌লো,—"দয়াময়! দয়াময়! চুপ্ করুন তো আপনি! ভগবান! কী জানেন আপনি ভগবানের? বলুন পাষাণ, বড় বেশী কাঁদায়, বড় বেশী দুঃখ দেয়? ডাষ্ট টু ডাষ্ট। সবাই তো ডাষ্ট, মানুষ, ভুত, ভগবান্—সব!

বিমূঢ় পাক্‌ড়াশী আর গুপ্ত স্যাব্‌কে লুকিয়ে জগদীশ সন্তর্পণে খুব শুক্‌নো করে চোখ্ দুটোকে মুছে নিলো?

মনে মনে বললো, "তুমি কালো ছিলে, কালো ছিলে কঙ্কা! তবু তোমায় কী কম ভালোটা বেসেছিলাম? এবার আর কী নিয়ে বাঁচ্‌বো বলতো?"

৫

* * * কঙ্কাবতী জগদীশকে উল কিন্‌তে বলেছিল। সে আর কেনা হয়নি। সে টাকায় জগদীশ টিচারদের ভোজ দিয়েছিল। ভেবেছিল কঙ্কাবতী তার মোজাটা দু'দিন দেরী করেই বুনবে না হয়। সেই কথাটা আজ কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করে বিঁধছে!

আজ একসপ্তা হোলো কঙ্কাবতী মারা গেছে। সেদিন থেকে জগদীশ কচি মেয়েটার পানে ফিরে তাকায়নি, দাড়ি কামায়নি, আর স্নান করেনি। আজ সোমবার। গত সোমবারে কঙ্কাবতী মারা গেছে? কঙ্কাবতীর কথা আজ বড় বেশী করে তাই মনে পড়্‌ছে।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরবার পথে জগদীশ একটা দোকানে দাঁড়িয়ে গেল? সেখান থেকে একটা উলের সোয়েটার আর একজোড়া মোজা কিন্‌লো। কিন্‌লো একটা লাল পশমের টুপী।

বাড়ী ফিরে দেখে বারান্দায় দড়ি দিয়ে টাঙ্গানো বেতের দোলনাটায় ওর মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। সন্তর্পণে অপটু হাতে জগদীশ নিজেই মেয়েটাকে সোয়েটার, মোজা আর টুপিটা পরালো।

জগদীশ দেখ্‌ছে মেয়েটা ঘুমের ঘোরে একটু হাসলো যেন।

কী একটা অব্যক্ত বিচিত্র আনন্দ অনুভূতিতে জগদীশের মনটা যেন ভরে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ও চেয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে। ওর মনে হোচ্ছে, মনে হোচ্ছে, ঐ ছোট্ট মেয়েটা ঠিক যেন কঙ্কারই প্রতিকৃতি না? হুবহু যেন চেহারাটা কঙ্কার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে না? ঠোঁটের বাঁকা রেখাটুকু অমনি করুণ আর মধুর? কপালের ক্ষুদ্র পরিধিটুকু অমনি নিটোল মসৃণ?—খানিক পরে দেখা গেলো যে জগদীশ নিজের মনেই বলছে,—

"কে বলে, সান্ত্বনা দিতে ভগবান নেই? কী জানে, কী জানে ওরা?"

কঙ্কার কচি মেয়েটার রাঙ্গা তুলতুলে ঠোঁট দুটীতে জগদীশ পরম আনন্দে চুমু খেলো। চুমু খেলো তার কপালের মসৃণ কালো ছোট্টটো পরিধিটুকুতে, ভালবেসে, আদর করে।।

ঘুমন্ত মেয়েটা এবার চম্‌কে চোখ মেলে চেয়েছে বুঝি ভয়েই ছোটো ঠোঁট দুটো এবার ফুলালো।

ভারী খুসী মনে জগদীশ হাস্‌লো। এত সুখ যে জগতে এখনও ছড়িয়ে আছে কে তা জান্‌তো। হাস্‌তে হাস্‌তেই বললো,—

"আমার দাড়ী দেখে ভয় লাগছে তোর? আমার রুক্ষ চেহারা দেখে? আমি যে বাবা হই রে সোণা।"—

কর্কশ দাড়িভরা মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জগদীশ তার মেয়েটার ফুলো নরম গাল দুটোতে চুমো খেলো। হ্যাঁ। আজকেই জগদীশ স্নান করে দাড়ি কামাবে।

* * *

সাবান মেখে স্নান করে আর দাড়ি কামিয়ে জগদীশের বেশ ঝরঝরেই লাগ্‌ছে। মেয়েটাকে এবার দোলনা থেকে বুকে তুলে নিয়ে জগদীশ গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে। কে বলে জীবন মিথ্যে, পৃথিবী দুঃখের আর ভগবান দয়াময় নয়? ওই তো জগদীশের এখন বেশ চমৎকারই লাগ্‌ছে। জগদীশ আবার খুসী মনে হাস্‌লো।

"সনেট"

(E. B. Browning হইতে)

শ্রীমানসী বসু

কত ভালবাসি তোমা? বলি কত ভাবে ভালবাসি।
ভালবাসি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে যতখানি ধরে ভালবাসা,
ভালবাসি অনুভূতি দিয়ে, যাহা মর্ম্মে জাগাইয়া দেয়
জীবনের উদ্দেশ্য সকল, আদর্শের পরিপূর্ণ ভাব।
ভালবাসি তোমা, ভালবাসি দিনেকের শান্ত প্রয়োজনে
ভালবাসি দিবারাত্র, ভালবাসি অনুক্ষণ প্রিয়।
ভালবাসি মুক্ত ভাবে—যে ভাবেতে সত্যান্বেষী ফেরে;
ভালবাসি স্বার্থ হীন ভাবে—যথা কর্ম্মী প্রসংশা না চায়।
ভালবাসি শৈশবের নির্ভরতা দিয়ে—
ভালবাসা মোর দুঃখময় অনুভূতি মাখা।
ভালবাসি কৈশোরের সরলতা দিয়ে পলে পলে—
বয়োধর্ম্মে হারায়েছি যাহা।
ভালবাসি সমগ্র প্রাণের হাসি দিয়ে, অশ্রু দিয়ে!
ঈশ্বর করুণ।
তোমাকে বসিবো ভালো মৃত্যুপারে গিয়ে।

জাতীয় জীবন গঠনে গ্রন্থাগারের স্থান

অধ্যক্ষ শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত

বিগত ১৫০ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগার রচনা রীতির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও মানব সভ্যতা প্রায়ই সমসাময়িক। আমাদের অতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারার সহিত যোগ অব্যাহত রাখিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে নালান্দা, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব গ্রন্থাগারসমূহ তদানীন্তন শিক্ষায়তনগুলির প্রাণকেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কত চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে দূর দূরান্তর হইতে গ্রন্থরাশি সংগৃহীত করিতেন তাহার তুলনা মিলে না।

লর্ড রোজবেরী (Lord Roseberry) কেবল গ্রন্থস্তূপকে "আবর্জ্জনা স্তূপ, সমাধিভূমি" (rubbish-heap, cemetry) বলিতেন। গ্রন্থরাশির সমাবেশকে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার বলা যায় না। যে সকল স্থানে গ্রন্থাদির নির্ব্বাচন, শ্রেণীবিভাগ, এবং মনস্বিতার সহিত প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থগত সত্যরাশি জনসমাজের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সকল গৃহ বা স্থানকে প্রকৃত লাইব্রেরী বলা হয়।

এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় প্রত্যেক লাইব্রেরী গৃহ শিক্ষার এক একটি জীবন্ত পরীক্ষা-শালা। (Laboratory) বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের চরিত্র গঠিত হয় বিদ্যালয়ের শাসন এবং শিক্ষকের প্রভাবের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া; সেই স্থানের যে পরিবেশ তাহাতে শিক্ষকের আদর্শ, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব, সামাজিক রীতিনীতি ও শিক্ষাদর্শ এই সকল বহিঃপ্রভাবের দ্বারা বিদ্যার্থীর জীবন গঠিত ও নিয়মিত হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের মূল সূত্র হইতেছে,—

Self development in an atmosphere of freedom.

স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত বায়ুতেই মানুষের আত্মবিকাশ হয় এক একটি গ্রন্থশালাতে। এইখানে এক একটি শিক্ষার্থী নিজের রুচি নিজে গঠিত করিবার সুযোগ পায়। প্রকৃত গ্রন্থশালাতে শিক্ষার্থী বেশ দেখিতে পায় তাহার অতীত সংস্কৃতিতে ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজতন্ত্রে রাজনীতিতে, রাষ্ট্রগঠনে তাহার সকল ঐতিহ্যে কি কি আদর্শ কি কি ভাবধারা কত দিকে কত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; সেই সকল ভাবরাশিতে অবগাহন করিয়া সে নিজের দেহমন নির্ম্মল করিয়া তোলে, নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের জীবনের বৈশিষ্ট্য রচিত করে। এই গ্রন্থশালার মধ্যে প্রত্যেক বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই নিজ নিজ সমাজিক, ধর্ম্মগত, রাষ্ট্রগত জীবনের সংস্পর্শে আসে। গ্রন্থশালার এই শক্তি যে কোন বিদ্যায়তনের প্রভাব হইতে শতগুণে অধিক। বিদ্যালয়ের মূলসূত্র হইতেছে self development under restraint যখনি কোন একটি প্রকৃত গ্রন্থশালায় আমরা প্রবেশ করি, দেখিতে পাই, বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাষ্ট্রগত, ধর্ম্মগত, কৃষ্টিগত, সমাজগত সীমারেখা দেখা যায় (frontier) সব সীমা রেখা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন জাতি যুগ যুগান্তের সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়া যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, শিক্ষার্থী তাহার সম্মুখীন হয়। তথায় সে শাশ্বতের উপলব্ধি করিতে পারে। সকল ধর্ম্মের, সকল সমাজের সাধনের ধারাগুলি সার্ব্বজনীন মানবত্বের বিকাশের সহায়তা করিয়াছে, শিক্ষার্থী তাহাই গ্রন্থশালাতে অনুভব করিতে পারে।

শান্ত রক্ষিতের মীমাংসা দর্শনের আত্মবাদ, কি যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কি pythagorasএর আধ্যাত্মিক (mystic) ও আবেগপূর্ণ ধর্ম্ম, জার্ম্মাণ বিদ্যার্থীর পক্ষে যেমন উন্মুক্ত, বাংলার বিদ্যার্থীর পক্ষেও সমান আদরণীয়। বিভিন্ন দেশের কৃষ্টির যে গণ্ডী দেখা যায় গ্রন্থাগারে সেই

সকল গণ্ডী অন্তর্হিত হইয়া যায়। শিক্ষার্থী বুঝিতে পারে কোন দেশের কৃষ্টি দেশের রাষ্ট্রগত সীমার মধ্যে অবরোধ করা আজকাল সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতের কৃষ্টি মিশর দেশে, মিশরের কৃষ্টি গ্রীসে, গ্রীসের কৃষ্টি রোমে এবং রোম সাম্রাজ্যের কৃষ্টি সারা জগৎময় হইয়া গিয়াছে। এক একটি ভাল গ্রন্থাগার বিশ্বজগতের কৃষ্টির সমন্বয়ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে কোন Pass port ব্যতীত যে কোন লোক যে কোন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

উপরোক্ত উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইবে গ্রন্থাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে কোন শিক্ষকের দায়িত্ব হইতে অনেক বেশী। শিক্ষক শিশু ও যুবকদের জীবন লইয়া কায করেন; বর্ত্তমান নিয়ে তাঁদের কায; কিন্তু গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষের কায হইতেছে, অতীতের ভাবধারা যে সব প্রণালী পথে বর্ত্তমানকে গঠিত করেছে এবং বর্ত্তমানের সহস্রমুখী চিন্তা ও ভাবের গতি যে ভবিষ্যৎ আলোক রাজ্যের আভাস দিতেছে, তাহার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ভঙ্গী চালিত করা। শিক্ষক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ উভয়ের কার্য্য পরস্পর অনুপূরক (conplementary)।

একজন ফরাসী লেখক Lebon বলিয়াছেন—It is the dead and not the living that rule us. Books are part of life where one can walk with confidence and self reliance the open road of the imagination bring. the seeing eye and understand the issues the world.

এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইবে, স্কুল, গ্রন্থভবন এবং জীবন এই ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে সকল সভ্যতার মূল সূত্র আয়ত্ত করা সম্ভব।

একটী সৎগ্রন্থাগার সুগঠিত করিতে হইলে এই কয়টি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত :—

(১) লাইব্রেরী গৃহে বসিবার স্থানে আলোক, বাতাস প্রভৃতির সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

উহা এমনভাবে সুসজ্জিত থাকিবে যেন পাঠার্থী উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে গ্রন্থাদি পাঠের দিকে তাহার মন সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে।

(২) যে সকল ভাল বই, নূতন সংগৃহীত বই থাকিবে উহা পাঠার্থীদের সম্মুখে থাকিবে। জীর্ণ শীর্ণ গ্রন্থাদি দূরে রাখা প্রয়োজন।

পাঠাগারের প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা সমিতির বৈঠক করায় সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) পাঠাগারে minimum documentation and clerical work এর ব্যবস্থা করা উচিত।

(৫) গ্রন্থাদির যথারীতি Cataloging and indexing করা উচিত। যাহা আধুনিক। Deweys system or অন্য কেস আধুনিক system অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৬) আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে Liberary গ্রন্থের যাদুঘর (museum) নহে; উহা আমাদের কৃষ্টির গবেষণাগার।

(৮) যে পরিবেশের জন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত তথাকার সকল অধিবাসিদের সহিত যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় থাকে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

রাজসাহীর সোনাপীরের গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌষমাসে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবে আমরা অনেক মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদের পরিচয় পাই। এই শস্যোৎসব উপলক্ষে কৃষকগণ একটা অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌষের শস্যোৎসবের ছড়া-গানগুলি বিভিন্ন নামে প্রচলিত। রাজসাহী ও মালদহ অঞ্চলের পল্লীপ্রদেশের কৃষকগণ এইগুলিকে 'শাঁখবোল' (1) ছড়া নামে অভিহিত করে, দক্ষিণ বঙ্গের কৃষকেরা 'ধলই' (2) গান নামে অভিহিত করে এবং ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় গানগুলি 'অরণ' (3) গান নামে সুপরিচিত। আবার রাজসাহী জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের মুসলমান কৃষকগণের মধ্যে শস্যোৎসব জাতীয় ছড়াগুলি সোনাপীরের গান নামে প্রচলিত।

সোনাপীরের গান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, শাঁখবোলের গানের অনুকরণে পরবর্তী কালে মুসলমান পল্লীকবিরা এই গানগুলি রচনা করিয়াছেন। পৌষমাসে মুসলমান রাখালগণ সন্ধ্যাকালে গৃহস্থগণের বাড়ীতে সোনাপীরের গান গাহিয়া যে দান সংগ্রহ করে, তাহা দিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে তাহারা পীরের দরগায় সোনাপীরের নামে সিন্নি দেয়। কিন্তু আধুনিক কালে স্থানে স্থানে মুসলমান রাখালগণ বাঘপূজার নাম করিয়া সোনাপীরের গান করিয়া থাকে—এই গানগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে রাখালগণের অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। মূলতঃ সোনাপীরের গান শস্যোৎসব শাঁখবোলের অনুরূপ মুসলমান বালকগণের অনুষ্ঠিত গান। সোনাপীরের ছড়াগুলির আলোচনা করিলে এগুলির সত্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। (4) এখানে কয়েকটী সোনাপীরের গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১)

সাজিল সোনাপীর গোয়ালা নগর।
ঐ আইল রে এক ছাওয়াল মাণিকপীর॥
সোনার খাট পাইয়া পীর হেলাইয়া দিল গাও।
আশে পাশে পড়ছে শ্বেত চামরের বাও॥
সোনাপীর উঠিয়া বলে—মাণিকপীর রে ভাই।
ক্ষিধায় আকুল তনু গোয়ালা নগর যাই॥

[শব্দার্থ ঃ—ছাওয়াল—শিশু। বাও—বাতাস, বায়ু শব্দের অপভ্রংশ।]

(২)

গোয়ালা নগর যাইয়া সোনাপীর দুগ্ধ মাগিয়া খায়।
অর্দ্ধেক ঘেঁটা যাইয়া নয়ন তুলিয়া চায়॥
মরা কদম্ব গাছ জিয়ান করিয়া দেয়॥
আগাপাছা দুইজন করিল গমন।
নন্দ ঘোষের বাড়ী যাইয়া দিল দরশন॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের কালে উপস্থিত হইল॥
সোনাপীর বলে—দুগ্ধ কিঞ্চিৎ দেও।
গোয়ালা বলে আছে দুধ, গোয়ালিনী বলে—নাই॥
শিকার উপর দুগ্ধ থুইয়া পীরকে ভাঁড়ায়।
পঞ্চপুরের পঞ্চ কন্যা জপে হাতে পায়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ কড়ি তাতে পয়দা হয়॥
ধর ধর গোয়ালার নারী, লও এক কড়ি।
সোয়া সের দুগ্ধ দুই ফকিরে দিও॥

(৩)

আমরা কি জানিরে বাবা তোমরা মাণিকপীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
সোনাপীর উঠ্যা বলে মাণিকপীর রে ভাই।
গাভীর বাথানে যাইয়া প্রাণ জিয়া দিয়া যাই॥
সাত দিনকার মরা গাভী মুড়্যা তোলে গাও।
সাত দিনকার মরা গাভী দন্তে তোলে ঘাস॥
গাই করে হাম্বা ডাম্বা বাছুর খায় দুধ।
এই অবধি বাঁচ্যা গেল গোয়ালিনীর সতুর॥

এই গানগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, সোনাপীর ও মাণিকপীর কৃষকগণের শস্য, গাভী, ধন সম্পদের রক্ষাকর্ত্তা মঙ্গল দেবতা বিশেষ। শাঁখবোলের গানের মত সোনাপীরের গানগুলিও শুধু কৃষকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তুলনার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত মাণিকপীরের ছড়া হইতে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

সুবুদ্ধি আছিল কন্যার কুবুদ্ধি হইল।
শিকার উপর দুধ থুইয়া মাণিকপীর বিদায় দিল॥
বম্ বম্ বলিয়া ফকির মারল নড়ির বাড়ী।
তিন দিনের মরা ধেনু হাঁইটা আইল বাড়ী॥
আগে যদি জান্তাম ফকির তুমি মাণিক পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা, পাছে দিতাম ক্ষীর॥

('বাংলার শক্তি' আশ্বিন, ১৩৪৫)

রাজসাহী হইতে সংগৃহীত উপরি-আলোচিত সোনাপীরের ছড়াগুলির সহিত পূর্ব্ববঙ্গের মাণিকপীরের ছড়ার হুবহু মিল রহিয়াছে এবং সোনাপীরের ন্যায় এই মাণিকপীরও কৃষকদের গাভী ধনসম্পদের দেবতা বিশেষ।

'সোনাপীর' শব্দের ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। 'সোনার বাংলায়' শস্যই 'সোনা'। ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের দ্বারা কৃষকেরা সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে—শস্যই তাহাদের নিকট সোনারত্ন বিশেষ। বহুদিন হইতেই বাংলাদেশে 'সোনা' অর্থে শস্যের প্রচলন রহিয়াছে। সুতরাং 'সোনাপীর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় 'সোনার পীর' অর্থাৎ শস্যের অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ দেবতা।

বস্তুতঃ সোনাপীর, মাণিকপীর, সোনারায়, মানিকরায় পল্লীবাসী হিন্দুমুসলমানগণের শস্য, গাভী প্রভৃতি ধন ঐশ্বর্য্যের মঙ্গল দেবতা বিশেষ এবং গৃহস্থগণ এই সব লৌকিক মঙ্গল দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সোনাপীর ও মাণিকপীর শব্দ দুইটী সমান অর্থবাচক এবং একই লৌকিক দেবতাকে বুঝায়। ঠিক তেমনি সোনাপীর ও সোনারায় এক এবং অভিন্ন।

শস্য সম্বন্ধীয় এই জাতীয় ছড়াগুলির রচনাকাল দেড়শত বা দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অষ্টাদশ শতকের ... শাঁখবোল উৎসবের জন্ম বলিয়া স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সময়েই এই জাতীয় হাল্কা গান ও ছড়ার রচনা খুবই সম্ভবপর। অষ্টাদশ শতকের অরাজকতা হেতু বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অধঃপতনের যুগ। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতার হ্রাস, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ স্বাধীন বাংলার নবাবদের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি ও অরাজকতা; বর্গীর উৎপাৎ; ইংরাজদের সহিত সিরাজ উদ্দৌলার বিবাদ ও তাঁহার পতন —ইংরাজ অধিকারের সূত্রপাত; মীর কাশিমের স্বাধীন ভাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টা, ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ ও পতন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" প্রভৃতি দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পল্লীর কবিওয়ালারাই বাংলা সাহিত্যের প্রধান সমালোচক ও পৃষ্ঠপোষক। পল্লীকবিতা ও ছড়া গানই এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্বল। এই সময়ের লোকে হাল্কা গানে ও ছড়ায় প্রীতিলাভ করিত, ভাবের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। (Dr. S. K. De প্রণীত A Hietory of Bengali literature' দ্রষ্টব্য।)

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির সময় যেমন কৃষকগণের মধ্যে শস্যোৎসবের ছড়া গানের প্রচলন তেমনি স্থানবিশেষে ব্যাঘ্রোৎসবের ছড়া গান গাহিবার রীতিও দৃষ্ট হয়। এই জন্য অনভিজ্ঞতাহেতু কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পৌষ সংক্রান্তির শস্যোৎসব ও ব্যাঘ্রোৎসবের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্য থাকিতে পারে। সুতরাং এই সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শাঁখবোল, ধলই অরণ, সোনাপার প্রভৃতি ছড়া গান গুলিতে শুধু শস্য সম্বন্ধীয় কথাই বর্ণিত হইয়াছে এইজন্য এইগুলিকে শস্যোৎসবের গান (Harvest songs) নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু ব্যাঘ্রোৎসবের গানগুলিতে শুধু ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয় বিষয়ই বর্ণিত হইয়া থাকে—উদাহরণ স্বরূপ চণ্ডীকাব্য ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রযুদ্ধ কৃষ্ণরামের 'রায় মঙ্গলের' ব্যাঘ্রযুদ্ধ অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য ...

গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব কারণ ছাড়াও ব্যাঘ্রোৎসবের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে, ব্যাঘ্রোৎসব ও শস্যোৎসবের গান সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মানব সভ্যতার আদিযুগ হইতেই লোকসমাজ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন জীব বা বস্তুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই অসীম শ্রদ্ধা হইতেই মহাদ্যুৎতি সূর্য্য, অপরিসীম ধৈর্য্যশীল পৃথিবী, বিরাট কায় সমুদ্র প্রভৃতির পূজা পার্ব্বণের সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পৌরাণিক উৎসবগুলি এবং ব্যাঘ্র দেবতা, সর্প, বৃক্ষ দেবতা প্রভৃতির পূজা পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পাঞ্জাবের হরাপ্পা ও সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদারোতে দুইটী অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় ধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটী নগরী আনুমাণিক ৩০০০ খৃঃ পূঃ ২৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা ডি-এস্-সি মহাশয় লিখিয়াছেন, বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাগ্বৈদিক, প্রাক্-আর্য্য সভ্যতা হইতে গৃহীত—যেমন শিবপশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুল নৈবেদ্য দিয়া পূজা পদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজা। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে ব্যাঘ্রোৎসব প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য্য যুগে অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতেও বাংলা দেশে ব্যাঘ্রপূজার উৎপত্তি কাল অতি পৌরাণিক। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ষষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

---

* ১ উত্তর বঙ্গের শাঁখবোল প্রবন্ধ—১৪ই মাঘ, ১৩৪৫, 'দেশ'।

(২) 'দক্ষিণ বঙ্গের ধলই গান'—৮ই বৈশাখ, ১৩৪৬ 'দেশ'।

(৩) 'ফরিদপুরের অরণ গান'—১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৬, 'দেশ'।

(৪) রাজসাহী জেলার কালীসফা নিবাসী মহম্মদ কোঁকাই প্রামানিকের (৯০ বৎসরের বৃদ্ধ) নিকট হইতে 'সোনাপীরের গানের' বিবরণ ও ছড়াগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। পাকুড়ীয়া (রাজসাহী) ডি-বি-ইউ-পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাশ সংগ্রহ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

আলোক বিথারি' এসো আকাশের কোলে
ওগো জ্যোতির্ম্ময়,
আঁধার জীবনে সেই মণিদীপ দোলে
আশার আলোয়।

কেন্দ্র সমিতির কথা

প্রচার কার্য্য

খরগপুর কৃষি-শিল্প স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী :—গত ৫ই মার্চ্চ খরগপুর কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুত সুধীর লাল সরকার তথায় গমন করেন। মহিলা দিবসে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে একটী মহিলা সভার অধিবেশ হয়। মেদিনীপুর ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন, শ্রীযুত সরকার শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে উহাদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ডোমজুড় মহিলা সমিতি :—ডোমজুড় পল্লীসংস্কার সমিতির উদ্যোগে সমিতির সাহায্যার্থে সমিতির অন্তর্ভুক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনীত হয়, এতদ্ব্যতীত হাওড়ার এক স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেয়া অভিনীত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ অভিনয়ের পূর্ব্বে সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে একটী নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুত সরকারও এই উপলক্ষে তথায় গমন করেন।

কুমারখালি প্রদর্শনী :—কুমারখালী স্বাস্থ্য সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীযুক্তা ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সরকার তথায় গমন করেন। ১৯শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সময় পুরুষ ও মহিলাদের একটী সম্মিলীত সভা হয়; সেই সভায় প্রথমে শ্রীযুক্তা ঘোষ পল্লীগ্রামে মহিলা সমিতি সংগঠনের উপকারিতা বর্ণনা করিলে শ্রীযুত সরকার ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন মহিলা সমিতির কার্য্যাবলী ও জাতিগঠনে মহিলাদের স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সভায় প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বসিরহাট কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী :—এই প্রদর্শনী উপলক্ষে শ্রীযুত সুধীর লাল সরকার ২২শে মার্চ্চ তারিখে একটী মহিলা সভায় 'শিশু মঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেন। এই সভায় প্রায় দুই শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

কুমিরা মহিলা সভা :—গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে খুলনা জিলার অন্তর্গত কুমিরা নামক গ্রামে একটী মহিলা সভার অধিবেশন হয় শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ও শ্রীযুত সুধীর লাল সরকার এই সভায় আহূত হন।
সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলা সমিতি সংগঠণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে শ্রীযুত সরকার "কুটীর শিল্পে মহিলাদের স্থান" সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষে কুমিরায় একটী মহিলা সমিতি সংগঠিত হয়।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

যাদবপুর যক্ষ্মাহাঁসপাতালে সাধ্বীর-দান।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের নিবাসের জন্য গৃহের অত্যন্ত অভাব। পরম দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধ্বী স্ত্রী, বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদিকার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুর যাদবপুর হাঁসপাতালের যক্ষ্মারোগীদের নিবাসের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দাতা মহিলার স্বামী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া এই নিবাসের নামকরণ হইবে। যক্ষ্মা রোগ যেমন বহুলভাবে সমাজের ব্যক্তির ক্ষতি করে

আর কোন ব্যধি সে প্রকার আজকাল করিতেছে না। ইহার দূরীকরণে যাহারা যতটুকু সাহায্য করেন তাঁরা দেশের পরম হিতাকাঙ্খী। আমরা শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের দরদ ও দানের জন্য স্তুতি করিতেছি। যে কোন বিত্তশালী রমণীর চিত্ত এই প্রকার সদনুষ্ঠানে আরোপিত হইলে দেশের ও দশের মঙ্গল অনিবার্য্য।

নূতন "গীতশ্রী"

প্রতি বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতায় সঙ্গীত সম্মিলনীর উদ্যোগে এক উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত প্রতিযোগীতা পরীক্ষা সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞগণ (গোয়ালিয়রের সলীর খাঁ সাহেব, গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ডাঃ অমিয়া সান্নাল, ও শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়) 'গীতশ্রী' পরীক্ষার বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারী শীলা সরকার, কুমারী ইলা দাস ও প্রতিমা গুপ্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "গীতশ্রী" উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবনের নূতন দান

নারী শিক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের স্থায়ী ভাণ্ডারে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতি ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন. সুযোগ্য সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বিনয় রঞ্জন সেন আই, সি, এস, মহাশয়ের উদ্যোগে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতির অর্থানুকুল্যে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী ৩ খণ্ডে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে অতি সুন্দর ও প্রামাণিক পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ইহার মুদ্রণের কোন সম্পর্ক নাই)

এই পুস্তকের মুদ্রণের ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে পাঁচ হাজার টাকা বিদ্যাসাগর বাণীভবনের (ঝাড়গ্রাম শাখায়) স্থায়ী তহবিলে মিঃ বি, আর, সেন উদ্যোগ করিয়া প্রদান করায় বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিধবার দরদী আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং কয়েকজন হিন্দু বিধবারও উপকার হইবে।

ব্রতচারী মহিলা অনুশীলন শিবির

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় ব্রতচারী সমিতির উদ্যোগে সরোজ নলিনী সমিতির গৃহে ও প্রাঙ্গণে মহিলাদের ব্রতচারী গান, ব্রত, কৃত্য ও নৃত্য আদি শিক্ষা দিবার জন্য একটী অনুশীলন কেন্দ্র বিগত ৯ ফেব্রুয়ারীতে উদ্বোধন হয়। প্রায় আড়াই মাস ব্যাপীয়া প্রায় আশীটী মহিলা শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান সকল বয়সের এমন কি একটি প্রায় ৪৫ বৎসরের উপর বয়স্কা মহিলা যোগদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ৩১শে চৈত্র এই অনুশীলন শিবীরের সমাপ্তি উৎসব হয়। কুমারী সুনীতিবালা গুপ্ত এম, এড, এম, এ, মহোদয়া সভা-নেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিসেস্ সাহাবুদ্দিন এম, এস, এ, মহোদয়া একটি উৎসাহ বাণী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উইমেন্স এথলেটিক্ ক্লাব

পর্দ্দানসীন মহিলাদিগের সন্তরণ শিক্ষালাভের জন্য কয়েক বৎসর হইতে হেদুয়া পুষ্করিণীতে কতিপয় মহিলার উদ্যোগে উইমেন্স এথলেটিক্ ক্লাব নাম দিয়া একটি সন্তরণ প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। পর্দ্দানসীন মহিলাগণের স্বাস্থ্য চর্চ্চার জন্য মহিলাদিগের তত্ত্বাবধানে চালিত কোনরূপ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান এ দেশে নাই। এবং দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সন্তরণই যে মহিলাদিগের একমাত্র উপযুক্ত ও আনন্দদায়ক ব্যায়াম তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কলিকাতা সহরের কয়েকটি বিশিষ্টা মহিলা এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশে মহিলাদিগের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান খোলা ও তাহা চালান যে কি কঠিন কার্য্য তাহা সকলেই জানেন। অতএব যদি বহু মহিলা ও বালিকাগণ স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার্থ অতি প্রয়োজনীয় সন্তরণ শিক্ষালাভের জন্য এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ দেন তাহা হইলে ইহার পরিচালকগণের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার হয় ও এই প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী হইতে পারে। ইহার চাঁদার হার মধ্যবিত্ত পরিবারের সুবিধার জন্য অতিশয় কম করা হইয়াছে। পর্দ্দার বন্দোবস্তও অতি সুন্দর। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ছয়মাস সকাল প্রতিদিন প্রত্যূষে (৫ হইতে ৬-৩০ মিঃ) ইহার শিক্ষাদান কার্য্য চলে। দুইজন অভিজ্ঞ মহিলা ট্রেণার ও একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইহার শিক্ষাদান কার্য্য চালাইয়া থাকেন। যে কোনদিন প্রত্যূষে হেদুয়ায় যাইয়া ভর্ত্তি হওয়া যায়। তবে জন বিরল স্থানে কোন বৃহৎ পুষ্করণীতে সন্তরণ শিক্ষা প্রদান করাই সুশোভন।

CALCUTTA
Acc. No............
Book No............
LIBRARY

মহিলা সমিতি

মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতি

"আনন্দ মেলা"

মাণিকগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের পৃষ্ঠ পোষকতায় এবং মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিশু প্রদর্শনী ও আনন্দ মেলা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনী ৩রা এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল স্থায়ী ছিল, প্রদর্শনীতে নানা প্রকার মডেলের সাহায্যে স্বাস্থ্য মাতৃমঙ্গল শিশু কল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সুখের বিষয় এবারকার উৎসবে কলিকাতা সরোজ নলিনী সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীর লাল সরকার উৎসবে যোগদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। সভাতে সম্পাদিকার মহিলা সমিতির রিপোর্ট পাঠ করার পর স্থানীয় সভ্যা শ্রীমতী প্রীতিলতা চন্দ্র শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীর লাল সরকার সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর মহাকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়া ঐ দিন সভার কার্য্য শেষ হয়। রাত্রিতে ছোট ছোট মেয়েরা শকুন্তলা ট্যাবলো অভিনয় করে। অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। ৪ঠা এপ্রিল আবার এক মেলা হয়, এবার গরমের জন্য সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন মেলা ভাল হইবে না, বেলা ৩টার সময় হইতে বহু দোকান লইয়া মেয়েরা উপস্থিত হইয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শক, নিকটবর্ত্তি গ্রাম হইতে বহু মেয়ে যোগদান করেন, স্থানীয় সারস্বত ভবনে মেলার স্থান হইয়াছিল। পরে স্থানের অভাব হইয়া পড়াতে ৺কালী মাতার বিরাট প্রাঙ্গন মেয়েরা অধিকার করে। মেলাতে ফলের সরবতের মিষ্টান্নের, মনোহারী কাপড় ইত্যাদির দোকান বহু আসিয়াছিল ও ক্রয় বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছে, এবং সমিতি কিছু সাহায্য পাইয়াছে। ঐ দিন রাত্রি হইতে বায়োস্কপ আরম্ভ হয়; ৬ দিন বায়স্কোপ ছিল।

৫ই এপ্রিল শিশু প্রদর্শনী হয়; ৭ই ছোট ছোট মেয়ের গানের ও কবিতার প্রতিযোগীতা হয়। শ্রীমতী সাবিত্রী বালা বিশ্বাস গানে ও আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১০ই এপ্রিল সব বিষয়ের প্রাইজ বিতরণ, গান বক্তৃতা ইত্যাদি হইয়া এই এগজিবেশনের কাজ সম্পন্ন হয়। প্রাইজগুলি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল—রূপার পাণের ডিবি, কৌটা, ফুল, প্রজাপতি ব্রচ, মেডেল প্রভৃতি অনেক জিনিষ ছিল।

এই বৃহৎ ব্যাপারে এবার আমরা অনেকের উৎসাহ পাইয়াছি। রায় সাহেব নিশিকান্ত রায়, উকীল মণিন্দ্র চন্দ্র নিওগী মহাশয়ের মহিলা সমিতির উপর অনুরাগ ও কার্য্যে তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ।

সম্পাদিকা
শ্রীকিরণ বালা সেন
মাণিকগঞ্জ মহিলা সমিতি

ঠাকুর গাঁও মহিলা সমিতি

গত ১২ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুরবালা সেন গুপ্তা মহাশয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সুরবালা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারুবালা দেবী মহাশয়া একটী মর্ম্মস্পর্শী অভিনন্দন বাণী পাঠ করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র ভূতপূর্ব্বা সম্পাদিকা মহাশয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম এমন কি সেবা ও অমায়িক ব্যবহার এবং কর্ম্মকুশলতার জন্যই এই সমিতি নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে আজিও দাঁড়িয়ে আছে। এই মর্ম্মে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একটী মন্তব্য গৃহীত হয়। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা মহাশয়াকে একখানি শাড়ী ও রৌপ্য সিন্দুর কৌটা ভক্তি এবং প্রীতি অর্ঘ্য স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে বালিকাগণের একখানি হৃদয়গ্রহী বিদায় সঙ্গীত গীতান্তে সাশ্রুনেত্রে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুতুনী সৎসঙ্গ নারীমঙ্গল সমিতি

গত ৫ই এপ্রিল মহিলা সমিতির উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটী সভা হয়। এই সভা উপলক্ষে স্কুলের বালিকাবৃন্দ নানারূপ আবৃত্তি, সঙ্গীত ব্রতচারী নৃত্য লাঠি ও ছোরা খেলার দ্বারা সমবেত মহিলাদের আপ্যায়িত করে। শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ সভানেতৃত্ব করেন, প্রথমে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কেন্দ্র সমিতির মহিলা কর্ম্মী ও প্রচারকের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সমিতির উন্নতির জন্য স্থানীয় লোকদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীযুত সরকার কিরূপ ভাবে অল্প অর্থব্যয়ে কুটীর শিল্পের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বলেন, তৎপর শ্রীযুক্তা ঘোষ সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বর্ণনা করেন।

সভায় প্রায় ১৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দপুর মহিলা ব্রতচারী সমিতি

উক্ত সমিতির সভানেত্রী মিসেস সেনের বিদায়োপলক্ষে সমিতি কর্ত্তৃক নটীর পূজা অভিনীত হয়।

সরোজ নলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি (১৯৪০—৪১)

গত ১২ই এপ্রিল সমিতি-ভবনে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত চারু চন্দ্র বিশ্বাস, সি, আই, ই, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় আগামী ১৯৪০।৪১ সনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

পৃষ্ঠপোষিকা :—মহামান্যা লেডি লিন্‌লিথগো (ভাইসরয়-পত্নী)
মাননীয়া লেডী হারবার্ট (গভর্ণর পত্নী)
মাননীয়া বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী বাহাদুরা।

সহঃ পৃষ্ঠপোষিকা :—মাননীয়া সন্তোষের মহারাণী সাহেবা
মাননীয়া ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা
মহারাণী সুচারু দেবী
নাটোরের মহারাণী মাননীয়া ইন্দুমতী দেবী
মাননীয়া লেডী সিংহ
মাননীয়া লেডী ইস্‌মাইল সৈয়দ

সহঃ পৃষ্ঠপোষক :—মাননীয় শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এম, এল, সি,
মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এম, এল, এ
মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুর এম, এল, এ
মাননীয় মিঃ তামিজুদ্দিন খাঁ এম, এল, এ
মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সুরাওয়ার্দ্দী এম, এল, এ
মিঃ জে, এন, বসু
রায় বাহাদুর স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা কে, টি,
স্যার ইউ, এন্ ব্রহ্মচারী, কে, টি,
মিঃ জি, ডি, বিড়লা
কলিকাতার মেয়র মহোদয়
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে
রায় বাহাদুর রামদেব চোকানী

সভাপতি :—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি, আই, ই,

সহ সভানেত্রী :—মাননীয়া ঢাকার নবাব বেগম বাহাদুরা
শ্রীযুক্তা এ, এন, সেন
,, নীরজ বাসিনী সোম

সহ সভাপতি :—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত আর, সি, মিত্র
,, নসীপুরের রাজাবাহাদুর মাননীয় বি, এন, সিংহ
,, রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সি, আই, ই

" শ্রীযুত দেবী প্রসাদ খৈতান
" রায় বাহাদুর রাধিকা ভূষণ রায়
সাধারণ সম্পাদক :—ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস
কোষাধ্যক্ষ :—রায় বাহাদুর আই, এস, মুখার্জ্জী
সমিতির সম্পাদিকা :—শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর
স্কুলের " —মিস্ নীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি,
যুগ্ম সম্পাদক :—রায় বাহাদুর উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
" মিসেস ডি, এল, মজুমদার

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ

শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায়
শ্রীযুত বি, এন, ব্যানার্জ্জী বি, এস্, সি,
" কে, সি, রায় চৌধুরী, এম, এস, সি,
মিস্ গীতা চাটার্জ্জী, বি, এ, বি, টী
" দীপ্তি চাটার্জ্জী "
শ্রীযুত জে, সি, ঘোষ
" মনোজ বসু, বি, এ,
" ডি, এন, মুখার্জ্জী
শ্রীযুক্তা জে, সি, দে,
শ্রীযুত এস্, সি, মিত্র, বি, এস, সি (লণ্ডন) (শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর)
শ্রীযুত জি, কে, সেন, বি, এল
" কে, ডি, ঘোষাল,
" জি, এস, দত্ত, আই, সি, এস,
লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জী, আই, এম, এস,
শ্রীযুক্তা সাবিত্রী চাটার্জ্জী,
মিঃ রফিক্ উদ্দিন আহম্মদ
শ্রীযুত আর, পি ব্যানার্জ্জী, বি, এ,
শ্রীযুত এস, সি রায় এম-এ, বি, এল,
মিস্ প্রতিভা সেন, বি, এ, বি, টী,
ক্যাপ্টেন ডাঃ পি, সি, সেন, এম, বি, এম্ আর, এ, এস
শ্রীযুত পি, বি, দত্ত, এম, এ, বি, এল
" বি, এস, দত্ত, বার-এট-ল,
শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী রায়
ডাঃ এইচ, এন্, রায় ; এম, বি, এম, সি, ও, জি
শ্রীযুত এস, কে, মিত্র
ডাঃ এইচ, এল, সেন, এম, বি,
শ্রীযুত এ, এন্, ব্যানার্জ্জী এম, এ, বি, এল,
রায় বাহাদুর এস, সি, ব্রহ্মচারী
শ্রীযুত ইউ, এন, মুখার্জ্জী, এম, আই, এম, ই
শ্রীযুত বি, এন্, রায় চৌধুরী বার-এট-ল
" পি, সান্যাল, (ওয়েলফেয়ার অফিসার ই, বি, রেলওয়ে
মিস্ অরু সেন (কর্পোরেশন স্কুলের ইন্‌স্পেক্ট্রেস)
শ্রীযুত কে, ডি, গাঙ্গুলী
" পি, ঘোষাল
" শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
" মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুতা কমলা ঠাকুর
মিসেস্ বি, কে, দে
রায় বাহাদুর কে, এন্ মিত্র
রায় সাহেব জে, জি, বিশ্বাস
শ্রীযুত এস, সি, ভাদুড়ী
শ্রীযুতা সুধীরা মজুমদার
মিঃ বি, সি, মণ্ডল, এম, এল, এ
শ্রীযুত কে, পি, ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন
খান বাহাদুর এ, এফ, এম, আবদার রহমন, এম, এল, এ
শ্রীযুত জে, এন সরকার, এম, এ, বি, এল,
রায় সাহেব সি, সি, পাল,
মিস্ হেমনলিনী মল্লিক
শ্রীযুত অরবিন্দ সিংহ
শ্রীযুত এ, ডি, আঢ্য বি, এ,
শ্রীযুক্তা প্রকৃতি গুপ্তা
শ্রীযুত শেখরকুমার বসু বার-এট-ল
শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান
" জীবনকৃষ্ণ মিত্র
" গোপীনাথ পাল
" পরেশলাল সোম
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার
" জে, এন, ব্যানার্জ্জী
কলিকাতা কর্পোরেশনের ২ জন প্রতিনিধি)

এই বেঁচে থাকতেই আনন্দ

চীনে মেয়েদের মধ্যে একটা কাহিনী এখনও প্রচলিত আছে যে, দেবতাদের রাজা স্ত্রীলোককে চা-গাছ দান করিয়াছিলেন তাহাদের স্বামীদের মদের নেশার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। সিংহলীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি সুন্দর ছড়াতেও চীনদের মতই এ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যে, মাতাল স্বামীদের রোধ রাতে চা-ই হচ্ছে অব্যর্থ উপায়। এদের একটা পদ্যে লেখা আছে যে স্বামীদের চা-খেতে অভ্যাস করাতে পারলে তাদের মদের নেশা কেটে যায়। চীনে স্ত্রী জানে ঠিক কোন্ সময় তা'র স্বামীর মদ খেতে কিম্বা অন্য কোন নেশা করতে ইচ্ছে হবে, এবং ঠিক সেই সময় এক পেয়ালা সুগন্ধি চা স্বামীর সামনে এনে হাজির করে। এই অদ্ভুত চিকিৎসার ফলে নাকি অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীদের মদের নেশা কেটে যায়।

চীনের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চায়ের রেওয়াজ অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হোলো আরম্ভ হয়েছে। সে-সব দেশের মেয়েরা চা'কে খুবই আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, যদিও বিভিন্ন কারণে। প্রথমত মেয়েরা বুঝতে পেরেছে যে, চা পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে উপভোগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ চা খাওয়ার ফলে সমস্ত পরিবারের ভিতরে আসে পরিপূর্ণ সন্তোষ ও আরাম।

মেয়েদের কাছে চায়ের অসাধারণ মূল্যের কথা বর্ণনা করে' বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেইকপিস্ থ্যাকারে (ইনি কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন) লিখেছেন :

"যতদিন থেকে চা'কে আমরা জেনেছি, ততদিন থেকে চায়ের পাত্র আমাদের মনের কত কথাই না শুনতে পেয়েছে! কত অসংখ্য মেয়েই না চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে চোখের জল ফেলেছে! কত রুগ্ন লোকের বিছানার পাশেই না চা গেছে! কত জ্বরকম্পিত ঠোঁটই না চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছে! প্রকৃতি যখন চা-গাছ সৃষ্টি করেছিলেন তখন মেয়েদের করুণা করাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। বাস্তবিক ভেবে দেখ্‌তে গেলে— চায়ের পাত্র আর চায়ের পেয়ালা আমাদের মনে কত ছবি, কত কল্পনাই যে জাগিয়ে তোলে তার ইয়ত্তা নেই।',

সম্প্রতি শুনতে পাওয়া গেছে যে, বৃটিশ নৌ-সৈন্য-বিভাগ ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার এবং জাহাজগুলোতে ৭ জনের বেশি লোক নিয়ে গঠিত প্রত্যেক 'মেস্'-কে চা তৈরী করবার পাত্র দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, যদিও, সস্‌পেন ইত্যাদি রান্নার অন্যান্য বাসন কোসন দিতে এঁরা অস্বীকার করেছেন। এঁরা বলেন যে এ-সব জিনিস

বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

বঙ্গলক্ষ্মীর অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲০ আনা ভিঃ পিঃতে ৩৷৵০ নমুনার সংখ্যার মূল্য ।৵১০ আনা। বিনামূল্যে কাহাকেও নমুনা দেওয়া হয় না। বৎসরের যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০ পাঁচ আনা। ভারতের বাহিরে বঙ্গলক্ষ্মীর বর্ত্তমান বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

৩। বঙ্গলক্ষ্মী প্রত্যেক বাঙ্গলা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ৩০ তারিখের ভিতর বঙ্গলক্ষ্মী না পান তাহা হইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিসে অথবা বিভাগীয় পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসে অভিযোগ করিয়া তাহাদের উত্তরসহ প্রত্যেক বাংলা মাসের শেষ তারিখের ভিতর অপ্রাপ্তসংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীর নাম উল্লেখ করিয়া গ্রাহক নম্বর সহ পত্র দিলে বিনামূল্যে ঐ সংখ্যা পাঠান হইবে।

৪। সমিতির কোন সভ্য বা বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করার আদেশ দিয়া বাধিত করিবে।

৫। রিপ্লাইকার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

২। বিজ্ঞাপন দাতারা যদি তাহাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগকে উহা জ্ঞাত করান। ২১ তারিখ হইতে আমদের বিজ্ঞাপন ছাপা আরম্ভ হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য

বঙ্গীয় মহিলাগণের মধ্যে এই পত্রিকাই সর্ব্ব প্রথম এবং ইহাই বেশী প্রচার সুতরাং বিজ্ঞাপনের মূল্য যে অচিরে আরও বর্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপস্থিত নিম্নলিখিত হারে বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইতেছে।—

পূর্ণ পৃষ্ঠা	সাধারণ	...	একমাস ২০৲
অর্দ্ধ ,,	...	...	,, ১১৲
সিকি ,,	...	...	,, ৬৲

বৈদেশিক, রেলওয়ে ও গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের দর শত করা ২৫৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

বিশেষ,বিশেষ স্থানে ও মলাটের উপর বিজ্ঞাপনের মূল্য স্বতন্ত্র

সাধারণতঃ তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুগ্রহ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতারা তাহাদের ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক ফেরৎ না নিলে বা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

'বঙ্গলক্ষ্মীর' মূল্য ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন

৬০, বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট } বঙ্গলক্ষ্মী

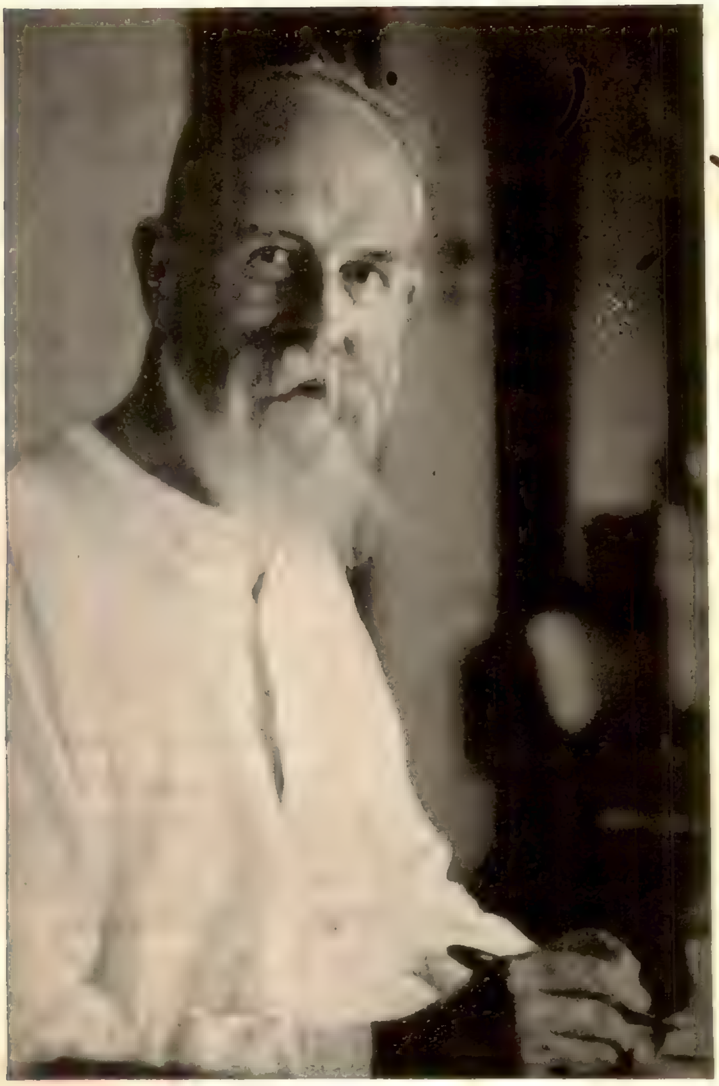

শেষবাণী—

"স্নেহশীল বন্ধুলাভ—[illegible] দানের শ্রেষ্ঠ এই দান—এই জীবনে আমি ভগবানের [illegible] পাইয়াছি।"

সি, এফ্, এণ্ডরু[illegible]

"আমাদের এণ্ডরুজ সাহেব"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি গৃহীত
ফটোগ্রাফ্ হইতে—

—ব্লক, প্রবাসীর সৌজন্যে

পঞ্চদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ | ৭ম সংখ্যা

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

মংপু

সব চেয়ে সত্য করে পেয়েছিনু যারে
সব চেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধা[illegible]
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

সব কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্ত বেগে,
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মা ও বড়দিদি

শ্রীহেমলতা দেবী

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের বয়স হলো আশী বৎসর। লোক-চক্ষে তিনি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তি এখনো কত প্রখর, মন কত সতেজ, পৃথিবীর সুখ দুঃখে এখনো তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয় কতখানি, মানুষের প্রয়োজন তাঁকে আকর্ষণ করে কত দিকে কত ভাবে তার পরিচয় তাঁর লেখনীর মুখে ও দেশের বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তাঁর যোগদানে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে আজও সকলের কাছে। দেহকে এড়িয়ে এগিয়ে চলে তাঁর মন, মনকে পেরিয়ে চলে তাঁর আত্মিক বল। এই আশ্চর্য্য মানুষটির মনে বালকোচিত ভাব এখনো যে কেমন সুন্দর ও উজ্জ্বল ভাবে খেলা করে তার একটি নিদর্শন পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিয়ে খুসী হই তাঁর এই আশী বৎসরের জন্ম দিনে।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের বয়স হোল আশা বৎসর

মনটা যখন তাঁর খুসী থাকে, নিজের মার কথা গল্প করতে গিয়ে তিনি যেন বালক হোয়ে যান। মাকে তাঁর মনে পড়ে, দালানে জলচৌকী পেতে বসে মা ছেলে-মেয়েদের রূপটান মাখাচ্ছেন তাদের রং ফর্সা হবে ব'লে। কবে বালক রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কয়েকটী পদ কোথা থেকে মুখস্থ করে মাকে শুনিয়েছেন মা ছেলের মুখে পদগুলি শুনে বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথকে তলব করলেন—ডাক্ তো দ্বিজেন্দ্রকে রবি কেমন পড়া শিখেছে শুনুক্। মায়ের আনন্দ উৎসাহ ধরে না পুত্রের মুখে রামায়ণ আওড়ান শুনে। বালক রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তিনি একবার মহর্ষিদেবকে একটি পত্র লেখান (মহর্ষি তখন সিমলা পাহাড়ে) রুশিয়া এসে পড়বে কর্ত্তা যেন বিদেশে না থেকে সত্বর বাড়ী চলে আসেন। মহর্ষি উত্তরে লেখেন "ভয় কি, রুশিয়া আসে, লড়াই করা যাবে।" মাতাপুত্রের এই বালকোচিত ব্যাপারের কথা গল্প করতে গিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বালসুলভ আনন্দ উপভোগ করেন।

বড় দিদি সৌদামিনী দেবীর বড় স্নেহ সব ছোট ভাইটির উপর। রবীন্দ্রনাথ ভাই বোনেদের সবার ছোট। বড় দিদির সঙ্গে ছোট ভাইয়ের স্নেহের আলাপে হাসি ঠাট্টা, মজার গল্প চলতো অনেক সময়; একটা নিদর্শন দেখাই। বড় দিদি বলতেন "রবি তুই যখন ভূমিষ্ট হলি, ঘরে যেন ধবধবে সাদা একরাশ বেলফুল ফুটে উঠলো; তুই এম্নি ফর্সা হয়েছিলি। মা তোকে সর্ষের তেল মাখিয়ে রোদে রেখে কালো করে দিয়েছেন।" বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই গল্প করতে গিয়ে মজা ক'রে হেসে, অভিমানের সুরে বলেন—"মা কেন আমাকে তেল মাখিয়ে রোদ খাইয়ে কালো করে দিলেন, তাই তো আমি এমন কালো হয়ে গেলুম! রবীন্দ্রনাথ আজও যেন শিশু মায়ের কাছে।

আমরা বলি, বালক বয়সের রবীন্দ্রনাথকে মা নিশ্চয়ই রূপটান মাখিয়ে আবার ফর্সা করে দিয়ে গেছেন, নতুবা বৃদ্ধ বয়সে এমন উজ্জ্বল বর্ণ পূজ্যপাদ কবির অঙ্গে দেখা যেত না।

কবির শৈশবের সামান্য কাহিনীও কবির মুখে শুনতে কত মিষ্টি লাগে, যারা শুনেছে তারাই জানে।

পরলোকে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গলায় পণ্ডিতরা শ্রুতি ও স্মৃতি শক্তির প্রখরতার জন্যই বিশ্বে বিখ্যাত। স্মৃতি শক্তির প্রভাবেই বাঙ্গলায় নৈয়ায়িক ও দার্শনিকরা বাঙ্গলার সাধনার ও সংস্কৃতির অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল। বহু ভাষার বহু বিষয় বহু পুস্তক তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে পুস্তক তিনি একবার পাঠ করিতেন তাহার সমস্ত অধীত বিষয় তাঁহার স্মৃতিপটে গাঁথা থাকিত। তিনি যেন একটি জীবন্ত পুস্তক-বিবরণ-তালিকা (Bibliography, ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন বিষয় পুস্তকের সম্বন্ধে অবগত হইবার জন্য (Referance) গমন করিলে তিনি অম্লান বদনে সাগ্রহে তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত সূচিপত্র দৃষ্টে দু-তিন মিনিটের মধ্যে পুস্তকের, সাময়িক পত্রের নাম ও সংখ্যা বলিয়া দিতেন। কত পুস্তক পড়া থাকিলে, কত বিষয় অবগত হইলে এবং কত অধ্যবসায় জন্মাইলে তবে এমনি ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

তিনি অনেকগুলি ভাষা লিখন ও পঠনে সক্ষম ছিলেন। পালি, সংস্কৃত, হিন্দী, জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। মরণকাল পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেন। অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতন নিষ্ঠাবান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন!

বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। বহু রচনা, মাসিক পত্রিকা সম্পাদন, মহাকোষ প্রকাশ করিয়া তিনি বাণীর পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গ-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পূজারীর অভাব হইল।

অমূল্যচরণ কলিকাতা মহানগরীতে ১৮৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ হাবড়া শিবপুরের অধিবাসী ছিলেন। বাল্য অবস্থায় কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে কাশীধামে সংস্কৃত পাঠ করেন এবং সেইখান হইতে বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন। তিনি নানা ভাষা শিখিয়া বিভিন্ন ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতে মনস্থ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে একটি 'অনুবাদ-বুরো' স্থাপনা করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালে বিভিন্ন ভাষা শিখিবার জন্য এডওয়ার্ড কলেজ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। জার্ম্মান ভাষায় হিন্দুর বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক পুস্তকের টিকা ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, অবগত হইয়া নিজের জার্ম্মান ভাষা শিখিবার অনুরাগ জন্মায়, তেমনিই জার্ম্মান ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত ক্লাস খুলিয়াছিলেন।

১৯০৪ সালে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অমূল্য বাবু অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে 'বাণী'র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছুদিন মানসী ও মর্ম্মবাণী কাগজ পরিচালন করেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয় ভারতবর্ষ' প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই অমূল্য বাবু তাঁহার বৈবাহিক স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয়ের সহিত ভারতবর্ষের যুগ্ম সম্পাদক হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস' কাগজের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'শ্রীভারতী' কাগজও সম্পাদন করিয়াছিলেন। একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য আলোচনাদির জন্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল, সেই জন্য তিনি পঞ্চপুষ্প সম্পাদন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর অতি দক্ষতা ও উচ্চ আদর্শের সহিত পঞ্চপুষ্প সম্পাদন করিয়া তিনি অসুস্থ ও ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়েন।

তিনি একজন পরম কৃষ্ণ ও গৌর ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে প্রকৃত বৈষ্ণবের মতন বিনয়, তাহার স্বভাব সৌজন্যে ভরা ছিল। বৈষ্ণ সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অমূল্য প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথিগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করিয়া গিয়াছেন। অমূল্য বাবু এই সংগ্রহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রহের মধ্যে সংকীর্ত্তনামৃত পুথিখানির ভূমিকা লিখিয়া ও সম্পাদন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাস পুস্তকখানি তিনি সম্পাদন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় স্যহিত্য সম্মেলনের তিনি একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্স পণ্ড হইয়া যাওয়াতে, প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত হয়। সেই অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তদবধি অনেক সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯১২ সালে মালদহ সাহিত্য সম্মিলন, ১৯২০ সালে শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলন' ১৯২২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখায়, ১৯৩৬ সালে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে ১৯৩৮ সালে রাঁচীর হিন্দু সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুচিন্তিত সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

বহুদিন হইতে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। আটাশ বৎসর তাঁহাকে সাহিত্য পরিষদের মন্দিরে কোন কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছি। সাত আট বৎসর তাহার সহিত একযোগে সহকারী সম্পাদক হইয়া কার্য্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি ১৩৪১ সাল ও ১৩৪২ সালে সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি, ১৩৩০ হইতে ১৩৩৪ পাঁচ বৎসর পুনরায় ১৩৪৩ সালে সম্পাদক, ১৩২৬ হইতে ১৩২৯ পর্য্যন্ত চারি বৎসর সহকারী সম্পাদক পদে থাকিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বাণীর সেবা করিয়াছেন। বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব দেবীর উপর পরিষদে যে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা যেমন গবেষণা মূলক তেমনি চিত্তাকর্ষক। বৈদিক প্রক্রিয়ার বহু বিশ্লেষণ তিনি এই প্রবন্ধে করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি একখানি মহাভারত গল্প কথা শিশুদের জন্য লিখিয়া বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে মুদ্রণের জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মনোরম ও উপাদেয় হইয়াছে।

অমূল্য বাবুর সৌজন্য, নিরহঙ্কার, সরল ব্যবহার তাঁহার পাণ্ডিত্য অভিমানকে প্রকাশ করিতে দেয় নাই। সাহিত্য পরিষদের যখন সম্পাদক ছিলেন, আমি তখন তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলাম। কত অত্যাচার কত বিরক্ত করিয়াছি সমস্তই তিনি গায়ে মাখেন নাই।

মহাকোষ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এই মহাকোষের পাণ্ডুলিপি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ কথা মৃত্যুর পূর্ব্ব সপ্তাহে আমায় বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই জাতীয় সম্পদ যাহাতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় সেই কার্য্য এখন সকলের করা কর্ত্তব্য। তিনি ১৩৪৭ সালের ১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার ঘাটশীলায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাব বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে পূরণ হওয়া দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাঙ্গলা সাহিত্যের এমন কোন অধ্যায় নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্পর্শে শোভিত ও পরিপুষ্ট হইয়া না উঠিয়াছে। শ্বেত শ্মশ্রু, বার্দ্ধক্যে ক্লান্ত কবিশ্রেষ্ঠের অশীতি বর্ষের অভিজ্ঞতা আজ কাব্যকে, দেশকে, সমাজকে যেভাবে নানাপ্রকারে উৎসাহিত ও পরিশোধিত করিয়াছে, তাঁহাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সার্থকতা।

বালক রবীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমানে রবীন্দ্রকাব্য এত বেশী ব্যাপক যে তাহাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া আলোচনা করিতে গেলেই বাতুলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু কর্ম্মময় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় তাহার সহিত পরিচিত হওয়ার সার্থকতা আছে।

সাহিত্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন মানব জীবনের সভ্যতার ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে—"মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের, সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্য তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে।" এই ভিত্তির উপরেই তাঁহার সাহিত্যের সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনাই তাঁহার যাদুস্পর্শ।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

দর্শনশাস্ত্রেও তিনি এক নূতন-প্রণালী গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীনকালের ঋষিদের ন্যায় ধর্ম্ম ও দর্শনকে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করিয়াছেন এবং তাঁহার এই তত্ত্ববাদকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহারই লেখনীপ্রসূত কাব্যধারায়।

তিনি তাঁহার জাতীয়তাবাদকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নন। মানুষের প্রতি মানুষের যে অবিচার, অসৎ, নির্ম্মম, মানুষের উপর মানুষের সেই অত্যাচারকে দূর করিবার

জন্য মন্ত্র দিয়াছেন মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি ও সখ্যতার মধ্য দিয়া। তাঁহার এই চেতনা জন্ম লভিয়াছে মানবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া। লোকে ইহাকে বিশ্বপ্রীতি বলে। কিন্তু যে মাতৃভূমি কোমল ও দান-উৎসুক সেই জন্মভূমির পূর্ণ বিকাশ ত' মানবতার পূজায় আর মানবতার আত্মোৎসর্গে। বাল্যকাল হইতেই এই বৃহত্তর জাতীয়তাবাদ তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছে। প্রীতি ও সখ্যতার ভিতর দিয়া সকল মানবকে জয় করাই তিনি তাঁহার জাতীয়তাবাদের আদর্শ বলিয়া মনে করেন।

সেইজন্য তাঁহার স্বাদেশিকতায় সঙ্কীর্ণতা, আত্মপ্রবঞ্চনা, স্বার্থ-সংঘাত অথবা বিজাতীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই আদর্শ চিরকাল দেশের লোকের কাছে অপমানিত হইয়াছে

যুবক রবীন্দ্রনাথ

বলিয়াই তিনি একদিন সখেদে বলিয়াছিলেন—"তারপরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্ত-প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে গ্রাম, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে, তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রীক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর—তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তালিকাই তার অতি বহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠলো।"

তাঁহার এই মানবতার আদর্শবাদ লইয়া অনেকেই অনেক সময় বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

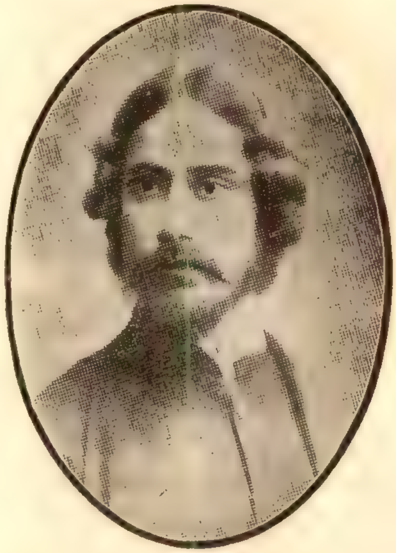

মধ্য বয়সে রবীন্দ্রনাথ

"পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্য জন্মের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্র ঘুচে যায়, এখানে সে অনেকের অন্তর্ব্বর্ত্তী। স্বার্থ-সাথেও আমি হচ্ছি কেন্দ্র অন্য সমস্ত পরিধি। মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র, এই আমি সমগ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং এই সমগ্র প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমন্দেই তার ভালমন্দ।"

জাতীয়তাবাদীদের মৌখিক বাক্যজাল অপেক্ষা সমাজকে এবং চরিত্রকে গঠন করিয়া তোলাই তিনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের ন্যায়ই স্বাধীনতাকে অন্তরের সহিত কামনা

করেন কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ তাঁহার নিকট পরিপূর্ণ এবং মৌলিক। বৈদেশিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। আত্মত্যাগ সুশিক্ষা, আত্মশুচিতা এবং আত্মসংযমের মধ্যে যে স্বাধীনতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তিনি সেই স্বাধীনতাই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহার এই মতবাদ ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিনি আত্মার মুক্তি কামনা করেন। সেই হেতু তাঁহার রাজনীতি ও অধ্যাত্মবাদ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ

"লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করেচেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুল্‌চে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেল্‌চে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করে ছিলাম—নব শিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলেম এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্তক-শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে' বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করতো। তারপরেও নব-নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল পরে' ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তার পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে'চ। অনেক ছেলের মা যেমন অর্দ্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় [illegible] প্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিম কালের কথা ভাবচেন,—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না, আর আমি অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।"

"প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি বিশ্বাস করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতি সম্বন্ধে সচেতন,—কেহ বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, বুঝি বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে,—সকলই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; শুধু যে জিনিষটাকে প্রকাশ করে, তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে;—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া, ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তি রসের আস্বাদন!"

(ভারতের সৌজন্যে)

প্রেম-বহ্নি

শ্রীহেমলতা দেবী

জ্ঞান যদি থাকে "আমি"
সে আমি তোমার,
প্রাণ যদি থাকে তবে
স্বামী তুমি তার।
দান যদি থাকে তবে
তুমি তার শেষ,

ইচ্ছা যদি থাকে তবে
তোমার আদেশ।
নাম যদি থাকে তবে
তোমার সেবক,
পরশে করেছ ধন্য—
হে প্রেম-পাবক!

লণ্ডনের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

যদিও শীতের কুহেলী কাটিয়া ইংলণ্ডের আকাশ নির্ম্মল ও মেঘমুক্ত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এমন একটী অনিশ্চিততার মধ্যে, একটী বিপর্য্যয়ের ভিতর আমরা সকলে বাস করিতেছি যে কোন কিছুই যেন স্থির হইয়া করিবার উৎসাহ কাহারও নাই। যুদ্ধের হাঙ্গামায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগ সোয়ানসীতে আসিয়াছে। আমার ছেলে ও তাই কলেজ সহ এখানে আসিয়াছে। লণ্ডন ও অন্যান্য সহরের লোক হঠাৎ এখানে আসিয়া ভীড় করায় অত্যন্ত স্থানাভাব ছিল তাই আমি পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি আমি লণ্ডন ছাড়িয়া সোয়ানসীতে আমার ছেলের কাছে আসিয়াছি। লণ্ডনের দৃশ্য এখন নানাদিকে পরিবর্ত্তিত। গগন চুম্বী অট্টালিকা সব বালুর ব্যাগে আবৃত। নীলাকাশ দেখিবার সৌভাগ্য লণ্ডন-বাসীদের খুব কমই হয়, তাহার উপর এখন আবার সে আকাশ বেলুন ব্যারাজে ভর্ত্তি। পথে ঘাটে, মাঠে সর্ব্বদা সামরিক পোষাকে বৃটিশ যুবকদেরকে চোখে পড়ে। পাব্লিক পার্কে তাহারা প্যারেড করে। সামরিক পুলিশ, অতিরিক্ত পুলিশ, রিজার্ভ পুলিশ—নানা নামের নানা পুলিশ নানা রকমের টুপী ও নানা প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া গ্যাস মুখোস লইয়া লণ্ডনে দিবারাত্র পাহারা দিতেছে। লণ্ডনে মোটারের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। সাইকেলের সংখ্যা বাড়িতেছে, ঘোড়ার গাড়ীরও প্রচলন হইতেছে। ছেলেরা সব দেশরক্ষার কাজ লইয়া বিব্রত। মেয়েরা ঘরে বাইরে সাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া পুরুষদের কাজে সহায়তা করিতেছে। নানা বিশৃঙ্খলতার ও দুঃখের দিনে পুরুষের সাহায্যকল্পে মেয়েদের এই একতাটুকু বড়ই মধুর। স্বামী পুত্রকে সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়া কি যে গভীর উৎকণ্ঠা লইয়া নারীরা ঘরকন্নায় ব্যস্ত রহিয়াছে তাহা ইঁহাদের ভিতর এমন দুঃখের দিনে বাস না করিলে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বাহিরের কৃত্রিমতা ছাড়িয়া যখন এই সব বৃটিশ নারীরা সত্যিকারের নারীরূপে ঘরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করে তখন তাহাদের ক্ষমায়, ধৈর্য্যে পূর্ণ মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি আমার বড় ভাল লাগে। প্রাচ্যের নারীদের, এই কঠোর সংগ্রামে ব্যাপৃত পাশ্চাত্য নারীদের নিকট হইতে অনেক কিছুই শিক্ষনীয় আছে বলিয়া মনে করি। আমি কতদিন যে এখানে থাকিতে পারিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। এ স্থানটী মন্দ নয়। সমুদ্রের কোল ঘেঁসিয়া সহরটী দাঁড়াইয়া আছে। দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশি। সমুদ্রতীরস্থ সহরের এতখানি জায়গা জুড়িয়া বালুকারাশি অন্য কোথাও বড় চোখে পড়ে না। সোয়ানসীর সমুদ্রতীর আমায় পুরীর কথা মনে করাইয়া দেয়। তবে আমাদের পুরীর সমুদ্র অতি দুর্দ্দান্ত ও অশান্ত, এই বিলাতী সমুদ্র ঠিক ততটা দুর্দ্দান্ত নয়। এই সমুদ্র চঞ্চল কিন্তু পুরীর সমুদ্রের মত গর্জ্জনকারী নয়। জল, জঙ্গল, পাহাড় সব মিলিয়া······যেন প্রকৃতির এক নয়নাভিরাম মূর্ত্তি! এই দেশের লোকেরাও বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন এবং গৃহস্থদের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালী কতকাংশে কৃত্রিমতা বর্জ্জিত।*

* শ্রীযুত গুরুসদয় দত্তের নিকট লিখিত লণ্ডন প্রবাসিনী সুলেখিকা শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ীর পত্রাংশ।

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL:

কল্যাণভাজনেষু
নন্দিনী ও অজিত,

তোমরা দুজনে একমনা
করিবে রচনা
তোমাদের নূতন সংসার।
সেথা নিত্য মুক্ত রবে দ্বার
বিশ্বের আতিথ্য নিবেদনে
তোমাদের অকৃপণ মনে।
পুণ্য দীপ রবে জ্বালা;
সেবার নৈবেদ্যের ডালা
পূজার কুসুমে পূর্ণ হবে;
চতুর্দিকে বাজিবে নীরবে
গম্ভীর মধুর
পরিপূর্ণ আনন্দের সুর
বাজিবে কল্যাণ শঙ্খরব
দিবসরজনী।।

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ই পৌষ

ফিরতি পথে

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহরায়

বিয়ের পর কয়েক মাস রমা শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ঠাকুর ঝি, সবারই আদর পেয়ে আস্‌ছিল নানাদিক দিয়ে, হঠাৎ গেল মাসে স্বামী রত্নটী ল'তে ফেল ক'রে বসলেন, সেই থেকেই শ্বশুর শাশুড়ী যেন নতুন বধূকে শুনিয়ে শুনিয়েই বল্‌তেন—যে ছেলে ম্যাট্রিক ও আই, এ তে বৃত্তি পেয়ে, বি, এ তে মেডেল পেল, বিয়ের পর তার এই অধঃপতনের কারণ কি? কথা কয়টি আগাগোড়া প্রশ্নবোধকই রয়ে গেল অথচ শিক্ষিতা রমা স্বামীর ফেল করার দোষের ভারটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে একেবারেই দমে গেল। স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসা গ্রহণ করতে তার বাধে। ভাবে হয়ত স্বামীকে সে আরও নষ্ট করে ফেলছে। প্রাণ খুলে হাসতে রমা ভয় পায়।

সদা হাস্যময়ী রমারাণীর চোখের কোণে কাল দাগ পড়ে গেছে। স্বামীর খুব নিকটে যেতে তার হৃদয় কেঁপে উঠে। স্বামী পায় না স্ত্রীর প্রাণখোলা ভালবাসা, কাজে কর্ম্মে পায় না উৎসাহ, ভাবে রমাকে বিয়ে করে সে ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে; রাগের মাথায় স্ত্রীকে তাহার মত স্বামী পাবার অযোগ্য বলে গালি দেয়; স্ত্রী প্রতিবাদ করে না; স্বামী রাগ করে, কথা বলে না। স্বামীর ল' পরীক্ষার বেশী দিন বাকী নাই, স্ত্রী ভাবে কিছুদিন রাগ করে থাকাই ভাল পরীক্ষার দিন পনর থাকতে সে বাবাকে লিখে কুষ্টিয়ায় চলে যায়, শ্বশুর শাশুড়ী আপত্তি করেন না, ভাবেন ভালই হ'ল।

মাস দুই পরের কথা। মৃণাল বন্ধুর অসুখের তার পেয়ে হাজারীবাগ রওনা হয়ে গেছে। যাবার বেলা মা বল্‌লেন—ওর নাকি থাইসিস্, বেশী মাখামাখি করিস্ নে যেন।

হাজারীবাগ সহর; হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেশন থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল মোটরে করে যেতে হয়। জার্নিটা একঘেয়ে নয়, বেশ একটু আরামপ্রদ, কোথাও রাস্তা সরু হয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে—আবার কোথাও উপরে উঠে পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলে গেছে অনেকদূর, রাস্তার দুদিকে তাকালে চোখে পড়ে ছোট বড় পাহাড়।

ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের একখানা বাড়ী ভাড়া করে অধর মা ও বোনকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছে অবধি রোগের আক্রমণটার বিশেষ বাড়াবাড়ি ছিল না, তবুও মা অমঙ্গল আশঙ্কা করে তার করলেন মৃণালকে, মৃণালের বাল্যবন্ধু এই অধর, ভারী স্মার্ট ছেলে, আই, সি, এস এ ফাষ্ট হয়েও ফিজিক্সে ভাল মার্ক না থাকাতে সবই নাকচ হয়ে যায়। তার চেহারা এবং রং যে কোন মেয়েরই লোভনীয় কিন্তু রোগ তার মারাত্মক।

রাত ২টা। রোগীর ঘরে মৃণাল আর অধরের ছোট বোন মিনি—নাম তার মিনতি, তার চোখ দুটি টানাটানা সবদিক দিয়েই যেন সে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাণ দিয়ে গড়া দেবীরূপী মানবী—চোখে মুখে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধভাব। হাতের উপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, আসছে অবধি মৃণাল সামনাসামনি তাকে কোন কথা বলে নি, কোথায় যেন একটু গলদ আছে। মৃণাল ডাকলে—মিনি! মিনতি মাথা তুলে সহজ ভাবেই বল্‌লে—কিছু বল্‌বেন? মৃণাল—হাঁ, ঘুমুও গিয়ে, ততক্ষণ আমি বসি, ঘুম পেলে আবার জাগিয়ে দেব'খন।

আপত্তি করবার মিনতির কিছুই ছিল না, চোখ দুটী তার ঘুমে জড়িয়ে আসছে। যেন তেন প্রকারেণ বিছানায় গিয়ে পড়তেই তার ঘুম এল, গভীর নিদ্রা মোটেই নয়, মানসিক উত্তেজনার বিরাম ছিল না। স্বপ্নে দেখছে সে—মৃণাল বলছে, মনে পড়ে মিনি সেই বোটানিকেল গার্ডেনে পিকনিকের কথা, কি প্রতিজ্ঞা ছিল তোমার মনে পড়ে? মিনতি উত্তেজিত হয়ে উঠে; কথা তার আটকে যায় যেন—পুরুষগুলির কথার কোন দাম নাই, ভাল তারা বাসতে পারে যে কোন মেয়েকে যে কোন মুহূর্ত্তে, মিনতি

গম্ভীর স্বরে বলে—বিয়ের কথা বল্‌ছ, সে ত তোমার হ'য়ে গেছে রমাদির সাথে, শুভলগ্নে শুভদিনে মাতাপিতার আদেশে, তোমার অনিচ্ছাই বা বলি কি করে।

সে ত ভালবাসতে জানে না, মিনি—মৃণাল বলে। সে পাঠ আমিও ভুলে গেছি অনেকদিন—মিনতি উত্তর দেয়। —মিনি, চল আমরা আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ করি, মৃণাল তাকে খুব কাছে টেনে যেন বলছে—মিনতি অনুভব করছে যেন তার বুকের স্পর্শ। বুক তার কেঁপে উঠে ভয়ে, ঘুম তার ভেঙ্গে যায় কার ডাকে, জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে মৃণাল ডাকে—৬টা বেজে গেছে মিনি, দাদার কাছে একটু বস গিয়ে; এক্ষণি একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে হবে আমাকে। মিনতি ধড়ফড় করে উঠে বসে, তার স্পন্দন তখনও থামে নি।

সপ্তাহ কাল কেটে যায় রোগীর বিছানার পাশে বসে বসে। অধরের বুকটা দিন দিন খোলাসা হয়ে যাচ্ছে, অথচ মিনতির মুখের হাসি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—মা তা বুঝতে পারেন, কারণটাও। কিন্তু সে আশা তিনি ত্যাগ করেছেন অনেক দিন—সেদিন কি কান্নাটাই কেঁদেছিল মিনতি কোঠার দরজা বন্ধ করে, ওদিকে বরবধূ ঘরে গেল, শাঁক বাজল, উলুধ্বনি পড়লো। মিনতি কি সাধ করে গিয়েছিল সে বিয়ে বাড়ীতে, মৃণালইত তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল—ঠিক ছিল বিয়ের রাত্রে সুন্দর একটা অভিনয় হবে কিন্তু তার বিদ্রোহী মন একে একে সবই সহ্য করে নিল—সেই ফুলশয্যাও, দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে তার চোখের জল পড়েছে অনেক; বধূকে আশীর্ব্বাদ করতে, উপহার দিতে এসেছিল সবাই—সেও গিয়েছিল সোনার সিন্দুর কৌটা হাতে করে, বরবধূকে প্রণাম করতেও ভুল করেনি।

সপ্তাহ দুই পরে ডাক্তার রোগীর বুক পরীক্ষা করে বলে গেল—এখন আর ভয়ের কিছুই নেই, নার্শ করবার এখন বিশেষ দরকার নেই, বরং ওকে দু'একখানা বই এনে দিন। মা আশ্বস্ত হয়ে বলেন, তবে যা মিনি তোর মিনুদাকে এখানকার সবকিছু দেখিয়ে শুনিয়ে আয় না। বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

যাবে মিনুদা, ড্রাইভারকে গাড়ী বের করে দিতে বলে দি? মিনতি বলে।

মৃণাল ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানায়।

বেরিয়ে যেতে যেতে মিনতি মাকে বলে—আমাদের ফিরতে গৌন হলেও তুমি ভাবতে বসোনা কিন্তু। মা হাসলেন।

অধর বল্‌লে—ফাজিল কোথাকার।

এইগুলি লেক মিনুদা, একটা, দুটা, তিনটা, কলকাতার বালিগঞ্জের লেক্ থেকে সুন্দর, নেচারেল্ কিন্তু এই জল নিকাশের ব্যবস্থাটা আর্টিফিসেল হলেও বেশ মনোরম। বেশ নির্জ্জন, ওখানকার মত হাট বসেনি, চার্মিং ত বটেই, ঐ দেখনা হাঁসগুলি ডুব দিয়ে আবার ভেসে উঠছে। এইটা রিফর্‌মেটরী স্কুল, তোমার ছেলে দুষ্ট হলে এখানে পাঠিয়ে দিও, ওরা ভালমানুষটী করে ছেড়ে দেবে। কলকাতায় বসেও তোমরা এখানকার অনেক কিছুর ছবি দেখেছ, মনে পড়ে? বা-রে, শিশির ভাদুড়ীর 'রীতিমত নাটক' দেখনি, অনেক ছবিই ত এখানকার সেই কলেজের লেক্‌চার থেকে সুরু করে, মোটরে শান্তার পালিয়ে যাবার দৃশ্য ত এখানকারই। বাস্তবিক দাদার হৃদয়ে এত বড় একটা আঘাত দিয়ে শান্তার পালিয়ে যাওয়া কি উচিত হয়েছে—প্রফেসর কি ভালই না বাসত তার বোনকে, আর সেই বোনই একজন শিক্ষিত যুবকের মনগড়া ভালবাসার ছলনায় পড়ে দাদাকে পাগল করে তুলল। অশিক্ষিত মানুষ অনেক ভাল, ছলনা জানে না, সরলতায় পূর্ণ থাকে তাদের হৃদয়। ভাষার চাতুরী জানেনা, হৃদয়ের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায় তাদের কথার ভিতরে। কথার ঘায়ে মৃণালের মুখ ফুটলো—অশিক্ষিতারা ভালবাসতে জানে না, জানে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে, কিন্তু শিক্ষিত দেবতা তাতে তুষ্ট হন না, তার হৃদয় অতৃপ্ত থেকে যায়। প্রমাণ তোমার রমাদি, মেট্রিক পাস করা হলে কি হবে, ভালবাসা শব্দের মানে তার কাছে স্বতন্ত্র, আমি তার পূজার ঘরের শম্ভু মাফিক কেউ, আমার পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়েই সে খালাস।

মিনতি বলে—সেই ত ভাল, শিক্ষা তার স্কুলের গণ্ডি

ছাড়িয়ে কলেজে গিয়ে পৌঁছেনি, শিখেনি সে ভালবাসার অভিনয় করতে শিক্ষিতাদের মত, যারা ভালবাসার প্রতিদান না পেলে প্রিয়তমকে দুধের সাথে নাইট্রিক-এসিড মিশিয়ে খেতে দেয়। বিজ্ঞানের যুগ কিনা, কলে কৌশলে আদায় করতে হবে সবই। নিজের ভোগে না লাগলে তার একজিসটেন্সএর প্রয়োজন মানে না। তা বলে তোমার একজিসটেন্সএর প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি নে—রমাদির সেই সরল চাহনি, বাস্তবিক মানুষ ত ওরাই, বললে—দিদি, আশীর্ব্বাদ কর সিঁথির সিন্দুর যেন অক্ষয় হয়ে থাকে। বধূরূপে না দেখে মাতৃরূপে দেখবার আশা জানিয়ে দিয়েছি তাকে—সে লজ্জায় কথা বলে নি; মায়ের জাতি ত তারাই ওদের সন্তানই হবে জগতের এক একজন মেধাবী পুরুষ।

কিন্তু অশিক্ষিতাদের সন্তানের চেয়ে শিক্ষিতাদেই সন্তানই হয় সব দিক দিয়ে উন্নত—মৃণাল বলে।

মিনতি বলে—শিক্ষিতাদের সন্তান-সম্ভাবনা কৈ, বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষিতারা—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা এই মামুলি বুলি অস্বীকার করে, তারা চায় অঙ্গসুখ, সন্তান কামনা নবদম্পতীর গৌন অভিলাষ, ফলে বৃদ্ধবয়সের সন্তান হয় চিররুগ্ন, অভিশাপ।

অত যুক্তি তর্ক নিয়ে বিয়ে করা চলে না মিনি—মৃণাল বলে।

কিন্তু এই পরিষ্কার কথাটাই দাদা, যা কেউ মানতে চায় না, তাই মাঝে মাঝে তারা গণ্ডগোল সুরু করে—মিনতি বলে,—বললুম ডাক্তারী পড়বো, দাদার মত আছে পুরোপুরিই, মাকে রাজী করাতে পারলেই ব্যস্। বা-রে ৯টা বেজে গেল মিনুদা, মা হয়ত ভাবছেন, পাগলা মেয়ে তার না জানি কি কাণ্ডটাই করে বসেছে—দাদা কিন্তু নিশ্চিন্তে সেক্সপিয়র নিয়েই ঝিমাচ্ছে, ঠিক দেখবে।

গাড়ী এলো বাড়ীর সামনে—হর্ণ দিতেই, ড্রাইভার দৌড়ে এসে তাকে গ্যারেজে তুলে রাখলে। উপরে উঠতে উঠতে মিনতি বললে—দাদা, আজ তোমার উকিল বন্ধুকে বক্তৃতায় মাৎ করে দিয়েছি—বাস্তবিক শিক্ষিতা মেয়েদের সাথে কথা বলতে নিয়ে শিক্ষিত পুরুষগুলি ভেড়া বনে যায়, নয় কি মিনুদা!

পরের দিন। শীতের সকাল, ঘড়িতে তখন মাত্র ৭টা, ইজি চেয়ারে বসে অধর। একটু আধটু মিষ্টি রোদ লাগছে তার গায়ে, তার কঠিন রোগের ঔষধই বটে। কোচের সমস্ত স্থানটা জুড়ে বসে মৃণাল সিগার ফুকছিল, জিনিষটা বাঙ্গালী মেয়েদের চোখের বিষ। মিনতির গলা শুনতেই সিগার জানালা পথে অদৃশ্য হল, কিন্তু তার ধুম অতি মন্থর গতিতে চলেছে অজানা পথে। বিজ্ঞানের চোখে তুচ্ছ জিনিষগুলিও ধরা দেয় অতি সহজে। হাতের ষ্টেটস্‌ম্যানখানা নাড়তে নাড়তে মিনতি এসে বলে—দাদা, দেখ, এডভারটাইজের কায়দা—Ladies love the smoker. I. C. S. এর মাথায় রহস্যটা ধরা পড়ে গেল অতি সহজেই। মৃণাল বললে—ষ্টেটসম্যান ত, হতেই হবে, মিনতি ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিৎ করে বলে—why?—সিগারেটের সুগন্ধটা ইউরোপিয়ান লেডিদের প্রিয়—মৃণাল বলে—বাংলা কাগজে এই এডভারটাইজের দাম এক পয়সাও নয়। মিনতি জবাব দেয়—কেন, বাংলার যুবকেরা কি সিগারেট কম খায়? বাঙলার মেয়েরা কি smoker কে ভাল না বেসে পারে, as for instance, our রমাদি—তুমি বলছ রমাদি ভালবাসতে জানেনা; Is it—because you are a smoker? কথা শেষে অধর ও মিনতি হাসির ঝড় তুললো; মিনতি বলে—ভাগে ই সিগারটা আমার গায়ে পড়ে বিয়ের দামী শাড়িখানা বেঁচে গেছে।

বেহারা ট্রে বোঝাই চা'র সরঞ্জাম টেবিলের উপর রেখে গেল। প্রস্থানে উদ্যত হলে মিনতি বললে—"দাদার ফলের জুস্ দিয়ে যাস্ এক্ষণি। মিনুদাকে চা দেব না দুধ দেব? মৃণাল সহজকণ্ঠে বললে—"আপত্তি নেই কিছুতেই।" এক কাপ চা, এক কাপ দুধ, খান কয়েক বিস্কুট এবং এক প্লেট পায়স এনে রাখলে মৃণালের সামনে! মৃণাল বলে—"চা, দুধ দুইই।" "আপত্তি যখন নাই, ক্ষতি কি"—মিনতি বলে। এক চামচে পায়াস মুখে দিতেই মিনতি বললে—খাওয়ার সিষ্টেম ও নয়, দুধটুকু খেয়ে, চা বিস্কুট খেয়ে নাও, তারপর পায়াস মুখে দিলে তৃপ্তি পাবে পুরোপুরিই। মা এসে পড়তেই মিনতি বললে—দেখলে মা, দাদার উকিল বন্ধু এ বয়সে খেতে পর্য্যন্ত শিখলে না, সেদিন যে দাদা বলছিলেন তার সঙ্গে I. C. S. candidateদের ডিনারে ডাকা হলে কোন্ candidate নাকি কাঁটা চামচ

রেখে গোগ্রাসেই গিলতে স্থরু করে দিয়েছিল। উকিল বাবুরও অবস্থা অনেকটা তদ্রূপ। মা হেসে বল্‌লে—যার যেমন স্থবিধ, তৃপ্তি নিয়ে কথা। মিনতি বলে—তবে স্থান কাল বিচার করা ত দরকার, কলেজে হষ্টেলে মাছ মাংস খেয়ে পরে ডাল দিয়ে পেট বোঝাই করতে কোন আপত্তি নাই, ঘরে যেতে হবে রুচি ঠিক রেখেই। অধর হেসে বলে—Example দুটা appropriate হয়নি মোটেই। মৃণাল হাতে তালি দিয়ে হাসতে থাকে, কারণ মুখ তার engaged, মুখের গ্রাস গলাধকরণ করে মৃণাল বলে—মেয়েরা logically কথা বলতেই জানে না—কবির ভাষায় বলতে গেলে তাদের ভাষা হল—ব'লে যাও যাহা মুখে আসে, অর্থহীন ভাবে ভরা ভাষা। মিনতি মৃদু হেসে বলে—বেশ জব্দ করলে বটে, কিন্তু কথোপকথনের সময় এক পক্ষ নীরব থাকলে, অপর পক্ষ স্থবিধা পেয়েই logic ছেড়ে দিয়ে আক্রমণ স্থরু করে নানা স্থত্র ধরে। ogicএর দোষটা মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে বাহাদুরী ফলিয়ে লাভ কি? মা বিরক্ত হয়ে বলেন—তোদের logic টজিক্ রেখে দিয়ে, একটা কাজের কথা শোন ত এবার। মিনির জন্য একটা ছেলে দেখে দেনা মিনু! মিনতি গম্ভীর কণ্ঠে বলে—মিনুদার সে ব্যবসাও আছে না কি ! ওকালতিতে নাম করা কঠিন, এ ব্যবসা স্থরু করলে পাড়াগাঁয়ের বৌ ঝি ও শ্রীনামটা কণ্ঠস্থ করে রাখবে। কি যে বাজে বকিস্ তুই, ফাজিল্—মা ধমক দেন। অধর মৃদু হেসে বলে—তোমার মেয়ে ও পাঠ পড়বে না মা, বিজ্ঞান পড়া আছে, জোর জবরদস্তি করতে যাও তো—পটাসিয়াম্‌সাইনেট গিলবে। মিনতি জোর গলায় বলে—অত coward আমি নই। অধর স্থর পরিবর্ত্তন করে বলে—না মা, ভুল হয়ে গেছে, গিলবে না, ডাইলিউশন করবে, ডাক্তারী পড়বে কিনা! বেশ ত ভালই, মাষ্টারীও করতে পারে, কিন্তু বাপু টাইপরাইটার টিপতে যেও না যেন।

পিয়ন ডাক দিয়ে গেল। তিনখানা চিঠি—মৃণাল বস্থর নামে দু'খানা—একখানা মেয়েলি হাতের লেখা, রমাদির সন্দেহ ক'রে ব্লাউজের ভিতর চালিয়ে দিয়েছে মিনতি, বল্‌লে—তার ফ্রেণ্ড মীরা দত্ত লিখেছে কলকাতা থেকে। পিতা ভূদেব বস্থ লিখেছেন একখানা কুষ্টিয়া থেকে—মৃণালের খোকা হয়েছে, সে সংবাদই ওখানার বিষয়বস্তু। রং মায়ের মতই, নাক মুখ চোখ অবিকল মৃণালের মত, খোকা শক্ত হ'লে বধূমাতাকে নিয়ে ফিরবেন লিখেছেন—মিনতিই পড়ছিল চিঠি, সহজকণ্ঠে যেন নয়। সহজ গতিতে বাধা দিয়ে মৃণাল বল্‌লে—ঐখানা অধরদার বুঝি ,His majesty's service, আবার Interview নেওয়া হবে বোধ করি, দাদা fight করছো কিন্তু কম নয়, খোকার বিষয় চাপা পড়ে গেল, কিন্তু ব্লাউজের নীচের চিঠিখানা যেন বিদ্রূপ করছিল মিনতিকে তার পরাজয়ের রূপ নিয়ে, কি মনে করে সে বেরিয়ে গেল হঠাৎ—জল খেয়ে এলো এক গ্লাস। মা বল্‌লেন—খোকার এবার চাকুরী হলেই মিনির বিয়ে দেওয়া যাবে প্রফেসর ঘোষের বিলাত ফেরৎ ছেলের সঙ্গেই, কি বল মিনু। মৃণাল বলে—মন্দ কি অধরদা কি বলেন? মিনতি উঠে গেল আলোচনাকে উপেক্ষা করেই। মা বললেন—পাগলা মেয়ে।

বিকেল বেলা, মৃণাল ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে, বুকের উপর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান। মিনতি ঢুকেই তার বুক থেকে বের করলে সেই চিঠি লুকাবার সেই গোপন স্থানটা থেকেই বললে—চল মিনুদা একটু বেড়িয়ে আসা যা'ক, মাথাটা ভারী ধরেছে যেন। মৃণাল উঠে বসতেই বেহারা ২ বিস্কুট নিয়ে হাজির, চা'র কাপে চুমুক দিয়ে মৃণাল বললে—মনটা আমার বিশেষ ভাল নেই আজ।

মিনতি হেসে বলে—খোকার মাকে খবর দেব কি? মৃণাল গম্ভীর হয়ে চার কাপ শেষ করে উঠে পড়ে, মিনতি বলে—দাঁড়াও, শাড়ীখানা পাল্‌টিয়ে নি।

দেওয়ালের ঘড়িতে তখন ৬টা বেজে গেছে। ... রঙের বাড়ী থেকে একখনো হলদেরঙের গাড়ী রাস্তা বেরিয়ে গেল, আরোহি মৃণাল আর মিনতি স্বামী স্ত্রী বলে পথিকজনের ভুল হওয়া বিচিত্র নয় মোটেই। গাড়ী হাজারীবাগ কলেজের সম্মুখ দিয়ে রাঁচির রাস্তা ধরে চলেছে ড্রাইভ করছিল মৃণাল। মিনতি বললে—রাঁচির পথে রওনা দিলে যে, মাথা খারাপ হয় নি তো?

মাথা খারাপ হয়েছে কার তা দেখতে পাচ্ছি—মৃণাল জবাব দেয়। হঠাৎ গাড়ী ফুল্‌স্পিডএ ছুটলো। মিনতি ডাকলে মিনুদা! মৃণাল ষ্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে জবাব দেয়—কেন? আমি ভাবছি—মিনতি বলে, কথা কেড়ে নিয়ে মৃণাল বলে—শান্তার কথা?—তা নয়, নিজের লোকসান্ করে নিজের ক্ষতিপূরণ করার প্রবৃত্তি নেই বল্‌ছি—গাড়ীতে মনে হয় বেশী তেল নেই, তেল ফুরিয়ে গেলে সমস্ত পথ হেঁটে যেতে হবে যে, তোমার না হয় দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদানের করবার অভ্যাস আছে কিন্তু আমার উপায় কি হবে?—কাঁধে বয়ে নেব—মৃণাল জবাব দেয়। গাড়ী dead stop করে মৃণাল বলে—এবার ফিরব?—চল একটু হেঁটে এই পাহাড়টায় গিয়ে উঠি—মিনতি বলে। রাস্তার পাশে গাড়ী রেখে উভয়ে চললো পাহাড় দেখতে। চলার পথে ব্লাউজের নীচ থেকে চিঠিখানা বের করে মিনতি বলে—মিনুদা, এখান ও তোমারই চিঠি, রমাদি লিখছেন বোধ করি।—ঐ উঁচু জায়গাটাতে গিয়ে পড়া যাবে মৃণাল বলে। উভয়ে গিয়ে বসলে একটা টিবির উপরে। আপন মনে চিঠির সমস্তটাই পড়তেছিল মৃণাল, চিঠির শেষ দিগকটায় মিনতিকে লক্ষ্য

করে প্রায় এক পাতা লেখা। মৃণাল সে দিকটা জোর গলায় পড়ছিল—মিনি দি, তোমার আশীর্ব্বাদ ফ'লে গেল, অধরদাকে নিয়ে একবার আমাদের এখানে আসবে কি, খোকাকে আশীর্ব্বাদ করবে না? মিনিদি, তোমার কথা অনেক শুনেছি ভাই—তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড রাণীদির মুখে; ও আমার মাসতুত বোন্—গেলবার তোমার সাথেই পাশ করলে। ভাই, তোমার অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি, জান্‌তুম না যে, শত্রু মনে কর ত বিষ খেয়ে মরবো, বোন বলে গ্রহণ করতে পারো ত স্বামীর প্রস্তাবে মত দিও, এসো বোন, দুজনে এক হয়ে তাঁর জীবনকে সরস করে তুলব, তোমাকে ছেড়ে সে শান্তি পাবে না যে—তাঁর মুখেও তোমার কথা অনেক শুনেছি। বিয়ে তোমাদের নাকি ঠিকই ছিল, জ্যোতিষই শুধু ঠেকিয়ে রাখলে—তোমার আয়ুষ্কাল নাকি খুবই অল্প, এই অজুহাত।………

মিনতি হঠাৎ চমকে উঠে বলে—উঃ মিনুদা, কিসে কামড়ে দিলে যেন, উঃ সাপ, ঐ যে, ঐ যায়। মৃণাল হাতের লাঠি ছুঁড়ে দিলে সেই দিকে, সাপ পালিয়ে গেল। —উঃ, কি বিষ মিনুদা, আর পারছিনে—মিনতির মুখ শুকিয়ে গেছে যেন। মৃণাল কাঁধে করে তাকে মোটরে নিয়ে তুললে। গাড়ী ছুটলো বিদ্যুৎবেগে।—পথে রমাদিকে টেলি করে দিও, খোকাকে যেন সঙ্গে আনে, আশীর্ব্বাদ করবো তাকে, মিনতি বলে। মৃণালের চোখে জল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় গাড়ী এসে বাড়ী ঢুকলো।

তারপর সেই লালবাড়ীর সামনে চার পাঁচখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে, ডাক্তার, কবিরাজ, সাপুড়ে এসে গেছে গণ্ডা পাঁচেক। বিপদে পড়লে অধর, চীকিৎসার গোলমালে। একে একে ডাক্তার, কবিরাজ বিদায় নিলে সাপুড়ে একজন সেই পাহাড়ে গেল সাপ ধরতে, সেও ফিরলে, ফল হল না কিছুই। বিষ আর নামে না বুঝি। মিনতি অজ্ঞান, মা কক্ষের দ্বার এঁটে কান্না জুড়ে দিয়েছেন—আশা নেই আর। একবার চোখ মেললে মিনতি, রাত্রি তখন ১২টা, চোখ মুখ তার কাল হয়ে গেছে কাল নাগিনীর বিষে, বললে, কে—উঃ মিনুদা, বুক জ্বলে যায়, এক গ্লাস জল দাও। মৃণাল জলের গ্লাস মুখে ধরতেই সমস্ত গ্লাসটাই খালি করে দিলে সে, বললে—রমাদিকে বলো, ভালই হল, এক স্বামীর দুই স্ত্রী থাকা ভাল নয় যে; খোকাকে আশীর্ব্বাদ করছি, সে যেন দীর্ঘজীবি হয়, ভালবাসতে দিও না কোন মেয়েকে যাকে বিয়ে করতে কোন কারণে বাধা থাকে। না, মিনুদা আর পারিনে, দাদাকে ডাক—রমাদি এলে বলো, আশীর্ব্বাদ করে গেছি—সিথির সিন্দুর যেন অক্ষয় হয়ে থাকে। মা কাছে এলেন, মিনতি বললে—মা, বিয়ে আমার হয়ে গেছে, সে অনেকদিন মা,—দাদা,—আমায় ক্ষমা করো। চোখ তার বুজে গেল।

সেরা মালী

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি বলিল :—
বসন্তে কানন আজি কুসুমে কুসুম
এ দুদিন কোকিলের চক্ষে নাহি ঘুম॥
কবিসখা বলিল :—
আরে রাম! অবিরাম কুহু কুহু কুহু!
কৃপা করি ওহে পিক্ ক্ষান্ত হও মুহু!
শেষ রাত্রে পঞ্চম সপ্তমে যবে চড়ে,
শিয়রের গোড়ায় ডাকাত যেন পড়ে।
কবি বলিল :—
হুহু শ্বাস ছাড়িল দক্ষিণ দিগ্‌বধু।
কুহু স্বরে অমনি উত্তর দিল মধু॥
কবিসখা বলিল :—
তোমার মধুর পায়ে করি আমি গড়
ফুলকফি কাড়ি নিল গালে মারি চড়।
বদলি দিলেন যাহা—কদলিরই ভাই
বকুল আম্র মুকুল ভস্ম আর ছাই!
কবি বলিল :—
বকুল নয়নশূল কর্ণশূল পিক্!
চেপেছে বিরহ জ্বর—ভাল না গতিক।
কবিসখা বলিল —
কবিরাজ বটো কিন্তু নাড়ীজ্ঞান নাই।
মোর কাছে বিরহের খাটে না বড়াই।
বিরহের পিতা যিনি (প্রেম যাঁর নাম)
দূর হতে মোরে তিনি করেন প্রণাম।
কবি বলিল :—
কবি যাতে ডুবি থাকে—রস অতি গাঢ়
তাহা যদি ভঙ্গ কর সঙ্গ মোর ছাড়॥

তোমার বচন শেলে মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা
মৃত প্রায় কোকিলের ফুরিছে না কথা ॥
মনেই রহিল তার মনের বারতা।
নৃত্য গীতে ক্ষান্ত দিল নিকুঞ্জের লতা ॥

কবিসখা বলিল :—

ক্ষান্ত দিবে তুমিও আসিবে যবে জল
ভরসা আমার এই ছাতাটা কেবল
করিয়া আইল মেঘ এই যে বিলক্ষণ !
চিকুর হানিছে অই ! ভাল না লক্ষণ !

কবি বলিল :—

জল আসে আসুক ! মরিব আমি ভিজে
আমার ব্যথার ব্যথী ঋতুরাজ নিজে।
চারু তরু লতায় ফুটেছে চেকনাই।
তার পানে তোমার আদবে চোক নাই
যখনি উঠিছে জাগি বাতাস দখিণে—
আসিছে বকুল গন্ধ ! গাছ ত দেখিনে।

কবিসখা বলিল :—

জেলের ছেলেটি যেথা ধরিতেছে মাছ :
শিলের ওপারে অই বকুলের গাছ ॥
পাশের কুটীর খানি পড়ি নাই খালি।
কে যেন গাঁথিছে মালা : বোধ করি মালি ॥
হিত বাক্য এ মোর করো না অবহেলা।
অই ঠাঁই চল যাই শীঘ্র এই বেলা ॥
ভেবেছিনু বৃষ্টি হবে ঠিক তাই হোল।
পারো যদি ছাতা খানা টেনেটুনে খোলো ॥
ততক্ষণ আমি গিয়া মালীরে শুধাই—
ঘরে যদি দুই দণ্ড দিতে পারে ঠাই !

কবির বিপদ

পড়িল দু এক ফোঁটা কবির মাথায়
খোলে না হে ছাতা খানা একি হোল দায়।
দ্বিতীয়, তৃতীয় চাপে খুলে গেল ছাতা।
ভিজিবার দায় থেকে বেঁচে গেল মাথা ॥
ঘোর করি এল মেঘ শ্যাসাইয়া তরু।
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডমরু ॥
ঝিলের উপরে হেরি কুড়ে ঘর খানি
কবিরে কবির মন করে টানাটানি ॥
ঝিল সে বৃহৎ দীঘি স'ওয়া কোশ পাকা।
ঘুরিয়া যাইতে হলে দু ঘণ্টার ধাক্কা ॥
বাঁকিয়া হয়েছে পথ নয়নের আড়।
দ্বীপের করিছে ভান গাছে ঢাকা পাড় ॥
ক্ষণেক ফিনকি ধারে নামিয়া নিস্তব্ধে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ঝুপ ঝাপ শব্দে।
তুবড়িয়া যায় ছাতা বৃষ্টির থাবোড়ে।
ভূঁয়ে লপটায় কোঁচা হয়ে লড়বোড়ে।
গুটাইয়া ছাতাটা আঁটিয়া মালকোঁচা
কোমর বাঁধিয়া কবি দৌড় দিল চোঁ-চা ॥

আপদঃ শান্তি

দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটী বগলে।
সহাস্য বদনে সখা দুয়ার আগলে ॥
বলে কবি বন্ধুর এমনি বটে কাজ।
হাসে আর কাষ্ঠ হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ ॥
চৌকাট ডিঙাবে যেই, খাইল হোঁচট।
আরে ! আরে ! বলে সখা লাগেনি ত চোট ॥
পিছলিয়া পড়িতে পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা হেচ্ছো ! কবি হাঁচে ॥
বলে আর কবিত্বের রাম শ্যাম কীট।
জলে ভিজি এইবার হইয়াছে চীট ॥
মূর্ত্তি যে হয়েছে তব কেমনে বাখানি !
বাসী হইলেই ফলে বাঙালের বাণী ॥
কবি বলে ফলিবার হইলেই ফলে।
বাণীর পিতার লেখা বাণীতে না টলে ॥
যা হোক্—এখন আর চিন্তা নাই কোনো।
হস্তে ওটা কি তোমার গুটোনো স্থটোনে ॥
সখা বলে হস্তে মোর দেখিতেছ এ যা—
জীবদ্দশায় ছিল ব্যাঘ্র মহাতেজা ॥
মালীর সহিত ছিল প্রণয় অত্যন্ত।
নিত্য খাওয়াইত মালী বরাহ জীয়ন্ত ॥
পিঞ্জরের দ্বার খুলি মাঝে মাঝে মালী।
ডাকিত আদর করি করালী, করালী ॥
কোলাকুলি হৈল আর সাঙাতে সাঙাতে ॥
পিঞ্জরের দ্বার খুলি, এক দিন প্রাতে।
অনেক ডাকিল মালী—না পাইল সাড়া ॥
ভাবিল বাঘার বুঝি লাগিয়াছে জাড়া ॥
গাত্র নাড়াচাড়া দিয়া দেখে শেষে মালী।
শরীর পিঞ্জর খানা হয়ে গেছে খালি ॥
তে রাত্রি ত্যজিল মালী নয়নের বারী।
চর্ম্মের হইল শেষে উত্তরাধিকারী ॥
ভিজিয়া গিয়াছে ধুতি ছাড়ো অতএব ;
পরি এই বাঘ ছাল সাজো মহাদেব ॥
বৃষ যদি চাও তবে পাদুকা ও দুটী।
হয়েছে জীয়ন্ত বৃষ জলে ফুলি উঠি ॥
পাজোর বেরোনো ছাতা ত্রিশূল মন্দ না।
কবি বলে অপূর্ব্ব এ জিবের বন্দনা।
পাইলে লুফিয়া লৈত অন্নদামঙ্গল।
পথে হাটে ছড়ায়ো না রসের সম্বল ॥

এত বলি বাঘছাল কটিতে আঁটিয়া।
করিল কৈলাস গিরি মালীর খাটিয়া।।
চপলা বলিয়া গেল রাঙাইয়া চোক।
আরম্ভিল অমনি মেঘের ডাক ডোক।।
তড় তড় শিলা পড়ি ছেয়ে ফেলে মহী।
গলা ছাড়ি ডাকে ভেক গোলাগুলি সহি।
অদৃশ্য হইয়া গেল তৃণ-আস্তরণ।।
তবু ছাই জলধারা না মানে বারণ।
চাহিয়া দেখিল কবি, মালি নাই ঘরে।
সখারে শুধায় তাই এ বৃষ্টি বাদরে।।
ভিজিতে ভিজিতে মালী গেল কোথা ভাই।
সখা বলে আমিও তো ভাবিতেছি তাই।
অই আসিতেছে মালী, পুঁটুলিতে কিও,
তপ্ত মুড়ি এনেছে যে—শত বর্ষ জিও।
উপস্থিত করে মালী চারি ধামা মুড়ি,
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গামছা দিয়া মুড়ি,
ঝাঝালো সর্ষপ তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড,
কবি বলে, "সর্ব্বনাশ, করিছ কি কাণ্ড।
হাতীর খোরাক এযে হরে হরে হরে,
এ দু'ধামা রাখ তুমি আপনার তরে।
এত বলি মুঠা মুঠা মুড়ি করে পার,
চারি ধামা হয়ে গেল নিমেষে উজাড়।
পাতিয়া তখন মালী কলাপত্র থালা
সাজাইয়া রাখে দুটা নারিকেল মালা।
আনিয়া ঘটিতে করি ক্ষণ পরে মালী
সেই দুই পাত্রে দিল গরম চা ঢালি।
সে চা'র জনম ভূমি ঝিলের ওধার,
মালঞ্চের মুখ ম্লান সুগন্ধে তাহার।
চা চাখিয়া বলে কবি "জানো কি গো জাদু"
চা কোথাও পিই নাই এমন সুস্বাদু!
মালী বলে "ক্ষমিবে সহস্র মোর দোষ,"
এত বলি লবঙ্গের দিল ঠেসঠোস
গুয়াচূণ খএরে তাম্বুল দিল সাজি
কবি বলে "বাকী কিছু রাখিলে না আজি।
ছিলে নন্দনের মালী সেবিতে বাসবে
ক্ষীণ পুণ্য পুরাবারে এসেছ এ ভবে।
সম্বল আঁটিয়া পুন যাবে সেই ঠাই॥
মালী বলে কৃপায় স্বর্গ হাতে পাই"
কবিরে বলিল সখা করি পরিহাস
লেগেছে মালীর গায়ে তোমার বাতাস।
বড্ড আজ ফাঁকতালে হাতাইল স্বর্গ
হাতে যদি রজতের পড়িত বিসর্গ
এই দণ্ডে হইত স্বর্গের পথ রোধ,
একটু থেমেছে বৃষ্টি হইতেছে বোধ।
ভেকের গলার নাই শকতি সেরূপ,
এবার বুঝিবা গেল একেবারে চুপ।
এই কথা যেই মাত্র মুহূর্ত্তেক বলা—
সারা উদ্যানের ভেক ছাড়ি দিল গলা
মিনিট পনের ষোল বৃষ্টি হোল ঝেড়ে,
নরমিয়া ক্রমশঃ বাদল গেল ছেড়ে,
অবসান হয়ে এল বিদ্যুতের রেখা,
কোথায় যে গেল মেঘ, নাহি তার দেখা।
বৃষ্টি গেল ধরিয়া ফরসা হল দিক্,
বৈকালে করিল সুরু নব রাগে পিক।
পাদুকায় দিতে মালী আগুনের সেঁক
চর্ম্মের কুটুরী থেকে লম্ফ দিল ভেক।
বেলা আছে দেখি মালী অবসর বোধে,
ভিজে ধুতি ম্যালাইয়া টাঙাইল রোদে।
মালীর সৌজন্য হেরি কবির স্যাঙাত,
থাকিতে নারিল আর গুটাইয়া হাত।
রেশমের রুমালের খুলিয়া পুঁটুলি,
রূপার চারিটি চাকি ধীরে লয় তুলি।
বলে আর মালীরে "কিঞ্চিৎ এই ধর"
জোড় হাতে বলে মালী "এবে ক্ষমা কর"।
অধম জনের প্রতি না করিহ রোষ,
পদধূলিতেই মোর পরম সন্তোষ।
কবি বলে, অর্থ আগে বোঝ কথাটার,
প্রয়োজন হইয়াছে আমা-দুজনার।
ভাল মালা দুই ছড়া তারি এই মূল্য,
মালী বলে নাহি ধন প্রসাদের তুল্য।
প্রসাদ বিতরি লহ দাসের প্রণামি,
বহু যত্নে এ দুছড়া গাঁথিয়াছি আমি।
কবি বলে, আজিকে যা শিক্ষা লভিলাম—
স্মরণে রহিবে গাঁথা—লৈনু ফুল-দাম॥
ফুল যাবে যার কোলে, না রহিবে আটকা,
স্মৃতির সুগন্ধ রবে চিরদিন টাটকা।
এত বলি উদ্যানের শান্তি করি ভোগ,
গৃহে যাইবার কবি করিল উদ্যোগ।
শুকাইয়া ধুতিখানা করে লটপট্,
কোঁচাইয়া ফেলিয়া পরিল চট্পট্।
গোষ্ঠ পথে চলা ভার কুলীদের ভিড়ে,
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায়, পক্ষী যায় নীড়ে।
শীতল মলয় আনে ফুলের সুবাস
সোজা চলে দুই জনা ছাড়ি আশপাশ,
শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে, সন্ধ্যা দীপ জলে
দু-সখার মালা যায় দু-সখীর গলে।।

জ্ঞানের মোহ

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(১১)

শ্বশুর ও পুত্রবধূতে কথা হইতেছিল। ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—কাল সব দেখে এলে মা? হাসপাতাল, স্কুল বাড়ী তোমার পছন্দ হোল তো?

—হাঁ, বাবা, খুবই সুন্দর। কিন্তু আর একটি জিনিষও দেখে এসেছি?

—কি জিনিষ মা?

—সে বড় সুন্দর বাবা, জনার্দ্দন ঠাকুরের মেয়ে ঊষা। তাকে দেখেছিলাম এতটুকুটি। তাকে একদিন নিয়ে আস্‌বো আমাদের বাড়ীতে।

—হ্যাঁ, তোমার শাশুড়ীর মরবার মাস দুই পরেই বোধ হয়, ওর মা মারা যায়, তখন মেয়েটা নেহাতই শিশু।

—ঊষা কিন্তু বাবা, তার মার চেয়েও দেখতে ভাল!

—তার আশ্চর্য্য কি মা! জনার্দ্দনও তো সুপুরুষ! বাপ মায়ের রূপ গুণই তো সন্তানে পায়।

—ঊষাকে দেখেই, তার ওপর আমার এমন একটা মায়া হয়েছে, বাবা, যে তাকে ছেড়ে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

—জনার্দ্দনকে বোলে, তাকে আজই নিয়ে এলে না কেন বৌমা! আমি ও দেখ্‌তুম কত বড়টি হয়েছে, আর কত মিষ্টি গান গায় সে!

—আমি বাঁড়ুজ্যে মশায়কে বলেছি বাবা, শীঘ্র একদিন নিয়ে আস্‌বো।

—বেশ করেছ! কিন্তু তাকে এখন জনার্দ্দন পাঠায় কি না!

—কেন পাঠাবেন না?

—তাকে তো তুমি জান না মা! সে এক ধরণের।

—কিন্তু আমাকে তো বলেছেন, পাঠাবেন।

—বেশ, ভাল! কিন্তু তোমার অরুর বিয়ের কি করছ মা?

—তার আমি কি জানি, বাবা!

—তুমি তার মা, তুমি না জান্‌লে, জানবে কী ওপাড়ার হরি পোদ্দারের শাশুড়ী! বলিয়া ঘোষাল মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

—আমি মা হ'লেও, আপনি যে আমার বাবা! বাপ থাক্‌তে, মেয়ে কেন সে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যাবে বলুন!

—না বৌমা, এখন আর আমি তোমার বাবা নই, অরু আর আমি দুটি ভাই—তোমার ছেলে; এখন আমাদের সব দায়িত্বই তোমার মা!

—তা জানি, বাবা! কিন্তু অরু যে আপনারই!

—না মা! অরুণ ঐ গোবিন্দের! আমার বলবার সাহস আর নেই, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়েছে, তাই তাকে নারায়ণের পায়েই সঁপে দিইছি! বলিয়া ঘোষাল মশায় একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

—আশাদেবীও নিরুত্তর রহিলেন।

—কিছুক্ষণ পরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—এবার অরুণের বিয়ে শিগ্‌গীরই ঠিক কর বৌমা, আর দেরী ক'রো না।

—কিন্তু অরুর উপযুক্ত মেয়ে ও তো পাওয়া চাই, বাবা!

—কয়েকখানা ফটো তোমার কাছে এসেছে না?

—হ্যাঁ।

—তার মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ?

—একটিও নয়, বাবা!

—সে কী, বৌমা! তারা তো বেশ লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা, আর বড় ঘরের!

—তা জানি বাবা, কিন্তু তবুও তারা আমার অরুর পাশে বস্‌বার মত নয়।

—কিন্তু আমি তো ফটো দেখেছি—দেখ্‌তে তারা মন্দ নয়!

আশাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন।

—অরুণকে দেখিয়েছিলে ফটো?

—না।

—কেন?

—আমারই যখন ভালো লাগে নি, তখন তাকে আর কি দেখাবো, বাবা!

—কিন্তু কেন যে তোমার পছন্দ হচ্ছে না' তাই তো বুঝতে পারছি নে, বৌমা!

—বলেছি তো বাবা, দেখ্‌তে তেমন ভাল কোনটিই নয়, যাকে আমার অরুণের বৌ করতে পারি!

—কিন্তু, আমার চোখে তো মন্দ লাগে নি, তা ছাড়া আসল সুন্দরী হয়ই বা ক-জন!

—হয় বই কী বাবা!

—ঘোষাল মহাশয় মুহূর্ত্ত পুত্রবধূর দিকে চাহিলেন। অপরূপ সুন্দরী গৃহস্থ কন্যা আশাদেবীকে যেদিন তিনি পছন্দ করিয়া আনিয়াছিলেন—বধূর সৌন্দর্য্যে সেদিন তাঁরা কতই না গর্ব্ব করিয়াছিলেন। সত্যই তাঁর পুত্রের পাশে এমন মেয়ে না হইলে মানাইত না, কিন্তু সেই ছেলে যেদিন চলিয়া গেল, তখন তরুণী বধূর রূপ তাঁর চোখে জ্বালা ধরাইয়া দিল—মনে হইল বধূ তাঁর এত সুন্দরী না হইলেই ভাল হইত! অরুণের বধূ নির্ব্বাচনে সুন্দরী কন্যা লইতে তাঁর আর সাহস ছিল না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—বেশী সুন্দরী বৌ নাই বা হ'ল বৌমা, মোটামুটি মেয়ে দেখেই তুমি অরুণের বিয়ে দাও!

—কিন্তু বাবা, এমন মেয়ে চাই, যে অরুণের সহধর্ম্মিণীর আসনটির মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে!

—তোমার কি মনে হয় মা, তেমন মেয়ে কেউ নেই এর মধ্যে?

—সত্যিই তাই, বাবা!

—তবে অন্য মেয়ে তুমি খুঁজে বার কর মা, তোমার ছেলের উপযুক্ত!

—তার খোঁজ আমি পেয়েছি, বাবা!

—কোথায় পেলে বৌমা?

—এখানে।

—তবে কী উষাকেই তোমার ছেলের যোগ্য ভেবেছ?

একটু হাসিয়া আশাদেবী বলিলেন—আপনি যে বুঝতে পারবেন, তা আমি জানতুম বাবা?

—কিন্তু, জনার্দ্দন রাজী হবে না মা!

—কেন বাবা! অরুণ কি আমার যে সে ছেলে! রূপ, গুণ তার কিছুই তো কম নয়!

—তা জানি বৌমা! কিন্তু জনার্দ্দনের গোঁড়ামী তো তুমি জান না!

—তাতে মেয়ে দেবার বাধা কি?

—শুনেই তো এসেছ মা, সে সৎ বামুনের ছেলেকে মেয়ে দেবে,

—কিন্তু অরুণও আমার ছোট বংশে জন্মায়নি, বাবা!

—সবই বুঝি মা, কিন্তু শুনছি, অরুণ ডাক্তার হয়েছে ব'লে, জনার্দ্দন না কি তার উপর সন্তুষ্ট নয়!

—কেন?

—তা তো কিছু জানি নে, মা! তবে গোপী এ কথা ব'লছিল। রুগী দেখ্‌তে সে সব জাতের ঘরেই যায়—

—তাতে দোষ কী, বাবা! সে ডাক্তার, রুগী দেখ্‌তে সে জাত বিচার করতে পারে না!

—তা আমি ও জানি, বৌমা; কিন্তু আগেই তো বলেছি, জনার্দ্দনের গোঁড়ামীটা কিছু বেশী।

অরুণ আসিয়া বলিল—আজ আপনার ধনঞ্জয়ের বাড়ী গেছিলুম, দাদু!

তার দিকে চাহিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—কেমন আছে সে?

—এ বয়েসে যেমন থাকে!

—কী বল্‌লে তোমাকে?

—বলবে কী! পরিচয় পেয়েই কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

—আহা! সে যে আমার চেয়েও বড়! চল্‌তে টল্‌তে পারে?

—ঐ লাঠি ধ'রে একটু-আধটু!

—তাকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। পুরোনো লোক!

—একদিন মোটরে চড়িয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব আপনার কাছে।

আশাদেবী বলিলেন—তোর জন্মদিনে নিয়ে আসিস্। তুই যেদিন হয়েছিলি, সেদিন আনন্দে সামনের মাঠে কত রকম খেলা দেখিয়েছিল সে!

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—হ্যাঁ সেদিন ধনঞ্জয়ের আহ্লাদ দেখে কে! তাই ভাল, ঐদিনই তাকে এনো, তাতে সেও খুশী হবে!

অরুণ বলিল—সেদিন কিন্তু গাঁয়ের সব জাতকেই আমি নেমন্তন্ন করবো, দাদু!

—বেশ তো, খুব আনন্দের কথা! তোমার মা সামলাতে পারলেই হ'ল!

—আমার মাকে কি আপনি জানেন না, দাদু!

—জানি বই কী ভাই!

—তবে এ কথা বলছেন কেন? মা! তুমি পারবে না এদের খাওয়াতে?

—তোর মা কি তা বলেছে অরু! বলিয়া আশাদেবী ছেলের দিকে চাহিলেন।

(১২)

জন্মতিথি পূজা শেষ করিয়া অরুণ জননীকে প্রণাম করিল।

আশাদেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রের ওষ্ঠে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

—এসো মা, দাদুকে প্রণাম করিগে, বলিয়া অরুণ উপরে গেল।

—তুই চল—আমি আস্‌ছি—

অরুণকে দেখিয়া রাধানাথবাবু বলিলেন—পুজো হ'য়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—ব'স আমার কাছে।

—কিন্তু আপনাকে যে প্রণাম ক'রবো—

—থাক্ ভাই, তার আর দরকার নেই, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবি হও!

—কিন্তু প্রণাম না ক'রলে, আমার যে তৃপ্তি হবে না দাদু, বলিয়া অরুণ ঘোষাল মহাশয়কে প্রণাম করিল।

তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—আজ তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে অরুণ!

—তাই না কী! বলিয়া অরুণ হাসিল।

—হ্যাঁ ভাই! এই গরদের জোড় পরণে, নূতন পৈতে গাছটির ওপরে ফুলের মালা, আর কপালে ঐ হোমের টীকে, বড় চমৎকার দেখাচ্ছে! কিন্তু একটা অভাব এর র'য়ে গেছে, ভাই!

—কী বলুন তো?

—বাঁ দিকের একটি সঙ্গিনী।

অরুণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসি নয় ভাই! এখন সত্যি এর দরকার!

—কিন্তু আমার তা মনে হয় না, দাদু।

—হয় বই কী ভাই!

—না দাদু, এ কথা আপনার সত্যি ব'লে মান্‌তে পারিনে!

—কিন্তু আমিও মিথ্যে বল্‌ছিনে, অরুণ! একটি গৃহিণীর তোমার বিশেষ দরকার!

—আমার দরকারটা আপনি বেশী বুঝছেন্ দেখ্‌ছি, দাদু!

—সত্যিই অরুণ! তাতে আমারও একটু স্বার্থ আছে কিনা!

—তাই বলুন।

—হ্যাঁ—ভাই! স্বার্থ না থাক্‌লে কি আর কেউ কারও জন্যে মাথা ঘামায়!

—কিন্তু সেটা শুন্‌তে পাইনে?

—কেন পাবে না! আমি হচ্ছি বাতের রুগী, নড়তে চড়তে পারিনে, কাজেই বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যে একা থাকৃতে হয়—একটি নাতবৌ এলে, তবু আমার দোসর হয়—

—ওঃ! এই জন্যেই বুঝি আপনার এত তাগিদ! বলিয়া অরুণ হাসিতে লাগিল।

—আয় অরু! কাপড় ছেড়ে জল খেয়ে নে, বলিয়া আশাদেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—যাই মা—

—এই নাও কাপড়, শিগগীর ছেড়ে নাও, বেলা অনেক হয়েছে।

—এ যে খদ্দর!

—হ্যাঁ তোমার জন্যে তাঁতিকে দিয়ে তৈরী করিয়েছি।

—সুতো কে কেটেছে?

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—বৌমা যে রোজ চরকা কাটেন, তা বুঝি জান না!

—কৈ, না!

—ওঁর কাপড় সবই ওঁর নিজের কাটা সুতোর!

—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি দাদু, যে এত মিহি সুতো মা কাটলেন কি ক'রে!

—ওতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই অরুণ! এ তোমার মায়ের অনেক দিনের অভ্যেস্।

অরুণ ধুতি এবং চাদর মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল।

—বাবার আর দাদাবাবুর খাবার এনেছি মা, বলিয়া দাসী ঘরে ঢুকিল।

—এখানে রাখ।

রাধানাথবাবুর সাম্নে ছোট মার্‌বেল পাথ'রর টেবলখানির ওপর, দুখানি বড় রূপোর মিষ্টান্নভরা রেকাবী রাখিয়া ঝি বলিল—সরবৎও কি আনবো মা?

—আন্‌বে বই কী!

রাধানাথবাবু আর অরুণ, জলযোগ করিতে বসিলেন।

চাকর আসিয়া বলিল—বামুনদের পাতা কি এখন করা হবে, মা?

—হ্যাঁ।

—আপনি একবার আস্‌তে পারবেন কি? দেওয়ানজী মশাই জিজ্ঞেস করলেন।

—আস্‌ছি আমি—

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—তুমি যাও মা, আর দেরী ক'র না।

—আপনাদের জল খাওয়া হোক্—

—আমরা খাচ্ছি, তুমি যাও—গোপীর হয়তো কোন বিশেষ দরকার আছে।

অরুণ বলিল—চলো মা, আমিও যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে

—না, তুই খা!

—খাওয়া আমার হ'য়ে গেছে—

—সে কী! কিছুই তো খাওনি অরুণ! বলিয়া ঘোষাল মাহশয় তার দিকে চাহিলেন।

—যথেষ্ট খেইছি—আর খাবনা দাদু, এসো মা—বলিয়া অরুণ নীচে গেল।

ব্রাহ্মণ ভোজনের পর, গ্রামের অপর সকলের আহার করাইতে, আশা দেবী যখন ব্যস্ত, তখন অরুণ আসিয়া বলিল—মা এদিককার সকলের খাওয়ান তোমার সারা হ'য়েছে?

—হঁা বাবা! এই গুলি হ'লেই হয়—

—কিন্তু আমার গরীব প্রজারা এবার আস্‌ছে—তাদের খেতে বসাতে যেন দেরী না হয়!

—বাইরে যেখানে তাদের ব'স্‌বার জায়গা করেছ, সেখানে পাতা করাও, আমি খাবার পাঠাচ্ছি।

আহারের পর ভীম বলিল—ভাই সব! বল্, আমাদের রাজা বাবুর জয় জয়কার হোক! আমাদের মাথার চুলের মতো তেনার যেন পেরমায়ু হয়!

ভীমের কথায় সকলে অরুণের জয়ধ্বনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিল।

আশা দেবী বলিলেন—অরুণ এবার তুই খেতে বোস্—

—এখনও আমার বিকেলের স্নান হয়নি—

—তবে যা, আর দেরী করিস্‌নে, চট্ ক'রে নেয়ে আয়! তোকে খাইয়ে আমি আহ্নিক করতে যাব—

—তুমিও তো সারাদিন উপোস্ ক'রে আছ মা? জপ সেরে নাও, মায়ে ছেলেতে এক সঙ্গে খাবো আজ!

—না বাবা! সে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে!

—দেরী কিসের?

—এখনও বাড়ীর চাকরদের খাওয়া হয়নি, তাদের সারা হ'লে তবে আমার জপের সময় হবে।

—তা হোক্ মা! আমি ততক্ষণ বাইরের হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি।

স্নান শেষে লাঠি গাছটি হাতে লইয়া অরুণ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ঊষাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া

অরুণ দেখিল, দরজাটি খুলিয়া উষা তাদেরই বাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিছন থেকে অরুণ বলিল—কী করছেন এখানে?

—অরুণের কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরিতেই উষার মাথা অরুণের ঠোঁটে ধাক্কা লাগিল।

—উঃ! বলিয়া অরুণ হাত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

—আশ্চর্য্য হইয়া উষা বলিল—আপনি এত রাতে!

—হুঁ! কিন্তু দেখুন দেখি ঠোঁটটা আমার—

অপ্রস্তুত হইয়া উষা বলিল—কেটে গেছে না কি?

—কাটবে না! যা জোরে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিলেন!

সেদিন পূর্ণিমা! চাঁদের আলোয় সারা বিশ্ব যেন লুটোপুটি খাইতেছিল। অরুণের ঠোঁট কাটিয়া সত্যই রক্ত পড়িতেছিল। জ্যোৎস্নায় উষা তা দেখিতে পাইয়া নিজের অঞ্চলে অরুণের ওষ্ঠ মুছাইয়া দিয়া ব্যথা ভরা গলায় বলিল—দেখুন দেখি! আজকে আপনার জন্মদিনে আমার জন্যে রক্তপাত হ'ল! কিন্তু আপনি যে কাণের কাছে কথা বল্‌বেন, তা আমি বুঝবো কি ক'রে?

—তোমার মাথাটাও যে এমন শক্ত, তা আমার ধারণা ছিল না উষা!

—মাথা আবার নরম হয় কার?

—কিন্তু তোমাদের তা হওয়া সম্ভবই মনে হয়ে ছিল, কারণ নারীকে যে কোমলাঙ্গী ব'লে কি না!

—সে কথাটা ডাক্তার হ'য়েও আপনি সত্যি বলে ধরে রেখেছেন বুঝি! বলিয়া উষা হাসিতে লাগিল।

—আঃ এর মধ্যে আবার ডাক্তারীকে টেনে আন্‌ছ কেন?

—আপনি ডাক্তার ব'লে!

—না উষা! বলেছি তো তোমার কাছে আমি অন্য কিছুই নই—শুধু অরুণ! সে কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে কেন? কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি—

—কি বলুন?

—এই যে তোমাকে আমি "আপনি" ছেড়ে "তুমি" বলছি—এতে তো রাগ করনি?

—না, রাগ করবো কেন, বরং খুসী হইছি।

—সত্যি ব'লছ, উষা?

—মিথ্যে কেন ব'লবো বলুন! আপনি সং... দিয়েই আমার চেয়ে বড়, তাই আপনার "আপনি" ব... আমাকে কুণ্ঠিত ক'রত। ভেবেছিলুম্ এ কথা আ... ব'লবো একদিন, যাতে "আপনি" আর না বলেন। ... নিজে থেকে "তুমি" বলায় আমি ভারী খুসী হইছি।

—তোমাকে "আপনি" বল্‌তে আজ আর ... কিছুতেই ইচ্ছে হ'ল না, উষা। আপনি কথাট ... অনেক দূরে ঠেলে দেয়—তোমাকে আমার কাছে ... জন্যেই "তুমি" বলেছি! তুমি যে আমার পর, এ ... ভাবতে ইচ্ছে হয় না।

—এ আমার পরম সৌভাগ্য!

—তুমি যে আমার এ অধিকারটুকু মেনে নিয়ে... আমার কম আনন্দ নয়!

কথাটা পাছে আরও বাড়িয়া যায়, তাই উষা ব... —আজ আপনাদের বাড়ীখান্ কিন্তু ভারী সুন্দর সাজি...

—তাই বুঝি এখান থেকে দেখ্‌ছিলে তুমি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে ... উষা!

—কেন?

—আজ আমার জন্মদিনে, মা তোমাদের নেমন্ত... সত্ত্বেও কেন যাওনি বল তো?

উষা চুপ করিয়া রহিল।

—চুপ ক'রে থেকো না, তোমাকে ব'লতে হবে, উ... তুমি জান, আমি এতে কত দুঃখ পেইছি!

—ব্যাথা কি শুধু আপনিই পেয়েছেন!

অরুণ চাহিয়া দেখিল, উষার বড় বড় চোখ দুটি ... ভরিয়া আসিয়াছে।—আমি বুঝেছি, উষা! তোমার ... যেতে দেন্ নি!

উষা কোন জবাব দিল না।

তাহাকে কথা কহাইবার জন্য অরুণ বলিল—অ... উষা! আমার জন্মদিনে, তুমি যদি যেতে, তো কি দি... বল তো?

—কী আর দিতুম্ আপনাকে, দেবার মত আমার আছেই বা কী বলুন!

—যাক্! তাহ'লে ধরে নিলুম তোমার মাথার ধাক্কাটাই আজ আমার জন্মদিনের উপহার!

—ও কথা ব'লে আর কেন দুঃখ দিচ্ছেন!

—এতে দুঃখ কেন মনে করছো উষা, আমি কিন্তু সে ভেবে বলি নি!

—কিন্তু আজ যদি আপনার উপযুক্ত কোন জিনিষ, থাকতো আমার তাহ'লে দিতুম—আজ আপনার জন্মদিনে কিছু দিতে না পেয়ে আমার এত দুঃখু হচ্ছে, যে আপনি তা বুঝতে পারবেন না।

—দাও না, উষা কিছু—তাই নিতেই যে এসেছি তোমার কাছে।

—কিন্তু কী দেবো, কিছুই যে নেই আমার।

—আছে উষা, আছে। আজ আমাকে বিমুখ ক'রো না।

—মুহূর্ত্ত উষা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়ান্ একটু।

এক গাছি ফুলের মালা আনিয়া উষা বলিল—এই আমার সম্বল।

অরুণের পায়ের ওপর নত হইয়া মালা গাছটি দিতে যাইতেই, সে উষার হাত সমেত মালাগাছটি গলায় লইয়া বলিল—ও জিনিষ কি পায়ে দেয় উষা। দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে এখন। এই তো আমি চেয়েছিলাম আজ তোমার কাছে।

উষা অরুণের দিকে চাহিতে তার হাসিমাখা চোখের সহিত দৃষ্টি মিলিল, লজ্জায় উষার মুখখানি টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল।

সে দিকে চাহিয়া অরুণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

—এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়!

—কেন উষা?

—মালাটা আমার হাত থেকে গলায় কেন পরলেন বলুন তো?

—কিন্তু ওটা যে পায়ে পড়বার নয়, তা তুমি ভাল ক'রেই জানো!

উষা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার গলায় মালা দিয়ে তোমার দুঃখ হচ্ছে, উষা?

—দুঃখ নয়!

—তবে?

—আমি যে কুমারী—বলিয়া উষা মুখ খানি নীচু করিল।

একখানি হাত উষার কাঁধের উপর রাখিয়া অপর হাতে তার মুখখানি উঁচু করিয়া অরুণ বলিল—তাতে দুঃখ কি, উষা! আমিও তো কুমার!

(১৩)

অরুণের হাসপাতাল আর স্কুলের কাজ এক সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রামের কয়েকটী বেকার ছেলেকে সে রোগীর সেবার উপযোগী করিয়া লইয়াছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই অরুণ তাদের সুন্দর নার্সিং শিখাইয়া দিয়াছিল। ঘরে বসিয়া এই কাজ পাওয়ায় ছেলেগুলি খুসী হইয়াছিল।

গ্রামের সকলেই অরুণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল এবং তার চিকিৎসায় তারা অনুগত হইয়াছিল। সকলেরই শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই শুধু একজনের—প্রথম হইতেই জনার্দ্দন একটা বিজাতীয় ক্রোধ পোষণ করায়, অরুণের প্রত্যেক কার্য্যে সে নিজের অপমানের সূচনা দেখিত।

একটি যুবা রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, জনার্দ্দন বলিলেন—জমিদার বংশে একটা কুলাঙ্গার জন্ম-গ্রহণ করেছে! কিন্তু আশ্চর্য্যি হচ্চি, এই ভেবে যে বুড়ো জমিদার এখনও বেঁচে! নাতির এই সব কাজ সে সমর্থন করছে কি করে?

ছেলেটি প্রণাম সারিয়া জনার্দ্দনের দিকে চাহিয়া বলিল —অরুণ বাবু ত কিছু অন্যায় করেন নি যে তিনি বারণ করবেন! গাঁ টা এতদিন ম'রে ছিল, তাঁর দয়ায় প্রাণ পেয়েছে!

—যত সব খোসামুদের দল! তো ব্যাটাদের আক্কেল যে কবে হবে, তা বুঝতে পারিনে! এই যে ইস্কুল করেছে, সব জাতের ছেলেগুলই নাকি পড়ে—ঐ নীচ

চামার পর্য্যন্ত! আর হাঁসপাতালও তাই! জাত বিচার নেই! এই সব যে কাণ্ড, এতে কি গাঁয়ের ভাল হয়েছে! 'প্রাণ' দিয়েছে, ! না—জাহান্নমে দিচ্ছে।

—অমন কথা বলবেন না। গ্রামের লোক অরুণ বাবুর দয়ার কথা ভুলতে পারবে না। ম্যালেরিয়ায় গ্রামখানা উচ্ছন্ন গিয়েছিল। চারিদিকের জঙ্গল কাটিয়েছেন, পুষ্করিণীগুলোর সংস্কার করালেন, তা ছাড়া আরও একটা বড় পুকুর কাটাচ্ছেন, ওঁর মা নাকি প্রতিষ্ঠা করবেন। শুনছি, সেখানে কেউ নাইতে পাবে না, শুধু খাবার জন্য সে জল ব্যবহার করা হবে।

—হুঁ! বড় কাজ করছেন! এমন নদীর জল থাকতে আবার পুকুর কাটা! নতুন একটা কিছু ক'রতো—তাও বাবা বুঝতাম!

—তাও করছেন!

—কী?

—যেমন বড় সহরে থাকে, তেমনই একটা লাইব্রেরী, আর তার সামনে বাগান!

—তাতে গাঁয়ের লোকের কী চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবে?

—চোদ্দ পুরুষ না হ'লেও, নিজেদের কিছু উন্নতি হবে বই কি!

—সেখানে নভেল নাটক পড়ে, গাঁয়ের ছেলেগুলো আরও গোল্লায় যাবে!

—আজ্ঞে না। লাইব্রেরীতে শুধু নভেল নাটক্ থাক্‌বে না—

—তবে?

বড় বড় লোকের জীবনী, বাংলা ইংরাজী খবরের কাগজ, তা ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থও অনেক থাক্‌বে।

—শুধু এই থাক্‌বে! আর কিছু থাক্‌বে না! বিলেতি বোতল্ টোতল্?

—আপনি ঠাট্টা করছেন তাঁকে—?

—না! তা কি করতে পারি! তবে ইংরিজী জানা লোকদের বেশীর ভাগ ওসব সখ্ থাকে কিনা!

—কিন্তু উনি সে ধরণের নন্। গাঁয়ের উন্নতিই ওঁর লক্ষ্য।

—তা হ'লে আরও কি উন্নতি করছেন তাও বল, শুনি?

—অল্প বয়সী ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা করেছেন, আর প্রত্যেক পুরুষকে, যাদের চল্লিশের কম বয়স, সপ্তাহে দু'দিন লাঠি খেলা শিখ্‌তে হবে।

—এইবার বুঝেছি, তোমাদের জমিদারটি স্বদেশী—ডাকাতের দল খুলবে! বলিয়া জনার্দ্দন হাসিলেন।

—আপনি তাঁকে জানেন না, তাই একথা বলছেন—তিনি দেবতা।

ধমক্ দিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—থাম বাপু! আমার সামনে মানুষকে দেবতা ব'লে ভগবানের অপমান ক'রো না, সে আমি সহ্য করবো না!

অবজ্ঞা ভ'রে যুবকটি বলিল—আপনি আর চোখ রাঙ্গাবেন না—ঐ অহঙ্কারেই গেলেন চিরদিন! কিন্তু মানুষের মধ্যে দেবতা থাকে না তো থাকে কোথায়? আপনি ত মস্ত বড় পণ্ডিত! কেবল ছোঁয়াছুঁয়িই নিয়ে আছেন। মানুষকে ভালবাস্‌তে তো শিখ্‌লেন না কোনদিন, শুধু ঘৃণাই শিখেছিলেন! দেবতা আর একা আপনার একচেটে নয়! মানুষকে ভগবান বললে ঈশ্বরের অপমান হয় না। আমরা জানি মানুষকে অবজ্ঞা করলে তাঁকে অপমান দেওয়া হয়। ছেলেটি আর দাঁড়াইল না।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া জনার্দ্দন ভাবিতে লাগিলেন—এ হলো কী! যে গ্রামে এতকাল সকলে তাঁকে এত খাতির করিয়া চলিয়াছে, এই একটা বছরে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল, যে, তাঁর মুখের উপর যুবকটি এতগুলি কথা বলিয়া গেল। এ সবই ঐ অরুণের কারসাজি!

(ক্রমশঃ)

CALCUTTA UNIV
Sec. No............
Book No..........

হজরত মুহম্মদের উপদেশ

অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

(৫১)

রসুলুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পাপ কি ?" তিনি বলিলেন, "আমাকে পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না; পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর," এবং ইহা তিনি পরে উচ্চারণ করিলেন। তৎপর বলিলেন, "জানিও মানুষের মধ্যে অধম কুশিক্ষিত, জ্ঞানী কুব্যক্তি, উত্তম শিক্ষিত জ্ঞানী সৎ ব্যক্তি।"

(৫২)

প্রার্থনা দ্বারা হৃদয় লঘুতর হয়; এবং দান-ঈমানের (বিশ্বাসের) প্রমাণ, এবং পাপ হইতে সংযম ইহার পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্য। কোরাণ তোমার পক্ষে লাভের প্রমাণ। যদি তুমি মঙ্গল কর, এবং ইহা তোমার পরিপন্থী যদি তুমি অন্যায় কর, এবং প্রত্যেক মানুষ প্রভাতে উঠিয়া তাহা করে যাহা তাহার মুক্তি কিম্বা ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হইবে।

(৫৩)

তৎপর (জয়নাবের) পুত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় হজরত মুহম্মদের নিকট আনয়ন করা হইল। তখন তাহার আত্মা ভয়-বিহ্বল এবং চঞ্চল। রসুলুল্লাহের উভয় চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। এবং লোকে বলিল, "রসুলুল্লাহের এই কান্না এবং অশ্রু বর্ষনের হেতু কি ?" তিনি বলিলেন, "ইহা কোমলতা এবং সহৃদয়তা যাহা ঈশ্বর তাঁহার দাসেদের চিত্তে স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার দাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অনুকম্পা-শীল হন না সহৃদয় এবং দয়াশীল ব্যক্তিদের ব্যতিরেকে।

(৫৪)

রসুলুল্লাহ সাতদিন ওবাদার মৃত্যুতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি বলিলেন, "তোমরা কি জাননা যে ঈশ্বর অশ্রু মোচনের শাস্তি দেন না, কিংবা দুঃখ দীর্ণ-চিত্তের অনুচ্চ বিলাপে। সে আমাদের দলভুক্ত নহে যে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করে......এবং তাহার গলবন্ধ ছিন্ন করে এবং অজ্ঞান দিবসের ন্যায় শোক প্রকাশ করে।

(৫৫)

মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিও না। তোমাদের কেহ, না-সুকাজকারী—। সম্ভবত সে তাহার সুকার্য্যাবলী বৃদ্ধি করিতে পারিবে দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সঙ্গে; সে পাপকারী কেন না সম্ভবত সে অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করিতে পারে। সময় আসিবার পূর্ব্বে মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা কিংবা প্রার্থনা করিও না, কেন না নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হইলে, আশার শেষ হয় এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা আসে এবং নিশ্চয়ই মোমিনের জীবন তাহার সুকার্য্যাবলী বৃদ্ধি করে।

(ক্রমশঃ)

জঙ্গলু

শ্রীরণজিৎ গুপ্ত

চা বাগানের কুলী বস্তি। ছোট্ট ছোট্ট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাঁশের ঘর। আলো বাতাস এদের ভেতর প্রবেশ করতে ও'ঠে হাঁপিয়ে। এমনি করে তৈরী এদের কাঠামো জোর বাতাস বইলেই মড়মড় করে উঠে এরা গৃহবাসীকে ক'রে তোলে ত্রস্ত ভীত। বর্ষার বৃষ্টিকে বাধা দিতে এদের ছাউনী নয় সবল। তাই অল্প বৃষ্টিতেই ঘরের মেঝে ভরে উঠে জলে। এমনি ঘরের সামনে স্তূপীকৃত আবর্জনা। বর্ষার জলে পচে সৃষ্টি করে বীভৎস গন্ধ। বাগানের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে না এদিকে।

এমনি একটী বাড়ীতে থাকে জঙ্গলু আর তার ছোট পরিবার। জঙ্গলুর ঘর বাড়ী দেশ কোথায় কেউ তা জানে না—হয়তো সে নিজেও তার অনেকখানি গেছে ভুলে। মা বাপকে ছেড়ে কোন অসংযত মুহূর্ত্তে সে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর বাড়ী ছেড়ে। পথে দেখা হ'ল তার সঙ্গে এক কুলী সর্দ্দারের।—অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে এল তাকে এই দেশে। তার পর থেকে এটাই হল তার ঘর, তার সব। ক্রমে ক্রমে সে বিয়ে করলো বামীকে, তারপর আজ, আজ তার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে এক শিশু। এই নিয়ে হ'ল তার সংসার।

সে দিন শ্রাবণের শেষ। ভাদ্রের প্রারম্ভ। বর্ষা মন্থর গতিতে চলেছেই—সেদিন বর্ষণের মাত্রা বেশী না হ'লেও টিপ টিপ করে বেশ হ'চ্ছিল। রাত্রিতে বৃষ্টির জন্য 'জঙ্গলুর' ঘুম হয়নি।—তার উপর খাটুনির পরিমাণ ও ছিল বেশী। তাই হয়তো শেষ রাত্রের দিকে তার জ্বর এসেছিল।

ভোর হ'তে না হ'তেই সর্দ্দার কাজে বেরোবার জন্য হাঁক দিয়ে গেল। জঙ্গলু শুয়ে শুয়েই বল্লো বামীকে—"বামী তুই সর্দ্দারকে ব'লে দে আজ আমার জ্বর হয়েছে কাজে যেতে পারবোনা।" হঠাৎ কথাটা শুনে বামী যেন একটু চমকে উঠল—ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বল্লে—তোমার কী খুব শরীর খারাপ—

"না বামী খুব অসুখ করেনি, বৃষ্টিতে ভিজলে আরো বাড়বে।" পাশ ফিরে বল্লে জঙ্গলু। ক্ষণিক চুপ করে আবার বল্লে, "এ সপ্তায় তো ঘরে কিছু নেই—কাজে না গেলে যে খেতে মুস্কিল হ'বে।" কথা কয়টি শুনল জঙ্গলু কিন্তু কিছু বল্লে না, দুঃখ বেদনা চিন্তা সব মিলিয়ে একটা করুণ ছায়া ফেল্লে জঙ্গলুর মুখে—সে চুপ ক'রে রইল।

সকলেই কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু জঙ্গলুকে না দেখতে পেয়ে সর্দ্দার তো অগ্নি শিখা; হন্তদন্ত ক'রে ছুটে এসে হাজির হ'ল জঙ্গলুর বাড়ীতে। চেঁচিয়ে ডাকতে জঙ্গলুকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বামী,—বল্লে ওর জ্বর হ'য়েছে। কথা শুনে সর্দ্দার উঠল দ্বিগুণ রেগে

'ও সব' আমি বুঝি না—আজকে পুরুষ দরকার; অনেক কাজ জঙ্গলুকে যেতেই হ'বে, কোদালী করতে।

সর্দ্দারের মেজাজ দেখে ক্লান্তি ও অবসাদ জড়ানো দেহ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জঙ্গলু—বল্লে, সর্দ্দার আজ মাপ করো, শরীর বড় খারাপ।

—না সে হবে না, আজ ২নং টীলাতে কোদালী দেওয়া না করতে পারলে, বড় সাহেব আমার জরিমানা করবে।

—সর্দ্দার আজকে রেহাই দাও, সপ্তার শেষ তোমাকে মদের পেয়ালা দেব।

একটু প্রসন্ন হয়ে বল্লে,—আচ্ছা বেশ—আজকে তাহ'লে ছুটি পেলি, আমি 'সিক্‌ম্যান' রিপোর্ট ক'রে তোর রোজ আদায় ক'রে দেব।—কিন্তু দেখিস রবিবার যেন পার্টীর ব্যাপার নিয়ে গোলমাল করিস না; সব যেন ঠিক থাকে।

সর্দ্দার বিদায় নিলে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাওয়ায় এসে বসলো জঙ্গলু। সপ্তাহের শেষে তার পুঁজি মাত্র দেড় টাকা। শরীরের রক্ত জল করে এই দেড় টাকা, যে পেট

আবার ছয় আনা দিতে হবে সর্দ্দারকে তার অসুখ হওয়ার দণ্ড স্বরূপ। বাকী পয়সা দিয়ে সপ্তাহের খোরাক জোগাতে হবে তিনটী প্রাণীর। তারপর সেদিন বামী বলেছিল তাকে কয়েক জোড়া কাঁচের চুড়ি এনে দিতে। বামীও তো মানুষ—ওরও তো সাধ হয়। আর সে স্বামী, স্ত্রীর সাধটুকু মেটাবার ক্ষমতা তার নেই। সমস্ত মিলিয়ে কেমন যেন এক বিদ্রোহের আলোড়ন তোলে জঙ্গলুর হৃদয়ে।—তাদের নিয়ে কেন এই ছিনিমিনি খেলা বিশ্বের তারা কি কেউ নয়।—সংগ্রাম করতে হবে, সব চুপ করে সহ্য করে দিন দিন যেন জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছি—এমনি একটা বিপ্লবের অনুরণন ধ্বনিত হচ্ছিল ওর ধমনীতে।

মাস ছয়েক পরের কথা। কংগ্রেসী মন্ত্রীর দল আসামে চা বাগানে ঘুরে ঘুরে কুলী মজুরদের ভেতর বাগানের রক্ত শোষক কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক সজোর আন্দোলন সৃষ্টি করে তুলেছে। তারই প্রথম ফল পরিলক্ষিত হলো ধর্ম্মঘটে।

আজ ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় সপ্তাহ—

জঙ্গলু এই ধর্মঘটীদের মধ্যে একজন।

গম্ভীর চিন্তামগ্ন জঙ্গলু। বামী নিঃশব্দে তার কাছে এসো বস্‌লো। কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। বামী বল্লে—সাহেবকে গিয়ে ধরো এবার

জঙ্গলু আত্মস্থ হয়ে একটু নড়ে বসলো বল্লে,

—আমায় কিছু বলছিলে?

—হাঁ বল্‌ছিলাম, ধর্মঘট আমাদের সাজে না। সুখতো দূরে থাক, দুঃখ দিন দিন আমাদের চরমে উঠছে। আগে দু'বেলা দুমুঠো খাবার মিল্‌তো, কই এখন তাও জুটছে না। যদি সাহেবকে বুঝিয়ে ব'লো—তুমি তো সত্যি এ'দের মধ্যে যাওনি—দশজনের কথাতে গিয়েছে।

—নাঃ বামী, তুই জানিস্‌নে—আমরা মৃত্যুপন ক'রে সংগ্রামে নেমেছি—যদ্দিন না আমাদের নেওয়া হয় তদ্দিন।

বামী একটু উষ্ণ হয়ে উঠল—বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, বুদ্ধিকে বাহার দেই। তদ্দিন হাওয়া খেয়ে থাকতে হ'বে?

—ঠিক তাই, বামী—প্রয়োজন হ'লে তাই করতে হবে, শিক্ষিত বাবুরা এই ব'লেন।

বামী এবার সত্যি চটে উঠল—ব'ল্‌লে, তা বল্‌বেনই তো বাবুরা, তাদের দু'বেলা খাবার চিন্তা করতে হয় না কি না।

—ছিঃ বামী, তুই ও'দের দোষ দিস্‌নে,—দোষ আমাদের। এতকাল যে পাপ আমরা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হ'বে। এই তার সূচনা। মুখ বাঁকিয়ে ব'লে উঠল বামী, বাঃ চমৎকার। জঙ্গলু বল্লে ঠাট্টা নয়, খুব সত্যি বামী। অজ্ঞতার শেষ ধাপে আমরা দাঁড়িয়ে, তারা ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বাধা দেইনি। অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছে, শক্ত হয়ে দাঁড়াইনি। যা দাবী ক'রেছে দিয়েছি। দাবী করিনি কখনও। এমনি ক'রে পরাজয় স্বীকার করে এসেছি আমরা; আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইনি কোনদিন। ক্লীবত্বকে এমনি ক'রে বরণ ক'রে নেওয়া পাপ নয় কী? শতাব্দির পুঞ্জীভূত অপরাধ কী একদিনে ধুয়ে মুছে যাবার। বামী বলে, এ সব তোমাদের ঐ স্বদেশী বাবুরা বলেছেন তো? তাই কি? তাই, আজ সারাদিনে এক মুঠো ভাতও মুখে উঠেনি।

সে দিন বাড়ী ফিরতে জঙ্গলুর বেশ একটু দেরী হ'ল, সারা দিন ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ঘরে ঢুক্‌তেই বামী কেঁদে উঠে বল্‌লে—ওগো, যে ক'রেই হোক ছেলেটাকে বাঁচাও, বাছা যে আমার কেমন কর্‌ছে।

ছেলের জ্বর শুনেছিল, কিন্তু কান দেয়নি, আস্তে আস্তে সে ছেলের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল। মনে মনে সে যথেষ্ট অনুতপ্ত হ'ল, তার এই উদাসীনতার জন্য। ছেলেটী ধুকছে,—জীবনপ্রদীপের যে টুকু তেল অবশিষ্ট ছিল, তাও হয়'তো শেষ হয়ে যাবে শেষরাত্রির দিকে। বামী দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে জঙ্গলু—মাতৃত্বের এই চরম আকুতি—আর ভাব্‌ছে—ছেলে তো বামীর একার নয়, ওতে তারও অংশ আছে। আজ ঔষধ তো দূরের কথা—একটু জল ছেলের মুখে দেবার ক্ষমতা নেই জঙ্গলুর। তার মনে ভেসে উঠ্‌ল সেই দিনের কথা, যখন যৌবনের প্রারম্ভে সে বামীকে

তার ভাবী মাতৃত্বের অপারদর্শিতা সম্বন্ধে ঠাট্টা ক'রে কত কথাই বলেছিলো। তার উত্তরে বামী বলেছিল—"যাও, তুমি বড় দুষ্টু", আজ সেই বামীই তার মাতৃত্বের কর্ত্তব্য তিল তিল ক'রে পালন করছে, আর পাশে দাঁড়িয়ে পিতা নির্ব্বাক হয়ে স্বপ্নের ছন্দ গননা করছে।

অদৃষ্টের কী নির্ম্মম পরিহাস। জঙ্গলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ছেলের ম্লান পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়, তার ঠোঁটের কোলে এক টুক্‌রো হাসি—সহজ সরল নয় যেন ?

পিতার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রেশ:র মধ্যে জঙ্গলুর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে।

বামী এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। এবার আবেগে কেঁদে ফেল্ল—বল্লে—যাও সাহেবের কাছে, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

জঙ্গলু সব কথা হয়তো শুন্‌লো না। বেরিয়ে পড়লে, ব'লে, ভয় নেই বামী,—আমি বাঁচাব ওকে, উন্মত্তের মত সে ছুটে গেল বাইরের দিকে।

ঘণ্টা খানেক পরে জঙ্গলু ফিরে এল। সর্ব্বাঙ্গে তার অসহ্য জ্বালা। অন্তরে গ্লানি—অপমান, তিক্তজ্বালা। সাহেব তা'কে সম্মানিত করেছে—সবুট লাথি মেরে। বামী ভীত হ'য়ে জিজ্ঞেস করল—কী হ'ল, জঙ্গলু তার উত্তর দিল না, আপন মনেই বল্‌তে লাগল—না, ওর মরাই উচিত। কী হ'বে বেঁচে থেকে। এমনি পদাঘাত, দারিদ্র্যের এমনি জ্বালা তো ওকেও একদিন সহ্য করতে হ'বে ? কিম্বা পারবে ও হয়তো পারবে—পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে হয়তো একটু ঠাঁই পাবে—কিন্তু এ'তে প্রয়োজন—মরুক, শান্তি পাবে।

বামী কিছু বুঝতে পারে না, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

চতুর্থ প্রহরে বনে ডেকে উঠে পাখী—শুকতারা ম্লান হাসি হেসে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার গোড়া পত্তন

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

(শেষাংশ)

এই শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে ১৮৫৫ খৃঃ Calcutta Review এ National Female Education শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এ সম্বন্ধে মিসেস্ উইলসন ও রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য পরম শিক্ষাপ্রদ।

বেথুন স্কুলের স্থাপনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস Mr. Arthur Howell তাঁর Education in British India গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা যেমন বিস্তারিত তেমনই বহু নূতন তথ্য সম্বলিত। তিনি লিখিয়াছেন—"১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার কিছুই করিয়াছেন বলিয়া তিনি কোন সংবাদ দেখিতে পান নাই। ১৮২১ খৃঃ পূর্ব্বেই একটি বদান্যকারী সমিতি দেশীয় স্ত্রীলোক-দিগকে শিক্ষা দিবার উদ্যোগ করেন। তখন British & Foreign School Society মিস্ কুক্ (পরে মিসেস্ উইলসন) নাম্নী মহিলাকে কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য সহরে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৬ সালে ৬০০ ছাত্রী সহ ত্রিশটী বালিকা বিদ্যালয় তিনি পরিচালনা করিতেন। ১৮২৮ সালে Ladies Society for National Female Education-এর তত্ত্বাবধানে এই সকল স্কুল কেন্দ্রীভূত করা হয়। সেই প্রকার কয়েকটি স্কুল the London & the Church Missionary Society দ্বারাও পরিচালিত হইত

তদাবধি সরকার স্ত্রীশিক্ষার জন্য কিছুই করেন নাই। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে উত্তরপাড়ার ধনী জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও সরকার পান। কিন্তু এবারও সরকার তাহা বিনা বিবেচনায় প্রত্যাখান করেন। কারণ That there was a strong Prejudice against the education of women, not founded on any direct Precept of Hindu faith, but rather on immemorial custom and tradition, seems certain, and with this prejudice the Govt. was probably very unwilling to interfere. It is true that in old Sanscrit plays there is evidence that women of rank, at least, was taught to read and write and the accomplishments of drawing and music, and that in the high Rajput family of C. India the women took a share in affairs of state. The Eastern ideal of female life was one of strict purity, seclusion and quite domestic duty, and the literature of the classical languages of India was far too corrupt to allow of any teaching in it compatible with such an ideal." লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক যেমন হিন্দু ছাত্র দ্বারা মেডিক্যাল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই লর্ড ডালহৌসী স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের দ্বারা যুগান্তর আনয়ন করেন। মহামতি বেথুন সাহেবের প্ররোচনায় ও যত্নে গভর্ণর জেনারেল দেশীয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন বলিয়া সরকারি ঘোষণা করেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব একটি স্কুল স্থাপনা করেন, সেইটি পরে বেথুন স্কুল ও কলেজ নামে খ্যাত হয়।

যদিও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের হুকুম লর্ড ডালহাউসী প্রদান করেন তথাপি তিনি দেশের ও সমাজের অবরোধ প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত করিবার নির্দ্দেশ দেন। যে কোন ভদ্রমহোদয় স্ত্রী-শিক্ষা প্রদানের উদার উদ্যোগ করিবেন তাহাকে সাহায্যকরা হইবে ঘোষণা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাউনসিলও তখন তাঁহার এই মত সমর্থন করেন।

বারাসতের স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা এক সমিতি গঠিত হইয়া একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই বিদ্যালয়কে সরকার অর্থ সাহায্য করেন সেইটিই "The first female School recognised by the Government was that of Barasat." (A. H. E. B. I.)

১৮৪৯ সালের আগষ্ট মাসে হাওড়া জিলার উত্তরপাড়ার জয় কৃষ্ণ ও রাজ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কাউনসিলকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা একটি পরিকল্পনা ও প্রদান করেন। তাহাতে মাসিক ১২০৲; ব্যয় হইবে লিখিয়াছিলেন। (প্রবীন পণ্ডিতের মাহিনা ১৫৲ ঝি ৪৲ দরওয়ান ৪৲ পুস্তকাদি ৭৲ পশম সুতা প্রভৃতি ১০৲ ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় নিজেরা বহন করিয়া অপর অর্দ্ধেকের ব্যয় বহনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে প্রস্তাবও সরকার প্রত্যাখান করেন।

১৮৫০ খৃঃ ২৯শে মার্চ, লর্ড ডালহাউসীকে বেথুন সাহেব একখানি বিস্তারিত পত্র লিখিয়া দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। এবং ১৮৪৯ সালের মে মাসে তিনি যে স্কুল স্থাপন করেন তাহাও জ্ঞাপন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন মিশনারীদের অবিশ্বাস করিয়াই বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহাদের কন্যাদের বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না। সেইজন্য মিশনারীদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

"আমার স্কুল খোলাতে কলিকাতায় বেশ একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল, ১১জন ছাত্রী লইয়া স্কুল আরম্ভ হয়। কলিকাতায় বহু সম্ভ্রান্ত লোক ইহার বিরুদ্ধতা করেন, তাহার প্রধান কারণ 'As I believe on the ground of mortified vanity because they had not been consulted in the matter, তথাপি আমি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহযোগীতা পাইতেছি।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী রাম গোপাল ঘোষ আমার প্রধান পরামর্শদাতা এবং তিনিই প্রথম ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া দেন,

রাজা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্কুলের জন্য পাঁচ বিঘা জমি (২০০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের) প্রদান করেন এবং পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার নিজ দুইটি কন্যাকে (কুন্দমালা ও ভুবন মোহিনী) আমার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তাহা ছাড়া তিনি অবৈতনিক ভাবে বাঙ্গলায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা দিবরে জন্য পুস্তক লিখিতেও সম্মত হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বৃত্তি দিবার জন্য অনেকে বলিতেছেন, কিন্তু আমি এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে চাহি না। কারণ আমার উদ্দেশ্য আধুনিক শিক্ষা উচ্চবংশীয় ঘরের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের বাটীর মেয়েদের আকৃষ্ট করা। সে উদ্দেশ্য বৃত্তি প্রদানের দ্বারা হইবে না। আমি একখানি গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা ১২টী বালিকাকে এক সঙ্গে স্কুলে আনয়ন করিতে পারে। বিনা খরচায় সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাকে যাহারা ইচ্ছা করেন পাঠাইতে পারেন। এবং যাহাদের অপরিষ্কার বেশভূষা থাকে তাহাদের মাঝে মাঝে সুশ্রী পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা ইচ্ছা করেন কন্যাদের গাড়ী ভাড়ার জন্য অর্থ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করতে পারেন। নানা বাধা স্বত্ত্বেও আমরা স্কুলটী চালাইতে সক্ষম হইতেছি। লেডী ডালহোসী প্রথম যে দিন স্কুল পরিদর্শন করিতে যান তখন ত্রিশটীর মধ্যে ২৫টী বালিকা উপস্থিত ছিল।”

তিনি এইরূপে স্কুলের উপকারিতা গভর্ণার জেনারেলকে জ্ঞাত করান এবং বলেন যে “আমি যতদিন ভারতবর্ষে থাকিব ততদিন ইহার যাবতীয় খরচ স্বয়ং বহন করিব কিন্তু আমার অনুপস্থিতে গভর্ণমেন্ট যদি ইহার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে একটী মস্ত সৎকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন—If I could obtain your Lordship's influence with the Honorable Court of Directors in inducing them to address Her Majesty for leave to call the School by Her name and to consider it as placed especially under Her patronage. It will not be one of the least remarkable triumps in India which will have redounded to the honour of Her Majesty's reign, that in the time of a female Sovereign a beginning should be made towards emancipating so many of Her female subjects from the degradation and misery which are now their lot.”

১৮৫০ খৃঃ ১লা এপ্রিল তারিখের কাউন্সেলের মি... পুস্তকে ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া লর্ড ডালহৌসি মত লিপিবদ্ধ করেন। কাউন্সেলের অন্যতম সভ্য J. H. Littler তাঁর অনুকুল মত ১৮৫০, ২রা এপ্রিল লিপি... করেন। তিনি বেথুন সাহেবের উদ্যমকে যথোচিত প্রশং... করিয়াও লিখিয়াছিলেন—The scheme of Female Education is doubtless unpopular, and looked upon by the mass, with fear and dread, whether Hindus or Mahomedans. Will it not involve a direliction of the principle of neutrality to which the Government, (I have always understood is pledged in like cases ?

আজকালকার ভেদনীতির দিনে divide & rule মন্ত্রের মধ্যে এইরূপ ইংরাজ সরকারের নিরাপেক্ষ... কল্পনায় পরিণত হইয়াছে মাত্র। গল্পর মতন শুনাইতে...

কাউন্সেলের অন্যান্য সভ্য Sir F. Currie, ... Lowie লর্ড ডালহাউসীকে সমর্থন করেন। ... গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী F. J. Halliday সাহেব ১৮... সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের নোটে তিনি Chief Civil Officer of the Mofussil গণকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের সাহায্য ও ... পোষকতা করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করেন। ... নোটে বাঙ্গলায় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের যে ব্যবস্থা পূর্ব্বেও ... তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

It is the opinion of the Governor General in Council that no single change in the habits of the people is likely to lead to more important and beneficial conse...

quences than the introduction of education for their female children. The General practice is to allow them to grow up in absolute ignorance, but this custom is not required or even sanctioned by their religion, and in fact a certain degree of education is now given to the female relatives of those who can afford expenses of entertaining special instructors at their own houses.

লণ্ডন হইতে ১৮৫০ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর Court of Directors গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীকে এক ডেস্পাচ্ পাঠান, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের যে পরিকল্পনা লর্ড ডালহাউসী লিখিয়াছেন তাহার মূলনীতি অনুমোদন করেন। তবে খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কলিকাতায় বেথুন সাহেবের উদ্যমে যে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে তাহার খুব স্তুতিবাদ করিলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম সেই স্কুলের সহিত সংযুক্ত করিবার নির্দ্দেশ করিলেন না।

লর্ড ডালহাউসী Kyrasole, Dak Banglow হইতে ১৬ই এপ্রিল ১৮৫০ সালে একখানি গোপনীয় পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন—বেথুন সাহেব আজ এক বৎসর হইল যে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে—তাহার আদর্শে আরও ছয়টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

"I took it up on the part of the Govt. and all the council except Sir John Littler concurred in placing these schools under the Govt. like the boy's schools. I believe this is the beginning of a great revolution in Indian habits. The degradation of their women has been adheared to by Hindus and Muhammadans more tenaciously than any other customs, and the change will do more towards civilising the body of society than any thing else could effect."

তৎপরে বেথুন সাহেবের স্কুলটী সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। লর্ড ডালহাউসী এই বিষয় ১৮৩৪ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারীতে একটি Despatch পাঠান তাহা বাঙ্গলার স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

"We have the honour to acknowledge the receipt of your Hon'ble Courts Despatch No. 71, Dt. 9th Nov. last, conveying your assent to the proposal that was made by the Govt. that your Hon. Court should adopt the Native Female school founded in Calcutta by the late Mr. Bethune.

2. We have to convey to your Hon. Court our acknowledgements for your ready assent to our proposal. It affords us the utmost satisfaction to know that this Institution which we believe to be calculated to aid a great object, will by your liberality be upheld hereafter in full activity.

3. There is one point however suggested by your Hon. Court which strikes us as being of doubtful expediency, and that is the levy of a school fee from the pupils generally. Fees in such cases have not been found to work badly, but where the experiment of Female Education is concerned, we would not interpose the risk of even a small fee to the successful accomplishment of the design of the benevolent founder of the Institution.

4. The most Noble Governer General desire to add to the acknowledgements of this Govt. his personal and respectful thanks to your Hon. Court, but His Lordship begs permission to decline your liberality in wishing to releive him at

once from the charge of the Institution. His Lordship has signified his desire to maintain the School so long as he remains in India, and he begs that arrangment may be allowed to stand.

We have etc.
(Signed) Dalhousie
Fort william ,, J. Dorin
3. 2. 1854. ,, J. Low
,, F. J. Halliday.

এইরূপে বহু বাধা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া বাঙ্গলায় আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা চিরকাল এই সব মহানুভব শিক্ষানবীসদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে। বাঙ্গালীর মেয়েরা এই রূপে শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইয়াই সমগ্র ভারতে আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার পত্তন করিয়াছে। গোড়া হইতে স্ত্রীশিক্ষার ভার বিদেশীয়দের হাতে থাকাতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ উপযোগী হইতে পারে নাই। তাহা আমাদেরই দোষ। যদি স্ত্রীশিক্ষার ভার আমরা সুরু হইতে নিজ হস্তে বহন করিতাম তাহা হইলে ভিন্ন সমাজের বিলাসপ্রিয়, সংসারের দায়িত্ব জ্ঞান-হীনা দিদিমণিদের হস্তে আমাদের সোনার পুতুলিগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার দিতাম না। আজ শত বর্ষ পরেও আমাদের মা-বোনরা তাহাদের সন্ততিদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালায় নারীদের শিক্ষা প্রদানের রীতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের যেমন আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তেমনি নূতন ধারায় শিক্ষা দীক্ষা দিবার অনাড়ম্বরী, পূতচরিত্র, সংযমী, বিলাস-বিমুখী, স্নেহশীলা শিক্ষয়িত্রীরও দরকার।

সে যুগের স্ত্রীশিক্ষা হিন্দু প্রচেষ্টা ও খৃষ্টীয়ান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাগল ভারতবর্ষে ১৩৪২ আষাঢ়, ভাদ্র ও ১৩৪৩ আষাঢ়ে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে কেবল Mr. Richey কর্ত্তৃক সংগৃহীত Selections from Educational Records 1840-59—Published in 1922 অবলম্বনে বর্ত্তমান যুগের স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার পত্তন বিষয় কতগুলি সরকারী চিঠিপত্র ও বিবরণ অনুবাদ করিয়া লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তাহা যেমন নানা তথ্যপূর্ণ সেই প্রকারই সত্য ঘটনা সম্বলিত। তাঁহার প্রবাসীতে ১৩৪৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারই "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" পুস্তিকারই লেখক। গত সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে ইহার প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা ব্রজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধাদি পাঠে দূরীভূত হইয়া যায়।

অধিকন্তু এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য হইলেও—শনিরঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্গত করিয়া "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটী পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ও তাহার ভূমিকা পাঠ করিলেই পুস্তিকাটীর বিষয় যাবতীয় সংবাদ বিশদ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার গোড়া পত্তন বিদেশীয় ও বিধর্ম্মীদের দ্বারা প্রচলিত হওয়াতে আমাদের অনেক অসুবিধা হইয়াছে। তথাপি আমরা যে মহীয়সি মহিলা ও ভদ্র মহোদয় আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব। সেই মিস্ কুক্, মিস্ ওয়ার্ড, রেভাঃ উইলসন, Rev Pearce, David Hare, Drinkwater Bethune, Lord Dalhousie প্রভৃতি বিদেশীয় ও রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জয়কৃষ্ণ ও রাজ কৃষ্ণ মুখার্জ্জি প্রভৃতির স্মৃতি চিরকাল হৃদয় পোষণ করিয়া আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার পত্তনের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যাপতি *

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের কবি। সুদীর্ঘ পাঁচ শতাধিক কাল বাঙ্গালী নরনারী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গানে মাতোয়ারা। চৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্ত-শিষ্য বেষ্টিত হইয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান শ্রবণ করিতেন (১) এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উদ্দেশে কবিতা লিখিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি কীর্ত্তন-গায়ক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নামে আখর দিয়া কীর্ত্তন জমাইয়া তোলেন। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত এমন বাঙ্গালী নাই যে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের নাম জানেন না, অথবা ইঁহাদের পদ-সঙ্গীত শুনেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে লইয়া বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যেমন অশোভন তেমনই গভীর নৈরাশ্যজনক।

আধুনিক সময় হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের সিংহাসনে আদি যুগের কবি হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' (চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ) স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "বিদ্যাপতি" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন "বিদ্যাপতি মৈথিল কবি।" বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের অধিকাংশই রাজকৃষ্ণ বাবুর মতানুযায়ী বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাংলা সাহিত্যের সিংহাসনে বিদ্যাপতির সুপ্রতিষ্ঠিত আসন শিথিল হইতে লাগিল।

৬।৭ বৎসর পরে ১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব এসিয়েটিক সোসাইটী হইতে মৈথিল ভাষার ব্যকরণ, রচনা সংগ্রহ ও শব্দার্থ প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত ৮২টী পদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টী অপরাপর প্রসঙ্গে। এই পদগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে গ্রীয়ার্সন সাহেব কয়েক বৎসর রীতিমত আলোচনা করেন; কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'Indian Antiquary' পত্রিকায় লেখেন—

"While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidyapati, it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is very doubtful origin."

বাংলা ও মিথিলায় বিদ্যাপতির যে সব পদ আছে, তাহাদের ভাষায় অসাদৃশ্য দেখিয়া গ্রীয়ার্সন সাহেব মনে করেন এগুলি এক বিদ্যাপদি কর্ত্তৃক রচিত নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী" ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিয়া প্রমাণ করিলেন। মৈথিল পণ্ডিতেরাও আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারাও মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করিলেন। নগেন্দ্র বাবুর পদগুলিকেই তাঁহারা অবলম্বন করিলেন। আধুনিক কালে হিন্দি সাহিত্যের কোন কোনও পণ্ডিত বিদ্যাপতীকে হিন্দী কবি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। (২) এইরূপে বাংলা সাহিত্যের সিংহাসনে বিদ্যাপতির স্থান আরও শিথিলতর হইতে লাগিল।

বিদ্যাপতি সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "সহজিয়া সাহিত্যে" (৩) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন বসু বলিয়াছেন "২৪, ৮০, ৮৫ প্রভৃতি সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। ঐ পদগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, সেগুলি মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত নহে। হয়

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য সমিতিতে পঠিত।

বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি আখ্যাধারী কোনি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন নতুবা ঐ সকল পদ বিদ্যাপতির নামে সহজিয়াদের দ্বারা রচিত হইয়াছে।" বিদ্যাপতি সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় বাংলায় "ছোট বিদ্যাপতি"র আবিষ্কার করিলেন! (৪) "রসকল্পবল্লী" ও 'সংখ্যা নির্ণয়' নামক গ্রন্থদ্বয়ে কবি রাম গোপাল দাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীখণ্ডের বাবু নন্দন ঠাকুরের একজন শিষ্যের নাম ছিল কবিরঞ্জন (?)। ইঁহাকে লোকে "ছোট বিদ্যাপতি" বলিয়া অভিহিত করিত। ঐ কবিরঞ্জন বোধহয় বিদ্যাপতির অনুকরণে গান বাঁধিয়া পল্লবাসীদের নিকট শুনাইতেন। এইজন্য পল্লীবাসীরা তাঁহাকে "ছোট বিদ্যাপতি" নামে ডাকিত। এই "ছোট বিদ্যাপতির" কবি প্রতিভা সম্বন্ধে অদ্যাপি আমরা কোনও প্রমাণ পাই নাই। "রসকল্পবল্লীতে" বিদ্যাপতি ভণিতায় যে সব পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলি এই "ছোট বিদ্যাপতি" কর্ত্তৃক রচিত, এরূপ মনে করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই কবিরঞ্জন "ছোট বিদ্যাপতি"কে যদি বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "কবিরঞ্জন" ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি আছে সেগুলিও "ছোট বিদ্যাপতি" রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু "কবিরঞ্জন" ভণিতাযুক্ত পদগুলি স্বয়ং বিদ্যাপতির রচনা, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। (৫) সুতরাং "ছোট বিদ্যাপতির" আবিষ্কারে বিদ্যাপতি সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইল না।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি—বাংলা দেশে তাঁহার পদ আমদানী হইল কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী ছাত্রেরা মিথিলায় ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন সমাপনান্তে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে মৈথিল বিদ্যাপতির পদ-সঙ্গীত বাংলায় লইয়া আসিছে! কতিপয় ছাত্র বিদ্যাপতির পদ লইয়া আসিল—বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কোনও রূপে যাচাই না করিয়া ঐগুলি একেবারে লুফিয়া লইয়াছেন? বিদ্যাপতির ভণিতায় বাংলাদেশে মৈথিল, ব্রজবুলী, বাংলা ভাষায় পদ রচিত হইল কিরূপে? "মৈথিল বিদ্যাপতির নামে মিথিলায় যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাংলাদেশে সেগুলি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত;" বাঙ্গালী ছাত্রেরা একটা জন প্রবাদও আনিতে পারে নাই? বাঙ্গালী ছাত্রেরা বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতগুলি লইয়া আসিতে ত্রুটী করে নাই—তাহারা বিদ্যাপতির 'শৈবস্ব [illegible] হার,' বা 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'র একটি শিবসঙ্গীত আনিতে কি কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে? মিথিলার পদে [illegible] মিথিলায় প্রচলিত পুস্তকে বিদ্যাপতি কথনও 'বিজ্জা[illegible] রূপে উল্লিখিত দেখা যায়, কিন্তু বাংলায় এই রীতি [illegible] অপরিজ্ঞাত। ছাত্রেরা কি 'বিজ্জাবই' শব্দটাও আনিতে পারে নাই? রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন—"বাংলা দেশের অনেক স্থলে অনুসন্ধান করিয়াও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা পা[illegible] নাই। কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি[illegible] বাঙ্গালী ছাত্রেরা বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাবতীয় [illegible] যাবতীয় শিববিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি সংক্রান্ত [illegible] বিষয় বাদ দিয়া শুধু বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক [illegible] লইয়া আসিয়াছে! ধার করা মৈথিল বিদ্যাপতিকে [illegible] বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মাতিয়া উঠিলেন, তাঁহারা বিদ্যা[illegible] সম্বন্ধে জানিবার কোন অবসরই পাইলেন না? চৈ[illegible] চরিতামৃতে কোথাও উল্লিখিত আছে, চৈতন্যদে[illegible] বিদ্যাপতির পদ শুনিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু চৈ[illegible] চরিতামৃতে কোথাও উল্লিখিত নাই যে, বিদ্যাপতি মৈ[illegible] কবি। বৈষ্ণবদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ক[illegible] বিদ্যাপতির উদ্দেশে পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা[illegible] বিদ্যাপতি মৈথিল একথা বলেন নাই। চৈতন্য চ[illegible] মৃতকার, বৈষ্ণবদাস, গোবিন্দ দাসের বিদ্যাপতি[illegible] এত টুকু কৃতজ্ঞতা ছিল না, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যা[illegible] স্বদেশ মিথিলার কথা উল্লেখ করিতে পারেন[illegible] বাংলায় বিদ্যাপতির পদপ্রচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করিলে, এসব প্রশ্নের কোনও [illegible] সমাধান মিলে না।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে এই সব বাক্ বিতণ্ডা [illegible] ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "[illegible] বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন সমাধানের সময় হই[illegible] আমরা এ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিতে পারি না।"

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, পণ্ডিতগণ বিদ্যা[illegible]

চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধান করিতে চান প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে—রসানুভূতির দিক দিয়া তাঁহারা বিচার করিতে চান না। প্রত্নতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আমাদের কোনও আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু রসানুভূতির কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে কোনও 'পাথুরে প্রমাণ' না থাকিলেও তাঁহারা যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানব হৃদয় সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। পাথুরে প্রমাণের অভাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বিব্রত করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু মনোজগতের সিংহাসন হইতে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসকে এতটুকু সরাইবার উপায় নাই। এদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদিগকে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

মিথিলায় আমরা যে বিদ্যাপতির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে তিনি শৈব ছিলেন। মৈথিল বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম বিরেশ্বর প্রভৃতি এবং তাঁহার প্রণীত 'শৈবসর্ব্বস্বহার' 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' প্রভৃতি তাঁহার শৈবত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ, দেবী সিংহ, ভৈরব সিংহ প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ সকলেই শিবভক্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। এদেশে যেমন বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কবি বলিয়া জানি, তাঁহার স্বদেশে সেইরূপ শৈব কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি। মিথিলার সর্ব্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায় লোকমুখে। রাধাকৃষ্ণের গীত অল্প। বিদ্যাপতির পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শৈব ছিলেন।" তাঁহার রচিত শিব বিষয়ক সঙ্গীত হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শিবের উপাসনা করিতেন—

"আন চান গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভক্ত বছল প্রভু বান মহেশ্বর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥
বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
জুরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয় তুঅ পরসাদে॥"

[চন্দ্র ও অন্য দেবতাগণ, কমলাসন হরি সকলকে আমি পরিতগণ করিয়াছি। বান মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল এই জানিয়া তোমার সেবা করিয়াছি। বিদ্যাপতি কহে আমার মন পূর্ণ কর, যমের ত্রাস আমাকে ত্যাগ করুক আমার দুঃখ হরণ কর; তাহাতে তোমার সুখ, তোমার প্রসাদে সকল হয়।]

এ বিষয়ে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, মৈথিল বিদ্যাপতি যখন শিব, দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন, অথবা স্মৃতিশাস্ত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন। কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিতে মৈথিল শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অপরদিকে বাংলা দেশে বিদ্যাপতি একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়া সুপরিচিত। রাজকৃষ্ণ স্বয়ং বিদ্যাপতির বৈষ্ণবত্ব স্বীকার করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়াছেন "বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্য কাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতা কুসুমের বসন্ত সৌরভ বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রীতির উৎস বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে।" বাংলা দেশে বিদ্যাপতি শুধু একজন বৈষ্ণব কবি মাত্র নহেন, পদকর্ত্তা মাত্র নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন। এখন আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছি মিথিলায় বিদ্যাপতি একজন পরম শিবভক্ত বলিয়া সুপরিচিত এবং বাংলায় বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন নামে সুপরিচিত। একই বিদ্যাপতি কি শৈব ও বৈষ্ণব ছিলেন? একজন প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে এইরূপ বহু ধর্ম্মপ্রীতি সচরাচর দেখা যায় না। বাংলা দেশে বৈষ্ণবেরা বিদ্যা-

পতিকে আদর্শ ভক্তির আসরে বসাইয়াছেন। শৈব ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ থাকিলে, অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিকতার অভাব থাকিলে কখনও এইরূপ হইতে পারিত না। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা', রবীন্দ্রনাথের 'ভানু সিংহের পদাবলী' সত্ত্বেও মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিশেষতঃ প্রার্থনার পদগুলিতে, এমনই একটা ভক্তির প্রবাহ উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাপতিকে শৈব বলিয়া কল্পনা করিবার কোনও অবকাশ থাকে না। এইরূপ অবস্থায় আমরা দুইজন বিদ্যাপতির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শৈব বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণব বিদ্যাপতি দুইজন বিভিন্ন বিদ্যাপতি ছিলেন—(১) মৈথিল বিদ্যাপতি—পরম শিব ভক্ত; শৈবসর্ব্বস্বহার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতির রচয়িতা; এবং (২) বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদরচয়িতা।

এই সিদ্ধান্তের প্রথম বাধা হইতেছে, বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ মিথিলায় প্রচারিত হইল কিরূপে? ইহার উত্তর খুবই সহজ। বাংলা দেশ হইতে যে সব ছাত্র মিথিলায় ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে যাইত তাহারা অবকাশ সময়ে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ গাহিত। মিথিলাবাসীরা বাংলার ছাত্রগণের নিকট হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব পদ-সঙ্গীত শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ ছাত্রগণের নিকট হইতে 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ শিখিয়া লইয়াছিল। মিথিলাবাসীরা বাঙ্গালী ছাত্রগণের নিকট হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ যে ভাষায় ছিল, তাহা সংরক্ষণ করিতে পারে নাই—আপন মৈথিল ভাষার সহিত সাদৃশ্য রাখিতে গিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদে মৈথিল শব্দ ঢুকাইয়া অনেক পরিমানে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, মিথিলা ও বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদে, শিব সিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর কথা উল্লিখিত দেখা যায়—ইহা কিরূপে ঘটিয়াছে? বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদের লালিত্য ও মনোহারীত্ব লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ মৈথিল বিদ্যাপতির নামে চালাইবার উদ্দেশ্যে খুব সম্ভব মিথিলার পণ্ডিতেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বিস্ফির দানপত্র ও রাজপঞ্জীর সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতির পদসংগ্রাহক গ্রীয়ার্সন সাহেব স্বয়ং বিস্ফীর দানপত্রকে জাল প্রমাণ করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও গ্রীয়ার্সনের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "অল্প দিন গত হইল শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব ভূমি দানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন; তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হয়। (৭) বিস্ফীর দানপত্র ও রাজপঞ্জী অনুসারে বিদ্যাপতির বয়সাদি নির্ণয় করিতে গিয়া দীনেশ বাবু কোনও "বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত" না হইয়া এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ভূমিদান পত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠায় এইরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।" (৭) আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব মৈথিল পণ্ডিত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদগুলিকে মৈথিল বিদ্যাপতির নামে চালাইবার জন্যই মৈথিল বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ, লছমী দেবী প্রভৃতির কথা দিয়া মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন।

মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত যে সব পদে শিবসিংহ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি এইরূপ—

১

"অরুণ পুরব দিশি বহুল সগর নিশি
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেল কুমুদিনী তাইও কোহর ধ্বনি
মূদল মুখ অরবিন্দা॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুয় মান নহি মুঞ্চসি
পপনুব তুঅ ব্যবহারে॥
সব গুণ পরিহরি হরখি হরুধনি
মানক অবধি বিহানে।

রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভণে ॥

"ভণই বিদ্যাপতি শুন ব্রজ যৌবতী
ইথিক লক্ষ্মী সমানে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা সেই বিরমানে ॥" ইত্যাদি—

এই পদগুলি মৈথিল ভাষাতেই রচিত বলিলেই হয়; ইহাতে বাংলা ভাষার শব্দপ্রয়োগ খুবই কম।

বাংলা দেশে বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত যে কয়েকটি পদে শিবসিংহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সেগুলি এইরূপ—

১

"কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥"

২

"ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥"

৩

"রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক ॥"

৪

"বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ নারায়ণ সাখি ॥"

এই পদগুলি বাংলা ভাষায় রচিত। মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত যে সব পদে শিবসিংহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ভাষাগত বিচারে এগুলির সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্যই নাই, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালী সহজিয়ারা বাঙ্গালী বিদ্যাপতি সম্পর্কে লছমী প্রভৃতি উপকথাটি চালাইবার উদ্দেশ্যে খুব সম্ভব বাংলা দেশে এই জাতীয় পদ রচনা করিয়াছে। বর্ত্তমানে কোনও কোনও পণ্ডিত বিদ্যাপতির সম্বন্ধে লছমী এবং চণ্ডীদাস সম্পর্কে রামীর উপাখ্যানগুলি সহজিয়াদের রচিত বলিয়া মনে করেন। (৮)

তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে—বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কি কি উপাধি ছিল? নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন "মিথিলার পদাবলীতে বিদ্যাপতির উপাধি পাওয়া যায়—'কবিকণ্ঠহার', 'কবিশেখর', 'দশাবধান', 'অভিনব জয়দেব', 'পঞ্চানন'। বাংলাদেশে বিদ্যাপতির এইসব উপাধি প্রচলিত নাই। সুতরাঃ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির উপরোক্ত উপাধিগুলি ছিল না। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে "শেখর বা রায় শেখর" রচিত অনেক পদ স্থান পাইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু মনে করেন যে, সেই 'রায় শেখর' নামে একজন কবি শ্রীচৈতন্যের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'তে 'শেখর' ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলিতে চৈতন্যের প্রভাব ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। সেইগুলি ব্রজবুলির পদ হইলেও বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে না। (৯) কাজেই বিদ্যাপতির 'কবি শেখর' উপাধি ছিল মনে করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। বাঙ্গালী বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। (৫) 'পদকল্পতরুতে' 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ রহিয়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যে মিলন কথা পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে 'কবিরঞ্জন' বলা হইয়াছে। (১০)

চতুর্থ প্রশ্ন—বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন? অনেকেরই ধারণা যে বিদ্যাপতি ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি পদাবলী সম্পাদকগণ 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলী পদগুলি বিদ্যাপতির স্বয়ং রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।" ব্রজবুলী ভাষা বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষা। (১১) ব্রজবুলী ভাষায় রচিত পদগুলি বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদ। এই সব কারণে আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ব্রজবুলী ভাষার স্রষ্টা।

রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে বাঙলা প্লাবিত করিয়াছিল।" পদরচয়িতা

বিদ্যাপতি যদি মিথিলার লোক ছিলেন, মিথিলার জলবায়ু আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন, তবে তাঁহার হৃদয়টা বাঙ্গালীর মত হইল কিরূপে? যদি মিথিলাবাসী বিদ্যাপতি বঙ্গালী জয়দেবের কৃষ্ণরসে পরিপুষ্ট হইয়া শিবোপাসক শিবসিংহের রাজসভায় পদসাহিত্য রচনা করিলেন, তবে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদসঙ্গীতের ঢেউয়ে মিথিলা প্লাবিত না হইয়া সমগ্র বাংলা বিদ্যাপতির পদরসে ভাসিয়া গেল কিরূপে? নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তাঁহার (বিদ্যাপতির) পূর্ব্বে মিথিলার ভাষায় কেহ কাব্য রচনা করেন নাই। বিদ্যাপতির পর তাহার সমকক্ষ কবি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানে না। বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলী এ পর্য্যন্ত সে আকারে প্রকাশিত হয় নাই।" পদরচয়িতা বিদ্যাপতি রসমকক্ষ ত দূরের কথা, তাঁহার এক চতুর্থাংশ শক্তি লইয়া কোনও কবি কি মিথিলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন? বিদ্যাপতি কি মিথিলার সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন? আসলে পদরচয়িতা রসসাগর বিদ্যাপতি বাঙ্গালী—বৈষ্ণব মহাজন বাঙ্গালী বিদ্যাপতিকে মিথিলার সাহিত্যের সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা শুধু কষ্ট কল্পনা নয়, সম্পূর্ণ অশোভন।

চৈতন্যপূর্ব্ব বাঙ্গালী বিদ্যাপতির জন্মস্থান বা পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে আশাপ্রদ ফললাভ করা যাইতে পারে। *

(১) "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।)

(২) রামচন্দ্র মুকুল, রামশঙ্কর মুকুল, রসুল প্রভৃতি লিখিত 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

(৩) ভূমিকা ৮৵ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

(৪) 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ, 'ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৬।

(৫) "Editors of the collected Songs of Vidyapati, accept all the Brajabuli poems by Kaviranjan as works of Vidyapati himself," "A history of Brajabuli Literature'—Sukumar Sen, Calcutta University, p. 145.

(৬) 'A history of Brajabuli Literature' —Sukumar Sen.

(৭) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—ষষ্ঠ সংস্করণ।

(৮) "চণ্ডীদাস সম্বন্ধে রামী প্রভৃতিকে লইয়া রোমাঞ্চকর গল্প ইত্যাদি উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পরই সেই সকল গল্পকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীদাসের যে সকল রোচক গল্প প্রচলিত আছে, তাহা তালগোল ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতিতে "চণ্ডীদাস সমস্যা" বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, 'যুগান্তর,' ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪৫)

(৯) নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "কবিশেখর" যে বিদ্যাপতির উপাধি এদেশে সে বিশ্বাস ছিল না।"

(১০) "মিথিলায় প্রচলিত নাই যে বিদ্যাপতির উপাধি কবিরঞ্জন"—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(১১) "Brajabuti is really a dialect—only it is literary of Bengali, and in the sense that it had originated and developed in Bengal and had been cultivated exclusively by Bengali poets."

A history of Brajabuli Literature—
Sukumar Sen.

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রভূত সহায়তা ও উৎসাহ লাভ করায় এই প্রবন্ধ রচনা সম্ভবপর হইয়াছে।

—লেখক।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসার সমিতির অনুষ্ঠান পত্র

আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি

উদ্দেশ্য

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সমিতি স্থাপিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালী মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য্যে ও ব্যবহারে বাঙলা ভাষা ব্যবহার।

(খ) বাংলা দেশে প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যতদুর সম্ভব বাঙলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময়।

(গ) অবাঙালীগণের মধ্যে ও বঙ্গের বাহিরে যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং অবাঙালীদের যাহাতে বাঙলা ভাষা শিখিবার সুবিধা হয় তদ্ উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কেন্দ্র স্থাপন ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষা প্রচলন।

(ঘ) ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষায় যথা—দেবনাগরী, মহারাষ্ট্র, গুজরাতী, তামিল প্রভৃতির অক্ষরে বাঙলার বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা অনুশীলন করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করেন। এবং নিখিল ভারতীয় বঙ্গভাষার পরীক্ষা গ্রহণের ও পরিচালনের জন্য মণ্ডলী স্থাপন।

(চ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা পঠন ও পাঠনের জন্য ও প্রবাসী বাঙালীর সন্তানগণের মাতৃভাষা বাঙলার বাহিরে শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন।

(ছ) বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষার অনুবাদের ব্যবস্থা।

(জ) বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বঙ্গভাষাভাষী বিভিন্ন অধিবাসী যথা—মাহাতো, বাউরী, সাকারা, সাওতাল, মুণ্ডা, প্রভৃতি যাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে সুবিধা পায় এবং অন্য ভাষা শিখিবার আন্দোলনের কবল হইতে রক্ষা পায় তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন।

(ঝ) বঙ্গভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীর আন্দোলন।

নিয়ম

১। বঙ্গভাষা অনুরাগী ব্যক্তি বার্ষিক অন্যূন ১৲ একটাকা চাঁদা প্রদান করিলেই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। বাঙলা সন-ই বৎসর রূপে পরিগণিত হইবে।

২। যিনি এককালীন ৫০৲ টাকা প্রদান করিবেন তিনি আজীবন সভ্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। এককালীন ১০০৲ টাকা বা ততোধিক টাকা প্রদানকারী এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য হইবেন।

৪। সমিতির উদ্দেশ্য নিয়মাবলী ও নির্দ্দেশ পালন করিয়া বার্ষিক ২৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিলে বঙ্গের বাহিরে যে কোন স্থানে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইতে পারিবে।

৫। শাখা সমিতির আয়ব্যয় ও দায়ীত্ব সম্পূর্ণভাবে তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৬। সমগ্র ভারতে বঙ্গভাষার প্রসার ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অবাঙ্গালীদের প্রীতি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য! এই সমিতি ও ইহার শাখা সমিতিতে কোন প্রকার রাজনৈতিক বা প্রাদেশিক ভাষা-বিদ্বেষমূলক আন্দোলন ও কার্য্য নিষিদ্ধ।

৭। সমিতির সভাপতি সহকারী সভাপতিগণ সম্পাদকদ্বয় সহকারী সম্পাদকদ্বয় কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রয়োজন মত সাধারণ সভা পরিচালন সমিতি ও বিভিন্ন কার্য্যকরী শাখা সমিতি গঠন করিবেন। স্থায়ী অর্থ ভাণ্ডারের ক্যাস রক্ষক সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে গঠিত হইবে।

বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন।

সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস,। মিঃ ওয়াজেদ্ আলী, বার এট ল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম, এ, বি, এল।

সহঃ সম্পাদক—মৌলভী রেজাউল করীম, এম, এ বি, এল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুনীত কুমার মল্লিক।

পত্রাদি ব্যবহার এবং অন্যান্য তথ্য জানিবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিতে হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। — শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

নারী কর্মীর প্রয়োজনীয়তা

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

সচরাচর আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙ্গালীর সংসারে দেখা যায়—মেয়েদের জীবনে যাত্রাপথ গৃহের ক্ষুদ্র আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ। তাঁদের একান্ত উদাসীন মন,—স্বামী, পুত্র আত্মীয় স্বজন ব্যতীতও সংসারের বাইরেও যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে সে সম্বন্ধে নির্লিপ্ত; কোনওরূপে তাঁদের নিবিড় করে তোলেনা। এর মূলে আছে তাঁদের অজ্ঞতা আর তাঁদের অভিভাবকদের "মেয়েরা যে শুধু পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই কথাই প্রমাণ করবার একটা ব্যাকুলতা। তাই তাঁরা মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু কয়েকটি মেয়ে দেখা যার এ সম্বন্ধে খুবই উদ্যোগী অথচ তাকে কার্যকরী করে তোলবার কোনওরূপ সুবিধা ও সুযোগ পাননা। কিন্তু কালের ক্রম বিবর্তন ধারায় চলিষ্ণু যুগের এই বর্তমান আবহে গৃহের অন্ধকূপেই মেয়েদের স্থান সীহাবদ্ধ থাকলে চল্‌বেনা।—তাঁদের হতে হবে মুক্ত, নদীর স্রোতের মত স্বচ্ছ। জননী যেমন সন্তানকে একান্ত আপন বস্তুর মত করে গভীর স্নেহের সঙ্গে লালন পালন করেন সেইরূপ সংসারের প্রতি মেয়েদেরও একটা নিরন্তর চকিত দৃষ্টি রেখে দিয়ে মহীয়সী মাতৃমন নিয়ে, কল্যাণের প্রদীপ হাতে জ্বেলে রেখে পুরুষের পাশে থেকে সব কাজে তাঁদের সহায়তা করতে হবে। যে কোনও কাজই হোক্‌না কেন মেয়েদের দরদী সহযোগিতা ব্যতীত সৌষ্ঠবযুক্ত হয়ে সুসম্পন্ন হতে পারে না। কেননা নারী শক্তির আধার, আনন্দের প্রতিমা। বিশ্বের দরবারে নারীর স্থান শীর্ষে।

তাই বুঝি কবি বলেছেন—তাজমহলের দেখেছ পাথর
দেখেছ কী তার প্রাণ,
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরেতে শাজাহান।"

তা হতেই করিব এই বাণী হতে সম্যক উপলব্ধি করতে পারি আমরা, সব কাজেই মেয়েরাই পারে প্রাণ যুক্ত করতে, মূলে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিতে। তবে এর জন্য মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন এবং এই শিক্ষা মেয়েদের বিশেষ আগ্রহশীলা হতে হবে। মেয়েরা যে জাতির এক ভাগ এই কথা তাঁদের চিন্তা করে দেখতে হবে। তবে শিক্ষা অর্থে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকেই আয়ত্তাধীন করাই নয়—প্রকৃত জ্ঞান আহরণ, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন। এবং প্রত্যেক মানুষ তা সমস্ত জীবনব্যাপী অর্জ্জন ও সঞ্চয় করতে পারেন। তার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট লগ্ন বা ক্ষণ নেই। আমার মনে হয় পাঠাগার, নানারূপ সাময়িক সংবাদপত্রাদি এবং বেতার যন্ত্রই সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করবার একটী অন্যতম সহজ, সরল ও প্রকৃষ্টতম পথ। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারাই মেয়েদের অভিজ্ঞতার অন্ধকার কেটে যেতে পারবে। বিলীয়মান যুগের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে তাঁরা বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে চকিত হয়ে উঠতে পারবেন। অনেক মার্জ্জিত ও উন্নত হতে সমর্থ হবেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে, অর্থের প্রতিকূলতা যেখানে সব কাজের মূলে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে, সেখানে ঘরে ঘরে বেতার যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সব রকম সংবাদ পত্রের ব্যয় বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ আমাদের এই অত্যন্ত নিকটেই রয়েছে, আমাদের Railway **Institution**; সেখানে বেতারযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রয়েছে, নানারূপ সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি আসে, কিন্তু আমাদের মেয়েদের জীবনে তা কার্য্যকরী হয়ে উঠতে পারে না; অনায়াসে তাঁরা দুপুর বেলা অনর্থক নিদ্রার আলস্য সময় অতিবাহিত না করে, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দার মধুরতম আবর্তে ফেনায়িত হয়ে না উঠে কিছুক্ষণের জন্য রেডিও দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন; খুসীমত

সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করতে পারেন; উচ্চ স্তরের আলাপ আলোচনা তাঁদের মধ্যে চল্‌তে পারে। এর দ্বারা মনের স্ফুরণ হয়, জ্ঞানের বিকাশ হয়, রুচি উন্নত হতে পারে। মেয়েদের এই উন্নত করে তোলাই বাঙ্গালার মহীয়সী নারী সরোজনলিনীর একমাত্র লক্ষ্য ও প্রধানতম ব্রত ছিল। তাঁর অসমাপ্ত পূজানুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে, এবং সেই মহান্ আত্মার পূত স্মৃতিটীকে চির ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান করে রাখ্‌তে সাধক শ্রদ্ধেয় গুরু সদয় দত্ত কী বিরাট এবং একনিষ্ঠ ব্রতই না গ্রহণ করেছেন।

এবং সেই উদ্দেশ্যেই সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ থেকে আজকে শ্রদ্ধেয় ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, মিস্ নিরজবাসিনী সোম, দীপ্তি চ্যাট্যার্য্যি, হেমনলিনী মল্লিক, নানা অসুবিধা ও কষ্টের ভেতর দিয়ে আমাদের এখানে এসে মিলিত হয়েছেন

এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই মেয়েরা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় অনেক সুবিধে ও সুযোগ পেতে পারবেন। এর জন্য প্রত্যেক মহিলাকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে, সভ্য হতে হবে, এবং এই মহিলা সমিতির পক্ষ থেকেই Institue এ যোগদান করে সেখানকার সব রকম সুবিধা ও সুযোগ গুলি গ্রহণ করতে হবে, কার্যকরী ক্করে তুল্‌তে হবে। এর দ্বারা মেয়েরা এক সাথে মিলিত হয়ে ভাবের আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অর্জন করতে পারবেন।

এই সঙ্ঘবদ্ধতা ও একতা জাতির পরিপুষ্টি সাধনের অন্যতম প্রধান সোপান।

তবে এর জন্য দায়ীত্বশীলা মহিলা কর্মীর প্রয়োজন, যিনি প্রতিষ্ঠানের সব দায়ীত্ব সৌষ্ঠব যুক্ত পরিচালনায় সম্পাদন করতে পারবেন।

বিশৃঙ্খলা এসে যেন উদ্দেশ্যকে বিপর্য্যস্ত না করে, সেদিকে নিরন্তর চকিত দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই সব সঙ্কল্প সাফল্য যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে, সার্থক ও সমৃদ্ধ হবে। *

*সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠান 'লালমণিরহাট মহিলা সম্মিলনে' পঠিত।

ব্রহ্মখণ্ড

(শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সাহিত্যালঙ্কার)

আমি জীব, ব্রহ্মখণ্ড, আমারি ভিতরে
প্রেম, প্রজ্ঞা ও প্রতাপ চির-বিদ্যমান;
ত্রেধাত্মা—হ্লাদিনী শক্তি সন্ধিনী সম্বিৎ
ব্রহ্মে যাহা, জীবে তাহা আছে অংশ রূপে!
আমাতে অব্যক্ত যাহা, ব্রহ্মে ব্যক্ত তাহা
সকল প্রকট ব্রহ্মে, প্রচ্ছন্ন আমাতে;
আমি মাত্র বীজাবস্থ, ব্রহ্মেতে পূর্ণতা
ব্রহ্ম সিন্ধু, আমি বিন্দু—এইমাত্র ভেদ!
গড়া আমি হাতে যাঁর, শ্রী-ধী পেয়ে তাঁ'র
বুঝেছি ভাবীর ভাবে অহং এ সোহং;
চিন্তনা মননা ফলে শক্তি চেষ্টনার—
স্বপ্রকাশ চাই যদি, হয় সাধনায়!
অখণ্ডের খণ্ড আমি বুঝি যেই দিন,
সেইদিন হ'তে আর নহি কভু দীন!

প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে—"অস্ত্র-শস্ত্র"

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ জুড়িয়া আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রলয়বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদেশে বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ কুশলতার ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। এই মহাযুগসন্ধিক্ষণে প্রাচীন বাংলার বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রসঙ্গ অবতারণা করিতেছি। তাই বাঙ্‌লায়, একদিন কি উৎসবে, কি ব্যসনে, কি রাষ্ট্রবিপ্লবে, কি কি রাজদ্বারে, কি শ্মশানে—সর্ব্বত্রই অস্ত্রসম্ভার ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইত। অস্ত্রশস্ত্রের অমিত প্রভাব দেশ ও জাতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিত। অচল, অসাড় ও পঙ্গুজাতি অস্ত্র নির্ম্মাণে ও তাহার যথাযথ ব্যবহারে পুলকিত হইয়া নিজেদের শৈবালাচ্ছন্ন জীবন স্রোতে এক নবীন প্রবাহ জাগাইয়া তুলিতেন।

সমসাময়িক যুগে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই অস্ত্রশস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিতে পাই।

সোনার বাংলায়, একদিন আচার অনুষ্ঠানে, পালপর্ব্বে সর্ব্বত্রই এই অস্ত্রশস্ত্র খেলার পুতুলের মত লোকে ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান সময়ের দীপালির অগ্নি উৎসব, রাজপুতনার হোরি খেলা, পল্লীমেলার ঢালি, লাঠিখেলা, মুসলমানদের মহরমের কলাকুশলতা কোন মতে যেন দেশের ধারা রক্ষা করিতেছে।—পাশ্চাত্য জগৎ বর্ত্তমানে স্ব স্ব অস্ত্রের প্রভাবে যদুকুল ধ্বংসের ন্যায় আত্মধ্বংসের আয়োজনে ব্যাপৃত। বাঙ্গালী অস্ত্রশস্ত্রের অপব্যবহার করিতে জানিত না। বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য ছিল, সততা, ন্যায় ও বিশ্বস্ততা। বাঙ্‌লার প্রাচীন কাব্যগুলিই তাহার একমাত্র সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রাচীন বাংলার অস্ত্র শস্ত্র প্রসঙ্গে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 'শিবায়ন' কাব্যে লিখিতেছেন—

"সুমেরু শিখরে যেন জলদ ঝরিল হেন
নন্দীর উপর খরশর।
কেহ মারে শূল সাঙ্গী ডাবুস পট্টিস টাঙ্গী
পরশ্বধ কুঠার তোমর॥"

নন্দীর সহিত দক্ষ সেনার সংগ্রামকালে আমরা উপরি উক্ত অস্ত্রগুলি দেখিতে পাই। যথ,—শেল, সাঙ্গী, ডাবুস, পট্টিস, টাঙ্গী, পরশ্বধ, কুঠার ও তোমর।

বীরভদ্রের সহিত দক্ষ সেনার সংগ্রাম কালেও কবি রামেশ্বর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

"খরধার তলবার শেল শূল টাঙ্গী।
ডাবুষ পাটিষ খট্টাঙ্গ সাঙ্গি॥
সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী।
বহু তীর তূণীর কোদণ্ডধারী॥"

অন্যত্র "দক্ষনাশ" কালেও দেখিতে পাই,—

"কেহ মারে শেল শূল কুঠার তোমর।
ডাবুষ পটিশ টাঙ্গি ছত্রিশ আতর॥"

বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংগ্রামে "মুগদর ও গদা" ব্যবহার হইয়াছিল।

"মারিল মুগদর ফেলে ছিল যত জোর।
মুদ্গারে মারিল গদা উঠিল অনল॥"

"রুক্মিণীহরণ" প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজগণের সহিত যুদ্ধকালে কবি রামেশ্বর 'কামানের' উল্লেখ করিয়াছেন।

"দশনে অধর চাপে খেঁচিয়া কামান।
শেল শূল শিলি সাঙ্গী ডাবুষ পটিষ।
কোপ করে ফেলে মারে আতর ছত্রিশ॥"
"ধনুক তরঙ্গ তাতে কুর্ম্ম ছত্র ঢাল।"

দ্বারকায় গোলযোগ কালে হরিহরের সংগ্রামে কতিপয় অস্ত্রের উল্লেখ আছে—

"খড়্গ খর শর কুঠার তোমর
ডাবুষ মুগদর টাঙ্গি।
কেহ মারে যষ্টিক কেহ মারে সষ্টিক
কেহ মারে শেল শূল সাঙ্গী॥"

শিবদূত ও যমদূতের যুদ্ধকালেও দেখিতে পাই,—

"লোহার মুগ্দর কুঠার তোমর
শেল শূল খরধার ছুরি।
ডাবুষ পট্টিশ পরশু পরশ্বধ
খরতর বরিখৈ ভূরি॥"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর সহিত পশুগণের যুদ্ধে টাঙ্গি ও ধনুকের ব্যবহার দেখাইয়াছেন।—

"খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করি শুণ্ড।
ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন॥"

অন্যত্র,—"ঘন পাক দিয়া গোঁপে ফেলিয়া পট্টিশ লোফে॥"

সমসাময়িক দিনে যুদ্ধে 'গুলি, ব্যবহার করা হইত। এই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,—

"সঘনে ছাড়য়ে গুলি শ্রবণে লাগায় তালি
ত্রিভূবনে লাগয়ে আতঙ্ক।"

কলিঙ্গপতির সৈন্য সজ্জাকালেও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাই।—

"ভিন্দিপাল খরশান তবক বেলক বাণ
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস গদাধারী।
নব লক্ষ ফিরে কাল সাজিল মদন পাল
ঘন ঘন ঢাল খাঁড়া লোফে।"

অন্যত্র—হস্তি শুণ্ডে বাঁধি দিল লোহার মুগ্দর।"

মাহুত হাতীর পিঠে শেল, শূল, শক্তি জাঠে
গগনে পুরয়ে আড়ম্বর।"
বাজান নূপুর পায় বীর ঘটা পাইক ধায়
রায় বাঁশ ধরে খরশান,।"
"তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেও পূর্ণিত করিল বান॥"

কালকেতু কলিঙ্গপতির সহিত লড়াই করিতে আসিলেন। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী অস্ত্র উল্লেখযোগ্য।

"দোয়াড় ছিয়াড় বাণ করাল খরশান
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস চক্রবাণ।"

শ্রীমন্ত সদাগরকে রক্ষার্থ চণ্ডিকা যে রণসজ্জা করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ কতিপয় অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—

"করে ধরি অসি খাণ্ডা ডানি চলে উগ্রচণ্ডা"
"বারাহী খেটক ধরা আহিলা দেবী চণ্ডীচূড়া
করালাস্য মুষল ধারিণী।
মুখে অট্ট অট্ট হাস করে ধরি অসি প্রাস
খট্টাঙ্গ ধারিণী ঘোর রসনা॥
গায়ে আরও পিল টাঙ্গি তবক বেলক সাঙ্গী
ভূষণ্ডী ডামস খরসান।
যমদণ্ড ভিন্দিপাল ডঙ্ক টাঙ্গি করবাল
অসিপত্র কামান কৃপাণ॥"

অন্যত্র,—"চণ্ডিকার বারবাণ কামান আর কৃপা।
ভিন্দিপাল দোয়াল ছেয়াড়।
কবন্ধ তোমার পাশ চক্রবাণ নাগপাশ
ডাঁউসা মুষল শতপ্রাড়॥"

অতঃপর দেখিতেছি—টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্ম
অস্ত্র অভেদ্য বর্ম্ম,
দিলা নানাবিধ প্রহরণ।"

কোটালের শ্রীমন্ত বধার্থ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া গেল।—কবিকঙ্কণে দেখিতে পাই—

"পুরিয়া তবকী ধাইল ধানুকী
ধানুকী সারিয়া কাঁড়া।
পুরিয়া সন্ধান ছাড়ি দিতে বাণ
ছিস্তিল ধনুর চড়া॥
পাছ হইল ধানুকী আগু হইল তবকী
থেকে পূরিল গুলি।
অনলে দিতে ফুঁ তবকীর পোড়ে মু,
পাছু হয়ে পড়িল গুলি॥
পরিখ ভূশণ্ডী তোমার গণ্ডী
ডাবুষ ছুরিকা শেল।"

অন্যত্র,—"ভাঙিল রায় বাঁশ পঞ্জাতি পায় ত্রাস।"

সিংহল রাজার যুদ্ধ বর্ণনায় বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম লিখিতেছেন,—

ঢালি পাইক ধায় রণে হাথে খাণ্ডা ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল॥
ধানুকী পাইক ধায় হাতে ধনুশঃর।
কটিতটে তলোয়ার চলিল সত্বর॥
চৌকাণিয়া পাইক চৌকণ শোভে করে
শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান।
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তুণেতে পূর্ণ কৈল বাণ॥"

অপর একখানি জীর্ণ বহু প্রাচীন পুঁথিতে দেখিতে পাই, শালি বাহন রাজার রণসজ্জা প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেন,—

"তবক বেলক টাঙ্গি কাছে খরশান সাঙ্গি
ধানুকী লইল বেড়াজাল।

যুদ্ধ বর্ণনায় কবি বলেন—

কাটিয়া লইল ধনু দানা দুইখান॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে।
তাল ফল সম গোলা পূরিল ভিতরে॥"
"গুরু স্মঙরিয়া গোলা ভেজায় অনলে।
পাছ হয়ে পড়ে গোলা নরপতি দলে॥"

কবি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত শ্রীরামরসায়ন কাব্যে "মারীচবধ" প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"ধনুর্ব্বাণ ধরি করে পৃষ্ঠে তূণ শোভা করে
খড়্গচর্ম্ম ধরিয়া কুক্ষিতে।"

শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির বিবাহপ্রসঙ্গে কবি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"গায়েতে পড়িল সানা শিরেতে টোপর।
কেহ নিল খড়্গচর্ম্ম কেহ চাপ শর॥
কেহ ছুরী কাটারী বিচিত্র যমধার।
ভুশুণ্ডী মুদ্গর ধরে কেহ শেলসার॥"

অন্যত্র,—"বাণ তূণ নিশান ধরিয়া ধায় কত।
ঢাল খাঁড়া খর্পর লইয়া শত শত॥"

ভার্গবের রণসজ্জা কালেও দেখিতেছি,—

* * * * ডান করে শর সাজে
বাম করে ধরিয়াছে ধনু।
স্কন্ধেতে কুঠার বর বুকে শানাইছে শর।"

খর দূষণ বধপ্রসঙ্গে কবি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ [ক]রিয়াছেন,—

"তেঁই সাজাও সেনা নিজ সানা পরহ সুন্দর।
শিরে দৃঢ়তর মনোহর ধরহ টোপর॥
তারা কসি কসি চর্ম্ম অসি বান্ধয়ে তোমর।
কত ছোরা ছুরী গদা ফরী মুষল মুদ্গর॥
বান্ধে তীক্ষ্ণতর নানাসর-পরিপূর্ণ তূণ।
ধরে সুশোভন শরাসন দিয়া দিব্যগুণ॥
রাম তোলে ধনু খর তনু লৌহের সমান।
অতি খরতর ফলধর দিব্য দিব্য বাণ॥
কত রিপু নাশি গদা অসি কঠিন কুঠার।
কত শূল সাল ভিন্দিপাল তোমার কাটার॥"

শ্রীরামের যুদ্ধকালে অস্ত্রের কথায় কবি বলেন,—

"পড়িলা বিকচ কঠিন কবচ
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া।
পিঠে তূণদ্বয় বান্ধিলা অক্ষয়
প্রখর শরেতে পূরিয়া।
বান্ধিলেন ভাল খর অসি ঢাল
বামেতে যাইছে দুলিয়া॥"

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"এক কালে অস্ত্র ছাড়ে রামের উপর।
কেহ শর শূল কেহ নারাচ মুদ্গর॥
কেহ চক্র কেহ খড়্গ পরশু তোমার।"
"নিক্ষেপ করিলা এক গদা ঘোরতর।"
"তবে সেনাপতি এক ধরিল মুদ্গর।"

রাবণের পুরী রক্ষকদের হাতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ছি[ল] তদপ্রসঙ্গে কবি বলেন,—

"শক্তিশূল খড়্গাধারী দ্বারে কোটি কোটি দ্বারী
সাবধানে করয়ে রক্ষণ।"

সীতাকে চেড়ীগণ ছোরা, ছুরী, অসি, যমধার, প্রভৃ[তি] অস্ত্র দেখাইয়া ভীতা করিয়া তুলিত।—

"আনি চেড়ী ছোরা ছুরী অসি যমধার।
করয়ে সীতার অঙ্গে সকলে প্রহার॥"

রাক্ষস ও মারুতির যুদ্ধকালে,—

"পরে দিব্যসানা রণে হানা বারয়ে যাহার।
আর শিরস্ত্রাণ পরিধান করয়ে মাথায়॥
নিল সুপ্রখর নানাশর ভুষণ্ডী তোমার।
কত খড়্গ করি ছোরা ছুরী প্রচণ্ড মুদ্গর॥
ধরি ধনুর্ব্বাণ বেগবান উঠিল অম্বর।"

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধকালে,—

"নিল ধনুবানপূর্ণ তূণযমধার।
খড়্গচর্ম্ম তোমার ভুষণ্ডী শক্তিধার॥

তীক্ষ্ণ শর যোগ করি বীর শরাসানে।
টানি টানি বেধ করে পবন নন্দনে॥"

বানরগণের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনায় কবি প্রাচীনযুগের বিবিধ অস্ত্রের বার্ত্তা শুনাইয়াছেন,—

"রামচন্দ্র দিল দিব্য ধনু দুইখান
অভেদ্য কবচ দুই দিব্য দিব্য বান॥
দুই দুই খড়্গচর্ম্ম চক্র যমধার।
দুই দুই ভিন্দিপাল নারাচ কুঠার॥"

সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দর্শন কালে মুদ্গর, কুঠার, মুষল, গদা, চক্র, খরশান, খড়্গ, ধনু, তুণ, শর, প্রভৃতি অস্ত্রের কথা জানিতে পাই।—

রাবণের যুদ্ধকালেও কবি বহুল অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কলে-বরে বান্ধে অস্ত্রশস্ত্র বিবিধ প্রকার।
কার শক্তি আছে নিরুপণ করিতে তাহার॥
হার হেন পট্টডোরিতে করিয়া পৃষ্ঠোপরি।
পরিষ্কার তুণ বান্ধিল সুতীক্ষ্ণ শরে ভরি॥
সব-স্কন্ধ ধরে খড়্গ ছোরা ছুরিকা আধার।
ধার যাহাদের বজ্র হেন অতি পরিষ্কার॥"

"কেহ মহাতেজে চক্রতেজে কপির উপর।
তাহে কারো ঘাড় কারো হাড় কাটয়ে বিস্তর॥
কেহ মারি ছুরী নাড়িভুঁড়ি কারো কাটি পাড়ে।
কেহো করে ভঙ্গ কারো অঙ্গ গদার প্রহারে॥
কেহ খড়্গ করি করে ধরি করে প্রহরণ।
তাহে কারো মস্ত কারো হস্ত করয়ে গ্রহণ॥
কেহ শূলশাল ভিন্দিপাল কাটার তোমর।
মারি কাটে পুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কারো উরু কর॥"

লক্ষণের রনসজ্জাকালে খড়্গচর্ম্মতুণ শরাশণ প্রভৃতির উল্লেখ বর্ত্তমান।—

"বান্ধিলেন দিব্য দিব্য খড়্গচর্ম্ম তুণ।
শরাসন লইয়া সংযোগ ক'র গুণ॥"

রাবণের প্রথম দিবসের যুদ্ধে কবি কতিপয় অস্ত্রের তালিকা দিতেছেন,—

"পরে ধরিলেক ধনু তুণ, কাটার কুটার।
আর চক্র গদা শূর শাল অসি সমধার॥
ধার বজ্র হেন হয় যায় সে সব কৃপাণ।"

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে,—

শাল, শূর, ঢাল খাঁড়া ধরি চলে কত চর।"

কুম্ভকর্ণকে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করাইতে 'মুষল মুদ্গর' অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে হয়।—

"মুষল মুদ্গর দিয়া করয়ে প্রহার।"

রণযাত্রা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"শং, ধনু, মুদ্গর, গদা, ভুষণ্ডী তোমর।
মর্ম্ম ভেদকর ধরিয়াছে খড়্গ বহুতর॥"

"তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ভল্ল ভাল ভাল ভাল।
বিগধ প্রমাণ নলী কাণ্ড শূল পাল॥
কেহ কেহ ঘুরাইছে মুষল মুদ্গর।"

অতিকায় বধ প্রসঙ্গে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া কবি লিখিতেছেন,—

"দেখ রথ উপরেতে অস্ত্র শস্ত্র নানামতে
শূল শাল মুষল মুদ্গর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল শত শত তরবাল
কঠোর কুঠার বহুতর॥
অতিশয় ভয়ঙ্কর লৌহময় বাণধর
অষ্টত্রিংশ তুণ শোভা করে।
স্বর্ণবন্ধ সুশোভন দিব্য দিব্য শরাসন
চারিদিগে রহে থরে থরে॥
দশহস্ত পরিমাণ দুই পাশে দুইখান
খড়্গ দুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বাম করে একখান ধনুকেরে
ইন্দ্রধনু সম দীর্ঘতর॥"

ইন্দ্রজিতের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলেন,—

"পৃষ্ঠেতে বাঁধিল তুণ শরেতে পূরিত।
খরশান খড়্গ নিল অতি বিপরীত॥
খড়্গ চর্ম্ম শূল শাল পরশু তোমর।
গদা চক্র ধরি যায় কত নিশাচর॥"
অস্ত্রশস্ত্র নানাজাতি বরিষয়ে সার।
কাটার কুটার শূল তোমর মুদ্গর॥"

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"যত নিশাচর ধরি ধনুসার
কাটার কুঠার ফরী।

বানর উপরে　　সম্প্রহার করে
চক্র গদা অসি ধরি ॥
কারো গদাঘাতে　　ভাঙে বুক হাতে
খড়্গ করে বিদারণ।
কত নিশাচর　　তেজি অসি শর
হাতাহাতি করে রণ ॥"

মকরাক্ষ বধকালে কবি রঘুনন্দন অস্ত্রশস্ত্রের বিবিধ সন্ধান দিতেছেন,—

"বান্ধিল পিঠে তূণ,　　ধনুকে দিয়া গুণ
তুলিয়া লইল পানেতে।
বান্ধিছে শূলশাল　　প্রখর অসি ঢালে
তোমর কাটার কুঠার।
শাবল ছুরি টাঙ্গি　　বরশা ছয়শাঙ্গি
লগুড় খাসা যমধার ॥
ধণুক অসি শর　　পরশু সুতোমর
প্রভৃতি লইল অস্ত্রগণে।"

ইন্দ্রজিত পুনরায় যুদ্ধযাত্রা কালে খড়্গ, ফরী, ছোরা ছুরী কাটার ভিন্দিপাল শূল শাল শাবল লইয়া ছিলেন।—

"আর খড়্গ ছোরা ছুরী কাটার বান্ধিল।
কত ভিন্দিপাল, শূলশাল শাবল লইল ॥"

ইন্দ্রজিতের শেষ অস্ত্র ঃ—

"অসুরাস্ত্র হইতে শত শত হইছে নির্গত।
কত গদা অসি চক্ররাশি শূল শত শত ॥
কত যমধার ছুরী আর ভূষণ্ডি তোমর।
কত শেল শাঙ্গী ছোরা টাঙ্গী কুঠার মুখার"

রাবণের শেষ অস্ত্র ঃ—

"ধাত চক্র গদা অর্দ্ধচন্দ্র মুষল তোমর।
মর-ণের হেতু শূলতনু ভূধর শিখর ॥
কত ভূষণ্ডী খর্পর খড়্গ অঙ্কুশমুদ্গর।
গর-জন করি ঘোরতর ছাড়য়ে বিস্তর ॥"
কেহ ফেলে ঢাল কেহ শাল কেহ বা তোমর।
কেহ অলঙ্কার ফেলে আর সানাই টোপর ॥

রাবণ কর্ত্তৃক কুবের পরাজয় প্রসঙ্গে কবি রঘুনন্দন শ্রীরাম রসায়ণ কাব্যে বলিতেছেন,—

"পিঠে বান্ধে তূণ,　　দিয়া দিব্যগুণ
ধণুক লইল করে।"
ছুরি শূল শাল　　গদা অসি ঢাল
বন্দিলেক থরে থরে ॥"

কবি রামপ্রসাদ তাঁহার অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণে রা… রাক্ষসের যুদ্ধ বর্ণণায় লিখিতেছেন,—

"ত্রিশূল মুষল মুদ্গর টাঙ্গি।
রক্ষঘটা জাঠা মারয়ে সাঙ্গি ॥
ভল্লা ভিন্দিপাল তোমর আদি।
মারয়ে কপিরে সন্ধানী হুদি ॥"
"রাবণের রক্ষিগণ　　করে বাণ বরিষণ
ত্রিশূলমুসল জাঠা টাঙ্গি।
অর্দ্ধচন্দ্র আদি অস্ত্র　　নাগপাশু মারে ত্রস্ত
মুদ্গর তোমর আর সাঙ্গি ॥
শেল শূল গদা ভাল　　মারে ভল্ল ভিন্দিপাল
অঙ্কুশ পট্টিশ কত শত।"

অতঃপর লক্ষ্মণের অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গে কবি রামপ্রস… লিখিতেছেন,—

"আকর্ণ পূরিয়া কত শত মারে শর।
পুলিমুখী, সূচীমুখী, ভল্লা ভিন্দিপাল!
ত্রিশূল মুষল জাঠা পরশু বিশাল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র পট্টিশ তোমার।
পাশুপত মেল কত দারুণ সমরে ॥"

যুবনাশ্বের পরাজয় প্রসঙ্গে জৈমিনি ভারতে দেখিতে পাই—

"জাঠি জাঠা শেল শূল পট্টিশ তোমর!"

সুধন্বার যুদ্ধারম্ভে জৈমিনি ভারত কতিপয় অস্ত্র শ… কথা উল্লেখ করিতেছেন,—

'নিজে বীর রাজপুত্র বর্ম্মাবৃত তনু।
আঁটা কঠি জঠাজাঠী নিল দিব্যধণু ॥
কবচ কিরীট শর তুণ অগনণ।
ভূমিতে ছাইয়া পড়ে বৃষ্টির মতন ॥
নিরন্তর শেলশূল পট্টিশ তোমরে।
পাণ্ডব সৈন্যের নাশ করে একেশ্বরে ॥
হাতে ঢাল তরোয়াল মুখে ভাঙে লাল।
রক্তস্রাব নাহি বাঁর শরীর বিশাল ॥"

প্রমীলাপুরে অর্জ্জুনের অশ্বসহ গমন প্রসঙ্গে জৈমিনি ভা… কতিপয় অস্ত্রের সন্ধান দিতেছেন।—

"হাতে শেলশূলবান জাঠা জাঠি বর্ত্তমান
ভিন্দিপাল পরশু তোমর।
গদা নাগপাশ শর শোভে কত নিরন্তর
ঘোর বেশ সহর্ষ অন্তর॥"

অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধকালে জৈমিনি ভারত বিবিধ অস্ত্রের কথা বলিয়াছেন,—

শেলশূল গদা অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
লইল যতেক কেশ সংখ্যা করে তার॥"
শেলশূল জাঠা আদি ভূষণ্ডী তোমর।
পরশু পট্টিশ আদি বাণ বহুতর॥"

৺ঘনরাম কৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে "ঢেকুর পালায়" প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্রের কথায় দেখিতে পাই।—

"ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক।
সাজিয়া ঘোসের সঙ্গে চলে শতাধিক॥
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দামদুম।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম॥
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ ডাকে হানহান।
একাকার ধানুকী বন্দুকী আগুয়ান॥
গড় কাটি কোদালে করিল সমতুল।"

"গৌড়যাত্রা পালায়"ও দেখিতে পাই—

"বিশাই নির্ম্মাল ফলা অভয়ার অসি।
খাঁড়া ফলা কর্পূর কুমার টাটে কসি॥
আগে পিছে ধানুকী বন্দুকীরধায় ঢালি।
তড়বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি॥
বন বেড়ি বড় গোলা বন্দুকে ছুটে গুলি।
দুমদাম শব্দ শুনি বাঘা যায় তালি॥
নানা অস্ত্রে করে বৃষ্টি বনে ঝড়ে ঝোপে।
টাঙ্গি শেল সঘনে সিফাই সব কোপে॥
তার কাছে তীরগুলি কামান বন্দুক।
বামকরে ধরে শাল আচ্ছাদিয়া বুক॥"

কামরূপ যুদ্ধ প্রসঙ্গে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে অস্ত্রশস্ত্রের ধায় বলিতেছেন,—

"ঝুটীনাড়া দিয়ে নিল ঢাল খাঁড়া কেড়ে॥
ঝুপ ঝাঁপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলি সার।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে কর ভর॥
চৌদিকে চাপিয়া গুলি গাজে দুমাদুম।"

"ঝণ ঝণ ঝাঁকে খাঁড়া টান্ টান্ টাঙ্গি।"
"শন শন শুনি শুধু শরের শব্দ।"

গৌড়ে পালবংশের রাজত্বকালেও দেখিতেছি বন্দুকের ও গোলাগুলির বহুল প্রচলন ছিল।

"ঝাড়া কাড়া খঞ্জর জাঠি ঝকড়া শর
সাঙ্গি শেল পরিমল চাঁপ।"
"ঢালি চঞ্চল চলে ঢালি পাক ফরিকালে
ধর ধর বলি বেগে ধায়।
বড় গোলা বন্দুক ছড় ছড় দশ মুখ
চকিতে চমকিত শেষ।"
"আসিয়া চৌবেড়ে জাঠি ঝকড়া এড়ে
কোপে কালু করে বীরদর্প।"
"একাকার ধূম হুড়ুম হুড়ুম
শব্দে ছোটে বড় গোলা।"
"হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঙ্গি শেল রাখে
ঝুপ ঝাপ রাখিলে শর।"

কানাড়ার স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই,—

"বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দুড়দুম।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম॥
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ হাঁকে হান হান।
একাকার ধানুকী বন্দকী আগে যান॥"

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে কবি ঘনরাম বলিতেছেন,—

"ধনু টাঙ্গি শূল শাল খরতর খাঁড়া ঢাল
কালমুখী হীরা বান্ধা ধার।
তরকচে তীরগুলি কোমরে কাটারি তুলি
বান্ধিয়া হইল আগুসার॥"
"কুঠার করিয়া কাটে কুঞ্জরের স্কন্ধ।
সর্দ্দার সিফাই পড়ে শিরে শরবন্ধ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর সাঙ্গি শেলগুলি।
ঢাল ঢালি সামালি হাফানে হানে ঠায়।
শারগুলি আথালি পাথালি তালি খায়॥
অন্ধকার নিশাতায় একাকার ধূম।
চৌদিকে বাজে গোলা হুড়ুম হুড়ুম॥
শন শন শুনি শুধু শরের শব্দ।"

ইছাই বধ পালাতেও প্রাচীন যুগের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।—

"ডানভাগে বান্ধিল যুগল সমধা।
খরতর জোড়া খাঁড়া নামে দুই থর॥
বামেতে যুগল টাঙ্গী সম অবতার।
চকো ছুরী কাটারি কুটিলহীরাধার॥
ফলা আঁটে ফিরিয়া ফলঙ্গ মারে বীর।
ইছাই উপরে এড়ে হীরা ধার তীর॥
ইছাই সেনেরে দিল অতি বড় তাড়া।
হান হান হাকে দেবী হাতে ঢাল খাঁড়া॥"

মাইকেল মধুসূদন "মেঘনাদ বধকাব্যে" প্রমীলাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে সমালোচকগন বলিয়াছিলেন, ইহা বিলাতী অনুকরণ। আমাদিগের মতে আদৌ তাহা নহে।—প্রাচীন বাংলাকাব্যেও দেখিতে পাই স্ত্রীজাতি বহুবার অস্ত্রধারণ করিয়াছেন।—

"ঢাল খাড়া কানাড়া যুবতী যদি ধরে।
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের কাঁপে ডরে॥"

অন্যত্র দেখিতে পাই,—

"দুড় দুড় বন্দুক গোলার হুড়াহুড়।
কামিনী কামান ছাড়ে কাঁপায়ে গউড়॥"

বীর কালুডোমের অস্ত্র শস্ত্র প্রসঙ্গে ঘনরাম বলেন,—

"দূরে পড়ে ঢালখাঁড়া শাঙ্গি শেল তীর।
ভূমে পড়ে ফুফারে ঘুমায় মহাবীর॥
কালুর কাটারি ছড়ি মস্তকের টিরা।
বিজয় নিশান লয়ে ভয়ে চায় ফিরা॥
ঢালী পিছে ধানুকী শোভা পায়।
কাঁথি আড়ে কামানী কামান ধরে রয়॥"

কবি ঘনরাম কৃত "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্যে এত অধিক স্থলে গোলা, গুলি, বন্দুক ও কামানের উল্লেখ করা হইয়াছে যে সকল দৃষ্টান্তগুলি যোজনা করা সম্ভবপর নহে।—

পদ্মাপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালী রচয়িতা দ্বিজবংশীদাস লক্ষীন্দরের বিবাহ সজ্জা বর্ণনায় প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া তীর, গুলি, ঢাল, ধনুক, জাটি, ঝকড়া, বন্দুক ও কামানের তালিকা দিতেছেন।—

"হাতে জাটী ঝকড়া।" "তীরন্দাজ গোলন্দাজ, ঢালি ও ধানুকী সাজ।" "ঠনঠনি ধনুক টঙ্কার।"

"মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পালিতা হাত
একেবারে দশ গুলি ছোটে।
তীর কামান আসোয়ারি * * *।"

জীবনযুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রই প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে অস্ত্রশস্ত্রের সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবতারিত করিলাম, তাহা গল্প উপকথা নহে, আকাশ কুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা এবং প্রাচীন কাব্যগুলির সহিত একাংশীভূত। তবে কবি কল্পনায় ইতিহাস কাব্য রসে পরিণত হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের ঝঙ্কারে প্রাচীন বাংলা গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া বাঙ্গালী বীর রমনীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে রণক্ষেত্রে অভিযান, বাঙ্গালী পাঠকগণ কি অস্বীকার করিতে পারেন?

গ্রাম্যগাতে "লালন সাই" সুর ও এক সময়ে নাম কিনিয়াছিল। নিরক্ষর গ্রাম্য কবির পল্লী গানে অনেক সময়ে সাময়িক ঐতিহাসিক তত্বও মিলিয়া যায়।—একটী গানে অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হইয়াছে।—

"কি হলো রে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কর্ত্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীর মদনের গায়॥"

নবাবের পতনের সাথে সাথে বাংলায় অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ রহিত হইয়া গিয়াছে। আমিও নবাবের পতন দুঃখে বিচলিত হইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কেন্দ্র সমিতির কথা

লালমণির হাট সমিতি পরিদর্শন—গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্র সমিতি হইতে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, মিস্ নীরোজ বাসিনী সোম, বি, এ, বি-টী, মিস্ দীপ্তি চ্যাটার্জ্জী বি, এ, বি, টী, মিস্ হেম নলিনী মল্লিক ও প্রচারক শ্রীযুত সুধীর লাল সরকার লালমণির হাট মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। দুই বৎসর পূর্ব্বে ই, বি, রেলওয়ের ওয়েল ফেয়ার অফিসার শ্রীযুত প্রভাত সান্যাল মহাশয়ের উৎসাহে ও স্থানীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি কেন্দ্র সমিতি হইতে উহা পরিদর্শন করা হয় নাই। তজ্জন্য সম্পাদক মহোদয় এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্য ৩ জন মহিলা এই সমিতি পরিদর্শন করার অভিমত প্রকাশ করেন। তদনুসারে ই, বি, আরএর জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়কে লেখা হয়। তিনি উক্ত সমিতি পরিদর্শন করার জন্য উহাদের জন্য সেকেণ্ড ক্লাস পাশ পাঠাইয়া দেন এবং উঁহাদের পথে যাহাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ওয়েল ফেয়ার অফিসার মহোদয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক মহোদয় এবং অন্যান্য সদস্যাগণ স্থানীয় ডিঃ লোকো সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এবং প্রচারক শ্রীযুত সরকার স্থানীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

২৫শে এপ্রিল অপরাহ্নে তাঁহারা সমিতি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন উপলক্ষে মহিলা সমিতির সদস্যদের হস্ত নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদি দ্বারা একটী ক্ষুদ্র প্রদর্শনী খোলা হয়। কেন্দ্র সমিতির পরিদর্শকগণ অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমিতির নানাবিধ উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক মহোদয়—এমব্রয়ডারী কার্য্যে দক্ষতার জন্য স্থানীয় সমিতির মিস্ হেনা রায়কে কেন্দ্র সমিতি হইতে একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন।

অতঃপর স্থানীয় পিয়ার্স ইন্‌ষ্টিটিউটে মহিলা সমিতির একটী বিরাট সভা হয়। এই সভায়—বহু বিশিষ্ট রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ যোগদান করেন। প্রারম্ভ সঙ্গীতের পর ডিঃ লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পত্নী মিসেস্ ইউ এন্ ব্যানার্জ্জী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে মিস্ সোম মহিলা সমিতির উপকারিতা ও মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। যাহাতে সমিতির কার্য্য প্রসার লাভ করে, তজ্জন্য স্থানীয় মহিলাদের মিলিত এবং সুসংবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর ডাঃ নিয়োগী মহিলা সমিতির কার্য্যাবলী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। বাংলার অসংখ্য অসহায়া, দুঃস্থা বিধবাদের শিল্প শিক্ষা দ্বারা স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কিরূপ ভাবে বিভিন্নস্থানে মহিলা সমিতি গঠন করিয়া তাঁহাদের দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদ্বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি মহিলা সমিতির ভিতর দিয়া সাহায্যে "শিশু মঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ" কার্য্যে মহিলাদের অগ্রসর হওয়ার জন্য স্থানীয় মহিলাগণকে অনুরোধ করেন।

অতপর সভানেত্রী ও অতিথিবৃন্দকে ধন্যাবাদ প্রদানান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

মূলধর মহিলা সমিতি—সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী মহোদয় মূলঘর মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান, ৩০শে এপ্রিল তথায় একটী শিল্প ও শিশু প্রদর্শনী হয়।

বাঙলা লোক-সাহিত্যে নারী

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কাব্য-সাহিত্য জগতে নারীকে সৌন্দর্য্য সুষমাময়ীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। প্রাচীনকালের বিবাদ-বিসম্বাদের মূলেও নারী। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড প্রভৃতি মহা কাব্যগুলি নারীকে উপজীবি করিয়া রচিত। ও রকম কত কি ঘটনা আমাদের স্মৃতি-গোচর হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে—সে সব লইয়া আমরা মাথা ঘামাই না। কিন্তু যখন জনক-নন্দিনী পতিব্রতা সীতার কাহিনী পাঠ করি, তখন ভাবে বিহ্বল, এবং দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। পতি বিয়োগ বিধুরা শোকাকুলা জানকীর দুঃখে বনের তরুলতা পশুপক্ষী কাঁদিয়া আকুল, চরণের নূপুর পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্লেষ দুঃখে মৌনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া কর্ত্তব্য-বোধে (?) ত্যাগ করাতে শ্রীরামচন্দ্রের আন্তরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে তাঁহার স্থান হইল না; দেবী বসুন্ধরার বক্ষে তাঁহাকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

"স্ত্রীয়ঃ চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং" এই রূঢ় নীতির বলে নারীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের সামান্য ত্রুটি ও উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। পাষাণময়ী অহল্যার মর্ম্মবেদনা তাই গুমরিয়া মরিতেছে, ভাষায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, সেখানে চরিত্রের প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু দুর্য্যোধনের অভিলাশ ভাষায় ব্যক্ত করিলে বুঝি বা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য হইলেও সেগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীকে পতির ছায়ানুগামিনী রূপে ধারণা করা হইয়াছে, এ রকম আদর্শ সকল দেশের কাব্য-সাহিত্যে সম্মান পাইয়া আসিতেছে। যখন নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয় তখনো ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্ত পত্নী-প্রীতির অন্তরালে এমন এক নারী চরিত্রের আবশ্যক হইল, যাহা প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস। তাহাকে না হইলে বুঝি নাটকের মাধুর্য্য অক্ষুন্ন থাকে না। পত্নী-প্রীতির সংযত ভাবধারার মধ্যে যেন আনন্দ নাই; তাই দুই একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া সরলা আশ্রম-বালাকে লইয়া একটু ছিনিমিনি না খেলিলে যেন চলে না। শত শত গোপীর মন চুরি, বসন চুরি করিয়া গোপীবল্লভের আনন্দ—তাহা বুঝি চাপিয়া রাখা যায় না। তাঁহাকে যে গোপীরা "তনু-মন-প্রাণ" সব সঁপিয়াছে, ও রকম না করিলে নিলাজ-বল্লভকে বোধকরি পাওয়া যায় না।

বাঙলা লোকসাহিত্যের মধ্যে ময়নামতীর গান প্রাচীনতম। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে নাথ পন্থীরা ধর্ম্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট সাহিত্য গড়িয়া তুলে—বাঙ্গালী রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মধ্যে তাহা রূপ প্রাপ্ত হয়। তাহাই ময়নামতীর গানের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু।

গোপীচন্দ্রের পত্নী, অদুনা পদুনা পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপা। তাঁহাদিগকে সতীর শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যৌবনে ত সন্ন্যাসধর্ম্ম সাজে না। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহাদের দুর্গতির অন্ত থাকিবে না। সেজন্য বয়সকালে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া অদুনা স্বামীর নিকট মিনতি জানাইতেছে—

> কান্দিছে অদুনারাণী ধরিয়া রাজার পাও।
> এ হেন বয়সের বালা ছাড়িয়া না যাও॥

স্বামীকে অবলম্বন করিয়া তাহারা যে লতার মত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই, তাহারা স্বামীর চরণতলে পড়িয়া থাকিতে চাহে।

> তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি হমু লতা।
> রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পলাইয়া যাবু কোথা॥

একান্তই যদি তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তাহারা স্বামীর কথা ভুলিতে পারিবে না। শয়নে স্বপনে-জাগরণে স্বামীকে তাঁহাদের মনে পড়িবে।

> নিন্দের স্বপনে মহারাজ হব দরিসন।
> পালঙ্ক হস্তে দেখি নাই স্বামী ধন॥
> খালি পালঙ্ক দেখি মুই জুড়িম কান্দন।

অদুনা-পদুনার চোখের জলে রাজার পাষাণ বুক ভিজিল না, তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

যখন বাঙলায় বৌদ্ধ সহজিয়ার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল,

তখন পল্লী গীতিগুলিও সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। সহজিয়া সাধনা জ্ঞান মার্গীয় হউক, আর রস-পর্য্যায়ের হউক তাহাতে সাধারণ লোকের আসক্তি নাই। সহজ-ভাবে সাধনার মধ্য দিয়া পরকীয়া ভজনা আত্মপ্রকাশ করিল। তারপর পরকীয়া ভজনার বাহ্যরূপই সাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইল। স্বকীয়া, পরকীয়া অর্থে স্বকাম নিষ্কাম কিংবা আত্মেন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ কাব্যামৃতের রসাস্বাদন ক্রমে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইল। পল্লী গীতিগুলি সে সব প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

কালে ধামালী শ্রেণীর এক রকম গান শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত বিষয়বস্তু লইয়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহা বাঙলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বর্ত্তমানের পদাবলী ধামালী ও ব্রজবুলির মিশ্রিত রূপ মাত্র বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণধামালী গানের মধ্যে পরকীয়া সাধনার দৃষ্টান্ত অনেক বেশী। পরকীয়াবাদ কবে হইতে প্রসার লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন তুলিব না, তবে তাহার মধ্যে বাঙালীর ভাবের পরিচয় আছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাল্পনিক ভাব-বিলাসকে উপলক্ষ করিয়া আমরা অনেক অশ্লীল ভাব-ধারাকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু পল্লীগীতির প্রাকৃত বিবরণে তাহা ধামা-চাপা দেওয়া যায় নাই; তথাপি তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটু মাধুর্য্য থাকিয়া গিয়াছে। আমরা এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কিছু বিবৃত করিতেছি।

তুমি আমি জঙ্গলেতে কথায় লাগল আড়ি।
প্রেম করিবার সত্ত কথায় যাইয়ো আমার বাড়ী॥
সকল দিকে যাইয়ো কানাই, যাইয়োনা গোয়াল পাড়া
কাড়ে নেবে মোহন বাঁশী ছিড়বে গলার মালা॥

সাধারণ ছোট খাটো পল্লীগীতিতে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সরলতার জন্য সেগুলি অতুলনীয়। প্রিয়জন ছাড়া হইলে যে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক সে সব গানে তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই। সেজন্য রাখালকে ছাড়িতে প্রাণে দুঃখ লাগে।

(আজি) আইলে বাড়ে আইল কালিয়া।
পাথরের সেকি বালা।
তুই রাখাল ছাড়িয়া গেইলে,
কে ধরিবে গলা রে॥

তুমি ত রাখলের ছাইলা,
ওরে আথোয়ালে মতি।
তুমি নি রাখিতে পার,
গোপন পিরীতি॥

কখনো মইষালকে দেখিয়া বুক ফাটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

মইষালের বড় দুঃখ রে দিদি
মইষালের বড় দুঃখ।
ভিজা বস্ত্র কাঁধে দিয়া,
মইষাল ছেঁকে দুধ॥

কখনো মইপাল বন্ধুর জন্য প্রাণ ছটফট করে, মনে কত আশঙ্কা জাগে।

ও পোড়া পরাণ কান্দে মাজে দিদি
মইপাল বন্ধুর লাগে॥
মইপাল বন্ধু লাঙ্গল চষে,
কড়ই তলার মাঠে।
ও তার মুখখানি শুকায়ে গেছে পশ্চিমে বাতাসে

এ রকম খণ্ড গীতিগুলির ভাবধারাকে একত্র করিয়া পল্লীর পালা গান রচিত হইয়াছে। সে গুলি ভাবের অনন্ত খনি। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার অনন্ত ভাব সম্পদে মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই, অনেক সময় সেগুলি আধুনিক কালে রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। সে সব গানে নারীকে প্রেমের উচ্চতম শিখরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা হইতে আন্ধা বন্ধুর গানের সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা হইতেছে। বিদেশী আন্ধাবঁধুর জন্য রাজকন্যা পাগলিনী হইয়াছেন; বিদেশী আন্ধা বধুর জন্য কুল লাজ মান ত্যাগ করিতেও তাঁহার বাধা নাই।

বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব,
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব॥
তোমার বুক লইয়া আমি শুনব তোমার বাঁশী।
জনমে মরণে বন্ধু হইলাম তোমার দাসী॥

বন্ধু যদি তাহার প্রতি সদয় না হয়, তাহা হইলে রাজকন্যা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।

সদয় যদি না হওরে বন্ধু নিদয় যদি হও
ত্যজিব এ ছার প্রাণী দাণ্ডাইয়া রও॥

স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় "এই গানটিকে গীতি কাব্যের মধুচক্র" বলিয়াছেন। সত্যই আন্ধা বন্ধুর গানটি চণ্ডীদাস পদাবলীর সমকক্ষরূপে স্থান পাইতে পারে। অনেক স্থানে চণ্ডীদাস পদাবলীর সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে। উপরি উক্ত উদ্ধৃতাংশের সহিত পদাবলীর একটি অংশের সাদৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য।

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

(শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী।

মইষাল বন্ধু, কাঞ্চনমালা, মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া প্রভৃতি পল্লীর পালা গানগুলি ও ভাব সম্পদে অপূর্ব্ব সে সব গানের নারী চরিত্রের উপর কলঙ্কক্ষেপ করিবার প্রয়াস ও বুঝি দূষণীয়।

মইষাল বন্ধুর গানে সাজুতি যে স্থানে বলিতেছে, বন্ধু আমি যদি পাখী হইতাম তাহা হইলে গাছের ডালে বসিয়া তোমার মুখখানি দেখিতাম, তাহা সত্যই কাব্য সঙ্গত।

পক্ষী যদি হইতাম রে বন্ধু উড়িয়া উড়িয়া।
তোমার মুখ দেখতাম বন্ধু ডালেতে বসিয়া॥
ইচ্ছা হয় তোমার ল্যাগ্যা ছাড়ি কুল মান।
মুছাইয়া শীতল করি তোমার অঙ্গের ঘাম।

ভাবের ঘরে অনেক লুকোচুরি খেলিলেও তাহা আমাদের মনকে আনন্দ দেয়। মইষাল বন্ধুর সহিত সাজুতির মিলন না ঘটিলেও ভবিষ্যতে আশা রাখে।

নারীর সহিত পুরুষের সম্বন্ধ পল্লীগীতির অনেক স্থলে উপভোগ্যরূপে চলিত হইয়াছে। স্বামী বিহীন জীবন নারীর পক্ষে কিরূপ দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়ে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। কাঞ্চন মালার গানের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত মিলে।

কেউ কান্দে ঘরের ল্যাগ্যা কেউ বা কাঁদে রইয়া।
অভাগিনী নারী কান্দে সোয়ামি না পাইয়া॥

* * * *

যে নারীর পতি নাই কিবা আছে তার।
চেড়াগ নিবাইলে যেমন দুনিয়া অন্ধকার॥
ধনজন থাউক শত তাতে কিবা আসে যায়।
চাঁন্দ যদি নাহি থাকে কি করিবে তারায়॥

পতি গীতির মধ্যে নারীকে পুরুষের শোভারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে নারীর গৌরবের হানি হয় নাই। কমলমনি গানের একস্থানে অনুরূপ ভাবসম্পদ আছে।

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা,
জলের শোভা তরী।
দেখ আন্ধাইর ঘরে প্রদীপ শোভা,
পুরুষের শোভা নারী॥

উত্তর বঙ্গের চলমল সাধুর গানের মধ্যে উক্ত অংশের সহিত সামঞ্জস্যের সন্ধান মিলে। দেশকালের সীমা পার হইয়া এরকম ভাবধারা বাঙলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চলমল সাধুর গান রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গানের বিষয় বস্তু এইরূপ ; লক্ষ্মীমাতার পুত্র চলমল সাধুর সহিত পাটি গ্রামের শাখ রাজার কন্যা দুবুলা সুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহে ধন সম্পদ নিঃশেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মীমাতা পুত্র চলমলকে বাণিজ্য করিতে আদেশ করিলেন। সাধু বিদেশ যাইতে বদ্ধপরিকর হইলে, তাহার প্রিয়তম পত্নী দুর্ব্বলা সুন্দরী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। স্বামী না থাকিলে স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ হয়, তাহাই সে প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার স্বামীর নিকট বিবৃত করিতেছে।

খুলাতর শোভা গাছ গাছালি
(র) আস্তার শোভা গাড়ী,
বাড়ীর শোভা ময়না পাখী
পুরুষের শোভা নারী॥
সগ্‌গতে নাইরে চন্দ্র কি করিবে তারা,
যে নারীর সোয়ামী নাই দিনে আঁধিয়ারা
যে নারীর সোয়ামি নাই ভাবিতে জনম যায়॥
যে নারীর সোয়ামি আছে আন্দে বাড়ে খায়।
চৌকিতে নাইরে মৈচ্ছ বক বা কি করে।
যে নারীর সোয়ামি নাই মন বা কেমন করে॥

বহির্জগতে নারীর কিছু করিবার আছে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু সংসারে স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন তাহার আর বেশী কাম্য কি থাকিতে পারে? নীড়ের বাঁধন যখন প্রত্যেককে মানিতে হইবে, তখন স্বামী-সোহাগিনী হওয়া বোধ করি বড় সৌভাগ্যের।

পল্লী গীতিকায় নারীর প্রতি অবিচার করা হয় নাই। পল্লীগীতি রসিক স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের কথার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতে হয় :—"বাঙ্গালার রমণীরা প্রেমকে একটা খেলার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এই রমণীদের প্রেমে স্বর্গ ও মর্ত্তের মিলন সূচিত হইয়াছে। ইহারা প্রেমের জগতে সাধনার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি বিশেষ বাঙালী নারী যে অপূর্ব্ব প্রেম সাধনা করিয়াছেন, কোমলতার ভিতর দিয়া যে সুকঠিন আদর্শ লাভ করিয়াছেন— কুসুমাকীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া দুর্গম পন্থার অভিশাপকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহার নিদর্শন এই গীতিকাগুলির পত্রে পত্রে পাইবেন।"

CALCUTTA UNIVERSITY Sec. No...

মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধে মেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু আলাপ করেছি। মেয়েদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, বর্ত্তমানে কোন রকমের শিক্ষা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে, এই সময়ে আমি সে কথা বলতে চাই।

চলার পথে চলে ঠেকতে ঠেকতে বর্ত্তমানে আমরা এমন এক যায়গায় এসে পৌচেছি, যেখানে আসার কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী দিনে অর্থাৎ শিক্ষার প্রারম্ভকালে কেউ করেন নি। সে দিনে কেউ ভাবেন নি—আমরা নিচেয় নামছি অথবা উপরে উঠছি, লক্ষ্য ছিল দূরের পানে, সেই মরিচীকাই সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিল!

সে দিনের সেই মোহময় আবেগ এখন কেটে গেছে; বরাবর হোঁচট খেতে খেতে এতদূর এসে পড়ে আমরা আজ থমকে দাঁড়িয়ে গেছি, সামনে পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ পিছন ফিরে দেখবার সময় এসেছে আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, পূর্ব্বাপর ভাবা বা বিবেচনা করার শক্তি জেগেছে দেখছি—আমরা কি দিয়েছি কি পেয়েছি।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সেই প্রথম যুগে ছেলেদের মধ্যে আবার একটা আলোড়ন এসেছিল যে কোনক্রমে কয়েকটী মাত্র ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেই চাকরী মিলবে। এই জন্যই যে যার জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করে শিখতে গিয়েছিল ইংরাজী ভাষা এবং চাকুরীর জন্য লালায়িত হয়েছিল।

এ আলোড়ন শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, মেয়েদের মধ্যেও অল্পে অল্পে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, উপস্থিত সে আলোড়ন পূর্ণ মাত্রায় চলেছে। আজ এই সময় এসে পৌছে আমাদের দেখবার, তুলনা করবার সময় এসেছে—দেখছি আমাদের সংসার, আমাদের জীবনপথে চলতে আমরা কতকটা লাভবান হয়েছি।

শিক্ষার উপকারীতা বুঝেই বর্ত্তমানে আমাদের এই বাংলাদেশে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং আরও হবে যেখানে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে। নিজেদের উন্নতি অবনতি বুঝবার সময় এসেছে, সেইজন্যই কেউ আর কোন দিক দিয়ে ছোট হয়ে থাকতে চায় না। জাতীয় জীবনের অপরিপূর্ণতা আজ স্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে, প্রত্যেক ত্রুটি কেড়ে নেওয়ার জন্য সকলেই তাই আজ তৎপর হয়েছে। শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষার ধারা কি রকম হবে, কি রকম ভাবে শিক্ষা দিলে, যে জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষালাভ করা যায় তা সার্থক হবে, সেইটী ঠিক করাই আমাদের প্রধান এবং প্রথম বলা।

ছেলেদের দিক দিয়ে উচ্চ শিক্ষার ফল স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একই বাঁধাধরা নিয়মে শিক্ষালাভের ফলে শিক্ষাকালের পরবর্ত্তী জীবন তাদের কাছে দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এ দেশে বর্ত্তমানে কেবল জ্ঞান লাভই নয়, মূলে লক্ষ্য রয়েছে উপার্জ্জন করা, এবং অধিকাংশ স্থলে এই উপার্জ্জন হয় চাকরী দ্বারাই। আজকাল চাকরী পাওয়া যে দুষ্কর হয়ে উঠেছে এ কথা কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। এই বেকার সমস্যা দিন দিন অধিক পরিমাণে বেড়ে উঠেছে, এবং সেইটী লক্ষ্য করেই নানা রকম কার্য্যকরী, অর্থকারী শিক্ষাও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও বেকার সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বেকারদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী, অথচ চাকরীর বাজারে তারা স্থান পাচ্ছে না। যে ছাঁচে ঢালা শিক্ষা তারা লাভ করেছে তাতে তারা চলবার পথের কোনও ঠিক পায় না। শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল তা ফুরিয়ে গেছে, চাকরীর বাজার পূর্ণ হয়ে গেছে, কোন ছোট কাজে তারা আর যেতে পারে না কারণ তাদের আশা অপরিমিত আর সেই জন্যই তারা হতাশ্বাসে গুমিয়ে মরে।

মেয়েদের মধ্যেও ঠিক এই একই ছাঁচে শিক্ষা প্রণালী চলেছে, যার ফলে গড়া চলে স্কুল টিচার, ডাক্তার, প্রফেসর, ব্যারিষ্টার বা অ্যাড্‌ভোকেট প্রভৃতি। মেয়েরা এরোপ্লেনে, মোটরদৌড় প্রভৃতির প্রতিযোগীতাতেও নেমেছেন,—এতে

প্রমাণ করে, মেয়েরা দুর্ব্বলা নয়, পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় এঁরা ও সমকক্ষ স্থান অধিকার করতে পারেন। বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রমাণ করেছে মেয়েরা ছোট নন,—পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা লাভ করার যোগ্যতা তাঁদেরও আছে।

বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে যে সব মেয়েরা নেমেছেন তাঁদের সংখ্যা আজ কম থাকলেও দু চার বৎসরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে মনে হয়। আজ যেখানে চলছে জয়গান, কাল সেখানে জাগাবে ঈর্ষা, এতটুকু জায়গা পাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি—হাতাহাতি—মারামারি। চাকরীক্ষেত্র বা ব্যবসাক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকবার মত শক্তি মেয়েরা হয়তো পাবেন,—শিক্ষাই তাঁদেরকে এ শক্তি লাভ করবার সুযোগ বা সুবিধা এনে দেবে, কিন্তু তাতে আমাদের সংসার গড়বার কি সাহায্য হতে পারবে, প্রথমে সেই প্রশ্নই মনে জাগে।

এই ছাঁচে ঢালা শিক্ষা মেয়েদের এমন এক জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেছে—যেখান হতে ত্যক্ত স্থানে ফিরে যাওয়াও কষ্টকর। অনেক মেয়ে পরিবারের আবেষ্টনীর বাইরে বোর্ডিং বা মেসে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হন, যেখানে তিনি নিজেই নিজের, পরিবারের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগ থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগ থাকে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যা পড়তে এসে ধনীকন্যার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে গিয়ে আপনার অজ্ঞাতে বিলাসিতা বাড়িয়ে তোলে, এবং এরপরে ব্যবহারিক জীবনে এর জন্য কষ্ট পেতেও হয় বড় কম নয়। পরিবারের আবেষ্টনীর মধ্যে যদি তাকে ফিরে আসতে হয়, দেখতে পায় সে অনেকদূর সরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট ঘটেছে।

বিলাসিতা আপনার অজ্ঞাতসারে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যখন তার বীভৎসতাও আর চোখে পড়ে না। এরই ফলে সরল স্বাভাবিকতা ঘুচে গিয়ে তার স্থলে এসে পড়েছে কদর্য্য কৃত্রিমতা, কেবল পোষাক পরিচ্ছদে নয় কেবল বহিঃসৌন্দর্য্যে নয়, মনের উপরে তার প্রভাব পূর্ণভাবে থাকে।

এই সমস্ত দিক দেখে আমাদের মনে হয়, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত, যা তাদের নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারবে। সহজ সরল আড়ম্বরহীন বেশভূষা অনেক অর্থ ব্যয়ের প্রতিকূল--ইহাতে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়। সহজ সরল ভাবে জীবন যাপন প্রণালী বিধিবদ্ধ করে দেওয়া সঙ্গত এবং শিক্ষাও যাতে জীবন যাপনের জন্যই হয় আজ সেই রকম ব্যবস্থা করাই দরকার। কল্পনা কল্পনাই মাত্র, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই সব সময়, এই কথাটি তাদের মনে জাগিয়ে দেওয়াও উচিত। যে শিক্ষা করে শান্তি না এনে অশান্তি উৎপাদন করে, মনকে কেবল বহির্মুখী করে রাখে, তাকে প্রকৃত শিক্ষা কোনদিনই বলা চলে না।

ছেলেরা একে ছাঁচে ঢালা শিক্ষালব্ধ ডিগ্রী পেয়ে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে, দিন দিন বেকার সমস্যা বাড়িয়ে তুল্‌ছে, মানুষ হওয়ার ইচ্ছা থাক্‌লেও মানুষ হতে পারছে না, মেয়েরাও ঠিক সেই রকম শিক্ষালাভ করে ঘরে বাইরে অশান্তির মাত্রাই বাড়িয়ে তুলবেন বলে অনেকে মনে করেন। উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র সকলের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব, শক্তিশালী পুরুষ এতদিন নির্ব্বিবাদে যে সব স্থানে নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছে, সন্ধিসূত্রে তাহ'তে কিছু ছেড়ে দিলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রে যে নিজের কায়েমীস্বত্ব সে ছাড়বে না, সেও জানা কথা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ মেয়েদেরও অন্ধ করেছে, কেন্দ্রচ্যুত করেছে এবং তারা নিজেদের স্থান হারিয়ে চলেছে বাইরের দিকে এখনও। শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে দেশের তথাকথিত জাতি, রক্ষা পাবে।

আমরা তাই বলি, মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথম ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার হয়েছে—সেখানে কেবল ডিগ্রী দিলেই সব ফুরিয়ে যাবে না, সত্য সত্য সেখানে মেয়েদের গঠন কাজ চলবে। এখানে শিক্ষা দিতে হবে সরল গার্হস্থ্য জীবন যাপনের, তাদের আদর্শ গৃহিণী হওয়ার, স্ত্রী হওয়ার, মা হওয়ার। জার্ম্মাণীর দিকে মাতৃমঙ্গল, শিক্ষায়তন আজ গড়বার প্রয়োজন হয়েছে এই জন্যই—উচ্ছৃঙ্খলতার

হাত হতে গৃহলক্ষ্মীদের ফিরানো—ঘরকে সুন্দর করে তুলবার উদ্দেশ্যে। মেয়েদের শিক্ষাটকু হবে এইখানে, সংসারকে রমণীয় ও সুন্দর করে তুলতে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পানে চেয়ে আমরাও আজ তাই চাই—চাই সত্যকার মা—সত্যকার স্ত্রী, সত্যকার কন্যা। কে দেশের ভাবী বংশধরকে আনবে, দেবে অনুপ্রেরণা, সাহস ও দুর্ব্বার শক্তি। শুধু উচ্চ ডিগ্রি লাভ নয়, কেবল বাইরের কাজও নয়। আমাদের দেশের শিক্ষালয় সমূহে আমরা সেই রকম ব্যবস্থা করতে বলি। কেবল পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ বা নোট করা নয়, সংসার গড়বার উপাদান দিয়ে মানুষ গড়তে হবে—জাতির জননীকে গড়তে হবে।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালে মহিলার দান।

গত মাসে আমরা সাধ্বী কমলা ঠাকুরের যক্ষ্মা হাঁসপাতালে প্রদত্ত দানের কথা বলিয়াছিলাম। আর একটি সাধ্বী মহিলা, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা মল্লিক মহোদয়া তাঁহার পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে একটি বিভাগ স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গালার মহিলাগণ নিজ নিজ স্ত্রীধন ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেশের যক্ষ্মা-রোগাতুরদের কল্যাণে চিত্ত নিয়োগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই আদর্শে বহু ধনী নারী অনুপ্রাণিত হইলে দেশ ধন্য হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত ছাত্রী-আবাস পরিদর্শন।

অধুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে, কলিকাতা মহানগরীতে কলেজে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৎসর বৎসর বহু ছাত্রীকে কলিকাতায় বাসের জন্য আগমন করিতে হয়। তাঁহারা না পান থাকিবার উপযুক্ত আবাস, না মিলে দরদী অভিভাবক। এই অবস্থায় তাঁহাদের যেমন পাঠের ব্যাঘাত হয়, তেমনিই নানা সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাসগুলি পরিদর্শন এবং স্বাস্থ্যকর রাখিবার খবরদারী করিবার নিমিত্ত এবং ছাত্রীদের অন্যান্য সুখ দুঃখ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি স্থায়ী হোষ্টেল ইনস্‌পেকট্রেস্ নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত লাবণ্য লেখা ব্যানার্জ্জি বি-এ এই পদে নিযুক্তা হইয়াছেন। তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে টীচিং ডিপ্লোমা বিভাগে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী ডিভিজনে অস্থায়ী ভাবে সরকারের এসিষ্টেণ্ট্ ইনস্‌পেকট্রেস্ অব স্কুলের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের অনেক অভাব মোচন আশা করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এই পদের জন্য ১২৫৲ টাকা মাহিনা এবং যানবাহনের ভাতা স্বরূপ আর ৫০৲ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ছাত্রী হিতকারী কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ধন্যবাদার্হ।

ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার বিভাগ ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শরীর উন্নতির জন্য নানাবিধ উপায় ও বিধি প্রচলন করিয়া ছাত্র সমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছে।

এই বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ অনাথ নাথ চাটার্জ্জি খেলা ধূলা, ব্যায়াম, সন্তরণ, লেকে নৌ-বাচ খেলা, গড়ের মাঠে ফুটবল টেনিস খেলা আদি বহু ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রদের পরম কল্যাণ করিতেছেন।

এই বিভাগ ছাত্রীদের স্বাস্থ্য খবরাখবরি করিবার জন্য এবং স্বাস্থ্য ও শরীর সুগঠনের নিমিত্ত নানা মত ও পথ দেখাইতে একজন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্তা সুবর্ণ মিত্র এম, বি, এই পদে নিযুক্ত আছেন। পরিদর্শনের জন্য তিনি ৭৫৲ ভাতা পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য্য করিবার জন্য রেঙ্গুণের সুপ্রতিষ্ঠিত মেয়ে ডাক্তার মিস্ অগিলভী রায় বি-এ, বি-টী এম-বি মহোদয়া নিযুক্তা হইয়াছেন।

পুরী বিধবাশ্রম

(উড়িষ্যার গভর্ণর বাহাদুরের শিল্প বিভাগের পরামর্শদাতা মিঃ ডব্লিউ, এইচ্ এন্‌সোর্জ্জের পত্নী কর্ত্তৃক পুরী বিধবাশ্রমের সম্পাদিকা শ্রীযুতা হেমলতা দেবীর নিকট প্রেরিত পত্র)

কটক
উড়িষ্যা
৫।৫।৪০

প্রিয় মিসেস্ ঠাকুর,

পুরী বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাফ করিয়া আপনি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আশা করি শীঘ্রই একদিন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

এই আশ্রমটী বহু বিধবাদের জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য যে কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে, তৎপ্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি ও আগ্রহ আছে, আশ্রমটী প্রকৃতই একটী সুন্দর প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমটীতে যাহাতে আরও বেশী সংখ্যক বিধবাদের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা কিন্তু বুঝিলাম আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আশ্রমটীর কলেবর বৃদ্ধি করা আপাততঃ সম্ভবপর হইতেছে না। যাহা হউক, আমি আশা করি এই আশ্রমটী ক্রমশঃ সাধারণের সাহায্য লাভ করিবে; কারণ ইহা সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার মত একটী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

আপনি আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

ইতি —আপনার একান্ত বিশ্বস্ত—

স্বাক্ষর—(মিসেস্) ডব্লিউ, এইচ্ এনসোর্জ

সেনহাটী মহিলা সমিতি

সেনহাটী, খুলনা—বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ১৯৩৯

নারীমঙ্গল কার্য্য :—

(ক) শিল্প বিদ্যালয় :—

গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে এই সমিতি একটি স্থায়ী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই বিদ্যালয় কলিকাতা সরোজনলিনী নারী শিল্প বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত এবং উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে বর্ত্তমানে উহা উক্ত কেন্দ্র শিল্প বিদ্যালয়ের শাখা শ্রেণী ভুক্ত। এই শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এখানকার পাঠ শেষ করিয়া সরোজ নলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের শেষ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে দুইটী ছাত্রী উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর তিনটি ছাত্রী পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২টি পাশ করিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয় সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, সরকারী শিল্প বিভাগ এবং গ্রাম্য চাঁদার সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্যবর্ষে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, সরোজনলিনী নারী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন এবং সরোজনলিনী ট্রেনিং স্কুলের অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেব এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এই বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন এবং ইহার কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। পল্লীগ্রামের এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক মাত্রেরই প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(খ) শিল্প প্রদর্শনী :—

আলোচ্য বর্ষে দৌলতপুর কৃষি কলেজে যে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হয় তাহাতে এই সমিতি একটি বিশেষ ষ্টল লইয়া-

ছিল। এবং সমিতির সভ্যগণের প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্প কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রায় বাহাদুর নলিনীনাথ মজুমদার মহাশয় সমিতিকে ১০্ টাকা পুরস্কার দান করেন। সমিতি প্রতিষ্ঠিত শিল্প বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সময়েও এখানে একটি শিল্প ও শিক্ষা প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীটিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

(গ) ব্রতচারী সংঘ :—

গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির প্রচেষ্টায় গ্রামে একটি মহিলা ব্রতচারী দল সংগঠিত হইয়াছে। এই ব্রতচারী দল গ্রাম হিতকর বহুকার্য্য সাধন করিয়া গ্রামবাসী মাত্রেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। নিয়মিত ব্রতচারী নৃত্যের সাহায্যে গ্রাম্য মেয়েদের স্বাস্থ্য উন্নতির সুবন্দোবস্ত এই সংঘ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রিয় ব্রতচারী সংঘের সংগঠন সচিবের নিমন্ত্রণে স্থানীয় ব্রতচারী বালিকাগণ দৌলতপুর কলেজে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন মণ্ডপে ব্রতচারী নৃত্য দেখাইয়া সমবেত সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(ঘ) সাধারণ শিক্ষা :—

এই সমিতির সাহায্যে এবং একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে বয়স্থা বালিকাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষায় উপস্থিত করিবার জন্য বিশেষ কোচিং ক্লাস খোলা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই ক্লাসের ৮টি বালিকা ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ছয়টী বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কিই না-করা চলে!

'চা নিয়ে কি না করা যায়!' সম্প্রতি দিল্লীর একখানি কংগ্রেস্-পন্থী কাগজে এই প্রশ্ন তুলেছিলো। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করে' তা'রা লিখেছিলো :

"বোম্বাই কিম্বা কলকাতার অবসন্ন মজুরদের আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেন তারা যন্ত্রপাতি রেখেই চা খাবার জন্য চায়ের দোকানের দিকে ছোটে; জিজ্ঞাসা করতে পারেন ক্লান্ত আইনজীবীকে, কেন খুনের মোকদ্দমায় সওয়াল করেই সে এক পেয়ালা চা চায়; প্রশ্ন করতে পারেন ডাক্তারকে, একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার শেষ করেই সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় কেন; আমাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, একটা প্রবন্ধ শেষ করেই কেন আমি এক পেয়ালা চা চাই। এর জবাব হচ্ছে—"চা যে অপূর্ব্ব অনুভূতি পাবার জন্য।"

চায়ের থেকে যে অনুভূতি পাওয়া যায় তা সব সময় ঠিক বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে দেখা দেয়। কিন্তু এই অনুভূতি সম্বন্ধে অন্তত একটা বিষয়ে চা-রসিকদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা যায় না—সেটা হচ্ছে এই যে চা শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

একজন আমেরিকান্ বলেছেন, "চা অতি চমৎকার তেজোদায়ক পানীয়"। চায়ের তেজোদায়ক, শক্তিদায়ক ও শীতগ্রীষ্মের গ্লানি দূর করবার শক্তির কথা উল্লেখ করে' ইনি লিখ্‌ছেন :

"যখন ভাবি যে মুষ্টিযোদ্ধা ও কলেজের নৌকা বাইচের দাঁড়িদের শিক্ষানবিশ করবার সময় নিয়মিত চা খেতে হয়, আর ফুটবল খেলার ট্রেইনাররা খেলার বিশ্রামের সময় খেলোয়াড়দের গরম চা খেতে দেয় তখন স্বভাবতই একথা মনে হয় যে চা "ফুলের-ঘায়ে-মূর্চ্ছা-যাওয়া অনুভূতি" জাগানো পানীয় নয়।

চা নিজের গুনেই সবচেয়ে ভালো শীতল পানীয়ের পদ তো দাবি করতে পারেই (আমেরিকান্‌রা বরফ দিয়ে চা খায়), তা ছাড়া চা দিয়ে আরো অনেক রকম গ্রীষ্মের পানীয় তৈরি করা যায়। মাঝে মাঝে যখন মুখ বদলাতে ইচ্ছে হবে তখন আধপেয়ালা চা খুব কড়া করে' তৈরি করে একটা বড় গ্লাস্-এ ঢেলে নেবেন। তার মধ্যে ফেলে দেবেন দু টুকরো পাতিনেবু, খোসা টোসা সুদ্ধু। সেই নেবু খানিকক্ষণ গরম চায়ে ভিজ্‌তে দেবেন। তারপর মেশাবেন একটু চিনি, একটুখানি অরেঞ্জ বিটার্‌স্ আর তিন চার টুক্‌রো বরফ। এবার জিঞ্জার এইল দিয়ে গ্লাসটা ভর্ত্তি করে নেবেন। তারপর সব একসঙ্গে নেড়ে নিয়ে দেখবেন যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন পাবেন একটা উপাদেয় জিনিষ—এমন জিনিষ যা গরম পড়্‌লে সত্যিই উপভোগ্য।"

সত্যই চা নিয়ে কি না করা যায়?

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী

পঞ্চদশ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৭ | ৮ম সংখ্যা

শ্বেত পদ্ম

শ্রীহেমলতা দেবী

রংএর বাজারে মোর লেনাদেনা সব
চুকায়ে ফেলেছি, তাই বৃথা কলরব
পশেনা হৃদয়ে মোর, জাগায় না ব্যথা
জানায় না সেথা প্রিয়-বিরহের কথা।
প্রিয়েরে রেখেছি ধরে নিবিড় অন্তরে
বর্ণ যার স্বর্ণ রেণু, মর্ম্মে রহি' ভরে
সুগন্ধে পূরিয়া তোলে প্রাণকোষখানি—
আনন্দ বারতা তার, জানি ওগো জানি,
সর্ব্বগামী বায়ু বহে সবার সকাশে
দিকে দিকে জনে জনে প্রকাশে উল্লাসে।
বলে "জল ছলছল" স্বচ্ছ সরোবর,—
দাঁড়াও ক্ষণেক থামি' হে পথিক বর
বর্ণলেশ করি শেষ জাগে পরিমল
গন্ধে ভরা দিব্য তনু শুভ্র শতদল।

উত্তর চীনে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

চীন সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমানায় সাংসী প্রদেশে "সৌলি" নদীর তীরে দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন ইউয়াং কাং সহরের প্রান্তে একটি সুদৃশ্য নীল পাহাড়ের গাত্রে এক বৌদ্ধ বিহার পর্ব্বতবপু কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"আজিও অর্দ্ধ জগৎ জুড়িয়া
ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর"

সেই বুদ্ধদেবের এক বিশাল মূর্ত্তি ও নানা বুদ্ধ ও ভারতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্বলিত গুহা এখনও অটুট অবস্থায় অবস্থিত। ভারতের ন্যায় বিধর্ম্মীদের অত্যাচারে এই সুমহান গুহা এবং অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভার বিধ্বস্ত হয় নাই।

বর্ত্তমানে এই ইউয়াং কাং (Yun kang) গুহা নবপ্রতিষ্ঠিত ইনার মোঙ্গলীয় (Inner Mongolia) রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজসরকার এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহাটি সুসংস্কৃত করিয়া এবং পুষ্প উদ্যান রচিয়া মনোরম করাতে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করিতেছে।

ইউয়াং কাং-এর গুহা দেখিলে ভারতের সংস্কৃতি, শিল্প সৃষ্টিতে বৌদ্ধ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিকিং হইতে সানীয়ান পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ রেলপথ গিয়াছে তাহারই উপর কালগাং ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া টাটুং সহরে গমন করিতে হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পুরান নগর,

গুহার দৃশ্য : সম্মুখে বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি

কালের প্রভাবে ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুরাগ অভাবে এই প্রকৃতির সুন্দর লীলাভূমি, মানব শিল্পীর অপূর্ব্ব বিজয়-কেতন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরম পবিত্র স্থান বহু শতাব্দী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল।

প্রাচীর ও দুর্গ এখনও এই সহরে দেখা যায়। বৈকাল হ্রদ হইতে তাতার রাজ এই প্রদেশ দখল করিয়া এই স্থানে ৩৮৬ খ্রীঃ রাজধানী স্থাপন করেন।

টাটুং হইতে ইউয়াং গুহা মাত্র দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

পূর্ব্বে উটের পিঠে চড়িয়া যাইতে হইত। গোবী মরুভূমি পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থান হেতু উষ্ট্রযানই সুবিধাজনক। বর্ত্তমান সময়ে মোটর যানেও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

'সীলি' নদীর তীর হইতেই অদূরে নীল পাহাড়ের উপর কপোত-কপোতীর নীড়ের ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে আলোক প্রবেশের গবাক্ষগুলি অতি মনোরম দেখায়। পুরাকালে গুহার অভ্যন্তরে যাইতে হইলে অনেকগুলি মন্দির ও বিহারের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। সেগুলি কালের প্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার মধ্যে মিং রাজবংশের রাজন্যগণের উদ্যোগে মাত্র তিনটি মন্দির এখন সংস্কার হইয়াছে। এই বিহার ও চৈত্যগুলির গঠন ও পরিকল্পনা দেখিলে বিলুপ্ত হর্ম্ম্যগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার ছাদ উজ্জ্বল নীল রংএর টালীর দ্বারা মণ্ডিত। পশ্চাতের গাঢ় রং এর পাহাড়ের কোলে এই নীল রং এর ছাদের হর্ম্ম্যগুলির সৌন্দর্য্য যেমন পার্থক্য সৃষ্টি করে তেমনই সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া আছে।

প্রথম বিহারের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেই সম্মুখে উহার তিমিরাবৃত পথ ও দ্বার দেখা যায়। প্রথম হর্ম্ম্যের ঢালু বারান্দায় ছাদের নিম্নের স্তম্ভের শিরোপরি চীন দেশীয় শিল্পীদের ধারায় ড্রাগন পশুর ভয়াবহ মুখ গঠিত রহিয়াছে। অবশ্য এইগুলি অতি আধুনিক শিল্পীর প্রস্তুত, প্রধান গুহাবলীর ভাস্কর্য্যের সহিত ইহার কোন তুলনা নাই।

পর্ব্বতখণ্ডের গুহা পরিচ্ছন্ন রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও পরিত্যক্ত আবাসের ন্যায় ঘুঘু ও কপোত শ্রেণী আশ্রয় লইয়া অপরিচ্ছন্ন করিয়া থাকে। একদল স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মশাল দ্বারা গুহার অভ্যন্তরে যাইবার পথ দেখাইয়া থাকে। মশাল আলোকে উদ্ভাসিত গুহাগুলি অতি জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারন করে। পাহাড় কাটিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যে দালান এই গুহায় আছে তাহার উপরের ছাদ—আদত পাহাড়টি একটি বৃহৎ স্তম্ভের দ্বারা রক্ষিত। এই স্তম্ভের গাত্রে ও চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে অজস্র বুদ্ধ বা বুদ্ধশিষ্য মূর্ত্তি খোদিত হইয়া আছে।

এই অতিকায় স্তম্ভটি যেন একটি প্যাগোডা—ইহার চারিদিকে চারিটি বৃহৎ আকারের মূর্ত্তি খোদিত।

গুহার মধ্যে সম্মুখেই প্রকাণ্ড ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি বসিয়া আছে। ইহার চক্ষুর কমনীয়তা এবং গঠন পদ্ধতি ইউয়াং কাং-এর শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। মস্তকের কোঁকড়ান নীলবর্ণের কেশগুচ্ছ সোণালী বর্ণের বহুভাজযুক্ত অঙ্গবাস এবং লম্বা কর্ণ এতদ্দেশীয়. বিশেষতঃ জাপানের বুদ্ধ মূর্ত্তির নিদর্শন। কিন্তু ইহার চক্ষের পবিত্র জ্যোতি এবং মুখমণ্ডলের প্রশান্ত ভাবে ভারতীয় শিল্পীর সাধনার ধারার প্রভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। নির্ম্মম প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইলেও বক্ষের ও অঙ্গবাসের ভাঁজের নিম্নে অস্থিমাংসের ভাব বাটালির ঘায়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছে সেই অপূর্ব্ব শিল্পী।

ঐরাবৎ পৃষ্ঠে ইন্দ্র

স্তম্ভের ডান ও বাম পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি স্বর্ণ স্তবকে মণ্ডিত হইয়া উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। ইহার উপরের ছাদের তলায় অসংখ্য ছোট ও বড় বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিশালায় পরিণত হইয়াছে।

দুইটি উচু সিঁড়ির ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া উঠিলে অভ্যন্তরের গুহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রীমান মৈত্রেয়ী'র মূর্ত্তি স্থাপিত। মস্তকের চুড়ার উপরে এক প্রদীপ্তমান মুখমণ্ডল দর্শক-মাত্রেরই চিত্ত পুলকে ভরিয়া দেয়। বস্ত্রের বহু

ভঁাজ এবং নানা অলঙ্কারে সেই যুগের মানবের সামাজিক রীতি প্রকাশ পায়। সম্মুখে রক্ষিত এক অশ্ব মূর্ত্তিও অতি ভক্তিভরে বুদ্ধদেবের চরণে প্রণতি জানাইতেছে! এখনও প্রাচীন শিল্পীর নিপুণতা নীল, খয়েরী এবং সবুজ বর্ণের রং ফলানতে প্রমাণ হইতেছে।

গুহার ৷ত্তলের গবাক্ষ হইতে নিম্নের যে অতিকায় বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা যেন সহজেই স্পর্শ করা সম্ভব মনে হয়।

অন্যান্য গুহায় মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী নিম্নস্তরের শিল্পীদের দ্বারা সংস্কৃত হওয়াতে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মূর্ত্তির গঠন ও ভাব অতি উচ্চাঙ্গের এবং এই সমস্ত মূর্ত্তিই ভারতীয় দেবদেবীর আদর্শে, ভারতীয় শিল্পীর সাধনার ধারায়, বৌদ্ধ তাপসদের মহিমায় গঠিত ও খোদিত হইয়াছে।

সহস্র বুদ্ধ মূর্ত্তি

শুধু বৌদ্ধ ধারায় কেন, হিন্দু শিল্পীদের আদর্শে বহু মূর্ত্তির নিদর্শন এই গুহাগুলির ভাস্কর্য্যে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষু ও পরিব্রাজকগণের বিনম্র প্রশান্ত মুখমণ্ডল এবং তাহাদের হাঁটু গাড়িয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রণাম পদ্ধতির মূর্ত্তি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। চীরবাস লুণ্ঠিত যুক্তপাণি, নিমীলিত চক্ষু এই মূর্ত্তিগুলি ভারতীয় সাধনার প্রতীক্।

বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, ঐরাবত উপরে ইন্দ্র মূর্ত্তি, পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিব মূর্ত্তিগুলি হিন্দুর পৌরাণিক ঘটনাবলীর সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুদূর এশিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্তে ভারতীয় সাধনা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল জানিলে ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

গুহার অভ্যন্তরে যে অগণিত বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহা বিভিন্ন ধারায়, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নূতন নূতন ভাবে খোদিত হইয়াছে। কোনটি পদ্মাসনা, কোনটি ভূমিস্পর্শা, কোনটী বা ধ্যানী, কোনটি বা সাধারণ মানব আকারে নির্ম্মিত।

বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি

শুধু মূর্ত্তি গঠনে নহে, পুষ্প পত্র পদ্ম, লতা, বৃক্ষ আদি খোদনেও ভারতীয় শিল্পধারার প্রভাব রহিয়াছে।

তবে অনেকগুলি মূর্ত্তির পরিচ্ছদ, জামা, অঙ্গবাস, অলঙ্কার নানা জাতীয় দেশের রীতি অনুসারে পরিহিত

আছে। এমন কি একটি গুহায় প্রাচীর চিত্রে গ্রীক, রোম, আরব্য, পারস্য, ভারতীয় মানবের সমাবেশ দেখা যায়। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, এই স্থানে এক সময়ে সকল জাতির সমাবেশ হইত। তাহার আদর্শে ও স্মৃতিতে এই চিত্র খোদিত ও অঙ্কিত হইয়াছে।

ইউয়াং কাং-এর গুহাটি এক ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় (হিষ্টোরিকাল মিউজিয়াম) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

একটি মহিলা মূর্ত্তি এই গুহার সহস্র সহস্র মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ ধারার মধ্যে বিস্ময় উৎপাদন করে। তাহার নিবিড় পরিচ্ছদ, স্কার্ট বডিস দেখিলে তাহার জাতি ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না তবে এই মহিলা যে একজন উচ্চবংশীয়া তাহা তাঁহার বেশভূষা হইতে উপলব্ধি হয়।

একটি গুহার প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি নৃত্য পটীয়সীর মূর্ত্তি অতি মনোরমরূপে খোদিত। একটীর মুখমণ্ডলে গ্রীক, অপরটির চীন দেশীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তির গঠন পদ্ধতি ভারতীয় ধারায় গঠিত। মনে হয় এই গুহা নির্ম্মাণের জন্য ভারত হইতে শিল্পীরা বুদ্ধ শ্রমণ ও পরিব্রাজকের সহিত সুদূর উত্তর চীনে গমন করিয়াছিল।

গুহাবলীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ প্রায় ত্রিশ ফীট্‌উর মূর্ত্তি গুহার প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত আকাশতলে অবস্থিত। তাহার কৃষ্ণ বর্ণের দীপ্তিমান চক্ষুদ্বয় 'সী লি' নদীর উপর ন্যস্ত, ইহার কুঞ্চিত কেশ সংযুক্ত মস্তক, পদ্মাসনের ভঙ্গিমায় বসা অবস্থা, ধ্যানরত চক্ষু, বিশাল বক্ষ, সুদৃঢ় বাহু, সুঠাম পদদ্বয় এক বিরাট পুরুষের পরিকল্পনা। দর্শন করিলে ভক্তি ও ভয় উভয়ই সঞ্চার হয়। ভারতের, জাভার এমন কি জাপানের বিশালকায় বুদ্ধ মূর্ত্তি যেমন বুদ্ধের বিশিষ্টতা-পূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তির ভাব প্রকাশ করে এই মূর্ত্তিটিতে তাহার অভাব হইলেও ইহা একটি অপূর্ব্ব শিল্প সৃষ্টি। মূর্ত্তিতে ভারত শিল্পীর প্রভাব বেশ দেখা যায়।

বুদ্ধেরই নাম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বিক্ষিপ্ত মানব মনকে বুদ্ধ স্মরণে আনয়ণ করিবার জন্য অগণিত জনসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্যই এই গুহাটিতে শত সহস্র বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। তাহা যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনই প্রাণবন্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছ' মন্ত্রবাক্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

অনিন্দিতা

উপন্যাস

শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী

জনকোলাহল মুখর কলিকাতা নগরীর রামবাগান লেনের —নং বাড়ীতে তখন বিবাহের সানাই বাজিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। গোধূলি লগ্নে অনুর বিবাহ। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়ে এবং নব বিবাহিতা বৌ ঝীয়েরা বর আসিবার প্রতীক্ষায় উৎসুক আগ্রহে দুপ্রহর হইতেই অপেক্ষা করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময় হইবার পূর্ব্বেই, যেন বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এই রকম ভাব দেখাইয়া তাহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য লইয়া উপরে নীচে বার বার ছুটাছুটী করিতেছে।

এমন সময় দূরে গলির মোড়ে বর আসিবার বাজনা "গোরা-ব্যাণ্ড" শোনা গেল। কন্যাকর্ত্তাগণ তাড়াতাড়ি দরজার নিকট গেলেন; ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াইয়া জানালায় বারান্দায় রাস্তায় যে যেখানে পারিল স্থান করিয়া লইল। উপরে পুর ললনাগণ বর দেখিবার জন্য ছাদের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। যাহাদের কোলে শিশু অথবা হাতে কাজ ছিল, তাহারা দৌড়াইয়া ছাতে যাইতে না পারায়, অতি ব্যগ্র-ভাবে আসিয়া ঘরের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইল, সকলেরই ভাবখানা—যাহার ভাগ্যে বরের দর্শন আগে মিলিবে সেই যেন অক্ষয় মুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষ পাইবে।

বিবাহের যে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া "কনে" সেও বালিকাসুলভ চপলতা প্রযুক্ত দৌড়াইয়া জানালার কাছে গেল বর দেখিতে—ভুলিয়া গেল আজ সে "বিয়ের কনে"—যে বর দেখিতে সকলের এত ব্যস্ততা, এত উৎসুক প্রতীক্ষা, সে বর সকলকেই দেখিতে আছে, কিন্তু তাহাকে নাই। তাই যখন সে জানালার নিকট গিয়া খুড়তুত ছোট বোন নীরুকে বলিল—"তুই একটু সরে দাঁড়া না ভাই নীরু, আমিও বর দেখি।" তখন নীরু সরিয়া গিয়া দিদির জন্য একটু স্থান করিয়া দিলেও, সম্পর্কীয়া দিদি, বউদি, নব বিবাহিতা জ্যাঠতুত খুড়তুত বোনেরা অবাক বিস্ময়ে অনুর মুখের দিকে চাহিল—যেন ভূ-ভারতে এমন কথা কেহ কখনো শোনে নাই যে বিয়ের 'কনে' নিজের বর দেখিতে দৌড়াইয়া যায়।

অনুর নতুন বৌদি বলিয়া উঠিলেন—

"বাব্বা, কি বেহায়া মেয়ে তুই অনু! কোথায় লজ্জায় ঘরের এক কোণে চুপটী করে বসে থাকবি, না বাজনা শুনেই তুই দৌড়ে এলি নিজের বর দেখতে; তাও আবার লুকিয়ে ছাপিয়ে নয়, আমাদের সকলের সঙ্গেই। আমরা হ'লে লজ্জায় মরে যেতুম ভাই। তোর দাদা যখন গিয়েছিলেন অমনি বর সেজে বিয়ে করতে, তখন সেই বাজনা শুনেই আমার এমন লজ্জা হয়েছিল যে পরে বিয়ের সময় আমাকে নিয়ে পিঁড়ীতে বসাতেই না সবাইকে কত টানাটানি করতে হয়েছিল; আর তুই ভাই নিজেই কি করে বর দেখতে দৌড়ে এলি—।"

এই বলিয়া তিনি অপরাপর সব সঙ্গিনীদের প্রতি চাহিয়া একটু মুরুব্বী চালে হাসিলেন, এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার সে হাসিতে যোগ দিল। এই নতুন বৌদি অনুদের বাড়ীতে বধূ হইয়া আসিয়াছে মাত্র দুই বৎসর হইল, কোলে তাহার দেড় মাসের শিশুপুত্র, এবং বয়সে তিনি অনু অপেক্ষা মাত্র তিন বৎসরের বড়; কিন্তু অনুকে ধমকানর ভঙ্গিমায় তিনি যেন এ সংসারের কত কালের গৃহিণী, প্রবীণা নারী।

নতুন বৌদির কথায় অনুর মনে লজ্জার চাইতে অভি-মানই প্রবল হইল।

সে উত্তর দিল—"কেন তোমরা সকলেই যদি বর দেখতে পার, শুধু আমি দেখলে যত দোষ। চাইনা আমি তোমাদের অমন ছাই বর বিয়ে করতে।" বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। অকারণ দুঃখে অভিমানে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

ঘরের এক কোণে অনুর বড় বৌদি তাঁহার রুগ্ন কোলের সন্তানটীকে দোলা দিয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে সবই দেখিতে

ও শুনিতে ছিলেন। অনুর জন্য তাহার মাতৃহৃদয়ের কোণে একটা স্নেহ ছিল; অভিমানী দুরন্ত অনুকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; তাই অনুর জলভরা ছলছল চোখ তাহার মনে ব্যথার সঞ্চার করিল। মাতৃহৃদয় বলিয়া উঠিল—"আর কি, ছেলে খেলা ত ফুরাইল, কয় ঘণ্টারই না মাত্র ব্যবধান, তারপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই দুরন্ত চঞ্চলা বালিকা যাইবে অন্য ঘরের বধূ হইয়া।

তিনি অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া অনুর কাছে আসিয়া তাহার কোমল ছোট দুইখানি হাত নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইতেই অনুর চক্ষের জল আর বাধা মানিল না; সে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিয়া বড় বউদির বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—

"ওরা আমায় বর দেখতে দিলে না, আমি ও বর বিয়ে করব না বড়বউদি।"

বড়বউদি স্নিগ্ধ হাসিয়া আদর করিয়া ননদিনীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "দূর বোকা মেয়ে, আজ যে তুই "বিয়ের কনে" তোকে কি আজ শুভদৃষ্টির আগেই নিজের বর দেখতে আছে? আমরা সবাই আগে তোর বর দেখব, কিন্তু তুই তখন দেখ্‌তে পাবি না সেই ত মজা। আবার তোর বরও আমাদের সবাইকে আগে দেখ্‌তে পাবে কিন্তু তোর মুখ দেখ্‌বে ঠিক্ শুভ দৃষ্টির সময়। বল ত দেখি সে কেমন মজা; কিন্তু তা না হয়ে যদি আগে থাক্‌তেই বর ক'নের দেখা হয়ে গেল, তবে আর শুভদৃষ্টির কি মূল্য রইল?"

বড়বউদির কথায় অনুর অভিমান কাটিয়া গিয়া মনটা বেশ হাল্কা হইল। সে বড় বউদিকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লে।

তখন বড়বউদি বল্‌লেন—

"তুই এখানে একটু চুপ করে বসে থাক্ আমি বর দেখে এসে বসছি। তা ছাড়া ফুলীই তোকে খবর দিয়ে যাবে কেমন বর।"

এই বলে বড়বৌদি অনুকে যথাস্থানে বসিয়ে বর দেখতে গেলেন।

ইতিমধ্যে অর্দ্ধেক প্রসেশন অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, বর সমীপবর্ত্তী—বরের আট ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া অনুদের বাড়ীর দরজায় থামিল। (প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বর হয় চতুর্দ্দোলে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে আসিত, মোটরকারের তত রেওয়াজ ছিল না)।

পূর্ব্বোক্ত ফুলী—অনুর সম্পর্কীয়া বউদি, অল্প বয়সে মাতৃহীনা হওয়ায় ওবাড়ীতে তাহাকে কেহ রক্ষণা বেক্ষণ করিবার না থাকায়, অনুর এক দূর সম্পর্কের খুড়তাত ভাইয়ের সহিত সাত বছরের ফুলীর বিবাহ দিয়া, অনুর মাতা ফুলীকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়া নিজের কন্যার মতই পালন করেন। বলা বাহুল্য, দেশে তখন সরদা আইন জারি হইতে বহু বিলম্ব ছিল, কাজেই সাত বছরের ফুলীর উনিশ বছরের ছেলের সহিত বিবাহটা তখন কেহই আপত্তিজনক বা অদ্ভুত মনে করিল না।

ফুলী অনু অপেক্ষা এক বৎসরের বড়, উভয়ে আবাল্য সঙ্গিনী কিন্তু ফুলী অনু অপেক্ষাও বেশী চঞ্চল। অনুর মা ছাড়া সময় বিশেষে ফুলী সকলের কথারই অবাধ্য হয় এবং সব সময় সব বিষয়েই তাহার বুদ্ধিটা যেন একটু কম। কোন সময় কাহাকে কি কথা বলা সঙ্গত ও অসঙ্গত তাহা এই পনর বৎসর বয়সেও ফুলীর মাথায় ঢোকে না।

সেই ফুলী দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল "ও ভাই ঠাকুরঝি, তোর বর এসেছে রে, কিন্তু দেখতে মোটে ভাল নয়। তোর চাইতেও কাল, কেমন যেন বুড়ো "পেটমোটা কার্ত্তিক," "তুম্বোমুখো নারায়ণ" আমার ত মোটে পছন্দ হ'ল না ভাই, তবে দাঁড়া সবটা দেখে আসি।" বলেই আবার ঝড়ের বেগে ফুলী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুর কিশোরী চিত্তে বর দেখিতে না পাওয়ার যে অভিমান সুপ্ত ছিল তাহা আবার জাগিয়া উঠিল, সে তখন নিজ মনেই বলিল—

"ব'য়ে গেছে আমার ঐ বুড় কাল বর বিয়ে করতে, আমি কাল আছি বেশ, কিন্তু আমার বর কাল হ'তে যাবে কেন? আমি জ্যাঠামশায়কে বলে এ বিয়ে করবই না।"

বলা বাহুল্য, অনুর রং একটু কাল। অন্য বাড়ীর পক্ষে অনু শ্যামবর্ণা হইলেও অনুদের বাড়ীতে অনুকে সবাই কাল বলেই জানে; কারণ অনুর মাতা পরমাসুন্দরী, এতখানি বয়স হইয়াছে, বহু সন্তানের জননী হইয়া, মাথার চুল পাকিয়া তিনি আজ বাড়ীর প্রবীণা গৃহিণী, তবু এখনও তাঁহার রং

এত সুন্দর আছে যে চাহিয়া দেখিবার মত। অনুর অন্যান্য ভাই বোনেরাও মায়ের রং পাইয়াছে, কিন্তু অনু পাইয়াছে তাহার পিতা মহিমপ্রসাদের রং, শ্যামবর্ণ। অনু পিতামাতার একমাত্র সন্তান নয়; বহু পুত্রকন্যার ভিতর একটী, তায় আবার বাংলা দেশের কালো মেয়ে তবু পিতামাতার গভীর স্নেহ যেন এই কাল মেয়েটীকেই বিশেষ করিয়া ঘিরিয়া ছিল। অনু একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবারের কাল মেয়ে হইলেও সব দিক হইতে সকলের নিকটেই আদর পাইয়াছিল অপর্য্যাপ্ত এবং গুরুজনের প্রাণভরা ভালবাসা ও মঙ্গলাশীষের ভিতরেই মেয়েটীর চতুর্দ্দশ বৎসরের জীবন কাটিয়াছে, তাই তাহার স্বভাবে অভিমানের মাত্রাটা অত্যধিক।

অনুর জন্মের পর পিতামাতা আদর করিয়া কাল মেয়েটীর নাম রাখিলেন "শ্যামলী" আর তাহার জ্যাঠামহাশয় কাল মেয়ের অন্নপ্রাশন খুব ঘটা করিয়া দিয়া নামকরণ করিলেন "অনিন্দিতা" আর সেই অনিন্দিতাই ডাক নামে পরিণত হইল "অনু" বলিয়া। পিতামাতা বরাবরই তাহাকে শ্যামলী ডাকেন, কিন্তু আর সকলের নিকটেই সে অনু নামে পরিচিতা। সেই শ্যামলা মেয়ে অনুর আজ বিয়ে। যেমন পৃথিবীর নিয়ম, নিজের যা আছে লোকে ঠিক তার উল্টোটী চায়, বিশেষ কাল রং কেহই চায় না, অনুও নয়। তার বাবা কাল, তা হোক, বাবা কাল হ'লেও বেশ দেখায়, কিন্তু বর কাল, সে যে বিশ্রী। কাল মানুষ স্বামী হলে যে স্ত্রীর চোখে ভাল লাগিতে পারে এ নিয়ে অনু কখনো মাথা ঘামায়নি। সে নিজে কাল, কিন্তু সুন্দরের প্রতি তার আকর্ষণ বেশী; তাই ফুলী যখন জানিয়ে দিয়ে গেল, বর সেজে ব্যাণ্ড বাজিয়ে যে এসেছে তার রং কালো, অনুর মন তখন ভাবী বরের প্রতি একান্ত বিমুখ হয়ে বলে উঠল—

"বয়ে গেছে আমার ঐ কাল তুম্বোমুখো" বর বিয়ে করতে।"

এদিকে নীচে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। ব্যাপার কি? না একটু পরেই বরের বাজনা যেন অনুদের বাড়ী ছাড়িয়া গলির সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর গণ্ডগোল, হৈচৈ শানাইয়ের সুর সবই যেন অনুদের বাড়ীতে নিঃশব্দে চুপ হইয়া গেল।

কেন, কি হইল?

অনুর কানে গেল মেয়েরা এ ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"বর এসে আবার চলে গেল কেন ভাই?"

শুনিয়া অনু নিজ মনে বলিয়া উঠিল—

"যাক্ বাঁচা গেল। ঐ কালো "গজদামরা" বরকে ত আর বিয়ে করতে হবেনা। নাই বা হল আমার বিয়ে, বেশত।"

তখন ফুলী আসিয়া অনুর গলা ধরিয়া সংবাদ দিল "ঠাকুরঝা ভাই ও 'তুম্বোমুখো নারায়ণ' 'পেট মোটা কার্ত্তিক' তোর বর নয়রে (ফুলী ও অনুর ভিতর এই 'তুম্বো মুখো' 'গজদামরা' 'পেট মোটা কার্ত্তিক' ইত্যাদি নিজেদের তৈরী কতকগুলি কথা বা Idiom ছিল যা তাদের কাছে ছাড়া অভিধানে মানে খুঁজতে চাওয়া বৃথা) ও সোনা বেনেদের ক্ষেন্তির বর।" ক্ষান্তমণি পাড়ার মেয়ে, তারও আজ বিয়ে।

ব্যাপারখানা এই—রাম বাগান লেনের এ গলিটা খুব লম্বা, আর অনুদের বাড়ীটা গলিতে ঢুকে খান পাঁচ ছয় বাড়ীর পরেই। আজ বিবাহ উপলক্ষে তথায় রসুনচৌকি বসিয়াছে, আলো বাতি পুষ্পমাল্য বিবাহের মঙ্গলঘট দিয়ে বাড়ী সাজান; এবং ঐ গলির ভিতরে একই দিনে আরও কয়টী বিবাহ আছে; তাই ক্ষান্তর বর অনুকুল বর্দ্ধন, তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিতে আসিয়া গলির প্রথমেই যে বাড়ীখানা বিবাহ উৎসবে সজ্জিত দেখিল সেই খানেই থামিয়া পড়িল।

পাড়ার মেয়ে পিতৃহীনা ক্ষান্তর বিবাহের কর্ত্তা ছিলেন তাহার কাকা, এবং বর অনুকুলের দিকে কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন বরের মামা। এদিকে অনুর বিবাহের সব ঠিক করিয়াছিলেন তাহার জ্যাঠামহাশয় হরপ্রসাদ বাবু। তিনি ও অনুর পিতা মহিম প্রসাদ ছাড়া অনুর ভাবী স্বামী সমীরকে বাড়ীর আর কেহ দেখে নাই।

(ক্রমশঃ)

পূজারণী

শ্রীঅন্নপূর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন প্রকৃতির শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। বর্ষার পর শরৎ আসিয়াছে; শেষ রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার দরুণ বোধ হইতেছিল যেন কোন সৌখীন দেবতা সযত্নে সেই পশ্চিমের সহরটির প্রত্যেক অংশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। যখন সবেমাত্র প্রাতঃ সূর্য্য তাঁহার স্নিগ্ধ রক্তিম ও সোনালীবর্ণ মিশ্রিত রূপ লইয়া কোনও এক বৃক্ষ শ্রেণীর পশ্চাৎভাগ হইতে উদয় হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রাতঃসূর্য্যের মতই রূপ লইয়া এক সুন্দরী সেই নগরপথে চলিতেছিল। সঙ্গে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, বোধ হয় উহার পিতা। উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, হঠাৎ অশ্বপদধ্বনি ও তৎসঙ্গে মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, অশ্বপৃষ্ঠস্থিত কোনও এক যুবক তাঁহাদেরই কি প্রশ্ন করিতেছে; উঁহাদিগকে থামিতে দেখিয়া যুবক আরো অগ্রসর হইয়া, অতি ভদ্রতার সহিত কহিল. "শুনেছি এইখানে একটা খুব ভাল বাগান আছে, কিন্তু আমি কিছুতেই তার পথটা ঠিক করতে পাচ্ছি না, অনুগ্রহ ক'রে যদি ব'লে দেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, একটা বাগান এখানে আছে বটে, কিন্তু আপনি যে অনেকটা পথ বেশী চ'লে এসেছেন। এই পথ দিয়ে সোজা গিয়ে তারপর বাঁ দিককার পথ ধরে গেলেই আপনি সেই বাগানের কাছে পৌছুবেন। যুবক তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া ঘোড়া ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

এইখানে একটু যুবকের পরিচয় দিব। উহার নাম সমীর; বেশ পুরুষোচিত চেহারা, উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুন্দর মুখশ্রী; তবে বর্ণ শ্যাম। দেখিলেই বোধ হয় বেশ বলশালী ও বুদ্ধিমান যুবক; ইহা ছাড়া তাহার একটি মহৎ গুণ এই যে, সে প্রাণপণে পরোপকার করে। সমীর ধনীর সন্তান, সম্প্রতি আবার সে বিলাত হইতে বেশ সম্মানের সহিত ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বাস কলিকাতায়; কিছুদিনের জন্য এইস্থানে বেড়াইতে আসিয়াছে। এখানে তাহার নিকটস্থ আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই, তবে আছেন তাহার পিতৃবন্ধু অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী প্রতাপ বাবু। ইঁহার নিকটই সমীরকে থাকিতে হইয়াছে, কারণ প্রতাপবাবু কেবল তাহার পিতৃবন্ধু নহেন; সমীরের ভাবি শ্বশুরও বটে, তিনি তাঁহার একমাত্র সুন্দরী কন্যা বেলাকে আধুনিক ধরণের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও সে পাইয়াছে, তাহা ছাড়া সঙ্গীত শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি কিছুই তাহার অজানা নাই; অতএব সমীর আর যাইবে কোথায়। আর বাস্তবিকই সমীরও বেলাকে স্ত্রীরূপে পাওয়া নিজের সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। বেলা যখন তাহার নীলবর্ণের শাড়ীটি পড়িয়া তাহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইত, তখন সমীর ভাবিত ইহা অপেক্ষা সুন্দর বুঝি আর জগতে কিছু নাই। কিন্তু সে দিন প্রাতঃকালে ভ্রমণের পর হইতে সমীর যেন কেমন অন্য মনস্ক ছিল। এমনকি বেলার সহিত ও ভাল করিয়া কথা বলিতেছিল না। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "আজ শরীরটা তত ভাল নেই।" অমনি বাড়ীতে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, বড়লোকের বাড়ীতে অতি সামান্য কারণেও যেমন হইয়া থাকে। প্রতাপবাবু বলিলেন, "তাই ত হে তোমার শরীরটা আবার খারাপ হল কেন, আজ আর উঠে হেঁটে বেড়িও না।" প্রতাপবাবুর স্ত্রী বলিলেন "শরীরটা বুঝে একটা ওষুধ বিষুধ খাও।" এইবার বেলার পালা, সে কহিল, "সমীরবাবু আপনাকে কতদিন বলেছি যে অত ভোরে উঠে বেড়াতে যাবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, আপনি কিন্তু কিছুতেই তা' শোনেন না।" ইহাতে সমীর বলিল, "ভোরে বেড়ানো যদি বন্ধ করি বেলা, তা হলে শরীর আরও বেশী খারাপ হবে, এবার থেকে মনে কচ্ছি তোমাকেও নিয়ে যাবো।" বেলা বলিল "আপনি মনে করলেই আমি গেলাম আর কি; ততক্ষণ আমার ঘুমুলে কাজ হবে।" সমীরের

কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ভাল লাগিল না, তাই সে কহিল, "বেলা তুমি এই কথা বলছ, আর আজ অত ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, তোমারি বয়সি একটি মেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সঙ্গে বোধ হয় তার বাপ রয়েছে, যদিও বেড়াতে অনেকেই বেরোয় তবে এর বিশেষত্ব এই যে যা এখানে এসে পর্য্যন্ত চোখে পড়েনি, তার পায়ে জুতার পরিবর্ত্তে আলতা ও গায়ে দামী কাপড় ও ফারকোটের পরিবর্ত্তে একটি সাধারণ লাল পেড়ে শাড়ী। হাতেও সব কি জিনিস ছিল, বোধ হয় কোনও মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিল।" বেলা একটু উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "এতে আপনি মনে করেন যে সে খুব বাহাদুরী করেছে? ফারকোট ও জুতা পরার ও আবার উপযুক্ত হওয়া চাই এবং অভ্যাসও থাকা চাই। কোথা থেকে একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে এসেছে, তাকে দেখে আপনি একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন।" ইহা শুনিয়া সমীর কহিল, "না বেলা সেই মেয়েটীকে না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না সে কি ধরণের মেয়ে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েও আমি যথেষ্ট দেখেছি; কিন্তু এরকম আমার কখনও চোখে পড়ে নি। আমার বড় ইচ্ছে কচ্ছে তাকে একবার তোমায় দেখাতে।" এই কথা শুনিয়া বেলা এবার সত্য সত্যই রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার দেখবার প্রয়োজন নেই, আপনি রোজ একবার ক'রে দেখে আসবেন।" তাহার পর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বাহিরে যে এক ব্যারিষ্টার বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল তাহার নিকট গিয়া গল্প করিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রে সমীরের কিছুতেই নিদ্রা হইতে ছিল না; সারারাত ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল; সেটি এই, সে এক অতি ভীষণ স্থানে রহিয়াছে, যেখানে আলোকের লেশমাত্র নাই। চারিদিকই বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত জলে পূর্ণ এবং সে বহু চেষ্টা সত্বেও সেই জল হইতে উঠিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তলাইয়া যাইতেছে। এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, হঠাৎ সেই স্থান আলোকিত হইল ও কিসের সুগন্ধে ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সমীর দেখিল দেবীর ন্যায় রূপ লইয়া এক নারী তাহার নিকট আসিতেছেন। তাহারই দেহের জ্যোতিতে ও সৌরভে সে স্থান পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সমীরের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া অনায়াসে তাহাকে সেই ভীষণ জলরাশি হইতে উঠাইয়া লইলেন। তখনি সমীরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্য হইল; কারণ যে দেবীমূর্ত্তি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল সেই মূর্ত্তিই ত আজ প্রভাতে সে দেখিয়াছে।

পরদিন ভোরে আবার সমীর ঘোড়া লইয়া বাহির হইল। সমীর পথ চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই পূর্ব্বদিনের সেই দুই পথিককে দেখিতে পাইল; কিন্তু সেদিন আর সে তাহাদের সম্মুখীন হইল না; অল্প দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ক্রমে দেখিল, তাহারা একটি অতি সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিল। এখানে সুন্দরের অর্থ মণি মুক্তাযুক্ত নহে; জাকজমক শূন্য পবিত্রতা ও শান্তি-পূর্ণ ক্ষুদ্র মন্দির বেষ্টন করিয়া চারিদিকে ফুল ফুটিয়া আছে তাহাদের সুমিষ্ট গন্ধ যেন চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পথিকদিগকে আহ্বান করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কি মধুর সঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনি শুনা যাইতেছে। বোধ হয় কোনও অজানা পাখীর ডাক। সমীর কি প্রকারে উহাদের সহিত আলাপ করিবে ভাবিতে ভাবিতে মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে উহারাও পিতাপুত্রিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন; ভদ্রলোকটির দৃষ্টি সমীরের উপর পড়িবামাত্র উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি ভদ্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন "এই যে বাবা তুমি আজও এসেছ, বেশ বেশ, ভোরের বেলা বেড়ান খুব ভাল। তা বাবা তোমাকে আগে ত কখনও দেখিনি; বিদেশে বাঙ্গালী দেখলে বড় আনন্দ হয়। তোমার নামটি কি? কিছু মনে কোরোনা বাবা, আমি একেবারেই 'তুমি' বলতে আরম্ভ করলাম; জানি না কেন তোমাকে দেখেই তোমার উপর একটা কেমন মায়া পড়ে গেছে, তাই আর আপনি বলতে পারলাম না।" সমীর এই সুযোগই

খুঁজিতেছিল, তাই ভদ্রলোকটির উপরি উপরি এত প্রশ্নের উত্তর সে খুবই আনন্দের সহিত দিয়া যাইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বেই সেই মেয়েটি, "বাবা তুমি গল্প করো আমি মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে আসি" এই বলিয়া উহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে। এদিকে উভয়ের কথাবার্ত্তায় সমীর জানিতে পারিল, ভদ্রলোকটির নাম সতীশ বাবু, ইহার দুই কন্যা; বড়টির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এইটি ছোট, ইহার নাম দীপ্তি। কর্ম্মস্থল হওয়ার দরুণ তাঁহার এই স্থানেই বাস। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দেখনা বাবা, আমার এ পাগলী মায়ের এ কি ঝোঁক যতই ঠাণ্ডা ঝড় বিষ্টি হ'ক না কেন, ওর প্রতিদিন এই মন্দিরে এসে ফুল দিয়ে যাওয়া চাইই। তা কতবার বকেছি এই ভোরবেলা খালি পায়ে পথ চ'লে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে, কিন্তু ও তাতে ব'লে, "বাবা আমি দেবীর পূজা দিতে যাচ্ছি' এতে আমার কিছু অসুখ করবে না। ইতিমধ্যে দীপ্তি তাহার কাজ শেষ করিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা এবার বাড়ী চলো।" তখন সতীশবাবু সমীরকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। সমীর প্রথমে রাজী হইল না; শেষে বলিল "আচ্ছা চলুন আজ গিয়ে আপনার বাড়ীটা দেখে আসি, আর একদিন এসে বসা যাবে।" তাহার পর তিনজনে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। এখন দীপ্তি ও সমীরের সহিত বেশ নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল; সমীর দেখিল তাহার প্রত্যেক কথায় বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। ক্রমে তাহারা একটি বাংলোর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার সম্মুখে ইংরাজী ও বাংলায় লেখা রহিয়াছে "শান্তি কুটীর"। সমীর দেখিল নামের সহিত বাড়ীটির খুব সাদৃশ্য আছে। সেই নিস্তব্ধ কুটীরটি ভরিয়া যেন কেবল শান্তিই বিরাজ করিতেছে। বসিবার ঘরটি এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে সমীর মনে মনে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। দীপ্তি সহস্তে খাবার প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিয়া সমীরকে দিল। সমীর খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল, এরূপ আস্বাদপূর্ণ খাদ্য সে পূর্ব্বে খাইয়াছে কি না। তাহার পর দীপ্তি বলিল, "চলুন সমীরদা, আপনাকে আমার বাগান দেখিয়ে নিয়ে আসি। উভয়ে বাগানে আসিল। সমীর দেখিল অতি সুন্দর বাগান, খুব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সমীর যখন বাগানের প্রশংসায় উন্মুখ দীপ্তি তখন একটি একটি করিয়া বাগানের সমস্ত ভাল ফুল গুলি তুলিতে লাগিল। হঠাৎ এ দিকে চোখ পড়ায়, সমীর দেখিল, দীপ্তির মুখের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে তাহার সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে। এদিক ও দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া ফুল তোলার জন্য তাহার খোঁপা খুলিয়া চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে। সমীর ভাবিতে লাগিল, "কি সুন্দর এই মেয়েটি, ভগবান কি তাঁর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই মূর্ত্তিটির সৃজন করিয়াছেন।" তাহার পর সে দীপ্তির নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি এই ভাল ভাল ফুলগুলি তুলেছেন কেন? গাছে ত বেশ দেখাচ্ছে।" দীপ্তি ফুলগুলি সমীরের হাতে দিয়া বলিল "এগুলি আপনি নিয়ে যান।" ইতিমধ্যে সতীশবাবু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সমীর, এই যে বাবা বাগান দেখছ, এর সমস্ত কাজ আমার এই দীপ্তি মা নিজে হাতে ক'রে। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর সমীর তাহাদের নিকট বিদায় লইল, এবং পথ চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল "সতীশবাবু ও দীপ্তি কি চমৎকার মানুষ! একদিনের আলাপে তাহাকে কিরূপ আপনার করিয়া লইয়াছে; সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল তাহাকে দীপ্তির সেই নারীজনোচিত লজ্জা, ধীরতা প্রভৃতির মধ্যেও তাহার সেই সঙ্কোচহীন সরল ব্যবহার! সে জীবনে কখনও এরূপ নারীর সংস্রবে আসে নাই। যাহা হউক এইরূপে আলাপ হইবার পর হইতে সমীর মধ্যে মধ্যে সতীশবাবুর বাড়ী যাতায়াত করিত। একদিন সমীরের নিকট বেলার কথা শুনিয়া দীপ্তি বলিল বেলাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু সমীর যখন বাড়ী ফিরিয়া বেলার নিকট ঐ কথা বলিল, বেলা বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন আমার কি কোনও কাজ নেই যে, সে বলেছে বলেই যেতে হবে? আপনি তার কাছে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারেন কিন্তু তাকে ব'লে দেবেন যে আমার সময়ের দাম আছে; তা ছাড়া আমাকে অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হয়, কাজেই এ স্থলে আমি ওর নিমন্ত্রণটা রক্ষা করতে অক্ষম।" সমীর দীপ্তির নিকট

এ সমস্ত কথা বলে নাই। সে কেবল জানাইল, বেলা আসিতে চাহে নাই। ইহা শুনিয়া দীপ্তি বলিল "তবে আমিই একদিন তাঁর কাছে যাব।" তাহার স্নেহান্ধ পিতা কোনও দিনই তাহার কোনও কার্য্যে বাধা দেন নাই; কাজেই একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সতীশবাবু ও সমীর দীপ্তিকে লইয়া প্রতাপবাবুর বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা উহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রতাপবাবু তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন; বেলা তখন সেই ব্যারিষ্টারটির সহিত বাগানে বেড়াইতেছিল; পরে তাঁহাদের নিকট আসিয়া বসিল ও আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইল। বেলার দীপ্তির উপর কেমন যেন একটু আক্রোশ ছিল; কারণ তাহার বরাবর এই ধারণা ছিল যে, রূপে গুণে তাহার ন্যায় সুন্দর বাঙ্গালীর ঘরে আর আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু যখন দেখিল, সমীর দীপ্তির প্রশংসায় ক্রমেই উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে তখন তাহার ঐ না দেখা মেয়েটির প্রতি কেমন একটা হিংসার ভাব জাগিয়া উঠিল। বেলার ধারণা ছিল, দীপ্তি একেবারে অশিক্ষিতা; কারণ যে প্রত্যহ মন্দিরে গিয়া পূজা ক'রে, সে কি আর পড়াশুনা করিয়াছে। তাই সে দীপ্তিকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছায় নানা কঠিন কঠিন বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিল। কিন্তু দেখিল দীপ্তি তাহাতে না থামিয়া সমানে তাহাদের আলোচনায় যোগ দিয়া চলিল, এবং তাহার প্রত্যেক কথায় বেশ উচ্চ শিক্ষার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশেষে বেলা আর কোনও উপায় না দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা দীপ্তি দেবী, আপনি প্রত্যহ মন্দিরে গিয়ে পুজো করেন কেন? অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট করা আপনি উচিত মনে করেন? দীপ্তি বলিল, আপনার এ ধারণা হ'ল কেন যে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে? বেলা, "আমার মতে আধুনিক সময়ের মেয়েদের ওরকম সেকেলে ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে চলা মোটেই উচিত নয়। যখন যেমন হাওয়া সেভাবে না চল্লে জীবনে অনেক কষ্ট পেতে হয়।" এই কথা শুনিয়া দীপ্তির কথা বলিবার আগেই সমীর একটু উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বেলা, তুমি কি সব বাজে কথা বলছ! তুমি মনে করেছ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টো ডিগ্রী পেয়েছ বলেই এঁর চেয়ে তুমি অনেক বেশী জ্ঞানী? আজ থেকে মনের কোনেও তুমি সে কথার স্থান দিও না। শোন বেলা ইনি ঐ ডিগ্রি নেননি বটে, কিন্তু এত বেশী পড়াশুনা করেছেন যে, এঁর মত জ্ঞানী স্ত্রীলোক অন্তত আমি এখনও দেখিনি। তোমরা কেবল পরের নকল করা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ইনি নিজেদের জিনিসটাকে বড় ক'রে তুলতে ব্যস্ত। তোমরা যতক্ষণ পাঁচজনকে ঠকাবার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, ইনি ততক্ষণ কি উপায়ে স্নেহযত্ন দ্বারা পাঁচজনের কষ্ট দূর করা যায় সেই চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। এখন বুঝলে তোমার উচ্চ শিক্ষায় আর এঁর শিক্ষায় প্রভেদ কি।" এই কথা শুনিয়া, রাগে অপমানে বেলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে হতবুদ্ধি হইয়া ইহার উপযুক্ত উত্তর খুঁজিতেছিল, ইতিমধ্যে দীপ্তি একটু লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি ঠিকই বলেছেন বেলা দেবী, আমার ও একটা কেমন ছোটবেলা থেকে পাগলামী আছে, নিত্য মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসা; তবে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কিছুতেই আর ছাড়তে পাচ্ছি না।" ইহার অল্পক্ষণ পরে সমীর বলিল, এবার চলুন রাত হ'য়ে যাচ্ছে, আমি আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি।" তখন তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া প্রতাপবাবু বলিলেন, "সেকি আমার মোটরটা বার করতে বলি," কিন্তু সে কথায় সতীশ বাবু, দীপ্তি ও বিশেষতঃ সমীর আপত্তি করিল। সমীরকে উহাদের সহিত যাইতে দেখিয়া সতীশবাবু বলিলেন, "কেন বাবা তুমি আবার কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে আসছ?" সমীর কহিল, আপনাদের পৌছে দেবার নাম ক'রে আমারও একটু বেড়ান হয়। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সমীর দীপ্তিকে বলিল "আজ আমার জন্যে আপনাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হ'ল।" ইহাতে দীপ্তি অতি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, ও সব কি বলছেন সমীরদা, পাঁচজন একজায়গায় বসলেই অমন তর্ক বিতর্ক হয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্যে কি মন খারাপ করতে আছে।"

সমীর রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পর বেলা উগ্রমূর্ত্তিতে তাহার নিকট আসিয়া বলিল "সমীরবাবু, আমি জানতে চাই আপনি কি উদ্দেশ্যে সকলকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাদের সামনে আমাকে এভাবে অপমান করলেন। সমীরের মেজাজটাও তখন রুক্ষ ছিল, কাজেই

সে কহিল, "তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করবার মত সময় আমার নেই বেলা। নিজে ভেবে দেখ, কে কাকে অপমান করেছে, তোমার মনে যদি বিবেক বলে জিনিস থাকে ত সেই উত্তর দিয়ে দেবে ঠিক।

কিছুদিন পরের কথা। সমীর কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। প্রতাপ বাবুর বাটীতে এখন আর তাহার চিঠির আদান প্রদান নাই; কারণ বেলার প্রকৃতি দেখিয়া সমীর তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়াছে। তবে ইহাতে বেলা একেবারেই দুঃখিত নহে উপস্থিত তাহার যে এক ব্যরিষ্টারের সহিত আলাপ হইয়াছে বেলা তাহাকেই নিজের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ঠিক করিয়াছে। কিন্তু প্রতাপ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহাদের এই উদ্ধত প্রকৃতির মেয়েটির জন্য অমন পাত্র হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতে বড়ই মনক্ষুণ্ণ। দীপ্তি মধ্যে মধ্যে সমীরকে চিঠি লিখিয়া থাকে আর সেও তাহার উত্তর পাঠায়। সমীর বহুবার যাহা সতীশবাবুর নিকট বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই, একদিন হঠাৎ তাহাই চিঠিতে লিখিয়া ফেলিল। সেটি আর কিছুই নহে দীপ্তিকে বিবাহ করিবার কথা, সে লিখিল 'মহাশয় আপনারা যদি আমাকে দীপ্তির উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেন আর যদি দীপ্তির মত থাকে ত আমি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। আপনারা আমাকে স্নেহের দাবী করবার অধিকার দিয়েছেন বলেই আজ এ কথা লিখতে সাহসী হলাম। যাই হক আমাকে ক্ষমা করবেন।'

পত্র পাঠ করিয়া সতীশবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না; কারণ বিনা আয়াসে এমন রূপবান ও গুণবান পাত্রের হাতে দীপ্তিকে দিতে পারিলে তাঁহাদের আর ভাবনা কি। এই ঠিক দীপ্তির উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের এই আনন্দের স্রোতে বাধা পড়িল যখন দীপ্তি চিঠি পড়িয়া মুখ গম্ভীর করিল।

সতীশবাবু তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'চিঠি পড়ে দীপ্তি অমন হয়ে গেল কেন?"

সতীশবাবুর স্ত্রী, 'জানি না, মেয়ে যেন এক রকমের হয়েছে', এই কথা বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে গেলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি একবার দীপুকে জিজ্ঞেস করো ওর সমীরকে বিবাহ করতে মত আছে কি না।

তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে, দীপ্তি তাহার ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার দৃষ্টি ছিল একটা চামেলী ফুলের গাছের উপর নিবদ্ধ; এমন সময়ে তাহার মা আসিয়া বলিলেন 'দীপু কি ভাবছিস মা, চুলটুল বেঁধে নে, বেড়াতে যাবি না?'

দীপ্তি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, 'মা এই পৃথিবীতে কারুর সঙ্গেই বেশ সরলভাবে বেশী মেশা উচিত নয়—না?'

মা বলিলেন, ও কথা বলছ কেন দীপু। সমীরের চিঠি পড়ে? কিন্তু আমরা ত এ আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে কচ্ছি। আর তোমার তার প্রতি ব্যবহারে ত সমীরকে অপছন্দ করার মত ভাব আমরা কিছু দেখতে পাইনি। দীপ্তি 'আমি ত তাঁকে মোটেই অপছন্দ করি না মা, বরং তাঁর কতকগুলি অসাধারণ গুণের জন্যে তাঁকে আমি আমার মনের অনেক উচ্চে স্থান দি, আর তাঁকে আমি ভালবাসি এ কথা একেবারে সত্য, কিন্তু আমার সে ভালবাসার মধ্যে এমন কোনও ভাব নেই যাতে করে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠতে পারে। তাই ত আমার বড় দুঃখ হয়েছে মা—যাঁকে আমি আমার মনের অত উচ্চে স্থান দিয়েছি, তিনি আমার এই নির্ম্মল ভালবাসা যে কি তা বুঝলেন না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন একদিন না একদিন বোঝেন। আমি ত তাঁকে সেরকম চক্ষে দেখিনি যাতে করে বিয়ে করতে পারি বা তিনিও সে রকম প্রস্তাব তুলতে পারেন; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর মা এ বিয়েতে আমি কিছুতেই রাজী হতে পারবো না। এই কথা শুনিয়া দীপ্তির মাতা বলিলেন, "দীপ্তি তুমি কি মনে কচ্ছ, সমীরের চেয়ে ভাল পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? এখন হাতের রত্ন পায়ে ঠেলছ কিন্তু পরে না এর জন্যে আপশোষ করতে হয়," দীপ্তি তখন দৃঢ়স্বরে বলিল "মা তোমরা এটা ঠিক জেনে রেখে যিনি আমার স্বামী হবেন তিনি কিরূপ লোক হবেন ত আমি জানি না বটে কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি, তিনি যত মন্দ লোক হ'ক না কেন আমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে

করবো।" এইবার দীপ্তির মার চক্ষে জল আসিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমার এতটুকু মেয়ের অন্তরে কোথা থেকে এমন পবিত্র ভাবের স্রোত এল।" তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কন্যাকে ডাকিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা দীপু আজ তোমার কাছে আমরা হেরে গেলাম, আর তোমার কাছে অনেক শিক্ষা লাভও করলাম। ভগবান তোমায় নিশ্চয়ই সুখী করবেন।"

সমীরের দীপ্তিকে বিবাহ করিবার আশাপ্রদীপ ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা একেবারে নিবিয়া গেল ও রাগে দুঃখে অপমানে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল যখন সতীশ বাবুর পত্রে দীপ্তির এই বিবাহে অমত দেখিল। তাহার নারীজাতটারই উপর কেবল একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। তাই প্রতিজ্ঞা করিল জীবনে আর কখনও কোন নারীর সংস্পর্শে যাইবে না। সেই রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না; সে তাহার ঘরের সম্মুখের ছাদে পায়চারী করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিল, "অত সুন্দর মূর্ত্তির মধ্যে এত কপটতা লুকানো আছে, এ তো আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। জানি না দীপ্তি, তুমি আমার মতো আরও কতজনের সর্ব্বনাশ করবে। মৌখিক আদর যত্নের দ্বারা একেবারে আপনার ক'রে নিয়ে শেষে তাকে দূরে ফেলে দেবে। ভগবান কেন তোমায় এত গুণ দিয়েছেন। সেইদিনটা আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারবো না এখানে আসবার পূর্ব্বে যেদিন আমি সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরছিলাম, তখন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বাগান পর্য্যন্ত নেমে এসেছিলে জ্যোৎস্না এসে তোমার মুখে পড়াতে দেখলাম, তোমার চোখ দুটী জলে ভরে গেছে; তখন তোমার মুখে এত শোভা হয়েছিল যে আকাশের চাঁদ তার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তুমি সেই সজল চক্ষু আমার প্রতি রেখে বল্লে "আমাদের যেন কখনও ভুলবেন না।" তা হ'লে সে সবই কি কেবল ছলনা মাত্র! দীপ্তি তোমার তুলনা চন্দ্রই ঠিক; স্নিগ্ধ শীতল চন্দ্রের ভেতরটা যেমন কেবল ভীষণ উত্তপ্ত পাষাণময় মরুভূমি মাত্র, তোমারও ঠিক তেমনি, বাহির অত সুন্দর কিন্তু অন্তর ভীষণ কঠিন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনে যেন আর কখনও তোমার মুখদর্শন করতে না হয়।

মানুষ যে বিষয়টা ভুলিতে চেষ্টা করে, সেটা আরও বেশী করিয়া মনকে আঁকড়াইয়া ধরে, সমীরেরও ঠিক তাহাই হইল, সে যত দীপ্তির স্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সময় কাহারও জন্য দাঁড়াইয়া থাকে না; তাই সমীরেরও উদ্দেশ্য ও আশাবিহীন জীবনের দিনগুলি এক বৎসর ঘুরিয়া আসিল। তাহার মনের মধ্যে যে কল্পনার মন্দির গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা দীপ্তির একটি মাত্র কথায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাহার পৃথিবীর কোনও জিনিসের প্রতিই এতটুকু আকর্ষণ নাই। কিছুরই সে এখন ভালমন্দ বিচার করে না। অন্তর তাহার ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিল। এই অবস্থার হাত এড়াইবার জন্য সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

দীপ্তি এখন সচ্চরিত্র রূপবান ও গুণবান যুবক শচীন্দ্রের স্ত্রী। তাহাদের উভয়ের এত মনের মিল ছিল যে সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। শচীন্দ্রের পয়সার অভাব নাই; কাজেই সে দীপ্তির অনুরোধে এক পল্লী গ্রামে অতি মনোহর বাগান বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেছিল এবং দীপ্তির পূজার জন্য বাগানের মধ্যেই একটি দেবী মন্দির স্থাপনা করিয়া ছিল। দীপ্তি সেই গ্রামের কৃষক প্রভৃতি যত দরিদ্রদিগের মাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাহারও কঠিন রোগ হইলে দীপ্তি যাইয়া সহস্তে তাহার সেবা করিত। কাহারও সংসারে পয়সার অভাব হইলে দীপ্তি তাহা পূরণ করিত। অতএব গ্রামের সকলেই তাহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া জানিত ও ভক্তি করিত। সে এই গ্রামে একটি অনাথাশ্রম করাইয়া দিয়াছিল। শচীন তাহার দীপ্তির এই সব কীর্ত্তি দেখিত ও সকলের মুখে সুখ্যাতি শুনিত ততই তাহার মন কি এক পবিত্র আনন্দে ভরিয়া উঠিত। সেই গ্রামে দরিদ্র, ধনী, ইতর-ভদ্র এমন কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক

ছিল না যাহার সহিত দীপ্তি কথা বলে নাই। ছোট বড় সকলকার সম্মুখেই দীপ্তি বাহির হইত। দেবীর পূজা উপলক্ষে সে সকলকে সযত্নে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া বড় আনন্দ পাইত। সেই সময় সেই যুবতী দীপ্তির মুখে এমন সুন্দর এক স্বর্গীয় মাতৃভাব ফুটিয়া উঠিত যে সকলেই তাহার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিত না। এই রূপে দীপ্তি ও শচীন্দ্রের এক অনাবিল সুখের মধ্য দিয়া দিন যাইতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে দীপ্তি পূজা সারিয়া আসিবামাত্র শচীন অতি ব্যস্তভাবে সেস্থানে আসিয়া বলিল, 'দীপ্তি বড় বিপদ শীগ্‌গীর এই ঘরে এস, একটি ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়েছিল, অবস্থা খুবই খারাপ, তবে তুমি সেবার দ্বারা বাঁচাতে পার কি না দেখ।'

দীপ্তি ঘরে ঢুকিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'একি এযে সমীরদা, তুমি একে কোথায় পেলে, এর এমন অবস্থা কে করলে? ওঃ চেহারা কি খারাপ হয়ে গেছে, চেনা যায় না।'

—'সে কি! তুমি যে সমীর বাবুর কথা বল তিনিই এই?'

দীপ্তি, 'হ্যাঁ, কিন্তু এর এমন অবস্থা কি করে হল?'

—'আমার মনে হয় দীপ্তি, পথে কোনও বদমাইস লোক এর মাথায় লাঠি মেরেছে; কি ভীষণ আঘাত লেগেছে দেখ, এই জন্যই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

শচীন ডাক্তার লইয়া আসিল, তিনি ভালরূপে সমীরকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, আঘাত গুরুতর জানাইয়া খুব সাবধানে রাখিবার কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। দীপ্তি প্রাণপণে সমীরের সেবা করিতে লাগিল। সে রাত্রে সমীরের জ্ঞান ফিরিল না। যখন আঁধার আলোর সন্ধিস্থলে অর্থাৎ ভোর বেলায় তাহার জ্ঞান ফিরিল তখন সে তাহার ললাটে কাহার শীতল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিল। চক্ষু মেলিয়াই সে দীপ্তিকে দেখিয়া বড় চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল।

'এ আমি কোথায়!'

দীপ্তি শান্ত কণ্ঠে বলিল 'আপনি ব্যস্ত হবেন না সমীরদা, আপনি খুব ভাল জায়গায়ই আছেন।' কি[ন্তু] সমীর তাহার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই পুনরায় জ্ঞান হারাই[ল।] যাহা হউক রীতিমত ঔষধ প্রয়োগে ও দীপ্তির আন্তরি[ক] সেবার গুণে সমীর ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছি[ল।] কিন্তু সে যতই দীপ্তিকে দেখিতেছিল, ততই তাহা[র] অন্তর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কতবার ভাবিল এই[বা]র সে দীপ্তিকে বলিবে 'আর ডাইনির মায়ায় সমী[র] ভুলিবে না।' কিন্তু দীপ্তির সেই সরল অথচ গম্ভী[র] পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার সেই কথা সমু[দ্র] তরঙ্গে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিল। ক্রমে সমীরের চক্ষু ফুটিল, সে বুঝিতে পারিল দীপ্তির যে ব্যবহারকে সে এতদিন কপটতা বলিয়া মনে স্থান দি[য়া] আসিয়াছে তাহা কপটতা নহে, তাহা স্বর্গীয় অনাবি[ল] ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ; এরূপ ব্যবহার জগতে বিরল, তাই সমীর দীপ্তিকে বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউ[ক] আজ সে বুঝিল যে সে পর হইলেও, দীপ্তি তাহাকে যথা[র্থ] সহোদরের ন্যায় ভালবাসে। আবার সে দেখিল, দীপ্তি[র] সংসারটি কি সুন্দর শান্তিপূর্ণ; যাহার ঠিক বিপরীত চি[ত্র] সম্প্রতি সে বেলার সংসারে দেখিয়া আসিয়াছে। সে শচী[ন] ও দীপ্তিকে স্বর্গের দেব দেবীর ন্যায় দেখিতে লাগিল। এবং তাহার জীবন দান করিয়াছে বলিয়া সেই স্বামী স্ত্রীকে প্রাণের আবেগের সহিত ধন্যবাদ জানাইল।

সমীরের নিকট দীপ্তি ও শচীন শুনিল যে, সে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া পড়ে; সে জানিত না যে এইস্থানে দীপ্তি থাকে। দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যা বেলা সে একা ঐ পথে ভ্রমণ করিতেছিল; হঠাৎ কতকগুলি লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তাহার সোনার রিষ্টওয়াচ বোতাম প্রভৃতি লইয়া এমন ভীষণ প্রহার করে যে সে সেই স্থানেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাহাহউক ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু শচীন ও দীপ্তির অনুরোধে কিছুতেই সে যাইতে পারিতেছিল না। সমীর যাইবার নাম করিলেই তাহারা বলে "আর কিছুদি[ন] থেকে যান।" একদিন শচীন ও সমীর বাগানে বেড়াই[তে]

ছিল এবং শচীন সমীরকে বলিতে ছিল, "জানি না ভাই আমি কোন পূণ্য বলে দীপ্তিকে পেয়েছি, আমার মনে হয় ও স্বর্গের দেবী, আমার কাছে এসেছে, তাই কেবলই ভয় হয় আমি বুঝি ওর ঠিক মত যত্ন করতে পাচ্ছি না।" এমন সময় সাক্ষাৎ কল্যাণময়ী দেবীর ন্যায় সদ্যস্নাতা দীপ্তি সেখানে আসিয়া বলিল, 'তোমরা দেখবে এস, আজ মন্দিরে উৎসব হচ্ছে।'

শচীন,—'কিসের উৎসব দীপ্তি ?

দীপ্তি—'আমি সমীরদার জন্যে পূজো মেনেছিলাম কি না, এখন উনি ভাল হয়ে গেছেন তাই উৎসব।'

'বেশ—বেশ চল যাই' এই বলিয়া শচীন সমীরের হাত ধরিয়া মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিল। পূজা হইয়া যাইবার পর দীপ্তি সহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইল। কাঙালীরা ভোজন করিয়া হর্ষধ্বনিতে সে স্থান পূর্ণ করিয়া তুলিল। এইরূপে তাহাদের অসীম নির্ম্মল আনন্দের মধ্য দিয়া দিন যাইতেছিল। দীপ্তির প্রতি শচীনের ব্যবহার দেখিত আর সমীর ভাবিত, দেবীর ন্যায় দীপ্তির এই উপযুক্ত স্বামী হইয়াছে শচীন। কি মধুর ইহার ব্যবহার! আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। একদিন যে সময় শচীন বাড়ী ছিল না, সমীর দীপ্তিকে গিয়া বলিল, 'দীপ্তি আমি তোমার নির্ম্মল ভালবাসা ও স্নেহ যত্নের মর্ম্মগ্রহণ করতে না পেরে যে অন্যায় প্রস্তাব করেছিলাম সে জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। বাস্তবিক বলছি দীপ্তি আগে তোমাকে দেখে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, এখন তোমাদের পবিত্র সংসারে এসে তোমার আর শচীন বাবুর সুন্দর সরল ব্যবহারে তার চেয়ে শতগুণ বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি পেলাম।

বিদায়

এ, এফ, এম, ফজলুল হক

বিদায়' বিদায়
ভিড়িল পান্‌সী ঘাটে
প্রাণ কাঁদে হায়!
যেদিকে তাকাই ফিরে
ভাসি শুধু আঁখিনীরে,
বলাকা ফিরিছে নীড়ে
সন্ধ্যা ঘনায়
বিদায় বিদায়।

ধূলির ধরার পানে
মিছে ফিরে চাই—
হেথায় বেদনা শুধু
ভালবাসা নাই,
প্রাণের সায়রে বসি,
কাঁদিতেছে ক্রন্দসী
বন্ধু, সেথায় পশি,
মিছে সান্ত্বনা
দান করিবার ছলে
বাড়ায় যাতনা।

রবি ডুবে যায়
অলস বেলায়—
স্বপন পসারী কবি,
কাঁদে শুধু হায়,
বিদায় বিদায়।

জ্ঞানের মোহ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(১৪)

রঘু ক্যাওটের বাড়ী উষা আসিতেই, তার ছোট্ট তিন বছরের ছেলেটি উষার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া বলিল—মা নক্কী! প্যারসাদ—

উষা একটু হাসিয়া আঁচলের খুট হইতে দুখানি বাতাসা বাহির করিয়া তার হাতে দিল। রঘুর স্ত্রী বলিল—এবার তুমি অনেকদিন প'রে এয়োচ, মা।

—তোমরা সব ভাল আছ ত? পাঁচুর মা।

—হিঁ! আপনাদের কেরপায় এক রকম ভালই।

সাতকড়ির মা আসিয়া বলিল—পেঁচোর মা! জল আন্‌তে যাবি না কি?

—না দিদি? আজ আর আমি যাবো নি।

সাতকড়ির মা, উষাকে দেখিয়া বলিল—মা নক্কী—এ এয়েচেন্ যে!

—হ্যাঁ!

—এতদিন আস্‌নি কেন মা? আমরা কতদিন তোমার কতা বলি! তোমারে দেখলে আমাদের বড় আনন্দ হয়—

—মা নক্কী, তুমি যে সে দিন বোললে, সাবিত্তির গপ্প শোনাবে! বলিয়া পাঁচুর মা উষার মুখের দিকে চাহিল।

উষা বলিল—এখন কি তোমাদের গল্প শুনবার সময় হবে?

—হবে। তুমি বলো! একখানি পিঁড়ি আনিয়া উষাকে বসিতে দিয়ে পাঁচুর মা সাতকড়ির জননীকে বলিল—দিদি তুই ও বোস্, আজ আর জলকে যাস্ না।

—রোস্! তাইলে কলসিটে ঘরে রেকে ছটকীকে আমাদের ডেকে আনি, গপ্প শুনতে সে বড্ডো ভালবাসে।

—তবে যা! কিন্তক শিগগীর আসিস্! দেরী করি নি যেন!

—না, লো না, একুনি আসচি? বলিয়া সাতকড়ির জননী চলিয়া গেল।

পাঁচুর মা বলিল—তুমি যকন্ অনেকদিন আস্‌না মা, তকন্ ইচ্ছে হয়, তোমার ঘরে যেয়ে খবর নিয়ে আসি, কিন্তক্, তোমার বাবার ভয়ে সায়োস্ পাইনে! আজ্জমে কত না পাপ করেছিলাম, তাই এমন ঘরে ভগবান্ জম্মে দিয়েচেন! বলিয়া সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

পাঁচুর মার কথায় উষা মনে ব্যথা পাইল। এ কথার যে সে কী জবাব দেবে, বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে উষা ভাল করিয়াই জানে, যাদের নীচ বলিয়া দূরে রাখা হয়, তাদের ভগবানে বিশ্বাস উচ্চ শ্রেণীর চাইতে কম নয়, বরং বেশীই!

—গপ্প তো আরম্ভ করনি, মা নক্কী! বলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে দ্রুতপায়ে সাতকড়ির মা আসিয়া উষার পায়ের কাছে বসিল। তার পিছনে আট দশটি ছোট বড় নারী আসিয়া উষাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিল—বলো মা নক্কী, গপ্প।

উষা যখন সাবিত্রীর উপাখ্যান ইহাদের শুনাইতেছিল, কি একটা কাজে রঘুর সঙ্গে অরুণ তার বাড়ী ঢুকিয়াই, এতগুলি মেয়েকে উষার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল।

গল্প শেষে যখন সাবিত্রী সত্যবানকে যমের কাছ হইতে ফিরিয়া লইয়া আসিল এবং তার শ্বশুর চক্ষু এবং রাজ্য ফিরিয়া পাইল, তখন আনন্দে নারীগুলি উষাকে জিজ্ঞেস্

করিল—খাসা গপ্প! এ সব সত্যি হ'য়েছিলো, মা নক্কী?

—সত্যি বই কী! বলিয়া উষা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাতুর মা বলিল—তুমি চল্‌লে নাকি?

—হ্যাঁ।

একটি মেয়ে বলিল—আর একটা গপ্প বলো না, মা নক্কী?

—না, আজ যাই, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, আবার একদিন বলবো।

—আবার কবে আস্‌বা, তুমি?

—যে দিন সময় পাবো!

—তোমার মুকে যখন সাবিত্রির কথা শুনচিলাম, তখন মনে হচ্ছিল তুমিই যেন সেই রাজকন্তে সাবিত্তির! নয়ন দুটী কী? বলিয়া সাত কড়ির মা তার ছোট জায়ের দিকে চাহিল।

ভীমের কন্যা ক্ষেমী বলিল,—তাইলে সত্যবান কোথায়! খুড়ি?

বলাইয়ের মাসি বলিল—আমাদের রাজাবাবু যদি সত্যবান হয় তাইলে বেশ মানায়! নয়রে ক্ষেমী?

—তা যা বলিছিস ঠাকুরজী! আমাদের মা নক্ষীরে ওনার ঘরেই মানায়। মা নক্ষী আমাদের সত্যি যেন রাজকন্তে!

বলাইয়ের জননীর কথায় উষার ভারী লজ্জা হইল। সে আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। তার মনে সেদিন অতর্কিতে তার হাত হইতে মালা পরিয়া একেই এক সমস্যায় ফেলিয়াছিল অরুণ, তার উপর ইহাদের কথাগুলি যেন মনে এক আশার আলো আনিয়া দিল।

—রঘুর বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?

উষা এত অন্যমনস্ক ছিল, অরুণ যে তার এত কাছে তা বুঝিতে পারে নাই।

—খুব অন্যমনস্ক হয়ে চলছিলে কিন্তু পথ চ'লতে হ'লে এতখানি অন্যমনস্ক থাকা উচিত নয় উষা!

এই সময় অরুণকে যে সামনে দেখিবে তা উষা ভাবিতে পারে নাই। মনের কথা ভাবিয়া উষা অরুণের সামনে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

—ও কী, মুখখানা নীচু করে নিলে যে! আমার কথার জবাব দেবে না বুঝি?

—ওলো, ক্ষেমী, মুখপুড়ী, এদিকে আয়,—দেখছিস্ নে, ওখানে রাজা বাবু, মা নক্কীর সাথে কথা বলচেন্!

বলাইয়ের পিসির চাপা কণ্ঠস্বরে, উষা ফিরিয়া চাহিল।

ক্ষেমী হাসিয়া বলিল—আমরা সাবিত্তিরি সত্যবানরে দ্যাখছিলুম, মা নক্কী!

—ও কী বলছে? বলিয়া অরুণ উষার দিকে চাহিল।

—কিছু নয়।

—সত্যবানের কথা কি বল্‌লে?

—ওদের সাবিত্রীর গল্প বলেছি কি না, তাই!

—ও!

উষা আর দাঁড়াইল না।

(১৫)

কোথায় যাচ্ছিস্, অরুণ?

—হাসপাতাল।

—এই তো এলি, আবার এখুনি বেরুচ্ছিস্! ঘরে কি তোর একটুও থাকতে নেই, বাবা! চেহারাটি কী হয়েছে, দেখ দেখি!

—কেন, কী হয়েছে?

—কত রোগা হ'য়ে গেছিস্!

অরুণ হাসিতে লাগিল।

—হাস্‌লি যে?

—তোমার কথা শুনে! রোগা আবার কোথায় হয়েছি, বরং কলকাতা থেকে এখানে এসে বেশ একটু মোটা হ'য়ে পড়েছি!

—হ্যাঁ! কী যে বলিস্ তার ঠিক নেই!

—আমি কী মিছে বলছি মা! আচ্ছা, তুমি এস আমার সঙ্গে দাদুর কাছে, তিনি কি বলেন দেখি? বলিয়া অরুণ জননীর একখানি হাত ধরিয়া টানিল।

—তোর এখনও পাগলামি গেল না, অরু! বলিয়া আশাদেবী হাসিলেন।

—তুমি বেঁচে থাকতে, তা আর যাবে না মা—, তোমাকে দেখলে, মনে হয় না যে বড় হয়েছি!

স্নেহ সিক্ত দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া আশাদেবী বলিলেন—সত্যিই অরু? মায়ের কাছে ছেলে কখনও বড় হয় না!

বাহিরে আসিতেই গেটের কাছে অরুণের ভীমের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল—

—আপনারে একটা কথা ব'লবার ছিল।

—কী?

—শুনলুম, পুরুত ঠাউর আপনার নামে বদনাম করচেন্ আর গালাগাল দিচ্চেন!

—হাসিয়া অরুণ বলিল—আমার অপরাধ?

—আপনি আমাদের ছোঁয়ো করেন ব'লে।

—ও, তা দিনগে যান তিনি যত পারেন গালাগাল।

—আজ্ঞে না! আপনার মতন দ্যাবতারে তেনি গালাগাল দেবার কে! বসতির ছেলেরা সব খাপ্পা হ'য়ে উঠেছে, এই শুনে—তারা বলচে অমন পুরুতরে মন্দির থেকে তেড়িয়ে তবে ছাড়বে!

—ছিঃ, ভীম! তুমি তাদের মোড়ল থাকতে এসব কী কথা! তাঁর যা খুশী বলুন না—ওসব কথায় তোমরা কাণ দিও না!

—আমি ও তাদের এই কথা বললাম, কিন্তু জানেন তো এখনকার ছেলেদের! বুড়োর কথা তারা কাণে নেয় না! আপনি যদি একবার গিয়ে ওদের বুজিয়ে বলেন। সেই জন্যেই এলাম আপনার কাছে!

—এখন তো আমার সময় হবে না। বিকেলের দিকে যাব আমি।

—আচ্ছা, যাবেন তা'হলে। বলিয়া অরুণকে প্রণাম করিয়া ভীম চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার দিকে অরুণ যখন ভীমদের পাড়ায় গেল, তখন কতকগুলি লোক একটা মাদল লইয়া গান গাহিতেছিল। অরুণকে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি মাদলটা রাখিয়া লজ্জিত মুখে তারা উঠিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ বলিল—লজ্জা কি! গাও না তোমরা! সারা দিন কাজ কর, একটু আমোদ না করলে বাঁচবে কেন!

ভীম ঘর হইতে আসিয়া বলিল—আপনি এসেছেন! বলুন তো এদের একটু বুজিয়ে—মা লক্ষীর বাপের ওপর এরা বড্ডো রেগেছে!

ভীমের কথায় বলাই বলিল—রাগ হবে না! তুমি বলো কী মোড়ল। ওনার এত বড় আস্পদ্দা, আমাদের রাজা বাবুরে কিনা গালাগালি করেন! তোমাদের এই সব পেরাচীন লোকেদের জন্যেই তো আমরা ওনারে কিছু বলতে পারছিনে! নইলে দেখতুম একবার, ওনার কত ক্ষ্যামতা যে রাজাবাবুর নিন্দে করেন!

অরুণ বলিল—করুন্ না উনি আমার নিন্দে বলাই! তাতে তোমরা রাগ করছ কেন?

—আমরা রাগ করবনি তো কে করবে? ভগবানেরে আপনার মদ্দি পেইচি! পুরুত ঠাউরের মন্দিরের কাছ দিয়ে আমরা গেলে, ওনার ঠাবদা অশুদ্য হ'য়ে যায় যকন্, তখন আমাদের দ্যাবতারে তিনি অচ্ছেদ্দা করবার কে!

—কিন্তু মন্দিরের দেবতা যে শুধু পুরুতের, তা তো নন্! সে যে তোমাদের ও! সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন! আর আমাকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করো না! আমি তোমাদের-ই একজন। আর ঐ পুরুত ঠাকুর ও তোমাদের একটি ভাই! এই কথা ভেবে তোমরা তাঁর ওপর রাগ করো না।

—সে যাই হোন্ উনি, কিন্তুক আপনাকে যে নিন্দে ক'রে বেড়াবেন—সে আমরা সইবো না! তা ব'লে দিচ্চি!

—কী ক'রবে তবে?

—এমনিতে যদি না শোনেন্, তাইলে সত্যিই আমরা একদিন ওনার ঠাকুর বাড়ী ঢুকে আক্কেল দিয়ে দেব!

—ছিঃ বলাই! এ রকম সঙ্কল্প তোমরা ত্যাগ কর! জান তো তিনি ব্রাহ্মণ! এতে তোমাদের অপরাধ হবে!

—হোক্ অপরাধ! আমরা নীচ জাত, তাতে ডরাই নে!

—তোমার কথায় আমি কিন্তু ভারী দুঃখু পেলুম, বলাই! ভেবেছিলুম, তোমরা আমার কথা শুনবে, এখন বুঝেছি; তা আমার ভুল!

—ভূল আপনার একটুও নয়, রাজাবাবু! আপনার হুকুম আমরা বেদ বাক্যি বোলেই মানি! তবে পুরুত ঠাউরের আচরণ আর সওয়া যাই চে না, তাই তারে একটু শিক্ষা দেবার ইচ্ছে ছেল্, তা আপনার যদি অমত হয়, তো ক'রবো না।

—তোমার কথা শুনে, বড় আনন্দ হ'ল, বলাই! আজ বুঝলাম, তোমরা যথার্থই আমাকে ভালবাস! তিনি যদি অবুঝ হন্, তোমরা কেন তা হবে! তিনি যখন বুঝবেন যে তোমরা তাঁর কথা কানে নাও নি, তখন আপনিই আর কিছু বলবেন না!

—কিন্তু একটা কথা আপনারে বলছি, রাজাবাবু,—এ অনুমতিটুকু আপনাকে দিতে হবে!

—বলো?

—পুরুত ঠাউর যদি আমাদের পেছনে আরও নাগেন, তা'হলে আমরা কিন্তু মাথা ঠ'ণ্ডা রাখতে পারবো নি! আপনি আমাদের ভালবাসেন বোলে, উনি আজকাল আমাদের ওপর বড্ডো রেগে আছেন। আমরা কাজে বেরুলে, যেখানেই কেন দেখা হোক্ না, বলেন, "জমীদারের আস্কারাতে তো ব্যাট্যাদের বড় আস্পদ্ধা হয়েছে আজকাল" এ সব ধর্ম্মে সইবে না। ছেলেদের ইস্কুল পাঠাই ব'লে, বলেন—"ছোট নোকের ছেলের আবার নেকাপড়া কি!" এ সব ক'রলে পাপ হয়! এমনি কত কত রাগ ক'রে বলেন!

সব বুঝেচি বলাই! উনি বড় বদরাগী, আর গোঁড়া ব্রাহ্মণ, তাই যেটা জ্ঞান হ'য়ে থেকে মেনে আসছেন, তার ব্যতিক্রম সইতে পারেন না। কিন্তু তোমাদের একটু সহ্য করতে হবে ভাই!

ভীম বলিল—ওরা সইবে বই কী, রাজাবাবু! তিনি যে আমাদের মা নক্ষ্মীর বাবা! তেনারে কষ্ট দিলে, মা নক্ষ্মী যে আমাদের দুঃখ পাবেন! তা কী ওরা জানে না!

বলাই বলিল—মোড়ল সত্যি কথাই বলেছে, রাজা বাবু! মা নক্ষ্মীর কতা ভেবেই, তেনার কিছু করতে পারবিনে!

(১৬)

জনার্দ্দন যখন শুনিলেন, যে ছোট জাতরা তাঁকে অপমানিত করিবে স্থির করিয়াছে, তখন ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িবার মত হইলেন। খড়ম্ জোড়া পায়ে দিয়া জমীদার বাড়ী আসিয়া ঢুকিলেন।

হঠাৎ জনার্দ্দনকে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া গোপী বলিল—আপনি! কিছু দরকার আছে?

—হ্যাঁ, একবার ঘোষাল মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই!

—বসুন, আমি তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি;—

বিরক্ত হইয়া জনার্দ্দন বলিল—ব'সবার আমার সময় নেই, গোপী! কোথায় তিনি?

—অন্দরে।

—তবে এসো তুমি আমার সঙ্গে।

—কিন্তু তাঁর শরীর ভা'ল নয়।

—তা আমি জানি!

—দেখা করা কী আপনার খুবই দরকার?

—তা না থাক্‌লে আমি আস্‌বো কেন!

—তবে চলুন্।

ঘোষাল মহাশয় একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। গোপী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একবার কাশিল।

মাথা তুলিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন—কে? জনার্দ্দন।

—হ্যাঁ, চিন্‌তে পেরেছেন। বলিয়া জনার্দ্দন ঘোষাল মহাশয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

চোখের চশমাটি খুলিয়া খাপে ভরিয়া একটু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—চিনতে পারবো না, বলো কী! এখনও এমন ভীমরতি ধরে নি। ব'সো—ব'সো!

—কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, যে আপনার ভীমরতিই ধরেছে!

—কেন?

—গাঁয়ের মধ্যে, আপনার নাতি যে-সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে, আপনার বর্ত্তমানে, তা থেকে কী প্রমাণ হয়, বলুন দেখি?

—কিন্তু সে তো কিছু অন্যায় করছে না, জনার্দ্দন! সে যা ক'রছে, গ্রামের কল্যাণের জন্যেই।

—গ্রামের কল্যাণ! না, এতে গাঁয়ের কোন ভালই হচ্ছে না! বক্তৃতা দিয়ে গাঁয়ের নীচ জাতগুলোকে এমনি ক'রে তুলেছে, যে দেবতা বামুনকে পর্য্যন্ত তারা ভক্তি করা তো দূরে থাক্, ভয় পর্য্যন্ত করে না! এ সব খবর জানেন কী, আপনি?

—সব সংবাদই রাখি, জনার্দ্দন! এ তোমার ভুল ধারণা। অরুণ আমার তেমন ছেলে নয়, যে কাওকে মন্দ শিক্ষা দেবে!

—ভুল নয়! সত্যিই সে আমার বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করেছে। আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, একদিন যারা আমার সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পার'ত না, আজ তারা আমার মুখের ওপর কথা ব'লতেও ভয় পায় না! শুনলুম নাকী ডোম পাড়ার কতকগুলো ছোকরা আমাকে অপমান করবার জন্য জোট বেঁধেছে! ভীম আর যদু তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে, তা না হ'লে, তারা হয় ত বিগ্রহের আর আমার সমান অবস্থা করত! তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি যে আপনি এর বিহিত করবেন।

—তোমার এ কথা, কিন্তু, আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে, জনার্দ্দন!

—তবে কী আমি মিথ্যে বল্‌ছি! বলিয়া জনার্দ্দন ক্রোধ ভরে ঘোষাল মহাশয়ের দিকে চাহিল।

—সত্যিই আপনার এ নালীশ মিথ্যে! বলিয়া অরুণ আসিয়া পিতামহের পাশে বসিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—কখনো না!

—কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে কাউকেই ক্ষ্যাপাই নি! আমার ওপর আপনি অন্যায় রাগ ক'রে দাদুর কাছে নালীশ করছেন!

—নালীশ করা আমার স্বভাব নয়, অরুণ! তোমার ঠাকুরদা এখন ও বেঁচে আছেন, এ সব কাজ তাঁর জ্ঞাতসারে হচ্ছে কী না, তাই জানবার জন্যই তোমাদের বাড়ী এসেছিলুম! কিন্তু এসে দেখলুম, যে জমীদার রাধানাথ ঘোষাল আগে ছিলেন, এখন তা নেই!

—তুমি বড্ডো রেগেছ, জনার্দ্দন! বলিয়া ঘোষাল মহাশয় তাঁর দিকে চাহিলেন।

—কিন্তু রাগ কী আমার সাধ ক'রে হচ্ছে। আপনি থেকে ও এই সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করছেন না।

আমার বয়েসটার দিকে তোমার একবার ভাবা উচিৎ, জনার্দ্দন। এখন কী এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার! এইজন্যেই শাস্ত্রে আছে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেত"!

হ্যাঁ, আপনি তো খাসা "বনে" বাস ক'রছেন! বলিয়া জনার্দ্দন হাসিলেন।

জনার্দ্দনের বিদ্রূপে ঘোষাল মহাশয়ের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। গম্ভীরকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন,—জনার্দ্দন!

এ স্বর গোপীর পরিচিত, শঙ্কাপূর্ণ চোখে সে অরুণের দিকে চাহিল।

অরুণ পিতামহকে বলিল—আপনি চুপ করুন দাদু! ওঁর কথা আমাকে নিয়ে, আমি তার জবাব দিচ্ছি!

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—তাই ওকে বুঝিয়ে দাও অরুণ! তোমার সকল কাজই আমি সমর্থন করি।

—শুনলেন—তো! এখন আপনি কী ব'লতে চান? বলিয়া অরুণ জনার্দ্দনের দিকে চাহিল।

—আমি বলতে চাই, তুমি ঐ ছোট জাত গুলোকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছ কেন?

—কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই ব'লেছি, আপনার বিরুদ্ধে ওদের আমি কোন কথাই বলিনি!

—তুমি না বল্‌লে, ওদের এত বড় ক্ষমতা হ'ত না যে জনার্দ্দন শর্ম্মাকে তারা মারবার কথা চিন্তা ও করতে পারে!

—কিন্তু আমি তাদের ও কথা বলিনি কোনদিন! তবে আপনার এই বেশী গোড়ামীর জন্যে হয়তো তাদের কাছে কোনদিন অপমানিত হবেন। ভুলে যাবেন না যে যদু আর ভীমের বয়েস সকলের নয়! নতুন রক্ত গরম শিগ্‌গীর হয়!

অরুণের কথায় জনার্দ্দনের ভয়ানক রাগ হইল। বেশী রাগ হইলে, তিনি তোতলাইয়া যাইতেন। তিনি

বলিলেন—তোমার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, তারা তোমার আস্কারাতেই এতখানি বাড়িয়ে তুলেছে!

জনার্দ্দনের তোতলামীতে অরুণের ভারী হাসি পাইতেছিল। কোন রকমে দমন করিয়া সে বলিল—আমি তাদের কোন পরামর্শই দিইনি, তবে শুনেছি, আপনি না কি তাদের গালগালাদি করেন, তাতেই তারা আরও রেগেছে!

—রেগেছে তো আমার বড় ব'য়েই গেছে! গাল দে'ব না! শালাদের একবার সাম্‌নে পেলে, হাচিংড়ী এই খড়ম দিয়ে, মাথা ভেঙ্গে দে'ব! বলিয়া জনার্দ্দন পা হইতে খড়ম খুলিতে গেলেন।

—আহা, করেন কী—করেন কী! তারা এখানে নেই! বসুন স্থির হ'য়ে! বলিয়া অরুণ জনার্দ্দনকে জোর করিয়া বসাইয়া দিল।

জনার্দ্দন চেয়ারে বসিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

ঘোষাল মহাশয়, একবার তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

—দেওয়ানজী মশায়! মাকে বলুন গে তো, বাঁড়ুয্যে মশায়ের জন্যে জলখাবার পাঠাতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রে তেষ্টায় ওঁর হয়তো গলা শুকিয়ে গেছে, বলিয়া অরুণ গোপীর দিকে চাহিল।

জনার্দ্দন বলিলেন—না, আবশ্যক নেই।

—কেন? একটু জল খেয়ে, আপনার যা বলবার আছে, বলবেন।

—এখন আমি খাবো না, আমার পূজো শেষ হয় নি—

—তবে থাক্। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো বাঁড়ুজ্যে মশায়!

—কী?

—এই যে ছোটজাত ছোটজাত ক'রে, আপনারা চ্যাচামেচী আর তাদের ঘৃণা করেন, এর ফল কি হচ্চে, তা জানেন?

—কী আবার হবে!

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল—নিজের জাতের কোন খোঁজই রাখেন না, অথচ বলেন যে "আমরা হিন্দু!" আপনাদের এই অবহেলা থেকে হিন্দুর সংখ্যা কত কমে গেছে, তার খবর রাখেন না। হিন্দুদের এই গোড়ামীর প্রশ্রয় পেয়ে, মুসলমান আর খৃষ্টানেরা তাদের জাত বাড়িয়ে তুলছে! এতে হিন্দুর লজ্জা হওয়া উচিত!

—লজ্জা কেন হবে! বলিয়া জনার্দ্দন বিরক্তি ভরা চোখে, অরুণের দিকে চাহিলেন।

নিজের ধর্ম্মের লোক, অন্য সমাজে আশ্রয় নিচ্ছে, কারণ তাদের দিকে আমাদের না আছে স্নেহ, না আছে সহানুভূতি! কিন্তু অপর ধর্ম্মের লোক, সেইটুকুর লোভ দেখিয়ে, নিজের কাছে তাদের টেনে টেনে নিচ্ছে! যাদের আমরা হিন্দু ব'লে জানি, তাদের আমরা ভাই ব'লে কেন ভাবতে পারব না! তাদের ভালবেসে কাছে রাখতে না পেরে, অনাদরে দূরে ঠেলে দি, এ শুধু মিথ্যে হিন্দুত্বের গোঁড়ামীর জন্যে! এ কী লজ্জার কথা নয়, বাঁড়ুজ্যে মশায়?

—তুমি বল্‌তে চাও ছোট জাতদেরও সকলের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া উচিত! কেমন্?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তা অসম্ভব!

—কেন?

—ও সব কথা আলোচনা করতে, তোমার কাছে আমি আসি নি, অরুণ! তবে এইটুকু মনে রেখো, তা যদি সম্ভব হতো তা হ'লে শাস্ত্রকারেরাই দিয়ে যেতেন!

—কিন্তু তাদের নিয়ে আপনাদের একসঙ্গে খাওয়ার কথা তো আমি বলছি নে—আমার উদ্দেশ্য বা ওদের ইচ্ছে, শুধু দেবদর্শন! সেটুকু ওদের সচ্ছন্দেই আপনারা দিতে পারেন! কারণ দেবতা সকলেরই।

—কী যে তুমি বলছ অরুণ, পাগলের মত! নোংরা কাজ যাদের ব্যবসা, তারা করবে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের পূজো।

—নোংরা কাজ তাদের ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু সে তো তাদের অপরাধ নয়! মা যখন সন্তান পালন করেন, তখন যদি নোংরা কাজ ভেবে, তার মলমূত্র না ছোন তা হ'লে কী ছেলে বাঁচে?

—এ কথার অর্থ?

—সহজ, বাঁড়ুজ্যে মশায়! সেই সন্তানের 'মল'

পরিষ্কার করার পর, তিনি কী দেবপূজোর অধিকারিণী থাকেন না ?

—বুঝলুম তোমার কথা ; কিন্তু এটা কি তুমি ভেবে দেখেছ, যারা ভগবানের নাম 'দেবতা' কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না, বলে 'দ্যাবদা' এমনি সব মূর্খ ! এরা চায় দেবমন্দিরে ঢুকবার অধিকার ! আর তাদের দিক্ থেকে করছ তুমি ওকালতী। এমনি করেই হিন্দু সমাজটা তোমরা উৎসন্নে দেবে।

—কিন্তু 'দেবতা' বল্‌লে যেমন তিনি শুন্‌তে পান, 'দ্যাবদা' বল্‌লেও তঁর কাণে যায়, বাঁড়ুজ্যে মশায় ! এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন।

মূর্খ বদতি বিষ্ণায়, ধীর বদতি বিষ্ণবে,
উভয়স্থ সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনৰ্দ্দন ॥

(১৭)

অরুণের কথার কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরিয়া জনার্দ্দন পূজায় বসিলেন। মনের স্থিরতা না থাকায়, বার বার তাঁর পূজায় ভুল হইতে লাগিল। ধ্যানে রাধা গোবিন্দের মূর্ত্তির সহিত অরুণের দৃঢ়তা ব্যঞ্জক হাসি মাখা মুখ মনে আসিতেছিল। বিরক্ত হইয়া তিনি পূজার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। এই ছেলেটার জন্য শেষ তাঁর পূজা আহ্নিক পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল ! কী কুক্ষণে যে অরুণ গ্রামে আসিয়া বসিল, ভাবিয়া জনার্দ্দনের এ বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল ! ডাক্তারী পাস ক'রে কলকাতায় থাকলেই তো হ'ত ! বড় সহজে সেখানে যা খুসী করতিস্। সেখানে সমাজ বা ধর্ম্ম ব'লে কিছুই নেই ! সব একাকার। এই নিরীহ পল্লীগ্রাম খানায়, ঐ সহরের হাওয়া নিয়ে আসবার তার কী দরকার ছিল। এত দিন তো কেউ মন্দিরের ঠাকুর না দেখে, বুক ফেটে ম'রে যায়নি ! আজই তাদের এমন অবস্থা হয়েছে, যে, মন্দিরে ঢুকতে পারছে না ব'লে পূজারীকে মারতে চায় ! ক্রোধে জনার্দ্দনের চোখদুটি জ্বলিয়া উঠিল। আমি বেঁচে থাকতে কখনই দেব না তাদের এ মন্দিরে ঢুক্‌তে ! যদি আসে, সব শালা হাড়ী, মুচী নির্ব্বংশ ক'রে ছাড়ব ! অরুণের ক্ষমতা নেই, আমার রাগ থেকে তাদের রক্ষা করতে ! এ আমার ঠাকুর কোন নীচ জাতকে—তাঁর মন্দিরে আসতে আমি দেব না—না—না—কিছুতেই নয় !

—বাবা !

কন্যার ডাকে জনার্দ্দন ফিরিয়া চাহিলেন।

—আপনার পূজো কি এখনও হয় নি ?

—না, মা।

—বেলা যে অনেক হ'য়েছে।

—হুঁ, জানিস্ উষা ! আমাকে আসে উপদেশ দিতে ; ভারী বিদ্যে হ'য়েছে। সে দিনের একটা ছোট্ট ছেলে এখনও আমার চোখের ওপর ভাস্‌ছে, ওর সেই পা—পা ক'রে চলা,—আমার সঙ্গে এসেছে তর্ক করতে, ভাবলে হাসি পায় ! বলিয়া জনার্দ্দন হো—হো—করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—কার কথা বল্‌ছেন, বাবা ?

উষার কথা জনার্দ্দনের কাণে যায় নাই, অন্যমনস্কে তিনি বলিলেন—কিন্তু ছেলেটার আশ্চর্য্য একটা ক্ষমতা আছে। এমন কথা ব'লে যার উত্তর দেবার আমার আর মুখ থাকে না।

উষা একবার পিতার দিকে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ইস্কুলের পণ্ডিত মাখনলাল আসিয়া বলিলেন, আহারাদি হ'য়ে গেছে বাঁড়ুজ্যে মশাই ?

—না।

—সে কী। বেলা যে দুটো, এখনও খাননি।

বিরক্ত হইয়া জনার্দ্দন বলিলেন—আমি তো আর ইস্কুলে মাষ্টারী করিনে, যে দশটার মধ্যেই খেতে হবে।

লজ্জিত হইয়া পণ্ডিত বলিলেন—আজ্ঞে তাতো বটেই। তবে এখন যাই, বিকেলে আসব।

—কোন দরকার আছে না কী ?

—উষার জন্যে একটি পাত্তর দেখতে বলেছিলেন না, তাই বলতেই এসেছিলুম।

—সন্ধান পেয়েছে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার ছেলে ?

—আজ্ঞে, আমারই ভাগনে,—

—কি পড়া শুনা করেছে ?

মাথা চুলকাইতে, চুলকাইতে পণ্ডিত বলিল—পড়াশুনা বিশেষ কিছু করতে পারেনি সে, কারণ ভগিনী আমার তাকে ছোট রেখেই মারা গেছিল। বৈমাত্রেয় বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই মানুষ হয়েছে।

—তা হ'লে লেখা পড়া কিছুই জানে না ?

—বেশী কিছু নয়, তবে ব্যাকরণ কিছু: পড়েছে। গ্রামের মধ্যে পুরোহিতের কাজ সেই করে।

—তা হ'লে পুজো আহ্নিক জানে বেশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা খুব ভাল জানে। ওদের গ্রামে এ বিষয়ে ওর খুব সুনাম আছে।

—তা হ'লে আমার রাধা গোবিন্দের ভার নিতে সে পারবে, কি বল পণ্ডিত ?

খুসী ভরা কণ্ঠে মাখনলাল বলিল—আজ্ঞে তা পারবে বই কী! বামুনের ছেলে, বিগ্রহের সেবা করা, সে তো তার সৌভাগ্য।

—কিন্তু এখনকার ছেলেদের অন্য রকম কথা।

—কী রকম ?

—মুচী, মেথর দিয়ে, ঠাকুর পুজো না করালে, তাঁরা বলেন, অন্যায় হয়।

—আজ্ঞে না, আমার ননী গোপাল কিন্তু সে রকমের ছেলে নয়।

—তাই আমি চাই, যে আমার অবর্ত্তমানে যেন রাধা গোবিন্দর আমার মর্য্যাদা বজায় থাকে।

—সে কথা তো ঠিকই। ননীকে একবার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, এই বয়েসেই তার কত নিষ্ঠা।

—আমি তো তাদের গাঁয়ে যেতে পারব না।

—তাকে আমার কাছে আনিয়েছি।

—তা হ'লে ওবেলা আমি তোমার ওখানে যাব, তাকে দেখতে।

—তার আবশ্যক কী। আমিই ননীকে নিয়ে এখানে আসবো বিকেলে।

—সেই ভাল।

—তা হ'লে আমি এখন আসি, বলিয়া জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া পণ্ডিত বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

অভিশাপ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হে বসন্ত, হাস্য গীতে পূর্ণ তব বনে
যৌবনের মন্দ বেগে কুঁড়ির অধরে
ক্রমে যেথা পুষ্প জাগি, রস-নিমন্ত্রণে,
বর্ণ আলিম্পনে পুন পড়ে ভূমে ঝরে'
সেথা রেখে প্রাণহীন শুষ্ক তরুটিরে
কি শাস্তি দিতেছ তুমি কী যে দোষে তার
একদা সর্ব্বাঙ্গে যার সর্ব্ব-শাখা ঘিরে
ধ্বনিত মর্ম্মর গান নিত্য বরষার,—
যার পুষ্প-আল্পনা হেরি পথ পাশে
থমকি দাঁড়ায় বন-অপ্সরীর দল
পুন তুলি পুষ্প সেই অধীর উচ্ছ্বাসে
কত ভঙ্গিমায় তারা সাজাত কুন্তল
তারে কেন বারে বারে আজি অপমান,
অজস্র দানের তার এই প্রতিদান ?

রবীন্দ্র নাথের প্রতিভা-সম্পদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মবার্ষীকী বিগত ২৫শে বৈশাখে সারা দেশে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র দেশের সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, ইত্যাদি সর্ব্ব সাধারণ কবিগুরুর জন্ম বার্ষিকীতে সমবেত হইয়া মৈত্রী ও সাম্যের গীতি গাইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অশীতি বর্ষ জীবনের প্রতিভাশক্তির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ, শতমুখী—এক কথায় অতুলনীয় সম্পদের খনি। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, কথা-সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সমালোচক—আরও বিশেষণ যোগ করিলে দেখা যাইবে তাঁহার প্রতিভাজগৎ কত বিরাট!

সমগ্র বিশ্ব কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান, বিদ্যা, মনুষ্যত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছে। নিখিল জগৎ রবীন্দ্র নাথকে আধুনিক যুগের পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ব-প্রেমিক রবীন্দ্র নাথের অপূর্ব্ব প্রতিভা বিশ্ব সবিনয়ে মানিয়া লইয়াছে।

স্ব-অধীন জীবনের ছন্দধারাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য ছুটাছুটী করেন নাই। তিনি স্ব-অধীন সাধনা দ্বারা মাতৃ-ভাষার সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বে তাঁহার মাতৃভাষা বাংলাকে অসীম গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি অগাধ বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "দূরদেশী ভাষা থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র। আত্ম প্রকাশের প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষাতেই।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা-সম্পদের বলে বিশ্বে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সব সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৯১৩—সুইডিস্ একাডেমী 'নোবেল পুরস্কার' দান করেন।

১৯১৩—কলিকাতা বিশ্বরিদ্যালয় হইতে 'D. Litt' উপাধি।

১৯১৫—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে 'স্যর' উপাধি।

১৯২১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ।

১৯২৪—চীন হইতে 'চেন তান' (Thundering Morning) উপাধি।

১৯২৬—গ্রীস গবর্ণমেণ্ট হইতে 'Commander of the order of the Redeemer' উপাধি।

১৯২৬—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা (The Philosophy of Art.

১৯৩১—সংস্কৃত কলেজ হইতে 'কবি সার্ব্বভৌম' উপাধি।

১৯৩২—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা বক্তৃতা' (মানবের ধর্ম্ম)

(১৯৩২-৩৪)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'।

১৯৩৪—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী' বক্তৃতা।

১৯৩৫—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯৩৬—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ।

সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি হইলেও, সাংবাদিক হিসাবেও তাঁহার প্রতিভা অপ্রতুল নহে। নিম্নে একটু পরিচয় দেওয়া গেল :—

১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে (সাধনার চতুর্থ

বৎসর) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'সাধনা'র সম্পাদক হন। 'সাধনা' ১৩০২ সালের কার্ত্তিক মাস (১৮৯৫, নভেম্বর) পর্য্যন্ত চলে। ১৩০৫ সালে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রেস বিলের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি টাউন হলে এক জনসভায় 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস (১৯০১, এপ্রিল) হইতে 'বঙ্গ দর্শন' নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক হন। 'বঙ্গ দর্শনের প্রথম সংখ্যা হইতে "চোখের বালি" বাহির হইতে থাকে। ১৩১০ সাল হইতে "বঙ্গ দর্শনে" "নৌকাডুবি" উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৩১২ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতা হইতে "ভাণ্ডার" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। 'ভাণ্ডার' তখনও চলিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রতিভার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র এই প্রবন্ধে কথিত হইল। এই মহামানবকে শ্রদ্ধা জানাইবার ভাষাও তাঁহারই নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি।

ফল্গু ধারা

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। সূর্য্য আপন শক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিয়া ধরণীর বুকে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে। পুষ্করিণীর সুশীতল জল এখন দুঃসহ গরম। নিদাঘের খরতাপে গাছগুলি যেন ঝিমাইতেছে। আকাশের কোন হইতে পিপাসু পাখীর করুণ চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছে ফটি-ই-ইক্ জল। কিন্তু তাহার সে প্রার্থনা পূরণের জন্য সেখানে কোন আয়োজনই লক্ষ্য হয় না। কার্য্যের অবসানে অধিকাংশ লোকই নিজের নিজের ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন।

এমনসময় পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাসন্তী ঠাকরুণের চির পরিচিত কর্কশ কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল, অলপ্পেয়েরা সব গোরু ছেড়ে দেবে আর আমাকে রাখালের কাজ করতে হবে। যত সব উনপাজুরে ছেলেরা,—আমার এখানে গোরু বাছুর ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় পড়ে পড়ে ঘুমুবে! হতভাগারা সব—"

বাস্তবিকই কতকগুলি বালক গাছতলায় পড়িয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে, অপর কয়েকটি বালক কি একটা আনন্দদায়ক খেলায় মত্ত। এই গলার ঝঙ্কারে নিদ্রিত বালকদের একজন জাগিয়া পড়িল কিন্তু উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। বাসন্তী ঠাকরুণ একবার দম লইয়া পুনরায় চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন, আমার বাড়ী না হলে তোদের গোরু চরানো হয় না। যা না হরিশ মিস্তিরের বাগানে, মুকুন্দ মজুমদারের বাগানে,—যানা সেখানে গোরুর পাল নিয়ে। সে যে কঠিন জায়গা তাই সেখানে সুবিধে হয় না। আমি মেয়েলোক কিনা তাই আমার বাগানের শাকগুলো ডাঁটাগাছগুলো সব গোরু দিয়ে খাওয়াতে খুব সুখ লাগে।"

কে একজন বলিল, মা ঠাকরুণ কোনও গাছতো গোরুতে খায় নাই। আমরা সব নজর রাখছি।'

এতক্ষণ পরে অপরাধীদের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। ওরে হনুমুখোর দল, তোরা নজর রাখছিস? কতকগুলো হা করে ঘুমোচ্ছিস আর কতকগুলো ওই দিকে মুখ করে করে কি ছাইপিণ্ডি খেলছিস। যা শিগির নিয়ে যা গোরু—

'আর একটু চরুক না। এখন তো কোনও গাছ খায় নাই।'

"তাই নাকি? আবার ঝিঙের বীচির মত দাঁতগুলো বের করা হচ্ছে। কোনও গাছ না খেলে আর ওদের তাড়িয়ে নিবিনা। তোদের খুব ভাল করে চেনা আছে। আমি বুঝি এই দুপুর বেলায় তোদের জন্যে এইখানে

বসে থাকব—আমার আর ঘুম নেই কিনা। ভালমানুষ পেয়েছিস তাই'—

অগত্যা অনুকূল সুখাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গোরুগুলি তাড়াইয়া লইয়া আসিল।

বিধবা বাসন্তী দেবী নিজের একমাত্র কন্যা অমলাকে লইয়া বাস করেন। তাঁহার স্বামীর যখন মরজগত ত্যাগের সময় আসিল তখন অমলার বয়স এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, আর আজ সে চৌদ্দ বৎসরের। স্বামীর কিছু জোতজমা ছিল,—তাহারই সাহায্যে এবং বাড়ীতে মূলাটা, বেগুণটা লাগাইয়া কোনওরূপে এতদিন তিনি দুইটি প্রাণীর ভরণ পোষণ চালাইয়া আসিতেছেন। দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার মেজাজ অতিশয় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় একগুঁয়ে এবং রাগী। কাহারও একটু কিছু দোষ আবিষ্কার করিতে পারিলেই তিনি তাহাকে যতক্ষণ পারিতেন ততক্ষণ গালি দিতেন। একবার ক্ষেপিয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। একবার কোনও ছুতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাঁহার তীব্র বাক্যস্রোত অনর্গল ভাবে বহিয়া চলিত। তাঁহার নিকট জ্বালাময় বাক্য না শুনিয়াছে এরূপ লোক গ্রামে বিরল। এতখানি রাগ তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু তাঁহার বড় ছেলেটির অকালমৃত্যুর পর হইতে তিনি তাঁহার ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

* * *

বেলা প্রায় চারটা। ডাল নাড়ার শব্দ পাইয়া বাসন্তী দেবী ধড়মড় করিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে একটি ছেলে মালকোঁচা মারিয়া গাছের ডালের উপর নড়াচড়া করিতেছে এবং নীচে আঁকশি হাতে কয়েকটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা কাঁচা আমের লোভে রৌদ্রের মধ্যে এখানে ওখানে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। দরজা খোলার শব্দ পাইয়া সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। দিবানিদ্রা ভাঙিয়া যাওয়ায় বাসন্তী ঠাকরুণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কণ্ঠস্বরকে শেষ পর্দায় চড়াইয়া তিনি অপরাধীদের পিতৃপিতামহ সম্বন্ধে নানাবিধ দোষ উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন।

অমলা জাগিয়াছে ; সে বলিল তুমি কেন ওদের অত বেশী গালাগালি দাও বল ত। তুমি হলে একা মানুষ, রাত দুপুরে এসে যদি ঘরদোর পুড়িয়ে দিয়ে যায়, কে রক্ষা কর্ব্বে? ওদের তো জ্ঞান বুদ্ধি নেই, আর যত সব মুসলমানের ছেলে, ওদের রাগ তো জানো। তোমার ভয় হয় না? পাড়ার লোকেরা এজন্যে তোমার কত নিন্দে করে।"

বাসন্তীদেবী বলিলেন, ওরে, এখন তো তুই কিছু বুঝিসনে যখন সংসার করবি তখন সব একে একে বুঝতে পারবি। একলা মানুষ পেলে যে লোকে কত অত্যাচার করে তা জানিসনে। এই মুখ ছিল বলে সুরেন্দ্রনগর গ্রামে বাস করে গেলাম।

"তোমার কিন্তু ওদের হাতেই মৃত্যু আছে। তাও যদি না হয় তো সাপের মুখেই তোমার অপঘাতমৃত্যু আছে। আম পাকলে তো নিশুতি রাত্রে ল্যাম্প জ্বেলে আমবাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াও। নিজের জীবন বলেও কি ভয় নেই?"

এই সময় গ্রামের বিন্দুঠাকরুণ পান চিবাইতে চিবাইতে দেখা দিলেন। ইনি গ্রামের একটী সংবাদপত্র বিশেষ, পাড়ার সমস্ত সংবাদ তাঁহার নিকটে সর্ব্বপ্রথমে আসে। তাঁহাকে দেখিয়া বাসন্তী দেবী ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইলেন। গ্রামের নানাবিধ ঘটনাবলী লইয়া তাঁহাদের আলোচনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

বৈকাল বেলা। মাইনর স্কুলের ছেলেরা ছুটীর পরে পুস্তকের রাশি হস্তে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইহারা, ভাবীকাল ইহাদের হস্তে রূপান্তরিত হইবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ইহাদের মুখে জীবনের দীপ্তি নাই, তাহার বদলে রহিয়াছে দারুণ নিরাশার অভিব্যক্তি।

বাসন্তী দেবীর বাড়ীর পাশ দিয়াই সরু রাস্তা সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দুই পাশে বেতের ঝোপ, একধারে যুগল সাহার বিশাল পুকুর তাহাতে জল কিছু কমিয়া গিয়াছে। ছেলেদের মধ্য হইতে বিভাস বলিল এক কাজ করা যাক, এখানে বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকাতে থাক। দেখ না কি মজা হয়।

অরুণ মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিল, 'নারে আর ওসব করে কাজ নেই। বুড়ী এখনই ছুটে আসবে, ওর তো মাথার ঠিক নেই। এখানে দাঁড়ালে নিশ্চয় ধারণা কর্বে যে বাগান থেকে কিছু চুরী করছি।

যতীশ সায় দিল, 'সে ঠিকই বলেছিস। সেদিন সে কি কাণ্ড। একটা সুন্দর পাখী ওই কাঁঠাল গাছটায় বসে ছিল, আমি একদৃষ্টে দেখছি। এমন সময় বুড়ী মুখ থেকে বাক্যবাণ ছড়াতে ছড়াতে হাজীর—যত মুখপোড়া এখানে জুঠে। আমার শশা কটা আর ঘরে তুলতে দেবে না দেখছি। সোজা স্কুলে গিয়ে নালিশ না করলে আর এরা শায়েস্তা হবে না। আজ আর ওকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।

সকলে বাড়ীর দিকেই চলিল। বাসন্তী দেবীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। নাদের মণ্ডল হাটে যাইতেছিল। সে শুনিতে পাইয়া বলিল, যা বলেছেন বাবুরা। ও মাঠাকরুণ যেন ভালমুখে কথা বলতে গেলেই গলাটা থেকে খন্ খন্ করে আওয়াজ বেরয়। এমন ঝগড়াটে লোক আমি বাবার কালে দেখি নাই।'

অরুণ বলিল, আসল কথা কি জান? ঝগড়া না করলে ওর গলাটা খুস্‌খুস্ করতে থাকে। তাই কোনও ছুতোনাতা পেলেই বক্ বক্ করতে আরম্ভ করে।"

বিভাস বলিল, "যাই বল, ওকে কিন্তু গাঁয়ের অনেক লোকেই ভয় করে। ও যদি মেয়ে মানুষ না হয়ে পুরুষ মানুষ হতো আর যদি একটু লেখাপড়া জানত তবে এই গ্রামের একজন হর্ত্তাকর্ত্তা মতন হত।"

কাছেই হাটের গোলমাল শুনা যাইতেছে। হাটটি ছোট—গ্রামের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষই পাওয়া যায়। সপ্তাহে দুই দিন এই হাট বসিয়া থাকে। তরিতরকারীর দোকানে তেমন গোলমাল নাই, যত ভীড় মাছের দোকানে। এই ভীড়ের মধ্যে অচল সিকি দুয়ানী চালাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ছাত্রদল আলোচনায় ক্ষান্ত দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে একবার বাজার দরটা জানিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইল।

স্কুলে কিসের উপলক্ষে সে দিন ছুটি ছিল। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পদ্মানদীর ঘাট জনশূন্য—গ্রামের লোকদের স্নানাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় যতীশ তৈলনিষিক্ত দেহ লইয়া নদীতীরে স্নানের জন্য আসিল। অন্যদিন স্কুলের তাড়া থাকে, আশ মিটাইয়া স্নান করা হয় না। আজ তাহার মহা আনন্দে স্নান করিবার সুযোগ। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের মাঝে নদীর শীতল জলের মত লোভনীয় জিনিষ আর নাই। নদীর জল এখন মাতৃস্নেহের মতই রমণীয়, মধুময়।

নদীর উন্মাদনা কম,—যতীশের সাঁতার দেওয়ায় আজ আর শ্রান্তি নাই। বাহু প্রক্ষেপে জল আলোড়ন করিতে করিতে সে চলিয়াছে। ছোট ছোট ঢেউয়ের মধ্য দিয়া সাঁতার দিতে দিতে সে অনেকদূর চলিয়া গেল। তখন একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দেখিল যে নদীর তীর বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

যতীশ আপনার গতি ফিরাইল। এখনও অনেকখানি পথ বাকী। পথের দূরত্ব দেখিয়া তাহার মনের কোণে একটুখানি ভয়ের সঞ্চার হইল; মনটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। খানিকদূর অগ্রসর হইবার পরে নৈরাশ্যের উদয় হইবামাত্র বাহু শিথিল হইয়া আসিল, সংকল্পের দৃঢ়তা কমিয়া গেল, চক্ষের সম্মুখ হইতে উজ্জ্বল আলোক নিবিয়া গেল। জনশূন্য নদীর বুকে তাহার প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িল। নদীর স্নেহের আলিঙ্গন এখন আর তৃপ্তি জাগাইতে পারে না। নদী তাহার সহিত গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

একখানি নৌকা দূরে আসিতেছে, কিন্তু তাহা আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতেই বালকের নিশ্বাসের স্পন্দন থামিয়া যাইবে। হঠাৎ নদীর জলে কাহার ঝাঁপ দিয়া পড়িবার শব্দ শুনা গেল। কেহ বোধ হয় দূর হইতে এই হঠকারী বালকের কাণ্ড দেখিতে পাইয়াছেন। বালকের নিকট আসিয়া পৌছিতে তাঁহার কিছু সময় লাগিল। তিনি ব্যাকুলভাবে জলের তলে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহার দেহ বুঝি হাতে ঠেকিল, অনুভবে বুঝিলেন যে তাঁহার ভুল হয় নাই। কিন্তু যতীশ তখন যেন একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত। সে দৃঢ়ভাবে তাঁহার হাত আঁকড়াইয়া ধরিল। নদীর বুকে শেষ আশ্রয় পাইয়া তাহার

বাঁচিবার জন্য আকুলতা বাড়িয়া গেল। গভীর নদীর বুকে দুইজনের ঝাপটাঝাপটি চলিতে লাগিল।

ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করিয়া নৌকাখানি আগাইয়া আসিতেছিল। এই দুইটি বিপন্ন প্রাণ নৌকার মাঝির দৃষ্টি এড়াইল না। নৌকা খানিকটা নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছিল; দুই মাঝি একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল। ইহারা নদীর সহিত ক্রীড়া করিয়াই মানুষ। নদীর ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়াও ইহাদের মনে ভয় জাগে না, জাগে উন্মাদনাপূর্ণ আনন্দ। ইহাদের নিপুণতা অসাধারণ; মুহূর্ত্তমধ্যে দুইটি প্রাণ উদ্ধার করিয়া নৌকায় উঠিল।

মাঝির নিবাস এই গ্রামেই জেলেপাড়ায়। মাঝি দেখিল যে মজ্জমান ব্যক্তিদের একজন যতীশ আর একজন সেই কর্কশভাষী বাসন্তী ঠাকরুণ। তিনি সাঁতার দিতে খুব ভাল জানিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা সাঁতারের কৌশল সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

পদ্মার কূলে নৌকা লাগিল। দুইটি প্রাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ভয় ছিল না। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পরে দুইজন চোখ মেলিল। বাসন্তী দেবী বলিলেন, "আমি কোথায়? জলে না ডাঙায়? সে পোড়ারমুখো বেঁচেছে? এমন হতভাগা ছেলে কি আর দুটা দেখা যায়?"

ওগো মমতাময়ী! যাহার প্রতি স্নেহের আধিক্যে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলে তাহার প্রতি এ কি সম্ভাষণ! এইরূপ বাক্যেই কি তোমার স্নেহের প্রকাশ?

নারী-প্রগতি

শ্রীসুধাংশু বসু

অধুনা রক্ষণশীল আর গতিশীলের মধ্যে "নারী প্রগতি" নিয়ে ভীষণ তর্ক উঠেছে। রক্ষণশীল বল্‌ছেন—ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য গেল, এক কথায় যা কিছু ভাল সবই গেল। হিন্দু দ্রুত রসাতলের পথে এগিয়ে চলেছে, এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে ইত্যাদি। গতিশীল বল্‌ছেন—না হে, না, পদে পদে খুটিনাটি বাধা-নিষেধের গণ্ডী মেনে চলতে আর পারি নে। পঙ্গু সমাজকে, ঘুমন্ত জাতীকে টেনে তুলতে হবে, চালিয়ে দিতে হবে দ্রুততালে, বর্ত্তমানের চলার মাঝে বাঁধন ছিঁড়তে হবে, নিয়মের কারাগার ভাঙতে হবে, কুসংস্কারের কালো দাগ তুলতে হবে। রক্ষণশীল আরও বলছেন স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্মো ভয়াবহ। অতএব সনাতন ধর্ম্ম প্রাণপণে আঁকড়ে থাক, হিন্দুত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ, নইলে মরবে। গতিশীল বলছেন—মনের প্রসার বাড়াও, আপন-পর ভুলে যাও। যা কিছু ভাল যেখান থেকে পার টেনে আন। সনাতনত্বের দোহাই দিয়ে আর নিজেকে পঙ্গু করে রেখো না। সবার সঙ্গে সমান বেগে পৃথিবীর উপর দিয়ে চল, নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ। কোন্ দলকে এর মানবো আর কোন্ দলকে ঠেলবো? প্রশ্ন সহজবোধ্য কিন্তু মীমাংসা দুরূহ। সব চেয়ে মুস্কিল এই যে ভাল-মন্দ বলে মার্কামারা কোন নির্দিষ্ট বস্তু, বিষয় বা পদ্ধতি এ সংসারে নেই। সময়োচিত প্রয়োজনীয়তা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাহিদা এবং প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে মিল রেখে ব্যক্তিগত বুদ্ধির বাটখারায় যাচাই ভালমন্দের বিচার করতে হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে বস্তুর মূল্য বাড়ে, বস্তুর মূল্য কমে। গতিশীল আর রক্ষণশীলদের তর্ক বিশেষ করে নারীর কর্ত্তব্য এবং মূল্য নিয়ে। গতিশীলদের "একাল" আর রক্ষণাশীলদের "সেকাল" নাম দিয়ে এই দুইটি চিন্তাধারার নাটকীয় ভাবে একটু আলোচনা করা গেল। কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের চেষ্টা এর মধ্যে নেই—শুধু একটা বিতর্ক মাত্র।

একাল। আসুন না স্যর একটু তর্ক করা যাক্। শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করছে। তর্কে এ ভাবটা কাটতে পারে, ইতপূর্ব্বে অন্তত সে উপকারটুকু পেয়েছি।

সেকাল। তুমি তর্ক বাধাতে পারলে বাঁচ। কিন্তু তুমি কালকের ছোকরা, তর্কের কি বোঝ! মিথ্যা গলাবাজি শোনার সময় আমার নেই। অর্থহীন তর্ক শুনতে চাই নে।

একাল। আপনার তর্কই অর্থহীন। আপনি কোন যুক্তি মানেন না। প্রমাণের ধার ধারেন না। শুধু সনাতনত্বের গদা ঘুরিয়ে আপনার বাক্যের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান। এ যুগের লোকে তা মানবে কেন?

সেকাল। বাজে কথা রাখ। ঋষিদের বাক্য তুমি উড়িয়ে দিতে পার? ঋষি বাক্য প্রমাণের আবশ্যকতা রাখে না।

একাল। নাই রাখুক তাতে কিছু এসে যায় না। জ্ঞান ভাণ্ডার অফুরন্ত। জানেন তো There are more things in Heaven and earth etc. কাজেই ঋষিরা কোন্ আদি যুগে যা বলে গেলেন তাইই সত্য, আর সবই মিথ্যা তাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করি? সত্যের শেষ মীমাংসা কি এক কালে হয়?

সেকাল। আরে সে তো গেল অন্য কথা। ঋষিরা যা বলে গেছেন, করে গেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য, তা মানতে চাও না তোমরা, এইটাই তো আমাদের দুঃখ।

একাল। ওতে মুস্কিল আছে। ঋষিবাক্য পালন করতে গিয়ে দেখি এক ঋষি যা বলেছেন অন্য ঋষি তার উল্টা কথা বলেছেন। একজন বল্‌লেন বরং চিরকাল কন্যাকে কুমারী রাখবে তবু অপাত্রে দান করবে না। আর একজন বললেন—কন্যা গৃহে রজঃস্বলা হলে কন্যার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ নরকগামী হবে। এখন উপায়? কার কথা শোনা যাবে? দুইই তো ঋষি।

সেকাল। আরে বাপু! ও একটা পরস্পর বিরোধী বাক্য বাদ দাও। তারা যাই করুণ তোমাদের কল্যাণের জন্যই করেছেন শুধু এই কথাই মনে রাখতে হবে।

একাল। হ্যাঁ, তা গেছেন। কোন অসদিচ্ছা হয়তো তাঁদের মনে ছিল না তা মানি।

সেকাল। তবে সেই সব শাস্ত্রবাক্য মুনি-ঋষিদের বাক্য তোমরা মানবে না কেন?

একাল। মানতে চাইনে পৃথিবীটা গতিশীল বলে। কালের আবর্ত্তনে-বিবর্ত্তনে এর অনেক কিছু ভাঙচুর হয় বলে। আর নিত্যকালের প্রয়োজনের তাগিদ এক নয় বলে। সেকাল-একালকে তারা একস্থানে বেঁধে দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দেখুন না, মনুকে রীতিমত মেনে চলতে হলে ছেলেকে আর স্কুলে পাঠান হয় না কারণ সেখানে বিধর্ম্মী অথবা ব্রাহ্মণেতর হিন্দুও শিক্ষা দিচ্ছে।

সেকাল। ঠিকই; সেই জন্যই তো আধুনা শিক্ষার এত অধোগতি হয়েছে। তাদের দূরদর্শিতা ছিল অনেক। তারা ভবিষ্যৎকেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের কথা—

একাল। আজ আর তা চলে না। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ আর পরিচালিত হতে চায় না। মনু বলেছিলেন অবিদ্যাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ। ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন মূর্খ হউন তিনি মহৎ দেবতা। আরও বলেছেন দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা—ব্রাহ্মণের চাকর হইবার জন্য ব্রহ্মা শূদ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। খুব সৌভাগ্য যে শাস্ত্রের এই সব মহিমা অনেকটা লোপ পেয়েছে। নইলে নিজেদের মধ্যেও একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাঁধাতো।

সেকাল। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য? ব্রাহ্মণকে না মেনেই তো তোমরা অধঃপাতের পথে এত এগিয়ে এসেছ।

একাল। কেন অত শাপ-তাপ দিচ্ছেন? সে আগের নিয়ম আর এখন খাটে না। সেই মুনি ঋষিরা চলে যাবার পর এই পৃথিবীতে অনেক ভূমিকম্প হয়ে গেছে। তারা এ ঘাটের জল সেঘাটে, সেঘাটের জল এঘাটে, এদেশের মাটি সেদেশে, সেদেশের মাটি এদেশে নিয়ে ফেলেছে। একদিন যেখানে পাহাড় ছিল, আর একদিন সেখানে সাগরের জল ঢেউ খেলে গেছে। একদিন যেখানে অতলস্পর্শী সমুদ্র ছিল, আজ সেখানে পাহাড় খাড়া হয়ে আছে। কাজেই আগেকার পথ অনেক বিলীন হয়ে গেছে, তার স্থানে নতুন পথ তৈরি হয়েছে অনেক, সেই পথে এখন হাঁটতে হবে।

সেকাল। তোমার গা ম্যাজানি সারাতে আমাকে তর্কে নামালে, কিন্তু তোমার কথা শুনলে হাড় পিত্তি

জ্বলে যায় ; না চেঁচিয়ে পারাই যায় না। (ওরে, ও নিধিরাম গড়গড়াটায় একটু তামাক দেতো। মগজটা একটু খুলুক গড়গড়া আসিলে তাহাতে টান মারিয়া)। হ্যাঁ, কি বলছিলে বল ? দেখ তোমার ওই অতলস্পর্শী সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি বড় বড় কথা এখন রাখ। চোখ বুজে, সোজা শাস্ত্রের পথে চল, তোমাদের আর ভাবতে হবে না। নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হবে।

একাল। কিন্তু তার আগেই যে দেখতে পাই শঙ্কট এসে পড়ে। আগের অনেক রাস্তা গেছে বিলুপ্ত হয়ে, জঙ্গলে মিশে। নতুন রাস্তা যা চোখে পড়ে, তাতেও চলতে পারিনে, আপনাদের দল একেবারে রা-রা করে এসে পড়েন আর ভয় দেখিয়ে বলেন—রসাতলে যাবে। এমন দোটানায় অনেক মুস্কিল হয়। কত অসুবিধে বলুন তো ?

সেকাল। শুধু গায়ের জোরে বললেই হয় না। কোথায় অসুবিধে ঘটছে দেখাও।

একাল। তাহলে তর্কটা কেন্দ্রীভূত করে একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর এনে ফেলা যাক।

সেকাল। বেশ, বিষয় ঠিক কর।

একাল। তবে নারী নিয়ে তর্ক করা যাক।

সেকাল। (আঁৎকিয়া উঠিয়া) এত থাকতে নারী কেনরে বাপু। বিষয়টা বিশেষ রকম জটিল। জানইত নারীর মন দেবা ন জানন্তি। আমি সেকেলে মানুষ, ও নারীটারি দেখলে বড় ঘাবড়ে যাই।

একাল। না, না, ঘাবড়াবেন না। বিষয়টা Interesting হবে। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কলেজের ছাত্রেরা তো special attention দেবে। আপনি লজ্জা পাবেন না। একটু অভ্যস্ত হতে শিখুন। কারণ নারীদের আর চেপে রাখা যাবে না। শেষে কি ঘরের কোনে আশ্রয় নেবেন ?

সেকাল। বল, কি বলতে চাও। তোমার সমস্ত যুক্তি আমি খণ্ডন করবো।

একাল। বিধবা বিবাহের কথাই ধরুন না।

সেকাল। তার মানে ? ওতে আর ধরা-ধরির কি আছে ?

একাল। নিঃসন্তান বাল-বিধবাদের আবার বি[illegible] দেওয়া উচিত।

সেকাল। (লাফাইয়া) না কখনই না। ওটা রস[illegible] তলের পথ।

একাল। কেন ? তা ঠিক পেলেন কি করে ?

সেকাল। ওতে শাস্ত্রের অনুমোদন নেই।

একাল। কেন ? শাস্ত্রে তো আছে, এবং বিদ্যাসা[illegible] তা দেখিয়াছিলেন। শুধু শাস্ত্র নিয়েও আপনারা চলে[illegible] না। দেশাচারই আপনারা বড় মানেন। যাক্, সেক[illegible] ছেড়েই দিন না। না-হবার সাপক্ষে যুক্তিটা কি তা[illegible] দেখান।

সেখান। যুক্তি ? যুক্তি মনু পরাশর প্রভৃতি শা[illegible] কারই জানতেন। যুক্তির সন্ধান আমার কাজ নয়। আ[illegible] বুঝি, ও ভাল নয়। বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে এ[illegible] শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। আর তাতেই সমাজের কল্যাণ। এ[illegible] অন্যথা আমি ভাবতে পারিনে। দেখতেও পারিনে।

একাল। আর, এক স্ত্রী থাকতে আরও গোটা কয়েক স্ত্রী, এবং স্ত্রী বিয়োগ হলে যে বয়সেই হোক্ আবা[illegible] একটি বিবাহ, এ সবই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ? বাঃ চমৎকা[illegible] যুক্তি। শাস্ত্রকাররা সব পুরুষ ছিলেন নিশ্চয়ই ?

সেকাল। সেকথা আসে কিসে ?

একাল। নারীর জন্য এই লোভ মোহ পূর্ণ সংসা[illegible] ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি বেশ জাবেদা রকমের ব্যবস্থা, আ[illegible] পুরুষের জন্য যত রকমের সুগম সরস পন্থা কি নারীপুরু[illegible] মিশ্রিত কোন চিন্তাধারায় স্থান পেতো ? তাই মনে হ[illegible] তারা সবই পরুষ ছিলেন এবং বিশেষ বিবেচকও ছিলেন।

সেকাল। শাস্ত্রকাররা পুরুষ ছিলেন কিন্তু নারীর উপর কোন অবিচার করেন নি। আমাদের সংসারে নারী পূজনীয়া।

একাল। এই আর এক প্রকারের ভণ্ডামি। গরু মেরে জুতা দান।

সেকাল। কেন ? তা মনে হোল কিসে ?

একাল। পূজোপূজো বলে গলা ফাটান, সেই পূজোটা কি ভাবে সম্পন্ন হয় একটু ভেবে দেখেছেন কি ? আমাদের সমাজে নারীর কোন স্থান নেই। হিন্দুর আইন

নারীকে পিতা বা স্বামী কারুর সম্পত্তিতেই কোন অধিকার দেয় নি। নারী স্বামী গৃহেও শুধু খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকারিণী। পিতার সম্পত্তিতে তার আদৌ কোন অধিকার নেই। এ সমস্ত নারীপূজারই লক্ষণই বটে! দেখুন, ও পুজোটুজো শুধু ফাঁকা আওয়াজ।

যারা একটু বাইরের আলোক পেয়েছে তাদের আর ওতে মন ভরে না। ওর মূল্য তারা জেনেছে!

সেকাল। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। হাতে ক্ষমতা পেলে আর রক্ষে ছিল? আমাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠতো। সংসারে আর সুখ থাকতো না, তাই ওদেরকে নিঃসহায় করে রাখার ব্যবস্থা।

একাল। এ্যাতো বড় এক চোখোমী আর আছে? শুধু পুরুষের সুবিধে দেখলে আধুনিক নারী তা মানবে কেন?

সেকাল। মানতে চায়না বলেই তো আধুনিক সংসারে সুখও নেই। চুলোয় যাক সব।

একাল। আপনি চটে যাচ্ছেন। চটলে আসল বুদ্ধি লোপ পায়। বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন।

সেকাল। ভাবি চটবো না, কিন্তু তোমাদের কথা শুনে না চটে পারার জো নেই। গায়ে হুল ফোটাতে থাকে।

একাল। সে তো বটেই। যেখানে কোন যুক্তি নেই সেখানে চটে যাওয়াই সুবিধে। পুরুষের হাতে স্ত্রীকে শাসনের যত রকমের ব্যবস্থা হতে পারে সবই রইল আর মাতাল দুর্বৃত্ত স্বামীকে শাসনের এতটুকু সুবিধেও নেই স্ত্রীর হাতে; এর চেয়ে অনুদার নীতি আর কি হতে পারে? যেকোন বড় ব্যবস্থাই পক্ষপাতশূন্য হওয়া চাই। নইলে টেকে না।

সেকাল। এটা পক্ষপাতিত্বের কথাই নয়। সামাজিক কল্যাণের জন্যই এই ব্যবস্থা। কারুর ব্যক্তিগত সুবিধের দিকে শাস্ত্রের ব্যবস্থা হয় না।

একাল। কিন্তু অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তারা তো রসাতলে যাচ্ছে না?

সেকাল। ওসব গায়ের জোরে বলা চলে। এতে নরকের পথই পরিষ্কার হয়, স্বর্গের নয়।

একাল। কিন্তু এদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এরা সবাই যদি নরকগামী হয়, তাহ'লে নরকে স্থান সঙ্কুলান হওয়া মুস্কিল হবে। দমদম্ স্পেশাল জেলের মত স্পেশাল নরক বানাতে হবে।

সেকাল। তুমি ডেঁপো ছোকরা। তোমার কথার জবাব আমি দেব না।

একাল। আবার চটছেন? এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিন্। উত্তেজনাটা একটু কাটুক। নইলে তর্ক চালাতে ভরসা পাইনে।

সেকাল। ছোট লোক'দের মধ্যে প্রচলিত থাকলেই সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা উচ্চ শ্রেণীর আর তারা ছোট লোক, মনে রাখতে হবে।

একাল। মস্ত বড় সান্ত্বনা।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রাচ ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ
বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংশমপি কর্ষতি।

ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররাই যখন এতটা ভীত ছিলেন তখন সেই বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে শুধু উচ্চ শ্রেণীতে জন্মাবার সান্ত্বনাই সংযত জীবন যাপনের পথে যথেষ্ট হবে কি? এই লোভ মোহময় সংসারে এই বাল-বিধবাদের পক্ষে ভুলচুক হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। আর ভুল হলে তো নরকবাস নিশ্চয়ই। তাহলে, ওই ছোট লোকরা নরকে যাবে কিনা তা সঠিক জানা নেই, কিন্তু এই বিপথগামী বিধবারা যে নরকগামী হবে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেকাল। দেখ, মনুর ব্যবস্থা নিয়ে এরকম ঠাট্টা বিদ্রূপ চলবে না। তিনি যা করে গেছেন তার ব্যতিক্রম হতে দিতে আমরা রাজি নই। মনু ছিলেন দেবতা।

একাল। কিন্তু সেই দেবতাই যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি নিজেই বোধকরি এই পুরাতন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন অনুমোদন করতেন। কিন্তু তার চেলারা যে তার উপরে যায়। আপনি বিধবা-বিবাহের নামেই শিউরে উঠেছেন, আমার তো মনে হয় আজ মনু বেঁচে

থাকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ডিভোর্সের ব্যবস্থাতেও চমকাতেন না।

সেকাল। কি বললে পাষণ্ড? ডিভোর্স? তোমরা ছারেখারে যাবে, মরবে, সর্ব্বনাশের আর বাকি নেই। অধস্তন সাতপুরুষ নরকে যাবে।

একাল। তা ঠিকই বলেছেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন আইন প্রণয়ন করে "সতীদাহ" প্রথা তুলে দিয়েছিলেন তখনও আপনাদের দল খুব চেঁচিয়েছিল। চাঁদা করে টাকা তুলে বিলেত পর্য্যন্ত আপিলও করেছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সদাশয় বেন্টিঙ্কের সেই কার্য্যে সর্ব্বনাশের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। দাসত্ব প্রথা যখন তুলে-দেওয়া হয়, শুনতে পাই দাসেরা নিজেরাই তার বিরুদ্ধে কেঁদে কেঁদে আপত্তি জানিয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী। মানুষ প্রচলিত প্রথার এমনি মারাত্মক রকমে বাধ্য। ডিভোর্সও অভ্যাস হয়ে গেলে, এ্যাতেও খারাপ লাগবে না, তা বলতে পারি।

সেকাল। একটা কথা তোমরা ভেবে দেখতে পার; ডিভোর্স যারা প্রথম প্রচলন করেছিল তারাই কি আজ সুখে আছে? যে বিষবৃক্ষ তারা রোপণ করেছিল তার বিষফল খেয়ে তারাই দলে দলে মরছে। তার খোঁজ রাখ? আর তারই বীজ এখানে ছড়াতে চাও—এই পুণ্যময় ভারতভূমে?

একাল। তাই বৈ কি। তারা মরছে কিন্তু মারছে না। আমরা মরছি এবং মারছিও। তারা মরুক, মানুষ অমর নয়। তাদের তাতে দুঃখও নেই। কারণ জীবনটাকে তারা উপভোগ করে মরছে। তারা পৃথিবীময় তাদের বিজয়কেতন সগর্ব্বে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যতক্ষণ ঘর সামলাচ্ছি, তারা ততক্ষণ বাইরে কে লুট করে এনে ঘরে পুরেছে। ঘরও তাদের পূর্ণ আছে, বাহিরও পূর্ণ আছে; তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তারা শক্তি এবং সাহচর্য্যে সর্ব্ববিষয়ে পারস্পরিক স্বার্থ বাঁচিয়ে পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করছে। তারা অনিশ্চিত পরপারের ততোধিক অনিশ্চিত সুখ সম্ভোগের মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়ে নারীর ইহকালের সম্ভোগটুকু পুরুষের আনন্দযজ্ঞে আহুতি দিতে বলে নি। নারীর নিজস্ব গত অধিকারের উপর তারা জুলুম করে নি।

সেকাল। আমাদের বৈশিষ্ট্যের জোরেই আমরা বড়। সেই বৈশিষ্ট্য খুইয়েচি। পাশ্চাত্য জগতের ধারা অনুসরণ করলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য তা বলে রাখছি।

একাল। বৈশিষ্ট্য মানে তো সবার থেকে আলাদা রকমের একটা কিছু। সবার থেকে আলাদা নাইবা হলাম! বৈশিষ্ট্য যাক্ না। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা নিয়েই কথা। পৃথিবীর আর দশ জনের মত বেঁচে থাকায় আপত্তি কি? বিশেষ দেশের বিশেষ জাতি বলে নাই বা চিনলো। স্বতন্ত্র একটা কিছু হলেই বড় রকমের একটা কিছু হয় না। বৈশিষ্ট্য যাবে শুনলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। জাতিটাই যদি মরে, বৈশিষ্ট্য বাঁচবে কি?

সেকাল। তোমরা আধুনিক যুগের নব্য ছোকরা, তোমাদের অসাধ্য কাজ নেই, দুপাতা ইংরেজি পড়েছ কিনা, তা নাহলে এমন সনাতন ধর্ম্ম তুমি এমনি করে কলুষিত করতে চাও? হিন্দুর বৈশিষ্ট্য তুমি গৌরবের মনে কর না, এ কম দুঃখের কথা?

একাল। দেখুন বৈশিষ্ট্য রব তুলে হা-হুতাশ করে লাভ কিছু নেই। পৃথিবীময় একটা যোগসূত্র রয়েছে। এর এককোণে যে স্রোত বয়, যে আবর্ত্ত ওঠে তার সংঘাত সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঝড়েও কূপের জলের মত নিজের জলটুকু নির্ম্মল রাখার উপায় আর নেই। কূপের জল হয়ে নির্ম্মল থাকতে আমরা আর চাইনে। সমুদ্রের জল হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলতেই চাই। সমুদ্রই বক্ষে রত্ন ধারণ করে—কূপ নয়। কিন্তু কূপের জল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।

সেকাল। তুমি যত জোরের সঙ্গেই তোমার যুক্তি সমর্থন করতে চাও করতে পার কিন্তু ওকে চালু করতে পারবে না। দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে ডিভোর্সের কথা আমি ভাবতে পারিনে। ভগবান ব্রহ্মা অলক্ষে বসে এই সম্বন্ধ সৃষ্টি করে রাখেন! মানুষ তারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। মৃত্যুর পরেও এ সম্বন্ধ ছিন্ন হবার নয়। মৃত্যুর পরেও এ ঠিক থাকবে।

একাল। হ্যাঁ ঠিকই! স্ত্রীর দিক দিয়ে ছিন্ন হবার

নয়। কিন্তু স্বামীর দিক দিয়ে আবশ্যক মত যখন তখন ছিন্ন হতে পারে। স্ত্রীর অসুবিধা ষোল আনাই। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। অর্থাৎ যে বেচারা স্ত্রীর ইহকালে সতীন ছিল না। পরকালে গিয়ে সুখময় স্বর্গধামে সতীনের উৎপাতে সেখানকার সুখটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কারণ স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটীও তো সম্পর্কচ্যুত হয়ে অন্যত্র অবস্থান করবেন না। তিনিও তো পিছু পিছু স্বর্গ পর্য্যন্ত ধাওয়া করবেন।

সেকাল। তুমি থাম! শাস্ত্রকাররা যা করে গেছেন তা নিয়ে বিচার বিতর্ক চলে না। ও সব অকাট্য। তোমার দুঃসাহস যে তুমি শাস্ত্রের ব্যবস্থা অমান্য করতে বল?

একাল। যে-ব্যবস্থা এখন আর চলে না, তা অমান্য করায় ক্ষতি কি? যে-বিধান স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমান চক্ষে দেখে না, স্ত্রীকে পুরুষের করায়ত্বে রাখবার জন্য নিরর্থক কতকগুলি কড়াকড়ির জাল বোনে, তা মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। যে বিধানের রচিত দড়াদড়ি শুধুমাত্র নারীকেই বেঁধেছে, সে মঙ্গলময় বিধান নয়। স্ত্রী শিক্ষা যখন মেনে নিয়েছেন তখন সে সব নিয়মের কিছু সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সত্যের পরীক্ষা কোন্ এক যুগে কোন্ মনীষির দ্বারা হয়ে গেছে বলে, তা কি চিরকালের মত একেবারে চুকে বুকে গেছে? তা যদি হতো তা হলে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘুরছে এই সিদ্ধান্তই চিরকাল জগতে নিটুট হয়ে থাকতো।

সেকাল। কিন্তু এই ডিভোর্স প্রথা প্রচলিত থাকার দরুণ আমেরিকায় হাজার হাজার স্ত্রী প্রতি বৎসর স্বামী ত্যাগ করছে। কত ঘর সংসার উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। নারীর উপর কিছু বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা না থাকলে এমনই হবেই।

একাল। কিন্তু বাঁধনটা শান্তির ব্যবস্থা নয়। ওতে ভেতরে ভেতরে অশান্তির আগুনই জ্বলে।

সেকাল। তা জ্বলুক, তবু আবহমান কালের ব্যবস্থা বদলানর পরামর্শ আমি অন্তত দিতে পারিনে।

একাল। আপনি তো দেবেন না তা জানি। কিন্তু যাদের উপর প্রয়োগ করতে চান তারা আর নির্ব্বিচারে তা মেনে নিতে চাচ্ছে না। মনুর ব্যবস্থায় আছে—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্রো কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বাপি॥"

আপনি তো এই একটু আগেই নারী পূজার উদাহরণ খাড়া করছিলেন। কিন্তু স্বগৃহেও স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যার অধিকার নেই, তাকে তুষ্ট করবেন কোন্ পূজার সামগ্রী দিয়ে?

সেকাল। আমি তো বলেছি, স্বাধীনতার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত দিতে ওঁদের কেউ কোন কালেই রাজি ছিলেন না। আর তুমি বল ডিভোর্স?

একাল। অবশ্য পরাশর সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকে আবার অন্য কথাও বলেছেন। যেমন—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।"

সেকাল। তোমার মুখেও শাস্ত্রবচন? ভূতের মুখে রামনাম। কিন্তু এটা জেনে রেখো যে তোমার সুবিধে মত ওর অর্থ ধরা যেতে পারে না।

একাল। শাস্ত্রের বচন আপনার সুবিধে মতই ধরুণ। অন্য পতি গ্রহণের ব্যবস্থা তো আছেই। না আপনার অর্থ অনুযায়ী তাও উল্টে যাবে?

সেকাল। তোমার কাছে আমি শাস্ত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চাইনে। তোমার মুখে ও মানায়ই না। তোমরা হ'লে শাস্ত্র ভাঙার কালাপাহাড়।

একাল। সে তো বটেই। এখানে একটু অসুবিধেয় পড়েছেন। আসল কথা হ'ল ধর্ম্ম টর্ম্ম সব লোক ভুলানো বুলি। ধর্ম্মের ভিত্তি হল নীতি পালনের উপর। হিন্দু ধর্ম্মের প্রথম যুগের নীতির সহিত আচার পালনই এখন সব কিছু। এ সব আচার আমরা কেন মানি তা ভেবে দেখবো না। মানি, কেননা বাপ পিতামহর আমল থেকে চলে আসছে। আসল কথা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার চেয়ে পদ্ম পিসির অনুশাসনই বেশী প্রবল। এই সব কারণেই সমাজ ব্যবস্থাও আজ আইনের হাতে তুলে দিতে হয়। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে।

তখন মানেন নি। শেষে আইনের প্যাঁচে পড়ে মানতে বাধ্য হলেন।

সেকাল। তোমাদের হাতে আছে ওই অস্ত্র। এমনি করে আইনের বান মেরে মেরে সমাজদেহকে তোমরা একেবারে শর শয্যায় চড়িয়ে ছাড়বে। পণ প্রথাটাও ডিভোর্সের সঙ্গে আইনের কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও; একটা কিছু করে ফেল।

একাল। করবে কি? নইলে বিচার বুদ্ধি দিয়ে আপনারা যে কিছুই মানতে চান না। যে কোন পরিবর্ত্তনের নামে আঁৎকে ওঠেন। অথচ জগত নিজেই পরিবর্ত্তনশীল তা ভুলে যান।

সেকাল। তোমরাও তো শাস্ত্রের নামে আঁৎকে ওঠ।

একাল। তা হলে আমরা দুইই সমান। তেম্‌নি হাম্‌বি মিলিটারী। কেউ কারুর কথা মানবো না।

সেকাল। আমরাও হয়ে পড়েছি কলির ব্রাহ্মণ। চোখে আর আগুন জলবে না। জললে দেখাতাম।

একাল। চোখ রাঙিয়ে শাসনের দিন আর নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ এসেছে। বিচার বুদ্ধি দিয়ে যা ভাল মনে হবে তাই আজকের লোকে গ্রহণ করবে। শাস্ত্র দেখিয়ে মন ভোলান যায় না। স্ত্রীদেরকেও না।

সেকাল। এবার রেহাই দাও, আমি হার মানছি।

একাল। তাহলে ডিভোর্স প্রথা মানতে রাজি?

সেকাল। না কখন না। তোমরা আইনের গদা ঘুরিয়ে ও প্রথা চালু করতে চেষ্টা করনা; আমি যাই বাপু, একটু তামাক খাইগে। এমন জানলে আমি তর্কে নামতাম না। তোমার গা ম্যাজমাজ করা সেরেছে তো, এবার আমাকে রেহাই দাও।

একাল। আপনাদের ব্যবস্থায় স্ত্রী ঘটিবাটি গেলাস গামছার সামিল। ঘটীবাটির তবু একটু সুবিধে যে মালিক যদি বিক্রয় করেন, তবে সে ক্রেতার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, কিন্তু অর্থের লালসায় স্ত্রীকে যদি স্বামী বিক্রয় করেন তাহলেও পূর্ব্বেকার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। তখনও তারা স্বামী-স্ত্রী।

সেকাল। আমি শাস্ত্র আগে বুঝি, তারপর অন্তকাজ! শাস্ত্র অমান্য করে ত্যাগী হতে পারিনে।

একাল। আমি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষকেই আগে দেখি। স্ত্রীও মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের ন্যয্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করবো কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে?

সেকাল। দেখ গড়তেই কষ্ট, ভাঙা সোজা।

একাল। সে কথা মানি। কিন্তু আমি যা বলছি এ ধ্বংসমূলক নয়। নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমরা নিজেরাই ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েছি, পড়বো। অর্দ্ধসংখ্যক লোক তো তারাই। পরমুখাপেক্ষী নারীকে কেহ মানবে না। ছেলেদের সঙ্গে তাদেরকে সমান চক্ষে দেখতে হবে, তাদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে। পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দিতে হবে। তাতে তাদের অসহায় অবস্থা ঘুচবে, হিন্দুর মর্য্যাদা এবং শক্তি বাড়বে—কমবে না একটুও।

সেকাল। তোমাদের যা খুশী কর। ধ্বংসের রাস্তা সহজেই তৈরি হয়।

একাল। রাস্তা আপনারাই করেছিলেন। অস্পৃশ্য লোককে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তারা আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে। নারীদের মধ্যে যে অশান্তির চাপা আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল, তা আজ প্রচণ্ড শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠেছে। তাতেই তো আজ সমাজ সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সেকাল। তুমি যা খুশী বলতে থাক, আমি চল্‌লাম।

একাল। তা আপনি যেতে পারেন। তবে যাবার আগে জেনে যান যে হিন্দু ধর্ম্মের সে স্পিরিট আজ চলে গেছে, আছে শুধু কতকগুলি ফর্ম্ম, শুধু ফর্ম্ম বজায় রেখে ধর্ম্মভাব প্রাণে জাগে না। কাজেই এটা কোর না, সেটা কোর না, এটা কর—এর কোন মানে হয় না। কেন করবো না আর কেন করবো তার কারণ জানতে চাই। হ্যাঁ—তাহলে আমাদের আজকের তর্কের সিদ্ধান্ত কি সেটা ঠিক হোক।

সেকাল। অশ্বডিম্ব।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বৰ্দ্ধমানের দান

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বর্দ্ধমান জিলার কবিগণের দান অপরিসীম। অগণিত প্রাচীন কবি বর্দ্ধমান জিলার অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়। কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। ১৪৫৯ শকে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। গোবিন্দ দাস চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, ইহার পর তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলী ভিন্ন ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত মাধব পদাবলী এবং কর্ণামৃত নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর সহিত গোবিন্দদাস বৃন্দাবন যাত্রা করেন। গোবিন্দ দাস একবার কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হন। "রাধাকৃষ্ণ" এই চতুরক্ষর মন্ত্র গ্রহণে তিনি সে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৫৩৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ৭৫ বৎসর বয়সে ইনি অন্তর্ধান করেন।

কবি বলরাম দাসও বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডনিবাসী। ইনি বৈদ্যবংশীয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে ইনি "কবি নৃপবংশজ" বলিয়া অভিহিত। ইহার পিতার নাম আত্মারাম দাস; মাতার নাম সৌদামিনী। "প্রেমবিলাস" ইহারই প্রণীত গ্রন্থ। ইহার গুরুদত্ত নাম, নিত্যানন্দ দাস। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥"

কবি জগদানন্দ ১৬২৪ শকে বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইহার পিতার নাম নিত্যানন্দ, —পিতামহের নাম পরমানন্দ। ১৭০৪ শকে বা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আশ্বিন বামন দ্বাদশীর দিন জগদানন্দের দেহত্যাগ হয়। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত ইনি "ভাষা শব্দার্ণব" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বর্দ্ধমান জিলার কাঞ্চননগরের কবি গোবিন্দ কর্ম্মকার গোবিন্দ দাস নামেই পরিচিত। ইহার কড়চা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী তিনি বিশদভাবে লিখিয়া রাখিতেন। কড়চার বর্ণনা,—অতিরঞ্জন দোষশূন্য, পরন্তু সরল ও মধুর।

কবি রামশেখরের জন্মভূমিও বর্দ্ধমান জিলার পড়ান গ্রাম। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামী ইহার দীক্ষাগুরু। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়। ইহার প্রকৃত নাম শশিশেখর। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী কবি।

কবি পরমানন্দ সেনের নিবাস বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রামে। পিতার নাম শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র,—চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর বা পরমানন্দ। যথা,—

"চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর॥"

পরমানন্দ ১৪৪৯ শকে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবাল্য কবি। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ,—শ্রীচৈতন্যশতক, স্তবাবলী, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, কৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা এবং অলঙ্কার কৌস্তভ। মহাপ্রভুই ইহাকে কবি কর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। ইহার আর একটি নাম পুরীদাস।

বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে কবি নরহরি দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পিতা নারায়ণের দুইপুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। মুকুন্দ গৌড়পতির চিকিৎসক ছিলেন। নরহরি আবাল্য সংসারবিরাগী। নরহরির গ্রন্থ,—ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল ও ভক্তামৃত অষ্টক প্রসিদ্ধ। ইনি বড় সুকান্তি পুরুষ ছিলেন। শ্রীখণ্ডের

গৌরনিতাই মূর্ত্তি ইহারই স্থাপিত। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোভাব হয়। নরোত্তম দাস "হাটপত্তনে" লিখিয়াছেন,—

"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥"

নরহরিই প্রথমে গৌরলীলার পদ রচনা করেন। সেই হেতু বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট সমাদর। নরহরি চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের গুরু। ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন।

বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রামে বিখ্যাত বসু বংশে কবি রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের নাম গুণরাজ খান বা মালাধর বসু। পিতার নাম সত্যরাজ খান। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানন্দ,—দ্বারকানগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত ভ্রমণ করেন।

বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডগ্রাম কবি আত্মারাম দাসের জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পদাবলী রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত।

বর্দ্ধমান জিলার আমাইপুরা গ্রামে কবি জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র; মাতার নাম রোদনী। সুবুদ্ধি গৌরাঙ্গ দেবের শিষ্য। পুরী হইতে বর্দ্ধমান যাত্রাকালে চৈতন্য সুবুদ্ধির বাটীতে যান। তখন সুবুদ্ধির পুত্রের নাম জয়ানন্দ রাখেন। কবির পূর্ব্ব নাম ছিল গুইয়া। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনেকাংশই বিভিন্ন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঐতিহাসিকত্বে অপূর্ব্ব।

কবি শিবানন্দ সেনের নিবাস বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রাম। ইনি অম্বষ্ঠ বংশীয়। প্রচুর মণিকাঞ্চনেও কবির পদাবলী রচনায় ব্যাঘাত হয় নাই।

কবি লোচনদাস ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর দাস; মাতার নাম সদানন্দী। কবির পূর্ণনাম ত্রিলোচন দাস। চৈতন্যমঙ্গলে কবি লিখিতেছেন,—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে ধাম।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তি দাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত,—লোচনদাস "দুর্লভসার" নামক প... একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যমঙ্গল তাঁহ... চৌদ্দ বৎসর বয়সকালে রচিত। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎ... বয়সে ইঁহার তিরোধান হইয়াছে। বর্দ্ধমান কাঁকড়া গ্রা... নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী... বাড়ীতে,—লোচনদাসের স্বহস্ত লিখিত চৈতন্য মঙ্গল পুঁ... অদ্যাপি বিরাজিত। লোচনদাসের হস্তাক্ষর বড়ই ক... ছিল।

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রা... বৈদ্যবংশে ১৪১৮ শকে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্র... করেন। ইহার পিতার নাম ভগীরথ। মাতার ... সুন...। দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস—কনিষ্ঠ শ্যামদাস। কৃষ্ণদাস মেধাবলে অল্পদিনে ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হ... বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৯৪ শকে রচনা আরম্ভ করেন... ১৫০৩ শকে ৯ বৎসরে গ্রন্থ সমাপ্তি হয়। শ্রীমুরারি গু... এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত কবি কর্ণপুরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয়, এবং ... পুরাণ ইতিহাস অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ৺রাধামাধবের মন্দিরে পরম ভক্তি সহকারে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণদাসের অন্যান্য গ্রন্থ,—বৈষ্ণবা..., গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গ রঙ্গদা নাম্নী টীকা প্রভৃতি। ১৫০৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বা... তিথিতে ৮৭ বৎসর বয়সে কবিরাজ গোস্বামীর অ... হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ... শাস্ত্র বিচার সুন্দররূপে মীমাংসিত।

বর্দ্ধমান জিলার রায়না থানার অধীন, রত্নাহু তরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী দামুন্যগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের জন্ম হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতারনাম দৈবকী। মিশ্র ইঁহাদের নবাব দত্ত উপাধি। ইঁহারা চক্রবর্ত্তী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কোয়ারি গাঁঞি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র। মুকুন্দরাম 'পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মামুদ সরিপ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কবি সপরিবারে জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করেন, এই সময় তাঁহাকে অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতঃপর মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে স্বীয় সুত রঘুনাথের শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত করেন। তাহাতে মুকুন্দরামের অন্নচিন্তা দূর হয়। দেবীর আদেশানুসারে, পরন্তু জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আজ্ঞায়, মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৪৯৫ শকে চণ্ডী কাব্যের আরম্ভ ও ১৫২৫ শকে শেষ হয়। কবিকঙ্কনের বংশধরগণ এক্ষণে বর্দ্ধমান জিলার ছোট বৈন্যান গ্রামে বাস করিতেছেন। সেনাপতি গ্রামে বাঁকুড়া রায় বংশীয়দের বর্ত্তমান বাটীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত লিখিত একখানি চণ্ডীপুঁথি প্রত্যহ ফুল চন্দন পূজিত হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহাকুমার অধীন সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের জন্ম। কাশীরাম কায়স্থ। ৯৬৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রপিতামহের নাম কমলাকান্ত। বাঙ্গালা ১০০০ সালে ইনি মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন।

মেদিনীপুর আস্তাসগড়স্থ রাজার আশ্রয়ে কাশীরাম কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহার মহাভারতের কোন কোন স্থল, মূল সংস্কৃত মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ। কাশীরামের অন্য দুইখানি গ্রন্থ—নলোপাখ্যান ও জলপর্ব্ব,—কিশোর বয়সের লেখা বলিয়া অনুমিত। রচনা অনেক পরিমাণে কাঁচা!

"জগৎ মঙ্গল" রচয়িতা গদাধর দাস কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। বাঙ্গলা ১০৫০ সালে "জগৎ মঙ্গল" গ্রন্থ রচিত হয়।

"চতুঃ ষষ্ঠি শকাব্দা সহস্র পঞ্চাশ শত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥"

ক্ষমানন্দ দাস ও বর্দ্ধমান জিলাবাসী। মনসার মহাত্ম্যময় "মনসার ভাসান" কবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে ক্ষমানন্দ কেতকাদাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জিলার বহুগ্রামের নাম মনসার ভাসানে সন্নিবিষ্ট। মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি। কল্পনা ও কবিত্বে "মনসার ভাসান" একান্ত প্রশংসনীয়।

কবিচন্দ্র, মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ সহোদর। নিবাস বর্দ্ধমান জিলার দামুন্যা।" শিশুবোধকে ইহা দাতাকর্ণ এবং "কলঙ্কভঞ্জন" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার কবিতা সরস এবং সরল।

বর্দ্ধমান জিলার খণ্ডাঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘনরামের নিবাস। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ। ইঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র শঙ্কর ও গৌরীকান্ত। গৌরীকান্তই ঘনরামের পিতা। ইহারা পৌষন্বান গোত্রীয়।

"ঠাকুর পরমানন্দ পৌযন্বান বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তাঁর সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত॥
মাতা আর মহাদেবী সতী স্বাধ্বী সীতা।"

১৬০১ শকে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গুরু তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি দেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহাকে রাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজাদেশে তিনি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনায় মনোযোগী হন। ১৬৩১ শকে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। ইনি মধুরকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। বংশধরগণ অদ্যাপি কৃষ্ণপুরেই বর্ত্তমান। ঘনরামের সুন্দর হস্তলিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল পুথি আজিও ইহাদের বাটীতে সযত্নে সুরক্ষিত আছে।

ঘনরামের ন্যায় বর্দ্ধমান জিলার দেনুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কুয়াড়া গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর রচিত অনুরূপ একখানি ধর্ম্মমঙ্গল সংরক্ষিত আছে। ইহা চব্বিশ পালায় সম্পূর্ণ। সাহিত্যানুরাগীর নিকট শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বড় আদরের সামগ্রী।

সাধক কমলাকান্ত ১২১৬ সালে অম্বিকাকালনা হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মহারাজার গুরুপদে বরিত হন। মহারজ বর্দ্ধমানের নিকট-বর্ত্তী কোটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কমলাকান্তের সঙ্গীত পীযুষধারায় বর্দ্ধমান বঙ্গ ডুবুডুবু হইয়া উঠে।

বর্দ্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামে ১১৯৩ সালে রঘুনন্দন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কিশোরীমোহন। মাড়োগ্রাম মানকরের নিকটবর্ত্তী। এরালবাহাদুরপুরে গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েন। সতর বৎসর বয়সেই রঘুনন্দন ভাগবত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। আঠার বৎসর বয়সেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ রামরসায়ণ গ্রন্থ, তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে রচিত। রামরসায়ণ ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ইহার এই রামরসায়নই মন্দিরাসংযোগে গীত হইয়া থাকে। প্রকৃতই রামরসায়ণ উপমা প্রাচুর্য্য, ছন্দবাহুল্য ও কবিতামাধুর্য্যে ভরপূর। অবশ্য রঘুনন্দন স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ কবি তুলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতে কোন কোন আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। কবির আর একখানি গ্রন্থ — গীতমালা—। ইহা ত্রিশটি গ্রন্থণে বিভূষিত। এক একটি গ্রন্থণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা বর্ণিত। আর গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাধামাধবোদয়। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রকটিত। মালঝাঁপ, বৃত্যনুপ্রাস, একাবলী, ত্রিপদী, ললিতা, ষোড়শাক্ষরী, কাঞ্চিযমক, তোটক; লঘুত্রিপদী; পঝঝটিকা, ছেকানুপ্রাস, যমক, তুনক ও মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী প্রভৃতি বিবিধছন্দে এই গ্রন্থ অতিমাত্রায় বৈচিত্র্যশালী। কবি ২৪ পরগণা জিলার পান্নিহাটী গ্রামে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। বাংলা পুস্তক ব্যতীত রঘুনন্দন ত্রিশখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যও লিখিয়াছিলেন। ইহার আট সন্তান,—১ মাধবানন্দ ২ কন্যা ৩ রামগোপাল ৪ কন্যা ৫ ব্রজগোপাল ৬ জয়গোপাল ৭ শৈশবে মৃত পুত্র ৮ মদন-গোপাল। কবি, রামকমল সেনের সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ বর্ত্তমান।

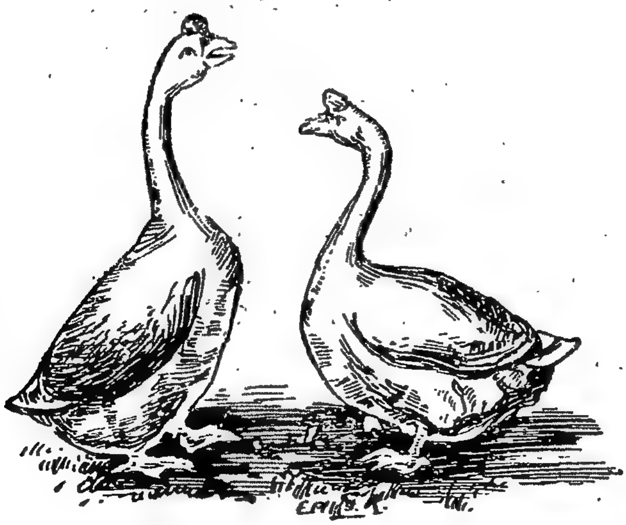

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ছোট-গল্প

(১২৯৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার ছোট গল্প লেখক বলিয়াই পরিচিত।

কোনও লেখকের লেখার সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের সহিত একটু পরিচয় থাকা আবশ্যক। যিনি যত উত্তমই লিখুন, তাহা সর্বতোভাবে সর্বযুগে সর্বত্র উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কারণ জগতের চিন্তা ধারার পরিবর্তনে উহা উত্তম ও অনুত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়া পড়ে।

যে কোনও লেখকের লেখার সমালোচনা সর্ব ক্ষেত্রে চলিতে পারে, কারণ ইহা কখনও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না যে সমালোচনা শুধু প্রশংসা বা শুধু নিন্দার জন্য।

সে যাহা হউক যে যুগে যে লেখক নিজের প্রতিভা-বলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার ভিতর সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা নিশ্চিতই ছিল। শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ছোট গল্প লেখক হিসাবে এ যুগে সে রূপ শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার হেতু থাকুক বা না থাকুক, তিনি তখনকার দিনের গণ্যমান্য ছোট গল্প লেখক ছিলেন।

তাঁহার "ইন্দু" ও "দাদার কাণ্ড" ছোট—গল্প দুইটি কিরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর, এবং তাঁহার অন্য ছোট গল্পগুলি কি চমৎকার।

তিনি কোনও দলের ছিলেন না। তাঁহার দল তিনি নিজে ও তাঁহার চিন্তাধারা নিজস্ব।

কিন্তু ইহা হইতে কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না যে, তাঁহার ছোট গল্পগুলি এক জাতীয়।

তিনি যদি কাহাকেও ভাষার দিক দিয়া অনুকরণ করিয়া থাকেন তবে তিনি তাঁহাকে এমন অনুকরণ করিয়াছেন, যাহাতে সে অনুকরণ আর কেহ ধরিতে পারে না।

তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে ইহা বলিতে হয় যে তিনি কখনও যেন এই দেশের আদর্শ তাঁহার কোনও ছোট গল্পে পরিত্যাগ করেন নাই। এই বাংলা দেশে যে সমস্ত ধর্ম—সংস্কার, সমাজ সংস্কার, পারিবারিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত সংস্কারের আদর্শ আছে, তিনি যেন সেই গুলি প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছেন।

"পর ধর্ম" কখনও আশ্রয় করেন নাই। আমাদের সব মন্দ আর অপরের সব ভাল একথাও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইতে শোনা যায় নাই। আমাদের ভালবাসা খারাপ আর উহাদের ভালবাসা ভাল, একথা তিনি কোনও ক্ষেত্রে লেখেন নাই।

হয়তো তিনি বিদেশীয়ের অনুকরণে ছোট গল্পের যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচনার অন্তর্নিহিত মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে কিরূপে তিনি বিদেশীয় আদর্শ অবলম্বনে নিজের দেশের আদর্শ বড় করিয়া তুলিবেন।

উমেদার। সাধনা, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের "উমেদার" ছোট—গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিনি উহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন, রবীন্দ্র নাথের ছোট গল্পও উহার কলেবরে শোভা পাইত, সুতরাং যে কোনও রকমের ছোট গল্প উহাতে স্থান পাইত না।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যে শুধু "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে "সাহিত্যে"ও ছোট গল্প প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার দুই একটা ছোট—গল্প "উৎসাহ" নামক মাসিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ছোট গল্পগুলির ধারাবাহিক আলোচনা কালে উহাদের নাম, তারিখ লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যে সময়ে এই "উমেদার" ছোট গল্পটি লিখিয়াছিলেন, তখন বাংলা দেশে এই যুগের বেকার সমস্যার প্রশ্ন উঠিয়াছিল কি না বিবেচ্য।

থাকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ডিভোর্সের ব্যবস্থাতেও চমকাতেন না।

সেকাল। কি বল্‌লে পাষণ্ড? ডিভোর্স? তোমরা ছারেখারে যাবে, মরবে; সর্ব্বনাশের আর বাকি নেই। অধস্তন সাতপুরুষ নরকে যাবে।

একাল। তা ঠিকই বলেছেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন আইন প্রণয়ন করে "সতীদাহ" প্রথা তুলে দিয়েছিলেন তখনও আপনাদের দল খুব চেঁচিয়েছিল। চাঁদা করে টাকা তুলে বিলেত পর্য্যন্ত আপিলও করেছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সদাশয় বেন্টিঙ্কের সেই কার্য্যে সর্ব্বনাশের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। দাসত্ব প্রথা যখন তুলে দেওয়া হয়, শুনতে পাই দাসেরা নিজেরাই তার বিরুদ্ধে কেঁদে কেঁদে আপত্তি জানিয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী। মানুষ প্রচলিত প্রথার এমনি মারাত্মক রকমে বাধ্য। ডিভোর্সও অভ্যাস হয়ে গেলে, এ্যাতেও খারাপ লাগবে না, তা বল্‌তে পারি।

সেকাল। একটা কথা তোমরা ভেবে দেখতে পার; ডিভোর্স যারা প্রথম প্রচলন করেছিল তারাই কি আজ সুখে আছে? যে বিষবৃক্ষ তারা রোপণ করেছিল তার বিষফল খেয়ে তারাই দলে দলে মরছে। তার খোঁজ রাখ? আর তারই বীজ এখানে ছড়াতে চাও—এই পুণ্যময় ভারতভূমে?

একাল। তাই বৈ কি। তারা মরছে কিন্তু হারছে না। আমরা মরছি এবং হারছিও। তারা মরুক, মানুষ অমর নয়। তাদের তাতে দুঃখও নেই। কারণ জীবনটাকে তারা উপভোগ করে মরছে। তারা পৃথিবীময় তাদের বিজয়কেতন সগর্ব্বে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যতক্ষণ ঘর সামলাচ্ছি, তারা ততক্ষণ বাইরে কে লুট করে এনে ঘরে পুরেছে। ঘরও তাদের পূর্ণ আছে, বাহিরও পূর্ণ আছে, তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তারা শক্তি এবং সাহচর্য্যে সর্ব্ববিষয়ে পারস্পরিক স্বার্থ বাঁচিয়ে পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করছে। তারা অনিশ্চিত পরপারের ততোধিক অনিশ্চিত সুখ সম্ভোগের মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়ে নারীর ইহকালের সম্ভোগটুকু পরুষের আনন্দযজ্ঞে আহুতি দিতে বলে নি। নারীর নিজস্ব গত অধিকারের উপর তারা জুলুম করে নি।

সেকাল। আমাদের বৈশিষ্ট্যের জোরেই আমরা বড়। সেই বৈশিষ্ট্য খুইয়েছি। পাশ্চাত্য জগতের ধারা অনুসরণ করলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য তা বলে রাখছি।

একাল। বৈশিষ্ট্য মানে তো সবার থেকে আলাদা রকমের একটা কিছু। সবার থেকে আলাদা নাইবা হলাম বৈশিষ্ট্য যাক্ না। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা নিয়েই কথা। পৃথিবীর আর দশ জনের মত বেঁচে থাকায় আপত্তি কি? বিশেষ দেশের বিশেষ জাতি বলে নাই বা চিনলো। স্বতন্ত্র একটা কিছু হলেই বড় রকমের একটা কিছু হল না। বৈশিষ্ট্য যাবে শুনলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। [illegible] যদি মরে, বৈশিষ্ট্য বাঁচবে কি?

সেকাল। তোমরা আধুনিক যুগের নব্য ছোকরা, তোমাদের অসাধ্য কাজ নেই, দুপাতা ইংরেজি পড়েছ কিনা, তা নাহলে এমন সনাতন ধর্ম্ম তুমি এমনি করে বর্জ্জিত করতে চাও? হিন্দুর বৈশিষ্ট্য তুমি গৌরবের মনে কর না, এ কম দুঃখের কথা?

একাল। দেখুন বৈশিষ্ট্য রব তুলে হা-হুতাশ করে লাভ কিছু নেই। পৃথিবীময় একটা যোগসূত্র রয়েছে। এর এককোণে যে স্রোত বয়, যে আবর্ত্ত ওঠে তার আঘাত সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঝড়েও কূপের জলের মত নিজের জলটুকু নির্ম্মল রাখার উপায় আর নেই। কূপের জল হয়ে নির্ম্মল থাকতে আমরা আর চাই নে। সমুদ্রের জল হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলতেই চাই। সমুদ্রই বক্ষে রত্ন ধারণ করে—কূপ নয়। কিন্তু কূপের জল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।

সেকাল। তুমি যত জোরের সঙ্গেই তোমার যুক্তি স্থাপন করতে চাও করতে পার কিন্তু ওকে চালু করতে পারবে না। দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে ডিভোর্সের কথা আমি ভাবতে পারিনে। ভগবান ব্রহ্মা অলক্ষে বসে এই সম্বন্ধ সৃষ্টি করে রাখেন! মানুষ তারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। মৃত্যুর পরেও এ সম্বন্ধ ছিন্ন হবার নয়। মৃত্যুর পরেও এ ঠিক থাকবে।

একাল। হ্যাঁ ঠিকই! স্ত্রীর দিক দিয়ে ছিন্ন হবার

নয়। কিন্তু স্বামীর দিক দিয়ে আবশ্যক মত যখন তখন ছিন্ন হতে পারে। স্ত্রীর অসুবিধা ষোল আনাই। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। অর্থাৎ যে বেচারা স্ত্রীর ইহকালে সতীন ছিল না। পরকালে গিয়ে সুখময় স্বর্গধামে সতীনের উৎপাতে সেখানকার সুখটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কারণ স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটীও তো সম্পর্কচ্যুত হয়ে অন্যত্র অবস্থান করবেন না। তিনিও তো পিছু পিছু স্বর্গ পর্য্যন্ত ধাওয়া করবেন।

সেকাল। তুমি থাম! শাস্ত্রকাররা যা করে গেছেন তা নিয়ে বিচার বিতর্ক চলে না। ও সব অকাট্য। তোমার দুঃসাহস যে তুমি শাস্ত্রের ব্যবস্থা অমান্য করতে বল ?

একাল। যে-ব্যবস্থা এখন আর চলে না, তা অমান্য করায় ক্ষতি কি ? যে-বিধান স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সমান চক্ষে দেখে না, স্ত্রীকে পুরুষের করায়ত্বে রাখবার জন্য নিরর্থক কতকগুলি কড়াকড়ির জাল বোনে, তা মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। যে বিধানের রচিত দড়াদড়ি শুধুমাত্র নারীকেই বেঁধেছে, সে মঙ্গলময় বিধান নয়। স্ত্রী শিক্ষা যখন মেনে নিয়েছেন তখন সে সব নিয়মের কিছু সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সত্যের পরীক্ষা কোন্ এক যুগে কোন্ মনীষির দ্বারা হয়ে গেছে বলে, তা কি চিরকালের মত একেবারে চুকে বুকে গেছে ? তা যদি হতো তা হলে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘুরছে এই সিদ্ধান্তই চিরকাল জগতে নিটুট হয়ে থাক্‌তো।

সেকাল। কিন্তু এই ডিভোর্স প্রথা প্রচলিত থাকার দরুণ আমেরিকায় হাজার হাজার স্ত্রী প্রতি বৎসর স্বামী ত্যাগ করছে। কত ঘর সংসার উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে! নারীর উপর কিছু বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা না থাকলে এমনই হবেই।

একাল। কিন্তু বাঁধনটা শান্তির ব্যবস্থা নয়। ওতে ভেতরে ভেতরে অশান্তির আগুনই জ্বলে।

সেকাল। তা জ্বলুক, তবু আবহমান কালের ব্যবস্থা বদলানর পরামর্শ আমি অন্তত দিতে পারিনে।

একাল। আপনি তো দেবেন না তা জানি। কিন্তু যাদের উপর প্রয়োগ করতে চান তারা আর নির্ব্বিচারে তা মেনে নিতে চাচ্ছে না। মনুর ব্যবস্থায় আছে—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্রো কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বাপি ॥"

আপনি তো এই একটু আগেই নারী পূজার উদাহরণ খাড়া করছিলেন। কিন্তু স্বগৃহেও স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যার অধিকার নেই, তাকে তুষ্ট করবেন কোন্ পূজার সামগ্রী দিয়ে ?

সেকাল। আমি তো বলেছি, স্বাধীনতার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত দিতে ওদের কেউ কোন কালেই রাজি ছিলেন না। আর তুমি বল ডিভোর্স ?

একাল। অবশ্য পরাশর সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকে আবার অন্য কথাও বলেছেন। যেমন—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।"

সেকাল। তোমার মুখেও শাস্ত্রবচন ? ভূতের মুখে রামনাম। কিন্তু এটা জেনে রেখো যে তোমার সুবিধে মত ওর অর্থ ধরা যেতে পারে না।

একাল। শাস্ত্রের বচন আপনার সুবিধে মতই ধরুণ। অন্য পতি গ্রহণের ব্যবস্থা তো আছেই। না আপনার অর্থ অনুয়ায়ী তাও উল্টে যাবে ?

সেকাল। তোমার কাছে আমি শাস্ত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চাইনে। তোমার মুখে ও মানায়ই না! তোমরা হ'লে শাস্ত্র ভাঙার কালাপাহাড়।

একাল। সে তো বটেই। এখানে একটু অসুবিধেয় পড়েছেন। আসল কথা হ'ল ধর্ম্ম টর্ম্ম সব লোক ভুলানো বুলি। ধর্ম্মের ভিত্তি হল নীতি পালনের উপর। হিন্দু ধর্ম্মের প্রথম যুগের নীতির সহিত আচার পালনই এখন সব কিছু। এ সব আচার আমরা কেন মানি তা ভেবে দেখবো না। মানি, কেননা বাপ পিতামহর আমল থেকে চলে আসছে। আসল কথা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার চেয়ে পদ্ম পিসির অনুশাসনই বেশী প্রবল। এই সব কারণেই সমাজ ব্যবস্থাও আজ আইনের হাতে তুলে দিতে হয়। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে।

তখন মানেন নি। শেষে আইনের প্যাঁচে পড়ে মানতে বাধ্য হলেন।

সেকাল। তোমাদের হাতে আছে ওই অস্ত্র। এমনি করে আইনের বান মেরে মেরে সমাজদেহকে তোমরা একেবারে শর শয্যায় চড়িয়ে ছাড়বে। পণ প্রথাটাও ডিভোর্সের সঙ্গে আইনের কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও; একটা কিছু করে ফেল।

একাল। করবে কি? নইলে বিচার বুদ্ধি দিয়ে আপনারা যে কিছুই মানতে চান না। যে কোন পরিবর্ত্তনের নামে আঁৎকে ওঠেন। অথচ জগত নিজেই পরিবর্ত্তনশীল তা ভুলে যান।

সেকাল। তোমরাও তো শাস্ত্রের নামে আঁৎকে ওঠ।

একাল। তা হলে আমরা দুইই সমান। তেম্নি হাম্‌বি মিলিটারী। কেউ কারুর কথা মানবো না।

সেকাল। আমরাও হয়ে পড়েছি কলির ব্রাহ্মণ। চোখে আর আগুন জ্বলবে না। জ্বললে দেখাতাম।

একাল। চোখ রাঙিয়ে শাসনের দিন আর নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ এসেছে। বিচার বুদ্ধি দিয়ে যা ভাল মনে হবে তাই আজকের লোকে গ্রহণ করবে। শাস্ত্র দেখিয়ে মন ভোলান যায় না। স্ত্রীদেরকেও না।

সেকাল। এবার রেহাই দাও, আমি হার মানছি।

একাল। তাহলে ডিভোর্স প্রথা মান্‌তে রাজি?

সেকাল। না কখন না। তোমরা আইনের গদা ঘুরিয়ে ও প্রথা চালু করতে চেষ্টা করনা; আমি যাই বাপু, একটু তামাক খাইগে। এমন জানলে আমি তর্কে নামতাম না। তোমার গা ম্যাজমাজ করা সেরেছে তো, এবার আমাকে রেহাই দাও।

একাল। আপনাদের ব্যবস্থায় স্ত্রী ঘটিবাটি গেলাস গামছার সামিল। ঘটীবাটির তবু একটু সুবিধে যে মালিক যদি বিক্রয় করেন, তবে সে ক্রেতার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, কিন্তু অর্থের লালসায় স্ত্রীকে যদি স্বামী বিক্রয় করেন তাহলেও পূর্ব্বেকার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। তখনও তারা স্বামী-স্ত্রী।

সেকাল। আমি শাস্ত্র আগে বুঝি, তারপর অন্য কথা! শাস্ত্র অমান্য করে ত্যাগী হতে পারিনে।

একাল। আমি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষকেই আগে দেখি। স্ত্রীও মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করবো কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে?

সেকাল। দেখ গড়তেই কষ্ট, ভাঙা সোজা।

একাল। সে কথা মানি। কিন্তু আমি যা বলছি এ ধ্বংসমূলক নয়। নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমরা নিজেরাই ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েছি, পড়বো। অর্দ্ধসংখ্যক লোক তো তারাই। পরমুখাপেক্ষী নারীকে কেহ মানবে না। ছেলেদের সঙ্গে তাদেরকে সমান চক্ষে দেখতে হবে, তাদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে। পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দিতে হবে। তাতে তাদের অসহায় অবস্থা ঘুচবে, হিন্দুর মর্য্যাদা এবং শক্তি বাড়বে—কমবে না একটুও।

সেকাল। তোমাদের যা খুশী কর। ধ্বংসের রাস্তা সহজেই তৈরি হয়।

একাল। রাস্তা আপনারাই করেছিলেন। অস্পৃশ্য লোককে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তারা আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে। নারীদের মধ্যে যে অশান্তির চাপা আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল, তা আজ প্রচণ্ড শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠেছে। তাতেই তো আজ সমাজ সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সেকাল। তুমি যা খুশী বলতে থাক, আমি চল্‌লাম।

একাল। তা আপনি যেতে পারেন। তবে যাবার আগে জেনে যান যে হিন্দু ধর্ম্মের সে স্পিরিট আজ চলে গেছে, আছে শুধু কতকগুলি ফর্ম্ম, শুধু ফর্ম্ম বজায় রেখে ধর্ম্মভাব প্রাণে জাগে না। কাজেই এটা কোর না, সেটা কোর না, এটা কর—এর কোন মানে হয় না। কেন করবো না আর কেন করবো তার কারণ জানতে চাই। হ্যাঁ—তাহলে আমাদের আজকের তর্কের সিদ্ধান্ত কি সেটা ঠিক হোক।

সেকাল। অশ্বডিম্ব।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বর্দ্ধমানের দান

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বর্দ্ধমান জিলার কবিগণের দান অপরিসীম। অগণিত প্রাচীন কবি বর্দ্ধমান জিলার অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়। কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। ১৪৫৯ শকে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। গোবিন্দ দাস চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, ইহার পর তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলী ভিন্ন ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত মাধব পদাবলী এবং কর্ণামৃত নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর সহিত গোবিন্দদাস বৃন্দাবন যাত্রা করেন। গোবিন্দ দাস একবার কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হন। "রাধাকৃষ্ণ" এই চতুরক্ষর মন্ত্র গ্রহণে তিনি সে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৫৩৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ৭৫ বৎসর বয়সে ইনি অন্তর্দ্ধান করেন।

কবি বলরাম দাসও বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডনিবাসী। ইনি বৈদ্যবংশীয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে ইনি "কবি নৃপবংশজ" বলিয়া অভিহিত। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম দাস; মাতার নাম সৌদামিনী। "প্রেমবিলাস" ইঁহারই প্রণীত গ্রন্থ। ইহার গুরুদত্ত নাম, নিত্যানন্দ দাস। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥"

কবি জগদানন্দ ১৬২৪ শকে বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইহার পিতার নাম নিত্যানন্দ, —পিতামহের নাম পরমানন্দ। ১৭০৪ শকে বা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আশ্বিন বামন দ্বাদশীর দিন জগদানন্দের দেহত্যাগ হয়। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত ইনি "ভাষা শব্দার্ণব" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বর্দ্ধমান জিলার কাঞ্চননগরের কবি গোবিন্দ কর্ম্মকার গোবিন্দ দাস নামেই পরিচিত। ইহার কড়চা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী তিনি বিশদভাবে লিখিয়া রাখিতেন। কড়চার বর্ণনা,—অতিরঞ্জন দোষশূন্য, পরন্তু সরল ও মধুর।

কবি রায়শেখরের জন্মভূমিও বর্দ্ধমান জিলার পড়ান গ্রাম। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামী ইহার দীক্ষাগুরু। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়। ইহার প্রকৃত নাম শশিশেখর। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী কবি।

কবি পরমানন্দ সেনের নিবাস বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রামে। পিতার নাম শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র,—চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর বা পরমানন্দ। যথা,—

"চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর॥"

পরমানন্দ ১৪৪৯ শকে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবাল্য কবি। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ,—শ্রীচৈতন্যশতক, স্তবাবলী, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, কৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা এবং অলঙ্কার কৌস্তুভ। মহাপ্রভুই ইহাকে কবি কর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। ইহার আর একটি নাম পুরীদাস।

বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে কবি নরহরি দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পিতা নারায়ণের দুইপুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। মুকুন্দ গৌড়পতির চিকিৎসক ছিলেন। নরহরি আবাল্য সংসারবিরাগী। নরহরির গ্রন্থ,—ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল ও ভক্তামৃত অষ্টক প্রসিদ্ধ। ইনি বড় সুকান্তি পুরুষ ছিলেন। শ্রীখণ্ডের

গৌরনিতাই মূর্ত্তি ইহারই স্থাপিত। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোভাব হয়। নরোত্তম দাস "হাটপত্তনে" লিখিয়াছেন,—

"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥"

নরহরিই প্রথমে গৌরলীলার পদ রচনা করেন। সেই হেতু বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট সমাদর। নরহরি চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের গুরু। ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন।

বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রামে বিখ্যাত বসু বংশে কবি রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের নাম গুণরাজ খান বা মালাধর বসু। পিতার নাম সত্যরাজ খান। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানন্দ,—দ্বারকানগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত ভ্রমণ করেন।

বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ডগ্রাম কবি আত্মারাম দাসের জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পদাবলী রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত।

বর্দ্ধমান জিলার আমাইপুরা গ্রামে কবি জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র; মাতার নাম রোদণী। সুবুদ্ধি গৌরাঙ্গ দেবের শিষ্য। পুরী হইতে বর্দ্ধমান যাত্রাকালে চৈতন্য সুবুদ্ধির বাটীতে যান। তখন সুবুদ্ধির পুত্রের নাম জয়ানন্দ রাখেন। কবির পূর্ব্ব নাম ছিল গুইয়া। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অনেকাংশই বিভিন্ন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঐতিহাসিকত্বে অপূর্ব্ব।

কবি শিবানন্দ সেনের নিবাস বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রাম। ইনি অম্বষ্ঠ বংশীয়। প্রচুর মণিকাঞ্চনেও কবির পদাবলী রচনায় ব্যাঘাত হয় নাই।

কবি লোচনদাস ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর দাস; মাতার নাম সদানন্দী। কবির পূর্ণনাম ত্রিলোচন দাস। চৈতন্যমঙ্গলে কবি লিখিতেছেন,—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে ধাম।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তি দাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত,—লোচনদাস "দুর্লভসার" নামক অ… একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যমঙ্গল তাঁহা… চৌদ্দ বৎসর বয়সকালে রচিত। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎস… বয়সে ইহার তিরোধান হইয়াছে। বর্দ্ধমান কাঁকড়া গ্রা… নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে,—লোচনদাসের স্বহস্ত লিখিত চৈতন্য মঙ্গল পুঁথি অদ্যাপি বিরাজিত। লোচনদাসের হস্তাক্ষর বড়ই কদর্য ছিল।

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৪১৮ শকে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্র… করেন। ইহার পিতার নাম ভগীরথ। মাতার না… সুনন্দা। দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস—কনিষ্ঠ শ্যামাদা… কৃষ্ণদাস মেধাবলে অল্পদিনে ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হ… বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচরিতা… গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৯৪ শকে রচনা আরম্ভ করেন,—১৫০৩ শকে ৯ বৎসরে গ্রন্থ সমাপ্তি হয়। শ্রীমুরারি … এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন ঠাকুরের চৈত… ভাগবত কবি কর্ণপুরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয়, এবং না… পুরাণ ইতিহাস অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। কৃষ্ণদা… কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ৺রাধামাধবের মন্দিরে পরম ভক্তি সহকারে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণদাসের অন্যান্য গ্রন্থ,—বৈষ্ণবাষ্টক, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গ রঙ্গদা নাম্নী টীকা প্রভৃতি। ১৫০৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ৮৭ বৎসর বয়সে কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ব… শাস্ত্র বিচার সুন্দররূপে মীমাংসিত।

বর্দ্ধমান জিলার রায়না থানার অধীন, রত্নানু তরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী দামুন্যগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের জন্ম হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতারনাম দৈবকী। মিশ্র ইঁহাদের নবাব দত্ত উপাধি। ইহারা চক্রবর্ত্তী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কোয়ারি গাঁঞি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র। মুকুন্দরাম 'পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মামুদ সরিপ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কবি সপরিবারে জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করেন, এই সময় তাঁহাকে অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতঃপর মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে স্বীয় সুত রঘুনাথের শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত করেন। তাহাতে মুকুন্দরামের অন্নচিন্তা দূর হয়। দেবীর আদেশানুসারে, পরন্তু জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আজ্ঞায়, মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৪৯৫ শকে চণ্ডী কাব্যের আরম্ভ ও ১৫২৫ শকে শেষ হয়। কবিকঙ্কনের বংশধরগণ এক্ষণে বর্দ্ধমান জিলার ছোট বৈন্যান গ্রামে বাস করিতেছেন। সেনাপতি গ্রামে বাঁকুড়া রায় বংশীয়দের বর্ত্তমান বাটীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত লিখিত একখানি চণ্ডীপুঁথি প্রত্যহ ফুল চন্দন পূজিত হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহাকুমার অধীন সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের জন্ম। কাশীরাম কায়স্থ। ৯৬৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রপিতামহের নাম কমলাকান্ত। বাঙ্গালা ১০০০ সালে ইনি মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন।

মেদিনীপুর আস্তাসগড়স্থ রাজার আশ্রয়ে কাশীরাম কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার মহাভারতের কোন কোন স্থল, মূল সংস্কৃত মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ। কাশীরামের অন্য দুইখানি গ্রন্থ—নলোপাখ্যান ও জলপর্ব্ব,—কিশোর বয়সের লেখা বলিয়া অনুমিত। রচনা অনেক পরিমাণে কাঁচা!

"জগৎ মঙ্গল" রচয়িতা গদাধর দাস কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। বাঙ্গলা ১০৫০ সালে "জগৎ মঙ্গল" গ্রন্থ রচিত হয়।

"চতুঃ ষষ্ঠি শকাব্দা সহস্র পঞ্চাশ শত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥"

ক্ষমানন্দ দাস ও বৰ্দ্ধমান জিলাবাসী। মনসার মহাত্মময় "মনসার ভাসান" কবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে ক্ষমানন্দ কেতকাদাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জিলার বহুগ্রামের নাম মনসার ভাসানে সন্নিবিষ্ট। মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি। কল্পনা ও কবিত্বে "মনসার ভাসান" একান্ত প্রশংসনীয়।

কবিচন্দ্র, মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ সহোদর। নিবাস বর্দ্ধমান জিলার দামুন্যা।" শিশুবোধকে ইহা দাতাকর্ণ এবং "কলঙ্কভঞ্জন" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার কবিতা সরস এবং সরল।

বর্দ্ধমান জিলার খণ্ডাঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘনরামের নিবাস। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ। ইঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র শঙ্কর ও গৌরীকান্ত। গৌরীকান্তই ঘনরামের পিতা। ইহারা পৌষল্যান গোত্রীয়।

"ঠাকুর পরমানন্দ পৌষল্যান বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তাঁর সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত॥
মাতা আর মহাদেবী সতী স্বাধ্বী সীতা।"

১৬০১ শকে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গুরু তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি দেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহাকে রাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজাদেশে তিনি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনায় মনোযোগী হন। ১৬৩১ শকে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। ইনি মধুরকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। বংশধরগণ অদ্যাপি কৃষ্ণপুরেই বর্ত্তমান। ঘনরামের সুন্দর হস্তলিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল পুথি আজিও ইহাদের বাটীতে সযত্নে সুরক্ষিত আছে।

ঘনরামের ন্যায় বর্দ্ধমান জিলার দেমুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কুয়াড়া গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর রচিত অনুরূপ একখানি ধর্ম্মমঙ্গল সংরক্ষিত আছে। ইহা চব্বিশ পালায় সম্পূর্ণ। সাহিত্যানুরাগীর নিকট শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বড় আদরের সামগ্রী।

সাধক কমলাকান্ত ১২১৬ সালে অম্বিকাকালনা হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মহারাজার গুরুপদে বরিত হন। মহারজ বর্দ্ধমানের নিকট-বর্ত্তী কোটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কমলাকান্তের সঙ্গীত পীযূষধারায় বর্দ্ধমান বঙ্গ ডুবুডুবু হইয়া উঠে।

বর্দ্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামে ১১৯৩ সালে রঘুনন্দন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কিশোরীমোহন। মাড়োগ্রাম মানকরের নিকটবর্ত্তী। এরালবাহাদুরপুরে গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েন। সতর বৎসর বয়সেই রঘুনন্দন ভাগবত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। আঠার বৎসর বয়সেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ রামরসায়ণ গ্রন্থ, তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে রচিত। রামরসায়ণ ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ইহার এই রামরসায়নই মন্দিরাসংযোগে গীত হইয়া থাকে। প্রকৃতই রামরসায়ণ উপমা প্রাচুর্য্য, ছন্দবাহুল্য ও কবিতামাধুর্য্যে ভরপূর। অবশ্য রঘুনন্দন স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ কবি তুলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতে কোন কোন আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। কবির আর একখানি গ্রন্থ—গীতমালা—। ইহা ত্রিশটি গ্রন্থণে বিভূষিত। এক একটি গ্রন্থণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা বর্ণিত। আর গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাধামাধবোদয়। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রকটিত। মালঝাঁপ, বৃত্যনুপ্রাস, একাবলী, ত্রিপদী, ললিতা, ষোড়শাক্ষরী, কাঞ্চিযমক, তোটক; লঘুত্রিপদী; পঝ্ঝটিকা, ছেকানুপ্রাস, যমক, তুনক ও মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী প্রভৃতি বিবিধছন্দে এই গ্রন্থ অতিমাত্রায় বৈচিত্রশালী। কবি ২৪ পরগণা জিলার পাণিহাটী গ্রামে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। বাংলা পুস্তক ব্যতীত রঘুনন্দন ত্রিশখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যও লিখিয়াছিলেন। ইহার আট সন্তান,—১ মাধবানন্দ ২ কন্যা ৩ রামগোপাল ৪ কন্যা ৫ ব্রজগোপাল ৬ জয়গোপাল ৭ শৈশবে মৃত পুত্র ৮ মদন-গোপাল। কবি, রামকমল সেনের সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ বর্ত্তমান।

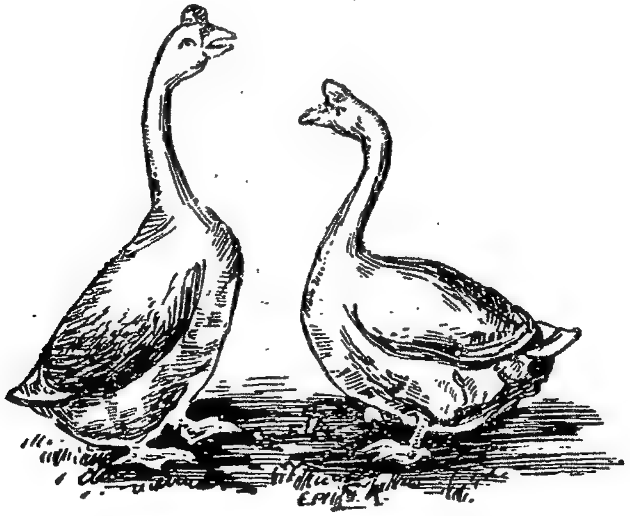

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ছোট-গল্প

(১২৯৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার ছোট গল্প লেখক বলিয়াই পরিচিত।

কোনও লেখকের লেখার সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের সহিত একটু পরিচয় থাকা আবশ্যক। যিনি যত উত্তমই লিখুন, তাহা সর্বতোভাবে সর্বযুগে সর্বত্র উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কারণ জগতের চিন্তা ধারার পরিবর্তনে উহা উত্তম ও অনুত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়া পড়ে।

যে কোনও লেখকের লেখার সমালোচনা সর্ব ক্ষেত্রে চলিতে পারে, কারণ ইহা কখনও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না যে সমালোচনা শুধু প্রশংসা বা শুধু নিন্দার জন্য।

সে যাহা হউক যে যুগে যে লেখক নিজের প্রতিভাবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার ভিতর সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা নিশ্চিতই ছিল। শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ছোট গল্প লেখক হিসাবে এ যুগে সে রূপ শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার হেতু থাকুক বা না থাকুক, তিনি তখনকার দিনের গণ্যমান্য ছোট গল্প লেখক ছিলেন।

তাঁহার "ইন্দু" ও "দাদার কাণ্ড" ছোট—গল্প দুইটি কিরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর, এবং তাঁহার অন্য ছোট গল্পগুলি কি চমৎকার।

তিনি কোনও দলের ছিলেন না। তাঁহার দল তিনি নিজে ও তাঁহার চিন্তাধারা নিজস্ব।

কিন্তু ইহা হইতে কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না যে, তাঁহার ছোট গল্পগুলি এক জাতীয়।

তিনি যদি কাহাকেও ভাষার দিক দিয়া অনুকরণ করিয়া থাকেন তবে তিনি তাঁহাকে এমন অনুকরণ করিয়াছেন, যাহাতে সে অনুকরণ আর কেহ ধরিতে পারে না।

তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে ইহা বলিতে হয় যে তিনি কখনও যেন এই দেশের আদর্শ তাঁহার কোনও ছোট গল্পে পরিত্যাগ করেন নাই। এই বাংলা দেশে যে সমস্ত ধর্ম—সংস্কার, সমাজ সংস্কার, পারিবারিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত সংস্কারের আদর্শ আছে, তিনি যেন সেই গুলি প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছেন।

"পর ধর্ম্ম কখনও আশ্রয় করেন নাই। আমাদের সব মন্দ আর অপরের সব ভাল একথাও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইতে শোনা যায় নাই। আমাদের ভালবাসা খারাপ আর উহাদের ভালবাসা ভাল, একথা তিনি কোনও ক্ষেত্রে লেখেন নাই।

হয়তো তিনি বিদেশীয়ের অনুকরণে ছোট গল্পের যোজনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রচনার অন্তর্নিহিত মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে কিরূপে তিনি বিদেশীয় আদর্শ অবলম্বনে নিজের দেশের আদর্শ বড় করিয়া তুলিবেন।

উমেদার। সাধনা, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের "উমেদার" ছোট—গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিনি উহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন, রবীন্দ্র নাথের ছোট গল্পও উহার কলেবরে শোভা পাইত, সুতরাং যে কোনও রকমের ছোট গল্প উহাতে স্থান পাইত না।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যে শুধু "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে "সাহিত্যে"ও ছোট গল্প প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার দুই একটা ছোট—গল্প "উৎসাহ" নামক মাসিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ছোট গল্পগুলির ধারাবাহিক আলোচনা কালে উহাদের নাম, তারিখ লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যে সময়ে এই "উমেদার" ছোট গল্পটি লিখিয়াছিলেন, তখন বাংলা দেশে এই যুগের বেকার সমস্যার প্রশ্ন উঠিয়াছিল কি না বিবেচ্য।

সে যাহা হউক তিনি যখন ইহা লিখিয়াছিলেন তখন এদেশের বেকার সমস্যা এত প্রবল আকারে না থাকিলেও কিছু ছিল, তাই তিনি চাকরির চেষ্টার এরূপ হীন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছিলেন।

মনে হয় তাঁহার বেকার সমস্যার চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা সংসারে শ্যালকের অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রবলতর ছিল এবং উহা লইয়াই তিনি এই ব্যঙ্গচিত্র মূর্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

তিনি এখানে দেখাইয়াছেন, মানুষ বিবাহ করিয়া কিরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির হইয়া যায়। বিবাহের পূর্বাবস্থায় যে ব্যক্তির মা বাপ ভাই বোন পিসি মাসি প্রভৃতির উপর প্রবল স্নেহ, উগ্র কর্ত্তব্য বোধ, সংসারের উন্নতি করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা থাকে বিবাহের পর সে ব্যক্তি কিরূপ বিকৃত হইয়া যায়। তাহার তখন যেন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে। সে কিরূপে নববধূকে সন্তুষ্ট করিবে, কিরূপে শ্যালিকাদিগকে মুগ্ধ করিবে, কিরূপে শ্যালকদের নিকট সুখ্যাতি পাইবে, তখন সে তাহার চেষ্টা করে। সে শ্বশুর শাশুড়ী ও শ্বশুরালয় সংক্রান্ত সকলের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়ে এবং সেখানকার যশোলিপ্সা তখন তাহার যেন জীবনের ব্রত হয়। সে ব্যক্তি সে সময় পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি কর্তব্য, বাড়ীর উন্নতির জন্য চেষ্টা ভুলিয়া যায়।

মানুষের এই অদ্ভুত পরিবর্তনকে বিদ্রূপ করিবার জন্য শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যেন এই "উমেদাঁর" লিখিয়াছেন। ইহাতে বেকার সমস্যার তীব্রতা প্রস্ফুটিত করিবার ইচ্ছাটা যেন তাঁহার গৌণ।

লেখক দেখাইয়াছেন, পিতার যত্নে যে মামা বাল্য জীবনে ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানে বস্ত্র পাইয়া ছিল, যে মামার প্রতি স্নেহ পরায়ণ হইয়া তাহাকে তাঁহার অফিসে চাকরীর সংস্থান করিয়া দিয়াছিল, সেই—মামা বাবার সমস্ত উপকার ভুলিয়া, কৃতজ্ঞতা ভরে তাহার প্রতি মাথা নত না করিয়া আমি ভাগিনেয়, আমাকে চাকরির সংস্থান করিয়া না দিয়া, তাহার নিজের শ্যালককে চাকরি করিয়া দিল, ইহাই উপকারের প্রত্যুপকার।

লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়া এই ছোট—গল্প আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি Idealistic বা আদর্শ তন্ত্রবাদী লেখক নহেন, একজন Realistic বা বস্তুতন্ত্রবাদী লেখক। দৈনন্দিন জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তিনি যেন তাহারই ছবি তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ভিতরের সাজানো গোছানো ভাবকে তিনি যেন অগ্রাহ্য করিয়া মোটা হাতে বেদী বাঁধিয়া, মোটা তাল তাল মাটিতে প্রকৃতির গঠনকার্য্য করিয়াছেন। তিনি সে প্রকৃতির রং ভড়ং করিতে যেন মোটেই চেষ্টা করেন নাই। লেখক বলেন, মামাটি যেন আজকালকার সংস্কারের মামা, যে নিজের শালাকে, বধূর আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিয়া থাকে, তাহার যেন চক্ষু লজ্জা কম, মা বাপকে বৌয়ের পক্ষ হইয়া যা তা বলিয়া অপমান করে। ইহাই লেখকের Realism বা বস্তুতন্ত্রবাদিত্ব।

ছোট গল্পে এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কণ শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের সর্বপ্রথম না হইলেও বোধ হয় তখনকার দিনে এরূপ বেশী হয় নাই। ছোট—গল্পের চরিত্র অঙ্কন করিতে হইলেই যেন তাঁহাদের মনে আসিয়া পড়িত, এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহা চর্মচক্ষুতে দেখিতে গেলে পাঠক পাঠিকার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে এবং আদর্শ চরিত্র বলিয়া তাহারা কল্পনা করে। এই আদর্শ তন্ত্রবাদিত্ব বা Idealism শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ভিতর যেন কম।

এখানে লেখক প্রথম নাথ চৌধুরীর চমৎকার দৃষ্টান্তের কথাও মনে করিতে হইবে যে, কোনও বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে নেহাৎ ডাল ভাত রাঁধিয়া আর তাহাদের নিমন্ত্রণ খাইতে ডাকা হয় না। ছোট—গল্পের বেলায়ও তাই। ইহাতে নেহাৎ রাম শ্যাম উমী বাণীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গেলে গল্প হইবে, ছোট—গল্প হইবে না, ইহা হইবে রাস্তার বিজ্ঞাপণের গল্প। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচনায় প্রমথনাথ চৌধুরীর অভিমত যেন প্রযুক্ত হয় না।

এই আদর্শবাদিতা ও বাস্তববাদিতার সমন্বয় করিতে গেলে অর্থাৎ প্রমথনাথ চৌধুরী ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মতবাদের মিলন ঘটাইতে গেলে মহা বিরোধ মিটাইতে হয়। প্রমথনাথ চৌধুরীকেও ঠেলিতে পারা যায় না,

আবার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকেও উপেক্ষা করা যায় না। দুইজনের অভিমতই গ্রাহ্য।

বাস্তবিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এই "উমেদার" ছোট-গল্পে যে বাস্তব চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা গ্রহণীয় হইয়াছে।

ডাক্তারবাবু। সাধনা, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "ডাক্তারবাবু" ছোট-গল্পটি প্রকাশিত হয়।

ইহা বিদ্রূপাত্মক রচনা। পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার কিরূপে পল্লীবাসীর জীবন লইয়া খেলা করে, ইহা তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রামদাস অশিক্ষিত গামাল রাঁধুনে বামুন। সে ডাক্তারী করিত, সময় সময় বহুরূপী সাজও দেখাইত। এইরূপ সাজ্যাতিক মারণাস্ত্রের উপরও পল্লীবাসীদের বাধ্য হইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। পল্লীবাসীদের কি দুর্দ্দশা। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, তৃষ্ণায় পানীয় নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। তারপর তাহারা রোগাক্রান্ত হইলে একফোঁটা ঔষধ পায় না। দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের দারুণ প্রকোপ, এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে। তাহারা অনাহারে বিনা ঔষধে যমের জন্য পাহারা দেয়। যাহাদের রক্তের অর্থে এই সহরের জাঁকজমক সম্পন্ন হয়, তাহারা রোগে পড়িয়া রামদাসের ন্যায় অসুরের দ্বারা চিকিৎসিত হয়, ইহা দারুণ অভিশাপের কথা।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার "ডাক্তারবাবু" ছোট-গল্পে রামদাস রূপ নায়কের অবতারণা করিয়া পল্লীবাসীদের দুঃখের কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন।

রামদাসের চরিত্র সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন, এরূপ ডানপিটে ছেলে সংসারে অনেক কাজে লাগে। লাজুক অকর্ম্মণ্য যুবকেরা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইতে পারে না। তাহারা কোনও লোকের সম্মুখে সতেজ দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু যাহারা চালাক চতুর, তাহারা কিছু গ্রহ্য করে না। ভাল হউক, মন্দ হউক তাহারা ইতস্ততঃ না করিয়া বলিয়া ফেলে বা করিয়া ফেলে। হয়তো সময়ের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহারা বিপন্ন হয়, কিন্তু নিজেদের চতুরতার কৌশলে আবার তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু যাহারা সেরূপ চতুর নহে, তাহারা কি করিব, কি হইবে ভাবিয়া কোনও কাজে হাত দিতে পারে না এবং সকলের পিছন পড়িয়া থাকে।

রামদাসের মত ধড়িবাজ ছেলে জীবনে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, সে কিছু না কিছু করিবেই। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এরূপ অদ্‌ভুতকর্ম্মা লোক পছন্দ করিতেন, তাই ডানপিটে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রামদাস বামুন, রামদাস পুরোহিত, রামদাস ডাক্তার, রামদাস বহুরূপী, রামদাস পাচক, রামদাস বিলসরকার, একাধারে রামদাস সব।

তিনি এরূপ একাধারে সমস্ত গুণযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া ইহাই বলিতে চাহেন, আজকালকার দিনে তেমন "ভাল ছেলে" হইলে তাহার ভাত নাই।

ছোট-গল্পে প্রণয় সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহা ভিন্নও যে চমৎকার ছোট-গল্প রচিত হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "ডাক্তারবাবু।" ইহা কেমন ছোট-গল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সুন্দরভাবে রচিত হইয়াছে। কেমন একটা সুর ছোট-গল্পটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। চরিত্র সৃষ্টি ব্যাপারেও তিনি কিরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। রামদাসের চরিত্রে নানারূপ অদ্ভুত অদ্‌ভুত কার্য্য দেখাইয়া ছোট-গল্প লেখক সেই গতানুগতিক চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই।

গুরু ঠাকুর। সাধনা, ১২৯৯-১৩০০ বঙ্গাব্দ।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "গুরু ঠাকুর" ছোট-গল্প ১২৯৯-১৩৩০ বঙ্গাব্দে "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা "ডাক্তারবাবু" ও "উমেদারের" ন্যায় শ্লেষাত্মক ছোট-গল্প। ইহাতে তিনি এদেশে নব্যশিক্ষার পিঠে চাবুক মারিয়াছেন, যেমন, "ডাক্তার বাবুতে" পল্লীস্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে, "উমেদারে" বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে। অবশ্য ইহাদের প্রতি ছোট-গল্পে ব্যাপক অর্থে অন্য শাখা প্রশাখার উপরেও লেখক আঘাত দিয়াছেন।

লেখক সংস্কারক হইবে, সমাজ সংস্কারক আচার ব্যবহার সংস্কারক, শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারক ইত্যাদি।

এ বিষয় এই গ্রন্থের অন্যত্র সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে এবং পূর্বকালীন লেখকবর্গ যে কলম ধরিবার সময় ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য মাথায় লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতেন, ইহার বিষয়ও পূর্বে বলা হইয়াছে।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের ছোট-গল্পগুলিতে এরূপ একটা তীব্র কষাঘাতের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, যদি কিছু চেতনা দেশবাসীর অন্তরে জাগরিত করিতে তাঁহার লেখনী সমর্থ হয়।

তাঁহার "গুরুঠাকুর" বলিতে চাহে, লোকে এই বিলাতী শিক্ষার দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সেই পুরাতন আজন্মাচরিত সংস্কার ভুলিয়া যায়। নিত্যানন্দ ঠাকুরের পিতা প্রপিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরায় ব্রাহ্মণের কুলোচিত ব্যবসায় করিয়া আসিতেছিল, নিত্যানন্দ গোঁসাইজীও তাহা করিত, কিন্তু কিছুকাল সে বিবাহ করিয়া তরুণী ভার্য্যার পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত কুলোচিত প্রথা ভুলিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি সে নিজের পুত্রের নামকরণটা পর্য্যন্ত বংশগত রীতি অনুসারে করিতে পারিল না।

তারপর সে পুত্রের ভবিষ্যৎ দীক্ষা শিক্ষা ইংরাজী ধরণে দিতে বাধ্য হইল। ফলে ইহা হইল, বিদেশীয় আদর্শের যেটুকু অসার তাহাই পুত্র গ্রহণ করিল। ইহার ফল ভোগ করিল যোগ্যপুত্র কুলচন্দ্র হেমচন্দ্র। সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে পারিল না।

যে গুরুগিরি ব্যবসায়ের দ্বারা হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া গিয়াছে, তাহাতে দুই চারি কথা ইংরাজী শিখিয়া শিষ্যমহলে সে উপহাসাস্পদ হইতে লাগিল। সে শিষ্যগণের দুয়ারে না যাইয়াও পারে না, আবার গুরুগিরি করিতেও তাহার ঘৃণাবোধ হয়। সে এখন হইল ময়ুর-সাজা কাকের মত। লোকে তাই তাহাকে নিন্দা করে।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার "গুরুঠাকুর" ছোট গল্পের ঘটনাটা বেশ জমাট করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই তিনটি ছোটগল্পে খাঁটি লেখকত্ব পাওয়া যায় না, কারণ চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া ইহারা বাস্তবিকই খাটো।

এ গুলিকে নক্সা-গল্প বলিলে যেন ভাল হয়। কোন বিষয়ের রস তর্জমা বলিয়া এই সমস্ত গল্পকে মনে করিলে মন্দ হয় না। এগুলি বেশ-লাগানো গল্প তবুও ছোট গল্প নহে।

সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও নলিনী কান্ত মুখোপাধ্যায়ের এই জাতীয় ছোট গল্প আছে। তাঁহাদের পরিচ্ছেদে এইগুলিকে নৈতিক বা নীতিশিক্ষামূলক ছোটগল্প বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ গুলির নাম নক্সা বা তর্জমা দিলে সমুচিত হয়।

এই জাতীয় ছোট গল্পে একটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে তাহা এই যে, ইহাতে করুণতার অংশ কম বা একরূপ নাই বলিলেই চলে, কিন্তু ছোট গল্পের অন্যতম ধর্ত্তব্য বিষয় ইহার করুণতা। উপক্রমণিকায় এই বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের "পূজার ছুটি" নামক একটি নক্সা বা রস তর্জমা প্রকাশিত হয়। উহাকে প্রকৃত পক্ষে ছোট গল্প বলা চলে না বলিয়া, উহার আলোচনা হইতে বিরত হওয়া গেল।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "আমার কৃষাণী" "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

তিনি ইহাতে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে বাহাদুরীর বিষয়ে শ্লেষ করিয়াছেন। কলম পেশা বাঙ্গালীর, কেরাণী বাঙ্গালীর ও ভাবোন্মত্ত বাঙ্গালীর যে ব্যবসায়-বুদ্ধি একেবারে নাই, তাহা এই ছোট-গল্পে লেখক চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহার মত ব্যবসায়ে চাই ধীরতা, কষ্টসহিষ্ণুতা। অর্থের জন্য মত্ত হইয়া, রাতারাতি বড়লোক হইবার কল্পনা করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ব্রতী হয় না।

তাঁহার মতে, এই সমস্ত কারণে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী, চতুর বাঙ্গালী, শিক্ষিত বাঙ্গালী জগতের সমস্ত জাতির পেছনে পড়িয়া আছে। আজ বাংলা তাই বাঙ্গালীর নহে। নিজ বাসভূমিতে সে প্রবাসী। তাহার মুখের গ্রাস অন্য দেশবাসী লইয়াছে, তাহার পরিধেয় পরদেশী বয়ণ করিতেছে, তাহার জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণ

বিদেশীয়েরা যোগান না দিলে, তাহার চলে না। এজন্য কোটি কোটি টাকা বিদেশে, অন্য প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে।

তিনি এই "আমার কৃষাণী" ছোট-গল্পে ইঙ্গিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর অদূরদর্শিতা ও ব্যবসায়ে হাতে কলমে শিক্ষার অভাব। কোনওরূপ ব্যবসায়গত শিক্ষালাভ না করিয়াও বাঙ্গালী মনে করে যে তাহার যখন অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তখন আর ব্যবসায় শিক্ষার আবশ্যকতা কি? ইত্যাদির জন্য সে ব্যবসায়ে পসার করিতে পারে না।

লেখক "আমার কৃষাণী" ছোট-গল্পে উহার নায়ককে দিয়া কতবারই তো ব্যবসায় ফাঁদাইয়া বসাইলেন এবং প্রত্যেক বারই তাহাতে তাহার অক্ষমতার, নিষ্ফলতার পরিচয় দেওয়াইলেন। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, তিনি বাঙ্গালীকে অপটু মনে করিতেন।

আমার কৃষানীতে তিনি যে নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে দিয়া তিনি স্বামীগতপ্রাণতা, পাতিব্রত্যের উদাহরণ যতটা দেখাইতে তৎপর, তাহার চেয়ে ঢের বেশী তৎপরতা দেখাইয়াছেন পত্নীকে দিয়া পতির ব্যবসায়-স্পৃহার নিন্দাবাদ করাইবার।

এই ছোট-গল্পটিও পূর্ব্বের কয়েকটি ছোট-গল্পের একাসনভুক্ত এবং ঐ সমস্ত ছোট-গল্পের বিষয় যে উক্তি করা হইয়াছে, এই ছোট-গল্পেও সেরূপ করা হইবে।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "সুষমা" ছোট-গল্প ১৩০০ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং "ঘাতপ্রতিঘাত" ছোট-গল্প ১৩০১ বঙ্গাব্দের "সাধনায়" মুদ্রিত হয়।

ক্রমশঃ

প্রেমের তীর্থে মীরা

শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

মানুষের অন্তর্বর্ত্তী সেই সৃষ্টি কর্ত্তা, মধ্য যুগের সাধকদের মধ্যে যে ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ। সেই জন্য মন্ত্র পড়ে তার পূজা হল না গান দিয়ে তার আহ্বান হ'ল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই সহজ সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

মধ্য যুগের তিমির মগ্ন আকাশপ্রান্তে একটি উজ্জ্বল তারা আমাদের চোখের সুমুখে ভাস্বর দীপ্তিতে জ্বলতে থাকে। সে এক পূজারিণীর অম্লান আত্মা, সে পূজারিণীর নাম মীরা বাঈ।

তাঁর বাস্তব জীবনের রূপ ইতিহাসের পাতায় পাতায় অস্পষ্ট কয়েকটি রেখায় যেমন ফুটে উঠেচে তাহা এই। খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই মহিয়সী রমণীর আবির্ভাব হয়। ভারতের আধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এ এক স্মরনীয় কাল। মারবার পতি রাও যোধাণীরের পৌত্র ছিলেন মেড়তার ভূস্বামী রতনসিংহ। মীরা বাঈ ছিলেন এঁরই মেয়ে।

ছোটবেলা থেকে মীরা একলা নির্জনতার ভিতর সময় কাটাতে ভালবাসতেন। তাঁর খেলা করবার একটি সাথী ছিল—তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা রায়মল্ল। জীবনে দুটি জিনিষের উপর মীরার টান ছিল। অন্তরের ভালবাসা ছিল—একটী হচ্ছে গৃহবিগ্রহ গিরিধারীলাল ও তাঁর সম্বন্ধে গান আর একটী বনের নানান রঙের ফুলের উপর।

মানুষের জীবনের সাধনায় শৈশবের প্রভাব নানাভাবে কাজ করে থাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামলালের প্রতি যে প্রেমে মীরা একদিন রাজৈশ্বর্য্য ধূলির মত ছড়িয়ে দিয়ে পথের ভিখারিণী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তার বীজ শৈশবেই তাঁর হৃদয়ে উপ্ত হয়েছিল।

শোনা যায় মীরা একদিন তার প্রতিবেশিনী একটি

মেয়ের বিবাহ দেখে এসে তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন —"মা আমার স্বামী কে?" রহস্য করে তার মা তাঁকে গৃহদেবতার বিগ্রহ দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"ঐ তোমার স্বামী।" তারপর থেকে মীরার অন্তরে যে অনুরাগের দীপ ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তা তাঁর গানের মধুর স্বরে, আজ যুগ যুগ অতিক্রম করে' আমাদের অন্তরে এসে পৌঁছেচে; আরো কত অনাগত কাল তা প্রসারিত হবে, স্রোতের জল জমিয়ে দেয়া নির্ম্মাল্যের মত—কে বল্‌তে পারেন! এই যে প্রেম, অম্লান অবিনশ্বর প্রেম, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন প্রেম—তিনি তা তাঁর স্বামীর উপর অর্পণ করতে পারেন নি; সেই প্রেমের মাল্য তিনি পাঠিয়েছিলেন—তাঁর গিরিধারীলালকে জগৎস্বামীকে যিনি অনন্তকালের জন্য তাঁকে ত্যাগ করবেন না!—; মৃত্যুর ভিতর দিয়েও যে ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করবে—অমর হয়ে বেঁচে থাকবে, সেই সাধনাই তাঁর জীবনে সফলতা লাভ করেছে।

একটি গানের ফুলে মীরা সেই কথায় বল্‌ছেন—

মেরে ত' গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই
জাকে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোই ॥
তাত, মাত, ভ্রাত, বন্ধু আপনা নাই কোই—
ছোড় দই কুল কি কানক্যা করেগা কোই ॥
সন্তন চিগ বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোই—
আঁশুবন জল সীঁচি, সীঁচি প্রেম-বেল বোই।
আবত বেল ফৈল গোই আনন্দ-ফল হোই—
তাই মেঁ ভক্তি জান জগত দেখ মোহি
দাসী মীরা গিরিধর প্রভু তারো অব মোহি ॥

সময় বয়ে যায় দুঃখ সুখের নানান-রঙের ঢেউ তুলে'! ধীরে ধীরে মীরা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হলো! তার রূপ ও গুণের সৌরভ সারা মারোবাড়কে পারিজাতের স্নিগ্ধ সুরভির মতো আচ্ছন্ন করলো! চিতোরের রাণা মুকুলদেবের পুত্র তরুণ যুবরাজ কুম্ভ সে কথা শুনতে পেলেন। ছদ্মবেশে এসে', তিনি মীরার সঙ্গে দেখা করে' তার গান শুনলেন। শেষে মুগ্ধ হয়ে যুবরাজ কুম্ভ নিজে হোতে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেন। এই বিবাহ মীরার জীবনের আনন্দ-উৎসের মুখে যেন প্রস্তর নিক্ষিপ্ত করল। যে ছিল বনের পাখী স্বাধীন, চঞ্চল, গীতি-মুখর—তাকে যেন রাজপুরীর সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করে' রাখা হোল। মীরা যেন নিজের জীবনকে আর সেখানে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তার উপর মীরা ছিলেন বৈষ্ণব ও রাণা কুম্ভ শৈব মতাবলম্বী; এতে করে' ধর্ম্মমতের বিরোধিতাও বাধ্‌ল।

মীরার স্বামী রাণা কুম্ভ খারাপ লোক ত' ছিলেনই না, বরং নানা গুণসমন্বিত, উদারচেতা মানুষ ছিলেন। তখনকার দিনে একজন ভাবুক কবি হিসাবে তাঁর নাম ছিল। মীরাকে ভালোভাবে কবিতা লিখবার শিক্ষা তিনিই দিয়েছিলেন। মীরার যে কাব্য-রচনায় পটুতা ছিল তা', তার স্বামীর সাহচর্য্যে, আরো সুন্দররূপে প্রকাশিত হলো—এমন কি তাঁর স্বামীর রচনাকেও পরাভূত করল!

বিরহিনী মীরার রচিত গানগুলি যা' তার প্রিয়তম গিরিধরলালের উদ্দেশে রচিত হয়েছে—তা নিত্য-কালের সম্পদ! তার ভিতর যে দুঃখ সুখের ছন্দ, প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা, বিরহের দীর্ঘ-শ্বাস ও অশ্রুজল, হৃদয়ের হাহাকার ও শূণ্যতা ধ্বনিত হয়েছে তা' উৎকৃষ্ট কবির প্রেম-গীতির পাশে স্থান পেয়েছে ও পাবে।

একটি গানের দরশন পিয়াসী ব্যাকুলা মীরা বলেছেন—

"প্যারে, দরশন দীজ্যো আয়,
তুম্ বিনা রহনে না জায়।
জল বিনা কঁবল্, চন্দ বিনা রজনী
ঐ সে তুম্ দেখা বীন সজনী।
য়্যাকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন
বিরহে কলিজা খায় ॥
দিবস নভুখ, নীদ নাহি রৈনা
মুখস্থ' কহত ন আবৈ বৈনা।
কাঁহা কুহু কুহু কহত ন আবৈ
মিলকর তপত বুঝায় ॥
কাঁড়ুর সাব, অন্তর যামী,
আয় মিলো, কিরপা করো স্বামী
মীরা দাসী, জনম জনমকী
পরি তুমহারে পায় ॥

হে প্রিয় তুমি ছাড়া রইতে পারি না, তুমি দেখা দাও। জল হারা কমল যেমন থাকে, চাঁদহারা রাত যেমন শূন্য

তেমনি আমার হৃদয়ও তোমা ছাড়া শূন্য হয়ে আছে। আমি ব্যাকুল হয়ে রাতদিন তোমার বিরহে ঘুরি, বিরহ জ্বালা বুকে আমার নিরন্তর জলতে থাকে।" এম্নি করে রাতদিন মীরা গিরিধর লালকে নিজ অন্তরের ব্যথা নিবেদন করতেন। নিভৃত রাজ অন্তঃপুরে, এম্নি করেই "আশু বানকী মালা" তিনি গাঁথতেন। যখন নিবিড় রজনীতে সমস্ত ভুবন গাঢ় সুপ্তিতে চেতনা হারা তখন মীরা নিদহারা চোখে গাইতেন—

—"সৈঁ বিরহিনী বৈঠি জাগু, জগত সব সোঠৈ রে আলি"—

সখি' আমি বিরহিনী বসে বসে রাত জাগছি—আর জগতের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দিন রাত্রি ধরে এম্নি করে বাজতে লাগল, মীরার অন্তরে প্রেমের নিবিড় তৃষ্ণার ও আত্মসমর্পণের সুর। সে সুর যেন মাটিতে ফুটে উঠা ফুলের অনন্ত আকাশের তারার জন্য ব্যকুলতা। চিত্ত জুড়ে জগৎ স্বামীর প্রতি প্রেমের মুকুল এম্নি করেই দিনের পর দিন নানান বর্ণ ধ'রে' বিকশিত হতে লাগল। এই হৃদয়াবেগের তীব্র পরশ আজো তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে আমাদের অন্তরে এসে' লাগে—আমাদের অভিভূত করে।

রাজপুরীর নিভৃত অন্তঃপুরে আর যেন কিছু মীরার অন্তরে স্থান পেল না। শুধু রইল মীরা আর তার প্রভু। তার শ্যামল, তার গিরিধরলাল। সমস্ত জগৎ তার কাছে অর্থশূন্য, নিস্ফল, মরুর মত উষর হয়ে উঠল—সত্য হোল শুধু হরি! পরিপূর্ণ রাজৈশ্বর্য্য ও বিলাসের মাঝখানে তার কাছে শুধু আসতে লাগল প্রিয়তমের দূত শ্রাবণের ঘন অন্ধকারে, তারায় ভরা জ্যোৎস্নার আলোকে, প্রভাতের অরুণিমায়, নদীর কল্লোলে, অরণ্যের উচ্ছ্বলিত মর্ম্মর ধ্বানতে। সে দূত এসে নিত্য তার হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করতে লাগল—"জাগো, জাগো, বিরহিনী।" কখনো উতলা ফাল্গুনের চাঁপা বকুলের তীব্র গন্ধোচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয় গেয়ে উঠত—

"নৈন লল্‌চাবত, জীয়রা উদাসী
সাঁবল বন মে বাজে, সাঁবলকী বাঁশি;
রৈন মেঁ বৈন মেঁ, মোরা নৈনান লাগৈ—
পীতম্‌কে শ্বাস আবৈ কুসুম সুবাসী।"

এর মানে হ'ল ঃ—

নয়ন তৃষিত করে, হৃদয় উদাসী!
শ্যামল কাননে শুনি, শ্যামলের বাঁশী;
ফুলের সুবাসে তাঁরি শ্বাস আসে ভাসি'॥

কখনো বিরহের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে গেয়ে উঠতেন—"প্রভু, গিরিধর নাগর, তুম্‌বিনা ফাটত হিয়া।" কখনো গাইতেন—তুম্ বিনা রহনে না যায়। এম্নি কত বিরহের সুর। কত পিপাসার গান।

শ্যামলের পূজায় সংসারের কাজে বাধা পড়তে লাগল, ত্রুটি, বিচ্যুতি ঘটল। হরির গানে মেতে থাকায়, স্বামী সেবায় পড়তে লাগল ব্যাঘাত। মাঝে মাঝে সমভাবের ভাবুক বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মালোচনা চল্‌তে থাকল। স্বামী ভালো চোখে তা' দেখলেন্ না, তিনি তাঁর চারিদিকের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠতে লাগলেন। তাঁকে ত্যাগ করবেন বলেও ভয় দেখাতে লাগলেন। হরিপ্রেম পাগলিনী মীরা ওতে ভয় পেলেন না।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল যাতে করে রাণা কুম্ভ করলেন তাঁকে নির্ব্বাসিতা। ঘটনাটি এই ঃ মন্দর রাজকুমার ঝালাকরের রাজকুমারীকে বিবাহ করতে গিয়ে-ছিলেন। বিয়ের রাতে, রাণা কুম্ভ সেই রাজকুমারীকে হরণ করে নিয়ে এসে বিবাহ করলেন। একদিন নবীন বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে সেই রাজকুমার এসে, চুপে চুপে মীরার সহিত দেখা করে' প্রার্থনা জানালেন যে সে একবার ঝালকার কুমারীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এবং এই দেখার পর সে বিরাগী হয়ে চলে যাবে চিরদিনের মতো। তার কথা শুনে মীরার হৃদয় গলে গেল। তিনি কৌশলে নিয়ে গেলেন তাঁকে রাজ অন্তঃপুরে এই দেখা শোনার জন্য। সেখানে ঘটনাচক্রে রাণা কুম্ভ মীরাকে কুমারের সহিত দেখতে পান এবং মীরাকে স্বৈরিণী মনে করে নির্ব্বাসিতা করে দেন চিতোর থেকে'। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক অনুনয় করে' ফিরিয়ে আনেন চিতোরে। এম্নি করে নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে চলতে চলতে, রাণা কুম্ভ মারা গেলেন। মীরার ঘরের বাঁধন কেটে' গেল। স্বর্ণময় খাঁচার দ্বার গেল খুলে।

মীরা বেরিয়ে পড়লেন, তীর্থযাত্রিনী হ'য়ে, ধরণীর

পথের ধূলায় তীর্থে তীর্থে প্রিয়তমের সন্ধানে। যার বাঁশীর সুর গৃহের অন্ধকারে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন আপনার অন্তরে—তিনি বেরিয়ে পড়লেন সেই পথ ভুলানো বাঁশুরিয়াকে ধরবার জন্য। পথের কণ্টকে তিনি পান তাঁর তীব্র পরশ, পথের বাধা বিপত্তি আসে তাঁর প্রেমের ইঙ্গিত হয়ে'। পাগলিনীর মত মীরা ছোটেন সব কিছু তুচ্ছ করে', ত্যাগ করে' সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে। অন্ধকারে অভিসারিকার মতো বুকের কাছে প্রেমের মৃদু দীপখানি জ্বেলে নিয়ে মীরা চলেন। কণ্ঠে তার জাগে গান, পাষাণ গালান সুরে—

তুম্‌হার কারণে সব সুখ ছোড়া
অব মোহি ক্যু তব সাবো।
আর ছোড়া নহি রণে প্রভুজি
চরণকে পাস কুলাবো।

—তোমারই জন্য সব সুখ ছেড়েছি, প্রভু আর কেন তৃষিত রাখো। এখন আমায় ছেড়ে দূরে থাকা তোমার সাজে না কিছুতেই; তোমার চরণতলে আমায় ডেকে নাও, প্রভু।

তীর্থে তীর্থে, ঘুরতে ঘুরতে মীরা বৈষ্ণব তীর্থ বৃন্দাবনে আসেন। শোনা যায় ভক্তপ্রবর তুলসীদাস তাঁকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। যা হোক, মীরা তার ধর্ম্ম জীবনের দীক্ষা, সেখানে মহাযোগী রৈদাসজীর কাছে নেন। চির-জীবন ধরে' যে প্রিয়তমের আরাধন তিনি করেছিলেন তার পরিপূর্ণ প্রকাশ এম্নি করে তাঁর জীবনে এসে উপনীত হোল। তিনি জীবন দিয়ে অনুভব করলেন তাঁর প্রিয়-তমের নিবিড় পরশ। জীবনে জাগল তাঁর পরম শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সুর। সমস্ত জীবন যেন একটি একটি করে প্রেমের পাঁপড়ি মেলে, তার প্রিয়তমের অরুণ চরণতলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠল। লুটিয়ে পড়ল, ঝরে পড়ল—রসিকের চিত্তকে অনুরাগরসে রঞ্জিত করে, সৌরভে পাগল করে'।

আমরা এখন মীরার সাধন পথ ও গানের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

ভারতীয় সাধনার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে—অধ্যাত্ম উপলব্ধির দুইটি বিশিষ্ট ধারা আমাদের চোখে স্বতঃই প্রতিভাত হ'য়ে উঠে। একটি ধারা প্রবাহিত হয়েচে দর্শনের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের মাঝ দিয়ে যা' আপাতঃ দৃষ্টিতে শুষ্ক রসহীন। এবং আরেকটি ধারা সঙ্গীত ও কাব্য কলার ভিতর দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে—মানুষের হৃদয়কে সরস ও শ্যামল করে। প্রথমটি—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির ভিতর আশ্রয় লাভ করেছে এবং দ্বিতীয়টি মরমিয়া সাধক কবিদের গীতোচ্ছ্বাসে ও কাব্যের অবারিত স্রোতে নিরন্তর প্রবহমান। মীরা, কবীর, দাদূ প্রভৃতি মরমিয়াদের অধ্যাত্ম সঙ্গীত ও কাব্য—এই দ্বিতীয় ধারার সাক্ষ্য দেয়। বাঙলা দেশে সহজিয়াদের বাউল গান ও তারই প্রমাণ। বৈষ্ণব কবিরাও এই রসে রসিক ছিলেন। মীরা এই দ্বিতীয় ধারার সাধক ও কবি। তাই তাঁর সাধনায় তত্ত্বের রুক্ষ, রসহীন মূর্ত্তি দেখি না, দেখি প্রাণস্পন্দ করা সঙ্গীতের অমৃত ধারা—যা' সর্ব্ব হৃদয়কে তৃপ্ত ও সজীব করতে পারে। এই মধ্য যুগীয় সাধকদের কাব্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন—"এই সকল কাব্যে যে রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েচে সে হচ্ছে—ভগবানের প্রতি প্রেমের রস।......শাস্ত্রের যে ভগবান ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্ম্মিক লোকের ভগবান—তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক রচনা করা চলে, তার জন্য অনেক মন্ত্র তন্ত্র। আর যে ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে, ভক্ত সত্য করে' দেখছেন, যিনি অহেতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্য্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায় —"মরমিয়া, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২।

এখন আমরা মীরার গানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

মীরার গানগুলির ভিতর বিশ্ব পূজারতির রূপ অন্তরের কান্না-হাসির সঙ্গে জড়িত হয়ে বারবার, সুন্দর ভাবে রূপ নিয়েচে। বহিঃপ্রকৃতি বারবার মীরার হৃদয়কে উতলা করেছে, আকুল করেছে, ব্যাকুল করেছে। বর্ষার মেঘ মেদুর দিনে মীরার চিত্তে যে ঝড় উঠেছে তা ফুটে উঠেছে একটি গানে, সেই গানটি এইঃ

স্থনী মৈঁ হরি আবন্ কি আবাজ।
দাদুর, মৈর, পপীহা বোলে,
কোইল মধুর সাজ।
গরজে বাদর বা মেঘা বোলৈ
দামিনী ছোড়ি লাজ;
ধরণী রূপ নব নব ধরিয়া,
কংত মিলন কা কাজ।
মীরা কি চিত ধীরা ন মানৈ।
বেগ মিলো মহারাজ॥

হরির আসার পায়ের ধ্বনি আমি শুনচি। দাদুরী, ময়ুর পাপিয়ারা ডাকছে! মেঘ গর্জন করছে, বাদল ঝরে পড়চে, বিজুরী ঝলক দিতেছে—; ধরণী প্রিয় মিলনের জন্য নতুন নতুন বেশ ধারণ করছে। মীরার হৃদয় আজ অধীর হোল; ওগো মহারাজ, এস তুমি আজ এস।—

এই আবেগ, এই যে উৎকণ্ঠা—এই ভাবের অনুরূপ ভাব, বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়!

"সখি, হামারি দুঃখের নাহি ওর
ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূণ্য মন্দির মোর। ইত্যাদি।

অনুরূপ ভাব—রবীন্দ্রনাথে ও আছে—

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো,
একা দ্বারের পাশে। ইত্যাদি।

আরেকটি গানে দেখি, মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি ঝরছে, বিজলি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি ঝলকিত করে নিয়ে যাচ্ছে—আর মীরা আনন্দ-মঙ্গল গান প্রিয়তমকে শোনাচ্ছেন।

বরসে বাদরিয়া শাবন কী।
শাবন কী, মন ভাবন কী।
শাবন মেঁ উমগ্যো মেরে মনজ
ভনক শুনি হরি আবন কী।
* * * *
মীরাকে প্রভু, গিরিধর নাগর
আনন্দ-মঙ্গল পাবন কী॥

আরেকটি গানে, বর্ষণ মুখর আকাশের দিকে চেয়ে মীরার সমস্ত হৃদয় কান্নায় ভরে' গিয়েচে—গিরিধর লালের বিরহে; সে বিরহের জ্বালা—নাগিনীর বিষের জ্বালার মত নিরন্তর দাহন করছে—মীরার হৃদয়! মীরা গাইছে—অশ্রু সজল কণ্ঠে:

"মাতবারো বাদল আয়ো রে,
হরিকা সন্দেশ কুছ নাঁহি লায়োরে।
দাদুর, মোর, পাপীহা বোলে
কোয়েল সব্দ, শোনায়ো বর।
কারী আঁধিয়ারী, বিজলী চমকে
বিরহিন অত ডর পায়ো রে।
গাজে, বাজে, পবন আধুরিয়া
মেহা অতি ঝড় পায়ো রে।
ফুকে কালী নাগ বিরহি কি জারি
মীরা মন হরি ভায়ো রে॥

এই যে বিরহের তীব্র দাহনভরা গান! হরি-প্রেম-পিপাসার তীব্রতা এতে অনুভব করা যায়।

আরেকটি গানে তাঁর আত্ম-সমর্পণের সুর ফুটে উঠেছে অনির্ব্বাচনীয়রূপে, সে গানটি বলছে: হে প্রিয়—তুমি যা কর' আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না! তোমার প্রেম ছাড়া আমার কোন গতি নাই; তুমি হলে গাছ—আমি তাতে পাখী; তুমি হলে দীঘি—আমি তাতে মাছ! তুমি হও গিরি—আমি তাতে গাছ; তুমি হও চাঁদ—আমি চকোর ইত্যাদি—হে প্রভু—আমি তোমার দাসী তুমি আমার ঠাকুর—এর ছত্রে ছত্রে আত্ম-সমর্পণের গান বেজে উঠেছে। শুধু বিরহ, শুধু পিপাসা, শুধু অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠাই মীরার গানে নাই; তাতে আনন্দের, মিলনের ও অনন্ত তৃপ্তির সুর ও আছে—যা পাওয়া যায় জীবনের পরম দেবতার সান্নিধ্যে, প্রিয়তমের নিবিড় কণ্ঠালিঙ্গনে! একটি গানের শেষের কয়েক লাইনে তারই কিছু আভাস পাওয়া যাবে;

মীরাকে প্রভু, পরম মনোহর
হরি চরণা চিতরাতি,
পল পল তেরা রূপ নেহারা
নিরখ, নিরখ সুখ পাতি॥

মীরার প্রভু পরম মনোহর; সেই হরির চরণেই তার চিত্ত অনুরাগী। মীরা পলে পলে তাঁর রাগ নিরিখন করে ও আনন্দরসে নিমগ্ন হয়।

মীরার কবিতাগুলিতে এমনি মাধুর্য্য অনেক স্থানেই উচ্ছ্বসিত হয়েছে—তার' বিস্তৃত পরিচয় দিতে হ'লে প্রবন্ধ অনেক বড়ো হয়ে যায়, কাজেই তা' থেকে বিরত হই। মীরার কাব্য কমল বনে, রসিকের চিত্ত ভ্রমরের মত চিরদিন মধু অন্বেষণ করে' ফিরবে এবং পান করে মুগ্ধ হবে, কৃতার্থ হবে। দেবালয়ের ধূপের পূত সুরভির মত মীরার গানগুলি চিরদিন ভক্তগণের হৃদয়কে বিহ্বল ও উদাস করে' তুল্‌বে। এই গানগুলি—ক্ষয়হীন, দীপ্তিমান কতকগুলি দীপশিখার মত—যা' অন্তহীন কাল ধরে' জলবে, একটি আত্মভোলা, পূজারিণীর অম্লান স্মৃতিকে বহন করে। এগুলির রস উপভোগ করা চলে, বিশ্লেষণ করা যায় না।

অনন্তের পূজারিণী মীরা, তাঁর সঙ্গীত রস-ধারার ভিতর দিয়ে, যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তরের মন্দিরে স্থান পেয়ে আসছেন ও অনাগত কালেও পাবেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বলেই মনে হয়।

পদ্যে উপনিষদ

৺দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয়।
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয়॥
মহান্ আত্মা তিনি জনমবিহীন।
জরা মৃত্যু ভয়-ডর—কারো না অধীন॥
চিন্তা করিলেন তিনি; চিন্তনের পিছু,
সৃজিলেন এই সব দেখিছ যা কিছু॥
তাঁহা হইতেই হ'ল বিশ্বের প্রকাশ।
জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ
অনিল সলিল জ্যোতি; আশ্চরিজ তিনি!
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী॥
ভয়ে তাঁর জলে অগ্নি, ভয়ে ভানু ভায়,
চলে মেঘ, চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায়॥
পরম তত্ত্বের সেই লভিবারে জ্ঞান।
যাইবে গুরুর কাছে শিষ্য মতিমান্॥
প্রশান্ত হৃদয়-মন প্রণত শিষ্যেরে
সত্য বলিবেন গুরু, বিনা ঘোর ফেরে,
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাতে ব্রহ্মে যায় জানা,
ছাড়িয়া কল্পনা আর জলপনা নানা,
ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব্ব,
শিক্ষা কল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব্ব॥
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তারে বলি
যাতে হয় নিত্য ধন লাভ।
পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দে'ন হৃদে আসি
ঘুচাইয়া সকল অভাব॥
যাঁ হ'তে হ'য়েচে সৃষ্টি, না যায় সেথানে দৃষ্টি
কেহ তাঁরে নাহি পায় ধরা।
নাহি গোত্র নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ,
সর্ব্বত্র আছেন তিনি ভরা॥
হস্ত পদ নাহি তাঁর, সূক্ষ্ম বিভু সারাৎসার
চরাচর বিশ্বের কারণ।
হ্রাস বৃদ্ধি নাই অণু, হেরে লোমাঞ্চিত তনু
তদগত চিত্ত তপোধন॥
দেব দেব পূজ্যতম! ইহাঁরেই করে নমো
ব্রাহ্মণেরা গার্গি বারবার।
স্থূল সূক্ষ্ম ছোটো বড়, যাহা কিছু মনে গড়ো
ন'ন ইনি কিছুই তাহার॥
রাঙা কালো তমোছায়

চক্ষে যাহা কিছু ভায়
ন'ন তাহা লিখিলের প্রভু।
জলের মতন ন'ন,
ন'ন তিনি সমীরণ
আকাশ নহেন তিনি কভু॥
সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ,
নাহি দেহ নাহি গেহ,
চক্ষু মুখ কর্ণ নাহি তাঁর।
বাক্য মন তেজঃ প্রাণ,
তাঁহাতে না পায় স্থান
ব্রহ্ম তিনি অগম্য অপার॥
ইহাঁরে শাসনে গার্গি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ
আপন আপন পথে ধায় অহরহ॥
উপরে দ্যুলোক আর নিচে বসুন্ধরা
শাসনের মন্ত্রবলে রহিয়াছে ধরা॥
মুহূর্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ষ চলে।
চলে ঋতু সম্বৎসর শাসনের বলে॥
তুষার মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত হইতে
ইহাঁরি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে
পূর্ব্বমুখে বহি চলে শত নদ নদী,
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি॥
ইহাঁরে না জানি যারা যত বীজ বপে,
যজ্ঞে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে,
বহুবর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান॥
ইহাঁরে না জানি যারা হেতা হৈতে যায়,
কি দুর্দশা তাদের কি ক'ব হায় হায়॥
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান্
হেতা হৈতে পুণ্য লোকে করয়ে প্রয়াণ
সেই ধন্য সেই ধন্য! তিনিই ব্রাহ্মণ!
বলিনু তোমারে গার্গি সত্য এ বচন॥
অক্ষয় পুরুষ ব্রহ্ম দৃষ্টি নহেন গম্য
কিন্তু তিনি দেখেন সকলি।
গম্ভীর তিনি নিস্তব্ধ
নাহি তাঁর সাড়া শব্দ,
শুনেন যা কিছু মোরা বলি॥
তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব
নাহি জানে দেব মর্ত্ত্য,
সকলি জানেন জ্ঞাতা সেই।
বস্ত্র বুনানির মতো
রহিয়াছে ওতোপ্রোতো
অসীম আকাশ তাঁহাতেই॥
ইহাঁর ভয়ে পবন বহে।
তপন উঠে ইহাঁর ভয়ে।
ইহাঁর ভয়ে অনল জ্বলে।
গগন পথে মেঘ চলে॥
আজ্ঞাকারী যেন ভৃত্য
মৃত্যু করে নিজ কৃত্য॥
সকলের প্রাণ ইনি; যা কিছু যেথায়
ইহাঁতে করিয়া ভর স্ব স্ব কাজে ধায়॥
সবাই করিছে তাঁহার কাজ।
মহদ্ভয় তিনি উদ্যত বাজ॥
কেবল যে জন তাঁহারে জানে
ভয় নাহি কোনো তাঁহার প্রাণে॥
মৃত্যুময় সংসারে
অমর হ'ন পেয়ে তাঁরে॥

সাহিত্যে ছদ্মনাম

—দিবাকর

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে স্রষ্টার ছদ্মনাম ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রধানতঃ দুইটি অনুমিত হয়। প্রথম, সমসাময়িক সাহিত্যিক ও পরিচিতদের মধ্যে নিজকে গোপন রাখিয়া তাঁহার রচনাবলীর প্রশংসা অপ্রশংসা শ্রবণ করা, দ্বিতীয়, নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া আপনার সৃজনানন্দে বিভোর হইয়া থাকিবার বাসনা। এই কারণে বহু ভারতীয় কবির সঠিক নাম আজও জানা যায় না এবং বহু উচ্চ স্তরের কবির দলে বহু নিম্নস্তরের কবিও একই নামের জন্য স্থান পাইয়াছেন। বেদব্যাস কয়জন ছিলেন আজিও তাহা নির্ণিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের সংখ্যা তো দুই তিন করিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

সাহিত্যে ছদ্মনাম গ্রহণ বহু প্রচলিত রীতি, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের সাহিত্যেই উহার প্রচলন আছে এবং ইহাতে দূষনীয় কিছুই নাই বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। বাংলায় আধুনিক বিখ্যাত কয়েকজন লেখকও ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া লিখিয়া থাকেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁহারা সেই ছদ্মনামেই প্রসিদ্ধ। ইহার জন্য কেহ কোন দিন অভিযোগ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। বীরবল বা রাহু নাম বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ পরিচিত যদিও ঐ লোকগুলির সঠিক নাম আমরা সকলেই জানি। হয়ত দুই তিন শতাব্দি পরে ঐ লেখকগণের সঠিক নাম তৎকালের পাঠকবর্গের অজানা হইয়া যাইবে, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, কারণ তাঁহার রচনা যে কোন নামেই পাঠককে সমান আনন্দ দিবে। যিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি নিজকে সেই ছদ্ম নামেই নিশ্চয়ই পরিচিত করিতে চান। সেই সাহিত্যিকের সেই ইচ্ছাটুকুকে সম্মান করায় পাঠকের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, বরং তাঁহারা ইচ্ছাকে সম্মান দানের ঔদার্য্যই দেখান হয়।

বহু লেখক এক নামে পরিচিত হইয়া গিয়া আর নাম বদলাইতে সক্ষম হন না, অন্য নামে পাঠকসাধারণ তাঁহাকে চিনিবে না এই আশঙ্কায়। কোন লেখকের বা শৈশব হইতে দুইটি নাম থাকে পঠদ্দশায় তিনি হয়ত দ্বিতীয় নামটি দিয়া সাহিত্য সাধনা করিতেন এবং সেই নামেই পরিচিত হইয়াছেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে দ্বিতীয় নামটিই রাখিতে হইল। কোন লেখক হয়ত স্বেচ্ছায় নাম বদলাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং সেই নামেই পরিচিত হইলেন—ইহাতে দোষের বা অন্যায়ের কি থাকিতে পারে? তথাপি দেখি, একদল হীনমতিসম্পন্ন লোক ছদ্ম সাহিত্যিকগণকে সুবিধা পাইলেই খাটো করিবার চেষ্টা করেন। বাঙ্গালীর ঈর্ষাপরায়ণতার মজ্জাগত এই পাপবৃত্তি সাহিত্যক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

যিনি পুষ্পকুমার নামে সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত, তাঁহার নাম আপনার নিকট করিলেই আপনি বলিয়া উঠিবেন——"ও, আমাদের সেই খেঁটু রাম!" যেন খেঁটুরাম হইলে তাঁহাকে আর সাহিত্যিক হইতে হয় না, অন্ততঃ উচিৎ নয়। তিনি যেন পুষ্পকুমার নামটার জোরেই সাহিত্যিক!

মানুষকে এইভাবে ছোট করিবার চেষ্টা বাংলার অনেক মানুষের মধ্যেই যে আছে তাহার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। "বনফুল" নামক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, একজন বলিতেছে—"করে ডাক্তারী, নাম বলাই মুখুজ্যে!" বক্তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

সম্বুদ্ধ, উপানন্দ, জরৎকারু ইত্যাদি নাম তো মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রায়ই দেখা যায় এবং লেখকগণ সকলেই প্রায় বিখ্যাত।

ইহা ছাড়া বহু লেখক আছেন যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে এক নামে পরিচিত এবং গৃহে ও বন্ধুবর্গের নিকট অন্য নামে পরিচিত।

বন্ধুবর্গ তাঁহাকে হয়ত শৈশবের ডাকা নামেই ডাকিতে পারেন কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের কি বোঝা উচিৎ নয় যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যে নামে পরিচিত সেই নামেই অভিহিত হইতে চান।

মানুষের মনোবৃত্তির কুৎসিৎ প্রকাশ বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সাহিত্যিকের ছদ্মনামকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে আছে যে নীচতা, তাহা সাহিত্যিকের পক্ষে অসহনীয় এবং পাঠকেরও মনোবিকৃতির পরিচায়ক।

পুস্তক পরিচয়

পরলোকাঞ্জলি—শ্রীমতী স্বরমা সুন্দরী ঘোষ প্রণীত, কবিতা সংগ্রহ, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক ১৪ পুলিশ হস্‌পিটাল রোড হইতে প্রকাশিত।

জন্ম ও মৃত্যু এ সংসারের নিত্য সনাতন পদ্ধতি। তথাপি মরণের বিভীষিকা প্রত্যেক জীবকে বিচলিত করিয়া রাখে মরণের ব্যাথা উপলব্ধি করিয়া থাকে। মরণের মর্ম্মবীণা মানবের প্রাণে শোকের ধ্বনি প্রকাশ করিয়া দেয়। মৃত্যুর শোকাঘাতে প্রবীণা গ্রন্থকর্ত্রী কয়েকটী বিয়োগান্ত কবিতা লিখিবার অনুপ্রেরণা পান। তাহার হৃদয়ের মর্ম্ম বেদনার সহিত মরণের রহস্য জানিবার স্পৃহা কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

কেবল আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে তিনি কাতরা হইয়া কবিতা লেখেন নাই—দেশের ও দশের প্রিয় জনের তিরোভাবে তাহার হৃদয়ের ব্যথা যতীন দাস, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর স্মৃতি তর্পণ 'স্যর জগদীশ', 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' 'চিত্তরঞ্জন দাস', 'স্যর আশুতোষ' কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'স্বর্ণকুমারী', 'বিদ্যাসাগর', 'সরোজনলিনী', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' 'গোপালকৃষ্ণ গোখেল', 'স্যর সুরেন্দ্রনাথ", 'আনন্দমোহন দাস' প্রতি দেশবরেণ্যদের স্মৃতিতর্পণ কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'রঞ্জিনী' 'সিঞ্জিনী' আদি কবিতার বইগুলির ন্যায় পরলোকাঞ্জলি বঙ্গের নরনারীর নিকট আদরণীয় হইবে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬ মূল্য ১৲।

তানসেন একজন সঙ্গীতের মহাসাধক এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারার পথপ্রদর্শক। আজ চারশত বৎসর ব্যাপী ভারতে সঙ্গীত সাধনার পথে তানসেনের অবদান বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তাঁহার ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেই জ্ঞাত আছেন।

গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী নিজে সঙ্গীতের সাধক এবং সঙ্গীতবেত্তাদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তানসেনের জীবনীর উপর যে চন্দ্রিকাপাত করেছেন তাহার দ্বারা তানসেনের জীবনের অনেক গূঢ় ও অধ্যয়ন যোগ্য রহস্য আমাদের গোচরে আসিবে।

তানসেনের প্রতিভার ক্রমবিকাশ, তাহার সুদীর্ঘ জীবনের চমকপ্রদ ইতিবৃত্তি গ্রন্থকার বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এ ধরণের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

গীতার কথা—শ্রীদাদা প্রকাশক শ্রীখগেন্দ্র কৃষ্ণ রায় মহাশয়, পোঃ নলহাটী, জেলা বীরভূম। ১৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কতকগুলি পত্রের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থকার শ্রীদাদা জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী সন্ন্যাসী। তাঁহার ভাষার মধ্যে জড়তা নাই, উপরন্তু পত্রমালার রূপ পরিগ্রহণ করায় গীতার প্রতি অধ্যায়ের ভাবধারার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার কঠিন বর্ম্মভেদ করে গ্রন্থকার গীতার মধুর ভাবরাশি সাহিত্যের ভাষায় সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন। ব্যাখ্যার সাথে বিশেষ বিশেষ মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষগণের সমানার্থক উক্তিও স্থানলাভ করেছে।

পত্রমালা সুসম্বদ্ধ ও ঐক্যপূর্ণ। সংস্কৃতানভিজ্ঞ নরনারীদের এবং বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠের পক্ষে এই বইখানি উপযোগী। উহার প্রচুর প্রচার আমাদের কাম্য। বইখানির আকারের তুলনায় দামও অল্প অথচ কাগজ ছাপা ও বাধাই চমৎকার।

কুমারী দীপ্তি সরকার বি-এ,

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্ত্তমান বর্ষে কুমারী সুনীলা মিত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমগ্র ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থ গার্লস কলেজের প্রধান অধ্যাপক প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের চতুর্দ্দশ বয়স্কা কন্যা।

ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রীই প্রথম

বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় সমগ্র উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী কনক পুরকায়স্থ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি সিলেট হইতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

কুমারী লতিকা ব্যানার্জ্জি ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক (বাধ্যতামূলক), অঙ্ক (ইচ্ছাধীন) ও সংস্কৃত এই পাঁচটী বিভাগে লেটার (নির্দ্দিষ্ট উচ্চ নম্বর) পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভিক্টোরিয়া ইনঃ এর ছাত্রী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রাণী উইলহেলমিনা

জার্ম্মাণ দৈত্যরা বিনা কারণে হলাণ্ডের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা যে প্রকারে চালাইয়াছিলেন তাহার আলোচনা ও প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। এই মহা বিপদের সময় হলাণ্ডের শাসনকর্ত্রী রাণী উইলহেলমিনা যেরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালান এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া যেমন-ভাবে ওলন্দাজ সামরিক ও অসামরিক প্রজাদের প্রতি দেশ-প্রিয় বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পাতায় চিরকালই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার অনুপ্রেরণা ডাচ ইণ্ডিজের (জাভা সুমাত্রা আদি) দ্বীপপুঞ্জবাসীদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

ইনি বর্ত্তমান যুগে একমাত্র মহিলা রাণী শাসনকর্ত্রী। তাঁহার রাজ্য পুনর্দখলে আসিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কলা-শিল্প শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয় মধ্যে "কলাশিল্প" বর্ত্তমান বর্ষেই প্রথম প্রবর্ত্তন হইল। অনেকগুলি ছাত্রী বর্ত্তমান বর্ষে "কলা শিল্প" বিষয় লইয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বেলতলা স্কুলের ছাত্রী কুমারী মানসী চ্যাটার্জ্জী "কলাশিল্প" বিষয় লইয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং "কলাশিল্প" বিষয়ে প্রথম স্থান পাইয়াছেন।

বিখ্যাত শিল্প সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের "কলাশিল্প" শিক্ষার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি এই বিষয়ে অধ্যয়নে উৎসাহ দিবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রীকে "গগনেন্দ্র নাথ" স্বর্ণ পদক প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জ্জী বর্ত্তমান বর্ষে "গগনেন্দ্র নাথ" পদকটি পাইবার অধিকারিণী।

শিল্পের সহিত সাহিত্যের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটিকে বাদ দিলে যে কোন উৎকৃষ্ট জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্রদেরও "কলাশিল্প" পাঠ্য বিষয় করিতে অনু-রোধ জানাইতেছি।

বেলতলা স্কুলের ছাত্রী ইন্দিরা দত্ত এবং সুলেখা ব্যানার্জ্জী নবম ও দশম স্থান অধিকার করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। এক বৎসরে ৪টী ছাত্রী প্রথম দশ জনের মধ্যে হওয়া মেয়েদের গৌরবের বিষয়।

ভোলানন্দ

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ভোলার প্রতীক ভোলানন্দ
আজকে তোমায় বন্দনায়,
তিরোভাবেও দেখছি যেন
আবির্ভাবের কল্পনায় !
মরণজয়ী আপন ভোলা,
আপনি দোলাও মরণ-দোলা
চিদানন্দে ভূমানন্দ তোমার আপন মহিমায় !

হে রুদ্র, হে বিশ্বগুরু
করাও করাও যাত্রাসুরু,
সাধন-পথে, সিদ্ধি-রথে শিষ্যে চালাও করুণায় ।
দিন হারা'য়ে হে দীনপালন
চাইছি তোমার চরণ শরণ
পরাণ খোলা ব্যোম্ ভোলানাথ
ঠাঁই দিওগো চরণ-ছায় !

সেনহাটি মহিলা সমিতি

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের শিল্প বিদ্যামন্দির পরিদর্শন

গত এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে বাংলা সরকারের কৃষি শিল্প ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় তমিজুদ্দীন খাঁ মহোদয় সেনহাটী মহিলা সমিতির শিল্প বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করেন। বিদ্যামন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ব্রতচারী বালিকাগণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অভ্যর্থনা করে। তিনি বিদ্যামন্দিরের প্রত্যেক বিভাগের কাজ ভালভাবে পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন পুস্তকে বিদ্যামন্দিরের কার্য্যাবলী বর্ণনা অন্তে লিখিয়া গিয়াছেন—"এই বিদ্যামন্দিরে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে গ্রামের বহু সহায়হীনাকে জীবিকা অর্জ্জনে সাহায্য করিবে। বিদ্যামন্দিরের কাজ দেখিয়া ধারণা হয় যে ইহা একটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যামন্দির দিন দিন উন্নত হইয়া নিজ সম্মান বজায় রাখুক ইহাই আমার অন্তরের কামনা।" বিদ্যামন্দিরের পরিচালিকাবৃন্দের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এমব্রয়ডারী করা একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। বাংলার পল্লী উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর, খুলনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সদর মহকুমা হাকিম এবং বিদ্যামন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মিঃ এস, কে, সেন এই সময়ে বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমিতির নিমন্ত্রণে বাংলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি আই, এম, এস মহোদয়, ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজিনের ডিরেক্টর ও মেটারনিটি সমূহের লেডি সুপারিন্‌টেনডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া এই গ্রামে আইসেন। গ্রামের নরনারীর এক সাধারণ সভায় লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপনের উপকারিতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। ঐ সময় মহিলা সমিতির ৬জন প্রতিনিধি ও গ্রামের একজন চিকিৎসককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। গ্রামে অবিলম্বে একটী মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র এবং একটি স্থায়ী প্রসূতি সদন স্থাপনই এই কমিটির কার্য্য। এই কমিটী এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে এবং গ্রামের একটি মেয়েকে মিডওয়াইফারী ও হেল্‌থ ভিজিটারসিপ ট্রেনিং এর জন্য প্রেরণ করা স্থির করিয়াছে। গ্রামের মেয়েদের কার্য্যে উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি খুব সন্তুষ্ট হয়েন।

কেন্দ্র সমিতির কথা

মহিলা সমিতি পরিদর্শন ও প্রচার-কার্য্য ঃ—

গত ৩০শে এপ্রিল খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে পল্লী উন্নয়ন সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়; কেন্দ্রসমিতির শাখা মূলঘর মহিলা সমিতিই শিল্প-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

এই উপলক্ষে ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় স্থানীয় স্কুলের মাঠে একটী বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। বাগেরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লতিফ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ণ সহযোগে সাধারণ শিল্প শিক্ষা ও মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরেরদিন মহিলা সমিতির উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলা মহিলাদের একটী সভা হয়। পণ্ডিত মহাশয় মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩রা মে পিলজঙ্গ গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ণ সহযোগে মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মে পণ্ডিত মহাশয় ব্রাহ্মণ-রাংদিয়া যান। ব্রাহ্মণ রাংদিয়া কো অপারেটীভ পল্লীমঙ্গল সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় স্কুল ভবনে একটা জনসভার অধিবেশন হয়। স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় উদ্বোধন বক্তৃতা করার পর পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় ম্যাজিক-ল্যাণ্ঠার্ণ সহযোগে মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ-রাংদিয়ায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একটী মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়া কেন্দ্র সমিতির সহযোগে প্রায় তিন বৎসর খুব সুন্দর ভাবেই পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু সভানেত্রী এবং সম্পাদিকা পারিবারিক নানাবিধ অসুবিধায় পড়ায় সাময়িক কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন।

তাঁহাদেরই উদ্যোগে ৫ই মে সন্ধ্যাবেলা রায়বাবুদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে মহিলাদের একটি সভা হয়; পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ণ সহযোগে বক্তৃতা করেন।

ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতি পরিদর্শন—

গত ২৪শে মে ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় থিয়েটার হলে এক বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা করেন এবং স্থানীয় স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তৃতা করেন।

পরের দিন ২৫শে মে বেলা ২টার সময় সমিতির সভ্যারা সম্পাদিকার বাড়ীতে মিলিত হইয়া পণ্ডিতমহাশয়ের সহিত আলোচনা করেন,—কিরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলে মহিলা সমিতির কার্য্য দ্বারা দুঃস্থা মহিলারা মাসিক অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

এইদিনও সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার হলে মহিলাদের একটী সভা হয়; পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মাতৃমঙ্গল ও শিশু-পালন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং হেডমাষ্টার মহাশয় শিশু-পালনের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মাদারতলী মহিলা সমিতি পরিদর্শন

গত ৫ই জুন খুলনা জেলার মাদারতলী মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক বিরাট জন সভার অনুষ্ঠান হয়। কেন্দ্র সমিতির সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা করেন।

পটুয়াখালী মহিলা সমিতি পরিদর্শন

গত ১০ই জুন পটুয়াখালী মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় সিনেমা হলে মহিলাদের এক সভা হয়। কেন্দ্র সমিতির সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

যার যেমন রুচি

বিভিন্ন দেশ—যার একটার সঙ্গে আর একটার না আছে নৈকট্য, না আছে সভ্যতা বা সংস্কৃতির যোগাযোগ—তা'রা নিজের নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী চা খাবার কত অদ্ভুত উপায়ই না আবিষ্কার করে' নিয়েছে। আজকাল আমরা যেরকম ভাবে চা খাই, অনেক দেশের চা খাবার প্রথা তা'র থেকে একেবারেই আলাদা। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোক দুধ-চিনি মিশিয়েই চা খায়; আবার অনেকে দুধ-চিনি না দিয়ে শুধু একটু নেবু দিয়ে চা খায়। চা-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের রুচিতে যেসব পার্থক্য এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' নামমাত্র; কারণ চা এম্‌নি জিনিষ যে এর উপভোগের পক্ষে দুধ কিম্বা চিনি কোনোটাই অপরিহার্য্য নয়। কিন্তু আজও এমন অনেক দেশ আছে যাদের চা খাবার আদব কায়দাটা আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে মধ্য ইয়োরোপের বোহেমিয়ান্, ম্যাগিয়ার, হাঙ্গেরিয়ান্ ও চেক্ জাতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা চায়ের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খায়। এদিকে তিব্বতীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চা খেয়ে আসছে, কিন্তু তা'রা এখনো নুন আর মাখন দিয়ে চা সিদ্ধ করে' খায়। বর্ম্মার কোনো কোনো অঞ্চলে নব-বিবাহিত দম্পতী একই পাত্র থেকে তেলে ভেজানো চায়ের পাতা চিবিয়ে খায়ঃ একে এরা বলে "মিয়াং"। কাশ্মীরীরা খানিকটা পটাশ, জোরান ও নুন দিয়ে চা ঘুঁট নিয়ে খেতে এখনও ভালোবাসে। তুর্কীস্থানে কড়া চায়ের সঙ্গে ফুটন্ত অবস্থায় ক্রীম্ মিশিয়ে তাতে ছোট ছোট রুটির টুক্‌রো ভিজিয়ে খাওয়া হয়। আল্‌জিরিয়ার লোকেরা মিন্ট্ এবং চিনি মিশিয়ে চা খায়। আরব দেশবাসীরা একটা পাত্রে একটু চা আর একটু চিনি ফেলে দেয়, তা'র মধ্যে জল ঢেলে সমস্ত জিনিষটা তা'রা ফুটিয়ে নিয়ে খায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় চা খাওয়া স্বরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন কিন্তু সেখানে যেরকম কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস তা' আর কোনো সভ্য দেশে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিজীবীদের বিশেষ প্রিয় হোলো 'বিলি' (Billy) চা; টিনের 'বিলি'তে গরম জল চাপিয়ে তাতে মুঠো মুঠো চায়ের পাতা ফেলে দিয়ে এই চা তৈরী হয়। মহামান্য ডিউক অফ্ গ্লষ্টর কিছুদিন আগে যখন অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি এই চা নিজে তৈরি ক'রে খেয়ে দেখেছিলেন।

তিব্বতে নববর্ষের দিনে চায়ের উৎসব একটা প্রধান আচার। দালাই লামা থেকে আরম্ভ ক'রে ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রের সব বড় লোকদেরই এ-উৎসবে যোগ দিতে হয়। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ রাজনৈতিক মিশনে যাঁরা লাসা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন "সান্‌ডে ষ্টেস্‌ম্যান্"-এ একটা প্রবন্ধে এ উৎসবের একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক বল্‌ছেনঃ—

ঘরের প্রান্তে যেখানে উৎসবের আচার আয়োজন হচ্ছে সেইখানে যখন দালাই লামা তাঁর উঁচু সিংহাসনের দিকে এগিয়ে এলেন তখন "তিনি তাঁর টুপি খুলে নিয়ে সিংহাসনের সাম্‌নে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, তারপর তিনি তাঁর উত্তরীয় উৎসর্গ করলেন। তখন দালাই লামাকে সোনার পাত্রে আর অন্য সকলকে রূপোর পাত্রে চা দেওয়া হোলো। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের চা খাবার পাত্র নিজেরাই বার করে' দিলেন।"

বিখ্যাত অভিযানকারী ক্যাপ্টেন স্কট্-এর ছেলে পিটার স্কট সম্প্রতি ক্যাসপিয়ান্ সমুদ্রের ধারে জলাভূমিতে বুনো পাখীর ছবি এঁকে মাস দুই কাটিয়ে এসেছেন। ফিরে এসে তিনি বলেছেন যে, সব জায়গার অধিবাসীরা অধিকাংশই ইরাণী। মাংস কিম্বা তরকারি না হ'লে নাকি তাদের স্বচ্ছন্দে চলে' যায়, কিন্তু রোজ সাত আট পেয়ালা চা না হলে তাদের চলে না।

শ্রাবণ শ্রী

প্রবর্ত্তকের সৌজন্যে

শিল্পী—শ্রী তারাশঙ্কর [illegible]

বঙ্গলক্ষ্মী

১৫শ বর্ষ | শ্রাবণ | ৯ম সংখ্যা

অ-ধরা

তোমায় ভরা থাকবে বলে
আকাশ হোল এমন ফাঁকা,
এমন বিরাট শূন্য ছাড়া
কোথায় তুমি থাকবে আঁকা !
ভরা আকাশ তোমার ভারে
রইতে নারে শূন্যে সুখে
নেমে পড়ে—নুয়ে পড়ে,
ভেঙে পড়ে আমার বুকে !

উঠ্‌লো ভরে বুকের তলা—
যায় না বলা কেমন তুমি,
আকাশ-ভাঙা অথৈ রসে
সিক্ত হোল চিত্ত-ভূমি !
বিরাট তুমি, বিশ্ব তুমি
দৃশ্যপটে তোমায় দেখা
যায় না তবু, "আমার তুমি"
চিত্ত পটে রইল লেখা !

"আমার তুমি" "আমার তুমি"
আমার "আমি" তোমায় ভরা,
আকাশ ঘেরা এই অ-ধরা
আমার বুকে পড়ল ধরা।

কালীমোহন ঘোষ

শ্রীহেমলতা দেবী

স্বদেশী যুগের পথঘোরা ছেলে কালীমোহনকে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ দেশের পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বল্লে অত্যুক্তি হয় না। কালীমোহন কলেজে আই, এ, পড়তে পড়তে স্বদেশীর টানে ঘর ছেড়ে, পড়া ছেড়ে, দেশের কাজের ধান্দায় অনির্দ্দেশ্য কাজের উদ্দেশে যখন ফিরছিলেন, সেই সময়, কবি-গুরু স্নেহের টানে টেনে এনে তাঁকে কাজে জুড়ে দেন, তাঁর হাতে তুলে দেন স্বদেশের কাজ। দেশের কাজের একটা ঠিকানা পেলেন কালীমোহন তখন কবির আদর্শের আশ্রয়ে।

কালীমোহন বুদ্ধিমান, কর্ম্মপ্রতিভা সম্পন্ন, সংকল্পনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। কাজের নির্দ্দেশ পেয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে লাগলেন তিনি দিনে দিনে, নিজের উন্নতি করে তুললেন সকল দিক দিয়ে। অবস্থার উন্নতি, জ্ঞান বুদ্ধির উন্নতি ঘটে উঠতে লাগল তাঁর কবির সংসর্গে, সহানুভূতিতে।

পূজ্যপাদ কবিগুরু স্নেহের টানে যাকে টেনে আনেন নিজের কাছে, তাকে কত যত্নে, কত স্নেহে লালন করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিই। কালীমোহন স্বদেশীর পাল্লায় ঘুরে যৌবনেই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন। কবি তাঁর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা ও চেষ্টা রাখতেন। একবার দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আমি অক্রান্ত হই। সেরে উঠতে অনেক বিলম্ব ঘটে। দামী ওষুদ সে সময়ে অনেক কেনা হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত যার অনেকগুলি ব্যবহারে লাগে নাই। কালী-মোহনের জ্বর আসতো মাঝে মাঝে। দামী ওষুদ পড়ে আছে দেখে কবিগুরু কত যত্নে সে-গুলি নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে কালীমোহনকে খাইয়েছিলেন। একবারে সব গুলি শিশি নিয়ে যেতে পারেন নি বলে দু'তিনবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনায়াসে চাকর পাঠিয়ে তিনি শিশিগুলি নিতে পারতেন কিন্তু নিজে নিয়ে যাওয়ার আনন্দ তাঁকে হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ায় প্রবৃত্ত করেছিল। কবির এই সেবায় অনুরাগ আমাদের প্রত্যক্ষ।

১৩১৯ সালে কালীমোহন সম্বন্ধে কবির লিখিত একখানি পত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

কল্যাণীয়াসু

আজ বুধবার, আগামী শনিবারের জাহাজে আমরা আমেরিকা যাত্রা করবো স্থির করেছি, ডাক্তার মৈত্রও আমাদের সঙ্গে যাবেন—সেটা আমাদের পক্ষে খুব সুবিধা হবে।

কালীমোহন সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বেই বিস্তারিত করে লিখেছি, সে এখানে খুব সস্তা বন্দোবস্ত করতে পেরেছে, অবশ্য রোটেনষ্টাইন দু'বছর ক্রমাগতই তার ছবি আঁকবেন, এটা আমরা আশা করতে পারিনে। অতএব কোন-না-কোন সময়ে তাকে কিছু টানাটানিতে পড়তেই হবে। কিন্তু যদি সত্যই……তাকে প্রতিশ্রুত টাকাটা পাঠিয়ে দেয় তাহলে ওর ওতেই চলে যাবে। কালীমোহন পড়াশুনার যে রকম ব্যবস্থা করছে এবং ভাল লোকদের সঙ্গে যে রকম মেলামেশার উদ্যোগ করতে পেরেছে তাতে বেশ বুঝতে পারছি, কোন মতে এখানে দু'বছর কাটিয়ে যেতে পারলে ওর খুবই উপকার হবে—ও রীতিমত মানুষ হয়ে যেতে পারবে। ওর চেয়ে শিক্ষিত অনেক ছেলে এখানে আসে কিন্তু তারা এখানকার সমস্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতেই পারে না। কালীমোহনের মধ্যে ভাল জিনিষকে পাবার একটা অপরিসীম ক্ষুধা আছে। এজন্য ওর সমস্ত উদ্যম সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে আছে। তোমরা দেখতে পাবে, ও যখন ফিরবে তখন ……প্রভৃতির চেয়ে ঢের বেশি উন্নতি লাভ করে যেতে পারবে। তাই দেখতে পাচ্ছি, ওকে এখানে পাঠাবার সমস্ত চেষ্টা ও ব্যয় ষোল আনা সার্থক হবে—অন্য কোন ছেলে ওর কাছেও লাগতে পারে না।……প্রভৃতি ছেলের চিত্তের সেই অদম্য উদ্যম নেই এবং তাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কালীমোহনের মত বলিষ্ঠ ও জাগ্রত নয়। এইজন্য বলচি, কালীমোহনকে তোমরা যে পরিমাণ সাহায্য করচো, ও তাকে বহুতর পরিমাণে সফল করে তবে ফিরবে। ওর সম্বন্ধে কাউকে কিছুমাত্র নিরাশ হতে হবে না, কারণ ওর নিজের শুভ বুদ্ধিই ওর সকলের চেয়ে বড় সহায়—ও ভাল বলেই ওর ভাল হবে—সুবিধা পেয়েছে বলে নয়। আনুকূল্য এবং প্রাতিকূল্য সমস্তকেই ও আপনার সুহৃদ করে নিতে পারবে।

ইতি, ৩০শে আশ্বিন ১৩১৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী পরমানন্দ

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মানব জাতির কল্যাণে ও বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ভারতের ঐতিহ্য, সাধনা ও শিক্ষার বাণী বহন করিয়া, পাহাড়, পর্ব্বত ও মরুভূমি পার হইয়া দূরদেশে এমন কি উত্তর চীনে, জাপান, মালয় দ্বীপে, তিব্বতে, জাভা ও বলি দ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন। ভারত সৈন্যবলের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু প্রেম ও সমত্ববোধের দ্বারা মহাচীনের ন্যায় বিরাট দেশকে জয় করিয়াছিলেন। বহু সম্মান লাভ এবং প্রতিপত্তিও বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভারতের এমন দুর্দ্দিনেও ভারতে এমন কয়েকজন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জগৎ-সভায় ভারতকে উচ্চ আসন দান করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"শত শত বৎসর পর আজও ভারতের সন্তানগণ দূর-দূরান্তরে ভারতীয় ঋষিগণের বাণী বহন করিয়া ভারতের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। স্বামী পরমানন্দ ছিলেন ইহাদেরই একজন।"

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সুদূর আমেরিকা ভূখণ্ডে ভারতের মহান আদর্শ, নির্ম্মল জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছিলেন যে মহাপুরুষ সেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বামী পরমানন্দ আমেরিকায় ভারতের সাধনা ও শিক্ষা আজ ত্রিশ বৎসরের উপর প্রচার করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেবা ও সাধনার দ্বারাই তিনি মার্কিন ও ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আত্মত্যাগে ও চরিত্রবলে বিদেশে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর নাম সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এই সন্তানের পুণ্যস্মৃতি ভারতবাসীর নিকট চির উজ্জ্বল রাখাই উচিত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বামী পরমানন্দের পরলোকগমন উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"আমেরিকায় ভ্রমণ কালে একদিন স্বামী পরমানন্দের আতিথ্য লাভ করেছি এবং দেখেছি, সেখানে জনসমাজে তাঁর কী সম্মান! আমাদের দেশের পক্ষে তাঁর অকাল মৃত্যু শোচনীয়। পাশ্চাত্য মহাদেশে তিনি ভারতবর্ষের নামকে জয়যুক্ত করেছেন; এই তাঁর কীর্ত্তির জন্য তাঁর স্বদেশের সকৃতজ্ঞ স্মৃতিকে তিনি সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেলেন, এ কথা ভোলবার নয়।"

আমেরিকায় স্বামী পরমানন্দের জনপ্রিয়তার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাই। স্বামীজীর গদ্যে ও পদ্যে প্রণীত ২৬ খানি পুস্তক বিক্রয় করিয়া বার্ষিক প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। বস্তুতান্ত্রিকতা নিপীড়িত প্রায় তিন লক্ষ মার্কিন নরনারী প্রত্যহ তাঁহার উপদেশামৃত পাঠে শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত "Rythem of life," "The Vigil", "Souls Secret Door", "Daily thoughts and prayer", "The Path of Devotion" গ্রন্থগুলি আমেরিকা ও ইউরোপের বিদ্বান সমাজে যেমন সমাদৃত তেমনি ভারতের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব আমেরিকার সমাজে বিস্তার করিয়া থাকে।

স্বামী পরমানন্দ বরিশাল জেলায় বনওয়ারীপাড়া নামক একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্তে ভগবৎ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি নাবালক অবস্থায় ১৯০০ সালের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তখন তাঁহার অল্প বয়স থাকায় তাঁহাকে বেলুড় মঠে রাখিতে নানা আপত্তি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বালকের কাতর নিবেদন শুনিয়া এবং তাঁহার সংসার-বৈরাগ্যের আগ্রহ দেখিয়া মঠে থাকিবার আদেশ প্রদান

করেন। তাঁহার সুন্দর আকৃতি, নম্র ব্যবহার, সরল চিত্ত দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহার নাম 'বসন্ত' রাখিয়াছিলেন। তাহাকে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে নাবালক বলিয়া দাবী করাতে তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রত্যর্পন করা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রাণে সংসার-বৈরাগ্যের প্রেরণা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি এক বৎসর মধ্যে সাবালক হইবা মাত্রই গৃহ ত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হন এবং মাদ্রাজে গমন করেন।

১৯০২ সালে জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পরমানন্দ নাম প্রদান করেন। তিনি মাদ্রাজের মঠে চার বৎসর থাকেন। ১৯০৬ সনে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে কলোম্বতে পদার্পণ করিলে স্বামী পরমানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত কলোম্ব যান এবং স্বামী অভেদানন্দের নিকট হইতে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ দেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা শুনিয়া আমেরিকায় যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তিনি স্বামী অভেদানন্দের সহিত সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ সালে ১০ই নবেম্বর স্বামী অভেদানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার সঙ্গে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমেরিকায় গমন করেন। এই তরুণ যুবক যখন বোম্বাই হইতে আমেরিকার পথে লণ্ডন যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার প্রাণে যেমন আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল, তেমনই রামকৃষ্ণ দেবের ও ভারতের বেদান্তের ঋষিদের বাণী বিশ্বে বিতরণ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও চিত্তে উদয় হয়।

লণ্ডনে দুই সপ্তাহ বক্তৃতাদি দিবার পর ডিসেম্বর মাসের শেষে তিনি স্বামী অভেদানন্দের সহিত নিউইয়র্ক সহরে পদার্পণ করেন। স্বামী পরমানন্দ আমেরিকায় বোষ্টন নগরে বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করিয়া ১৯০৭ সাল হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত রামকৃষ্ণ দেবের বাণী ও বেদান্তের সারমর্ম্ম প্রচার করিয়া আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন এবং পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ক্যালিফর্ণিয়ায় লা-ক্রিসেণ্ট নামে একটী সুদৃশ্য স্থানে "আনন্দ আশ্রম" নামে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র এই আশ্রমেই ছিল।

আমেরিকার এই আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার বালবিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী গায়ত্রী দেবী এবং তাহার ভগ্নী তাঁহারই প্রেরণায় জীবণের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং আহার বিহারের সংযমে স্নিগ্ধ পবিত্র আদর্শ ভোগবিলাসী আমেরিকার মহিলাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

যে সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল স্বামী পরমানন্দ আমেরিকায় ভারতের সাধনার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি পাঁচবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে তাঁহার আরাধ্য দেব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের সময় আগমন করেন। তার পরে ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে এবং ১৯৩৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। সেই সময়ে কলিকাতাবাসীরা তাঁহার দর্শন পাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। সেই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে আহূত বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের একদিনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। এই সময়ই স্বামী পরমানন্দের সহিত কয়েকদিন যাবৎ ঘনিষ্টতা স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার সৌজন্য স্নেহ পাইবার অবসর পাইয়া সৌভাগ্যান্বিত হইয়াছিলাম। তাহারই আত্মীয়ার সহিত পরিচয় থাকায় তিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, সে সৌভাগ্য আমাদের এখনও হয় নাই।

ইংরাজী ভাষায় স্বামী পরমানন্দের যেমন দখল ছিল, তেমনই বক্তৃতা দিবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল অপূর্ব্ব। কেবল আমেরিকায় নহে সমগ্র ইউরোপেও তিনি অনেক

বড় বড় সহরে বক্তৃতা দিয়া বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। সকল সময়ই তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক নানা বিদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আনন্দ আশ্রম হইতে তিনি "মেসেজ অব দি ইষ্ট" নামক একটি মাসিক পত্র নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিতেছিলেন। বাস্তবিক এই পত্রিকা প্রাচ্যের বাণীই পশ্চাত্য দেশে প্রচার করিতেছে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সকলেই তাঁহার সারল্যে ও অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার মতন ত্যাগী, জ্ঞানী, গুণী, ও কর্ম্মী সন্ন্যাসী প্রবরের তিরোধানে কেবল যে রামকৃষ্ণ মিশনেরই ক্ষতি হইল তাহা নহে, ভারতও তাঁহার অভাবে দীন হইল।

দিনান্তিকা

শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্র-স্মৃতি

শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যে গৃহখানি নির্ম্মিত হইয়াছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার উদ্বোধন করেন এবং তাহার নামকরণ করেন 'দিনান্তিকা'।

দিনান্তিকা

মৃত্যুদিন, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪২

মাতৃত্বে শিশুমঙ্গল বিজ্ঞান ও জাতীয়তা সংগঠনে তৎপ্রয়োগ

ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, আর, সি, ও, জি (লণ্ডন)

"মা" বা "মাতৃ" শব্দের অর্থ

পরমাত্মার আদি অভিব্যক্তি পরমেশ্বরী মা; মায়ের মূর্ত্তিতেই তিনি রূপময়ী হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি- স্থিতি লয় লীলা সম্পাদন করেন। এ বিশ্বের প্রতি অণু মাতৃত্বের সঞ্জীবনী-সুধায় জাত, পুষ্ট, বিধৃত। মাতৃত্বের যে অভিব্যক্তি আমরা জীবের মাঝে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই, যে প্রীতির অপরিমেয় সমুদ্র আমরা গৃহে মায়ের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করি, হৃদয়ের উদ্‌ঘাটনে রক্তকে অমৃতস্রাবে পরিণত করে সন্তানের দেহে জীবনসঞ্চরণ করতে—স্বভাবসিদ্ধ স্বার্থহীন স্বর্গীয় স্নেহের ধারায় সন্তানকে পালন ক'রতে মাকে নিরতা দেখি, তাতেই তাকে মূর্ত্ত-ভগবতী ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলেনা। কিন্তু এটুকু মাতৃত্বের বাহ্য উদ্বেলন মাত্র। মাতৃত্বের গূঢ় পরিচয়—মাতৃত্বের বিস্ময়কর মহিমা, তাঁর গর্ভধারণে—গর্ভগুহায় শিশু-নারায়ণকে শারীরোপাদান দিয়ে, জীবন দিয়ে গঠিত ক'রে পুষ্ট ক'রে তোলায়। আপনার শরীরের রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ুর বিশুদ্ধ উপাদানগুলি ভ্রূণের অঙ্গে অকাতরে ঢেলে্ দিয়ে তাকে মূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ময় প্রাণময় মনোময় করা—মাতৃত্বের সে গূঢ় পরিচয় মানবী মায়েরা যদি উপলব্ধি ক'রতেন—যদি আপনার এই সন্তান-গঠনটি আপনি প্রত্যক্ষ করতেন তবে তাঁরা নিজেরাই না বলে থাকতে পারতেন না "শোন সন্তানবৃন্দ—সাক্ষাৎ ভগবতী আমরাই। আমাদের প্রত্যেকের এই প্রাণবন্ত অস্তিত্বকে নিয়ে যদি তার আদি অন্বেষণ করতে অগ্রসর হই, তবে, গিয়ে উপনীত হই ওই মায়ে—ঐ মাতৃত্বরূপ মহাম্বুদের স্নেহঅঙ্কে। সারাবিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি তোলবার মত প্রত্যক্ষ দেবতা যদি কেহ থাকে তবে পরমাত্মার ঐ নারীরূপে আবির্ভূত মাতৃমূর্ত্তি।

সেই মা তাঁর মাতৃত্বের পথে অগ্রসর হ'তে যে বিপদ-সাগরের মাঝে পাড়ি দেয়, যেমন ক'রে তাঁর আপন জীবনকুসুমকে দলিত মৃত্যুমথিত করে সন্তানফল প্রসব করে, তা স্মরণে দেবতারও শির নমিত হয়!

মা বা মাতৃশব্দের অর্থ সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—যিনি এই চরাচর বিশ্ব ও আমাকে প্রসব করেন, পালন করেন ও সংহরণ করেন—সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মহীয়সী চিন্ময়ী মহাদেবীর নাম—"মা"। ইনি 'বহুধা' হইয়া—চূর্ণ হইয়া সর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তিতে নারীরূপে বিরাজমানা। তাই, প্রত্যেক স্ত্রী মূর্ত্তিই—"মা"।

"বিদ্যা সমস্তা স্তব দেবী ভেদাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু॥"

—চণ্ডী।

—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

—বেদান্ত সূত্র।

মাতৃত্ব শব্দের অর্থ—মায়ের মহিমা

এই মাতৃ-মহিমা বর্ণণা করা মা ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। "মা" যে কি, তা' মাত্র "মা"ই জানেন। আমরা তাঁর সন্তান—স্নেহের দুলাল—আনন্দময়ীর 'কুমার'। "মা" প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ স্নেহদেবী। প্রতি সন্তানকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি প্রদান করিবার জন্য প্রতি 'কণাকে'—প্রতি 'অণুকে ব্রহ্মৈশ্বর্য্য ভোগ করাইবার জন্য সদা আত্মহারা! হায়রে দুর্ভাগ্য সন্তান! এবন মায়ের কোলে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়াও "মা" দেখিলি না—মাতৃমুখী হইলি না। ধিক তোর জীবনে, শত ধিক তোর বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায়!

আমাদের আলোচ্য বিষয়—"মাতৃত্বে শিশু-মঙ্গলের বিজ্ঞান অর্থাৎ নারী-জীবন।"

নারী শব্দের" অর্থ

নর+ঈ ইতি নারী।

"ঈ"কার শক্তিবাচক। নরসৃষ্টিকারিণী শক্তি যাহাতে বিদ্যমান তিনিই নারী। নৃ শব্দ হইতে নর নিষ্পন্ন হইয়াছে—যিনি তালে তালে ছন্দে ছন্দে স্বীয় আত্মার উন্নতিলাভাভিমুখে গতিশীল তিনি নর। সুতরাং নৃত্যতি ইতি নরঃ'। যার বুকে যার স্রষ্টতার জন্য এই নর্ত্তন-তরঙ্গ জন্মায়, অবস্থান করে ও লয় পায়, তিনিই 'নারী' —অন্নপূর্ণা—"নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং"— সন্তান জননী—অন্নপূর্ণা—নারী।

নারীর মূর্ত্তি

দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে নারী বিরাজমানা—জননী ও রমণী। যে সন্তান নারীকে স্নেহময়ী জননী জ্ঞানে পূজা করেন তিনি অমরত্ব লাভ করেন—তিনি মৃত্যুর কবল হইতে চিরতরে মুক্ত হন—মৃত্যুঞ্জয় হন; আর যে সন্তান নারীকে ভোগ্য রমণীরূপে দর্শন করেন, সে সন্তানের মৃত্যু অনিবার্য্য।

র ম ণ = ম র ণ

যাক সে অন্য কথা।

মাতৃত্বের ত্রিভঙ্গিমা

ঋষি বলিলেন—মা আমার "ত্রিভঙ্গ-স্থানসংস্থানা"

মাতৃত্বের ত্রিভঙ্গিমার কথা ঋষিগণ কর্ত্তৃক নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—সৃষ্টি স্থিতি লয়, সত্ত্ব রজঃ-তমঃ, বাক্-প্রাণ-মনঃ, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বাক্যদ্বারা সাংখ্য বেদান্ত, বেদ উপনিষদে, তন্ত্রে, এই তত্ত্বের নানা গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। মূলতঃ তত্ত্ব কিন্তু একই। কেবল ইহার অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। আমরা এখন এই সকল গভীর তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ধাত্রীবিদ্যাবিদের চক্ষুতে মায়ের এই ত্রিভঙ্গিমা কিরূপ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, মাত্র তাহাই আলোচিত হইবে।

১।	প্রসব	=	সৃষ্টি	—	রজঃ
২।	পালন	=	স্থিতি	—	সত্ত্ব
৩।	ধারণ (রমণ)	=	লয় (সংহার)	=	তমঃ

স্থির চিত্তে নারীর দেহগঠন পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনই নারী-জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। তাই, মাতৃত্বে এই ত্রিভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয়। যথা—

গর্ভধারিণী বা গর্ভিণী
সন্তানপ্রসবিনী বা প্রসূতি
সন্তানপালিনী বা ধাত্রী

সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান একাধারে নারীহৃদয়ে—বুক-ভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও অপার্থিব স্বার্থত্যাগ পূর্ণ মাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন। সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ, সন্তানের দুঃখেই মায়ের দুঃখ, মাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনাতেই মা নিজের "নিজত্ব"টুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। ছেলেই ধ্যান, ছেলেই জ্ঞান, ছেলেই মায়ের সর্ব্বস্ব! ছেলের কল্যাণ কামনায় মা অম্লান বদনে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনেও কাতর হ'ন না। হায়, কালবশে সেই ছেলে এমন মাকেও অনাদর করে! ইহ জগতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? চিত্তের মলিনতার জন্য আমরা ভুলিয়া যাই যে,—মাতৃঋণ অপরিশোধনীয়।

যাক্ সে অন্য কথা।

আমরা বলিতেছিলাম যে, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনই নারী জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। কিরূপে এই সকল ধর্ম্ম আচরিত হইলে, প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই মঙ্গল হয়, তাহাই এখন যথাক্রমে আলোচনা করিব।

প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে গর্ভজাত সন্তানের শরীর সুস্থ ও সবল হয় না। শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা। অতএব, দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, জননীগণের দেহ যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে তদ্‌বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

'শিশু' অর্থে সন্তান—সন্তান অর্থে আত্মবিস্তার। আপনি বহু হইয়া বিস্তৃত হওয়া—আপনাকে আপনি বহু অংশে বিভক্ত করা। আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা 'আমার' বিস্তার হইলেও পরমদৃষ্টিতে ইহা—যিনি সকলের আত্মা—যিনি পরমেশ্বরী ও পরমাত্মা—তাঁরই বিস্তার। 'মাতা' ও 'পিতা' এই দুই অংশ লইয়া একটি সন্তান গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার কারণ, মূলতঃ যিনি পরমাত্মা তিনিই পরমেশ্বরী—

তাঁর এই দুই রূপ-প্রকাশের অংশ একীভূত করিয়া একটি সন্তান গঠিত হয়।

আমাদের দেশ ভগবানের দেশ। এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক দিয়াই প্রচেষ্টা করুন, যত রকমেই দেশহিত কল্পনা করুন—কিন্তু, এ দেশের মজ্জাগত যে ভাব—যে কৃষ্টি —তাহা ভগবানমূলক—ভগবানের 'নিজের' সন্তান—নিজের খণ্ড খণ্ড বিস্তার; আমরা এ শিক্ষা সমুজ্জল করিয়া ধরিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি, ভগবৎ-অভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দিককে যদি অবহেলা করি—সমাজ-পরিচালনে ভগবদ্বংশজাত বলিয়া যদি নিজেদের আত্মিক লক্ষ্য না স্থাপন করি—এবং সেই জন্য মানববংশ ধারায় যদি—ঋষি বা 'অতিমানব' প্রসবের যোগ্যা মা দেখিতে না পাই—তবে দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইল, ইহা আমরা দেখিতে পাইব না। এই চক্ষু—ঋষির চক্ষু—'অতিমানব' গঠন—ভগবান তুল্য মানবগঠন—'প্রাতিভ' পুরুষের জন্মদান—ইহাই মাতৃত্বের লক্ষ্য। যেমন বিশ্বজননীর লক্ষ্য সন্তানকে ভুক্তি মুক্তি দান, মানবী মায়ের লক্ষ্যও ঠিক সেইরূপ দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে—যদি প্রকৃত এ দেশের কৃষ্টি ও জগতের চিরকল্যাণদাতা মানব-বংশধারা রক্ষা করিতে হয়।

এইরূপ প্রসূতি তৈয়ারী করা যায়—যদি মায়েদের চিত্তে এ আশা সুদৃঢ় বিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় যে, তাঁহাদের ঋতুকালীন আচরণ হইতে, গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পর সন্তানপালন এই তিনটী অবস্থায় তাঁহারা সতর্ক লক্ষ্যে সন্তানের দিকে চাহিয়া থাকিতে শিক্ষা করেন। 'দীপ হইতে দীপান্তর' প্রকাশবৎ ঋতুকাল প্রকৃত সন্তান রচনা, সন্তান প্রসব ও তাহাকে পালন করিয়া প্রকৃত মানব রূপে পরিণত করিবার উদ্যোগ-পর্ব্ব। নারীকে এই শিক্ষায় যদি দীক্ষিত করা যায়, তবে নারী সহজেই চিরস্মরণীয় সন্তানরত্নের 'মা' হওয়ার আশা করিতে পারেন এবং এইরূপেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে।

দেশকল্যাণকর কার্য্যের মধ্যে এটী যে অন্যতম এক প্রধান ব্যবস্থা সে কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

আজকাল নানা কারণে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্যহানির যে সকল মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। তখন যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়, এবং ঋতুকাল হইতে কিরূপে সন্তানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সময়সংক্ষেপ বশতঃ সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বলিবার সুযোগ হইবে না। আপনাদের ইচ্ছা হইলে এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা যাইতে পারে।

'শিশু-পালন' কিরূপে করিতে হয় তাহা এদেশের অনেকেরই অজ্ঞাত। বড়ই দুঃখের বিষয়, 'মা' হওয়ার দায়িত্বজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই অধুনা আমাদের বালিকাগণকে জননীত্বে উপনীত হইতে দেখা যায়। 'শিশু-পালন' শব্দের প্রকৃত অর্থ—প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না। শিশুকে কেবলমাত্র 'খাওয়ান-পরান' অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট করাই শিশুপালন বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তান তৈয়ারী করাই শিশু-পালনের প্রকৃত মর্ম্ম। আর সে গুরু ভার—সে গুরুদায়িত্ব, মায়ের উপরই পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে ও সে কর্ত্তব্য পালনের যোগ্য সময় ঋতুকাল হইতেই সূচিত হয়।

বাল্যবিবাহ দূষণীয় নয়, বরং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাল্যে জননীত্ব গ্রহণ পরিবর্জ্জনীয়। গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, 'মা' হওয়া সহজ নহে।

(ক্রমশঃ)

লালমণিরহাট মহিলা-সমিতি পরিদর্শন ও পাহাড়পুর দর্শন

শ্রীমতী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

একদিন সরোজনলিনী এসোসিয়েশনের কলিকাতার আফিস ঘরে বসে কথা হচ্ছিল—সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নিয়োগী, বড়মা ও মিস্ সোমের মধ্যে। আমরাও ছিলাম। ডাঃ নিয়োগী বললেন—দেখুন, মহিলা সমিতিগুলি কিরূপ কাজ করে—সে খবর পাই আমরা পাবলিসিটি অফিসারদের কাছ থেকে; চলুন আমরা নিজেরা একবার কোনও সমিতির কাজকর্ম দেখে আসি। বড়মা ও মিস্ সোম মত দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানী তাদের লাইনের বড় বড় অনেকগুলি ষ্টেশনে মহিলা সমিতি স্থাপন করেছেন। অবশেষে স্থির হল, এই রেলের লালমণিরহাট ষ্টেশনের মহিলা সমিতি পরিদর্শন করা হবে। ই, বি, রেলের ওয়েলফেয়ার অফিসারকে রেলের পাশের জন্ম লেখা হল। কথা রইল ফিরবার পথে গোপালগঞ্জ ষ্টেশনে ঘণ্টা কয়েকের জন্ম ব্রেক জর্নি করবার অনুমতি লওয়া হবে; তাহা হলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাহাড়পুরের প্রাচীন স্তূপ এবং ভূগর্ভোত্থিত ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি দেখাও হবে। ওয়েলফেয়ার অফিসার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বড়মার যাওয়া হল না। রওনা হবার দুদিন পূর্ব্বে তিনি একটা পা মচ্‌কে ফেললেন। পায়ের নিচেকার গাঁঠে খুব বেদনা হল। মিস্ সোম টেলিফোন করলেন—আর্ণিকা লাগান ও হোমিওপ্যাথি আর্ণিকা খান। নিয়োগীমশাই চুণে হলুদ গরম করে দিতে উপদেশ দিলেন। পায়ের বেদনা কিন্তু আর্ণিকা, চুনে হলুদ প্রভৃতি কিছুই বিশেষ মানল না এবং যাত্রার দিন পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর থেকেই গেল। বড়মার যাওয়া হল না। শেষ পর্য্যন্ত রওনা হলাম—নিয়োগী মশাই, মিস্ সোম, মিস্ মল্লিক আর আমি।

২৪শে এপ্রিল ৯-৪৫ মিনিটে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে আমরা বাহির হলাম। একটা গাড়ীতে আমরা তিনজন মহিলা আর পাশের গাড়ীতে রইলেন ডাক্তার নিয়োগী আর মিষ্টার ব্যানার্জ্জি। ই, বি, রেলওয়ের 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' মিষ্টার সান্ন্যাল আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন না বলে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠিয়ে ছিলেন মিষ্টার ব্যানার্জ্জিকে। ডাক্তার নিয়োগী ছিলেন আমাদের সেথো, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি হলেন এসিসটেণ্ট সেথো। ট্রেণের জানালা খুলে শোওয়া আমার অভ্যাস। গাড়ীতে একবার মিস্ সোমের সব চুরি হয়ে যাওয়ার পর থেকে জানালা খুলে শোয়াতে মিস্ সোমের কিন্তু ততটা মত ছিল না। চলন্ত গাড়ীতে কেমন করে চোর ওঠে ইত্যাদি গল্প বলে মিষ্টার ব্যানার্জ্জি ইতিপূর্ব্বে আমাদের সকলকে একটু ভীত করে দিয়েছিলেন। ফলে সব জানালাগুলোর খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে বেশ একটি খাঁচা তৈয়ার করেই শয়ন করতে হল।

৬টা নাগাদ আমরা পার্ব্বতীপুরে এসে গাড়ী বদল করলেম। প্রাতরাশের ব্যবস্থা রেল কোম্পানিই করে দিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ী ছাড়ল, আমরা লালমণির হাট যখন গিয়ে পড়লুম তখন বেলা ১০৷৷টা ১১টা হ'বে। সেখানকার মহিলাসমিতির সাধারণ সম্পাদক মিষ্টার গাঙ্গুলি, সম্পাদিকা মিসেস মুখার্জ্জি ও শিক্ষয়িত্রী শ্বেতাঙ্গিনী দেবী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। শিক্ষয়িত্রীটি আমাদেরই পুরাতন ছাত্রী। আমাদের প্রচারক সুধীরবাবু একদিন আগে এসে সভার সব ব্যবস্থা করে রাখেন, তিনিও ছিলেন ষ্টেশনে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে। এখানে ট্যাক্সি বা মোটরের রেওয়াজ নেই। বেশীর ভাগ ট্রলির সাহায্যেই যাতায়াত করা হয়। আমাদের জন্ম তিনখানি ট্রলি ঠিক ছিল। আমরা তাতে চড়ে চল্লুম মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী। এই আমাদের প্রথম ট্রলি রাইড, বেশ মজা লাগল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী ষ্টেশন হ'তে বেশ খানিকটা দূর। যদিও রোদ ছিল বেশ, তবু খোলা জায়গা ও বাতাস থাকায় আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নি।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাংলোটি ভারী সুন্দর। সহরের সব সুবিধাই ছিল এখানে। বিজলী বাতি, পাখা, মায় ফ্রিজিডেয়ার শুদ্ধ। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে মিষ্টার ও মিসেস ব্যানার্জ্জি সেদিন তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন দুপুরে খাবার জন্য। খাবারের আয়োজন হয়েছিল বিরাট। একটা ছোট খাট বিয়ে বাড়ীর ব্যাপার বল্লেও চলে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির মত এমন সুগৃহিণী বড় একটা দেখা যায় না। সাতটি সন্তানের মা। কোলের ছেলেটি তিন মাসের। মেজ মেয়েটি অসুস্থা, তবু এত আয়োজন। সংসারের অত কাজকর্ম্মের মধ্যেও আদর আপ্যায়নের এতটুকুও হয়নি ত্রুটি।

স্নানাহার সেরে অল্প একটু বিশ্রাম করে আমরা ফের ট্রলি চড়ে গেলাম মহিলা সমিতির প্রদর্শনী দেখতে। প্রদর্শনীতে মহিলা সমিতির অনেক সভ্যাই উপস্থিত ছিলেন। সমিতির নতুন শিক্ষয়িত্রীটি অল্পদিন হ'ল কাজে যোগ দিয়েছেন, তবু প্রদর্শনীর নানা জিনিষপত্র দেখে কাজ যে বেশ ভালভাবে সুরু হয়েছে তা' বোঝা গেল। একটি মেয়েকে ছুঁচের কারুকার্য্য শিক্ষার জন্য কেন্দ্র সমিতি থেকে একটি মেডেল দেওয়া স্থির হল।

সেখান থেকে রেলওয়ে ইনস্‌টিটিউটে যাওয়া গেল। সেখানে সমিতির বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বহু মহিলা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের পুরুষ অভিভাবকেরা ও উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। সভা আরম্ভ হলে এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা গান গেয়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেছিল। অনেকগুলি বক্তৃতা হল। স্থানীয় মহিলাদের মধ্য হতে শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা গোস্বামী ও সভানেত্রী মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বক্তৃতা দেন ও কেন্দ্র সমিতির তরফ হ'তে মিস্ সোম ও ডাক্তার নিয়োগী বক্তৃতা দিলেন। কচি ছেলের কান্না, চ্যাঁ ভ্যাঁ, সব ছাপিয়ে নিয়োগী মশাই তাঁর বক্তব্য সবাইকে খুব ভালো করে শোনাতে পেরেছিলেন, কোন "লাউড স্পীকারের" সাহায্য না নিয়ে। সভার কার্য্য সমাপ্ত হ'বার পর সমিতির কর্ম্মীবৃন্দদের নিয়ে একখানি ছবি তোলা হয়।

দুরেরপু ভূরি ভোজনের পর রাতের খাওয়াটা বাদ দেওয়াই ছিল সকলের মত, কিন্তু মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সে কথা কানেও তুল্লেন না। ফের লুচি মাংসের শ্রাদ্ধ করে রাত আটটায় চড়লুম ট্রেণে। স্থানীয় অনেক ভদ্রমহিলা আমাদের ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলেন। রাত ১১টায় পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করবার কথা। আমাদের ধারণা ছিল ষ্টেশনে নেমেই গাড়ী পাব এবং সেই ট্রেণে ঘুমোবার ব্যবস্থা করব, তাই লালমনিরহাট থেকে পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত আমরা গল্প করেই দিলাম কাটিয়ে।

গাড়ী থামতেই ত' পড়লাম নেমে। পাশের গাড়ীতে গিয়ে দেখি আমাদের দুই পুরুষ অভিভাবক ঘুমুচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে। চ্যাঁচামেচি করে ত' তাঁদের দিলুম তুলে। ব্যানার্জ্জি সাহেব বল্লেন—"আপনারা নাম্‌লেন কেন? এখন অন্য প্ল্যাটফর্মে আসতে ঢের দেরি। আগে দার্জ্জিলিঙ মেল চলে যাবে তবে আমাদের গাড়ী প্লাটফর্মে আসতে পারবে।" শুনে ত' চক্ষুস্থির। গাড়ীতে ফের চড়ে পড়ব কিনা ভাবছি এমন সময় চেয়ে দেখি রেল কোম্পানির লোকেরা গাড়ীর দরজা জানালা এঁটে দিয়ে গাড়ীখানা সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছেন। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি ত গেলেন দেখতে যদি আমাদের কোন সুব্যবস্থা করতে পারেন, আমরা কিন্তু কোন কুল কিনারাই দেখতে পেলেম না। একটা প্রকাণ্ড জলের ট্যাঙ্ক ওল্টান অবস্থায় পড়েছিল সাম্‌নে। চড়ে ত' বসলুম গিয়ে তার উপর। মেজাজ গেল বিগড়ে। একটা কিছু ত করতে হ'বে? কিছু না পেয়ে ঝগড়া সুরু করে দেওয়া গেল নিয়োগী মশাইয়ের সঙ্গে। আমরা যখন সারা গাড়ী জেগে এলুম তখন উনি কেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিলেন, এই হ'ল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। এর আর তিনি কি প্রতিবাদ করবেন? শেষে লেমনেড খাইয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা করলেন।

"ইতিমধ্যে ব্যানার্জ্জি সাহেব এসে খবর দিলেন যে গাড়ী "ইয়ার্ডে" আছে। তিনি স্বহস্তে তাতে আলো পাখা লাগিয়ে এসেছেন, অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারি। হাঁটুতে হাঁটুতে সেখানে গিয়ে ত' পৌছান গেল। গাড়ীখানি দেখে কিন্তু আমাদের খুবই পছন্দ হ'ল। একেবারে নূতন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। তখুনি নিয়োগী মশাই ও ব্যানার্জ্জি সাহেবকে বিনা সর্ত্তে মার্জ্জনা করে দেওয়া হ'ল।

ট্রেণ যে কখন ছাড়ল, কি হ'ল কিছুই আমরা জান্‌তে পারিনি, ঘুম ভাঙ্গল একেবারে জামালগঞ্জে গিয়ে।

জামালগঞ্জ বিশেষ বড় ষ্টেশন নয়। যেখানে চা পাবার কোন আশা নেই, সে কথা ব্যানার্জ্জি সাহেব আমাদের আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন। আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার ও চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম ছিল তাই বাবুদের সাতটার মধ্যে "ছোটা হজ্‌রি "আমারাই দেব, এ প্রতি

লালমণিরহাট মহিলা সমিতির সভ্যাগণ সহ পরিদর্শকগণ

১। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মিসেস্ ইউ, এন্, ব্যানার্জ্জি ৩। শ্রীমতী দীপ্তি দেবী ৫। শ্রীমতী হেমনলিনী মল্লি[illegible]
২। শ্রীমতী নীরজবাসিনী সোম ৪। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী

শ্রুতি তাঁদের দিয়েছিলুম। চায়ের জল গরম করবার জন্যে একটা ষ্টোভ নেওয়া হয়েছিল সঙ্গে। ইচ্ছা ছিল প্ল্যাটফর্মে ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল করব তৈয়ের। কি জানি কখন নজরে পড়েছিল নিয়োগী মশায়ের। তিনি সারাপথ ভবিষ্যৎ বাণী করতে করতে এলেন যে আমাদের ষ্টোভ মোটেই জলবে না। জামালগঞ্জের প্লাটফর্ম্মে যখন ষ্টোভ ধরাবার চেষ্টা চলছিল তখনই বোঝা গেল আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের মুখের কথাই ফলে গেল! ষ্টোভ মোটে জলল না। নিয়োগী মশায়ের কাছে শেষে হার মান্‌তে হবে? এ আমরা কিছুতেই সইতে পারলুম না। সঙ্গের চাকরটাকে পাঠালেম ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ী। ষ্টেশন থেকে এক কেৎলী গরম জল আসতে বেশ ভাল করেই চা প্রস্তুত ক'রে ভদ্রলোক[illegible] চা পানের জন্য নেমন্তন্ন করে পাঠালাম। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু কেমন করে টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে ষ্টোভ ধরে নি। তিনি চায়ের প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু ষ্টোভ যে জলে নি এই নিয়ে "খোঁটা" দিতে একটু কসুর করলেন না।

জামালগঞ্জ ষ্টেশন থেকে পাহাড়পুর মাইল তিনেক পথ। মেঠো রাস্তা, মোটর চলে না, গরুর গাড়ী বা পাল্কিই হল এখানকার একমাত্র যান বাহন। গিয়ে দেখি গরুর জায়গায় রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ। মহিষ গুলোকে গাড়ীতে জোতা নিয়ে হল এক পর্ব্ব। কিছুতেই

তারা আর বাগ মানে না। আমাদের গাড়ীর মোষ দুটো ছিল ওরই মধ্যে ঠাণ্ডা, কিন্তু বাকিগুলকে নিয়ে হ'ল মহা মুস্কিল। শেষে কিন্তু সব দোষ এসে পড়ল মহিলাদের উপর। মিস্ সোমের পরণে ছিল একখানা লাল রঙের শাড়ী। মিস্ মল্লিকের ও আমার শাড়ীর পাড় ছিল লাল—অতএব দাঁড়াল এই যে লাল রং দেখে ভয় পাচ্ছে মোষরা। আসলে মহিষগুলো ছিল নতুন, গাড়ী টানা ছিল না তাদের বেশী অভ্যাস। গাড়োয়ানগুলো রেহাই গেল—আমাদের লাল কাপড়ের দোহাই দিয়ে। যাক্ কোন রকমে মহিষের গাড়ীগুলোর যাত্রা ত সুরু হ'ল। এক রাশ খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে ত বসা গেল। মাথা গিয়ে ঠেকল ছাউনির উপর। তারপর সে কি ঝাঁকুনি! মিস্ সোমের শরীর ত বিশেষ ভাল ছিল না,তাঁর প্রায় ভির্মি লাগবার জোগাড় হল। সঙ্গে একটু ওডিকোলন্ ছিল তাই দিয়ে কম্বলের উপর মাথা রেখে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে কোন রকমে তাঁকে একটু আরাম দেওয়া গেল। ঘণ্টা দেড়েকের পর গন্তব্য স্থানে এসে পৌছান গেল। আশে পাশের পথের দৃশ্য কিন্তু বড় করুণ! ধূ—ধূ—করছে মাঠ, একেবারে ধূলোয় ভরা। অসময় বৃষ্টি হয়ে এখন বৃষ্টির অভাবে চারিদিক করছে খাঁ খাঁ। আম গাছগুলিতে আমের চিহ্ন নেই। কাঁঠাল গাছগুলো কিন্তু নুয়ে পড়বার জোগাড় হয়েছিল ফলের ভারে। মাঝে মাঝে ছিল কয়েক খণ্ড চাষ করা জমি আর ক্ষেত। চাষারা মাথায় একরকম খড়ের টুপি পরে মাঠে কাজ করছিল, দেখে তাদের মনে হচ্ছিল যেন মালয় উপদ্বিপের লোক। পাহাড়পুরের পথে লোকের বসতিও বেশী দেখা গেল না। কোন জায়গায় কতকগুলি মাটির ঘর,কয়েকটি কলার বাগান, এই রকম। অদূরের বাঁশ ঝাড়গুলো কিন্তু দেখাচ্ছিল বেশ। এক একটা পুকুরে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল যেন পুকুর ভর্ত্তি কালো রাজহাঁস। কি অবলিলাক্রমে, তারা খেলে বেড়াচ্ছিল জলের মধ্যে, কি সহজ গতি, কি সুন্দর ভঙ্গী।

ভস্মমাখা সন্ন্যাসীদের মত ধূলো মেখে ত নামলেম গাড়ী থেকে। সামনেই ছিল একটা টিউব ওয়েলের পাম্প। তারই জলে হাত মুখ ধুয়ে নেওয়া গেল। যিনি পাহাড়পুরের এক্সকাভেসনের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি আমাদের বেশ যত্ন করে সব নিয়ে গিয়ে দেখলেন। ১০।১১ বছর হল পাহাড়পুর গ্রামে একটি বিরাট স্তূপ আবিস্কৃত হয়েছে। স্তূপটিকে দূর থেকে একটি ছোট খাট পাহাড়ের মত দেখায় তাই বোধ হয় গ্রামটির নাম হয়েছে পাহাড়পুর। পাহাড়পুরের এই ধ্বংসাবশেষ খনন করে একটি ধর্ম্মায়তন হয়েছে উদ্ধার। এই স্তূপের ভিতর থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বার হয়েছে। আবিস্কৃত প্রমাণ সমূহ হতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দি হ'তে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বরেন্দ্র ভূমি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। অতীতে এই স্থানের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গিয়েছিল তার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই নদীর ঘাট ও তার সংলগ্ন মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া যায় দেখ্‌তে। এই নদীরই পশ্চিম তীরে পাহাড়পুর গ্রামটি। স্তূপের চারিদিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসোপযোগী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ মাটির নীচ থেকে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। প্রবেশ পথ একটি। এর ঠিক সাম্‌নে, গড়ের মধ্যভাগে প্রকাণ্ড বড় সোপানের ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। এই সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে ওঠা যায়। এই তলে একটি "প্রদক্ষিণ পথ" আছে। পথের চারিধারে নক্সা করা টালিতে মানুষ ও নানারকম জীব জন্তুর ছবি চিত্রিত রয়েছে। স্তম্ভের গায়ে যে শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে তা' থেকে জানা যায় যে রাজা মহেন্দ্র পালের সময় এই মন্দিরের কিয়দংশের সংস্কার হয়েছিল। আরও জানা যায় যে সম্রাট বুধ গুপ্তের সময়ে, এই স্থানে একটী জৈন মন্দির ছিল। ভিত্তি খোঁড়্‌বার সময় যেসকল পাথরের দেবদেবীর মূর্ত্তি বেরিয়েছে সেগুলি হিন্দু কীর্ত্তির পরিচায়ক। খননে আবিস্কৃত প্রমাণগুলি হ'তে জানা যায় যে পাহাড়পুরের প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। এখানে একাধারে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলন ক্ষেত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুর ধর্ম্মায়তনের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে যবদ্বীপের বরবদুর মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য আছে।

কাছেই একটি মিউজিয়ামের মত ঘরে রয়েছে নানারকম

হাঁড়ি কুঁড়ি শিল নোড়া, যাঁতা, ছোট ছোট মূর্ত্তি, হাতের চুড়ি বালা এই সব অনেক কিছু। ভাল ভাল মূর্ত্তি গুলি না'কি রাজসাহী ও কলিকাতার মিউজিয়ামে রয়েছে।

সঙ্গে আমরা এনেছিলেম এক ঝুড়ি ডাব। তারই জল পানে শ্রান্তি দূর করে ট্রেণ ধরবার চেষ্টায় পুনরায় মোষের গাড়ীর স্মরণাপন্ন হলেম।

আমাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল বাড়ীর জন্ত এখানকার কোন জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যাব। সকলের মুখেই কিন্তু শুনলেম, এ সব অঞ্চলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা ত' গেলাম দমে। নিয়োগী মশাই কিছু না পেয়ে ডাবের খালি ঝুড়িটা বোঝাই করলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত কতকগুলি ইঁচড় দিয়ে।

তারপর ফেরা গেল। আবার মহিষদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে গাড়ীগুলো ক্রমশঃ ষ্টেশনে এসে পৌছাল।

মিস্ সোম ও আমার গাড়ীখানা আগে পৌছে গেল। ডাক্তার নিয়োগী ও মিস্ মল্লিকের তখনও দেখা নেই। অবশেষে দেখি তাঁরা আস্‌ছেন হাঁপাতে হাঁপাতে—সঙ্গে এক ঝুড়ি শশা ও করোলা উচ্ছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করাতে জানলেম্ যে নিয়োগী মশাই নেমেছিলেন ষ্টেশনের খুব কাছে, একটা বাজারে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে। কিন্তু পাওয়া গেল কেবল মাত্র শশা ও করোলা, উচ্ছে। বাজার সেরে তাঁরা আবার দেখেন, গাড়োয়ানটা ভেগেছে গাড়ীখানা নিয়ে তার উপর আবার অনেক চেষ্টা করেও শশা ও করোলা বইবার লোক তাঁরা পারেন নি সংগ্রহ করতে। অবশেষে নিয়োগী মশাই কোঁচার খুঁটে বাঁধলেন করোলা, আর মিস্ মল্লিক আঁচলে বাঁধলেন শশা। তারপর আরও বিপদ। মিস্ মল্লিক তাঁর জুতো জোড়াটি রেখে গিয়েছিলেন মোষের গাড়ীতে। করোলার ভারে নিয়োগী মশায় পারেন না চলতে, ওদিকে গরম বালির উপর পা ফেলতে না পেরে লাফাতে লাফাতে এলেন মিস মল্লিক। সে যাহা হউক ডাঃ নিয়োগী এসে গাড়োয়ানকে খানিকটা ধমকালেন। বেলা ৫টায় পোড়াদহে আবার গাড়ী বদলে উঠলেম চিটাগং মেলে। মাজদিয়ার কাছে এসে সেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

রাণাঘাটে এসে আমাদের সম্পাদক মশায় পান্তুয়া কেন্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। উনি ত নিলেনই, আমরাও বাড়ীর জন্যে এক এক হাঁড়ি কিনে নিলুম।

শিয়ালদহের কাছাকাছি এসে নিয়োগী মশাই বল্লেন —"অনেকদিন এত হাসি নি, অনেক পরমায়ু বেড়ে গেল কিন্তু" আমরাও তাঁর কথায় সায় দিলাম।

তারপর বিদায়ের পালা। পরস্পরের নিকট বিদায় নিয়ে স্ব স্ব গৃহে ফেরা গেল। কিন্তু লালমণির হাটের অভ্যর্থনা, পাহাড়পুরের দৃশ্য এবং এই দুই দিনের ছোট ছোট এড্‌ভেঞ্চারগুলো আমাদের সকলেরই অনেক দিন মনে থাকবে নিশ্চয়ই।

অন্য দেশের মেয়েরা

শ্রীমতী সুধারাণী বোস

গত ১৭ই জুলাই 'সরোজনলীনি নারী শিক্ষালয়ে' শ্রীরমানাথ বিশ্বাস, নিজের ভ্রমণ কাহিনীচ্ছলে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে লেক্‌চার দেন, স্বদেশে ও বিদেশে ২।৪ বার যা বক্তৃতা শোনবার সুযোগ হয়েছে, এ ধরণের বক্তৃতা কথনও শুনেছি বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রত্যেক কথার মূলে প্রত্যেক দেশের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে (আফ্রিকা, শ্যাম, মালয় জাপান, ইন্দোচীন ইত্যাদি ইত্যাদি) এই সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমি হীন। এক একটী দেশের নর নারীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে তোমরা এদের অনুকরণ কর। আফ্রিকার অধিবাসী উলঙ্গ থাকে, তাদের মনে কোন লজ্জা অহেতুক (?) উপস্থিত

হয় না। অর্থাৎ এইরূপ আমরা সকলে করিলে' তবে উন্নত হইতে পারিব। এই লজ্জাকর কথা তিনি বক্তৃতার ছলে দেশের মাতৃজাতীর সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না, দেখিয়া বড়ই লজ্জিত ও বিস্মিত হইলাম! আমার মনে হয়, বিশ্বাস মহাশয়ের কখনও 'ঘর' বলে কোন জিনিষ ছিল না, এবং মা বোনের স্নেহ উনি কখনও পান নাই। কোনও মহিলা সভাস্থলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে "এই যে তুলনাত্মক বক্তৃতা আপনি দিতেছেন, কিন্তু দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্গে কি অন্য দেশের তুলনা হয়, 'বিসুবিয়স' ও 'এভারেষ্ট' দুটো জিনিষ কি ঠিক পাশাপাশি আছে না দুটোর সঙ্গে দুটোর কোনও রকমে তুলনা হয়?" মিঃ বিশ্বাস আরও বলেছেন যে যেখানে থেকেছেন সেইখানেই নাকি তিনি মেয়ে মহলেই বেশী থেকেছেন! এতদ্বারা খুব মূর্খ লোকও বুঝতে পারে, তিনি মেয়েদের সঙ্গটাই বেশী পছন্দ করেন। এবং এত দেশ বিদেশের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেটে নি, তাই এসেছেন নিজের দেশের মেয়েদের স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাবার বক্তৃতা দিতে। আজ আমাদের দেশের অনেক মেয়েরাই হয়ত মনে করছেন—আহা! রমানাথ বিশ্বাস মহাশয় কি বক্তৃতা না দিয়াছেন! আমাদের কবে সে সৌভাগ্য হবে, যে ওই রকম হতে পারব। কিন্তু ভগিনীগণ! ক্ষণিকের উত্তেজনার বশীভূত না হইয়া, সমাহিত চিত্তে একটু মনোযোগ দিয়া ভেবে দেখবেন, বিশ্বাস মহাশয় বক্তৃতা ছলে আমাদের বিশেষ ভাবে অপমানই করেছেন। আমার বিশ্বাস উনি যেভাবে আমাদের হীন করে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করলেন যে সব তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, সে সব দেশের অধিবাসীও এ ভাবে পারত না। আমাদের 'মাকে' ভাবতে হলে, কি মূর্তি আমাদের মনশ্চক্ষে আসে? ফ্রক পরা 'টেনিস্ র‍্যাকেট্' হাতে, ববড্ হেয়ার চুল মনে হয় কি? না—আলতা পরা দুটী রাতুল চরণ, লালপাড় সাড়ীতে পূত বর মুখখানি বেষ্টিত আবেনী সংবদ্ধ সুদীর্ঘ কেশপাশ, তার মাঝে নারীর বিজয় টিকা, উজ্জ্বল এয়োতীয় সিঁন্দুর রেখা! এই কি আমাদের স্নেহময়ী করুণারূপিণী জননীর মূর্তি নয়? সে মূর্তি দেখিলে শির আপনি নত হয়। আর বিশ্বাস মহাশয় অম্লান বদনে সাড়ী ও ফ্রক পরা এক জিনিষ বলে, এতগুলি নারীর সামনে বিনা প্রতিবাদে ফিরে যেতে পারলেন, এই আমাদের সাহস! আমরা নিজের অপমানের উত্তরে একটী বাক্য জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করতে পারি না, আর অন্য কি করব। যদিও এদেশের নারি আজ পিছনে পড়ে আছে অনেক বিষয়ে, কিন্তু আমি বলি তাদের পিছিয়ে থাকা দরকার যে। আমাদের পারিবারিক, নৈতিক এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত জিনিষ নিয়ে তৃতীয় ব্যাক্তি আমাদের সঙ্গে ব্যঙ্গ পরিহাস করবে আমরা তার বিরুদ্ধে ১টা আঙ্গুল তুলব না। আর আমরা চেঁচিয়ে গগন ফাটাই স্বাধীনতা চাই—স্বাধীনতা চাই। যেদিন আমরা স্বাধীন হবার উপযুক্ত হব, সেদিন আমাদের অধীনতার বাঁধন আপনিই খুলে যাবে। ডিমের ভিতর থাকে পাখীর ছানা, কারণ তখন তার বাইরে থেকে আহার নেবার উপযুক্ত অবয়ব তৈরী হয় না বলেই। গরু ঘোড়ার ডিম হয় না তারা বাচ্চাই প্রসব করে, কারণ মাতৃস্তন্য পান করার শক্তি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তারা পায়। পাখীর ছানাও যখন খাদ্য গ্রহণ করে নিজেকে বাঁচাবার উপযুক্ত হয়, তখন তার আর ডিমের খোলসের দরকার হয় না, তাই আপনিই খসে যায়। আমার ভগ্নিগণ—এইটুকু জানবেন এবং বিশ্বাস করবেন, যাকে আপনারা অধীনতা বলেছেন—সেটা অধিনতা নয়। আমাদের সব রকম বিপদ অপমান—অসম্মান থেকে রক্ষা করবার দুর্গ। নিজের বাহির ভেতর যখন ঠিক তৈরী হবে, দেখবেন ঐ সবগুলা আপনিই ঢিলে হয়েছে। আমি বলছি না যে বিদেশীয়দের মধ্যে থেকে আমাদের নেবার কিছুই নেই। আছে, কিন্তু আমাদের হতে হবে হাঁসের মতন। হাঁস যেমন আবর্জ্জনার মধ্যে থেকে ঠিক তার খাদ্যকণাটুকু বেছে নেয়, তার বেশী কিছুই নেয় না, তেমনি কতকগুলি ভাল যা আছে—তা আমাদের স্থান কাল পাত্র বিশেষে অবশ্য গ্রহণীয়। দেশী বিদেশীর মধ্যে যে আমাদের জাতি ও আমাদের দেশ কত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ—তা—প্রমাণ দ্বারা ইহার পরে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব। আমাদের বিশ্বাস মহাশয় রামায়ণ ও মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন—আমিও সেই রামায়ণেরই কোন এক পৃষ্ঠায় পড়েছি, যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন সাগর বন্ধন করেন তখন কাঠবিড়ালি হেন ক্ষুদ্র জন্তুও একমুষ্ঠি বালি দিয়ে সাহায্য করেছিল। একজন ভগিনীও যদি আমার এই মর্ম্মব্যথার ভাষা বুঝতে পারেন তবে এতখানি লেখা সার্থক মনে করব। আশা করি ওরকম বক্তৃতা আর বিনা প্রতিবাদে কোথাও অবাধে চলবে না।*

---

* ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বক্তৃতার উত্তরে লিখিত।

নারীর ঘরে বাইরে শিক্ষা-দীক্ষা

[স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ]

সম্প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

ঘরে বাইরে শিহা দীক্ষা

গত বড় দিনের ছুটীর মধ্যে এখানে সর্ব্ব-ভারত-নারীর সম্মিলন দেখে তার প্রস্তাব শুনে, সভানেত্রীর মন্তব্য পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছিল তারি কথা তোমাদের জানাতে চাই।

১ম। ঘরের কথা—এক সময়ে এই বাংলা দেশের গৃহ-লক্ষ্মীদের ঘর নিয়ে থাকলেই চলে যেতো, তাতে তাঁরাও সুখী হতেন, বাড়ীর কর্ত্তারাও খুসী থাকতেন। কেননা তখনও সে সব দিনের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ব্যয়সাধ্য—মেয়েরাও অধিকাংশ কি ধনী কি নির্ধন স্বস্বকাজে অভ্যস্থ ছিলেন—পরিবার ছিল একান্নবর্ত্তী, একত্র বসবাস জন্য পরস্পর পরস্পরের বাধা সৃষ্টি না করে সহায়ক ছিলেন। আমার দিদিমার কাছে তাঁদের বধূ ও গৃহিণী-জীবনের যা' বর্ণনা শুনেছি তাতে এই ধারণাই আমার মনে স্থান পেয়েছে। তার পর হল আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন; ইংরাজী সভ্যতার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব অনুসারে একান্নবর্ত্তীত্বের ভিত্তি আলগা হয়ে আসতে লাগল, আগের মত অর্থ-স্বাচ্ছল্য রইল না, সকলেই ক্রমে অনুভব করতে লাগলেন—একের অন্নে দশের প্রতিপালন সমীচীন নয়, সুখের তো নয়ই। কাজেই আগে যাদের জমীজমা হতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হত,তাঁদের চাকুরে হতে হল, ক্রমে তাঁরা আপন আপন পরিবার নিয়ে ভিন্ন হয়ে গেলেন, যারা তা করলেন্ না বা পারলেন না, তাঁরা কষ্টে পড়লেন।

২য়। এখন এলো বাইরের কথা, বিদেশের জীবন যাত্রা স্বভাবতই পরদেশীয় ভাবাপন্ন হ'ল—পুরুষ ভাঙেন বেশী, গড়ন করেন কম। ছেলেদের শিক্ষা ক্রমে পূর্ব্বের গুরু-মশায়ের পাঠশালা ছেড়ে ইংরেজী পড়ান স্কুলে প্রবেশ করল, আগে যা ছিল তা' রইল না। ছেলেদের পড়া শোনার দেখা দেখি মেয়েদেরও লেখাপড়ার বাসনা মনে জাগল; মেয়েদের জন্যও বিদ্যালয় হ'ল, সেখানে গুরুমা শেখাতেন শেলাই, নামতা, অক্ষর পরিচয় হত তাঁরি কাছে—পণ্ডিত মশায় পড়াতেন বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি—প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালাতে বাংলাতেই শিক্ষা হ'ত, বহুকাল ইংরাজি পুঁথির সঙ্গে সংশ্রবে আসতে হত না; আমরা পড়েছি এই সব বিদ্যালয়ে কাজেই এখন যে আন্দোলন চলছে মাতৃভাষায় পঠন পাঠন তার উপকারিতা অভিজ্ঞতালব্ধ—সে সব প্রশ্নের মীমাংসা পরে হবে। বাড়ীর মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়তে গেলে ঘরের বাইরে অনেক সময় কাটে, তার উপর গৃহকর্ম্ম শিখবার সুযোগও কম হয়ে যায়—পড়াই হয়, তাও ছেলেদের মত শিক্ষা। বিশেষ করে মেয়েদের জীবন যাত্রাটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা চলে না,এবং পরবর্ত্তী জীবনে গৃহিণী হয়ে নতুন কিছু শিক্ষার অপেক্ষা করা আবশ্যক হয়। এ বিষয় ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন; বিশেষ উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। ক্রমে শিক্ষার বিস্তার হলো, উদার মতাবলম্বী পুরুষেরা ছেলেমেয়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন তখন বিচার-বিবেচনার সময় ছিল না গতানুগতিকের প্রভাব রয়ে গেলো। আমাদের এ বাংলা দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি নারী বহু অভিনন্দন লাভ করেছিলেন সে আজ প্রায় ৬০ বৎসরের কথা—ক্রমে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পথও প্রশস্ত হয়ে এল।

তাতো হলো, তবে সর্ব্বানুমোদিত হল না। এ প্রবন্ধে সে ইতিবৃত্ত লিখ্‌বার আবশ্যক নাই—এখানে যাঁরা আছেন সেটা তাঁদের জানা কথা।

শিক্ষা হতেই আসে দীক্ষা অর্থাৎ ধর্ম্ম, যা ধরে আমাদের থাকতে হয়, জীবনের চিরাচরিত পন্থা ও অবলম্বনও বটে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পূর্ব্ব পূজিত দেব দেবীর প্রতি আমাদের সরল অহেতুকী প্রীতি ভক্তি হ্রাস হয়ে এল, আমাদের পিতামহী মাতামহীরা যে ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে

সন্তুষ্ট থাকতেন, আমাদের মনে সন্তোষ বা তৃপ্তি তাতে পেত না—আমার নিজের কিশোর দিনের কথা স্মরণ আছে। সর্ব্বদাই মনে হত মস্ত বড় একটা অভাব কোথায় যেন রয়ে গেল। নিরাকার উপাসনার দিকে মনের অনুরাগ থাকলেও দেখতাম শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, সংসয় রহিত চিত্তবৃত্তি লাভ মনে হ'ত যেন সুদূর পরাহত।

তখনও আমাদের মন রাষ্ট্রীয় অধিকার কিম্বা পুরুষের সমকক্ষ হবার জন্যে উৎসুক কিম্বা উৎসাহিত হয়ে ওঠেনি। এখন যেমন আমরা বালা, বণিতা, বৃদ্ধা সকলেই স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে জাগরূকমন তখন তা' ছিল না, এসব কথা খানিকটে ঢিলে ভাবেই ভাবা হত, আর ঢিলে পোষাক পরিচ্ছদ খসিয়ে ফেলা যেমন সহজ, আমাদের মনও যেন দৃঢ় অধ্যাবসায়ের সঙ্গে সে সব কথা চিন্তাও করত না, এক লক্ষ্যভাবে সে সাধনাও করত না।

এখন নারী সঙ্ঘ স্বদেশে বিদেশে রাষ্ট্রে গৃহধর্ম্মে উত্তরাধীকার, বিবাহ নীতি, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী জীবনে বিবিধ স্বাধীনতা, এমন কি জন্ম নিরোধ প্রভৃতি নানা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শুধু ইয়ত্বা নয় আয়ত্ব করবার জন্যে প্রায়শঃই একমত পোষণ করেন। এসম্বন্ধে শুধু আন্দোলন নয়, রাজকীয় বিধি বিধান প্রবর্ত্তিত করে বাধ্যতা মূলক করতে ঐক্যবদ্ধ—যথা বিবাহের কাল নির্দ্ধারণ, নারীর রূপজীবনী বৃত্তির উচ্ছেদ, কন্যা সন্তানের পৈত্রিক বিষয়ে সমানাধিকার, বিধবার স্বামীর ত্যক্ত বিষয়ে পুত্র কন্যাদের ন্যায়ই স্বতঃ অধিকার প্রাপ্তি। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতামত অর্থাৎ ভোট যাহাতে দিতে পারেন আর পুরুষের মতই দিতে পারেন তাহার অবাধ অধিকার। এ সকল অধিকার লাভ করতে হলে শুধু গলার জোরে আর লাঠির ঘায়ে হবে না, যদিও একেবারেই হবেনা তাও নয়—কিন্তু সব চেষ্টার প্রকৃষ্ট পথ শিক্ষা দীক্ষা। মেয়ের কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের সাহচর্য্য আবশ্যক, পুরুষেরও তাই—এখানে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও শত্রু কি বিপক্ষ হলে চলবে না—বিরোধ নয়, প্রীতি।

সমগ্র হিন্দুস্থানের নারী সংঘবদ্ধ হতে হলে ভাষা বিভ্রাট দূর করা আবশ্যক—আজকালকার দিনে ইংরাজী রাজকীয় ভাষা বলে শিক্ষিত সম্প্রদায় এটা কইতে লিখতে জানেন, এতে অভাব নিরাকরণ হলেও মন বিদেশী ভাষার মনোভাব জানবার পক্ষপাতী নয়। মাতৃভাষার অপরাধ কি? তবে আমাদের সকলেরই মাতৃভাষা এক না, আমি বলি বাংলা, তুমি বল হিন্দি কি উর্দ্দু, তিনি বলেন গুজরাটী কি মারহাটী —মাদ্রাজী বলেন তেলেগু, তামিল, তাই মনে হয় সবাই যদি হিন্দী বলি ভাল হয়, সেই জন্য এই হিন্দী আবাল্য পাঠ্য ও লেখ্য হতে হবে—কি বাংলা দেশে কি অন্যত্র।

ভেবে দেখতে গেলে সবই গিয়ে দাঁড়ায় শিক্ষা ও দীক্ষায়। আমরা তো নিজ দেশে পরবাসী হয়েই আছি তার উপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন কাজেই তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে। এ দুর্দ্দশা দূর করতে হবে—দেশের আমাদেরই। আমাদের জীবনের প্রেরণা যে মহাপুরুষ দিয়ে গিয়েছিলেন যাঁর শক্তিতে আমরা ভাবতে শিখেছি, বলতে শিখেছি, এমন কি জীবন ধারণের অধিকার হতে বঞ্চিত হইনি, শতবর্ষ পরে তাঁকেই প্রথম প্রণাম জানাব—পরবর্ত্তী যারা নারীকে স্বাধীকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে চেষ্টিত হয়েছেন তাঁরাও আমাদের নমস্য। চিরদিন যেন সে সব অতীত ঋণ স্মরণ রাখি—এবং পরিশোধের জন্য অগ্রসর হই। সব কথা বলা হল না, হওয়াও সম্ভব নয়। মূল কথা যা তা বলবার চেষ্টা করেছি, অঙ্কুর কোথায় তাও দেখতে পাচ্ছি, এখন একে বাঁচাতে হবে, সলিল সেচনে, বাতাতপ হতে রক্ষা করতে হবে এ'কে খোঁচালে হবে না—স্নেহে সযত্নে পরিপুষ্ট করতে হবে—এই হবে সাধনা—সিদ্ধি দেখা হয়ত সৌভাগ্যে নাই—তবু লক্ষ স্থানে উপস্থিত হতে হবে—তাই বলি, নারী শক্তি জাগৃহি—সংগচ্ছধ্বং সংবদদ্ধং।

জ্ঞানের মোহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(১৮)

ননীগোপাল কিছুদিন সংস্কৃত পড়িয়াছিল, তারপর গ্রামের মেয়েদের লক্ষ্মী, মনসা পূজা করিয়া দুচার পয়সা যা পাইত সস্তার সিগারেট খিড়ির খরচ তার চলিয়া যাইত, বাকী সময় সিঁদু তাঁতির তাঁত ঘরে তাস পিটিয়া আর সখের থিয়েটারের রিহার্সল দিয়া বেড়াইত। বড় বড় বাবরি চুল গুলি সুগন্ধ তৈল দিয়া আঁচড়াইয়া গোপ কামানো মুখ খানিতে থিয়েটারের পাউডার মাখিয়া পুকুরের ধারে ছিপ হাতে নিয়া মেয়েদের জল আনিবার সময় বসিত আর ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়া আড় চোখে ঘাটের দিকে দেখিত। তার জননীর মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভাইএর সংসারে নেহাৎ আগাছার মতই ননী গোপাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া বখাটে ছেলেদের দলে ননীগোপালের যোগ দেওয়ায় তার দাদা ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছিলেন।

সেদিন যখন ননীগোপাল সারা রাত্রি তাদের পাশের গ্রামে থিয়েটার করিয়া বেলা দুপুরের সময় বাড়ী আসিয়া ঢুকিল, তখন তার বৌদিদি তিক্তকণ্ঠে বলিল—"বাড়ী এলে কেন? যেখানে গিইছিলে সেইখানেই থাকলেই হত।

হাসিয়া ননী গোপাল বলে—"সেখানে তো থাকবার জন্য যাই নি বৌদি।

—তবে কি করতে গিইছিলে?

—তা তো তুমি জান।

এই সময় ক্ষেতের কাজ দেখিয়া ননীগোপালের দাদা বাড়ী ফিরিয়া ভাইকে দেখিয়া বলে—এ বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হবে না, ননী। এটা হোটেল নয়!

ননী চুপ করিয়া থাকে। তার দাদার রাগ বাড়িয়া যায়, সে বলে—দাঁড়িয়ে থাকবার কোন দরকার নেই। বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। ভদ্রলোকের ছেলে, যত ইতরের মত চাল চলন! ভাই ব'লে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়! এমনি দু'চার কথা আরও সে শুনাইয়া দেয় ননীকে।

সারা রাত্রি জাগরণের পর ক্ষিদে আর ঘুমে দেহ ননীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, দাদার কথায় তারও রাগ হয়; সেই দিনই সে চলিয়া আসে মামার কাছে।

ননীগোপালকে দেখিয়া মাখন পণ্ডিতের মাথায় এক ফন্দি আসে। কথায় কথায়, একদিন জনার্দ্দন উষার জন্য একটি পাত্রের কথা বলেন তাকে। জনার্দ্দন ননীদের পাল্‌টা ঘর। কোন প্রকারে পণ্ডিত যদি এ বিবাহ ঘটাইতে পারে, তাহা হইলে, দেবত্বর সম্পত্তির আয়ে তার সংসারের আর কোন অভাব থাকে না। পণ্ডিত জানিত, ননী বুদ্ধিহীন, জনার্দ্দনের অবর্ত্তমানে বিষয় তার হাতে পড়িলেও, পণ্ডিতের কর্ত্তৃত্বে কোন বাধাই থাকিবে না।

মামার মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া ননী এত খুশী হইয়া উঠিল যে তিনি যখন বিষয়ের কথা তুলিলেন, সে বলিল—ওসব আমি কিছু বুঝিনে মামা, সে তুমি যা হয় ক'রো।

পণ্ডিত বলিলেন—তাই কী হয় বাপু! উষার সঙ্গে বিয়ে হলে, বিষয় যে তোরই হবে।

—সেঁ আমার, সম্পত্তির কর্ত্তা তুমি, কেবল আমাদের দুটো খেতে দিও, এর বেশী তোমার কাছে আর কিছু চাইনে!

পণ্ডিত জনার্দ্দনের মত পাইয়া, ভাগ্‌নেকে আসিয়া বলিল—তৈরী হ'য়ে নে, ননী! তোকে আজ জনার্দ্দন পণ্ডিতের বাড়ী নিয়ে যাব।

ননী চিরদিনই একটু সৌখীন বেশী। একখানি ইস্ত্রী

করা ধুতি পরিয়া আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বলিল—চলো মামা!

তার দিকে চাহিয়া পণ্ডিত বলিলেন—ওঃ! ব্যাটা যেন নবাব পুত্তর! ঐ পাম্পস্ পরে আর পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে গেলে, জনার্দ্দন তোকে মেয়ে দেবে ভেবেছিস!

—কেন?

—আরে আহম্মুখ! সে গোড়া বামুন! ও সব ছেড়ে একখানা শুধু ফরসা কাপড় পর, আর আমার এণ্ডির চাদরখানা নে, জুতা ছেড়ে ঐ খড়ম জোড়া পায়ে দে—

—না মামা! অমন্ ক'রে আমি যেতে পারব না সেখানে?

—তবে, এমনি জামাই সেজে যেতে হবে না কী?

—জামাই যখন হচ্ছি, তখন সেজে যেতে দোষ কী?

—কিন্তু এ সাজে জনার্দ্দন জামাই করবে না!

—তোমার কথায় না হয় কাপড় জামা বদলাচ্ছি, কিন্তু ঐ খড়ম পরে আমি যেতে পারব না!

—নেহাত যদি তা না পারিস তাহ'লে একজোড়া চটি পর!

মামার কথায় ননী-গোপাল চটি পরিয়াই তার সঙ্গে গেল।

জনার্দ্দন বসিয়া একখানি পুঁথি দেখিতেছিলেন। পণ্ডিতের আহ্বানে চাহিয়া বলিলেন—এসেছ, ব'স।

ননী-গোপাল জনার্দ্দনকে প্রণাম করিল।

পণ্ডিত বলিল—এই আমার ভাগনে, ননীগোপাল।

তার দিকে চাহিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—ব'স বাবা।

পণ্ডিত ভাগনেকে বেশ করিয়া শিখাইয়া আনিয়াছিল যেন জনার্দ্দনের সাম্‌নে সে খুব নিচু হইয়া কথা বলে। ননীগোপাল ছোট হইতে থিয়েটার করায়, সময় উপযোগী চলিতে খুব ভালই জানিত।

জনার্দ্দন দু একটি কথা ননীর সহিত বলিয়া তার সদুত্তরে খুশী হইয়াছিলেন। পণ্ডিতকে বলিলেন, —ভাগনেটি তোমার বেশ! এখনকার ছেলেদের মত নয়, আমার এর স্বভাবটি বেশ ভালই লাগলো।

পণ্ডিত খুশী হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! ননী আমাদের এখনকার ছেলেদের চেয়ে একেবারে আলাদা!

—তা বুঝতেই পারছি।

—আজ্ঞে, তাহ'লে…বিয়ের কথাটা……

—হ্যাঁ,—আমার আপত্তি নেই……

—তাহ'লে, ওর দাদাকে খবর দিই…

—দিতে পার।

—তবে এখন উঠি আমরা?

—দাঁড়াও! ননীকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দি…

—তার জন্যে ব্যস্ত কেন হচ্ছেন। ননী তো এখন আপনারই…এর পর কতো খাবে!

—সে পরের কথা, আজ তো হোক্…বলিয়া জনার্দ্দন ভিতরে গেলেন। একটু পরে দুখানি রেকাবীতে মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়া বলিলেন—খাও তোমরা! আজকের দিনে শুধু মুখে যেতে নেই।

(১৯)

রাধা-গোবিন্দের সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়া গেলে উষা আলোর কাছে একখানি কার্পেটের উপর গোপালমূর্ত্তি তুলিতে বসিল।

জনার্দ্দন আসিয়া বলিলেন—ও রেখে কাপড় ছেড়ে চট্ ক'রে আয় আমার সঙ্গে,—

—কেন বাবা?

—দরকার আছে।

—কাপড় তো আমি বিকেলে ছেড়েছি বাবা—

—তা জানি, একখানি রেশমের কাপড় পর!

বেশী কথা বলা উষার স্বভাব নয়, সে কাপড় ছাড়িয়া আসিল।

পিতার সঙ্গে বাহিরের ঘরে আসিয়া, উষা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোক অনেকগুলি সেখানে বসিয়া আছেন।

পণ্ডিত বলিল—ব'স মা এখানে।

উষা পিতার দিকে চাহিল।

জনার্দ্দন বলিলেন—ব'স, আজ তোমার পাকা দেখা, ওঁরা আশীর্ব্বাদ করবেন!

পিতার কথায় উষার পায়ের তলের মাটি যেন সরিয়া

যাইতেছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া সে বসিয়া পড়িল।

পণ্ডিত মাখনলাল উঠিয়া উষাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

উষার মনে হইতেছিল সেখান হইতে সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। সে পিতার মনের কথা একদিনও জানিতে পারে নাই। এত সত্বর যে তার বিবাহের ঠিক হইবে তা সে স্বপনেও জানিত না। এতগুলি লোকের মধ্যে এরূপ আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে যেন তার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বিবাহ যে কোথায় হইতেছে তা সে কিছুই জানে না।

জনার্দ্দন বলিলেন—উষা! প্রণাম কর এঁকে—উনি ননী গোপালের দাদা!

পিতার কথায়, উষা প্রণাম করিল, কিন্তু তার মনে পড়িল, কয়েক দিন আগে পণ্ডিত একটি যুবককে লইয়া তার পিতার কাছে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে ননী গোপাল বলিয়া ডাকিতে সে শুনিয়াছিল। তারা যখন বাহির হইয়া যায়, উষা ঠাকুর ঘরের কাজ সারিয়া ভিতরে আসিতেছিল, তার দিকে ননী এমন অভদ্রভাবে চাহিয়াছিল, যে উষা তা ভুলিতে পারে নাই। তারই গলায় যদি মালা দিতে হয়, ভাবিতে উষার দেহ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। না—না, রাধাগোবিন্দ তাকে এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করিবেন! তিনি তো জানেন, তার মনের কথা!

এক জোড়া সোনার দুল, উষার হাতে দিয়া পণ্ডিত বলিলেন—নাও মা! এ তোমার শাশুড়ীর জিনিষ!

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—আগের দিনে তো এ রকম গয়না ছিল না!

—এতো আগের দিনের নয়!

—তবে যে বল্লেন আপনার ভগিনীর?

—হ্যাঁ, কিন্তু ননী, তা ভেঙ্গে নিজের পছন্দে গড়িয়েছে! জানেন তো! এখনকার ছেলেদের রুচি! বলিয়া পণ্ডিত হাসিলেন।

জনার্দ্দন বলিলেন—উষা! তুমি যাও এবার—

উষা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পণ্ডিত বলিলেন—আমরাও উঠি তা হ'লে?

—না, একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাও—বলিয়া জনার্দ্দন পণ্ডিতরা যে সন্দেশ আনিয়াছিল, তাহা হইতে সকলকে দিতে লাগিলেন।

উষা, পিছনের দরজা খুলিয়া বাগানর মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল। কী বিপদ যে তার সম্মুখে, তা বুঝিয়া সে কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। একটা বছর আগে হইলে, হয়ত উষার এ বিবাহে কোন বাধা আসিত না, কিন্তু আজ সে ননী গোপালকে বিবাহ কিছুতেই করিতে পারে না। সে যে অরুণকে মাল্য দান করিয়াছে! হ্যাঁ সেই তার স্বামী! তাকে ছাড়া অপরকে বিবাহ করিবার তার সাধ্য নাই! কিন্তু বাবা যদি জোর করেন, উষা কী করিতে পারে! আরুণকে সে ভালবাসে, কিন্তু তার পিতা যে তাঁকে শত্রু মনে করেন—কী করিবে সে, কেমন করিয়া এ বিবাহ বন্ধ হয়! দুঃখে, চিন্তায় উষার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠিতেছিল, তারই জ্যোৎস্না, উষার মুখে পড়িয়াছিল। দূর হইতে অরুণ উষাকে বাগানের ভিতর কাঁদিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বেড়ার কাছে আসিয়া ডাকিল—উষা!

অরুণের আহ্বানে উষা ফিরিয়া চাহিল।

—এখানে একা বসে কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? বাবা ব'কেছেন?

উষা চুপ করিয়া রহিল।

—আমাকে ব'লবে না, উষা? বলিয়া অরুণ তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

উষা, আঁচলে চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ তার একখানি হাত, নিজের হাতে লইয়া বলিল—তোমার দুঃখের অংশ থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রো না, উষা! কী হয়েছে, আমাকে বলো?

—কিছুই হয়নি,—

—তবে কাঁদছিলে কেন, একা ব'সে?

—এমনি—মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেছিল।

—না—তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ!

—কী আবার লুকুবো! বলিয়া উষা হাসিল, সে হাসি কান্নারই রূপান্তর।

তোমার কথা!

—না হ'লে আর কী ক'রবো বলুন! কিন্তু এত রাতে আপনি এদিকে কোথায় ছিলেন?

—হাঁসপাতাল থেকে ফিরছিলুম। এ রাস্তায় আমাদের বাড়ী কাছে পড়ে।

—এত রাত হ'ল কেন?

—আজ একটা রুগীর অবস্থা বড় খারাপ।

—এই গাঁয়ের না কি?

—না এখান থেকে দশ ক্রোশ তাদের গ্রাম। কিন্তু তোমাকে—আজ ভারি সুন্দর মানিয়েছে, ওই সাড়ীখানি পরে!

উষা মুখখানি নীচু করিয়া লইল।

—তুমি ভারী লাজুক, উষা! কিন্তু কপালে হঠাৎ ফোঁটা কেটেছ কেন? এতে তোমায় দেখাচ্ছে ভারী সুন্দর!

—আপনার সৌন্দর্য্য-বোধ খুব বেশী দেখছি!

—তা কী আজ বুঝলে, উষা।

এতক্ষণ উষা সব ভুলিয়াছিল, অরুণের কথায় তার ললাটের সিন্দুর চন্দন, পণ্ডিতের দেওয়া মনে হওয়ায় দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। অরুণকে এ কথা সে বলিতে পারিতেছিল না। অরুণ তাকে ভালবাসে, একথা শুনিলে, তার যে কত কষ্ট হবে, তা কি উষা জানে না। না—নিজে থেকে এত বড় আঘাত অরুণকে সে দিতে পারিবে না।

(২০)

শুনেছেন মা! পণ্ডিত মশায়ের ভাগনের সঙ্গে পুরুত ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে।

দাসীর কথায়, আশাদেবী তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে বল্লে তোকে?

—সবাই বলছে, কাল যে পাকা দেখা হ'ল! ছেলেটাকে দেখলুম মা, যেন একটা যাত্রাদলের সং। বামুনের যে কী পছন্দ। অমন সুন্দর মেয়ে,—

—তুই এখন যা তো এখান থেকে—

উষাকে দেখার পর তাকে পুত্রবধূ করিতে আশা-দেবীর সাধ হইয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরের কথায়, এ কথা তিনি চাপিয়া গিয়াছিলেন। আজ কিন্তু উষার বিবাহের সংবাদে তাঁর মনে আনন্দ হইল না। ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আশা দেবী শ্বশুর আর পুত্রের জল খাবার গুছাইতে লাগিলেন। অরুণের ফিরিতে দেরী দেখিয়া শ্বশুরের খাবার নিয়া তিনি ওপরে গেলেন। বাড়ীতে ঝি, চাকরের অভাব নাই কিন্তু ছেলে আর শ্বশুরকে খাওয়ান নিজে হাতে না করিলে আশা দেবীর তৃপ্তি হইত না।

বধূকে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—অরুণ কি এখন ও বেড়িয়ে আসেনি, বৌমা?

—না, বাবা।

—এত দেরী হচ্ছে কেন?

—কি জানি, হয়তো কারও বাড়ী গিয়েছে!

—তাই হবে—তার তো গাঁয়ের গরীবদের বাড়ী অবারিত দ্বার!

—তারা যে ওকে ভালবাসে বাবা!

—তা জানি, কী ছেলেই গর্ভে ধরেছ বৌমা! এমন ছেলের মা হওয়া বড় ভাগ্যের কথা মা!

—আপনার আশীর্ব্বাদই আমাকে এ সৌভাগ্য দিয়েছে, বাবা!

—শুধু আমার আশীর্ব্বাদই নয় মা, তোমার সাধনা ও আছে!

—তা জানিনে বাবা!

—আমি জানি, বৌমা? তুমি আমার বড় পুণ্যবতী; ভাল সন্তানের জন্য মেয়েদের যে তপস্যা করতে হয়। যত মহা মানব জন্মেছেন, এমন কী অবতারও হয়েছেন, সকলেই পুণ্যবতী নারীর গর্ভে!

আশাদেবী খাবারের রেকাবী, ঘোষাল মহাশয়ের সামনে রাখিয়া বলিলেন—খান্, বাবা।

—অরুণ আসুক—

—তার হয়তো দেরী হবে, বাবা—আপনি রোগা মানুষ, খেয়ে নিন্।

—কিন্তু তার সঙ্গে না খেলে যে আমার তৃপ্তি হয় না, বৌমা।

—এ তো আর ভাত নয়—তা ছাড়া সে এখন কাজ কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত, কখন আসে তার ঠিক্ নেই—আপনি আর দেরী করবেন না, বাবা!

—তবে দাও—

তাঁর খাওয়া শেষ হইলে, আশাদেবী বলিলেন—শুনলুম উষার বিয়ে!

—কোথায়? বলিয়া ঘোষাল মহাশয় আশাদেবীর দিকে চাহিলেন।

—পণ্ডিত মশায়ের ভাগ্‌নে।

—মাখনের?

—হ্যাঁ।

—তার আবার ভাগনে এলো কোথা থেকে?

—তা তো জানিনে আমি—

—মনে পড়েছে—নন্দীগ্রামে মাখনের ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল, এ বোধ হয় তারই ছেলে!

—তাই হবে। এখানে যিনি থাকেন তাঁর তো ছেলে নেই?

—না, সে যে বাল বিধবা!

—শুন্‌লুম্ ছেলেটি নাকি তেমন ভাল নয়

—ভাল যদি না হবে, তা হ'লে জনার্দ্দন কি মেয়ে দিত! অন্ততঃ মূর্খ যে নয়, তা সত্যি!

—আমি আস্‌তে পারি?

—এস।

গোপীনাথ আসিয়া ঘোষাল মহাশয়কে প্রণাম করিল। আশাদেবী উঠিয়া গেলেন।

—ব'স গোপী! কিছু কাজ আছে নাকি?

—আজ্ঞে না—সে সব তো আপনি অরুণ বাবুর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন কোন কাজের জন্যেই এসেছে।

—আমার দুর্ভাগ্য—বলিয়া গোপী একটু হাসিল।

—দুর্ভাগ্য তোমার নয়, গোপী—সে আমার—যে আজ কাজের কথাতে ভয় করি।

—অমনিই তো এখন এ সব কাজের সময় নয়! আজ কাল আপনার শরীর কেমন আছে?

—আপনিই চলেছে—এ বয়েসের শরীর যেমন থাকে?

—ক'দিন থেকে ভাবছি, আপনাকে দেখ্‌তে আসব, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে আর সময় ক'রে উঠতে পারিনি—

—আজকাল কাজ কি খুব বেশী হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খাজনা পাঠাবার সময় কি না।

—ওঃ! বৌমা বল্‌ছিলেন, জনার্দ্দনের মেয়ের নাকি বিয়ে হচ্ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলুম্ তাই।

—পাত্রটি ভাল?

—কি জানি, তবে শুনেছি তেমন ভাল নয়—

—ক কিরে?

—কিছুই না—বকাটে গোছের!

—এ সব জেনে জনার্দ্দন মেয়ে দিচ্ছে?

—সম্ভব, না! পণ্ডিত ভাগনেকে বিদ্বান ব'লেই—পরিচয় দিয়েছে!

—তুমি যখন ছেলের বিষয় জান, তখন জনার্দ্দনকে বলছ না কেন?

—আপনি ক্ষেপেছেন! তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।

—তা সত্যি! জনার্দ্দন যে ভয়ানক এক গুঁয়ে।

গোপী বলিল—তা ছাড়া অরুণ বাবুর ওপর থেকে, আমাদের তিনি ভাল চোখে দেখেন না।

—দেখ দেখি, কী অন্যায়! অরুণের মত ছেলে, যে ইষ্টে বই, কারও অনিষ্টে নেই—গাঁয়ের সবাই তাকে ভাল বাসে—শুধু জনার্দ্দন, মিথ্যে রাগ পুষে রেখেছে, মনে!

—ওঁর স্বভাবই ঐ—একবার যা মন্দ ভাবেবন, কার সাধ্যি তা ভাল বলায়!

—থাক্! ও ভেবে আর কোন ফল নেই। তবে এটুকু ভাল, যে ঠাকুরের বিষয়ের জন্যে মেয়েটাকে খাবারের দুঃখ পেতে হবে না!

ঐ বিষয়ের লোভেই তো পণ্ডিত, ভাগনেটাকে এনেছে।

নিজের মেয়ে, সে যা ভাল বোঝে, করুক্ ?

—আজ্ঞে ? বলিয়া গোপী উঠিয়া দাঁড়াইল।

(২১)

অরুণ বেড়াইয়া ফিরিবার পথে উমেশের সঙ্গে দেখা হইল। অরুণকে প্রণাম করিয়া উমেশ বলিল—

কোথায় গিয়েছিলেন ?

অরুণ বলিল—বেড়াতে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

—পণ্ডিত মশায় ডাকলেন, তাই যাচ্ছিলাম্—

—ওঃ—

—তেনার ভাগনের বিয়ে কি না, তাই একখান্ চালা তুলতে হবে—

—তাই বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বিয়ে যে আমাদের মা নক্ষীর সঙ্গে!

—কী বল্লে ?

—মা নক্ষীর বিয়ের কতা!

—উষার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উমেশের কথায় অরুণের সমস্ত শক্তি যেন চলিয়া গেল। পাশের গাছটি ধরিয়া সে নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিল, কিন্তু উমেশের কথা তার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। নিশ্চয় উমেশ ভুল বলিতেছে।

উমেশ বলিল—আপনি বুঝি শোনেন নাই, কাল যে আশীর্ব্বাদ হয়েছে!

অরুণের চোখের ওপর গতদিনের সন্ধ্যার উষার মূর্ত্তি মনে হইতে তার সব সংশয় দূর হইল। না, উমেশ মিথ্যা বলে নাই। সেই জন্যই উষার কাল ঐরূপ বেশ ছিল; কিন্তু এ বিবাহ যে উষার অমতে হইতেছে, তা বুঝিতে অরুণের একটুও দেরী হইল না। উষার চোখের জলই তার প্রমাণ! অরুণ ফিরিয়া দাঁড়াইল—এ বিবাহে সে বাধা দিবে? উষার অনিচ্ছায় কিছুতেই সে বিবাহ হইতে দিবে না! উষাকে সে ভালবাসে—বিবাহে যদি সে সুখী না হয়, তো অরুণের দুঃখের সীমা থাকিবে না। এখনি সে উষার সঙ্গে দেখা করিয়া তার মনের কথা জানিবে। সত্যই যদি তার মত না থাকে, তা হ'লে যেরূপে পারে, অরুণ এ বিবাহ বন্ধ করিবে? কিন্তু উষা যদি বলে, এ বিবাহ তার সম্মতিতেই হচ্ছে। না—না—এ কথা উষা বলিবে না! অরুণ জানে, উষা তাকে ভালবাসে। সে দিনের মাল্যদানে, অরুণ, উষার মুখে যে মাধুরী দেখিয়াছে, তা কি সে ভুলিতে পারে।

অরুণ উষাদের বাড়ীর দিকে ফিরিতে, উমেশ বলিল—

—ঐদিকে ফিরলেন্ যে ?

—এই রাস্তায় যাব!

উমেশ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া উষা বাড়ী ফিরিতেছিল। পিছন হইতে অরুণ বলিল—উষা, শোন ?

অরুণের ডাকে উষা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কাছে আসিয়া অরুণ বলিল—কাল্ বাগানে তুমি কাঁদছিলে কেন, তা বুঝেছি, উষা!

উষা কোন জবাব না দিয়া শুধু একবার অরুণের দিকে চাহিল।

অরুণ বলিল—না উষা। এ আমি কখনও হ'তে দেব না।

—কী হ'তে দেবেন না ?

—তোমার বিয়ে।

—কেন ?

—কেন, তা কী তুমি জান না, উষা ?

—আপনার মনের কথা, আমি কি ক'রে জান্‌ব বলুন!

—এ কথা তোমার সত্যি নয়! আমার মনের সব খবরই তোমার জানা!

—কিন্তু আমার বিয়ে বন্ধ ক'রে আপনার লাভ কি হবে ?

—আমার লাভ!

—হ্যাঁ ?

—তোমার বাবার কাছে তোমাকে চাইব!

—না—

—কেন, উষা ?

—বাবা তা কখনও দেবেন না!

—আমি তাঁর পায়ে ধরে তোমাকে ভিক্ষা চাইব, তা-তে ও কী তাঁর দয়া হবে না!

—কিন্তু তা আপনি করতে পাবেন না।

—কেন ?

—আপনার উষার অনুরোধ।

—এমন অনুরোধ ক'রো না, উষা, তা আমি রাখ্‌তে পার'ব না!

—আপনার উষার জন্যেও নয় ?

—উষা! তা যদি ব'ল, তা হ'লে আমার আর কিছুই বলবার নেই—কিন্তু তোমাকে না পেলে, আমি বাঁচবো কী ক'রে, উষা!

অরুণের আবেগ ভরা কথায়, উষার ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইল। সে অশ্রু সজল চোখে অরুণের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি যদি এমন করেন, তা হলে আমি কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলব। আমার আশা ছিল, আপনি এ সহ্য ক'রতে পারবেন।

—তোমার কথায়, অরুণ সব পারে উষা, কিন্তু কেন নিজেদের একটা জীবন ব্যর্থ হ'তে দে'ব ?

—তা ছাড়া যে অন্য উপায় নেই!

—আছে, উষা! আমি তোমার কথা শুনবো না! আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে, তোমার পাণিপ্রার্থী হ'ব!

—না—আমি আপনাকে তা কিছুতেই হ'তে দেব না! তা যদি করেন, সত্যিই বলছি, আমি জলে ডুবে ম'রবো! বাবার কাছে, আমার জন্যে আপনাকে অপমান হ'তে দেব না।!

—কিন্তু এ বিয়েতে তুমি ত সুখী হবে না, উষা!

—তা আমি জানি—আপনি এখন বাড়ী যান—বলিয়া উষা ফিরিল।

—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অরুণ বলিল—উষা আর একটু দাঁড়াও—

—আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই, পূজোর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

—দাঁড়াও—উষা—দাঁড়াও! দুটো কথার জবাব দিতে এমন কিছু দেরী হবে না, তোমার!

—আপনার অনেক কথার জবাব তো দিলুম—বলিয়া উষা দাঁড়াইল।

—তা দিয়েছ, কিন্তু আর ও কথা আছে আমার!

—বলুন তবে ?

—এই বিয়েয় সুখী হবে না জেনেও, কেন তা করছ ?

—কেন করছি! এ আপনার আচ্ছা প্রশ্ন! বলিয়া উষা ম্লান হাসিল।

—কেন ?

—তা নয়! আপনি কি জানেন না যে মেয়েদের বিয়েয় নিজের স্বাধীনতা থাকে না, তার অভিভাবকের মতেই চল্‌তে হয়!

—কিন্তু সে দিন আর নেই, উষা!

—ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।

—কেন বিশ্বাস কর না! আগে বাল্যবিবাহ ছিল, তখন অভিভাবকদের মতে বিয়ে হোত, কিন্তু এখন প্রাপ্ত বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হয়। তারা নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পারে, আর তা অনেক জায়গায় হচ্ছেও!

—তা হোক! আমি কিন্তু বাবার অমতে তা পার'ব না।

—তবে ওখানেই বিয়ে করবে ?

—তা ছাড়া আর উপায় কিছু দেখছিনে!

—আমি এর উপায় কর'ব, তুমি বাধা দিও না!

—না, না—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি বাড়ী যান! বাবার কাছে এ সব কথা আপনি যেন কিছু বল্‌বেন না।

—না বল্‌লে কী করে হবে উষা! বিয়ে তোমার হয়ে গেলে, আর কোন উপায়ই যে থাক্‌বে না! তোমার বাবাকে আমি বল্'ব তোমার সঙ্গে বিয়ে আমার হ'য়ে গেছে! নিজে হাতে আমার গলায় মালা পরিয়ে কি তুমি দাও নি উষা ?

—কেন সে দিন অমন কাজ করলেন, আপনি! বলিয়া উষা করুণ চোখে তার পানে চাহিল।

—কেন করেছিলুম! সত্যি ক'রে ব'ল দেখি, তোমার মন কি আমার গলায় মালা দিতে চায় নি ? তোমার মনের কথা আমি কী কিছুই বুঝিনে, মনে কর! না উষা, ভগবান যে মনরূপী! তাঁর ইঙ্গিতেই তোমার মালা গলায় নিয়েছিলুম!

উষার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

তার কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া অরুণ বলিল—কেঁদো না। তোমার ব্যথা আমি বুঝি! বাড়ী যাও, অনেক বেলা হয়েছে—আমি ভেবে দেখি, কী উপায় হ'লে সব দিক্ রক্ষা হয়—।

(২২)

উষা বাড়ীর দিকে ফিরিতেই,একটা গাছের পাশ হইতে ননীগোপাল তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

উষা চমকিয়া তার দিকে চাহিল।

হাসিয়া ননীগোপাল বলিল—আমাকে তুমি চেন না বোধ হয়, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি! তুমি বাঁড়ুয্যে মশায়ের মেয়ে, উষা!

তার কথার কোন জবাব না দিয়া, বিরক্তি মুখে, উষা দাঁড়াইয়া রহিল।

—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, বুঝলে!

—হুঁ।

—কথা কইছ না যে?

—আমার কাছে আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি?

—দরকার এমন কিছু নেই, তবে বিয়ের আগেই শুভ-দৃষ্টিটা একবার ক'রে নিলুম্, বলিয়া ননীগোপাল হাসিতে লাগিল।

—এখন রাস্তা ছাড়ুন!

—চটছ কেন? দাঁড়াও না একটু!

—আমার সময় নেই!

—এতক্ষণ তো খুব গল্প করছিলে, ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে! ও কে?

—তাতে আপনার দরকার কী!

—আমার দরকার থাকবে না তো কী ও পাড়ার রামা নাপ্‌তের থাকবে! আমি হ'লাম তোমার স্বামী।

বিরক্তি কণ্ঠে উষা বলিল—যা তা বকবেন না, সরুন্!

—বাব্বা! যেন লড়ায়ে ঘোড়া! অন্যায়টা কী বলেছি! তুমি কী আমার বৌ নও?

—পাগলা'ম করবেন না, রাস্তার মধ্যে!

—কেন, মিছে বলিছি?

—নিশ্চয়! আমি আপনাকে চিনিও না।

—আজ না চিন্‌লে, দুদিন পরে তো চিন্‌বে! হেঁ, বাবা! তখন দেখে নেব, কেমন তুমি রাস্তার মাঝে পুরুষ মানুষের সঙ্গে ইয়ারকী দাও!

—ভগবান করুন! আপনাকে চিনবার সুযোগ আমার যেন কোন দিন না হয়!

—না হয়, বল্‌লেই হ'ল কিনা! বিয়ের সব ঠিক্। দে'খ উষা। তোমাকে আমি আগে থেকে ব'লে রাখ্‌ছি; কিন্তু ঐ সব ছোঁড়া-টোঁড়ার সঙ্গে গল্প গুজব আমি মোটেই পছন্দ করি নে, তোমার রূপ দেখে, ভেবেছিলুম বুঝি খুব শান্ত, কিন্তু কথা ক'য়ে দেখ্‌ছি, তা নও।

—পথের মধ্যে আপনার উপদেশ শুনবার সময় আমার নেই।

—সে ঠিক্ কথা। আর কদিন পরে তোমাকে ঘরে বসিয়ে ব'লব সব—এখনও আমার অনেক কথা তোমাকে বলবার আছে। দূর থেকে তোমায় দেখে আমি আসছিলুম, কিন্তু ঐ বাবুটির সঙ্গে তুমি এমন গল্পে মজলে, যে ফেরবার নামই কর না। ওর ওপর আমার এমন রাগ হচ্ছিল, যে দিই দু'ঘা।

—থামুন, আপনি।

—ধমকাচ্ছ কেন? আমি তো তোমাকে কত মিষ্টি ক'রে বল্‌ছি! স্বামীর সঙ্গে কী মেয়েরা এমন ক'রে কথা কয়! একটু হাস না! একবার তোমার হাসিমুখ দেখি!

উষা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,

—আপনার স্বামীগিরির সময় এখনও আসে নি!

—দেরী-ই বা কী আছে! মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে তুমি একজন যোয়ান লোকের সঙ্গে হাসি তামাসা করবে, আর পুরুষ হ'য়ে তাই আমি দাঁড়িয়ে দেখব, তাই ভেবেছ তুমি! ক-খ-খ-নো না! সে ছেলে আমি নই—তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, উষা—তুমি আমার বাকদত্তা—আমার কথা শুনতে তুমি বাধ্য!

কখ-খন না!

কী! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, তবুও আমার কথা শুনবে না?

—যতক্ষণ তা না হয়েছে, ততক্ষণ আমাকে কিছু বলবার অধিকার আপনার নেই।

—হুঁ নেই বললেই হ'ল! তবে কার আছে শুনি—ঐ বাবুটির বুঝি?

—আমার বাবার!

—তোমার বাবা তো আমার হাতেই দিচ্ছেন তোমাকে!

—কিন্তু এখনও দেন নি!

—ও দেওয়াই হ'য়ে গেছে!

উষার দেরী দেখিয়া জনার্দ্দন তাকে ডাকিতে যাইতেছিলেন, দূর থেকে ননীগোপালকে উষার কাছে দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য, পরে বিরক্ত হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বে ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ জনার্দ্দন কখনই পছন্দ করেন না। কাছে আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—

—ননীগোপাল! তুমি এখানে কেন?

জনার্দ্দনকে দেখিয়া ননীগোপাল ভয় পাইয়া গেল। সে ভাবে নাই যে জনার্দ্দন এ সময় আসিতে পারে।

জনার্দ্দনের কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা যে সঙ্গত হইবে না, তা বুঝিয়া ননীগোপাল বলিল—

—আজ্ঞে—এদিকে বেড়াতে এসেছিলুম্!

—হুঁ! একটা কথা তোমাকে বল্‌ছি আমি—মনে রেখো—আমি প্রাচীনপন্থী—বিয়ের আগে দেখা শোনা হওয়া আমি ভালবাসিনে। যতদিন না বিয়ে হয়, ততদিন তুমি এ রাস্তায় এসো না।

—আজ্ঞে!

—বুঝেছ?

—হ্যাঁ।

—উষাকে কিছু বলেছ তুমি?

—আজ্ঞে না! এই মাত্র তো আমি এলুম, তখনি আপনি এসেছেন!

—আচ্ছা যাও। জনার্দ্দন উষাকে লইয়া ফিরিলেন।

(২৩)

আজ এত দেরী হ'ল যে?

জননীর দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল—রাস্তায় উষার সঙ্গে দেখা হ'ল।

ছেলেকে জল খাবার দিয়া, আশা দেবী বলিলেন—

—তার নাকি বিয়ে?

—তুমি কার কাছে শুনলে?

হরিমতী বল্‌লে। সত্যিই তার বিয়ে হচ্ছে না কি?—

—হুঁ।

আশা দেবী বুঝিয়াছিলেন অরুণ উষাকে ভালবাসে, শুধু যদি তাঁর ইচ্ছা হইত তাহা হইলে, ঐ দুটি তরুণ তরুণীকে বিবাহ বন্ধনে তিনি বাঁধিয়া দিতেন।

—উষাকে তুমি তো সেদিন দেখেছ মা? বলিয়া অরুণ জননীর দিকে চাহিল।

—হ্যাঁ, বাবা!

—তাকে তোমার কেমন লাগে?

—বেশ—ভালই।

অরুণ মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া, তারপর বলিল—আচ্ছা মা, সে যদি তোমার বৌ হয়?

—সে তো খুব আনন্দের কথা অরু। কিন্তু তোর ইচ্ছে কী সে জানে?

—জানে।

—সে কী বলে?

—তার বাপের অমতে রাজী নয়।

—সে কথা আমিও জানি অরু, তাই উষাকে বৌ করবার সাধ থাকলেও বলিনি এতদিন!

—তোমার আর দাদুর যদি অনুমতি পাই মা, তবে আমি উষার বাবাকে বলি!

—উষার সঙ্গে তোর বিয়েয় আমাদের কোন আপত্তিই নেই, বরং খুশীই হব আমরা, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মশায় তোর হাতে মেয়ে দিতে সম্মত হবে না!

—একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে ক্ষতি কি?

—না বাবা! তার দরকার নেই, উনি মত দেবেন না!

—তুমি বারণ করো না মা, আমি যাব তাঁর কাছে।

—যাস্‌নে অরু! হয়তো তোকে অপমান হতে হবে!

—উষাও ঐ কথা বলছিল!

—কী বলছিল, উষা?

—তার বাবার কাছে আমাকে যেতে বারণ করলে, বল্‌লে, বিয়ের মত তিনি দেবেন না, শেষে আমাকে অপমান হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হবে—তা সইতে পারবো না।

—সত্যি কথাই বলেছে সে! বাপের মেজাজ সে জানে তোকে যে উষা ভালবাসে, বাবা! বলিয়া সস্নেহে আশাদেবী ছেলের পিঠে একখানি হাত রাখিলেন।

—কিন্তু মা, তার কথা আমি রাখতে পারব না! এ বিয়েয় উষা সুখী হবে না, জেনে আমি চুপ ক'রে থাকবো না!

—কিন্তু চুপ ক'রে না থেকে যে উপায় নেই, অরু!

—তবে কী উষার এই অপমৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?

—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আশাদেবী বলিলেন, তা ছাড়া আর কী করবি বল্‌! তার বাপ এমন বদরাগী, নিজের গোঁ কিছুতেই ছাড়বে না!

—মেয়ে সুখী হবে না জেনেও কী তার মত ফিরবে না!

—না রে, না, তাকে তুই জানিস্‌ নে! তার মতে গোঁড়ামীকে সে সকলের বড় ভাবে! তার মত না হ'লে হয়তো মেয়েকেও ছাড়তে পারে, কিন্তু নিজের মত সে বদলাবে না!

হতাশ কণ্ঠে অরুণ বলিল—তবে উষাকে রক্ষে করবার কী কোন উপায়ই নেই, মা?

আশাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। কোন কিনারাই তাঁর মনে আসিল না।

হরিমতী আসিয়া বলিল—পণ্ডিত মশাইর বাড়ী গিইছিলুম, বল্লেন, "আমার বোন্‌পোর বিয়ে হরিমতী, একটু কাজ কম্মো ক'রে দিস্‌ বাছা!" আমি বললুম, আপনার যে বোন্‌পো আছে তা তো শুনিনি দিদ্‌ঠাকরুণ!

ক্রমশঃ

প্রাচীন বাংলা কাব্যে নদীয়ার দান

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে বর্দ্ধমানের দানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নদীয়া জেলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়। প্রেমদাস ইঁহার গুরুদত্ত নাম—রাশি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। ষোল বৎসর বয়সে ইনি গৃহত্যাগ করেন। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কবি শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হন। কেহ বলেন,—তথায় তিনি গোবিন্দজীর ভোগ রন্ধন করিতেন, আবার কেহ বলেন, তিনি পূজারী হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে অগ্রজের আগ্রহে প্রেমদাস বাটীতে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি কবি কর্ণপূর প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। এই পদ্যানুবাদ গ্রন্থ ১৬৩৪ শকে লিখিত। ১৬৩৮ শকে তিনি বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। বংশীশিক্ষা গ্রন্থে কবি প্রেমদাস আত্মপরিচয় সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুল অবতংশ
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥
তাঁর পুত্র ছয় ছিলা তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম রাধাচরণ মধ্যম
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মনিষ্ঠ ॥

কনিষ্ঠ আমার নাম		মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি		নাম দিলা বিজ্ঞাবলী
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ।

বংশীশিক্ষা গ্রন্থের কাল নির্ণয় সম্পর্কে কবি লিখিতেছেন,—

শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রী বংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিল বর্ণন॥

নবদ্বীপ—কুলিয়া পাহাড়ে ১৪১ শকাব্দে মধু পূর্ণিমায় কবি বংশীবদন দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়ার মাঝখানে		সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম		শ্রীছকড়ি চট্টো নাম
মহাতেজা কুলীন সন্তান।

কুলিয়া পাহাড় গ্রামে প্রাণবল্লভ বিগ্রহ বংশীবদনেরই স্থাপিত। বংশীবদন পরে বিশ্বগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বিশ্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা বংশীবদনের জ্ঞাতি। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বংশীবদন কিছুদিন নবদ্বীপে গিয়া গৌরাঙ্গের বাটীতে অবস্থান করেন। ইঁহার পদসংগ্রহ সরলে-মধুরে মনোহর।

কবি রামচন্দ্র দাস গোস্বামী কবি বংশীবদনের পৌত্র, শ্রীশ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র। ১৪৫৬ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমনান্তে বৃন্দাবন হইতে রামকৃষ্ণ মূর্তি লইয়া প্রত্যাগত হন। বর্ত্তমান বাগানপাড়া ইহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনিই ব্যঘ্র ভল্লুক সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া এই গ্রাম পত্তন করেন। এই গ্রামেই রামকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হয়। অনেকেই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৫০৬ শকে মাঘমাসের কৃষ্ণাতৃতীয়ায় তিরোধান হইয়াছে।

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মভূমি। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে ইনি হরি বল্লভ দাস নামেই পরিচিত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, অলঙ্কার কৌস্তভ ও বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির প্রসিদ্ধ টীকাকার; ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, স্বপ্নবিলাসামৃত, গৌরাঙ্গলীলামৃত ও চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের গ্রন্থকার। ১৫৮৬ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই হরিবল্লভ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়া উঠেন ও বিষয়ে আসক্তি কমিয়া যায়। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে রহিয়া হরিবল্লভ ভক্তি সাধনায় ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ স্থানেই তিনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ১৬২৬ শকে সম্পূর্ণ হয়। ইহার দীক্ষা গুরুর নাম,—কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী। মুর্শিদাবাদ সৈদাবাদে ইঁহার নিবাস ছিল।

কবি বৃন্দাবনদাসের জন্মস্থান নবদ্বীপ। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম নারায়নী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৮ বৎসর বয়সে ইনি ভাগবত রচনা আরম্ভ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে ইহাঁর তিরোধান হইয়াছে। ইহাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রথমে চৈতন্য মঙ্গল নামেই অভিহিত হইত। লোচন দাসও স্বকীয় গ্রন্থের নাম রাখেন চৈতন্য মঙ্গল। অবশেষে বিরোধের মীমাংসাকল্পে বৃন্দাবনজননী নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম রাখেন,—চৈতন্য ভাগবত। ইনি পদকর্ত্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ।—পদসমুদ্র গ্রন্থে ইহাঁর বহুপদ সন্নিবেশিত।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমিও নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে। ১৪৩০ শকে রবি শুক্লপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস ভূমিষ্ট হন। কৃত্তিবাসের প্রপিতামহের নাম নৃসিংহ; উপাধি :ওঝা—নবাবদত্ত উপাধি। নরসিংহের চারিপুত্র। দ্বিতীয় মুরারি; সুপণ্ডিত, সু-কান্তি—সদাশাস্ত্র অনুশীলনে রত। ইহাঁর সাতপুত্র। বনমালী এই সাতপুত্রের অন্যতম। বনমালীর ছয়পুত্র, এক কন্যা, এই বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা, আর কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। ইহাঁরা মুখটি ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান খুলনা জিলার বসন্তপুর গ্রামের কোন বেদার্থদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট দ্বাদশবর্ষবয়সে কৃত্তিবাসের প্রকৃত শিক্ষারম্ভ হয়। বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তিনি গৌড় রাজ সভায় যাত্রা করেন। রাজা কংসনারায়ণ

তখন গৌড়েশ্বর। অতঃপর কৃর্ত্তিবাস রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া রামায়ন রচনা আরম্ভ করেন ১৪৬০ শকে। তিনি মাত্র বাল্মিকীর রামায়ন অনুবাদ করেন নাই; তাঁহার আদর্শ;—অদ্ভুত রামায়ন; পদ্মপুরানীয় রামায়ন ও বাল্মীকীর রামায়ন প্রভৃতি। কৃত্তিবাস সুনিপুন মালাকার। লোকচরিত্রবর্ণনে তিনি সিদ্ধহস্ত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পয়ার ছন্দেই সমধিক। ত্রিপদী মালঝাপ প্রভৃতি ছন্দও অপ্রচুর নহে। কৃত্তিবাস যোগাদ্যার বন্দনা ও শিবরামের যুদ্ধ নামক আরও একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন।

কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায়। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। গঙ্গার মাহাত্ম্যবর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বর্ণনা প্রাঞ্জল। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত; গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিস্তর গ্রাম নগরাদির মনোরম বিবরণ হইতে সন্নিবিষ্ট।

"কৃষ্ণমঙ্গল" রচয়িতা কবি মাধবাচার্য্যের পৈতৃক নিবাস নবদ্বীপ। দুর্গাদাসমিশ্রের দুইপুত্র,—সনাতন আর কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধব। মাধব অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি আচার্য উপাধি লাভ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে ইহার কৃষ্ণমঙ্গল রচনা। এই বিখ্যাত বংশে পণ্ডিত শিরোমনি জগদীশ তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবের বংশীয়গণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করিতেছেন। মাধবাচার্য্যের রচনা প্রসাদ গুনময়।

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুইপুত্র অতিগুনধাম॥
জেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ট কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আবাস॥
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এককন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।
আর এক পুত্র হইল অতি গুনধাম।
শ্রীযাদবমিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।"

প্রসিদ্ধ কবি সাতুরায়ের জন্মভূমি নদীয়া শান্তিপুরের নিকট বৈচি। ইনি আশৈশব কবি। শিবচন্দ্রের সখের দলে ইনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছেন।

কবি জয়গোপাল গোস্বামীর আদি নিবাস শান্তিপুর,—জেলা নদীয়া। ইনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বংশধর। কাব্য-দর্পণ, সীতাহরণ প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি রচয়িতা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটিয়ারি গ্রামে ১৭৫৪ শকাব্দে ২৮ শে চৈত্র কবি বিষ্ণুরাম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। ইনি আশৈশব কবি। ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রামবাল্যলীলামৃত।"

নদীয়া জিলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন ভাজনঘাটে কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম হয়। কৃষ্ণকমল,—বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রসিদ্ধ-শ্রীশ্রীকালু ঠাকুরের বংশাবতংস। কৃষ্ণকমলের পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। মুরলীধরের দুই বিবাহ—দ্বিতীয়া স্ত্রী যমুনা দেবীর গর্ভেই কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন কৃষ্ণকমল ভূমিষ্ট হন। সাত বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেস্থলেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। বৃন্দাবনের সমৃদ্ধ শেঠ পরিবার মুরলীধরের নিকট কৃষ্ণকমলকে প্রার্থনা করিলে তিনি বেগতিক বুঝিয়া পুত্রসহ ভাজনঘাটে আসেন। অতঃপর কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করেন।

অচিরেই তাঁহার কাব্যপাঠ সম্পূর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিক্ষালাভেরও অবসান ঘটে। অনন্যোপায় হইয়া তিনি অর্থার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ-কমল অবিলম্বে ঢাকা যাত্রা করেন। তথায় তিনি উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হন। অতঃপর পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে ঢাকা যাইতে হয়। সে স্থলে কৃষ্ণকমল স্বপ্নবিলাস দিব্যোন্মাদ ও বিচিত্র বিলাস রচনা করেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ "ভরত-মিলন, নন্দহরণ, সুবল সংবাদ প্রভৃতি। অচিরেই তিনি অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। হুগলী জিলার বাঁকিপুর

গ্রামে কৃষ্ণকমলের বিবাহ হয়। তাঁহার ছয় পুত্র ও চারি কন্যা—ইহার সুমধুর শ্রীমদ্ভাগবত কথকতায় এককালে পূর্ব্ববঙ্গে রসতরঙ্গের বন্যা ছুটিত। ইনি "নিমাই সন্ন্যাস" পালাও রচনা করেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইনি বড় গোঁসাই নামে বিখ্যাত। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, প্রসিদ্ধ যাত্রাকর গোবিন্দ অধিকারী, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাগণের অনুবর্ত্তন কৃষ্ণকমলের কবিত্বে স্পষ্টীভূত; কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণকমলের কীর্ত্তনসঙ্গীত মাধুর্য্যরসে একান্ত মনোহর।

নদীয়া জিলার অধীন বাগোয়ানের নিকটবর্ত্তী বাড়ে-বাঁকা গ্রামে ১১৯৮ সালে কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জন্ম হয় রসসাগর ইহার প্রসিদ্ধ উপাধি। পাদপূরণে ইহার প্রচুর শক্তি। ইনি কৃষ্ণসাগরপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দু ও হিন্দিভাষায় রসসাগরের অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষ্ণসাগরে ইহার বিবাহ হয়। শান্তিপুরে ইনি কন্যার বিবাহ দেন। শেষ বয়সে শান্তিপুরেই ইনি বাস করেন। ১২৫১ সালে শান্তিপুরে ইহার দেহান্তর হইয়াছে। পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামাধব রায় রসসাগরের জীবনবৃত্তান্তসম্বলিত "পাদপূরণের" এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সকল পাদপূরণের বিস্তৃত সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গেটেরি গ্রামে কবি রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাকবিতায় ইনি রামায়ন গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬০ শকে ইনি রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহার রামায়ণে ভক্তিরস প্রচুর। কবি রামমোহন একান্ত রামভক্ত ছিলেন; স্বগৃহে তিনি সীতার বিগ্রহ স্থাপিত করেন।

বাংলা ভাষায় নদীয়ার দান সামান্য নহে।

অনিন্দিতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী

যাঁহারা বর আসিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বর নামাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তিকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত বর বেশে দেখিয়া কিছুতেই তাহাদের অনুর বর বলিয়া আগ্রহ দেখাইতে পারিলেন না। কেহই ভাবিতে পারিল না, কাল মেয়ে বলিয়া অনুর জ্যাঠা মহাশয় এই প্রৌঢ় অসুন্দর ব্যক্তিটীকে জামাতা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছেন।

কেহই বরকে গাড়ী হইতে নামাইবার উৎসাহ প্রকাশ করে না, পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, মনে মনে বলে, পিতা হইয়া মহিম প্রসাদ শেষে অনুর জন্য এই জামাতা নির্ব্বাচন করিলেন? এতগুলি হৃদয়ের স্নেহ যেন নীরবে কাল মেয়ে অনুর উপর বর্ষিত হইতে থাকিল।

ফুলীর স্বামী সতীশও সেখানে ছিল। সে চিরদিনই দুরন্ত অনুকে বাড়ীর আর সব মেয়েদের চাইতে যেন একটু বেশী ভালবাসে, তাই বিবাহ বেশে সজ্জিত যে বর আসিয়া তাহাদের দরজায় দাঁড়াইল, তাহাকে সে অনুর ভাবী স্বামী বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিল না। এ দিকে একটা কিছু করা দরকার, অথচ কেহই বর নামাইতে আগ্রহ দেখায় না দেখিয়া সতীশই অগ্রসর হইয়া বরের গাড়ীর নিকট গেল।

বর তখন পুষ্প চন্দন শোভিত বিরাট বপু লইয়া অতি গম্ভীর মুখে, যেন পরম বৈরাগ্য আসিয়াছে, ভাব দেখাইয়া নির্লিপ্ত ভাবে চক্ষু মুদিয়া আট ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন সাধারণতঃ বরেরা হয় চতুর্দ্দোলে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়াই বিবাহ করিতে আসিত। মোটারকারে বর আসার চলন তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে।

সতীশ অনুর দাদা, বিবাহ হইলে বর ভগ্নীপতি হইয়া

তাহার ঠাট্টার সম্পর্ক হইবে, তাই অগ্রসর হইয়া সে ঠাট্টার স্বরে বলিল,—

"কি হে বর, বেশ ত সেজে গুজে গোরাব্যাণ্ড বাজিয়ে আমাদের দরজায় এসে গাড়ী থামালে, কিন্তু বাড়ী ভুল করনি ত হে? এখন নতুন বৎসরের আরম্ভ, বৈশাখ মাস, শুধু তুমিই নয় অনেকেরই এ দিনে বর সাজবার সাধ গিয়েছে; আর খান কয় বাড়ী পরে ক্ষান্তদের বাড়ীতেও আজ বরের শুভাগমন হবার কথা, এবং এই গলিটার শেষ ঠিক বড় রাস্তার মাথাতেই যে চারতালা নীল রংয়ের প্রকাণ্ড বাড়ীটা সেখানেও সানাই বাজছে, অতএব তুমি সে সব কোন একটা বাড়ীর ভাগ্যবান জামাতা না হয়ে, আমাদের অনুর জন্যই যে এসেছ তার প্রমাণ বার কর'ত দেখি, এবং প্রমাণান্তে চটপট নেমে পড়ে শুভ কাজ সমাধা কর। গোধূলী লগ্নে বিয়ে, শেষে কি দেরী করে ফেলে লগ্ন উত্তীর্ণ করিয়ে দেবে নাকি?"

বর চক্ষু খুলিয়া কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন লোক যেন দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া চীৎকার করিয়া কি বলিতে বলিতে সামনে অগ্রসর হইতেছে বোধ হইল, এবং সকলের দৃষ্টিই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল।

অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে গলদঘর্ম্ম হইয়া সিল্কের পাঞ্জাবী গায়, চাদর গলায়, মুখে পান একটী লোক দৌড়াতে দৌড়াতে হাপাতে হাপাতে আসিতেছে। ইনি অনুকুলের মামা—বরকর্ত্তা। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়াই আবার চীৎকার সুরু করিলেন।

"ওরে তোরা এখানে থামলি কেন, এ বাড়ী নয়, এ বাড়ী নয়। অনুকুল এগিয়ে চল বাবা, তোমায় যেতে হবে আরও খানকয় বাড়ী পরে। এ বাড়ী নয় বাবা, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।"

ইহার পূর্ব্বেই অনুর পিতাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, জামাতা বলিয়া যাহাকে তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছেন সে ছেলেটী এমন আড়ম্বর সহকারে আসিয়া তাহার জামাতার পদ লইবে না, সে নীরবেই আসিবে। বিবাহের কথা ও সব বন্দবস্ত পাকা করিবার জন্য যখন হরপ্রসাদরা দুই ভাই ভাবী বৈবাহিকের বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন কতজন বরযাত্রী ও কিরূপ সমারোহ সহকারে বর আসিবে সে আলোচনাও হইয়াছিল; কোন কার্য্যবশতঃ সমীরও তখন তথায় উপস্থিত ছিল, এবং কথা প্রসঙ্গে নম্রভাবে মহিমবাবুকে বলিয়াছিল

"বাংলা মুলুকে এত দৈন্য তার ভিতরেও বিবাহে অপব্যয়ের কিছুত অভাব নেই; তবে আবার ব্যাণ্ড বাজিয়ে আলো পুড়িয়ে বর সেজে গিয়ে অন্যদিকেও অকারণ অর্থব্যয় করতে সত্যি আমার কষ্ট হয়; এ টাকাটা ওভাবে নষ্ট না করে অন্য কোন ভাল কাজে খরচ করা সঙ্গত। আমি বিনা আড়ম্বরে বাড়ীর ছেলের মতই আপনাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হব।"

মনোনীত ভাবী জামাতার সেই নম্রতাপূর্ণ ভাবের ভিতর এইরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ স্বরে বলা কথা কয়টী মহিম প্রসাদের কানে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। যদিও তিনি জানিতেন, বাড়ীর মেয়েরা বিয়ের বর গোরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে না এলে মোটেই পছন্দ করবে না, এবং যে বর ব্যাণ্ড বাজিয়ে এল না তার সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে দিতে মন খুঁতখুঁত করিবে এবং মেয়েদের তরফ থেকে এ নিয়ে অনেক অপ্রিয় কথাও শুনিতে হইবে, তবু তিনি স্মিত-হাস্যে তখন উত্তর দিয়াছিলেন—"তাই ভাল, তুমি আমার বাড়ীর ছেলের মতই যেও আমি তাই চাই।" যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ধনী হইতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রায় সকলের বাড়ীতে বাজনা বাঁজাইয়া ধুমধাম করিয়া বর আসিবার রেওয়াজ ছিল; আজকালকার মত পুষ্প চন্দনে বিভূষিত হইয়া মোটরে চড়িয়া নীরবে বর আসার প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। যখন ক্যান্তর বর ব্যাণ্ড বাজাইয়া অনুদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল তখন মহিম প্রসাদ নিঃসংশয়ে জানিতেন, এ ব্যাণ্ড বাজাইয়া যে বর আসিয়াছে সে আর যে কোন বাড়ীরই হউক না কেন তাহার বাড়ীর নয়। তাই তিনি বর নামাইতে বাহিরে আসা প্রয়োজন মনে না করিয়া নিজ কাজ লইয়া ভিতরেই ব্যস্ত ছিলেন। যখন একটা গোলমাল ও "অনুর বর আসিয়াছে, অনুর বর আসিয়াছে" শব্দ কানে গেল তখন তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন যেখানে বাড়ীর সকলে ব্যাণ্ড বাজাইয়া বর আসিবে মনে

করিতে আনন্দ বোধ করে সেখানে মহিমবাবু তাহার জামাতা নীরবে আসেন তাহাই পছন্দ করেন।

তিনি আসিয়া বর দেখিয়াই ভুল বুঝিলেন ও ধীরভাবে বলিলেন, "এ বাড়ীর বর ব্যাণ্ড বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আসিবে না, সে বিনা আড়ম্বরে নীরবেই আসিবে।"

ইতিমধ্যে বরের মামা তাহার দলবল লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরবেশে সজ্জিত প্রৌঢ় ব্যক্তি অনুকূল বর্দ্ধনকে দেখিয়া স্নেহপ্রবণ মহিমপ্রসাদের হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হইল। ক্ষান্ত পাড়ারই মেয়ে, জন্মাবধি তাহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, সে যে তাহার শ্যামলীরও ছোট, সেই ছোট্ট মেয়েটীর এই বয়স্ক স্বামী—ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হইল।

এদিকে ক্ষান্তর বর খানিকটা অগ্রসর হইয়া যাওয়ায় ব্যাণ্ডের শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল এবং কি ভাবিয়া অনুদের বাড়ীর বিবাহের শানাইও হঠাৎ থামিয়া গেল। ছেলে-মেয়েরা বর আসিয়াই এত শীঘ্র চলিয়া গেল, দেখিয়া 'এ আবার কেমন বর' ভাবিয়া খেলা-ধুলা কান্নাকাটি ভুলিয়া কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিল, ভিতরে মেয়েরা সমস্ত খবর না জানিয়া বর আসিয়া চলিয়া গেল ভাবিয়া আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং বৃদ্ধারা অমঙ্গল আশঙ্কায় জোরে জোরে ইষ্টনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই নয়, হাসি ঠাট্টায় উড়াইয়া দিবার বিষয়, কিন্তু সব মিলিয়া বাজার বন্ধ হইয়া ছোটদের কোলাহল থামিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবাহ বাড়ীটা হঠাৎ যেন কেমন নিঝুম হইয়া গেল। যেন একটা অজানিত কিছু ঘটিয়াছে, অথবা এখনই অমঙ্গল একটা কিছু ঘটিবে এমনই একটা থম্‌থমে ভাব।

এমন সময় বিনা আড়ম্বরে প্রায় নিঃশব্দে খানকয়েক মোটরকার আসিয়া অনুদের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহারই একখানা গাড়ীতে তিনজন বন্ধুসহ, ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত যে ছেলেটী বসিয়াছিল সেই যে অনুর বর তাহা কেহ ভাবিতেও পারিল না। সতীশ ও অন্যান্য সকলে যাহারা তখনও সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা ভাবিল মোটারে করিয়া যাহারা আসিয়াছে তাহারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরই কেহ হইবে; তাই তাড়াতাড়ি বর নামাইবার আগ্রহ সতীশরা প্রকাশ না করিলেও, সমীরের চোখে এমন একটা কৌতুকপূর্ণ আনন্দের দীপ্তি, মুখে এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ ছাপ ও ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ছিল, যে কেহ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াও পারিল না।

বরকর্ত্তারা নামিয়া পড়িলেন। মহিমবাবু নিকটেই ছিলেন, অগ্রসর হইয়া নতুন কুটুম্বকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। আগ্রহভরে সমীরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ক্ষান্তর বর দেখিয়া তাহার মনে যে একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহা যেন এ সুদর্শন ছেলেটিকে কাছে পাইয়া একেবারে মুছিয়া গেল।

তখন আবার বিবাহ বাড়ীতে চীৎকার গোলমাল সুরু হইল। বাড়ী ভুল করে বেনেদের বর তাদের বাড়ী থেমেছিল, এবং তাহাকেই অনুর বর ভেবে সকলে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি আলোচনা করিয়া সকলের ভিতরেই বেদম হাসাহাসি সুরু হইল। সানাইয়ে বাজনা ধরিল; ছেলেমেয়েরা "এবার সত্যি বর এসেছেরে" আমাদের বাড়ীর বর এসেছে বলে চীৎকারসহ ভিতরে বাহিরে মহা ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত বাড়ী হঠাৎ আবার বিবাহের উৎসবে শঙ্খের আওয়াজে জাগিয়া উঠিল।

সবাই জিজ্ঞাসা করে, "কৈ বর এল, বাজনাতো কিছু শুনতে পেলুম না।"

উত্তরে জান্‌তে পায়—বর নীরবেই এসেছে।

তারপরেই আবার শোনা গেল—"এ আবার কি, চোরের মত লুকিয়ে ছাপিয়ে বর আনা। একটু বাজনা বাদ্যি নেই। গোধূলী লগ্নে বিয়ে বলে না হয় আলোর খরচটা কমালে কিন্তু তাই বলে দুটো "গোরাব্যাণ্ড" বাজিয়েও কি বর আসতে পারেনা? একি বাপু বর আনা, ছি, ছি, ছি।"

অপরা বলে—"ছেলে মেয়েরা সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিদির বর আসা দেখবে বলে। ওমা, বর এল তা কিছু জানবারও উপায় নেই, এমন তর লুকিয়ে বর আনাত কখনো দেখিনি ভাই।"

অনুর বৃদ্ধা পিসিমা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ওদের কুটুম ভাল বলেইত হরপ্রসাদের কাছে শুনেছিলাম ও

বেয়াই এমন কৃপণ যে কটা টাকা খরচ করে বাজনা বাজিয়ে যে ছেলে নিয়ে আসবে তা পারলেনা। গোড়াতেই কৃপণতার যা নমুনা পাচ্ছি, সেঘরে গিয়ে আমাদের অনু কিভাবে থাকবে কি জানি।"

এই রকম আক্ষেপ যখন খুবই চলিতেছে তখন ধীরপদে মহিমপ্রসাদ তথায় আসিয়া পিসিমাকে বলিলেন—"আচ্ছা ছোড়দি, তোমরা একটু চুপ করে বিয়ের যোগাড় করবে কিনা। এদিকে বিয়ের সময় প্রায় হয়ে এল। নতুন বেয়াইকে না জেনে দোষ দিওনা। ঘটা করে বাজনা বাজিয়ে বর না আসায় অর্থের অপব্যয় হতে পারলনা বলে, তোমাদের সকলের এত আপশোষ কেন বলত। শ্যামলীর বিয়ের বর আসা পর্ব্বটা না হয় নীরবেই সম্পন্ন হল, তাতে ত সত্যি বিয়ের কোন অঙ্গহীন হচ্ছেনা। উঠে এসে এখন সব দিকের ব্যবস্থা কর ছোড়দি।"

পিসিমা তাহার এই স্বল্পভাষী ছোট ভাইটিকে খুবই চিনিতেন, কাজেই এখন স্বমত বজায় রাখিবার জন্য ওকালতী করা করা সম্পূর্ণ বৃথা জানিয়া তিনি নীরবে স্বকাজে উঠিয়া গেলেন।

যাহাই হউক শীঘ্র এ সব আপশোষ থামিয়া গেল শঙ্খ উলুধ্বনির ভিতর জামাতাকে বরণ করিয়া লওয়া হইল ও সুদর্শন সুশ্রী বর দেখিয়া মেয়েদের গোরা বাজনা না বাজাইয়া বর আসার দুঃখ ও কিছু নিবৃত্ত হইল।

সকলে যখন জানিল এই সুন্দর ছেলেটিই অনুর বর এবং বিবাহের লগ্নও নিকটবর্ত্তী তখন বসন ভূষণ অলঙ্কারে সজ্জিতা অনুকে আবার একটু ভাল করিয়া সাজাইতে কণে-চন্দন পরাইতে মেয়েরা অনুর ঘরে আসিয়া ভীড় করিল। ফুলী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"ও ভাই চিঠা চিকু চির চিঝি চিএ চিসে চিই চিম চিতা চিলী চিসে চিদি চিন চিরা চিত্রে চিম চিকে চিদে চিখে চিলি, চিত্র চিভা চিই চিসে চিই চিলো চিক! আমি সত্যি বলছি ভাই, এর চিচো চিখ চিচু চিট ঠিক সেই রকম বড় বড় আর লাল। শেষে কি চিমা চিতা চিল তোর বর হবে ঠাকুরঝী।

পূর্ব্বেই বলেছি অনু ও ফুলীর নিজেদের ভিতর কতক গুলি কথা আছে যাহার অর্থ শুধু তারা দুটিতেই জানে তাই এক অনু ছাড়া ফুলীর উপরোক্ত কথার অর্থ কাহারই বোধগম্য হইল না; হইলে তখন সকলের মুখই শুকাইয়া যাইত, এবং তাহারা অনুকে ছাড়িয়া কাকে ফুলী "চিএ চিই চিমা চিতা চিল" বলিল তাহাকে দেখিতে ছুটিত, এবং সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই এ বিবাহের ফল শুভ হইত, মিথ্যা সন্দেহ কাটিয়া গিয়া অনু সুখী হইতে পারিত, কিন্তু তাহা আর হইলনা। অনুর ঘরে তখন যাহারা ছিলেন তাহারা কেহই চিমা চিতা চিল কথার অর্থ জানিতে পারিলেন না।

কাকীমা বলিলেন—"চলে যা ফুলী তুই এখান থেকে। অমন চিলের মত চি চি করে এখন পাড়া মাথায় করিসনি। নতুন বর এল এখন একটু স্থির ভাবে চলা ফেরা কর আস্তে আস্তে কথা বল তা নয় মেয়ে গলা ফাটিয়ে চি চি সুরু করেছেন।"

মাসীমা বলিলেন—"দিদির (অনুর মা) আদরেই ফুলী নষ্ট হ'ল। দিদির কাছে থাকলে ফুলী আর ভাল হবেনা।" (এখানে জানিয়ে দেওয়া ভাল বৌমা বৌদি মামীমা, কাকীমা, কোন ডাকেই ফুলী সাড়া দেয়না সে জানে সে ফুলী; সে ও সব সম্পর্কীয় নামের ধার ধারেনা বাড়ীর ছোট বড় সকলেই তাকে "ফুলী" বলে ডাকে।

ফুলী আবার "ঠাকুরঝী" বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সবাই তাকে ধমকালেন; সেই সময় অনুর মা কোন কাজে সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি ব্যাপার দেখিয়া ফুলীর নিকটে আসিয়া তাহার মাথাটা নিজের বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"তোর কি কোন কালেই বুদ্ধি হবে না, ফুলী, এখন বউ-মানুষের অত জোরে চেঁচাতে নেই, আস্তে আস্তে কথা বলতে হয়।"

ফুলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে আস্তেই কথা বলিবে। মুখে বলিল—"আমি ঠাকুরঝীর কাছে যাব।"

অনুর মা বলিলেন—"তা যা শ্যামলীর কাছে কিন্তু ঝগড়া করিসনি যেন।"

ফুলী বলিল—"আচ্ছা।"

অনুর মা নিজ কাজে চলিয়া গেলেন, এবং ফুলী আবার অনুর দিকে অগ্রসর হইতেই কাকীমা মাসীমা তাহাকে বকুনী দিয়া ওখান হইতে চলিয়া যাইবার তাড়া দিলেন।

তখন বিয়ের ক'নে অনু কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তোমরা সবাই মিলে ফুলীকে অত বকছ কেন, ফুলী আমার কাছে একটু আস্‌তে চায়, আমাদের দুজনের একটু কথা আছে।"

পিসিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"কি জানি বাপু তোদের কি কথা। কথা থাকে ভাল করে বল সবাই শুনুক, তা নয় কি যে তোরা চি চি করিস, তার এক বর্ণও যদি কেউ বোঝে। যা ফুলী যা, কি কথা তোদের আছে বল, কিন্তু দেখিস যেন অনুর কানে মন্ত্তর পরান খারাপ করে দিস্‌নি।"

ফুলী যে শুধু দুরন্তই ছিল তা নয়। দুষ্টামী বুদ্ধিও তার পেটে কিছু কম ছিল না। অনুর মায়ের কাছে কেবল ফুলী যেন শান্ত ছোট শিশুটী। তিনি ছাড়া বাড়ীর কেহই ফুলীকে এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাই ফুলী যখন বিয়ের ক'নের কাছে না গিয়ে ছাড়বে না দেখা গেল, তখন পিসিমা সাবধান করে দিলেন যেন সে অনুর সাজ সজ্জাতে হাত না দেয়।

ফুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনুর গা ঘেঁসিয়া বসিল। অনু এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া ধীর কণ্ঠে খুব আস্তে আস্তে ফুলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কি সত্যি বলছিস ফুলী?" ফুলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে এখন সত্য কথাই বলিতেছে।

অনু বলিল—"আমার বিশ্বাস হয় না ফুলী। তুই আবার গিয়ে ভাল করে দেখে এসে আমায় খাটি সত্যি কথা বলবি।"

ফুলী উত্তর দিল—"চিআ, চিচ্ছা=(আচ্ছা)।"

সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে ঠেলিয়া, উহাকে সরাইয়া ফুলী দ্রুতগতিতে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

অনুর দাদারা যখন অনুকে লইয়া বিবাহ স্থলে যাইবার জন্য নীচে নামিতেছে তখন অর্দ্ধপথে ফুলীর সঙ্গে সিড়িতে দেখা। অনু জিজ্ঞাসুনেত্রে নীরবে ফুলীর দিকে চাহিল, যেন তাহার দৃষ্টিই বলিল—"কি ফুলী, কি খবর?"

ফুলী উত্তর দিল—"ঠাকুরঝী সত্যি বল্‌ছি ভাই, এ সেই চিমা চিতা চিল। আমি কাছে গিয়ে দেখে এলাম, এ সেই চিমা চিতা চিলের বড় বড় চোখ।"

মুহূর্ত্তে অনুর মুখ হইতে সমস্ত রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত যেন কে শুষিয়া লইল। হঠাৎ উজ্জল চোখ দুইটী অতি দীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াই একবারে যেন নিবিয়া গেল। সে দাদাদের যেন কি বলিতে গেল কিন্তু একটি মাত্র শব্দও যেন মুখের বাহিরে আসিল না। সে তেমনই নীরবে ফুলীর মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া চক্ষু নত করিল।

অনুর মুখের ঐ শঙ্কাতুর বিবর্ণতা ও নিষ্পন্দতাব দেখিয়া ফুলী ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরঝী, তোর কি হ'ল ভাই?"

সকলে চাহিয়া দেখে অনুর মুখ যেন একবারে রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে ও সে অত্যন্ত ঘামিতেছে। দাদারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে অনু কি হ'ল? শরীর খারাপ লাগছে?"

নীচে তখন চীৎকার সুরু হইয়াছে—"কৈ সময় হওয়ে এল যে, শীঘ্র ক'নে নিয়ে এস, আর দেরী করা নয়। গোধুলী লগ্নে বিয়ে, আলো থাকতেই আরম্ভ করতে হয়; শীঘ্র কর, ক'নে আনতে দেরী হচ্ছে কেন?" ইত্যাদি।

দাদারা ভাবিল বৈশাখের এই গুমট গরমে নতুন শাড়ী জামা এত অলঙ্কার ইত্যাদি পরায় অনুর কষ্ট হইতেছে ও তাই গরমে এত ঘামিতেছে।

সতীশ বলিল—"যা ত ফুলী, চট করে ভাল মেয়ের মত একখানা পাখা এনে দেত দেখি।"

ফুলী বিনা বাক্য ব্যয়ে লক্ষ্মী মেয়েটীর মত কোথা হইতে একখানা পাখা আনিয়া দিল, ও পাখার হাওয়া করিতে করিতে হর্ষ কোলাহল, শঙ্খ উলুধ্বনির ভিতরে সকলে অনুকে আনিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত করিল।

অনুকে বিবাহ সভায় পৌছাইয়া দিয়া, আমায় এখন অনুর বিবাহের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের এক ঝঞ্ঝা বৃষ্টি সমাকুল রাত্রির কথা বলিতে হইতেছে। ইহা পাঠে জানা যাইবে কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় অনুর মুখ হঠাৎ অমন রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হইয়াছিল, আর কেনইবা ফুলী বর দেখিয়া আসিয়া অনুকে বলিল—"এ সেই চিমা চিতা চিল।"

ফুলী বর দেখিয়া আসিয়াই দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া "চি" দিয়া অনুকে যে সব কথা বলে তাহার সমস্ত অর্থ এই "ও ভাই ঠাকুরঝী, এ সেই মাতাল। সে দিন রাত্রে

যাকে দেখেছিলি, এ ভাই-সেই লোক। আমি সত্যি বলছি ভাই এর চোখ দুটা ঠিক সেই রকম বড় বড় ও লাল। শেষে মাতাল তোর বর হবে ঠাকুরঝী।"

এই রকম ফুলী-অনুতে "চি" দিয়া যত কথা হইয়াছে তাহার প্রথম অক্ষর "চি" ছাড়িয়া দিলে ও দ্বিতীয় অক্ষর সব পর পর সাজাইয়া পাঠ করিলে, মর্ম্মার্থ বোঝা যাইবে। যেমন "চি" দিয়া কথা—"চিআ চিচ্ছা," ইহার প্রথম চি বাদ দিলে থাকিবে "আ" ও দ্বিতীয় চি ছাড়িলে থাকিবে "চ্ছা" এই অক্ষর পাশে পাশে রাখিলে হইবে "আচ্ছা" তেমনি "চিমা চিতা চিল" ইহাদের 'চি ছাড়িয়া পড়িলে হইবে "মাতাল।"

এখন মোট কথা এই বোঝা যায়, বরবেশে যে ছেলেটী অনুকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে সে যে "মাতাল" সে বিষয়ে ফুলী নিঃসন্দেহ; এবং অনু ও ফুলী সেই মাতালকে কোন এক রাত্রে পূর্ব্বেই দেখেছিল।

অনুর বিয়ের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের কথা। সেদিন বিকেল থেকেই ভীষণ কাল বৈশাখীর ঝড় সুরু হ'ল। ঝড়ের সে কি দাপাদাপি ছুটাছুটী, যেন জলস্থল একাকার করে দিয়ে বিশ্ব সংসার গ্রাস করতে চায়। সন্ধ্যার পর ঝড়ের প্রবল প্রতাপ কমে এসে অল্প অল্প বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়া সুরু হ'ল, আর সেই দিন এত বেশীক্ষণ ধরে শিল পড়ছিল যে অত বেশী শিল পড়া অতি বৃদ্ধরাও জীবনে দেখেছিলেন কিনা মনে করতে পারছিলেন না। কলকাতার রাস্তা ঘাট, লোকের বাড়ীর বাইরের সব রক (বারান্দা) শিল পড়ে একবারে ঢেকে গিয়েছিল। শেষে শিল পড়া যদিও বা বন্ধ হ'ল কিন্তু রীতিমত ঝোড়ো বৃষ্টির বিক্রম আরম্ভ হল। অল্পক্ষণের ভিতরেই কলিকাতার সব রাস্তায় ও অনেক গলিতে হাটু সমান ছেড়ে কোমর সমান জল জমে উঠল।

অনু ও ফুলী সেদিন সমস্ত বিকেলটা ছুটাছুটী করে ও ওপর নীচু থেকে শিল কুড়িয়ে খেয়ে ও মাঝে মাঝে দিদি বউদিদের খাইয়ে নিজেদের গা মাথা, ও পরনের কাপড় সেমিজ ভিজিয়ে জবজবে করে তুলেছিল। সন্ধ্যার সময় অনুর মা তা দেখতে পেয়ে তাদের বকাবকি করে জামা কাপড় ছাড়িয়ে ঘরের ভেতর বন্দী থাকতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার মত সাহস বাড়ীতে কাহারও ছিল না; এই স্বল্পভাষিণী মহিলা পরম স্নেহ মমতার সহিতই সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। অনু ও ফুলী তখন বাইরে দুষ্টামী করতে না পেরে ঘরের ভেতর এসে লক্ষ্মী মেয়ে দুটীর মত জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে লাগল।

তখন আপিষ আদালত মাত্র বন্ধ হয়েছে—সবাই বাড়ী ফিরতে ব্যস্ত। এই জল পড়ে বেচারা আপিস ফেরত বাবুদের দুর্দ্দশার এক শেষ। রাস্তায় অত জল হওয়ায় মোটার গাড়ী ট্রাম ইত্যাদি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, কারণ ইঞ্জিনে জল ঢুকে যায়, কাজেই যে সব বড় বাবুরা মোটারের সাহায্যে আপিষে আসিয়াছিলেন ফেরবার পথে তাহাদের ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীর শরণাপন্ন হয়ে তবে বাড়ী পৌছাতে হ'ল। আর "পা গাড়ী" সম্বল বাবুরা পায়ের জুতো জোড়াটী খুলে হাতে নিয়ে, প্রথম কোঁচার কাপড় একটু গুটিয়ে উঁচু করে পরে মালকোচা মেরে ও শেষে উপায়ান্তর না দেখে, যতদূর সম্ভব উঁচু, প্রায় কোমর পর্য্যন্ত তুলেও যখন দেখলেন যে পরনের কাপড় আর রাস্তার জল থেকে ভেজার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন সে দিকে নিতান্ত নিরাশ হয়ে জুতো জোড়ার ওপরে সর্ব্ব মনোযোগ ঢেলে দিলেন। কাপড় ত ভিজলেই—কিন্তু জুতো, তাতে যেন জল না লাগে এই সদিচ্ছায় প্রায় সকলেই জুতোদ্বয়কে যতদূর সম্ভব রাস্তার জল ও উপরের জলের ছাট থেকে বাঁচিয়ে ছাতার নীচে বগলদাবায় নিয়ে, পথের জল কাঁদা ভেঙ্গে যতদূর জোরে পা-গাড়ীকে চালান সম্ভব চালিয়ে যে যার গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

অনু ও ফুলী খানিকক্ষণ বাইরের এই সব দৃশ্য দেখে আর চুপচাপ দুষ্টুমী ছাড়া জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল না লাগায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে না হ'তেই বামুন ঠাকুরকে খুব তাড়া দিয়ে কোন রকমে ডাল, আলুভাজা ও ভাত করিয়ে নিয়ে, রাত্রে খাবারের ব্যাপারটা সমাধা করে ফেলে নিজেদের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে। অত সন্ধ্যা রাত্রে খেয়ে এসেই কিছু বিছানায় যেতে তাদের ভাল লাগে না, তাই অনু একখানা ডিটেকৃটিভ গল্পের বই টেনে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে সুরু করলে ও ফুলী তার

ক্রুশের লেশটা নিয়ে বুন্‌তে বুন্‌তে গল্প পড়া শুনতে লাগল।

ফুলীর শুধু নামেই বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু সে তখনও ছিল যেন বাড়ীর কুমারী মেয়ে। ফুলীর অতি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় সে বাড়ীর অবিবাহিতা সব মেয়েদের সঙ্গে এমন ভাবে প্রতিপালিতা হ'য়ে আস্‌ছিল যে তাহার বিবাহের পর আট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও কাহারও মনে উদয় হইল না যে ফুলী সে বাড়ীর বধূ, অবিবাহিতা কন্যা নয়! অন্য বধূদের পিত্রালয় যাতায়াত আছে জন্য, তবু মনে হয় তাহারা অন্য বাড়ীর মেয়ে, কিন্তু ফুলীর পিত্রালয় যাবারও উৎপাত নাই। তাহার পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়া নতুন স্ত্রী সহ কার্য্য উপলক্ষে আসাম গেছেন ও সেখানেই বসবাস করবেন মতলব করেছেন। ফুলীর নয় বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতা ফুলীকে একবার আসামে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে দিন দুই থেকেই ফুলীর সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে এমন বিতৃষ্ণা বোধ হল, যে সে শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসবার জন্য কচি মেয়ের মত দুই পা ছড়িয়ে বসে চীৎকার করে কান্না সুরু করে দিলে। ফুলীর পিতা কন্যার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে দিন কয়েক পরেই ফুলীকে শ্বশুরালয় পাঠিয়ে দিলেন।

কলকাতায় এসে ফুলী দুইহাতে অনুর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—"বড়মা, আমি আর বাবার কাছে যাব না, তোমার কাছে থাকব।"

অনুর মা তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, মাতৃহীনা কন্যার কোন অভাবই পিত্রালয় গিয়ে পূর্ণ হয় নি; কোন আব্দারই পিত্রালয়ের লোকেরা সহ্য করতে পারেনি। তিনি পরম আদরে ফুলীকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে বললেন—"আচ্ছা তাই হবে, তুমি আমার কাছেই থেকো। তোমায় আর আমি সে আসামের ঘোর জঙ্গলে পাঠাব না।"

সেই হইতে ফুলীর পিতাও কখন ফুলীকে তাহার নিকট নিবার নাম করেন নাই, আর তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল যে ফুলী তাদের বাড়ীর বউ, তার পিত্রালয় বলে অন্য কোন স্থান আছে।

ফুলী এখন ১৫ বৎসরের মেয়ে, কিন্তু তাহার গড়ন বয়স অনুযায়ী বাড়ন্ত নয়ই বরং কেমন যেন রোগাটে ধরণের ভাব। এ কয় বছরে মাথায় সে বেশ একটু ঢেঙ্গা হয়েছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ তাকে দেখলে ভাববে সে ১১।১২ বছরের রোগা ঢেঙ্গা মেয়েটী, আর তার কপালের ফোঁটা ও সিঁথির সিন্দুর সাক্ষ্য দেবে সে বিবাহিতা।

অনুর দেহের গড়ন আবার ঠিক ফুলীর উল্টো। সে খুব বেশী বাড়ন্ত। ১৪ বছরের মেয়ে, বয়স না জানলে বাইরের লোক ভাববে ১৭ বছরের। লম্বায় খুব বড় না কিন্তু দেখতে বেশ গোলগাল এতখানি মেয়ে।

আগে ফুলী ও অনু একখাটে অনুর মায়ের ঘরেই ঘুমাত। সম্প্রতি প্রমোশন হ'য়ে তারা নিজেদের জন্য আলাদা ঘর পেয়েছে। অনুদের কোন নিকট আত্মীয়ের তিনটী শিশু মাতৃহীন হওয়ায় অনুর মা তাদের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিজের নিকট আনেন, এবং সেই মাতৃহীন শিশুরাই এসে অনু ও ফুলীর খাট দখল করে।

বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের দেশের খুব কম মেয়েই, বিশেষ যাদের বয়স ১৪।১৫র ভেতর আবদ্ধ তারা আলাদা নিজস্ব একটা করে ঘর পায়। সাধারণতঃ সেই সব মেয়েরা নিজেদের ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গে একত্রে একঘরে ঘুমায়; তাই অনুও মায়ের ঘরে ঘুমাত, এবং ফুলীও বাড়ীর মেয়ে হিসাবেই অনুর সঙ্গে এক বিছানায় শোন হয়েছিল। অনুর প্রথমে মাকে ছেড়ে অন্য ঘরে ঘুমাতে মোটেই উৎসাহ ছিল না, কিন্তু ফুলী যখন বল্‌লে—"দেখ ভাই ঠাকুর ঝী, সেই ত ভাল। ও ঘরখানা আমাদের একবারে নিজের হবে। আমরা সে ঘরে যখন খুসী দরজা বন্ধ করে দেব কেউ বিরক্তও করতে পারবে না, আর মামীমা কাকীমা কেউ বক্‌তেও আসবে না। তা ছাড়া সে ঘরে আমাদের ইচ্ছামত যত রাত খুসী বই পড়ব, সেলাই করব, গল্প করব, কেউ এতে বিরক্ত হয়ে আলো ও নিবিয়ে দিতে পারবে না।"

তখন অনুর মন মাকে ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়ে ঘুমাতে অনেকটা সায় দিলে। তা ছাড়া সে ফুলীর মত শুধু নিজেদের সুবিধাটা না দেখে এও ভেবেছিল যে "আমি ত এখন বেশ বড়ই হয়ে গেছি, মাকে ছেড়ে ঘুমাতে

আমার আর ভয় করে না কিন্তু ঐ যে তিনটে বাচ্চা, ওদের ত মা নেই, আমার মার কাছেই ওরা এখন ঘুমাক।”

তবু অন্য ঘরে শোবার কথায় সে ঠিক মায়ের ঘরের পাশের ঘরখানাই বেছে নিলে যে ঘরের ভিতরের দরজা দিয়ে মায়ের ঘরেও যাতায়াত করা চলে।

যদিও তারা ভেবেছিল আলাদা নিজস্ব ঘর একটা পেলে ঘরে গিয়ে ছুটীতে তারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থেকে বই পড়বে, সেলাই করবে, কত রকম গল্প করে গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রায় তাদের কার্য্যে পরিণত হয়নি। সেলাই নিয়ে বসে কাজ আরম্ভ করতে না করতে রাত্রি ৯।০টার ভিতরেই নিদ্রা দেবী তাদের আবির্ভূতা হয়ে তাদের সমস্ত কল্পনা জল্পনাই ব্যর্থ করে দিতেন। অনুর মা সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে এসে যখন দেখে যেতেন ঠাণ্ডার দিনে তাদের গায়ের চাদর ঠিক আছে কিনা, ও মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ হ'ল কিনা তখন তারা দুটিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

এসব কথা যাক্ এখন অনুর বিয়ের আগের সেই শিলাবৃষ্টির রাত্রের কথা বলি। অনু ও ফুলী সেই ত সাত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা রাত্রে খেয়ে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বই পড়া লেশ বোনা আরম্ভ করে দিলে, কিন্তু রাত্রি ৯টা না হ'তেই তাদের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছিল, কিন্তু বই খানা সেই রাত্রে শেষ করে ফেলবার আগ্রহ ও খুব। প্রিয়নাথ গ্রন্থাবলীর কোন একটা ডিটেকটীভ উপন্যাস চমৎকার গল্প, শেষ না করে যেন থামাও যায় না, আর তখন মাত্র খান কয়েক পাতাই অবশিষ্ট আছে, এবং ফুলীর লেশেরও তিনটা বরফী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই তারা মনস্থ করলে সে রাত্রে তারা হাতের কাজটুকু শেষ না করে কিছুতে ঘুমাবে না। ঠিক এমন সময় তাদের কানে গেল যেন কতকগুলি লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব হাস্‌ছে ও চীৎকার গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। এমন বৃষ্টির রাত্রে জল কাদার ভেতরে রাস্তায় স্ফূর্ত্তি করে মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াবার সখ গেল কাদের?

অনু ও ফুলী বই পড়া লেশ বোনা ফেলে রেখে দৌড়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়াল। অনুরা সে পাড়ার বহু কালের বাসিন্দা, কাজেই ও পাড়ার ছেলে বুড় সকল পুরুষকেই তাহারা প্রায় চেনে, কিন্তু এখন দেখ্‌লে জলের ভেতর দাঁড়িয়ে যে ১২।১৪ জন ছেলে হৈ হৈ করছে তারা কেহই ও পাড়ার লোক নয়, সবগুলিই অপরিচিত মুখ।

রাস্তার জল তখনও হাঁটু পর্য্যন্ত আছে, সেই জলে আর ঐ দুর্দ্দিনের রাত্রে অন্য পাড়ার ১২।১৪ জন ছেলেকে দেখ্‌তে পেয়ে অনু ও ফুলী খুব কৌতুহলী হয়ে বেশ ভাল করে ছেলেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। অনুরা অনুমান করে নিলে ছেলেরা সকলেই কলেজের পড়ুয়া, আর বয়স তাদের ২৩ থেকে ২৫ শের ভেতরে আবদ্ধ।

সর্ব্ব প্রথম তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটী অতি সুদর্শন সুপুরুষ যুবক। পরণে তার ধুতি, গায় তার সাদা টুইলের সার্ট; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে তারই সমবয়সী অন্য একটী যুবকের কাঁধে চড়ে বসে আছে—মুখ তার নীচু তাই স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেই কাঁধে চড়া লোকটীকে ঘিরেই অন্য সব তার বন্ধুরা হাস্‌ছে, গান করছে পাড়া ফাটিয়ে চীৎকার গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। বুড় ঢেকী একটা লোক অন্য লোকের কাঁধে চড়ে সং এর মত রাস্তায় বের হয়েছে দেখে অনু ও ফুলী আশ্চর্য্য যত হ'ল হাসি তাদের দ্বিগুন বাড়ল, চোখের ঘুম এক মুহূর্ত্তে কোথায় চলে গেল।

অনু হেসে গড়িয়ে পড়ে ফুলীর গলা ধরে বললে—“দেখ ভাই ফুলী লোকটা কি সুন্দর দেখ্‌তে, অথচ কি বোকা, একটুও লজ্জা নেই ভাই। অতখানি বুড় “ধেড়ে গঙ্গারাম” কিন্তু ধরণখানা ঠিক যেন সেজদির খোকা খাঁদু—ধরমসিং এর কাঁধের দুদিকে দু পা ঝুলিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।”

ফুলীও এ কথায় সায় দিয়ে খুব হাস্‌তে হাস্‌তেই বললে—“তুই ঠিক বলেছিস ঠাকুরঝী, “গজদামরা” সুন্দর হ'লে কি হবে, হাঁদা, “গোম্‌রামুখো”। বন্ধুর কাঁধে উঠে হ'তে চাচ্ছে যেন কচি খোকাটি। আর বসেছেও ঠিক আমাদের খাঁদুর মত, দুদিকে দু পা ঝুলিয়ে।”

তারা দুজনে একবার করে জানালার কাছে এসে দেখে যায়, আর দুজনে দুজনকে ধরে হেসে ঘরের ভেতর লুটোপুটী খায়। এ দিকে নীচে ছেলেদের হাসির মাত্রাটাও যেন খুব বেড়ে চলেছে। তারা যে কি বলছে অনুরা দোতালার জানালা থেকে স্পষ্ট কিছু শুন্‌তে পেল না, কিন্তু ঐ আধ

শোনা কথা ও তাদের ভাব ভঙ্গী দেখে এই অনুমান করে নিল যে ছেলেগুলি ঐ গলিরই কোন একটা বাড়ী খুঁজ্ছে কিন্তু কেহই সে বাড়ীর ঠিক নম্বর জানে না। যুবকরা সব খুব ঔৎসুক্য সহকারে গলির দু পাশের বাড়ীর নম্বর দেখ্তে দেখ্তে অগ্রসর হচ্ছিল, আর তাদের হাসাহাসি, গান গাওয়া, এ ওকে ঠেলে দেওয়া কিছুমাত্র না কমে যেন বেড়েই চলছিল।

ছেলের দল যখন অগ্রসর হয়ে প্রায় অনুদের বাড়ীর সাম্নে এসে পড়েছে তখন আবার সামান্য বৃষ্টির সঙ্গে ছোট ছোট শিল পড়া সুরু হল। ছেলের দল অতি ব্যগ্রভাবে নিজেদের চারিদিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে যে যেমন করে পারলে রাস্তার দুধারের বাড়ীর রকে অথবা জানালার পাশে বা কোন বাড়ীর ঝুলান বারান্দার নীচে কোনরকমে একটু আশ্রয় করে নিয়ে নিজেদের দেহটা শিলা-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে।

সেই কাঁধে চড়া সুন্দর ছেলেটী ও টপ্ করে বন্ধুর ঘাড় থেকে নেমে পড়ে কয়টী বন্ধুসহ অনুদের ঘরের জানালার ঠিক উল্টো দিকে বাড়ুজ্জেদের বাড়ীর যে উচু রকটা ছিল তাতেই উঠে দাঁড়াল।

এদিকে ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলে অনু ও ফুলী জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের স্থানে ফিরে এসে বই ও শেলাই আবার হাতে নিয়ে বস্‌ল, কিন্তু কিছুতেই তারা মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারলে না। বার বার তাদের ঐ অপরিচিত নতুন মুখ সব ছেলের কথা মনে হয়, বিশেষ করে ঐ কাঁধে চড়া সুন্দর ছেলেটীর। অনু ও ফুলী নিজেদের ভেতর হাসাহাসি করে আর বলে—"ঢেকী রাম বন্ধুর কাঁধে চড়ে রাত্রের জলো হাওয়ায় ফুর্ত্তি করতে বেরিয়েছেন।" তাদের দুজনের নিজেদের তৈরী অভিধানে অর্থহীন যত Idiom ছিল প্রায় সবগুলিই ব্যাবহার করে ও ছেলের দলকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব নামে অভিহিত করে নিজেদের ভেতরেই হেসে ঘরে কুটীপাটী হ'তে লাগলো।

খানিকক্ষণ এইভাবেই গেল, বাইরের জল ঝড়ও প্রায় কমে এল। অনু ও ফুলী দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দেখে যে এবার সব বন্ধুরাই নিজের স্থান ছেড়ে এসে সেই বাড়ুজ্জেদের রকে কোন রকমে আশ্রয় করে নিয়ে, সেই সুন্দর ছেলেটীকে ঘিরে খুব গল্প হাসি ঠাট্টা সুরু করে দিয়েছে। এবার সুন্দর ছেলেটীও যেন কিছু বলে একটু একটু হাস্‌ছে। সে একবার মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাল, দৃষ্টি তার ঠিক পৌছাল গিয়ে অনুদের জানালাতে, কিন্তু সে অনু ও ফুলীকে দেখতে পেয়েছিল কিনা সন্দেহ কারণ এর ভেতর কোন এক ফাঁকে ফুলী নিজেদের ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ছিল, তাই হয়ত সুন্দর ছেলেটীর দৃষ্টি অনুদের ঘরের অন্ধকারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে আবার নীচু হ'ল।

ছেলের দল যেখানে দাঁড়িয়ে হল্লা করছিল, সেখানে রাস্তার আলো সম্পূর্ণ ভাবে তাদের ওপর পড়েছিল। সেই উজ্জ্বল গ্যাসালোকে অনু ও ফুলী দেখলে, "কাঁধে চড়া ধেড়েগঙ্গারাম বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ। মুখের চেহারা সবই যেন তার নিখুঁত বিশেষ তার চোখ দুটি যেন বড় নির্ম্মল বড় পবিত্র। অনু ও ফুলী দুজনেরই এ ছেলেটীকে খুব ভাল লাগল।

শিলাবৃষ্টি যেই থেমে গেল তখন ছেলের দল যেমন হৈ হৈ, করে এসেছিল আবার ঠিক তেমনি হৈ হৈ করেই অনুদের গলি ছেড়ে চলে গেল। অনুরা লক্ষ্য করে দেখলে যাবার সময়ও সুন্দর ছেলেটীকে কয়জন বন্ধু জোর করেই প্রায় অন্য একজন ছেলের ঘাড়ে উঠিয়ে দিলে।

অনু ও ফুলী জানালা ছেড়ে বিছানায় এসে বস্‌ল। অনু হেসে বল্‌লে—"কেমন মজা দেখলিরে ফুলী। লোকগুলি যেন পাগল, কোথাও কিছু নেই রাত দুপুরে এই রাস্তার জলে দাঁড়িয়ে ফুর্ত্তি করতেও তাদের লাগল ভাল। যাই হউক আমরা কিন্তু ভাই বিনা পয়সায় মজা দেখে নিলাম—যেন আকাশের কার্ত্তিক ঠাকুর ময়ূর ছেড়ে মানুষ হয়ে মানুষ বাহান করে শিলা বৃষ্টির রাত্রে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কাঁধে চড়া ধেড়ে গঙ্গারাম লোকটা কিন্তু খুব সুন্দর, নারে ফুলী ?"

ফুলী বল্‌লে—"হুঁ"

ঘরের ভিতর অন্ধকার থাকায় ফুলীর মুখ দেখা যাচ্ছিল না বটে তবু অনু বেশ বুঝতে পারলে ফুলী এখন আর যাই করুক, কিন্তু হাসছেনা। কারণ ফুলীর ঐ

গম্ভার 'হু' শব্দই যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ফুলী কারণ অকারণে যেমন হেসে গড়িয়ে পড়তে পারে আবার তেমনি সময় বিশেষে অতি গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ একবারে চুপ করেও থাকতে পারে আর ফুলীর সেই চুপ করে থাকাটাই একটা মহা দুর্লক্ষণ যেন কোন বিপদের প্রথম সূচনা। ফুলী যে কোন ধাতু দিয়ে গঠিত তা একমাত্র তার সৃষ্টি-কর্ত্তাই জানে। মেয়েটী না পাগল, না স্বাভাবিক, না বুদ্ধি-হীন, না ঠিক; বুদ্ধি তার কেমন খাপছাড়া অদ্ভুত, তাই কারো সঙ্গে তার কোথাও বেশীক্ষণ মেলে না, কারো সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না।

বাড়ীতে ফুলীকে সব চেয়ে ভাল চেনে অনু ও তার মা; তাই এখন ফুলীর "হু" কথায় অনুর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে কোথাও কিছু গলদ আছে।

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—"কেনরে ফুলী, তোর ভাল লাগল না? আমার ত ভাই মনে করতেই হাসি পাচ্ছে।" বলতে বলতেই অনু হাসি চাপতে গিয়ে আরো জোরে হেসে ফেললে; কিন্তু এ হাসিতেও ফুলীর অটল গাম্ভীর্য্যকে টলান গেল না।

সে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে—"আচ্ছা ঠাকুরঝী, অপরের দুঃখ দেখে অমন হাসা উচিত?"

অনু ত অবাক! সে বল্লে—"তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ফুলী? দুঃখ তুই কোথায় দেখতে পেলি?"

ফুলী তার পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেই উত্তর দিলে—"আমি সত্যি কথাই বলছি ঠাকুরঝী। লোক-গুলির কপালে যে কত দুঃখই আছে সে কথা ভেবে আমারও হাসি শুকিয়ে গেছে।"

অনু যদিও ফুলীর কথায় একটু আশ্চর্য্য হ'ল, কিন্তু তার গাম্ভীর্য্যে অনুর হাসির মাত্রা বেড়েই গেল। সে হেসেই উত্তর দিলে—"তুই আচ্ছা লোক ফুলী। যেখানে বিনা পয়সার মজা দেখে স্ফূর্ত্তিতে মন নেচে উঠবে, সেখানে কোথাও কিছু নেই, দুঃখ দুঃখ করে রাত দুপুরে মেয়ের শোক উথলে উঠল। পাগল কি আর গাছে ফলে, তোকে লোকে পাগল বলে। ঐ একদল পাগলা ছেলে দেখে তুইও পাগল হয়ে গেছিস্ বুঝলি ফুলী?

ফুলী বল্লে—এ হাসির কথা নয় ঠাকুরঝী, এতে দুঃখ করবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু হাসবার কিছু নেই"

ফুলী যতই স্থির গম্ভীর হয়ে কথা বল্তে চায় অনুর হাসিও তত বেড়ে যায়। হেসেই সে বল্লে—"যা ফুলী, রাত দুপুরে আর পাগলামী করিসনি। কাল পিসিমার কাছ থেকে একটু মধ্যম নারায়ণ তেল চেয়ে এনে সকাল বেলা উঠেই তোর মাথায় বেশ করে চাবরে চাবরে লাগিয়ে দেব। এখন রাত্রিটার মত পাগল না হয়ে শুয়ে একটু ঘুমোত?"

ফুলী তার গম্ভীর স্বর গম্ভীরতর করে বললে—

তুইত পাগল ভেবেই বেশ নিশ্চিন্ত আছিস ঠাকুরঝী পাগল হ'লেও ত ছিল ভাল, এ যে তার চাইতেও খারাপ।

ফুলীর কথায় এই প্রথমবার অনুর মনের কোনে কেমন একটা ভয় ও ভাবনা বৃথাই জেগে উঠল। সে আস্তে ফুলীর গা ঘেসে বসে বললে—"তুই ওদের চিনিস নাকি ফুলী, আমিত পূর্ব্বে এদের কখন দেখিনি। বোধ হয় অন্য পাড়ার কোন কলেজের ছেলে এ পাড়ায় কোন বন্ধুর খোঁজে এসেছিল কিন্তু নম্বর না জানায় বাড়ী খুঁজে বার করতে পারেনি।"

এইবার ফুলী গলার স্বর একটু নরম করে নিয়ে বল্লে—"বন্ধুর খোজে এমন দুর্দ্দিনের রাত্রে কেউ বাড়ীর বার হয়। যদিও আমি ওদের কাউকেই চিনি না, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, ওরা কেউ কলেজের ছেলে নয়, অন্য লোক।"

অনু জিজ্ঞাসা করলে—"কি লোকরে?"

ফুলী উত্তর দিলে—"মাতাল।"

সঙ্গে সঙ্গেই অনু বলে উঠল—"মাতাল?"

ধীর কণ্ঠে ফুলী বললে—হ্যাঁ।"

সেই অন্ধকার ঘরের ভেতর দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। অনুর মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল।

শেষে অনুই প্রথম ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা ফুলী, তুইত ওদের কাউকেই চিনিস না, তবে কি করে জান্লি যে ওরা সবাই মাতাল।"

ফুলী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "কেন ওদের দেখেই জান্লাম। প্রথমে তোর মত ভাল আমিও ভেবেছিলাম ওরা বুঝি সব কলেজের পড়ুয়া, ভাল

লোক, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, তা নয়, ওরা সব মাতাল। বেশী মদ খেয়ে বুদ্ধি হারিয়ে এখন সবাই রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, নতুবা ভাল লোক কেউ কখন এই গভীর রাত্রে এমন জল ঝড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করে?”

রাত্রি বোধ হয় তখন সাড়ে এগারটাও হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই খেয়ে এসে নিরিবিলীতে নিজেদের ঘরে থাকায়, এবং তাদের ঘুমের সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার ঘরে বসে তারা ভেবে নিলে রাত্রি একটা কি দুটো বেজেছে। অনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজ মনেই ভাবলে হবেও বা ফুলীর কথা সত্যি; এত রাত্রে যখন সবাই মিলে অত জলের ভেতরে দাঁড়িয়েও স্ফুর্ত্তি করছে, তখন মাতাল ছাড়া ভাল লোক আর নয়। কিন্তু সুন্দর ছেলেটী, সেও মাতাল? মন তার এতে সায় দেয় না।

প্রকাশ্যে বললে—“সেই কাধে চড়া লোকটিও কি মাতাল ফুলী? কি সুন্দর তার চোখ দুটি ভাই; শেষে সে ও মাতাল হল?”

ফুলী বলিল—“তুই যখন পাগল পাগল করে খুব হাসছিলি তখন ঐ সুন্দর লোকটীর কথা ভেবেই ত আমার অত কষ্ট হচ্ছিল। সত্যি পাগল হলেও ত ছিল ভাল, পাগ্‌লা গারদে রেখে দিত, তাত নয় এরা যে সব মাতাল, এদের নিয়ে লোকে রাখবে কোথায় আর জানিস্ ভাই ঠাকুরঝী, ঐ সুন্দর লোকটীই কিন্তু সবার চাইতে বেশী মদ খেয়েছিল।”

অনু টপ করে জিজ্ঞাসা করলে—“সেই লোকটাই যে সব চেয়ে বেশী মদ খেয়েছে তা তুই কি করে জানলি; তোর কথা আমার বিশ্বাস হয় না। সে লোকটী বলতে গেলে তার বন্ধুদের মত চীৎকার গোলমাল কিছু করেনি, বরং ভদ্রলোকের মত চুপ করেই ছিল। তোর সবেতেই দোষ দেখা স্বভাব।”

সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ মানবের স্বভাবিক ধর্ম্ম; অনুর কিশোরী চিত্ত নিজের অজ্ঞাতেই অমন সুদর্শন যুবকের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাই সে কিছুতে মানতে চায়না অমন সুন্দর লোকটীই সব চেয়ে খারাপ। সে ফুলীর কথার প্রতিবাদ করলে। কিন্তু ফুলী থামবার পাত্র নয়। সে বললে—

“আমি দোষ খুজব কেন, বরং সত্যি কথাই বল্‌ছি! অন্য বন্ধুরা চীৎকার গোলমাল যাই করুক কিন্তু তখনও বুদ্ধি ছিল, আর সুন্দর লোকটীর দেখলিনা, তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হ'ল, সে এত বেশী মদ খেয়েছে যে হাঁটবার ও ক্ষমতা নেই। অনেক বইয়েতে পড়িসনা যে লোকে বেশী মদ খেলে চল্‌তে পারেনা মাথা নীচু করে থাকে, এ লোকটীরও ত ঠিক তাই। প্রায় সব সময়েই মাথা একটু নিচু করা ছিল।

[ক্রমশঃ

কাঙ্গালের আশা

কুমারী পীযূষকণা সর্ব্বাধিকারী

দীন ভাবে কি পুণ্য সুদিন
এসেছে আজ বরষায়,
সজল মেঘের বাদল-ধারা
ঝরুল তারি আঙ্গিনায়!
বাদল দিনের শ্যামল ক্ষেতে
কাঙ্গাল চাহে অন্ন পেতে
নিরাশ আজি নিরঙ্কুশে
অভয় পায় ও ভরসায়—
এস এস হে দীনতারণ
ডাকার মত আজ ডাকায়!

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

জীবনের মূল্য

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

"ওরে কাজল, চা-টা খেয়ে নে শিগ্‌গির, আজ অনেক খানি পথ হাঁটতে হবে—আর ভাত খেতে তো সেই বেলা দুটো।"—অবিনাশ তাহার পুত্র কাজলকে বলিল।

অবিনাশের বাড়ী বীরভূম জেলার নাচন-সাহা নামক গ্রামে। সে জাতিতে ডোম। বাঁশ কাটিয়া তাহা দিয়া ডালা, ঝুড়ি, মোড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করাই ইহাদের পেশা—এই শ্রেণীর ডোমকে বাজুনে ডোম বলে। অবিনাশ বৎসরের অধিকাংশ সময় নিজের ব্যবসায় লইয়া ব্যস্ত থাকে, একটু শীতের হাওয়া বহিলেই খেজুর গাছ কাটিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে করিয়া দূর দেশে চলিয়া যায় এবং গোটা শীত কালটা সেখানে কাটাইয়া আসে।

প্রভাত হইতে এখনও অনেক দেরী—রাত্রির অন্ধকার এখনও ভালোরূপে দূর হয় নাই, রাস্তাঘাট এখনও পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে শুকতারা এখনও জাগিয়া আছে। পল্লীর সকলে নিদ্রাভিভূত, ঝিঁ ঝিঁ পোকা অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিতেছে। একটু একটু শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অবিনাশ ডোমের বিদেশ যাত্রার সময় আগত; আজ সেইজন্যই সে প্রস্তুত হইয়া লইতেছে।

পিতার আহ্বানে কাজল আগ্রহ সহকারে চা পান করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ভদ্রলোকদের দেখাদেখি চা-পান প্রথা পল্লীগ্রামেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহা ক্ষুধা-মান্দ্য করে বলিয়া তথাকথিত ছোটলোকেরা ইহার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এমনভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে যে ইহার উন্মূলন করা একেবারে অসম্ভব। ইহারা যে চা খায় তাহা সম্পূর্ণরূপে দুগ্ধহীন এবং তাহাতে মিষ্টির ভাগও খুব কম থাকে। সকালবেলা উঠিয়া এই অপূর্ব্ব পানীয় ইহাদের কয়েক গেলাস পান করা চাই, নহিলে সারাদিন কাজে মন লাগিবে না।

অবিনাশ চা পান করিতে করিতে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "ও কাজলের মা, বাঁশ পাতা আরো কতকগুলো ঝেঁটিয়ে জড়ো কর—বড় জাড় করছে।"

কাজলের মা বলিল, "এখন কটা রাত হবে? এখনও তো ভালো করে ফরসা হয় নাই। এ সময় আজ না উঠলেই হত, আর একটু পরে উঠে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লেই হত। এত শীতে কি মানুষ রাস্তায় হাঁটতে পারে? আর অন্ধকারে পথ দেখবেই বা কি করে?"

অবিনাশ বলিল, "তাই তো বলছি, ভালো ক'রে চা খেয়ে গা-টা যুৎ করে নে—তাহলে খুব হাঁটতে পারবি, আর হাঁটতে হাঁটতেই শরীর গরম হয়ে যাবে।—ওরে কাজল আর একটু চা নিবি?"

কাজলের মা বলিল, "থাক্, ও এসে চা খাবে,—এখন বাঁশপাতাগুলো ঝেঁটিয়ে জড়ো করুক দেখি।"

কাজল বাঁশপাতা জড়ো করিতে লাগিল। বাঁশ ঝাড়ের পাশেই ইহাদের ছোট বাড়ীখানি, সেইজন্য বাঁশপাতার অপ্রতুল নাই; ঝড়ে অনেক পাতা আসিয়া ইহাদের উঠানে জমা হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক বাঁশপাতা জড়ো হইল, শুকনা পাতার স্পর্শে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—এই আগুনের ধারে বসিয়া ইহারা শীত নিবারণ করিতেছে।

কাজলের মা জিজ্ঞাসা করিল, "চা খেয়েই কি বেরোবে নাকি?"

অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ। বেশী বেলা করলে বড্ড রোদ্দুর লাগবে।"

কাজলের মা বলিল, "তা' সূয্যি উঠুক, তার পরে যাওয়া যাবে, এত তাড়াতাড়ি আর যেয়ে কাজ নাই।"

অবিনাশ বলিল, 'হ্যাঁ, শেষকালে বুঝবি রোদ্দুরের ঠেলা তখন আর হাঁটতে পারবি না, পথে কতবার গাছতলায় বসতে হবে। ভেদে কি এখানে? গেল বছরে গিয়েছিলি, মনে নাই?"

এই সময় অবিনাশের শিশু-পুত্রটির হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অবিনাশের স্ত্রী পুত্রটিকে লইয়া আসিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গেল।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কখন যাবে?

অবিনাশ বলিল, "দাঁড়া, তোর যে আর তর সইছে না দেখছি। যেতে পারবি ঠিক? জাড় করছে না তোর?"

কাজল বলিল, "আগুনের ধারে কি জাড় লাগে? আচ্ছা বাবা, সেখানে যেয়ে রস খেতে পাব তো?"

অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ রে, যত পারিস খাবি। এখন তো খুব রস খেতে চাচ্ছিস, কিন্তু ওখানে যেয়ে তো একটুও খেতে পারিস না।"

অবিনাশের স্ত্রী শিশু পুত্রটি কোলে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। শিশুটি অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিয়া চলিয়াছে।

"ওগো দেখছ, ছেলেটার যেন কি হয়েছে, গাটা গরম গরম লাগছে। অসুখ বিসুখ হবে না তো আবার?"

"ধ্যাৎ, অসুক অমনি হলেই হ'ল? চল, বেরোবার ব্যবস্থা কর— যাওয়ার সময় আর বাধা দিসনে।"

"একটু দেখে গেলে হত না? আজ একে বারে না গেলেই নয়? আমার কিন্তু আজ একে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না; সেখানে যেয়ে যদি অসুক বেড়ে যায় তাহলে কি হবে?"

"তুই কি মনে করছিস বল দেখি। বেরোবার ঠিক হয়ে গিয়েছে,—আর তুই কিনা এখন হোতে মানা করছিস! আজ না গেলে মনিবতো রেগে আগুন হয়ে যাবে। কবে থেকে সে যাবার কথা বলছে,—চল শিগির যাবার যোগাড় কর, শেষে বেলা হয়ে যাবে!"

"তা তুমি যখন শুনবে না—"

"নে, নে—সব ঠিকঠাক কর, বেরিয়ে পড়ি। ওর একটু গা গরম হয়েছে, ও জন্য কিছু ভাবিসনে।"

সঙ্গে লইয়া যাইবার মত জিনিষ খুব বেশী নয়। সামান্য কয়েকখানি ময়লা কাপড় তাহা স্থানে স্থানে তালি দেওয়া। রন্ধন কার্য্যের জন্য কয়েকটি মাটির হাঁড়ি, টিনের বাসন আর দুয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে যাইবে। স্বামীর অনুবর্ত্তায় অনিচ্ছা বশতঃ স্ত্রী জিনিষপত্র গুছাইল। অবিনাশ একটি বাঁকের দুইধারে [illegible] ঝুলাইয়া লইল। তাহার স্ত্রী শিশুপুত্রটি কোলে লইয়া [illegible] সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে [illegible] বাড়াইল।

সামনে দীর্ঘ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। কত গ্রামের মধ্য দিয়া. কত প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে [illegible] রাঙা মাটির পথ গিয়াছে তাহা কে জানে! তখনও রা[illegible] দিয়া লোক হাঁটিতে সুরু করে নাই। ইহারা [illegible] জনবিরল রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামের পরিচিত স্থান পিছনে ফেলিয়া তাহা[illegible] চলিয়াছে। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া ফরসা হইতেছে। রাস্তার ধারে ওই সেই আমগাছটা, যেখানে কাজ[illegible] গতবৎসরে আম পাড়িতে যাইয়া সুবল সর্দ্দারের হা[illegible] কান মলা খাইয়াছিল। গ্রাম্যবন্ধুদের সঙ্গে কত[illegible] সে এই গাছের আমচুরি করিবার কত ফন্দী আঁটিয়াছে। খানিকদূরে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুকুরে অনেকখা[illegible] জল। গতবৎসর সেই পরাণ জেলের ছেলে সাঁতার শিখিতে গিয়া ডুবিয়া মারা গেল, তার মা'র সেকি কান্না। ই[illegible] মনে হইয়া কাজলের চক্ষুও অশ্রুসজল হইয়া পড়িল। ক্রমে এই পুকুর তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, গ্রামের পরিচিত স্থানগুলি পার হইয়া তাহারা গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

কাজলের এই দারুণ শীত লাগে নাই। সারাপথ সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া যাইতেছে। কখনো কোন পরিচিত স্থান দেখিতে পাইলে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পিতা নীরবে সম্মতি দিতেছে।

এই গ্রাম পার হইয়া রাস্তাটি মাঠের মধ্য দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে। অনেক দূরে কুশলপুর গ্রাম। মাঝখানে প্রকাণ্ড মাঠ—এমাঠে কোন খানখেত নাই, কোন চাষীর জমিও নাই। শুষ্কপ্রায় ঘাস এই মাঠের বুকে জাগিয়া আছে। গ্রামের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পূর্ব্বাকাশে সামান্য লাল আলোর রেখা দেখা গেল। গ্রামের মধ্যে গাছপালার উপর পাখীরা

কলরব সাঙ্গ করিয়া আপন আপন আহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে।

কাজল অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া পিতাকে কহিল, "বাবা ওই দেখ সেই বটগাছটা দেখা যাচ্ছে, ওইখানে আমি নীরেণের সঙ্গে খেলা করতাম। সে গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে গাছ তলায় বসত, আমি আর সে মজা করে খেলতাম। কি সুন্দর বাঁশী বাজায় বাবা এই ছেলেটা।"

অবিনাশ নীরবে সায় দিল।

বিদেশগামী চারখানি গরুর গাড়ী সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। গাড়োয়ানেরা গল্প গুজবে মত্ত। একজনের হাতে একটি হুঁকা, ইহা পালাক্রমে অপর তিনজনের হাতে ঘুরিতেছে। চলার গতিতে ইহারা আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে।

"কোন গাঁয়ে যাবে গো"—অবিনাশ প্রশ্ন করিল।

"আমরা যাব অনেক দূরে গো, সেই রঘুনাথপুরের বাজারে। যেতে বেলা পেরায় ন' দশটা হবে। তুমি কোথা যাচ্ছ ভাই?"—একজন গাড়োয়ান বলিল।

"আমি যাব ভেদে'। যেতে সেই বেলা দুটো।"

"অনেক দূরে যাচ্ছ তো—এঃ, গরু দুটো চলছে দেখ। যেন ছয় মাস খায় না—" বলিয়া গাড়োয়ান বলদকে লাঠির বাড়ি মারিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। অবিনাশ পিছনে পড়িয়া রহিল।

শীতের মিষ্টি রৌদ্র উঠিয়াছে। নিজেদের গ্রাম বহু দূরে পড়িয়া গিয়াছে। ওই সেই বৃহৎ দেবদারু গাছটি গ্রামের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান। গ্রামের দৃশ্য ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে কুশলপুর গ্রাম।

(২)

আজ পাঁচদিন হইল অবিনাশ ভেদিয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে। একটী কুটীরে তাহারা উঠিয়াছে। কুটীরটি স্বল্পায়তন—চতুর্দ্দিকে বাঁশের চটা দিয়া ঘেরা, মধ্যে মধ্যে গভীর ফাঁক। চালেও উপযুক্ত খড় নাই। কুটীরটির অবস্থান খুব বেশী স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নহে। ইহার উত্তর দিকে একটি এঁদো পুকুর—তাহা জলজ পানায় ভর্ত্তি, এই ভীষণ শীতের সময় তাহা শীতের স্পর্শ আনিয়া দিতেছে। কুটীরটির চতুর্দ্দিকে নানা বন্য গাছপালা দাঁড়াইয়া আছে সামনে লুপ লাইনের রাস্তা। এই রেলপথের ধারে অনেক খেজুর গাছ। অবিনাশ এই গাছগুলির মাথায় চাপিয়া তাহা হইতে রস সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

বেলা প্রায় একটার সময় অবিনাশ গাছকাটা সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারাক্ষণ কাজ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্তি হওয়ায় সে পীড়ের উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

অবিনাশের স্ত্রী আসিয়া বলিল, "ওগো, ছেলেটা যে কি রকম করছে। তুমি না হয় একটা—"

অবিনাশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধমক দিয়া উঠিল, "তুই কি আমাকে একটু জিরোতেও দিবিনে। এই দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে খেটেখুটে এলাম, কোথায় একটু বসব তানা কানের কাছে সেই ভ্যান ভ্যান আরম্ভ করলি।"

"তা' তুমি বসনা, কিন্তু ছেলেটা যে থেকে থেকে কি রকম করছে—কিছু বুঝতে পারছি না।"

"তোর ছেলে তো এখানে আসবার সময়েই কেমন কেমন করছিল। আমি কি করতে পারি বল। সারাদিন খেটে এলাম, আমাকে আর কি বলিস।"

কাজল কোথায় ধুলা মাটি লইয়া খেলা করিতে ছিল। হঠাৎ পিতার আগমন দেখিয়া আনন্দের অধীরতায় দৌড়িয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা আমার জন্য রস এনেছ?"

অবিনাশ বলিয়া উঠিল, "রস এনেছ? আমি এখন উনির রস জুগিয়ে বেড়াই।"

অবিনাশের স্ত্রী বলিল, "যানা খেলা করছিলি করনা যেয়ে,—ছুটে আসতে কে বল্লে?

কাজল মুখে আঙ্গুল দিয়া ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাতা পিতার এরূপ মনোভাবের অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না।

অবিনাশ বলিল, "তেল দাও দিকি চান ক'রে আসি।"

"ছেলেটা কি মরবে?"

অবিনাশ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, "একটু তেল দাও তো দয়া করে। খেয়ে দেয়ে যা হয় করা যাবে।"

অবিনাশের স্ত্রী তাহার হাতে খানিকটা সরিসার তৈল ঢালিয়া বলিল, "তোমার ছেলে, তুমি যা করবে তার উপর তো আমি কিছু করতে পারিনে।"

অবিনাশ সেকথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "কি রেঁধেছ আজকে?"

"কি আর রাঁধব, ছেলেটা কাঁদতে লাগল। আলু সেদ্ধ করেছি আর ভাত রেঁধেছি।"

"কেতাথ ক'রে দিয়েছ একেবারে—"অবিনশ দম্ দম্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অবিনাশের স্ত্রী আপন মনেই বলিতে লাগিল, "ওকে কেউ একটু দেখবে না—যেন কার ছেলে, কোথা থেকে ভেসে এসেছে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। তা' যত মরণ হয়েছে আমার—এ ছাই প্রাণ যায়ও না, সব জ্বালা চুকে যায়।" ভাবিতে ভাবিতে গভীর দুঃখে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ শিশুপুত্রটী কাঁদিয়া উঠিল। মাতা শশব্যস্ত শিশুর নিকট ছুটিয়া গেল। ছেলেকে কতরকমেই থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু রোগের যন্ত্রনায় শিশুটি কিছুতেই থামিতে চাহেনা। শিশুর অবস্থা দেখিয়া মাতার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

এমন সময় অবিনাশ আসিয়া বলিল, "দাও দাও, শিগির ভাত দাও।

অবিনাশের স্ত্রী ঘরের মধ্য হইতে বলিল, "দাঁড়াও, দিচ্ছি, ছেলেটা জেগে উঠেছে।

অবিনাশ রাগিয়া উঠিল, "তোরা কি আমাকে পাগল না করে ছাড়বিনে? আগে ভাত দে।"

অবিনাশের স্ত্রী পুত্রকে শুয়াইয়া স্বামীকে ভাত দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

স্বামীকে ভাত দিতে দিতে সে বলিল, "দেখ, আর অবহেলা কর না, যা হয় একটা কিছু কর। আমিত সারাদিন ওকে চোখের সামনে দেখছি—আমি তো আর সহ্য করতে পারি না।"

অবিনাশ ভাত মুখে দিতে দিতে বলিল, "দাঁড়াও আমি দেখছি। আজকে ত আর হবে না, কাল ভেদে'র থেকে যতীন ডাক্তারকে নিয়ে আসব, সে দেখলেই ঠিক হবে, কিন্তু ডাক্তারকে টাকার কি হবে?"

অবিনাশের স্ত্রী বলিল, "টাকার মায়া ক'রে কি হবে? তুমি আগে ডাক্তার আনো, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। হাঁগো, আজকে কি ডাক্তার আনা যায় না।

"তুমি কি ক্ষেপেছ? আজ কি ডাক্তার আনবার সময় আছে? বেলা সাড়ে তিনটার সময় আবার কাজে যেতে হবে।"

"তা তুমি যা ভাল বোঝ কর। ছেলেটা বারে বারে কেঁদে উঠছে।"

"তা আর কি করব, আজ তো হতে পারে না, কাল ঠিক যতীন ডাক্তারকে ডেকে আনব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ভাত খাইবার সময় দাঁতে একটি কাঁকর ঠক করিয়া লাগিল। "এঃ, কি যে আরম্ভ করছে, চালটা ভাল করে চেলে নিতেও সময় পাও নাই? এত বড় একটা কাঁকর রয়েছে মাথাটা ঘুরে গেল।"—অবিনাশ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল।

অবিনাশের স্ত্রী কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

(৩)

সকাল সাতটা। সূর্য্যের কিরণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘাসের আগায় শিশির বিন্দুগুলি ঝলমল করিতেছে। অবিনাশ সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ছেলেটা সারারাত্রি কাহাকেও ঘুমাইতে দেয় নাই, অনবরত চেঁচাইয়াছে। অবিনাশ কতবার ধমক দিয়াও তাহার কান্না থামাইতে পারে নাই; শিশুর মাতা সারারাত্রি বিছানার পাশে বসিয়া ছেলেটির শুশ্রূষায় রত ছিল।

"দেখ, আমি চল্লাম, ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ফিরে আসব," অবিনাশ ডাক্তার আনিবার জন্য বাহির হইল।

ছেলেটা আজ অনবরত আন্‌চান্ করিতেছে। কিছুতেই যেন স্বস্তি নাই। শরীরের সমস্ত জোর দিয়া চেঁচাইতেছে

শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে চুপ করে না। বেদনায় শিশুটির মুখ বিবর্ণ। মাঝে মাঝে প্রবল বেগে কাসিতেছে।

প্রায় দুইঘণ্টা হইল অবিনাশ গিয়াছে। এখনও আসিবার নাম নাই। এত দেরী করিতেছে কেন তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এদিকে শিশুটিকে থামাইয়া রাখা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মাতা স্নেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও শিশুকে শান্ত রাখিতে পারিতেছে না।

তিনঘণ্টা কাটিয়া যাইবার পর দূরে দেখা গেল অবিনাশ আসিতেছে, পশ্চাতে বোধ হয় ডাক্তার বাবুই আসিতেছেন। মাতার মনে অনেকখানি আশা হইল।

অবিনাশ যতীন ডাক্তারকে লইয়া আসিয়া পৌছিল। "এই দিকে আসুন—এই দেখুন আমার ছেলেটা, এই ছয় দিন হ'ল বড় অসুখ, অনবরত কাঁদছে"—অবিনাশ বলিল।

"ডাক্তারবাবু দয়া করে সারিয়ে দেন, আপনার চিরদিনের কেনা হয়ে থাকব। বাছা আমার বড় কষ্ট পাচ্ছে ক'দিন।" অবিনাশের স্ত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বুঝিলেন যে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবার ফলে নিউমোনিয়া হইয়াছে। চারিদিকের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া রোগ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তিনি বলিলেন "এত দেরী করে ডাকতে হয় রে? আগে ডাকতে পারিস নাই, অসুখ যে বেড়ে গিয়েছে।"

অবিনাশের স্ত্রী পুনরায় অনুনয় জানাইল। ডাক্তার এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিলেন, "সেরে যাবে, সেজন্যে ভাবিসনে। এই ওষুধটা খাওয়াবি তিনঘণ্টা অন্তর চার দাগ রইল। আমার ভিজিটের দুটাকা দে এখন।"

অবিনাশ কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবু দুটাকা পাব কোথায়? অনেক কষ্টে এই দেখুন বারো আনা জুটিয়ে ছিলাম, এই নিয়ে মাপ করুণ। এই পয়সায় চাল কিনতাম আর খাওয়া হবে না। দয়া করে এই নিন।"

"আগেই বুঝেছি, যে দয়া করতে হবে। দে যা দিবি তাই দে।"

অবিনাশ তাহার সঞ্চিত বারো আনা পয়সা ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন।

অবিনাশের স্ত্রী বলিল, "এত বেলা ক'রে ডাক্তার নিয়ে এলে?"

অবিনাশ উত্তর করিল, "এই আসতে চায় না কত হাতে পায় ধরি তবে এত বেলায় উনি এলেন। আমরা তো কিছু দিতে পারিনে।"

বেলা প্রায় একটা। অবিনাশের উনুন জ্বলে নাই। শিশুপুত্রটির সঙ্কটজনক অবস্থা দেখিয়া মন বিষাদাচ্ছন্ন। ঔষধ দুইবার খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কোন ফলই হয় নাই। আজ সে কাজে যাইতে পারে নাই।

মনিববাড়ী হইতে ভৃত্য গদাই আসিয়া জানাইল অবিনাশের অবিলম্বে যাওয়ার প্রয়োজন, মনিব ডাকিয়াছেন; না গেলে তিনি অত্যন্ত রাগিবেন;

অবিনাশ অবসন্ন দেহখানি লইয়া গদাইয়ের সহিত মনিবের নিকট চলিল। মনিবের বাড়ী সহরের মধ্যে। সেখানে পৌছিয়া দেখে যে মনিব ভীষণ রাগিয়াছেন। যাইবামাত্র মনিব রামলোচন বাবু বলিলেন' "আনতো ব্যাটাকে এখানে। দেখি একবার তার কত বড় ক্ষমতা যে আমার কাজে ফাঁকি দেয়। যাস নাই কেন আজ গাছ কাটতে?"

অবিনাশ কম্পিত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, আমার ছোট ছেলেটার বড্ড অসুখ, বাঁচে কি মরে তার ঠিক নেই—"

"ওজর তো বিস্তর দেখাবি তা' আগের থেকেই জানি। ছেলের অসুখ, মেয়ের অসুখ, এতো লেগেই আছে..." আরো কত কি বলিয়া চলিলেন, সমস্ত অবিনাশের কর্ণে প্রবেশ করিল না। শুধু তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল শিশুপুত্রটির অসহায় অবস্থা, স্ত্রীর মর্ম্মভেদী কতরতা। নিজের উপরই তাহার রাগ হইতে লাগিল। কেন সে স্ত্রীর কথা শুনে নাই; স্ত্রীর কথা শুনিয়া সময় থাকিতে ডাক্তার আনিলে হয়ত এরূপ অবস্থা হইত না।

"সাধে কি বলে ছোটলোকদের আবদার দিতে নেই? আমি ভালোমানুষ ব'লে কিছু বলি না, অন্যখানে হ'লে টের পেতিস।" রামলোচনবাবু ক্রোধান্বিত স্বরে বলিলেন।

অবিনাশ জোড় করে বলিল, "বাবু, আর কোনোদিন এ রকম হবে না।"

"সে তো হবে না বুঝলাম, কিন্তু আজ কেন হ'ল ? যা, আজকে কিছু বললাম না, আর একদিন এ রকম হ'লে দেখবি।"

কি দেখিবে তাহা কল্পনা করিয়া লইয়া অবিনাশ বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তাহাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইবার কেহই জগতে নাই।

বাড়ীর কিছু নিকটে আসিয়া সে স্ত্রীর ক্রন্দনের স্বর শুনিতে পাইল। সেই সঙ্গে কাজলও চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তবে কি সব শেষ হইয়া গেল ? ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর ?

বাড়ী আসিয়া অবিনাশ দেখিল যে, পুত্রের জীবন দীপ নিবিয়া গিয়াছে। অসাড়, হিমাঙ্গ হইয়া পুত্র শুইয়া আছে। যে মুখে হাসির বিরাম ছিল না সে মুখ পাণ্ডু রং; দেহ চির-নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু তাহার হাস্যময় মুখ খানিতে করাল মুদ্রাঙ্কণ করিয়া গিয়াছে। স্ত্রী উন্মাদের মত হইয়া মর্ম্মভেদী চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে।

অবিনাশ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, গভীর শোকে তাহার চক্ষের অশ্রুর প্রবাহ যেন শুকাইয়া গেছে।

এই তো ইহাদের জীবন! ধনীর নিকট এই জীবনের মূল্য যেন কিছুই নহে। ইহারা যে সারাদিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া সমাজের কত উপকার করে, কে তাহা ভাবে ? অতি নিম্নস্তরের জীব ইহারা, নিজের উদর পূরণের জন্য কি না করিতেছে!

এই উদরের জ্বালায় অবিনাশ শিশু-পুত্রের অসুখ উপেক্ষা করিয়া অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে আসিয়াছে; এই দারুণ শীত গ্রাহ্য না করিয়া আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই উদর-পোষণ যে শিশুপুত্রটির জীবন দিয়া করিতে হইবে তাহা কে জানিত ?

তা'র নামে চাই শান্তি-ভাষ

শ্রীমুণীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সাহিত্যালঙ্কার

এক গালে যে চাপড় খেয়ে
　　হেসে পাতে অন্য গাল্,
হিংসা-বশে মানুষগুলো
　　কোন্ প্রাণে দেয় তা'রেই গাল্।
　কাঁটার মুকুট তাহার মাথায়,
　রক্ত ঝরে তপ্ত শিরায়,
অঙ্গ ক্ষত অত্যাচারে
　　নাই তবু তা'র হা-হুতাশ!
　জীবের তরেই ভেবে সারা,
　প্রকৃতি তা'র এম্নি ধারা,
শরীর আপন করল পাতন্
　　সে নয় মায়া-মোহের দাস।
　মরণ-দোলায় তাহার হাসি
　ডুবিয়ে দিল হিংসা-রাশি
বিশ্ব গাহে বিস্ময়েতে
　　আজ তাহারি প্রেমের জয়;
রক্ত দিয়ে ভক্তেরি সে
　　করল সকল পাপের ক্ষয়—
　　তা'র নামে চাই শান্তি-ভাষ!

কবি আনন্দময়ী দেবী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

অষ্টাদশ শতকে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব মহিলা যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি আনন্দময়ী দেবীই অন্যতম। আনন্দময়ী দেবীকে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি বলিয়া অভিহিত করা যায়। এমন কি, আনন্দময়ী দেবীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্তা আধুনিক মহিলার সমকক্ষ বলা যায়।

অষ্টাদশ শতকে আনন্দময়ী দেবী ব্যতীত যজ্ঞেশ্বরী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, সুন্দরী দেবী, দ্রবময়ী দেবী প্রভৃতি শিক্ষিতা মহিলাদের নাম ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গামণি দেবী বিক্রমপুর অঞ্চলের লাখা জয়নারায়ণের ভগিনী ছিলেন। গঙ্গামণি বহু গান রচনা করেন। তাঁহার রচিত অনেক গান এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে বিবাহের সময়ে নারীদের দ্বারা আলোচিত হয়। ফরিদপুর জেলার ব্রাহ্মণ মহিলা সুন্দরী দেবী ন্যায় শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গঙ্গামণি দেবী ও সুন্দরী দেবীর কাল উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে। রেভারেণ্ড জে, লং সাহেব তাঁহার তালিকায় সুন্দরী দেবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক চণ্ডীচরণের বিদুষী কন্যা দ্রবময়ী দেবীও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। দ্রবময়ী দেবী তাঁহার পিতার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। তৎকালে হটী বিদ্যালঙ্কার নাম্নী একজন মহিলাও সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। অষ্টাদশ শতকের কবিওয়ালা সাহিত্যে দাশরথি রায়, রামনিধি রায়, হরু ঠাকুর প্রভৃতি পুরুষ কবিদের জনপ্রিয়তার কথা আমরা সকলে জানি। কবিওয়ালা সাহিত্যে একজন মহিলা কবিও সুপরিচিত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন —ইনি হইতেছেন যজ্ঞেশ্বরী দেবী। যজ্ঞেশ্বরী দেবীর রাতি সখী সংবাদ গানগুলি তৎকালে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী দেবীর কবিত্ব বেশ মনোহর, গানগুলির সারমর্ম্মও মূল্যবান। এখানে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"আমায় বন্দী করি প্রেমে,
এখন ক্ষ্যান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
আমি কুলবতী নারী
পতি বই আর জানি নে॥
এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও,
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা,
কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা—
অসতীর আশা পুরাও॥"

ইঁহাদের মধ্যে আনন্দময়ী দেবীই হইলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আনন্দময়ী দেবীর পিতার নাম রামগতি সেন। রামগতি সেন 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' ও 'যোগ-কল্প লতিকা' গ্রন্থ দুইখানি রচনা করিয়া তৎকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। 'মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা' বাংলা কাব্য গ্রন্থ এবং 'যোগকল্পলতিকা' সংস্কৃতে রচিত। রামগতি সেনের ভ্রাতা জয় নারায়ণ সেন 'চণ্ডীকাব্য' ও 'হরিলীলা' গ্রন্থ রচনায় জয় নারায়ণ সেন তাঁহার বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর নিকট যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলেন। 'হরিলীলা' ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ পাতার পরে লিখিত হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যারাম সেনের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। অযোধ্যারাম পয় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং ইনিও সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর কবিত্ব প্রতিভা অধিকতর সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আনন্দময়ী দেবীর কবিত্ব-প্রতিভা তৎকালে সেনহাটী, মূলঘর, জপ্সা, পয়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জয় নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া

'হরিলীলা' কাব্যখানি রচনা করেন। ইহাতে আনন্দময়ীর রচিত কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, আনন্দ ময়ীর কবিতা সহজ, সরল ভাষায় চলিয়াছে। তাঁহার কাব্যের শব্দ গৌরব ও প্রশংসনীয়। আনন্দময়ীর সহজ কবিতার ভাষা এইরূপ—

"রহিয়াছি চির বিরহিনী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে ॥
ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি ॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে ॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী ॥
যে কঙ্কন করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কানে ॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী ॥"

আনন্দময়ী দেবী রচিত কতকগুলি কবিতায় সংস্কৃতের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যে তিনি সবিশেষ শিক্ষিত ছিলেন, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়। আনন্দময়ীর সংস্কৃত ঘেঁসা কবিতার নমুনা এইরূপ :—

"কত চারু বক্তা সুবেশা সুকেশা।
সুনাসা সুহাসা সুবাসা সুভাষা ॥
কত ক্ষীনমধ্যা শুভাসা সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা বশিজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা ॥
দেখি চন্দ্র ভানে কত চিত্ত হায়।
নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা ॥
সুকক্ষে নিতম্বে উরু হেম কুম্ভে।
এভাবে ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে ॥
স্থনে একে কেহ কেহ চন্দ্র ভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥
স্বহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে।
ঝনাত্ ঝনাত্ গলত্ গলত্ পড়ে নীর অঙ্গে ॥"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আনন্দময়ী দেবী একটী উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিবার যোগ্যা। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে আনন্দময়ীর দান অপরিসীম মূল্যবান্। অষ্টাদশ শতকের দীর্ঘকালস্থায়ী দারুণ অরাজকতার ফলে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অধঃপতনের যুগে আমরা দুই জন শক্তিশালী কবি লাভ করিয়াছি—একজন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫) এবং অপর ভারত চন্দ্র রায় কবি গুণাকর (১৭১২—১৭৬০).
এই অরাজকতার যুগে বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলে কবিওয়ালা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সে যাহাই হউক। অষ্টাদশ শতকের এই বিপদ সঙ্কুল আবহাওয়ায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনন্দময়ী দেবীর ন্যায় একজন প্রতিভাসম্পন্না মহিলা কবিকে পাইয়া আমরা সত্যই গর্ব্ব অনুভব করি ; বিশেষতঃ বাংলার মহিলা সমাজের গৌরব-সম্পদ রূপে কবি আনন্দময়ী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

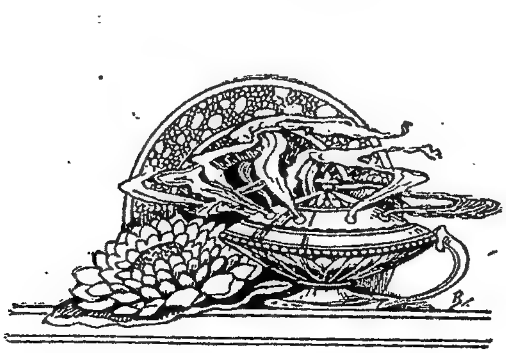

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

হাঁসপাতাল পরিদর্শন সমিতিতে মহিলা

বাঙ্গলা সরকার প্রতি বৎসর মেডিক্যাল কলেজ ও তৎ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাঁসপাতালগুলি সুপরিচালনার পরামর্শ দিবার নিমিত্ত এবং রোগীর অভাব অভিযোগ জ্ঞাত হইবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। আটাশ জন সভ্যের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে ছয় জন মহিলা সভ্যা হইয়াছেন।

বেগম ফরক্কা বানু খানম এম এল এ; মিসেস্ হাসীনা মুরসেদ এম বি ই, এম এল এ, বেগম হামিদা মোমিন এম এল সি, মিসেস্ কে সি দে, মিসেস্ পি রায় ও মিসেস্ সি এস্ রুস্তমজী বর্ত্তমান বৎসরের সভ্যা হইয়াছেন।

বি এস সি পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীমতী করুণা ঘোষ (মিসেস্ বসু) পদার্থ বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার পাইয়া বি, এস, সি পাশ করিয়াছেন। ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী।

কুমারী বেলা বসু স্কটিস চার্চ হইতে বি এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রী

বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্বদিদ্যালয় হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরাজীতে অনার লইয়া ২৩টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে চিত্রা মজুমদার (লরেটো) পাশ করিয়াছেন। উমারাণী চক্রবর্ত্তী ও মঞ্জু গোস্বামী (বেথুন), ভবানী সরকার ও শান্তি খোসলা (ভিক্টোরিয়া) এনাক্ষী সেন গুপ্ত (স্কটীস) নীলিমা দত্ত (ময়মন সিং), অরুণা মিত্র (বিদ্যা) রেণুকণা সিংহ, রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী 'অনার' পাইয়াছেন।

সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার পাইয়াছেন অনিমা চক্রবর্ত্তী, গায়ত্রী রায়, সবিতা দে, দীপ্তি সেন, বাদলরাণী রায়, (ভিক্ট) প্রমীলা দত্ত (বিদ্যা)।

ইতিহাস—রাধারাণী সোম (আশু) গৌরী মজুমদার (বিদ্যা) হেমপ্রভা কাকুতি (সিলেট) দ্বিতীয় শ্রেণী অনার পাইয়াছেন।

অর্থনীতি শাস্ত্রে মণিকা গুহ (ভিক) বেলারাণী বসু ও অমিতা গুপ্ত (বেথুন), প্রতিমা রায় চৌধুরী (বিদ্যা) বাণী মজুমদার, মায়া সেন ও নমিতা দাস গুপ্ত (আশু) দ্বিতীয় শ্রেণীর অনারে পাশ হইয়াছেন।

মানসী চক্রবর্ত্তী (আশু) অঞ্জলী মজুমদার (বেথু) অরুণা সেন গুপ্ত (রাজসাহি), বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন।

দেশবন্ধু মহিলা উদ্যান-সমিতি

শ্যামবাজার অঞ্চলে দেশবন্ধু পার্কের উত্তর অংশে মহিলাদের বায়ু সেবন ও ব্যায়াম ক্রিয়াদি করিবার নিমিত্ত বিশাল ভূমিখণ্ড ব্যবহৃত করিতে কলিকাতা কর্পোরেশন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকল প্রকার খেলাধুলার বন্দোবস্ত ফাঁকা যায়গায় মিলিত হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার, আমোদ প্রমোদ ও নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য দেশবন্ধু মহিলা সমিতি ৭ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয় এবং মহিলাদের আন্দোলনের ফলে ১৩৪০ সালে এই উদ্যান সমিতি উক্ত খোলা যায়গা ব্যবহৃত করিবার অনুমতি পান। এখন প্রায় ৫০০।৭০০ মহিলা নিত্যই বায়ু সেবন ও মেলা-মেশা করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী বিভাবতী মুখার্জ্জি (মিসেস এম, এন, মুখার্জ্জি) সম্পাদিকা ও লেডী ননীবালা ব্রহ্মচারী সভানেত্রী হইয়া এই সমিতির শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সমিতির বাৎসরিক উৎসবে উত্তর কলিকাতার বহু গণ্যমান্য

ও সাধারণ গৃহস্থের পর্দানশীল মহিলা যোগদান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ষে মাননীয়া লেডী সিনহা উৎসবের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। সম্পাদিকার ঐকান্তিক যত্নে এই সমিতি কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাংশের নারীদের পরম কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

এরূপ মহিলা সমিতি কলিকাতার অন্যান্য অংশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভবানীপুরে সাউদার্ণ পার্কের (রমেশ মিত্র রোড) উপর মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাগানে তদনুরূপ উদ্যান-সমিতি হওয়া প্রয়োজন। উন্মুক্ত বায়ু সেবনের সহিত সামাজিক মেলামেশাও একান্ত প্রয়োজন।

সাহিত্যের ষ্টাইল

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সাহিত্যে ষ্টাইল বড় না বিষয়বস্তু বড় সে নিয়ে কত জনে কত রকম করে তর্ক করেছেন। তাঁদের তর্কের ভাষা প্রখর, যুক্তিতে এবং পাণ্ডিত্যের জালে জটিল। তাঁদের সে সকল গবেষণার পরেও এনিয়ে আবার আমার আলোচনা করবার প্রয়োজন হয় তো অনর্থক। কিন্তু একে অনর্থক বলেই বুঝতাম এবং এইখানেই থাম্‌তুম, যদি না মনে হতো, বহু আলোচনার পরেও জিনিষটার দুর্ব্বোধ্যতা খুব বেশি স্বচ্ছ হয় নাই। এমন হবার কারণও বোধকরি যথেষ্ট রয়েছে। কারণ সাহিত্যের বিষয়ে আমরা যা কিছু বলতে চাই বা বোঝাতে চাই, তার ভিত্তিকে দাঁড় করাতে হয় যুক্তির চেয়ে উপলব্ধির উপরেই বেশি। যুক্তি এবং তর্কের চেয়ে অনুভবের আসন এখানে অনেক উচ্চে।

একথা বলা বাহুল্য, ফ্যাক্টস্ এবং ফীগার সম্মিলিত রচনা যে পরিমাণ প্রাঞ্জল হবে, হৃদয়ের নানা সুকুমার ব্যঞ্জনা যেখানে প্রকাশ করতে হয় তার ভাষা ঠিক তেমনটি হবেনা। ততখানি প্রখর স্পষ্টতা বোধকরি অব্যাহত থাকবে না। এসে পড়বে গোধুলি বেলাকার ছায়াময় অন্ধকার, প্রত্যুষের অস্পষ্ট ইসারা। কারণ এর ভাষা এবং হৃদয়ের ভাষা এক নয়। তাই এ সম্বন্ধে বহু লোক বহু কথা লেখা বলা সত্তেও আরও গোটাকতক কথা বলবার ধৃষ্টতা সংবরণ করতে পারলুম না। এসম্বন্ধে আমার নিজের যা মনে হয়, তাই অন্ততঃ সংক্ষেপে বলতে প্রবৃত্ত হলুম।

ষ্টাইল বস্তুটিকে ছোট করে দেখা অসম্ভব। সাহিত্যে যে জিনিষটিকে আমরা ষ্টাইল বলে থাকি, মানুষের বেলায় তাকেই বলি পার্সোনালিটী, ব্যক্তিত্ব। অমুক লেখকের ষ্টাইল আমার অতিশয় ভালো লাগে এমন কথা আমারা যখন বলাবলি করি তখন পরিষ্কার করে বোঝাতে পারিনে; কী বলতে চাই। অমুকের ষ্টাইল ভালো লাগে, তার মানে কী? ভালো কি লাগে তাঁর শব্দবিন্যাস-ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাঁর বলার নূতনতম ভঙ্গী? কিন্তু ঠিক কেমন করে জবাব দেব ভেবে পাইনে। এইটুকুই কেবল বারংবার মনে হতে থাকে, তাঁর সৃষ্টি থেকে এমন একটা প্রাণের হিল্লোল স্পন্দিত হচ্ছে, এমন আলো বিকীর্ণ হচ্ছে যা আমাদের মনকে আলোকিত করচে, আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ অভিভূত করছে। মানুষের ব্যক্তিত্বও তাই। যখন বলে যাই অমুকের অতিশয় ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তখন তাঁকে কী ভাবে পরিচিত করতে চাই? মনের সম্মুখে যে বস্তুর আভাস জেগে উঠে তার আকৃতি এবং প্রকৃতির কি কোন স্পষ্ট নিশানা রয়েছে? সেখানে একের পর এক কি কোন বিশেষ গুণের তালিকা স্থান পায়? শুধু মনে হয় তাঁর অস্তিত্ব মাত্রই আমাদের আনন্দিত করে। ষ্টাইল জিনিষটাই এমনি রহস্য-রমণীয়।

বস্তুতঃ ষ্টাইলই হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের প্রধান অংশ। আমাদের জীবনের, কর্ম্মের, ভাবনার ষ্টাইলটাই আমাদের সবচেয়ে পাকা পরিচয়। এবং আমার মনে হয়, সাহিত্যও তাই। শিল্পী যখন তাঁর বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে

সভায় বসলেন, তখন যদি তাঁকে ঘিরে তর্ক চলতে থাকে, তাঁর কাব্যের কথা বড় না সুর শ্রেষ্ঠ। তাঁর গল্পটাকে দেওয়া হবে বেশি প্রাধান্য না গল্প বলার রীতিকে—তাহলে সেই তর্কের জের চিরকাল ধরেই চলতে থাকবে, হবে না কখনো সমাধান। কারণ এ বস্তুর সমাধান নেই। তাই গুণী স্মিত হেসে বলেন, ও সব তর্ক এবং তত্ত্ব কথা তুলে রাখ। রেখে মন দিয়ে শোন, আমার গল্প বলার সঙ্গে গল্পটা কখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। পারবে না আর তাদের আলাদা করে বিচারে প্রবৃত্ত হতে। যে বস্তুর জোরে এমন সম্ভব হয়েচে, যার বলে সামান্য কয়েকটা কথার মধ্য দিয়ে বাণী মূর্তিমতী হয়ে উঠেচে তাকে বলে সম্মোহন। সেই সম্মোহনের নামই ষ্টাইল।

তা ছাড়া, মনে হয়, যে সাহিত্য সুন্দর যে সাহিত্য বড় তার ষ্টাইলও সুন্দর হবেই। অন্তর্প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিবৃত্তির বিশিষ্টতা যেমন মুখের রেখায় দেদীপ্যমান হয়ে মুখশ্রীকে করে উজ্জ্বল, করে কমনীয় তেমনি করেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা, তার গভীরতা রচনা রীতির 'পরে ছায়া বিস্তার করবে। এ দুইয়ে বিরোধের চেয়ে মিল বেশি। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের রাম চরিত্র সৃষ্টি করবার আগেই রামের মহত্তর জীবনকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ছন্দ পেয়েছিলেন। আগে তাঁর এসেছিল ষ্টাইল এসেছিল ছন্দ। সেই অপূর্ব্ব ছন্দের সৌরভে উতলা হয়ে তিনি যখন হাতড়ে ফিরছিলেন এমন ভাষায় যাকে সৃষ্টি করবেন, সে কে? তখন ত্রিভুবনও কৌতূহলী হয়ে তাঁর দিকে সপ্রশ্নে চেয়েছিল।

"বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্ত ছন্দোবানবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস, বোলো তাঁরে
'ওগো ভাগ্যবান্। এ মহা সঙ্গীত ধন কাহারে
করিব তুমি দান? এই ছন্দে গাঁথি লয়ে
কোন দেবতার যশঃ কথা
স্বর্গের অমরে, কবি, মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা?

সাধারণতঃ কবির থাকে সুন্দর করে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এবং তৎসঙ্গে প্রকাশের বস্তু। একদিকে যেমন তিনি অপূর্ব্ব অন্তর্দৃষ্টি বলে জীবনের এবং জগতের নব নব রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেন, প্রত্যহের সাধারণ জীবনযাত্রীর অন্তরালে যে সব অসামান্য বিস্ময়, ক্লেশ, বেদনা, আনন্দ, অন্যায় এবং অপমানের গুঞ্জন ... যাচ্ছে তাদের মর্ম্মরধ্বনি কান পেতে শোনেন, তেমনি সে ধ্বনিকে বহু লোকের শ্রুতিগম্য করে তুলবার ক্ষমতাও তাঁর থাকে। এক কথায় তাঁর experience এবং expression দুইই রয়েচে, এবং এ দুই-ই সমভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। কোথাও কোথাও হয়তো দেখা যায়, লেখকের Expression আছে কিন্তু experience নেই। নানা রঙের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম বর্ণবিলাস রয়েচে কিন্তু যে ছবিটা আঁকা হয়ে চলেছে তার নেই কোন যৌক্তিকতা। জীবনের গভীরের সঙ্গে নেই কোন যোগ-বন্ধন। সেখানে প্রথমে চোখের ঘোর যেমন করেই লেগে থাক, সে ঘোর দু'দিনেই কেটে যেতে বাধ্য। কারণ মনকে ভুলিয়ে নিতে না পারলে কেবল চোখের যে মোহ-অঞ্জন সে বস্তু স্থায়ী হয় না। এমন ধরণের লেখার ষ্টাইলটাকেই যথাসর্ব্বস্ব বলে বড় গলায় প্রচার করে বেড়ানোটা হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি, যখন আমরা বিমূঢ় হয়ে বলে থাকি অমুক লোকের ব্যক্তিত্বটা বুঝি শুধুই নির্ভর করে তার ব্যাক্ ব্রাশ এবং ব্লেজার কোটের উপর।

বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত ভালো ষ্টাইলের সাহিত্যের প্রয়োজন সর্ব্বব্যাপী।

কারণ পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের চিন্তা এবং কর্ম্মের ষ্টাইলটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে পাকা পরিচয়, এবং জীবনের ভিত্তিমূলে কোন একটা বস্তুকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে আমাদের এই ষ্টাইল রচিত হয়ে উঠতে থাকে। আগেকার দিনে দৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস এই কেন্দ্রস্থল ছিল। তারই ছন্দ-লয়ে-তানে জীবনের ষ্টাইল গড়ে উঠত। কিন্তু আজ সে বিশ্বাসের কেন্দ্র আলগা হয়ে গেছে। একটা আশ্রয় শিথিল হয়ে গেলে নব আশ্রয়ের সন্ধান করতে হয়। আমাদের স্বধর্ম্ম তাই। সেই নব আশ্রয় আজ লোকে সাহিত্যের মাঝে খুঁজছে। ভালো সাহিত্যের প্রভাব তাই আজকার দিনে আমাদের কাছে অপরিসীম। ছোট থেকে সিনেমা দৃশ্য এবং সিনেমা সাহিত্যের আওতায় যারা মানুষ তাদের জীবনের ষ্টাইল নিকৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাদের যৌবনের চেতনা এবং যৌবনের বেদনা সিনেমা জাতীয় সাহিত্যে পরিপুষ্ট তাদের প্রেমের আদর্শে এবং

যারা সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট কিংবা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার মত সাহিত্যের উত্তাপ উপভোগ করে এসেছে তাদের প্রেমের আদর্শে আসমান জমীন তফাৎ থাকবেই। এই কথাটা আজ খুব ভালো করে বুঝতে হবে কেননা নৈতিক বন্ধনের যেদিকটা দৃঢ় বদ্ধ সংস্কারের লাগামে বাঁধা থাকত তা আর নেই। এখনকার যুক্তি সর্ব্বস্ব বিজ্ঞানের যুগে তার অনেকখানি আলগা হয়ে গেছে। এখন সেই ভার এগিয়ে এসে নিতে হবে সৌন্দর্য্যে, নিষ্ঠায়, গভীরতায়, সমবেদনায় পূর্ণ প্রাণবান সাহিত্যকে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জাতির ষ্টাইল যেমন করে গড়ে উঠ্‌তে পারে এমন আর কিছুতেই নয়।

সাহিত্যের দরবারে মাঝে মাঝে আরও একটা তর্ক উঠে থাকে,

সাহিত্য বড় না জীবন বড়? সাহিত্যের একটা আলাদা কল্পলোক রয়েচে না জীবনকেই সে প্রতিপদে হুবহু অনুকরণ করবে।

এ সব তর্কের সমাধান অনেকে অনেক রকম করে করেচেন। কিন্তু একটা সন্দেহ কেন সবারই মনে জাগছে না যে জীবনকে হুবহু নকল করবে কি, জীবনই যে আজকাল পদে পদে সাহিত্যকে অনুসরণ করছে। আমাদের মন খানা ক্রমশঃ এমন সাহিত্যিক ধাঁচের হয়ে উঠছে যে, আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ দেখলেই যেন আমরা আওড়াতে বসি, "মেঘলোকে ভবতি সুখিনোপি........" এবং কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত্ততার সময় কেউবা উচ্ছ্বসিত হয়ে স্মরণ করে, Make me they lyre even as the forest is." এবং ঘন বর্ষার গাঢ় কালিমা লিপ্ত আকাশের বৃষ্টির ধারার দিকে চেয়ে কারও মনের মধ্যে গুঞ্জন চলতে থাকে, "নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টি ধারা........" তাজমহল দেখতে যেয়ে সেই বিখ্যাত লাইনটি সবাই মনে মনে একবার স্মরণ করেন, "সৌন্দর্যের পুষ্প পুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"

সন্তপুত্রহীনা কোন মা তার ব্যথার দিনে মনে মনে না বলচেন—

"আমার খোকা সে কি হারায়, আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।"

জীবনই আজ সাহিত্যের রঙে রাঙা হয়ে উঠেচে, এবং জীবনের উপর যে বস্তু এতখানি আভা ফেলে, এমন করে তাকে লাবণ্যময় করে, রুচির অভিজাত্যে, সত্যের মহিমায় সুন্দর ষ্টাইলে তাকে যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই হবে, এ কথাটা যেন আমরা অহর্নিশি মনে রাখি।

ওগো আকাশের অনাদি-কালের মূক—
কী ভাষায় কও কথা—
বুঝিবার লাগি খালি করে রাখি বুক,
সে ভাষা কি নীরবতা?

—'ফাল্গুনী'

পুরীর বসন্ত-কুমারী বিধবাশ্রম

শ্রীনলিনী সোম, বি, এ, বি, টি

"তুমি এই ক্ষুদ্রতনদিগের একজনের প্রতি যাহা করিয়াছিলে, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছিলে।"

গত ৮ই মে আমি আর বড়মা পুরীযাত্রা করিয়াছিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। ষ্টেশানে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী 'অভয়' আমাদিগকে নিতান্তই 'সভয়' করিয়া তুলিয়াছিল। না আছে কুলী—না আছে লোকজন অথচ ছোটতে বড়তে চোদ্দটি মাল পার করে কে? বড়মা ও আমি নিরুপায় হইয়া স্কুলের ভাঙ্গা 'বাসের এক কোনে স্থান গ্রহণ করিলাম। অবশেষে বড়মার তাড়নে কুলির বদলে অভয় নিজেই মালগুলি বহন করিতে লাগিল ও ক্লিনার ত্বরিৎপদে সেগুলি বাসে ভরিতে লাগিল। তখন ঝরঝরে বাস মানুষ-মাল এবং জিনিষ-মাল ভর্ত্তি হইয়া, অসমান পথে, তীর বেগে মরিয়া হইয়া ছুটিল। যাহারা এইরূপ বমাল সমেত ভাঙ্গা বাসে অসমান পথে যাত্রা করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিবেন এ যাত্রায় সুখ কত, কিন্তু এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে বড়মা কদাচ বিচলিত হন না, তিনি সমানে আশ্রমের কুশল, আশ্রমবাসিনীদের সুখদুঃখ এবং পুরীর অন্যান্য খবর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিজের মতামত দিলেন।

কোন সহৃদয় পাঠক যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুরীর বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রমের সংলগ্ন বিদ্যালয়টীকে একটি নতুন বাস দান করেন তাহা হইলে অনেক বালক, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবে, এবিষয়ে আংশিক সাহায্যও প্রার্থনীয়, কেন না বাসটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহার জীর্ণ পঞ্জরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আশ্রমটী শান্ত স্নিগ্ধ আত্মসমাহিত। এখানে চাঞ্চল্য নাই, অস্থিরতা নাই, জাক জমকের কোনরূপ আড়ম্বর নাই। এখানকার প্রাণ বড়মা, তিনিই বিধবাদের সুখদুঃখ নিজ প্রাণে অনুভব করিয়া যতটা পারেন ততটা দুঃখ দূর করেন; বাড়ী বাড়ী গিয়া অর্থভিক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেন। লাট পত্নী, পুরীর রাজা ও মহান্তগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী, উকিল ও পুলিশ সকলেই একাধারে বড়মার গুণমুগ্ধ, সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বৃদ্ধা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার যোগ্যা, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়,—পরের জন্য বাঁচতে পারা তবেই বাঁচা ধন্য হয়।

আশ্রমের 'ম্যাস্কট' বালক ঢুলু, বয়ঃক্রম ছয় বৎসর, শীর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ, বৈশিষ্টের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জল দুই চক্ষু। যাহা সব দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করে। আশ্রমের ভিতর থাকিয়া ঢুলুও শান্ত ও গম্ভীর। সে একমাত্র পিসিমার ওপর কেবল অত্যাচার করে। সেখানেই সে কেবল বালক, নতুবা আর সকলের প্রতি ব্যবহার প্রবীণের ন্যায়। একদিন বড়মা বলিলেন—"ঢুলু তোমার পিশিমাকে একবার ডাক।" ঢুলু গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "তুমি ডাকছ শুনলেই তাকে কি আর পাওয়া যাবে, সে একটা বিশেষ স্থানে গিয়া দোর দিয়ে বসে থাকবে।" একদিন আমি বলিলাম, "ঢুলু, দুটো চকলেট খাবে?" সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "খাবার কথা বললে এখানে আর আসা চলবে না।" এই নির্ব্বিকার শান্ত বালকটীকে আশ্রমবাসিনী সকলেই খুব ভাল বাসে; ঢুলুর লোভ নাই, কিন্তু প্রাপ্য অধিকারের প্রতি নজর আছে। প্রাইজের দিনে ঢুলুর সহপাঠি দুই বালক একটি করিয়া বল পেন্সিল পাইয়াছিল, ভূলক্রমে ঢুলুকে দেওয়া হয় নাই, তৎক্ষণাৎ ঢুলু বড়মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ওরা বল পেন্সিল পেলে আমি পেলুম না কেন? বড়মা আদেশ দিলেন, এখুনি ঢুলুকে বল পেন্সিল দাও, আর ঢুলু তুমি কি একটা বই চাও?"

তুলু বলিল, "বই আমার পাবার নয় আমি উচু ক্লাসে পড়ি না।"

আশ্রমের অভাব অনেক, টাকার বড় অকুলান। অনেক নিরাশ্রয় বিধবা টাকার অভাবে একটা স্থান পাইতেছে না, কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, আমরা কি তাহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি না? আপনার কন্যার বিবাহে, দশ হাজার টাকার অলঙ্কার তাহার অঙ্গে ধরাইতে পারিতেছেন না, বাক্সে ভরিয়া রাখিতেছেন। আপনি কি তাহার সামান্য কিছু আপনার এই বিধবা কন্যাদের দিকে ফেলিয়া দিতে পারেন না? যদি দেন, জানিবেন যে দুইখানা অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে যে আশীর্ব্বাদের বর্ষণ আপনার কন্যার মস্তকে হইবে তাহার মূল্য কোন অংশেই ঐ অলঙ্কারের মূল্য অপেক্ষা কম নহে।

সতেরই মে বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রম সংলগ্ন বিদ্যালয়ের পরিতোষিক দিবস ছিল। লেডী হাভাক সেদিন দুই ঘণ্টা মেয়েদের উৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন ও তাহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। পুরীর যাবতীয় গণ্য মাণ্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। উৎসব ব্যাপার সেদিন সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, বড়মা, সেক্রেটারী আটলবাবু যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্কুলের মেয়েরা অতি সুন্দররূপে গান বাদ্য নৃত্য আবৃত্তি দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে তুষ্ট করিয়াছিল এবিদ্যালয়ে আশিটী ছেলেমেয়ে পড়ে, তাহাদের স্কুল এখনও সমাপ্ত হয় নাই; আসবাবপত্রের অভাব আছে। কেহ যদি এ সকল বিষয়ে কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিবেন।

"বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা"

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসার সমিতি

গত ১৮ই জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং এ রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসার সমিতির পরীক্ষা সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক পরিচালিত 'প্রবেশিকা' পরীক্ষার কার্য্যে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কলিকাতায় উক্ত পরীক্ষার একটী কেন্দ্র করিবার বিষয়ও সাব্যস্ত হইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক রায় সাহেব দেব নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত ও অন্যান্য সভ্যগণ সভার কার্য্যে যোগদান করেন।

পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীকে অঙ্ক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প ভাষাতত্ত্ব, কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ও নাটক এই নয়টী বিষয়ের যে কোন দুইটী বিষয়ে এবং বাঙলা ব্যাকরণ ও রচনা (অবশ্য গ্রাহ্য) বিষয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে গুণানুসারে প্রশংসাপত্র, পদক ও নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুই টাকা দক্ষিণা সহ ৩১শে জুলাইর মধ্যে আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইতে হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত জায়গায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা, অথবা রায় সাহেব দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ।

সরোজনলিনী নারী-সমিতি গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি বাংলা দেশের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বহু স্থানে নারীকল্যাণকর যে সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, উহা সর্ব্বত্র বিপুল ভাবে সমর্থিত হইলেও সমিতির নিজস্ব কেন্দ্রগৃহ এতাবৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই দীর্ঘকাল পরে কলিকাতা পৌরসভার আনুকুল্যে এবং বাংলা সরকারের ঔদার্য্যে গত ৩ই জুন বৃহস্পতিবার প্রাতে নয় ঘটিকার সময় বালীগঞ্জ ষ্টশনের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন রোডের উপর দেড় বিঘা জমিতে সমিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব প্রাচীন আর্য্য, মুসলীম ও খৃষ্টীয় পদ্ধতিতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

আম্র-নারীকেল-ছায়াস্নিগ্ধ প্রাবৃট-প্রভাতে বহু মনীষী বৃন্দের সমবেত শুভেচ্ছার মধ্যে সেদিনের উৎসবানন্দ সত্যই আনন্দজনক হইয়াছিল।

উক্ত দেড়বিঘা জমি নামমাত্র খাজনায় কলিকাতা কর্পোরেশন সরোজনলিনী সমিতিকে দান করিয়াছেন এবং বাংলা সরকার গৃহনির্ম্মাণের জন্য ত্রিশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে প্রথমতঃ পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও তারাদাস মুখোপাধ্যায় বৈদিক বিধানে পূজা হোমাদির পর পঞ্চরত্ন, প্রচলিত মুদ্রা, সংবাদপত্র, সমিতির কার্য্য বিবরণী প্রভৃতি দিয়া প্রথম ইষ্টকখণ্ড স্থাপনের সঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, বৈদিক শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সমিতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—

“যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র মরুত স্তুন্বন্তি দিবৈ স্তবৈঃ
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপণিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥”

অতঃপর মিঃ রফিকউদ্দীন আহাম্মদ ও খান বাহাদুর এ, এফ, এম, অবদার রহমান মুসলিম প্রথায় প্রার্থনা করিলে কুমারী হেমনলিনী মল্লিক খৃষ্টীয় প্রথায় প্রার্থনা করিয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্য শেষ করেন। সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সদস্য ইষ্টকখণ্ডের উপর চুণসুরকী দিয়া সানন্দে এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে যোগদান করেন। সর্ব্বশেষে জলযোগের পর এই উৎসব সমাপ্ত হয়।

মেসার্স এ, কে, আদিত্য এই বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন; সুবিখ্যাত পূর্ত্তবিদ শ্রীযুক্ত এম, এন, মুখার্জ্জি বি, ই, এম, আই, ই, অনুগ্রহ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে এই নির্ম্মাণ কার্য্য দর্শনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সমিতিগৃহ নির্ম্মিত হইবে।

ঐ দিন উৎসব কার্য্যে যে সকল ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

রায়বাহাদুর এ, সি, ব্যানার্জ্জি, সি, আই, ই, রায় শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী, কর্ণেল এ, সি চাটার্জ্জি, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, মিঃ পরেশলাল সোম, মিঃ জে, কে, মিত্র, মিঃ জি, কে, সেন, মিঃ জি, সি, ঘোষ, মিঃ জি, এন, সরকার, রায়বাহাদুর উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মিঃ জে, সি, ঘোষ, মিঃ বি, এস, দত্ত, মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জি, মিসেস সুধীরা মজুমদার ইত্যাদি।

যাঁহাদের আনুকুল্যে ও অর্থ সাহায্যে সরোজনলিনী সমিতির এতদিনের অভাব দূর হইতে চলিল তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দানের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী সকলের নিকট এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারা যেন অকাতরে সমিতির গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে অর্থ সাহায্য করেন। এই গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে সমিতিকে এখনও ত্রিশহাজার টাকা তুলিতে হইবে, নহিলে তাহার রিজার্ভ ফাণ্ড সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেলে সমিতির ভবিষ্যত কার্য্যপন্থা সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে নিশ্চয়ই। আশা করা যায়, সমিতির পৃষ্ঠপোষকগণ ও অনুগ্রহকারীগণ অবিলম্বে সমিতির গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে অন্ততঃ ত্রিশহাজার মুদ্রা প্রেরণ করিয়া এই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-দিবসকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।

যত বেশী—তত ভালো

নিউ ইয়র্কের মাসিক পত্র "Tea & Coffee Trade Journal"এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিলো—প্রায় দশ বছর আগে। ঐ প্রবন্ধে চার্লস্ জাজ্ নামে কলকাতার একটি ভদ্রলোক গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে চা-পানের ফলাফল নিয়ে যে গবেষণা করেছিলেন তারই আলোচনা ছিলো। ফ্রান্সের Henri Neuville, জার্ম্মানীর Schulte im Hofe এবং হল্যাণ্ডের Nanninga প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মতামত আলোচনা করে' জাজ সাহেব যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার কয়েকটা নিচে উদ্ধৃত করছি :

"চীন ও জাপানের অসংখ্য অধিবাসী নিয়মিতভাবে যে পরিমাণ চা খায় সে কথা ভাবলে বোঝা যায় যে, চা শরীরের ক্ষতি করে এ-ধারণা কত ভুল। চীনে ও জাপানীদের হজমশক্তি বেশ ভালোই—অন্তত এর বিরুদ্ধে কখনো কোনো কথা শোনা যায় নি—তাছাড়া, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের প্রচুর চা খাবার অভিজ্ঞতা থেকেও এই মন্তব্য সমর্থন করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকেরা বোধ হয় পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী চা খায়; বল্‌তে গেলে তারা দিন রাতই চা খাচ্ছে, তবুও এদের স্বাস্থ্য অটুট রয়েছে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়লো। গত বছর লণ্ডনে লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল ওয়াল্টার স্মাইল্‌স্ সি, আই, ই, ডি, এস, ও; এম্, পি, একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে হজম শক্তির উপর চায়ের কোনো ক্রিয়া আছে, এরকম মনে করা অত্যন্ত ভুল। স্যার ওয়াল্টারের মতে : "এরকম অদ্ভুত ভুলের একমাত্র জবাব হচ্ছে এ-বিষয়ে দেশের সব ডাক্তারদের মতামত নেওয়া। সম্প্রতি ব্রিটেনের ৪,০০০ ডাক্তারের কাছ থেকে চা সম্পর্কে মতামত পাওয়া গেছে। এই সব মতামত দৃঢ়ভাবে এ-বিশ্বাসই সমর্থন কর্‌ছে যে চা মানব-দেহের পক্ষে উপকারী। এই চার হাজার ডাক্তারের মধ্যে একজন মাত্র বলেছেন যে তিনি চা-পান করেন না। অন্য সকলের মধ্যে অধিকাংশই দিনে চার, পাঁচ অথবা ছ'বার করে চা খান। ভালো করে' তৈরী এক পেয়ালা চা শরীরের কোনোই ক্ষতি করে না, বরঞ্চ উপকার করে—এ-বিষয়ে এঁদের মধ্যে একটুও মতদ্বৈধ নেই। আশা করা যায়, হজমশক্তি নষ্ট করে বলে' চায়ের যে একটা মিথ্যা দুর্নাম আছে, এখন তার শেষ হবে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সমস্ত জীবন ধরে রোজ চা খাচ্ছে, এবং সম্ভবতঃ তারই ফলে চমৎকার স্বাস্থ্য উপভোগ করছে। বাস্তবিক যত বেশি চা খাওয়া যায় শরীর ততই ভালো থাকে।"

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.

পুস্তক পরিচয়

আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর (স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥০ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস পুস্তক খানির নূতন সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন।

আলালের ঘরের দুলাল প্রথম ১৮৫৪ খৃঃ মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে "আলের ঘরের দুলাল" এক নব ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল। তৎকালীন চলিত ভাষা সংস্কৃত বহুল থাকায়, সাধারণ লোকেরা লিখন পঠনে অনেক অসুবিধা বোধ করিত। সেই সময় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় চলিত বোধ-গম্য ভাষায় এই পুস্তক রচনা করেন। 'আলালী' ভাষা বলিয়া তখন এই পুস্তকখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে অনাদৃত হইলেও, আজ প্রায় নব্বই বৎসর বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্য রচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। এই পুস্তকখানি বাঙ্গলা ভাষার দরদী ও অনুরাগী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। কেবল ভাষায় নূতনত্ব ইহার গৌরব নহে, সে কালের বাঙ্গালী সমাজের নিখুঁত ছবিও এই পুস্তক পাঠে জানা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানি বি-এ পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য পুস্তক শ্রেণীভূক্ত করিয়া বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ শিখিবার সুবিধা দান করিয়াছেন।

এই পুস্তকের সটিক পাঠ সহ সংস্করণ ছিল না। সাহিত্য পরিষদ এই পুস্তকের উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার ও প্রসারের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু ও সজনীবাবু ইহার ৪৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় তদানীন সমাজের ধারা গতি, তৎকালীন সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ধারা এবং গ্রন্থকারের জীবনী অতি দক্ষতার সহিত লিখিয়াছেন। উপরন্ত এই পুস্তকের শেষে যে সব শব্দার্থ ও বিভিন্ন পাঠের তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করিবার, বিশেষতঃ কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। সাহিত্য পরিষদ এমনই অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকগুলি সম্পাদন ও মুদ্রণ করিলে দেশের ও দশের পরম কল্যাণ হইবে।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ সচিত্র।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাসগুপ্ত একজন প্রতিষ্ঠাবান প্রবীণ লেখক। শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। দুই মাস পূর্ব্বে তিনি জয়ডঙ্কা নামে যে শিশুদের জন্য পুস্তকখানি লিখিয়াছেন তাহা যেমন সরল তেমনি সরস। বালক বালিকাগণ পুস্তকখানি পাঠে আনন্দও পাইবেন এবং বহু বিষয় শিখিবেন।

গোপাল ভাঁড় সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। সেই জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহী সভায় তাঁহার খুবই আদর ছিল। ইতি পূর্ব্বে গোপাল ভাঁড়ের গল্প বটতলা হইতে মুদ্রিত হইত। কার্ত্তিক বাবু এই সুরুচির দিনে এমনি এক ভাঁড়ের গল্পকথা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে রাখিয়া দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর প্রভাবে গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি যেমন কুরুচি বর্জ্জিত হইয়াছে, তেমনি অত্যন্ত সরস ও প্রীতিদায়ক হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে যেমন হাসিতে হইবে তেমনই নানা বিষয় শিখিতে পারা যাইবে। বুদ্ধি মর্জ্জিত না থাকিলে এমন গল্প বলিয়া মানবের চিত্তে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতে পারে না। আনন্দই মানুষকে সজীব ও সতেজ করে। এই প্রকার পুস্তক পাঠ করিলে বাঙ্গালীদের মধ্যে জড়তা কাটিয়া যাইবারই সম্ভবনা।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

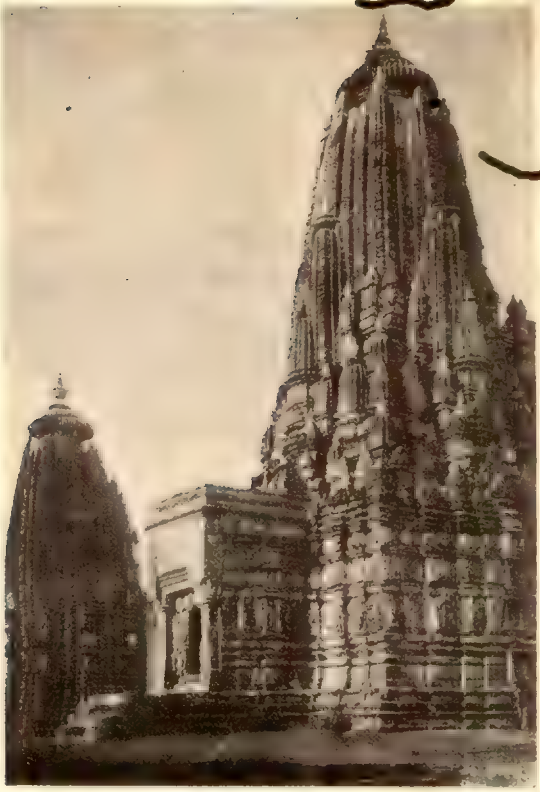

জৈন মন্দির

খাজুরাহো

১৫শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৭ | ১০ম সংখ্যা

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

তোসামারু
চীন সাগর

কল্যাণীয়েষু,

দিনু, কোথায় আছিস্ জানিনে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন নিশ্চয় তোদের স্কুল খুলেচে। তোদের শাল বাগানে আষাঢ়ের নব মেঘ ঘনিয়ে এসেচে, তোদের জামগাছগুলোতে মেঘলা রঙের ফল ফলেচে, প্রান্তর-লক্ষ্মী সবুজ রংএর আঁচল দিগন্তে বিস্তীর্ণ করে দিয়েচে, তোর বেণুকুঞ্জের সভাতে এস্‌রাজে মেঘ মল্লারের সুর লেগেচে। আমি তো কিছু কালের জন্য চলে এলুম, আমাদের আশ্রমের আনন্দ-ভাণ্ডারের চাবিটি তোর কাছেই রইল, সকালে বিকালে শিশুগুলিকে সুরের সুধা বণ্টন করে দিস।

এবারে আশ্রমে চিঠি লিখবার লোকের অভাব নেই—খবর খুব বিস্তারিত রকমেই পাবি, সন্দেহ নেই—আমি এবারে চিঠি লেখায় সময় দিতে পারবো না। "সবুজ পত্র" যদি বেঁচে থাকে তবে তারই পত্রপুটে আমার লেখা দেখতে পাবি। যা কিছু অবকাশ পাই তর্জ্জমা এবং বক্তৃতা লেখায় আমাকে লাগাতে হবে। এখন পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়েচি সুতরাং তোদের দিকে আমাকে পশ্চাৎ করতেই হবে। কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টি-বাদল সুরু হোল—ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো যায়গা বেছে নিয়ে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, "শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে"—তারপর "বীণা বাজাও", তারপরে "পূর্ণ আনন্দ"—কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চলল—তখন একটা নূতন গান বানিয়ে গাইতে সুরু করলুম—শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। সেটা নীচে লিখে দিচ্চি। বেহাগ, তেওরা। তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস তো, আমার সঙ্গে মেলে কি না দেখবো—ইতিমধ্যে মুকুলকে, পিয়ার্সনকে শেখাচ্চি, মুকুল যে নেহাৎ গাইতে পারে না, তা নয়। সে জাহাজে খুব আসর জমিয়েচে।

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা দিনের রবি,
আঁধার-আলোর সকল ছবি
তোমার আকাশভরা সকল বাণী
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।
তোমার ভুবন-বীণার সকল সুরে
হৃদয় পরাণ দাওনা পুরে।
দুঃখ সুখের সকল হরষ
ফুলের পরশ ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয় মাঝে দিক্ না আনি।

আশ্রম-বালকদের আমার আশীর্ব্বাদ এবং বন্ধুদের আমার অভিবাদন।* ইতি

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ রবি দাদা

* স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

প্রয়াণের প্রাতে

শ্রীহেমলতা দেবী

মাটি, ওগো মাটি, মোর দেহগড়া মাটি,
অনন্তকালের পথে বিশ্রামের ঘাটি,
তোমাতে রাখিয়া দেহ পঞ্চভূতময়
মন মোর হতে চায় অনন্তে বিলয়!
ভোরের অমল শান্ত নিস্তব্ধ আকাশে
নিঃশব্দে মিলিতে চায় ক্ষণ-অবকাশে—
নিমেষে উন্মেষে যবে জ্যোতিরূপ-রেখা
দৃষ্টির দুয়ার পথে যায় যারে দেখা।

বাতাসে করিয়া ভর আকাশের গায়ে
মুক্ত পাখী উড়ে চলে আনন্দের ছায়ে,—
পাখী তোর বুকে বাজে অবাধের সুর
সেই সুরে চিত্ত মোর হোক ভরপুর!
বিশ্বের রহস্য মাঝে প্রবেশের দ্বার
মুক্ত হোক, দৃষ্টি হোক অনন্তে প্রসার।

মাটি, তোরে দিয়ে যাব এ দেহের সাথে
যাত্রার আনন্দগান প্রয়াণের প্রাতে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্র

১১।১।১৯১৭

প্রিয়দর্শন স্কুমার,

তোমার প্রেরিত পত্রিকাবলী খুব আমার কাজে লাগিয়াছে ঃ—আসচে বারের পরের পরের প্রবাসী দেখিও। Literary Guide খানার আগাগোড়া সমস্তটা আমি পড়িয়াছি ; তাহা দৃষ্টে Englandএর বর্ত্তমান Literary worldএর Bird's Eye View প্রাপ্ত হইয়াছি। Literary world দুই দলে বিভক্ত—পাদরীর দল এবং এন্টি পাদরীর দল। পাদরীর দল যৎপরোনাস্তি গোঁড়া, Anti পাদরীর দল over rational কিম্বা Rational with a vengeance। This is a direct result of the present war। Real religionএর কোন দোষ নাই, দোষ হচ্চে পাদরীদের গোঁড়ামি আর Anti পাদরীদের অতিবুদ্ধি। problem হচ্ছে war কেন হয়। কেহই জানে না providence এর precise will, wisdom and love কিরূপ —কেননা তাহা জানা অসম্ভব। কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত জানি, মনুষ্য গভীর অন্তরে সত্য চায়, অসত্য চায় না, Peace চায় war চায় না love চায় hatred চায় না। গোড়ায় যদি truth আনন্দ love শান্তি না থাকে তবে মনুষ্যের এ চাওয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। এ চাওয়া কোথা হইতে আসিল—অবশ্য ঈশ্বর হইতে। Darwinist বলিবেন Evolution হইতে। কিন্তু Evolution তোমার আমার নিকট খুব একটা বড় জিনিষ হইতে পারে কিন্তু অসীম জগতের নিকটে, এমন কি পৃথিবীর নিকটেও উহা একমুহূর্ত্তকালের বুদ্‌বুদ্ মাত্র। The question is কুরুক্ষেত্র তুল্য warএর ঔষধ কি?—ঈশ্বরের নিকট জয় প্রার্থনা করা ঔষধ হওয়া দূরে থাক তাহা কুপথ্যের একশেষ। উভয় Belligrent party মিলিয়া যদি ঈশ্বরের নিকট অসতো মা সৎগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্মা অমৃতংগময় আবিরাবির্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" প্রার্থনা করে তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে war থামিয়া যায়।

This is the only medicine। যা হোক litarary guide পড়িয়া আমি অনেক উপকার পাইলাম। ইহার পূর্ব্ব সংখ্যা যতগুলা আছে সবগুলা যদি আমার নিকট পাঠাও তবে আমি তোমাকে রাশি রাশি সাধুবাদ, ধন্যবাদ, ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিব। *

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বড়মামা।

---

* এবার ছুটিতে যখন রাঁচিতে ছিলুম তখন শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি। গত যুদ্ধের সময় ১৯১৭ খৃঃ ১১ই জানুয়ারী পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় যে কথা কয়টী লিখে গেছেন তার সত্যতা আজকের এই যুদ্ধের দিনে সমানভাবে প্রযোজ্য ও উপলব্ধির যোগ্য হ'বে—সে বিষয় সন্দেহ নেই। মূল চিঠিটী বিশ্বভারতী লক্ষীতে বাহির হ'লে ভাল হবে ভেবে পাঠালুম।

শ্রীক্ষিতীশ রায়

দ্রাবিড় দেশ

(২)

শ্রীকমলা দেবী

মাদ্রাজ সহর ভারতবর্ষে নাকি তৃতীয়,—"কলিকাতা আর বোম্বায়ের পরেই এর স্থান। কলকাতা আর বোম্বায়ের মতন মাদ্রাজ মোটের উপর ইংরেজদেরই তৈরী। কিন্তু তা হলেও স্থানটা প্রাচীন।

এখানে আমাদের দু'তিনটে পুরানো মন্দির আছে; আর তা ছাড়া ভারতীয় খৃষ্টানদের একটা প্রাচীন কেন্দ্র হচ্ছে মাদ্রাজ, ইংরেজদের আসবার ঢের আগে থেকে। মাদ্রাজে দেখবার জিনিস যা আছে তা আমাদের কলকাতারই মতন—সেই মিউজিয়ম বা যাদুঘর, সেই হাইকোর্ট, সেই ইউনিভার্সিটি আর কলেজ।

কলকাতার কালীঘাট থাকায় কলকাতা সারা ভারতের একটা তীর্থ স্থান কিন্তু ময়িলাপুরের মহাদেব আর পার্ব্বতীর মন্দির আর পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির থাকাতেও মাদ্রাজ সেরকম তীর্থস্থান নয়। কলকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়ের নতুন মন্দির কলকাতাকে আরও বেশী করে তীর্থের মর্য্যাদা দিয়েছে, মাদ্রাজে সে রকম কিছু নেই। তবে মাদ্রাজে সমুদ্র আছে, আর সমুদ্রের ধারে আকোয়ারিয়ম অর্থাৎ জলচর প্রাণীর সংগ্রহ আছে, সেটাকে মাদ্রাজের চিড়িয়াখানা না বলে মছলীখানা বলা চলে, সেই আকোয়ারিয়ম মাদ্রাজে দেখবার জিনিসের মধ্যে প্রধান।

মাদ্রাজে দুটো বড় রেল ষ্টেশন আছে, একটা হচ্ছে সেণ্ট্রাল, যেখানে কলকাতার গাড়ী আসে, এটা হচ্ছে বড় লাইন, আর একটা হচ্ছে এগমোর ষ্টেশন, এটা ছোট লাইনের। এই ছোট লাইনের গাড়ী সমস্ত দক্ষিণ ভারতে তামিল দেশের সব তীর্থ আর নগরে গিয়েছে।

আমাদের হোটেলটী এগমোর ষ্টেশন ছাড়িয়ে; যে ষ্টেশনে আমরা নামলাম সেখান থেকে প্রায় দু মাইল হবে। বেশ চওড়া বড় বড় রাস্তা দিয়ে গেলাম। রাস্তার লোক-জনকে আমাদের বাঙ্গালা দেশের তুলনায় বেশ একটু কালো, একটু রোগা আর বেঁটে বলেই মনে হচ্ছিল। গলা খোলা কোট, লুঙ্গির মতন করে পরা সাদা ধুতি, ঝুঁটী বাঁধা খালিমাথা, আর কপালে ফোঁটা বা রেখার ঘটা, এই হচ্ছে বেশীর ভাগ পথ চলতি লোকের সজ্জা। খালি গা, হাটু অবধি ধুতি, আর গলায় একখানা ময়লা তোয়ালে আর মাথায় উড়ে খোপায় এই রকম গরিবও খুব। রাস্তায় মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী, কলকাতার চাইতে ঢের বেশী বলে মনে হলো। আমার স্বামী বুঝিয়ে দিলেন যে এদেশে পর্দ্দা প্রথা নেই তাই মেয়েরা অবাধে রাস্তায় বেরোয়। পর্দ্দাকে এদেশে "গোশা" বলে। কাপড় চোপড় আর গয়নায় মেয়েরা খুব চটক দেখায়।

এগমোর মডার্ণ হিন্দু হোটেল, যেখানে আমরা উঠলাম, সেটী একটী মস্তবড় হাতার মধ্যে অবস্থিত প্রাসাদ;—কোথাকার রাজার বাড়ী, হোটেলের জন্য ভাড়া দিয়েছে। হাতার মধ্যে দুখানা বাড়ী, একখানা বড়, আর একখানা ছোটো। ছোট বাড়ী খানার দোতলায় খুব চওড়া বারান্দাওলা পাশাপাশি কতকগুলা বড় বড় ঘর। প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া নাইবার ঘর আছে।

আমি শুনলাম আগে মাদ্রাজের সব বাড়ীতে স্নানাদির ব্যবস্থা আমাদের রুচিমতে অত্যন্ত খারাপ ছিল। আজ কাল এবিষয়ে কিছু কিছু উন্নতি হচ্চে। তাও আবার কতক গুলি বড় বড় সহরে। মফস্বলে পরে গিয়ে দেখলাম মাদ্রাজিরা অনেক বিষয়ে এখনও আধুনিক যুগের মত ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। আমাদের হোটেলটিতে দেখলাম, বড় বাড়ীটাতে সাধারণতঃ বেশী যাত্রী ওঠেনা। বড় বড় হলঘর, একএকটা ঘরে, আটজন দশজন লোক থাকতে পারে, সে রকম একটা ঘরে দিন আট টাকা দশ টাকা ভাড়া দিয়ে কজন যাত্রী থাকতে পারে? ছোট বাড়ীটাতে যে ঘরে আমরা উঠলাম, তার জন্য আমাদের খাওয়া ধরে

প্রত্যেকের আড়াই টাকা করে দু জনের পাঁচ টাকা নেবে ঠিক হলো। চাকরের খাওয়া আর থাকার জন্য আর এক টাকা। ঘরটাতে নারিকেল দড়ির ম্যাটিং, দুটো গদি আঁটা লোহার খাট, চেয়ার, টেবিল, আয়না, এই সব ছিল। আমরা সব গুছিয়ে নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে বসতে বসতেই আমাদের জন্য চা-কাফি-জলখাবার নিয়ে এলো। মাদ্রাজি চাকর, হিন্দী জানেনা কিন্তু খুব চটপটে, ইংরিজি বোঝে, আমার স্বামীর সঙ্গে খুব তড়তড়ে ইংরাজীতে কথা কইতে লাগলো। জলখাবার যা দিয়ে গেল তা আমার স্বামীতো খুব তারিয়ে তারিয়ে খেলেন—কি একরকম সুগন্ধি পাতা দেওয়া খুব বেশী কাজু বাদাম মিশানো নোনতা মোহন ভোগ, এই পাতাটি শুনলাম কাঁচা তেজপাতা। এই নোন্তা মোহন ভোগটীর নাম "উপ্‌মা"। মাদ্রাজে সব জায়গায় দেখেছি, ঘি-টী খুব ভাল ব্যবহার করে। মশলা দেওয়া আর নিজের রুচি মতন কাঁচা লঙ্কার কুচি দেওয়া বাদাম মেশানো এই খাদ্যটী বেশ মুখরোচক লাগলো। আমার মনে হয়, এই পুষ্টিকর খাদ্যটীর বাঙ্গালীর ঘরেও স্থান পাওয়া উচিত। ঐ সঙ্গে আরও দিলে, মিষ্টি বিস্কুট, আর বড় বড় ব্যাসনের মেঠাই। আমার স্বামী কফি খেলেন। ইতি-মধ্যে দশটা বেজে গেল। আমরা ঠিক করলাম, নাওয়া খাওয়া সেরে নিয়ে তার পরে সহর দেখতে যাবো।

স্নানের ঘরে গিয়ে দেখি, উপরের কলে জল আসে না। সব হোটেলেই এই সব খুটিনাটী অসুবিধা আছে। হোটেলের চাকর দুজন তখন বড় বড় পিতলের হাণ্ডা করে স্নানের ঘরের মস্ত এক তামার ডাওাল ভরতি করে দিয়ে গেলো, জানিয়ে গেলো, যত ইচ্ছে গরম জলও তারা এনে দিবে। পরে দেখলাম, দু বালতি গরম জলের জন্য দু আনা দাম ধরেছে। বিল দেবার সময় পরের দিন এই দুই-একটা অতিরিক্ত যে খরচ ধরেছিলো, সে গুলো কিছু কিছু বাদ দেয়। আমার স্বামী বললেন যে সাধারণতঃ হোটেলওয়ালাদের দস্তুর যে এই রকম এটা ওটা সেটা ধরে বিলটা ফাঁপিয়ে তোলে, ভদ্র হোটেল হলে এরকম করেনা; আবার অনেক জায়গায় অনুযোগ করে বললে অন্যান্য অতিরিক্ত দামগুলো বাদ দেয়। যাহোক আমাদের স্নানের পরে আমরা ঠিক করলাম আমাদের ঘরে খাবার না আনিয়ে হোটেলের সাধারণের খাবার জায়গায় গিয়ে খেয়ে আসবো।

বাড়ীর হাতার মধ্যেই বাগানে এক চারদিক্-খোলা টালিতে ছাওয়া আটচালা, তার ভিতরে ১৫।২০টি মারবেল পাথরের টেবিল। এদের রান্নাঘর কি রকম হয় তা দেখতে চাইলাম। তাতে এরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের খাবার জায়গাটীর লাগোয়া রান্না বাড়ীতে নিয়ে গেলো। শুনলাম, দুপুরে বাইরে থেকে অনেক লোক ভাত খেতে এই হোটেলে আসে, আর অনেকের আপিসে বা অন্যত্র টিফিন ক্যারিয়ার করে ভাত-তরকারী এই হোটেল থেকে যায়। আমরা যেদিন হোটেলে উঠি সে দিন বেশী লোককে হোটেলে বাস করতে দেখিনি। খালি জন দশ বারো মাদ্রাজি ছোকরা হোটেলটায় ছিল, আমার স্বামী খবর নিয়ে আমায় বললেন যে এরা আপিসের চাকুরে, মেস হিসাবে মেসের মতন ঐ হোটেলে আছে। যাক্ আমরা রান্নাবাড়ীতে ঢুকলাম, জুতা বাইরে খুলে রেখে। একটী ঘরে তরকারি কোটা হয়, সেখানে দেখলাম স্তূপাকার কাঁচ-কলার খোসা, আলুর খোসা আর নারকোল ছোবড়া তার মালা পড়ে আছে। এরা তরকারিতে খুব নারকোল ব্যবহার করে। একটা ঘরে মস্ত এক পাথরের খোলায় উখনির মত এক পাথরের নোড়া দিয়ে দুইজন স্ত্রীলোক চালের গুঁড়ো আর কলাইয়ের ডাল জল দিয়ে এক সঙ্গে ঘুঁট্‌ছে। পরে শুন্‌লাম, এই চাল-জলের পিটালি থেকে ভাপে-সিদ্ধ এক রকম পিঠা তৈয়ারী করা হয়—এই-পিঠেকে "ইড্‌লি" বলে, এর ভিতরটা স্পঞ্জ বা পাঁউরুটীর শাঁসের মত হয়, এরা এই জিনিসটা খুব ভালবাসে, গরম গরম ঘি নুন দিয়ে বা টক্ ডাল অথবা তেল ঝাল মশলা দিয়ে জল খাবারের মতন খায়। রান্নার পাত্র দেখলাম, প্রায় সবই পিতলের উপর কলাই করা। সব জিনিস খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাঁধুনী বামুনরাও খুব পরিষ্কার, আর দেখতে ভদ্র। আমাদের দেশের তুলনায় এদেশে বামুনের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু এদের চেহারা চাল-চলনে খুব পরিষ্কার আর খুব বুদ্ধিমান্ বলে মনে হয়। আমাদের খাবার এরা আমাদের যেখানে খুসী সেখানে দিতে চাইলে—রান্না-বাড়ীর মধ্যে ভুঁইয়ে আসন পেতে, কিম্বা

বাইরের খোলা চালাটাতে, চেয়ার-টেবিলে। আমরা দিশি মতে ভুঁইয়ে বসেই খেতে অভ্যস্ত এবং আমার স্বামী বিলেত ঘুরে এলেও মাটীতে বসে খাওয়াই পছন্দ করেন, কিন্তু তা:সত্ত্বেও চারিদিক দেখতে দেখতে খাওয়া যাবে বলে বাইরের টেবিলেই বসা স্থির করলেন। তখন টেবিলের উপর দুখানা আঙ্গট কলা পাতা পাতলে আর তারপরে ভাত তরকারী আনলে। চমৎকার সরু আলোচালের ভাত, খুব সুরভি ঘি, দুতিন রকম ডাল, চার পাঁচ রকম তরকারি (বলা বাহুল্য, সবই নিরামিষ), তিন চার রকমের চাটনী আর আচার "রসম্" যার কথা আগে বলেছি, লুচী, পাঁপর পোড়া, দই আর বেসনের বোঁদের মিঠাই, এই সব দিলে। আস্ত বেগুণ চার ফালি করে কেটে ভিতরে মশলার পুর দিয়ে ভাজা, এ জিনিসটা বেশ মুখরোচক লাগলো। তরকারী পরিবেশনের একটা পাত্র দেখে আমার খুব পছন্দ হলো—চারটে বড় বড় বাটী এক সঙ্গে আঁটা, একটা গোল হাতল থেকে ঝুলছে, পিতলের চামচে করে পাতে জিনিস দেয়। এদের একটু ভাল রকমের খাওয়াতে দেখছি, এরা কাঁচা ঘি-টা খুব খায়।

এই ভাবে দুপুরের খাওয়া চুকানো গেলো। ইচ্ছা ছিল একদিন আর দুরাত্ত রেলে কাটানোর পর একটু বিশ্রাম করবো, কিন্তু মাদ্রাজে থাকবো মাত্র একদিন, সে দিনটা ঘুমিয়ে কাটানো মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। হোটেলের কাছেই এখানকার একটা প্রধান দেখবার জিনিস মিউজিয়াম্। মিউজিয়াম্টী আমার স্বামীর খুবই পরিচিত। আমরা দুখানা রিক্‌শা ভাড়া করে গেলাম—খানিকটা পথ বাগানের মধ্যে একটা সরু রাস্তা,সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। এখানকার রিক্‌শাগুলো কলিকাতায় জাপান থেকে আমদানী যে রিকশা চলে সে গুলোর চেয়ে একটু বেশী জবড়-জঙ্গ, একটু বেশী ভারি বলে মনে হলো। এই রিক্‌শা গুলো এখানেই তৈরী—চাকায় রবার লাগানো আছে, কিন্তু একটু হাল্কা হলে কুলিগুলো বাঁচতো। এখানকার রিক্‌শা-কুলিগুলোকে দেখলে মায়া হয়। কালো, হাড় জির-জিরে চেহারা, শতভালি যুক্ত ময়লা কাপড়, এদের সঙ্গে দর কষা-কষি করতে লজ্জা হয়, দুটো পয়সা বেশী দিলে এরা যেন হাতে স্বর্গ পায়। এদের সঙ্গে হিন্দি চলে না, এরা ইংরিজীতেই বিদেশীর সঙ্গে কথা বলে। মিউজিয়ম বাড়ীটা তিন-চারটে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। কলকাতার মিউজিয়ম বাড়ীটা যেমন চক্ মেলানো একটা বড় আঙ্গিনার চারদিকে, মাদ্রাজের মিউজিয়ম সে রকম নয়। আমার স্বামী অবশ্য সব ভাল করে আমায় দেখালেন, কিন্তু অত সব কি কারু মনে থাকে ? তবে দু চারটে জিনিসের কথা খুব মনে আছে। প্রথমটা, আমরা ছবির ঘরে ঢুকি। সেখানে আছে রবিবর্ম্মার আঁকা অয়েলপেন্টিং। রবিবর্ম্মার ছবির কদর আজকাল কমে গেছে। কতকগুলো প্রাচীন তেলেগু পট্ আর অন্য প্রাচীন ছবি দেখিয়ে আমার স্বামী খুব প্রশংসা করলেন, কিন্তু সে-সবের সৌন্দর্য্য আমি ঠিক বুঝলাম না। পট, পট-ই ; তা থেকে উচ্চ অঙ্গের শিল্পের রস পণ্ডিতেরা পেতে পারেন—আমাদের চোখে সে সৌন্দর্য্য চটকরে ধরা দেয় না। তার পরে আমরা গেলাম প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তির সংগ্রহ দেখতে। এই সংগ্রহে গুটী কতক বড় বড় আকারের প্রাচীন বিষ্ণু মূর্ত্তি বড় সুন্দর লাগলো। অমরাবতীর ভাঙ্গা বৌদ্ধ স্তূপের অনেক পাথরে খোঁদা চিত্রফলক এখানে জড় করে রেখেছে। এগুলি নাকি এখানকার সংগ্রহের একটী প্রধান জিনিস। তারপরে প্রাচীন ব্রঞ্জ, তামা আর পিতলের মূর্ত্তি আর তৈজসপত্রের সংগ্রহ দেখলাম। এগুলি আর একটী বাড়ীর দোতালায় আছে। কতকগুলি ব্রঞ্জের নটরাজ মূর্ত্তি আছে যে-গুলির সৌন্দর্য্য কথায় বলে বর্ণনা করা যায় না।

নটরাজ শিবের মূর্ত্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একটু বিভিন্ন ভাবে কল্পিত হতো, বিভিন্ন ঢঙ্গে আঁকা হত। আমাদের বাংলা দেশের প্রাচীন পাথরের নটরাজ মূর্ত্তির ছবি দেখেছি, তাতে মহাদেব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে নাচছেন, আর আধুনিক মাটীর পুতুলের নটরাজের মূর্ত্তি আমার কাছে আছে, তাতে শিব মাটীর উপরই নাচছেন, কিন্তু তাঁর হাত, পা, মাথার ভঙ্গি একেবারে আলাদা, দুহাতে ত্রিশূল আর ডমরু নিয়ে নাচছেন। কিন্তু দক্ষিণের নটরাজ চারহাত, দুহাতে বর আর অভয়,এক হাতে ডমরু, আর এক হাতে আগুন জলছে, আর শিব একটী পায়ে ভর দিয়ে আর একটী পা উঁচুতে তুলে আছেন, তাঁর পায়ের তলায় আছে একটী খর্ব্বাকার

রাক্ষস, এই রাক্ষস হচ্ছে পাপের মূর্ত্তিমান্ রূপ। এক একটী নটরাজের মুখের ভাব অপূর্ব্ব, দেখলে মনে একটা অদ্ভুত ভক্তিভাব আসে। এই নটরাজ মূর্ত্তিগুলি শুনলাম আট'শ থেকে একহাজার বছর আগেকার তৈরী। দক্ষিণের এই ধাতু মূর্ত্তি-গুলি বাস্তবিক খুব সুন্দর।—অবশ্য কেউ বুঝিয়ে না দিলে এ-গুলির সৌন্দর্য্য ধরা একটু মুস্কিল হয়। আমার স্বামী এখানে ছিলেন ব্যাখ্যাকর্ত্তা। হরপার্ব্বতীর কতকগুলি মূর্ত্তি, বিষ্ণু-মূর্ত্তি তাঁর এক পাশে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী আর এক পাশে ভূ-পৃথিবী দেবী—এগুলিও খুব সুন্দর। নটরাজ মূর্ত্তির মতন সুন্দর লাগলো রাম, সীতা, লক্ষ্মণ আর হনুমানের চারটী ব্রঞ্জ মূর্ত্তি। এসবের পোষ্টকার্ড ছবি মিউজিয়মে বিক্রি হয়, আমার স্বামী তার কিছু কিছু কিন্‌লেন। আর সব দেখবার জিনিষ ঘুরে দেখলাম বটে, কিন্তু মনের উপর ছাপ দিয়েছিল মাত্র ঐ কটা জিনিষ।

মিউজিয়মের পাশে ভিক্টোরিয়া টেকনিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট বলে একটা বাড়ী করেছে। সেখানে মাদ্রাজ প্রদেশে তৈরী সব রকমের শিল্প কাজ সংগ্রহ করে রাখে আর বিক্রি করে। দ্রাবিড় দেশের সব রকম হাতের কাজের নমুনা এখানে একসঙ্গে দেখা গেলো। এও একটী ছোট মিউজিয়ম। পিতল তামার জিনিষ, কাঠের পুতুল, খেলনা, চেয়ার টেবিল আর অন্য জিনিষ, জরির কাজ করা সুতীর আর রেশমের কাপড়, হাতির দাঁতের কাজ, উলী আর রেশমী গালচে, আরও কত কি সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল। আমার বড়ই লোভ হচ্ছিল, দুই এক খানা রেশমী গালচে দেখে। এ গুলির নক্সা সাধারণ পশমী গালচের মতন নয়, সেকেলে দক্ষিণী হিন্দু নক্সা, মুসলমানী বা ইরাণ-তাতারের নক্সা নয়, রংগুলিও বেশ মানানসই মনে হল। কাঠের খেলনা এখানে বেশ সুন্দর করে। ত্রিবান্দ্রমের হাতির দাঁতের কাজ অতি চমৎকার, যেমন ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি-গুলি তেমনি মানুষের মূর্ত্তিগুলি, কোনটী কলসী কাঁকে মাথায় কৃষ্ণচূড়া করে খোঁপা বাঁধা মালাবারি মেয়ে জল আনতে যাচ্ছে, কোনটী তামিল বিয়ের কনে হাতে বরমাল্য নিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। হাতির দাঁতের সখ আমার স্বামীর আছে, তিনি এ সবের কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। স্থির করলাম, ফিরতি পথে এখান থেকে দু চারটে জিনিস নিয়ে যাবো।

হোটেলে ফিরে এলাম। খুব রদ্দুর, আমরা একটু বিশ্রাম করলাম। বিকালের দিকে চা খেয়ে আবার বেড়াতে বেরুলাম, একখানা খোলা ঘোড়ার গাড়ি করে। বেরুবার সময় দেখলাম যে এই হোটেলের দরোয়ান হচ্ছে এক জন কোমরে কুকরি-বাঁধা খাকি-পরা গুরখা; এখানেও তাহ্‌লে দরোয়ানি করবার জন্য সুদূর নেপাল থেকে লোক আসে, তারা কাজও পায়। গুরখা দরোয়ান এদেশে খুব একটা চাল দিয়ে দেখাবার মত ব্যাপার। আমার স্বামী এই লোকটীর সঙ্গে হিন্দিতে কথা কইলেন। এ অল্প কমাস হলো কলকাত্তা থেকে মাদ্রাজে এসেছে, দক্ষিণী বুলি এখনও শেখেনি, হিন্দির সাহায্যেই কোন রকমে চালিয়ে নেয়। হোটেলের ম্যানেজার আর দু-এক জন বামুন চাকর হিন্দি জানে। আমরা এগ্‌মোর ইষ্টিশানে এলাম সেখানে সমস্ত তামিল দেশ দেখে আসবার জন্য টিকিট কিন্‌লাম। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির সস্তার 'পিল্‌গ্রিম টিকিট"—অর্থাৎ তীর্থযাত্রীর টিকিট আছে। আমরা এই রকম দুখানা টিকিট কিনলাম—সেকেণ্ড ক্লাস নিলে ৬৭৲ টাকা করে আর চাকরের জন্য থার্ডক্লাস নিলে ২১৲ টাকা। আমার স্বামী হিসাব করে দেখলেন, এই সস্তার টিকিট না কিনে আলাদা আলাদা টিকিট কিনলে ৬৭৲ টাকার জায়গায় প্রায় ১১০ টাকা পড়তো। তিন মাসের মধ্যে এই টিকিটে অনেকগুলি জায়গা দেখে আবার মাদ্রাজে ফিরে আসতে পারা যাবে। মাদ্রাজ, চেঙ্গলপট্, বিল্লিপুরম্, চিদম্বরম্, কুম্ভকোনম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লি, পুদুকোটা, শিবগঙ্গা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, মাদুরা; তার পর আবার মাদুরা ফিরে এসে সেখান থেকে আবার ত্রিচিনোপল্লি, তার পর শ্রীরঙ্গম দেখে বিরুদ্ধাচলমের পথে মাদ্রাজ ফিরে আসা—এতগুলো জায়গা এই টিকিটে দেখে আসা যাবে।

টিকিটের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে আমরা মাদ্রাজ সহর দেখতে চললাম। মাদ্রাজের ট্রাম গাড়ি গুলো কলকাতার তুলনায় খারাপ বলেই মনে হলো। বাস গুলোও ছোট, এবং পুলিশের কড়া নিয়মের জন্য যেকটী লোকের জায়গা আছে

তার বেশী লোক নিতে পারেনা। ট্রাম, বাস, মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ার ঝটকা, গোরুর ঝট্‌কা, রিক্সা রকমারি পায়ে হাঁটা মানুষ এদের দিয়ে ভরা বড় রাস্তা ধরে আমরা অনেক গুলি বড় বড় বাড়ী আর ছোট বড় নানান দোকান দেখতে দেখতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এলুম। এই বাড়ীটি বেশ ভব্য, সেকেলে ভারতীয় ঢঙ্গে তৈরী; আমাদের কলকাতার হাইকোর্টের বাড়ী এক কিম্ভূত কিমাকার চালে যেন তৈরী, কতকটা গির্জ্জার মতন, আর কতকটা সাধারণ বাড়ীর মতন, এ বাড়ী সে রকম নয়। হাইকোর্ট ছাড়িয়ে একটু ডান হাতি গিয়ে আমরা সমুদ্র পেলুম। সহরের ভিড় আর হট্টগোল পিছনে ফেলে সামনে মহাসাগরের উদার অনন্ত বিস্তার, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বাধাহীন হাওয়া আর দূর থেকে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত জলকল্লোল দেহের আর মনের সব অবসাদ যেন মুছে দিলে।

আমি এর আগে পুরীতে সমুদ্র দেখেছি, মাদ্রাজের চাইতে পুরীর সমুদ্রের ঢেউ আরও বেশী। আমাদের চাকর বিহার প্রদেশের লোক, জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দেখে অবাক্।

সমুদ্রের ধার দিয়ে মস্ত চওড়া একটা রাস্তা। অনেকটা বালীর চড়া পেরিয়ে তবে সমুদ্র পাওয়া যায়। আমরা বাঁদিকে সমুদ্র রেখে দক্ষিণ মুখো চললুম। ডানদিকে দূরে লাট সাহেবের বাড়ী।

প্রথমটা বাড়ী ঘর কম, পথচলা লোকও বেশী নেই। তার পরে লোকের ভীড় আর রাস্তার ডান ধারে বাড়ী অনেক। বড় বড় সরকারী আপিস, মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ। এখানটায় সমস্ত মাদ্রাজ সহর ভেঙ্গে সহরের দেশী ভদ্রলোকেরা—ভদ্রঘরের মেয়েরাও সমুদ্রের ধারে হওয়া খেতে এসেছে। এখানটাতেই সমুদ্রের ধারে বালীর উপর মাদ্রাজের বিখ্যাত আকোয়ারিয়ম বা সামুদ্রিক মাছ-সাপ আর অন্য প্রাণীর সংগ্রহ।

সকলেই মাদ্রাজে এসে এ জিনিসটা দেখে, নইলে মাদ্রাজ দেখা পুরো হয় না। আমরা যথারীতি চার আনা দক্ষিণা দিয়ে দেখতে গেলাম। ছোট একতলা একটী বাড়ী নিয়ে এই আকোয়ারিয়ম্ ("ভেড়ার গোয়াল" যদি বলা চলে, তাহলে আকোয়ারিয়মের জন্য বাঙ্গলায় "মাছের চিড়িয়াখানা" বলা চলবে কি ?) ভিতরটার দেয়ালের সঙ্গে লাগান আর ঘরের মাঝখানে রাখা নানা আকারের কাঁচের চৌবাচ্চা, সেগুলি সমুদ্রের জলে ভরা, ভিতরে কল থাকায় সে জল দরকার মত বদলে দেওয়া হচ্ছে। চৌবাচ্চাগুলির ভিতরে রকমারি মাছ, সাপ আর অন্য জীব। জায়গায় জায়গায় সামুদ্রিক গাছপালা শেওলা পাথর প্রভৃতি দেওয়া আছে, সে গুলির ভিতরে এই সব প্রাণী থাকে। বাহির থেকে এদের গতি বিধি সব দেখা যায়। কত ভয়ানক দেখতে লম্বা লম্বা সাপের মত মাছ বা মাছের মত সাপ, কত রঙ্গিন মাছ, কত বা অদ্ভুত আকারের। রবারের বলের মত এক রকম মাছকে ধরে টিপে টিপে তার পেটের হাওয়া বার করা যায়—"মাছলীখানা"র একজন চাকর আমাদের সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখালে। এইভাবে খানিকটা সময় এই সব আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখে কাটানো গেল।

তার পরে আমরা সমুদ্রের তীরে খানিক ঘুরে বেড়ালাম, চারি ধারে মেলা বসে গিয়েছে। বিকট আওয়াজে রেডিওতে গান হচ্ছে—মিউনিসিপালিটি থেকে এখানে রেডিও লাগিয়ে দিয়েছে। বসবার বেঞ্চিতে বালীর উপরে খোঁপায় ফুল গুঁজে রঙ্গিন কাপড় পরে তামিল মেয়েরা আর সাদা ধুতি লুঙ্গির মতন করে পরে তামিল পুরুষেরা বসে বসে গল্প গুজব করছে, আর ফেরিওলাদের কাছে পাকোড়ি, কুলপি বরফ, চিনেবাদাম কিনে খাচ্ছে। রাস্তায় মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি আর ঝটকার ভীড়। আমরা একটু অন্ধকার হয়ে আসতেই হোটেলে ফিরলাম। কাল সকালে বেরুতে হবে, রাত্তিরের মধ্যেই সব জিনিস গুছিয়ে রাখতে হবে। (ক্রমশঃ)

সে আজ এসেছে দ্বারে

বন্দে আলি মিয়া

বরষার ম্লান দিন ছিনু বসি আনমনে নিরালায় গৃহকোণে একা
বিজন জীবনে মম চুপিসারে এলে তুমি—দিলে আজ সুগোপনে দেখা।
তোমার পানেতে চাহি বিস্ময়ে ভরে মন তুমি মোর মানস-কমল
তোমার বক্ষে আজি সপ্ত সাগর-সুধা কামনায় করে টলমল।
একটি তারকা বুঝি খসিয়া পড়েছে আজ—আসিয়াছে পার্শেতে আমার!
এত দিন পরে বুঝি ভাঙিয়াছে ঘুম প্রিয়া তব ফুল প্রেম-দেবতার!!
যে-ছিলো অসীম নভে যে ছিল সুদূর হয়ে সে যে আজ আসিয়াছে দ্বারে
আমার বিজন ঘরে বুকের আসন পাতি নিরালায় বসাইব তারে।
বরষার ম্লান নভে—মেঘের মেদুর ছায়া লাগিয়াছে নারিকেল শাখে
দূরের কানন হতে ভেসে আসে মিঠে সুর—বিরহিনী ঘুঘু কোথা ডাকে!
তুমি এলে সেইখনে পিছু হতে চুপি চুপি ফাগুনের ফুলপরী সম
একটি স্বপন যেন নামিল নয়নে মম—রূপ তার মধু মনোরম।
যে সাধ আছিলো মোর মরমেতে লুকাইয়া তুমি দিলে খুলে সেই দ্বার
পরশ করিনু তব একটি বেপথু হিয়া—পুষ্পিত তনুসম্ভার।
হেরিনু নয়নে তব প্রথম আবেশ মাখা পুলকের ঘন শিহরণ
কাঁপে দূরে নীপশাখা তারি সাথে কাঁপে প্রিয়া রসঘন তব তনু মন।
বরষার ম্লান নভ—আঁধার গহন রাতি ঝর ঝর বারি ধারা ঝরে
বাহিরে বাতাস কাঁদে শাখা পাতা ভেঙে পড়ে—দীপ নেবে প্রতি ঘরে-ঘরে
একা ঘরে মুখোমুখি তুমি আর আমি শুধু বসে আছি শুধু দুইজন
বাঁধ ভাঙা ঢেউ যেন উথলায় বুকে তব—সাড়া তার জাগে অনুখন।
বাহিরের ঝড় যেন লাগিয়াছে মনে আজ সুখে তার ভাষা নাহি হায়
দুই পারে থাকি মোরা কামনার তট হতে দু'জনারে চাহি দু'জনায়।
বাদল ভাঙিয়া পড়ে—জল আসে জানালায়—ডাকে দেয়া দূর নভ পারে
এত কাছে রহি মোরা তবুও মিলন লাগি একা ঘরে তিতি আঁখিধারে।

সঙ্গোপনে

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

নিতান্তই তুচ্ছ কথার সংঘর্ষে পাচক ঠাকুরটী যখন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তখন অমিতা একান্ত অসহায়ের দৃষ্টিতে সংসারটাকে দেখলো ভীষণ অন্ধকারময়। মুহূর্তে ওর চোখে জ্যোৎস্না-ঝল্‌মলে পূর্ণিমা রাত যেন ঘন কালো রূপে মূর্ত হয়ে উঠলো।

পাঁচটা অনেক্ষণ বেজে গিয়েছে, ধীরে ধীরে বিদায়মুখী দিনের আলো অনুজ্জ্বল, স্তিমিত হয়ে আস্‌ছে, স্বামী ইঞ্জিনীয়ার, তাকে আন্‌তে গাড়ী চলে গিয়েছে। অথচ উনুনে এখনও অগ্নি সংযোগ হোলনা; ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত স্বামীর সুমুখে কিসের প্লেট তুলে ধরবে? ওঃ চাকর বাকরগুলো কী ভীষণ পঙ্গুই না করে দিতে পারে? আবার তারাই ঝোপ বুঝে কোপ মারে—সবেমাত্র অমিতা তখন বিকেলের বেশ প্রসাধন সাঙ্গ করে, নিজের ঘরে, দক্ষিণ দিকে খোলা জানালার ধারে বসে অর্গ্যানের বুকে নূতন এক সুরের লহর তুলেছিল। অচিন্তনীয় এই ব্যাপারে ওর ফর্সা ঋজু অঙ্গুলিগুলি চলায়মান সাদা ধবধবে রীডের উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাধ্য হয়ে সে নীচে নেমে এল। ভায়লেটের ফুল হাতা ব্লাউসটা কনুইর উপর তুলে কয়লা গুদম হতে কয়লা ভেঙ্গে এনে, উনুনে অগ্নি সংযোগ কার্যে মন দিল।

"একি অমিতা, তুই যে উনুনে আঁচ দিচ্ছিস,—কিশোর সিং গেল কোথায়? ঠিক সেই মুহূর্তে একটী আঠার-উনিশ বৎসরের তরুণী মেয়ে এসে রান্না ঘরের সুমুখের বারান্দায় উঠলো।

মেয়েটী অমিতার এক অন্তরঙ্গ সখী—নাম ওর লাবণ্য; কোলকাতার মেয়ে স্কুলে পড়ায়, থাকে বোর্ডিংএ। শনি ও রবিবারের ছুটীর দুইটী দিন বাড়ীতেই অতিবাহিত করে। রান্নাঘরের ভিতরটা তখন স্তূপিকৃত ধোঁওয়ায় জমাট বেঁধে উঠেছিল, পাকানো পাকানো তার কালো কুণ্ডলিগুলিকে দুই হাতে সরাতে সরাতে বাইরে বেরিয়ে এসে অমিতা বল্‌লো,—"বলিস্‌নে ভাই আর ওদের অহঙ্কারের কথা—কী ভীষণ মুখে মুখে উত্তর করছিল, জবাব দিয়ে দিয়েছি।" ওর লাল টক্‌টকে চোখদুটী জল ভরে ঝাপসা হয়ে এসেছিল, অঞ্চলপ্রান্তে মুছে ফেলে বন্ধুনীর দিকে তাকালো।

ওর কয়লামাখা হাতখানার পানে ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূতে তাকিয়ে লাবণ্য বল্‌লে—"ওরা জানে কিনা—ওরা না হলে আমরা চল্‌তে পারিনা, তাই ওদের অত অহঙ্কার—ধরাকে সরা দেখে না!

"আর তুমি গ্রাজুয়েট ক্লার্ক চাও—উঠোনে নেমে হাত ধুতে ধুতে অমিতা বললো,—"একটা চাইলে কম পক্ষে বিশ পঁচিশটা পাবে"—

"সেই কথাই বল্‌ছি—আমাদের নিটিং টিচার মিসেস মৈত্র, লাবণ্য বল্‌লো,—তার স্বামী এম-এ পাশ করেও বেকার, কী যে কষ্ট ওদের যাচ্ছে—তা ভজলু গেল কোথায়, হাওয়া দিয়ে উনুনটা তো ধরিয়ে দিতে পারে—আমরা ততক্ষণ পুষ্পেন্দুবাবুর খাবার জোগাড় করি।"

অমিতা বল্‌লে,—"সে গেছে ভাই ঠাকুর আন্‌তে,—বল্‌লে, ছটা চুয়ান্নর কোন্ গাড়ী আসে পশ্চিম থেকে, বহু কর্ম্মপ্রার্থী যাত্রী নাকি আসে ওতে, ছুটে গেল কাকে যেন ধরে আন্‌তে"—

বাস্তবিক ভজলু বড় দরদী ভৃত্য,—অনেক দিনের পুরোণো, ও পুষ্পেন্দুকে নিজে হাতে করে মানুষ করেছে, সুদূর গ্রামের মায়া কাটিয়ে তার সঙ্গে তার কর্ম্মস্থল এই বিদেশে এসেছে। সংসারের প্রতি মায়া মমতা ওর অসীম।

ওদের বাঙ্গলোর নিকটেই ষ্টেশন; ও তখন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে একখানি বেঞ্চে উৎকণ্ঠিত মনে বসেছিল। কোলে তার ছিল অমিতার দুই বৎসরের ফুটফুটে সুন্দর শিশু পুত্রটি। জংসন ষ্টেশন, ঘন ঘন ট্রেণগুলি আসে যায়, ওদের

পায়ের বিরাট ধ্বনি ষ্টেশনের কোন সুদূর প্রান্ত চকিত কম্পিত করে তোলে। অজস্র কণ্ঠে, কলরবে, পায়ের শব্দে প্ল্যাটফর্ম মুখর হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে ভজলুর সন্ধানী দৃষ্টি যাত্রীদের ভীড়ে আরও চঞ্চল ও ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

"কি গো খোকন বাবু, আমায় দেখে এত হাসি কেন ?" বিরাট দৈত্যের মত যাত্রী পূর্ণ একখানি গাড়ী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলো, থার্ডক্লাস কামরা থেকে একটী তরুণ যুবক নামলো, ভজলুর নিকটে এগিয়ে গেল, স্নিগ্ধ চোখে খোকার হাসি বিকশিত প্রস্ফুট মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে ওর কোমল কপালে একটি আদরের টোকা মারলো।

"ওইরকম স্বভাব বাবু, বাড়ীতে দেখুন কেঁদে কেঁদে মাকে পাগল করবে, আর বাইরে এলে সকলের সঙ্গে ডেকে ডেকে আলাপ করবে"—ভজলু খোকাকে একটী স্নেহের চুম্বন দিয়ে—দৃষ্টি মেলে যুবকটীর দিকে তাকালো। ওর মনে হলো যুবকটী যেন ভদ্র বংশের ছেলে— ; চেহারা বেশ সুকুমার। কিন্তু—অত্যন্ত শ্রীহীন, গৌর রং দারিদ্রের আবরণে ম্লান, শীর্ণ ললাটে রুক্ষ চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। এক দীনতার মূর্ত্তিমান রূপ যেন ও। পরণে আধময়লা একটা ধুতি—ছেঁড়া হাত কাটা একটা কামিজ, পায়ে ব্রাউন রঙ্গের ক্যাম্বিশের জুতো, হাতে একটা চড়াউঠা টিনের সুটকেশ, সতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা।

ওর সার্টের ছিন্ন প্রান্তে উপবীত গুচ্ছের আভাস পেয়ে সহসা ভজলুর উৎকণ্ঠিত মনটা আশার স্তিমিত প্রদীপে ঈষৎ উজ্জল হয়ে উঠলো। আচমকা ভাবে সে যুবকটীকে প্রশ্ন করলো—"কোথায় যাচ্ছ বাবু তুমি" ?

"এই তো দুই ষ্টেশনের পর ইছাপুর—"

"কেন বাবু" ?

"চাকরীর চেষ্টায়।

"চাকরী ? আমাদের বাড়ী চাকরী করবে বাবু" ?

"করবো" তৃষ্ণার্ত্ত পান্থ শুষ্ক বালুতে পেলো এক ফোঁটা জল—এমনিতর ভাবখানা ফুটে উঠলো যুবকটীর আগ্রহ কণ্ঠস্বরে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ওর সে ঔৎসুক্য নিভে গেল, ঘন ম্লানিমায় নিবিড় হয়ে উঠলো যখন সে শুনলো রাঁধতে নাকি হবে ওকে।

রাঁধুনি বামুন ? পাচক বৃত্তি ? শেষকালে ওকে প্রাণের সম্পদতুল্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের অমূল্য ডিগ্রীগুলি বিসর্জন দিতে হবে রন্ধনবৃত্তির পায়ে ? এক টুকরো ক্ষীণ হাসি ওর ঠোঁটে ঝলসে উঠলো। দুমুহূর্ত ও যেন নীরবে কি ভাবলো হঠাৎ ওর চোখের অভ্যন্তর কৌতুকপূর্ণ সোনালী সুখের ছায়া-সম্পাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অপরূপ রস-মধুর এক রঙ্গিণ ছবি ওর মনের পটে বিচিত্র হয়ে উঠলো।

"মন্দ কী" ? উল্লাসের আবেগে ও চঞ্চল হয়ে উঠলো, মনের নিভৃত প্রান্তে বললো—"না হয় দুদিন পাচক বৃত্তির মাঝেই একটানা জীবনটা বিচিত্র সুন্দর অনুভূতিতে ভরে উঠুক। রোমান্স ? হ্যাঁ নিতান্ত অভাবিতে রোমান্সের রঙ্গিণ রাগে পথ চলা ক্ষণকালের জন্য স্বপ্ন হয়ে ওঠে, উঠুক না কেন ?

সে তো আর সত্যকার প্রেম নয়—প্রেমের নিছক অভিনয় মাত্র। "মাধবী" যে নিরন্তর আমারই। ক্ষণকালের জন্য তার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে বধু মাধবীর অমল স্নিগ্ধ মুখটি জ্বলে উঠে আবার তা নিভে গেল।

দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, প্রভাত বাবুর অমর উপন্যাসের তরুণী প্রিয়ম্বদার মাধুরী-স্তম্ভিত সুন্দর ছবিখানা "প্রিয়ম্বদা, প্রিয়ম্বদা" ওর সুখউচ্ছল কণ্ঠে ধ্বনিত হোল অতি অস্ফুট, মৃদু গুঞ্জনে।

"বাবু কাজ করবেন আমাদের বাড়ী—দশটাকা মাইনে খোরাক পোষাক" ভজলুর কণ্ঠস্বরে আত্মবিভ্রান্ত যুবকটি চমকে- উঠলো, যেন সদ্য স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বল্‌লো,—"চলো"।

বাড়ী পৌছে ভজলু নীচে উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লো—"বউমা, লোক এনেছি গো, দেখে শুনে নাও এসে"।

দ্বিতলে আপন কক্ষে তখন অমিতাদের গল্পের উৎস নিবিড়রূপে জমে উঠেছিল। অমিতার স্বামী সুরেশ কিছুক্ষণ হোল অফিস থেকে ফিরে, জলযোগান্তে ক্লান্ত দেহটী অলসভাবে ইজিচেয়ারে মেলে দিয়ে চুরুট টান্‌ছিল অমিতা ও লাবণ্যর হাস্য পরিহাসের তরল উচ্ছ্বাস ও মনের ও দেহের শ্রান্তি মুছে নিচ্ছিল।

"ওগো চলো না গো, ভজলু ঠাকুর এনেছে, ঠিক করবে," অমিতা স্বামীকে বল্‌লো।

"আমি আর নড়তে পারছিনে, তুমি যাও অমু—" পুষ্পেন্দু স্ত্রীকে বল্‌লো। মুহূর্ত্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে অমিতা ঠাকুরের পানে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ভজলুকে জিজ্ঞেস করলো—"এই ঠাকুর—কাজ করতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ বউমা—"

"হ্যাঁ বউমা" ঔৎসুক্য না চাপতে পেরে যুবকটী নত চোখ ছুটী তুলে অমিতার মুখে বারেক তাকালো। সহসা যেন দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপ নিভে গেল।

একী, এ যে এক তরুণী গৃহিণী—"ওর কল্পলোকের মানসী প্রতিমা লীলাচঞ্চলা হাস্যময়ী এক তন্বী মেয়ের পরিবর্ত্তে অবগুণ্ঠিতা, সিন্দুর শোভিতা, শঙ্খ বলয় পরিহিতা অমিতার কল্যাণী বধূ মূর্তিখানি ওর প্রসন্ন মুখে দিল মেঘ ছেয়ে। চাপা নিশ্বাসে বুকের তল ভারী হয়ে উঠলো।

"তোমার নাম কী"? অমিতার প্রশ্নে ও চমকে মুহূর্ত্ত যেন কি ভাবলো, ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লো,—"শ্রী অমলেশ অধিকারী"—

"বাড়ী কোথায়"?

"আজ্ঞে মেদিনীপুর—"

"কাজকর্ম্ম করতে পারবে তো"?

"আজ্ঞে হ্যাঁ"।

ভজলু, তবে তুমি একে ঘর দোর দেখিয়ে দাও"।

অমিতা পুনরায় উপরে এল, বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে লাবণ্য দাঁড়িয়েছিল, তার পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লো, "দেখলি তো? একেবারে ভদ্রবংশের ছেলে, কাজকর্ম্ম করতে পারবে তো"?

"আর না পেরেই বা উপায় কী"? মৃদু হেসে লাবণ্য বল্‌লো,—"ওর ওই রূপের ললিত শ্রী, সুন্দর চেহারা। অভিজাত বংশ গৌরব,—যদি কিছু অর্জিত শিক্ষা থাকে তার সৌরভ ওর জঠরের পূর্ণতা এনে দেবার পথ বলে দেবেনা। হয়তো ঘরে আছে স্ত্রী পুত্র কন্যা—বিধবা মা বোন"—কয়েক মুহূর্ত থেমে লাবণ্য বল্‌লো, "এইতো আমাদের মিসেস মৈত্র,—বাড়ীতে ছুটী তার বচ্ছা বাচ্ছা মেয়ে আছে—সে কী আর সাধ করে টিচারী করতে এসেছে? না করেই বা উপায় কী? স্বামীর তার যথেষ্ট শিক্ষার গৌরব থেকেও সে বেকার। সত্যি বড় দুখ হয় তার জন্য—বাড়ী শ্রীরামপুরে, মেয়ে ছুটী দূরে রেখে ওর কী বোর্ডিঙে থাকতে মন চায়—"?

ওর একান্ত সহানুভূতির কোমল চিত্ত নূতন পাচক ঠাকুরের করুণতম সমালোচনায় নিবিড় হয়ে উঠলো।

নিরুৎসাহী অমলেশ তখন আপন প্রাপ্য কর্ম্মে, ভীষণ এক অস্বোয়াস্তির অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল;—সে যাবে এখন কোন পথে? ওর ছুরন্ত আশা নির্ম্মূল হোল, রোমান্সেরও ভরসা নেই;—তবে কী নিতান্তই শুষ্কভাবে রন্ধনবৃত্তির পায়ে জলাঞ্জলি দেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিগ্রীগুলি? কিন্তু ওর মর্ম্মবীণায় এখনও অমিতার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভারী মধুর সুরে অনুরণিত হচ্ছিল, ওই সুরের লহর যেন কীসের এক প্রেরণা আন্‌লো ওর মনে।

অমলেশ যেন তার যাদু হতেই অমিতার সংসারের ধারা বদলে দিল। সাধারণ মাইনে করা পাচক ঠাকুরের মত সে নয়,—সমস্ত খুঁটিনাটী টুক্‌রো কাজগুলি সে পরিপাটী রূপে গুছিয়ে করে। ওর হাত ছুটী যেন মেল ট্রেণ, কী ত্বরিৎ গতি;—মুগ্ধ হয়ে অমিতা, ও যখন উনুনে আঁচ দেয়, মাছ কোটে, বাট্‌না বাটে, তখন ওর কর্ম্মনিবিড় চঞ্চল ছুটী হাতের পানে একান্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বা ওর চিত্তের গহীন তল্ ব্যথার সমুদ্রে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, নিশ্বাসও পড়ে একটা, "আহা, ভদ্রবংশের ছেলে শেষে কী না—"

ওর অজ্ঞাতে সে অমলেশের মুখে করুণতম চাহনি মেলে রাখে।

অমলেশ সন্ত্রস্ত হয়, অমিতার অচঞ্চল চোখে, তার দৃষ্টি মিশলো, ত্রস্তে সে নত করে তার বিকৃত চোখ ছুটী। কিন্তু বড় ভাল লাগে অমিতার ওই পলকহারা দৃষ্টি তার। সে আবার চোখ তুলে চায়, বিবেক ওকে বাধা দেয়—"ছিঃ একী তোমার প্রবৃত্তি? অমিতা যে বিবাহিতা নারী—"

সে মাধবীর মুখটা বুকে ফুটয়ে তুলতে চায়, মনকে সংযত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অবাধ্য মন শোনে কই তার শাসনের বাঁধ—তার খেয়ালী জোয়ারের কাছে অমলেশের সকল চেষ্টা পরাস্ত হয়। দিনের পর দিন ওর

চিত্তের উৎসুকতা আরও যেন নিবিড় হয়—ও আর শুধু অমিতার দৃষ্টিতেই তৃপ্ত হতে পারে না, তার কাছে কিসের প্রত্যাশায় যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আত্মবিভ্রম হয়ে সে একান্ত আত্মহারা হয়। ওর এই ভাবটা লক্ষ্য করে লাবণ্য বলে ওর বন্ধুনীকে—"দেখেছিস নূতন ঠাকুরের স্বভাবটা কী ভীষণ চলুনে,—ওর সঙ্গে তুই বেশী মিশিসনে—শেষ কালে মাথায় চড়ে বসবে।"

মৃদু হেসে অমিতা বলে,—"নারে ভাই, অত ভয় তুই করিসনে,—কথা দুটো বল্‌তে হয়, বুঝ্‌লিনে? শিক্ষা, বংশেরও তো একটা মর্য্যাদা আছে—

কিন্তু তোর ওই সম্ভ্রমটাকে ও যদি উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে না পারে—" লাবণ্যর কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো। হয়তো সে তার সূক্ষ্ম, ছুরীর মত ঝক্‌ঝকে দৃষ্টিতে অমলেশের মনের কোনেও গোপন ছবি অনুভব করেছিল, তাই সে হয়েছিল ভীষণ উতলা। স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধ হেসে ওর কথার প্রত্যুত্তরে অমিতা যেন কী বল্‌তে চাইছিল, সেই সময় অমলেশ ঘরে ঢুকে বল্‌লো "দাদা বাবুর কাট্‌লেট গুলো কী আমি ভাজবো—"?

অমিতা ওর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল—, কী সহজ হাস্য উজ্জ্বল সরলতা স্নিগ্ধ ওর কমনীয় মুখটা—আর লাবণ্য, ওর মনটা কী ভীষণ সন্দিগ্ধ, খুঁত খুঁতে—অমিতা কোন প্রকারেই বন্ধুনীর যুক্তিগুলি সমর্থন করে নিতে পারে না। সে বলে, "লাবু তুই বোস্‌ ভাই, আমি কাটলেটগুলো ভেজে অস্‌চি।"

অমিতা রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো, অমলেশ চিঙড়ীগুলি পরিপাটি রূপে গড়ে পিটে, ঠিক ভাজবার আগের মুহূর্তের মত করে থরে থরে একখানি প্লেটে সাজিয়ে রেখেছে। দেখে তার ভারী আনন্দ হয়। সংসার-অনভিজ্ঞ একটা পুরুষকে খুটী নাটী কাজগুলি এইরূপ নিখুঁত ভাবে করতে দেখে সে একান্ত বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। সহানুভূতি আদ্র্রতায় অন্তর ভরে ওঠে। মাঝে মাঝে স্নেহের কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা আমলেশ তুমি পুরুষ হয়ে মেয়েদের মত এমন সুচারু কাজকর্ম্ম কেমন করে শিখলে বলত"?

শিখলুম আর কবে—"? অমল বল্‌তে চায়—"কি জানি। কিসের টানে কাজগুলো যেন আপনি এসে ধরা দেয়—।"

কিন্তু তা সে বলেনা, অনেক কষ্টে উচ্ছসিত অন্তঃপ্রান্তকে আয়ত্তাধীন রেখে সংযত কণ্ঠে বলে—"মাঝে মাঝে করতুম কিনা ষ্টুডেণ্ট লাইফে—,তাই অভ্যাস আছে—।"

ষ্টুডেণ্ট লাইফ—কথাটা ভীষণ ভাবে নাড়া দেয় অমিতার মনে, আহা, ওর কণ্ঠ হতে নিঃসরণ হয় অতি মৃদু ভাবে, ব্যথায় চিত্ত ভরে ওঠে। আগ্রহের কণ্ঠে ও জিজ্ঞেস করে— তুমি কতদূর পড়েছ অমল"?

অমলেশ এবার আর তার নাম ধামের মিথ্যা পরিচয় দিলনা, কেননা সে জানে শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষিত পুরুষেই ভালবাসে।

সে নম্র কণ্ঠে বল্‌লো,—"এম, এ পর্য্যন্ত পড়েছি—"

এবার অমিতার দৃষ্টি আরও মুগ্ধ হয়ে উঠলো ওর মুখের ওপরে। ও বললে আমার কিন্তু বেশ লাগে সব কাজে এমনই এক্সপার্ট ছেলেদের"

অমলেশ কিছু বলেনা—, শুধু হাসে একটু গর্ব্বের হাসি, মন ওর অপরিসীম ফুল্লতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি তর টুকরো টুকরো সুখে তরঙ্গায়িত হয়ে সে নিরন্তর প্রবাহিত হয়। অমিতার সুমিষ্ট ব্যবহার ওর অন্তরে গভীর ভাবে রেখায়িত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতের তারার মত মাধবীর ভোরের মত নির্ম্মল মুখটা অন্তরে ফুটে ওঠে— তাকে কাছে পাওয়ার একটা অদম্য ব্যাকুলতা ওকে ভীষণ ভাবে উতলা করে তোলে— কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ওর আত্মসমাহিত চিত্ত অমিতার মিষ্ট সান্নিধ্যের মাদকতায় পরিপূর্ণ রূপে জমে ওঠে। মাধবীর মুখ মন থেকে উবে যায় কর্পূরের মতনই। এমনি ভাবে রঙ্গিন স্বপ্নের নাওতে ঢেউ তুলে দিয়ে ওর তরণী মদির আমেজে মধুর হয়ে ভেসে চলে, দিনগুলি কাটে যেন সবুজপাখী পাখা মেলে দিয়ে কালের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে ওর অদম্য উৎসাহ আরও নিবিড় হয়। প্রত্যেকটী কাজ করে সে আরও সুন্দর রূপে গুছিয়ে করে। অমিতার অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে কোনও কাজের সংস্পর্শে আসতে দেয়না শুধু, দেয় করতে তদারক।

লাবণ্য ওকে একদিন মৃদু হেসে বললে— "এ তদারক-টুকু তোকে কেন করতে দেয় জানিস অমু— তোর এটুকু সুমিষ্ট সান্নিধ্য হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারেনা বলে—'

"তার মানে"? অমিতা বিস্ময়ের চোখে বন্ধুনীর দিকে তাকায়।

"মানে—তোকে ভালোবাসে—"

"আমায় ভালোবাসে? তরল স্নিগ্ধ হাস্যে ও স্থানটা মুখরিত করে অমিতা বললো—"তোরা, বিয়ে করিসনা যে মেয়েরা তারা সব পুরুষের দৃষ্টিতেই দেখতে পাস্ প্রেমের আলো—,সত্য কথাটি বলনা লাবু, তোর ওকে খুব ভালো লাগে, নয়"? ও কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে উৎসুক দৃষ্টি বন্ধুনীর মুখে মেলে রেখে বললো—সত্যি ভাই, ছেলেটি বেশ কিন্তু। —আই এর সঙ্গে এম এ নিতান্ত বেমানান হবেনা—তুই ওকে বিয়ে কর্না— ?

"বিয়ে? খুব জোরে হেসে উঠে লাবণ্য বল্লো— "ও আমায় বিয়ে করবে কেন? তোকে যে ভালবাসে— তুই ওর পার্থক্য দৃষ্টির ভেতর দিয়ে এটুকু উপলব্ধি করতে পারিসনে— ?"

পার্থক্য দৃষ্টি! বলে কী লাবু? ভীষণ চমকে উঠলো অমিতা; স্পষ্ট অনুভব করলো, লাবণ্যের কণ্ঠস্বর যেন হাল্কা রহস্যে পূর্ণ নয়, কোথায় যেন গভীর সুর বাজে; সে সুর ওর প্রাণে একটা কণ্টকিত দাঁড়া তোলে। নীরবে ও মুহূর্ত্ত লাবণ্যের কথাগুলো ভাবে, এতদিন ওর যে মত কোন মতেই সমর্থন করতে পারেনি, প্রেম উন্মুখিত তরুণ প্রাণের সহজ কল্পনা বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আজ সেই কথা ওর মনে দিল গভীর দাগ, ওকে চঞ্চল করে তুললো। অমলেশের কয়েক দিনের আচরণ ওর মনের আলোকে উজ্জল হয়ে উঠলো। সে দিন অমলেশ ওকে স্পষ্টই বলেছিল, সে নাকি এক ভাল কাজের সন্ধান পেয়েছিল—কিন্তু সে গ্রহণ করতে পারলোনা— কারণ কি যেন এক মায়ার জালে এ বাড়ীতে দিনের পর দিন ও জড়িয়ে পড়েছে—

অমিতা জিজ্ঞেস করে—কিসের মায়া?

তার উত্তর সে ঠোঁটে দেয়নি—দেয়েছিল চোখে। প্রেমের কারবারে যারা পরিচিত তারাই জানে সে দৃষ্টির ঈঙ্গিত। সেইদিন অমিতার উদার চিত্ত ওর দৃষ্টিতে চকিত হয়ে উঠেছিল, আজ ও রীতিমত কেঁপে উঠলো।

ওর মৌন মুখের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য বোললো, এতটুকু তুই বুঝতে পারলিনে যে রন্ধন কার্যের মধ্যে এমন কী আর্ট পেয়েছে যার মাঝে সে দিনের পর দিন মত্ত হয়ে উঠতে পারে"?

লাবণ্যের আচমকা কণ্ঠস্বরে অমিতার চিন্তাতন্ত্রী ছিন্ন হলো। সে অবাক হয়ে এই চতুর মেয়েটীর বুদ্ধি-উজ্জল মুখের পানে চেয়ে রইলো। কী সূক্ষ্মতম দৃষ্টিগভীরতা-পূর্ণ তীক্ষ্ণ ছুরীর মত যেন জলজ্বল করে। ওই দৃষ্টির টানেই তো ও অমলের নিভৃত অন্তরের গোপন তত্ত্বের সন্ধান সে আবিষ্কার করেছিল। একটু পরে লাবণ্য পুনরায় বললো, নারীর সুরভিত চুলের গন্ধের মধুর অনুভূতির চেয়ে পুরুষের মদির প্রাণে আর কী বা বড় আর্ট থাকৃতে পারে—?

ঈষৎ কুণ্ঠার কণ্ঠে অমিতা বললে—"কিন্তু আমি যে স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী, সে কথা কী ও ভুলে গেছে?

"ভুলবে কেন ভাই"? লাবণ্য বললে "ওর তারুণ্যের জোয়ার উচ্ছ্বসিত চিত্তে এটুকু চিন্তা করবার অবসর কই? কেবা পতীর পত্নী আর কেবা সন্তানের মা? মনের নিভৃত কন্দর যে ওর একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষায় দুর্নিবার হয়ে উঠেছে, বুঝলিনে—একটু থেমে পুনরায় ও বললো "সেই কথাই আমাদের মিসেস মৈত্র বলে, পুরুষের ওই তারুণ্যের উচ্ছ্বাসটা কখনও বিশ্বাস করতে নেই। ওটা ভালোবাসা নয় নিছক একটা মাদকতা। একদিন যেমন অস্বাভাবিক রূপে জলে ওঠে, নিভেও যায় তেমনি আকস্মিক। একদিন সে নাকি ছিল বান্ধবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, স্বামী প্রেমে গর্বিতা অথচ আজ ওর স্বামী একখানা পত্র লিখেও খোঁজ খবর করে না—"

"দিদিমণি, কোলকাতার বোর্ডিং থেকে একখানা চিঠি এসেছে"। লাবণ্যের দাসী এসে কক্ষে প্রবেশ করলো।

"চিঠি"? তাড়াতাড়ি ঝিএর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে লাবণ্য পড়লো। ওর বোর্ডিঙের বন্ধুনী মিসেস মৈত্র লিখেছে, ওর হার্টের কষ্ট ভয়ানক বেড়ে উঠেছে, সে যেন যত শীঘ্র সম্ভব একবার আসে; যদি ওর জীবনলীলা এইখানেই

সাঙ্গ হয়, তবে ওর মেয়েদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা তাকে বলবে।"

চিঠিখানা অমিতাকে পড়তে দিয়ে ও দ্রুতপায়ে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল,—পাঁচটা পঁচিশের লোক্যাল ট্রেণে ও কোলকাতা যাবে, তখন পাঁচটা বেজেছিল।

* * * * *

লাবণ্যর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল; অমলেশ অমিতার কক্ষে প্রবেশ করলো, হাতে ওর খোকার দুধের বাটী।

দিন, খোকাকে দুধটা খাইয়ে দি—সে খোকাকে অমিতার কোল থেকে নিল। ওর হাতে অমিতার হাত স্পর্শ করলো, অমিতা যেন শিউরে উঠলো। অথচ এ স্পর্শ সংসারের কত খুঁটিনাটী কাজে কতদিন, কতবার হয়েছে, কিন্তু মনকে এমন করে কুণ্ঠিত করে তোলেনি তো কখনও? অমলেশের ওই স্পৃষ্ট স্থানটা ওর ঠিক অগ্নি কুণ্ডের মতই জ্বলতে লাগ্‌লো। চোখ তুলে অমলেশের মুখে তাকালো সে। সত্যই কী তবে ওই সুকুমার ফুল্ল মুখের অন্তরালে এক বিষের ছুরী প্রচ্ছন্ন আছে! স্পষ্টই যেন সে অনুভব করলো, আছে, একদিন যে দৃষ্টির অন্তরালে সে পেয়েছিল সারল্যের স্নিগ্ধ আভাষ, আজ প্রত্যক্ষ সে দেখলো কি যেন তীব্রতম আকাঙ্ক্ষায় সেই চোখের অভ্যন্তর ঝলসিত।

"অমলেশ" সে ডাকলো তাকে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে।

অমলেশ তখন মধুরতম এক অনুভূতিতে ভরে উঠে, যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে খোকার মুখে দুধটুকু নিঃশেষ করছিল। অমিতার অস্বাভাবিক কঠিন কণ্ঠে ওর নেশার আমেজ ফুরিয়ে গেল। সে চমকে উঠে অমিতার দিকে তাকালো। অমিতা বললে, "কালকের কাগজে দেখলুম একটা প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন, তুমি কি তার দরখাস্ত করেছ—"?

অমিতার হঠাৎ এরূপ প্রশ্নে অমলেশ ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছলো, বললো, "কই না তো—"

"কেন, করতে তো পারো, পাচক বৃত্তির চেয়ে নিশ্চয়ই উত্তম শিক্ষকবৃত্তিটা, অন্ততঃপক্ষে এম এর পক্ষে—নয় কী? কথা বলছো না যে—"?

কী বলবে অমলেশ? ওর বাকশক্তি তখন লুপ্ত হয়ে গেছলো। অমিতার শ্লেষের কণ্ঠস্বর, ওর বুকে তখন ছুরীর মত বিঁধছিল। অপমানে বেদনায় চোখ দুটী জ্বালা করছিল। অমিতা তো কোনও দিন ওর সাথে এরূপ ব্যবহার করেনি, চিরদিন সে তার মিষ্ট স্বভাবের মধুরতায় ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবে কী সে সব ওর নিছক অভিনয়? অমিতা ওকে ভালোবাসে না? ভালো যদি না বাসবে তবে কোন্ মেয়ে নিতান্ত এক ক্ষুদ্র স্তরের পাচক ঠাকুরের সঙ্গে গল্পের উৎসে নিবিড় হয়ে ওঠে?

না না, সে হতে পারে না, অমিতা নিশ্চিত ওকে ভালবাসে?

ওর স্মৃতিপটে অমিতার দৈনন্দিনের আচরণের একান্ত উদার ব্যবহারগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার ব্যথা-সুনিবিড় নীরব দৃষ্টির তলে একটা আশার রং ফুটে উঠলো। ওর মনে হোল,—তার প্রতি অমিতার এ আকস্মিক বিরূপতা স্বাভাবিক নয়,—আন্তরিক নয়—মনের কোনও উত্তপ্ততার রূপান্তর মাত্র। ও চোখ তুলে অমিতাকে বলতে চাইলো, "তুমি যেদিন স্পষ্ট অনুমতি দেবে, বলবে, অমলেশ তুমি চলে যাও, সেদিন আমি সেই মুহূর্ত্তেই চলে যাবো।" কিন্তু অমিতা তখন কক্ষে ছিল না, অনেকক্ষণ বাইরে চলে গেছলো।

কয়েকদিন হোল লাবণ্যের সহ-শিক্ষয়িত্রী মিসেস মৈত্র হার্টের কষ্ট কিছু কমলেও শরীরের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে সারেনি বলে লাবণ্য প্রায় তিন হপ্তা বাড়ী যেতে পারেনি, আজ মিসেস মৈত্র একটু ভালো অনুভব করছে বলে সে বাড়ী যাওয়ার জন্য বেলা তিনটের সময় প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় অমিতার একখানা পত্র পেলো।

অমিতা লিখেছে—'ভাই লাবণ্য, তোর অনুমান মিথ্যে নয়। আমি এখন বেশ বুঝতে পারি অমলেশের ভাবখানা যেন কেমনতর,—আশ্চর্য্য হয়ে যাই ভাবতে। বলতে চাই ওকে দুটো শক্ত কথা, তাও পারিনে কিছুতেই, স্তব্ধ হয়ে যায় আমার কাঁপা ঠোঁট দুটী ওর অভিমান-আর্দ্র মুখের পানে তাকিয়ে। কী জটিল জালের মধ্যে আমি যে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ছি,—সে তুই বুঝবিনে। তোর দাদাকে বলতে চাই সব কথা খুলে, কিন্তু তাও হয় না বলা, সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা আমাকে বড়ই বিপর্য্যস্ত করে তোলে। নিজেকে মনে হয় ভীষণ অপরাধী,

কিন্তু অমলেশের সান্নিধ্য আমাকে বড়ই শঙ্কিত করে তুল্‌ছে। আমি যেন ক্রমেই নিজের সব সত্তা হারিয়ে ফেল্‌ছি। তাই বল্‌ছিলুম, তোর দাদা কয়েকদিনের জন্য লাইনে বেরুবেন, এ কটা দিন আমি তোর কাছেই কাটাবো। আশা করি মিসেস মৈত্র ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছেন, বাস্তবিক মনের কষ্ট শরীরের বড় ক্ষতি করে। তুই আসিস্‌ তবে ষ্টেশনে। আমি একা বোর্ডিং চিনে যেতে পারবো না, তিনটের লোক্যাল ট্রেণে পৌঁছুবো।"

চিঠিখানা পড়ে লাবণ্য মৃদু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালো—তখন তিনটে বাজতে মাত্র পনরো মিনিট বাকী। ও যেয়ে মিসেস্‌ মৈত্রের ঘরে প্রবেশ করে বল্‌লো, "আজ আর আমি বাড়ী যাচ্ছিনা, বুঝলি—সেই যে অমিতার কথা তোকে বলেছিলুম, সে আজ আসছে আমাদের এখানে, তাকে আনতে ষ্টেশনে যাচ্ছি।" মিসেস মৈত্র কিন্তু এ কথায় মোটেই খুসী হতে পারলোনা, নিরাশার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ওর বুক থেকে ঝরে পড়লো। সে বড় আশা করেছিল লাবণ্য বাড়ী গেলে স্বামীকে একখানা চিঠি লিখবে, পুরুষ মানুষ স্ত্রীকে ভুল্‌তে পারে, কিন্তু যে মেয়েরা স্বামীকে ভালবাসে, তাদের পক্ষে তাকে ভুলে থাকা একটু কঠিন। কিন্তু লাবণ্য সে কথা শোনে কই? সে বলে, যে স্বামী দুই ফোঁটা কালীর সহায়ে স্ত্রীর সংবাদ রাখতে এতই কুণ্ঠিত—কোনও স্ত্রীর সে স্বামীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। অথচ সে তার শাশুড়ীর পত্রে জেনেছে, তার স্বামী নাকি নৈহাটীতে এক ধনী গৃহে প্রাইভেট টিউসনী পেয়েছে, এবং সেই ধনী ব্যক্তি তাকে রেল কোম্পানীতে ভালো চাকরী করে দেবেন। শাশুড়ীর চিঠিতে স্বামীর ঠিকানা আছে। মিসেস মৈত্র খাটে বসেছিল, নেমে ওর বাক্সের কাছে এল,—"অত শীঘ্র ওরা নিশ্চয়ই ষ্টেশন থেকে ফিরবে না,—কয়েক লাইন তো চিঠি লিখবে,—নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে,—" ও স্বামীর ঠিকানার জন্য শাশুড়ীর চিঠিটা বের করতে ট্রাঙ্ক খুলে ফেল্‌লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাবণ্য ও অমিতা মিসেস্‌ মৈত্রের ঘরে এসে ঢুক্‌লো। তখন মিসেস মৈত্র চিঠি লেখবার সরঞ্জামাদি বের করেছিল, কিন্তু লিখতে একটী অক্ষরও পারেনি ওদের বিয়ের সময় তোলা ছবিখানা বের করে একদৃষ্টে দেখছিল, হয়তো বা স্মৃতির তিমিরে আচ্ছন্ন হয়েছিল, কেন না চোখ দুটী বেদনায় পরিম্লান দেখাচ্ছিল।

"একী! এ না অমলেশের ছবি, দেখতো অমু" লাবণ্য ও অমিতা ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়লো। আত্মবিস্মৃত মিসেস মৈত্র চম্‌কে উঠলো, লজ্জিতভাবে ফটোখানা গোপন করতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু আর তখন সময় নাই। লাবণ্য ওর হাত থেকে ফটোখানা নিয়ে অমিতার সঙ্গে [illegible] করে দেখতে লাগলো। ওদের দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় মাখানো। অমিতা বললো,—"হ্যাঁ তাইতো এ অমলেশেরই তো ছবি।"—

মিসেস মৈত্র তখন আশ্চর্য্য পলক হারা চোখে ওর বন্ধুনী দুটীর পানে তাকিয়েছিল। লাবণ্য ওকে জিজ্ঞেস করলো, "এই বুঝি তোমার বিয়ের ছবি?"

হ্যাঁ—বিয়ের পরদিন তোলা হয়েছিল—যাই তোমাদের চায়ের বন্দোবস্ত করিগে"—ও মুখরা লাবণ্যর পরিহাসের তীব্র খোঁচা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে লাবণ্য ও অমিতা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লো—যে ভাষা এতক্ষণ ওদের নীরব দৃষ্টির তলে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা অধর-প্রান্তকে উছলিত করে তুল্‌লো। অমলেশের আলোচনায় ওরা নিবিড় ভাবে জমে উঠলো। হাসি, উচ্ছাস, দুঃখ, বেদনা, কৌতুক, নিরাশা, আশা, বিস্ময়, ঘৃণা, অনুশোচনা প্রভৃতি নানারূপ ছবি ক্ষণে ক্ষণে ওদের মনের মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছিল, সেই চিত্র আনন-মুকুরেও ফুটে উঠছিল।

* *

নিতান্ত অতর্কিতে অমিতার বোর্ডিং যাত্রায় অমলেশ যতখানি ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী ও ফুল্ল হয়ে উঠলো, কয়েক ঘণ্টা পরই অমিতা যখন বাড়ী ফিরলো সুস্থ শরীরে নয়—দেহের উত্তাপ নিয়ে। ভীষণ মাথা ব্যথা করছে অমিতার, সমস্ত দেহে ওর অসহ্য বেদনা বোর্ডিঙের লেডি ডাক্তার দেখে বলেছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। ওষুধের শিশি দুইটী অমলেশের হাতে দিয়ে একটু বার্লী তৈয়ারী করতে বলে ও কাঁপতে কাঁপতে যেয়ে ওপরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। অমলেশের সারা অন্তর এক অনির্বচনীয় সুখে ভরে উঠলো। সত্যই কী আজ ওর জীবনের আবছা আশার প্রদীপটী উজ্জ্বল হয়ে জলে উঠবে? পুষ্পেন্দু বাড়ী নেই, লাবণ্যরও আর আসার সময় নেই—ওকেই তবে নিশ্চয়ই অমিতার সেবা করতে হবে। প্রিয়ম্বদার রোগ পাণ্ডুর শীর্ণ মুখটা ওর চোখে মূর্ত হয়ে উঠলো, মূর্তিমান প্রভাত বাবুর নায়ক যেন। ও মনে বেশ গর্ব অনুভব করলো। ত্রস্ত পায়ে সে রান্নাঘরে গেল, একটু বার্লী তৈয়ারী করলো, "এই যে একটু বার্লি এনেছি খেয়ে নিন তো" কিছুক্ষণ পর ও অমিতার ঘরে ঢুকে তার শয্যা প্রান্তে বসলো। অমিতার মুখটা চাদরে ঢাকা ছিল,—তার অভ্যন্তরে সে একটু নড়ে উঠলো। "খেয়ে নিন লক্ষ্মীটি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—মাথা কী বড্ড ধরেছে? অমলেশ তার ললাটের উষ্ণতা অনুভব করতে তার মুখের উত্তরীয়টা একটু সরিয়ে দিলে, "য়্যা তুমি,—তুমি যে; কোত্থেকে এলে"—গভীর অন্ধকারে যেন এক সাপ দেখে অমল আঁৎকে উঠলো। কারণ শয্যায় যে ছিল সে অমিতা নয়, মাধবী ওরফে মিসেস মৈত্র।

জ্ঞানের মোহ

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২৪)

উষার রাধাগোবিন্দের কাছে প্রতিদিনের আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া বিবাহের দিন ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছিল। এ পক্ষের কাজের ভার পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রীর উপরই পড়িয়াছিল। বরের ঘরের মাসী এবং কনের ঘরের পিসির স্থান তিনি লইয়াছিলেন।

উষার মনে শান্তি ছিল না। সেদিন অরুণকে তার পিতার কাছে বিবাহের কথা বলিতে সে বারণ করিয়াছিল, কিন্তু নিজেই পিতাকে একথা বলিবে স্থির করিল। ননী গোপালকে বিবাহ সে করিতে পারিবে না—অরুণের গলায় মালা দিয়াছে, সেই তার স্বামী। অরুণের সহিত যে বিবাহ দিতে তার পিতা রাজী হইবেন না তা সে জানে—কিন্তু তাতে তার দুঃখ নেই, শুধু এ বিয়ে বন্ধ হইলেই সে সুখী হয়।

আহারের পর জনার্দ্দন বিশ্রাম করিতেছিলেন। উষা প্রতিদিনকার মত বাপের পায়ে হাত বুলাইতেছিল। সে ডাকিল—বাবা!

স্নেহকোমল চোখে কন্যার দিকে চাহিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—আমাকে কিছু বলবি, মা?

—হ্যাঁ, বাবা!

—বল!

—আমার বিয়ে আপনি দেবেন না, বাবা!

বিস্মিত চোখে জনার্দ্দন কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া উষার কেমন লজ্জা হইল, সে মুখখানি নামাইয়া লইল।

জনার্দ্দন বলিলেন—এই তোর কথা?

—হ্যাঁ—

—কিন্তু এ কথা তুই কেন বল্‌ছিস্?

—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকৃতে পারব' না, বাবা!

—আমাকে ছেড়ে তোকে থাকতে হবে না মা, তুই এখানেই থাকৃবি! তোকে ছেড়ে কী আমি থাকৃতে পারি!

—আমার বিয়ে আপনি দেবেন না, বাবা—আপনার আর রাধাগোবিন্দের সেবা নিয়ে আমি যেমন আছি, তেমনি থাকৃতে দিন!

গম্ভীর হইয়া জনার্দ্দন বলিলেন—মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের আলোচনা আমি পছন্দ করিনে, উষা! তা'তে আমার সম্মানের হানি হয়! তুমি যাও, আমি এখন ভাগবত পড়বো।

পিতার মুখ দেখিয়া উষার আর কিছু বলিবার সাহস হইল না। সে উঠিয়া গেল। কোন কাজেই উষার মন লাগিল না। একখানি মাদুর বিছাইয়া মেঝেতে শুইয়া নিজের বিষয় ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ বাহিরে জনার্দ্দনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, তিন চারিটি বালক বালিকা তার পিতার ধমক খাইয়া রোয়াকের উপর হইতে ভয়ে পলাইতেছে। তাদের ধাক্কা লাগিয়া হঠাৎ সাতকড়ি রোয়াক হইতে নীচে পড়িয়া গেল।

উষা ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিত সাতুর মাথাটি কোলে তুলিয়া লইল।

রুক্ষ কণ্ঠে জনার্দ্দন বলিলেন—ওকে তুই ছুঁলি কেন উষা! দেখছিস্ নে, ও বাগদীর ছেলে!

—জানি বাবা! কি কর্‌বো বলুন, দেখুন না! এর মাথা ফেটে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে! বলিয়া উষা নিজের আঁচলে সাতুর ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল।

—তাই ব'লে তুই একটা ছোট লোকের ছেলেকে কোলে নিবি!

—না নিলে রাধাগোবিন্দের দরজায় সে যে শিশুহত্যা হয়, বাবা—

—ঠিক হ'য়েছে! এমন না হ'লে তো ব্যাটাদের চোখ ফুটবে না। আমি বুঝেছি······কথায় বলে না—"আপনি আছেন গভীর জলে, পোলা পাঠাইছেন বার্ত্তা লইবার তরে"—এ ঐ ধারীদের কাজ! তারাই ওদের পাঠিয়েছে! ভেবেছিলুম, দি খড়ম দিয়ে ছোঁড়াদের মাথা গুঁড়িয়ে! তা রাধা গোবিন্দই শাস্তি দিয়েছেন!

হুড় মুড় করিয়া একেবারে আট দশজন ভীমেদের বস্তির পুরুষ লাঠী হাতে করিয়া ঠাকুর বাড়ী আসিয়া ঢুকিল।

ক্রোধে জনার্দ্দন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এঁ্যা! ত্যো ত্যো ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা তো কম্ নয়! বেরো সব ঠাকুর বাড়ী থেকে—

দলের একজন চ্যাঁচাইয়া বলিল—বেশী রাগ দেখাবেন না, পুরুত মশাই! আমরা ছোট লোক্।

—রাগ দেখা'ব না! তোদের কথায় না কী! কী করবি কী—আমার?

—কী করবো, তা দেখবা, পুরুত ঠাকুর। তুমি আমাদের বাচ্চাকে মেরেচো—আজ তোমারে আমরা সায়েস্তা না ক'রে ছাড়ছি নে! চার পাঁচটি যুবা লাঠী হাতে করিয়া আগাইয়া আসিতে, ভীমের সহিত অরুণ আসিয়া বলিল —খবরদার! এ ঠাকুর বাড়ী। লাঠী নামাও সব—

মুহূর্ত্তে ছেলেগুলি লাঠী নীচু করিয়া অরুণকে নমস্কার করিল।

সাত কড়ির পিতা ভীড় ঠেলিয়া, ভিতরে আসিয়া বলিল —আমার সাতু কই?

তার কথায় সাতুর খোঁজ হইল?

উষার কোলে সাতুকে দেখিয়া অরুণ বলিল—এই যে তোমার ছেলে!

—কই, কেমন আছে—বেঁচে আছে তো? বলিয়া সাত কড়ির পিতা পুত্রের পাশে বসিল।

উষা বলিল—বেঁচে আছে বই কী?

অরুণ বলিল—মাথায় কি বেশী চোট লেগেছে?

হ্যাঁ, রোয়াক থেকে পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল, এত ক্ষণে হুঁস্ হয়েছে।

সাত কড়ির পিতা বলিল—আমার কোলে দিন্ মা, আমি বাড়ী নিয়ে যাই। ছেলেগুলোর মুখে শুনে তো ভয়েই মরি! জানি তো পুরুত ঠাউরের রাগ?

ভজহরি বলিল—রাগ ওনার যতই থাক্, এই টুকুন বাচ্চারে মারা কিন্তু উচিত হয় নি!

উষা বিস্মিত হইয়া তার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবা তো সাতুকে মারেন নি।

—কিন্তুক্ ছেলেরা তাই বল্লেক্, মা নক্ষী!

—তারা হয়তো বুঝতে পারেনি—

—তবে সাতুর মাথায় নাগ্‌লো ক্যাম্‌নে?

—রোয়াক্ থেকে পড়ে গিয়ে—

—আপনি দেকেলেন?

—হ্যাঁ!

স্ববল বলিল—কিন্তু আপনার বাবা মারতে এয়েলেন, নক্ষী!

—মারতে আসেন নি, মারবো বলেছিলেন,—তাই ছেলেরা ছুটে যেতে গিয়ে ধাক্কা লেগে, সাতু পড়ে যায়—

অরুণ বলিল—এ সব কথায় আর দরকার নেই, তোমাদের মা নক্ষী যে মিথ্যে বলেন না, তা তোমরা জানো! চলো এখন এখান থেকে সব।

(২৫)

পিতার আদেশে উষা নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া উঠানে কাপড় মেলিয়া দিতেছিল। জনার্দ্দন আসিয়া বলিলেন—দিন্ দিন্ তোমার রকম দেখে, আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি উষা!

উষা কিছু না বলিয়া ঠাকুরের বৈকালিক পূজার জোগাড় করিতে বসিল।

তার কাছে আসিয়া গম্ভীর স্বরে জনার্দ্দন বলিলেন— ঐ সব ছোট লোকগুলোর সঙ্গে তোমার এত আলাপ হ'ল কি ক'রে, তাই আমি শুনতে চাই উষা?

—মৃদু কণ্ঠে উষা বলিল—ওরা আমাকে জানে—

—শুধু জানে নয়, ভাল ক'রেই চেনে দেখলুম? কিন্তু এতখানি জানা চেনা হ'ল কী করে, তাই বুঝতে পারছিনে! আমার এদিকে ওদের আসবার হুকুম্ নেই, তা ছাড়া ওদের বস্তিই আলাদা—

উষা নিরুত্তর—

—শুনছিস? সত্যি ক'রে বল্ দেখি, ওদের সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হয়?

উষা চুপ করিয়া রহিল।

গম্ভীরকণ্ঠে জনার্দ্দন ডাকিলেন—উষা!

উষা পিতার দিকে চাহিল।

—বল্, কী ক'রে ওদের সঙ্গে তোর পরিচয় হ'ল?

—নদীর ধারে!

—একজনের সঙ্গে নদীর ধারে হ'তে পারে, সকলকে কী করে জান্‌লি?

উষা কোন জবাব দিল না।

—অরুণকেও চিনিস্ বোধ হয়?

—চিনি!

—কেমন ক'রে?

—যদুর ছেলের অসুখে তার বাড়ীতে ওঁকে দেখেছিলুম।

—সেখানে তুই কেন গিয়েছিলি?

—তার ছেলেকে ঠাকুরের চরণামৃত দিতে!

—হুঁ! বুঝেছি—এই সব ছোট লোকদের ওপর এত দরদ কি ক'রে হ'য়েছে! এ সব ঐ বেল্লিক ঘোষাল বংশের কুলাঙ্গারটার কাজ!

উষা ডাকিল—বাবা!

—চুপ! আমি এত বোকা নই! সে বুঝেছে যে তোকে যদি হাত করতে পারে, তাহ'লে আমার মত বদলাবে, কিন্তু এ তার ভুল! জনার্দ্দন শর্ম্মা খোকা নয়!

—তিনি আমাকে কিছুই বলেন নি; বাবা! আমি ও পড়ায় তাঁর আসবার আগে থেকেই যেতুম্। আপনার ওপর ওঁর খুব শ্রদ্ধা।

—তোর যদি একটুও বুদ্ধি থাকতো, উষা, তাহ'লে বুঝতে পারতিস্, ওসব তার চাল্! সহরে থাকলে, অনেক রকম লোকভোলান কায়দা জানা থাকে! আজ যে কাণ্ডটি হ'লো ঠাকুর বাড়ীতে এর তলে ঐ অরুণ নিশ্চয়ই আছে!

—সে কী বাবা! উনি এসেই তো থামালেন ওদের, বলিয়া উষা পিতার দিকে চাহিল।

—তুই তো সব বুঝিস্ কি না! আমাদের দেখালে তাই—যাতে আমরা বুঝি যে অরুণ আমাদের এই ঝগড়া থেকে বাঁচালে! কিন্তু জনার্দ্দন শর্ম্মার চুল সাদা হয়েছে, সে কথা তার ভাবা উচিত ছিল?

—আপনি তাঁকে অন্যায় দোষ দিচ্ছেন, বাবা? তিনি এ সবের কিছুই জানতেন না। শুধু আমাদের ব'লে নয়, গ্রামের সকলেরই বিপদে উনি এসে দাঁড়ান।

—সব জানি রে, সব জানি! ও সব চালাকীতে ভুলবার পাত্র তোর বাবা নয়, বুঝলি!

উষা চুপ করিয়া রহিল। সে জানে পিতার সহিত বেশী প্রতিবাদ করা চলিবে না।

—শোন উষা! তুমি আর কোন দিন অরুণের সঙ্গে দেখা করতে পাবে না, বা ঐ নীচ পল্লীতে যেতে পাবে না! তোমার বিয়ের আর দেরী নেই, এ সময় বাড়ী থেকে কোথাও আর যেতে পাবে না—এই আমার হুকুম! বলিয়া জনার্দ্দন কন্যার দিকে চাহিলেন।

উষা নিরুত্তরে বসিয়াছিল। তার ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া জনার্দ্দনের মমতা হইল। আজ বার বছর এই মা-হারা মেয়েটিকে তিনিই বুকে করিয়া বড় করিয়াছেন। পাঁচ বছরের শিশু জননীকে হারাইয়া রাত্রে যখন ঘুমাইতে ঘুমাইতে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, নিজের দুঃখ ভুলিয়া তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছেন। হাতে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন, সাথী হইয়া সঙ্গে খেলা করিয়াছেন। আট বছর বয়স হইতে উষা সংসার হাতে লইয়াছে। রাধাগোবিন্দের কাজ করিতে উষার ছোট থেকেই উৎসাহ বেশী। তার মেধাশক্তি দেখিয়া জনার্দ্দন নিজে তাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। আজ এতগুলি কড়া কথা বলিয়া তিনি নিজের মনে ব্যথা অনুভব করিতে ছিলেন। স্নেহ ভরে মেয়ের মাথাটিতে একখানি হাত দিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—মনে দুঃখ করিস্‌নে, মা! তোর ভাল'র জন্তেই ব'লছি মনে রাখিস্, তুই আমার একমাত্র

সন্তান! সব দিক্ দিয়ে আমার মনের মত দেখতেই তোকে চাই, আমি!

(২৬)

উষা বসিয়া সন্ধ্যা-আরতির জোগাড় করিতেছিল। দোলপূর্ণিমা নিকটে হওয়ায়, বিগ্রহকে সাজানো হইয়াছিল।

যদু আর বলাই আসিয়া উঠান হইতে বলিল—আপনায় বাবা কোথায়, মা নক্মী?

তাদের দিকে চাহিয়া উষা বলিল—স্নান করছেন, কেন?

যদু বলিল—রাখালের অসুখের যে মানস্ করেছিলাম, মানক্ষী, তাই দিতে এইচি,—

উষা কিছু বলিবার আগেই জনার্দ্দন আসিয়া তাহাদের দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—

—আবার কী করতে এসেছিস্ তোরা?

যদু হাত জোড় করিয়া বলিল—আমার রাখালের অসুখের মানত ক'রেছিলাম, ঠাউর মশায়!

—বেশ করেছিলে! তা এখানে এসেছিস্ কি জন্যে?

—আজ একাদশী কিনা, উপোসী আছি, তাই আজই পুজোটী দিতে এনু—

—এজ্ঞে।

যা—দূর হ! দিন দিন আস্পর্দ্ধা দেখছি যে বেড়েই উঠেছে, তোদের!

বলাই বলিল—রাগ করবেন না, ঠাউর মশায়! মা নক্মীর ভরসা পেয়েই আমরা এয়েছি!

—মর্ ব্যাটা—আহাম্মুক! আমি যে এতক্ষণ বারণ করছি, সেটা বুঝি গ্রাহ্যের মধ্যেই এল না!

—আজ্ঞে, তা কেন হবে না—সেই জন্যেই তো এত দিন আসতে সাহস পাইনি।

—আজ কী আমি মরে গেছি, যে তোদের সাহস হলো? একেবারে ঠাকুরের দালানে এসে দাঁড়িয়েছিস্! সমস্ত ঠাকুর মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করলি, তোরা! তোদের জন্যে আমি কী পাগল হ'ব।

সুবল বলিল—আমরা শুয়োর বা মুরগী নই, ঠাউর মশায় যে মন্দির অছুচী হ'য়ে যাবে! আমরাও তো মনিষ্যি!

—চুপ্ কর্ ব্যাটা ক্যাওট্! ভারী যে পণ্ডিত হইছিস্ দেখছি! ঐ অরুণের কাছ থেকে এই সব শিখেই তো তোরা উচ্ছন্নে যেতে বসেছিস্!

তেনারে কিছু বল্‌বেন না, ঠাউর মশাই! তিনিই আমাদের দ্যাবতা!

—খুব হয়েছে! বলে সেই······কী চিনেছে গোবিন্দ কানা! যা—আর দিক্ করিসনে, আমার আরতির দেরি হচ্ছে—বেরিয়ে যা তোরা! আরতি দেখতে এখনি সবাই আসবে।

যদু বলিল—কখন তো ঠাউর ছাখবার সুবিধে পাইনি আমরা···আজ অনুমতি করেন, একপাশে দেঁড়িয়ে, আরতিটুকু দেকে যাই?

—আর বিরক্ত করিস্‌নে যদু! যথেষ্ট হয়েছে, তোরা এখানে থাকলে, আমি শুদ্ধ মনে দেবতার আরতি কয়তে পারব না!

—আমাদের একটু কেরপা দৃষ্টি করুন্, ঠাউর মশাই! আপনাদের দয়া না হ'লে, আমাদের যে আর গতি নেই।

—বুড়ো হ'য়ে তোর ভীমরতি হয়েছে যদু! কোথায় ছেলে ছোকরাদের বোঝাবি, যে তোরা ছোট জাত, মন্দির বাড়ীতে আস্‌বার অধিকার নেই, তা না, তুই এ সব নিয়ে ফ্যান্ ফ্যান্ করছিস্!

—এখানে এলে, আমাদের অপরাধই বা হবে কেন, ঠাউর মশাই? বলিয়া সুবল জনার্দ্দনের দিকে চাহিল।

জনার্দ্দন খিঁচাইয়া উঠিলেন—কেন হবে—কী বৃত্তান্ত এত কথা বলবার আমার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই!

—আপনি না বলুন, আমি শুনিছি, এখানে এলে আমাদের কোন দোষ নেই! রাধাগোবিন্দ হিঁদুর দ্যাবতা আমরাও হিঁদু!

—হুঁ! যে তোদের এ সব বলেছে, তাকে বলিস্, মাথার সঙ্গে পায়ের তুলনা হয় না!

—আপনি খালি রাগ করেন, ঠাউর মশায়, আমরা শুধু ঠাকুর দেখতে চাই, তাতে আপনি বারণ করেন কেন?

—আমার খুশী! তোদের কাছে তার কইফিয়ত আমি কখনই দেব না! যা—এখন।

—যাচ্ছি আমরা—রাখালের মানসিকটি নিন্, তাহলে।

—কী বল্লি! তোদের হাতের জিনিষ আমি রাধা-গোবিন্দের পূজোয় দেব!

যদু হাত জোড় করিয়া বলিল—আমি নেয়ে ধুয়ে এনেছি ঠাউর মশায়, আমার হাত নোংরা নয়, মানস করা জিনিষ, ঘরে নিয়ে গেলে, ঠাকুরের কোপে পড়'ব! তিন্‌টি ছেলে যমকে দিয়ে রাধাগোবিন্দর নামে রাখালকে আমার বাঁচাতে পেরেছি। পূজোর জিনিষ আমি ঘরে নিয়ে যেতে পারব না—বলিয়া যদু একটি শালপাতের ঠোঙ্গা এবং ফুলের মালা, রোয়াকের উপর রাখিল।

জনার্দ্দন ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—উঠিয়ে নে এ সব!

যদুর চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সুবল তার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—ঘরে চলো খুড়ো! ঐ তোমার দেওয়া হয়েছে ঠাকুরকে! পুরুত ঠাকুর মানুষ নয়! তাহ'লে তোমার দুঃখু বুঝত।

কান্না ভরা গলায় যদু বলিল—আবার যদি জন্মো নি যেন বামুন হই এই কথা আজ ঠাকুরে জানিয়ে যাচ্ছি!

—অমন কথা বলো না, খুড়ো! কীসের দুঃখু তোমার।

—মানুষ হয়েও যদি দেবতা বামুনের দয়া না পাই, তাহলে মনিষ্যি জন্মে যে বড় দুঃখু রে।

সারি সারি বারটি ঘিয়ের প্রদীপ ঠাকুরের সামনে জ্বালিয়া দিয়া ঊষা ঘর হইতে বাহিরে আসিল। জনার্দ্দন তার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

—তুমি এখানে কেন এলে?

সে কথার জবাব না দিয়া ঊষা যদুর প্রদত্ত দোনাটি উঠাইয়া লইল।

চীৎকার করিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—খবরদার ঊষা। ও সব জিনিষ নিয়ে, তুমি ঠাকুর ঘরে ঢুকো না। বলিয়া জনার্দ্দন দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।

পিতার ক্রোধ-মণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত ঊষা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর তাঁর হাতের নীচে দিয়া মালা গাছটি এবং বাতাসা সমেত একমুঠো আবির ঠাকুরের উদ্দেশে সিংহাসনের দিকে ছুড়িয়া দিয়া যদুকে বলিল—তুমি দুঃখু করো না যদু—তোমার মানত ঠাকুর নিয়েছেন, এই নাও হরির লুট।

(২৭)

জনার্দ্দন কন্যার ওপর পাহারা বসাইয়াছেন, যাতে সে আর কোন নীচ জাতের সামনে না যাইতে পায়; পাড়ার মাণিক কুমোরের মা তার কাছে সারাদিন থাকে।

জনার্দ্দনের জপ শেষ হইলে, রাত্রে সে বাড়ী যায়।

ঊষা শুনিয়াছে, সেইদিন হইতে সাতকড়ির জ্বর হইয়াছে এবং সে ভুল বকিতেছে। এ সব সংবাদ মাণিকের মার কাছে সে পাইয়াছে। সে দিন হঠাৎ আকাশ মেঘে ভরিয়া উঠিতে, মাণিকের মা বলিল—তাইতো বড্ডো যে মেঘ করল, ঊষা। তোমার বাবা জপে বসেছেন, আমার যে ঘুঁটে গুলো বাইরে রয়েছে—যদি বৃষ্টি আসে, তাহলে সব ভিজে যাবে। তুমি একটু একলা থাকো মা আমি চট করে ঘুঁটেগুলো ঘরে তুলেই আসছি।

মাণিকের মা চলিয়া গেলে ঊষা উঠানে আসিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া পড়িয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি কিন্তু কোথাও একটু আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। সাতুকে দেখিবার জন্য তার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ সুযোগ সে ত্যাগ করিল না। পিছনের দরজা খুলিয়া, বাগানের মধ্য দিয়া সে দ্রুত পায়ে সাতুদের বাড়ীর দিকে চলিল। খানিক দূর যাইতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

ঊষা যখন সাতুদের দরজায় পৌঁছিল, তখন বৃষ্টিতে তার সমস্ত গা ভিজিয়া গিয়াছে।

সাতুদের ছোট্ট কুড়ে খানির মধ্যে ছেঁড়া চেটাইয়ের ওপর একখানি কাঁথা বিছান; তাতেই সাতু শুইয়াছিল। পুত্রের শয্যায় সাতুর পিতা বসিয়া তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। এক পাশে একটা কাঠের গুড়ির ওপর অ...

বসিয়াছিল। একটী মাটির প্রদীপ ঘরের কোনায় মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। সাতুর জননী তার মলিন আঁচল খানির সাহায্যে হাওয়ার মুখ হইতে প্রদীপটি বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দরজায় আঘাত শুনিয়া অরুণ ফিরিয়া চাহিল।

সাতুর পিতা বলিল—ও কিছু নয়, বাতাস্

—কিন্তু পুনরায় দরজায় আঘাত হইতে, সাতুর মা বলিল—দেকো না, হয়তো কেউ এয়েচে ?

—এত বিষ্টিতে আবার আসবে কে ? বলিয়া সাতুর পিতা ছেলের গায়ে কাঁথা ঢাকিয়া দিল।

—ঘন ঘন দরজায় শব্দ দেখিয়া, অরুণ দরজা খুলিয়া দিতে উষা ভিতরে ঢুকিল।

বিস্মিত হইয়া অরুণ বলিল—উষা !

কপাট বন্ধ করিয়া উষা বলিল—হাঁ—সাতু কেমন আছে ?

—ভালই ?

সাতুর মা উঠিয়া বলিল—এস মা নক্ষী ! আমি শুনিছি, তুমিই সেদিন আমার সাতুরে বাঁচিয়েছেলে—পায়ের ধূলো দাও মা !

উষা সাতুর কাছে আসিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছে বুঝি ?

সাতুর বাবা বলিল—হ্যাঁ, মা ! এই কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। সেদিন আপনি না থাক্‌লে, সাতুরে আমার আর পেতাম্ না ?

অরুণ বলিল—এই বৃষ্টিতে কেন এলে, উষা ?

—এখন না এলে, আর আমার আসা হতো না—সাতুর অসুখ শুনে অবধি মন আমার বড় খারাপ হ'য়েছিল, কিন্তু দেখ্‌তে আসবার সুবিধে পাচ্ছিলুম্ না ?

—কিন্তু বৃষ্টিতে যে একেবারে ভিজে গিয়েছ ? যদি অসুখ হয়, তখন তোমায় কে দেখবে ?

—তার জন্যে তো আপনি আছেন ! বলিয়া উষা একটু হাসিল।

—কিন্তু আমাকে তোমার বাবা বাড়ীতেই ঢুকতে দেবেন না !

—আপনি ভাববেন না, অসুখ আমার হবে না, জলে ভেজা আমার অভ্যেস্ আছে !

সাতুর মা বলিল—বোস মা নক্ষী, এই পিড়েখানায়—

—না আমি আর বসবো না, সাতুর মা, এখন যাই। সাতুর জন্যে বড্ডোই ভাবনা ছিল। ভাল আছে দেখে নিশ্চিন্ত হ'লুম্।

—এই বিষ্টির মদ্যি একন্ যেয়ো না, মা ! বিষ্টি ছাড়লে ও যেয়ে তোমারে রেকে আস্‌বে।

—না সাতুর মা ! আমাকে এখুনি যেতে হবে—

অরুণ বলিল—কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয় নি !

—তা না হোক্ ! দেরী করবার আমার উপায় নেই ! বাবা জপ ক'রে উঠে যদি জান্‌তে পারেন, তো রাগ করবেন।

—তবে চলো, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই ?

—আপনি যাবেন এখন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ভিজে যাবেন যে ?

—না, আমার সঙ্গে বর্ষাতি আছে—

—ওঃ—তবে চলুন।

—আমরা চললুম্ তাহ'লে ! বলিয়া অরুণ উষার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

উষা দ্রুত পায়ে চলিতেছিল। অরুণ বলিল—অত তাড়াতাড়ি যেও না উষা ! রাস্তা ভয়ানক্ পিছল হ'য়েছে ?

—কিন্তু এখন জল একটু কমেছে, আবার যদি জোরে আসে !

—কিন্তু হঠাৎ যদি পড়ে যাও !

—আপনি তো কাছেই আছেন, ধরতে পারবেন না ? বলিয়া উষা অরুণের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

—ধরতে আমি চাই উষা। কিন্তু ধরা তুমি দিচ্ছ কই !

—কেন দেব না ! ধরুন্ না আমার হাত ! সত্যি বড় ভয় করছে।

—তার একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া অরুণ বলিল—শুধু আজকেই নয় উষা ! চিরদিন এই হাতখানি ধরে আমি জীবন-পথে চল্‌তে চাই !

—কিন্তু তার যে উপায় নেই, তা তো আপনি জানেন !

—তা যদি নাই থাকে উষা,—তবে আজকের রাতই আমাদের জীবনের শেষ রাত্রি হোক্! এই মুহূর্ত্তে আমার যদি মরণকে আলিঙ্গন করতে হয়, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, উষা!

অরুণের কথায় উষার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল।

অরুণ তার হাতে ঝাঁকানী দিয়া বলিল—তুমি চুপ ক'রে থেকো না, উষা! এই সামান্য সময়টুকু আমার কাছে অনেক দামী! তোমার বাবার ভয়ে, তুমি নিজেকে বলি দিচ্ছ, উষা! তোমার মন আমি জানি! না উষা না, এমন ক'রে তোমার জীবন্ত সমাধি দেখবার ক্ষমতা আমার নেই! চলো, আজই তোমার বাবার পায়ে ধ'রে আমি তোমাকে ভিক্ষে চাইব?

অরুণ বা উষার খেয়াল হয় নাই যে তারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে জনার্দ্দনের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে উষা অরুণের হাত ছাড়াইয়া নিল।

—অরুণের উপর একটা জলন্ত দৃষ্টি দিয়া, জনার্দ্দন কন্যাকে বলিলেন—এত রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে তুমি কোথায় গিয়েছিলে, উষা?

উষার সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি ধরিয়াছিল, গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। এমন ভাবে যে পিতার সম্মুখে পড়িতে হইবে, তা সে ভাবে নাই!

কন্যাকে নিরুত্তর দেখিয়া, ক্রোধ গম্ভীর স্বরে জনার্দ্দন বলিলেন—উষা, এত রাতে কোথা থেকে এলি বল্?

—কোন রকমে উষা বলিল—সাতকড়িকে দেখতে গিয়েছিলুম, বাবা—

—সাতকড়ি! সে কে?

—সে দিন যে ছেলেটি ঠাকুর দালান থেকে প'ড়ে গিয়েছিল।

—আবার তুই সেই ছোট লোক্‌দের পাড়ায় গৈছিলি? আমি তোমার বাবা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে যখন তুমি গিয়েছ, তখন আর এ বাড়ীতে তোমাকে ঢুকতে দেব না।

—ক্ষমা করুন্ বাবা, আর কখনও আপনার অবাধ্য হ'ব না।

—ক্ষমা! না—তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই, উষা! তুমি যাও—বলিয়া জনার্দ্দন এক পাট দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

দরজা এক পাট বন্ধ করিতে, উষা কাঁদিয়া বলিল—

—বাবা—বাবা আমি আপনার মেয়ে, আপনি ক্ষমা না করলে, কোথায় যাব আমি!

—আমার মেয়ে নেই! একজন পুরুষের হাত ধ'রে এত রাতে যে বাড়ী আসে, সে জনার্দ্দনের কেউ নয়! বলিয়া সশব্দে জনার্দ্দন দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আর একটু হইলেই দরজায় ধাক্কা খাইয়া উষা পড়িয়া যাইত, অরুণ ক্ষিপ্রহাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

উচ্ছ্বসিত হইয়া উষা কাঁদিয়া বলিল—কী হবে আমার! কোথায় আমি যাব!

—তার চোখের জল মুছাইয়া অরুণ বলিল—কেঁদো না উষা! আমার জন্যেই তোমার এই শাস্তি! চলো তুমি আমার বাড়ী!

—না—না—আপনার বাড়ী আমি যেতে পারব না, তাহ'লে বাবা আর কোনদিনই আমার মুখ দেখবেন না!

—কিন্তু এই অন্ধকারে, বৃষ্টির মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে উষা?

—যতক্ষণ বাবা দরজা না খোলেন!

—দরজা যে তিনি খুলবেন, তা তুমি বুঝলে কী ক'রে?

—কিন্তু আমাকে যে বাবা ভালবাসেন!

—তবে ডাক তাঁকে, দেখ যদি খোলেন!

—উষা দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল—বাবা! বাবা! ভিতর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। প্রায় ঘণ্টা খানেক ডাকাডাকি করিয়াও যখন জনার্দ্দনকে দরজা খোলাইতে পারিল না, তখন উষা হতাশ হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। অরুণ কাছে আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল—এসো উষা, আমার সঙ্গে! তোমাকে আমি এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারব না!

শৈলেশ মজুমদারের ছোট গল্প

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ

এত দিন তিনি "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় ছোট গল্প লিখিতেছিলেন, এবং তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন।

তিনি ছোট গল্প লিখিয়া প্রকৃত ও স্থায়ী যশস্বী হইয়াছিলেন এই "ইন্দু" ছোট গল্প দ্বারা। ইহা প্রকাশের অব্যবহিত পর হইতেই তাঁহার নাম বাজারে ছড়াইয়া পড়িল এবং তখনকার দিন হইতেই ছোট গল্প লেখক বলিতে শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকেই বুঝাইত। ইহা সাহিত্যিকের জীবনের পুণ্যাহ।

"ইন্দুর" লিখন-ভঙ্গিই যেমন অন্য রকমের। ইহাতে ভাষায় কি ভাবে সেই গতানুগতিক পন্থা নাই। ইহা বড়ই মনোমোহকর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোট গল্প লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল "রবীন্দ্রযুগ" আরম্ভ হইবার সময় হইতে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষ বা শতাব্দীর প্রথম বর্ষ, ব্যাপকভাবে দুই চারি বর্ষ ব্যাপিয়া, যদিও এই গ্রন্থে "রবীন্দ্রযুগ" আরম্ভ করা হইয়াছে ১৩০৫—১৩০৬ বঙ্গাব্দ। সে যাহা হউক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ১৩০২ বঙ্গাব্দে যে "ইন্দু" ছোট গল্পটি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সমূহের অন্যতম।

"চারু ছেলে মানুষ। তাকে ধরে বেঁধে তার স্বামীর ঘরে দিয়া আসিতে হয়। চারুর স্বামী মন্মথ চারুকে কথা কহাইবার জন্য কত চেষ্টা করে, চারু কিন্তু কলাবৌটির মত একহাত ঘোমটা টেনে গুঁটি সুঁটি হয়ে বিছানায় একপাশে জড়ের মত পড়ে থাকে। মন্মথ কত ডাকে কত সাধে কত অভিমান করে কখনও রাগ করে, কিন্তু চারু ফিরেও চায় না।

কত হতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয় না। চারুর মা খুড়ী আড়ি পাতিয়া জামাই বেচারার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন। চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে সত্যই বিরক্ত হয়, মা ও খুড়ীর এই আশঙ্কা জন্মিল, তাই চারুকে কোনও রূপ জাগান দিয়া রাতারাতি যুবতী ভাবাপন্ন করিবার জন্য কখনও বকিত, কখনও ভয় বা লোভ দেখাইত, কিন্তু কেমন একগুঁয়ে মেয়ে চারু সে-সব কথা কানেই তুলিত না। এজন্য চারুকে এক আধ দিন মার কাছে একটু বেশী রকম লাঞ্ছিতও হইতে হয়, কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া মা ও খুড়ী হার মানিলেন।

ইতিমধ্যে চারুর দিদি ইন্দু শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিল। ইন্দু আসিলে তার মা ও খুড়ী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইন্দুকে বলিল 'আমরা তো চারুকে এঁটে উঠতে পারলাম না, এখন বাছা! তুই যা পারিস কর। চারু তো তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাস নে!" ইত্যাদি—

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ইন্দুর এখানে যে পরিচয় দিলেন ইহার চেয়ে চমৎকার পরিচয় কেহ প্রদান করিতে পারে না। "ইন্দু" ছোট-গল্পে ইন্দুর চরিত্রই নায়িকার চরিত্র সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে যেরূপ গৌরচন্দ্রিকা থাকে, উপন্যাসে যেরূপ পূর্ব্বাভাষ লিখিত হয়, সংস্কৃত নাটকে যেরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায় সেরূপ এই "ইন্দু" ছোট গল্পের ইন্দুকে পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। ইন্দু চারুর বড় বোন। ইন্দু চারুর অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা ভগিনীর পতিপ্রেম পথের পরিচারিকা হইয়া আসরে অবতীর্ণা হইল।

চারু স্বামীর কাছে যাইতে যেন ভয় করিত। এরূপ মেয়ে পূর্ব্বের হিন্দু সংসারে বিরল ছিল না। তাহারা Romance করিয়া বা courtship করিয়া বিবাহ করিত না। প্রেম করা বলিলে আজকাল যাহা বুঝায় তাহার স্বাদ তাহারা সেকালে জানিত না সুতরাং ঐ সমস্ত আগেরকার লাজুক বিহ্বল মেয়েরা স্বামীকে দেখিলে

যেন ভালবাসার আতঙ্কে, লজ্জার ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। তাহারা স্বামীর ঘরে যাইতে চাহিত না, একত্রে স্বামী সহ শয়ন করিতে চাহিত না, এমন কি, স্বামীর শব্দে দশ বিশ হাত দূরে মাথায় ঘোমটা দিয়া পলাইত এবং সেই স্বামীই পরে দেবতা সম পূজনীয় আরাধ্যতম হইত।

এইরূপে নারীর জীবন মধুর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির সংমিশ্রণে গঠিত হইত। ইন্দু আন্নুর সই, আজকালকার চোখের বালি, বেগুন ফুল, গঙ্গাজল বা অতি আধুনিক 'ফ্রেণ্ড'। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রেম-নিবেদনের দূতী বা সহায়ক হইবে। শৈলেশ চন্দ্র মজুদার দেখাইতে চান পথেও কাঁটা আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে এই পুরাতন সদুদ্দেশ্যমূলক প্রথাও অত্যধিক স্বাধীনতার মধ্যে চালিত হইলে কখনও সর্ব্বনাশ আনয়ন করে।

ইন্দু চারুর স্বামীর সহবাসে সহায়তা করিতে গিয়া মন্মথর প্রেমে নিপতিত হইল। ইন্দুর সর্ব্বনাশ হইল। এই জন্য এই দূতীর কাজ পূর্ব্বে মা খুড়ী পিসি মাসিরা অর্থাৎ যাঁহারা বর্ষীয়সী, তাঁহারা করিতেন। এই কাঁচা বয়সের মেয়েকে দিয়া প্রেমের পথের সহায়তা সৃষ্টি করা সঙ্গত নহে বলিয়া লেখকের অভিমত।

"মন্মথ মন্মথর পঞ্চশর হানিল। সেই ফুলবাণে ইন্দুর ন্যায় কাম-পক্ষী বিদ্ধ করিল।"

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ চলিয়া গেল ইন্দু মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার একটা দৃঢ়তা আসিল; সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল, ভাল হয় নাই। ভগিনীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন কি দোষের হয়েছে! তখন আর কোন কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে। ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিল।

সেদিন বৈকালে অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল মন্মথের জল খাবারের ডাক পড়িল! অন্য দিন মন্মথের শাশুড়ী তাকে জল খাবার দেন, আজ কিন্তু ইন্দু জল খাবার দিতেছে। ইন্দু জল খাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, মন্মথ! জল খাও। মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল বুঝি আজ জল খাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ আর তার মনে স্থান পাইল না। সে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তখনও ইন্দু অবনতমুখী। মন্মথ মুগ্ধ নেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, ঠাকুরঝি! ইন্দু মুখ তুলিল, চারি চক্ষু মিলিবামাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া মন্মথ সপ্রতিভ ভাবে বলিল 'কই চিঠি?' চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠি খানি খুলিয়া ইন্দু মন্মথর হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানি আগাগোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িল—'যাও ছি! অমন করলে কিন্তু আর আসবো না' বলিয়া গমনোদ্যতা ইন্দু যেন ঈষৎ কোপন কুটিল কটাক্ষে মন্মথর দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু হাসিও খেলিয়াছিল, তখন 'যাই' বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

(৫)

মন্মথ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার ধুমটা একটু বেশী। অনেক রাত হয়েছে 'এখন যাই' বলিয়া ইন্দু একবার উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল, বলিল 'রাত আর কই হয়েছে, আর আজকার রাত্ত বৈতো নয়।' ইন্দু ভাবিল 'তা বটে।' সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

ঝম ঝম ঝম বাহিরে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে! গুরু গুরু দুরু দুরু গভীর গর্জনে মেঘ ডাকিতেছিল। তাহারা তাস খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে মনে মন্মথর রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুষুপ্ত, কেবল মন্মথ আর ইন্দু খেলায় গল্পে, হাসিতে বিভোর। সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাত-

হাসি আরম্ভ হইল। সহসা গৃহমধ্যে প্রচণ্ড বেগে একটি দম্‌কা বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জীবনও অন্ধকার হইয়া গেল।

ধীরে, অতি ধীরে ইন্দু সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল 'ঠাকুরঝি!' ইন্দু ফিরিল না। বুঝিবা সে কথা তাহার কানে গেল না।"

লেখক শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের এই "ইন্দু" ছোট গল্পের আলো নিবিয়া যাইবার দৃশ্য পড়িয়া ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই "চরিত্রহীনের" সতীশ সাবিত্রীর কক্ষের আলো নিবাইয়া দেওয়ার দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এই উভয়ের ব্যবধান এই যে "ইন্দুতে" ঝড়ের বাতাসে আলো নিবিয়া গিয়াছিল, আর "চরিত্রহীনে" সতীশ নিজে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। একে প্রকৃতি সাহায্য করিয়াছিল, অন্যে মানুষের করা কাজ। "ইন্দুতে" চরিত্রহীনতার পরাকাষ্ঠা, "চরিত্রহীনে" চরিত্র মাহাত্ম্যের অপূর্ব নিদর্শন। "ইন্দুতে" আলো নিবিয়া ইন্দু মহাপাপে ডুবিল, কিন্তু তাহা কেহ জানিল না, "চরিত্রহীনে" মহা অগ্নি পরীক্ষা হইল, কিন্তু লোকে জানিল সাবিত্রী ব্যভিচারিণী।

লেখক দেখিয়াছিলেন হিন্দু সমাজে বিবাহের পর নব বধূর স্বামীস্ত্রীতে ভাব জন্মাইবার জন্য এই প্রথা, বরের জ্যৈষ্ঠা শ্যালিকার দ্বারা কনের দৌত্য করানো অতি অসমীচিন, কনের বর্ষীয়সী যুবতী বান্ধবীদের দূতী পাঠানোও অসঙ্গত।

নব পরিণত বর এই সমস্ত যুবতীদের প্রলোভনে পড়িয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারে, তাই শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার সেই দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য এই ছোট গল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে সেই যুগে লেখকগণের সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারিত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি যেন প্রবল ছিল। সেজন্য শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার ইন্দুকে ক্ষমা করিয়া একটা কু আদর্শ দেশে স্থাপিত করিতে পারেন না। সেই হেতু তিনি তাহার আত্মহত্যায় প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাহার স্বামীর চিঠি। "সে (ভূপেন্দ্র) তাহার (ইন্দুর) পত্র আজকাল বিশেষ পায় না, এবং তাহাতে কেমন যেন উদাসীনতা, ইহাতে বিশেষ চিন্তিত :—"

তাহাকে যেন খোঁচা মারিল। সে সজাগ হইয়া ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পায়ের নীচ হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া গেল যখন সে বুঝিল "কি করিলাম! স্বামীর অবিশ্বাসী হইলাম, স্বতীত্ব রত্ন হারাইলাম।"

ইন্দু মনে করিল সে রক্ষিকা হইয়া ভক্ষিকা হইয়াছে। সরলা চারুর উপকার করিতে আসিয়া সে তাহার সর্বনাশ সাধন করিল। নিজে স্বামীর নিকট কলঙ্কিনী তো হইলই। তখন সে স্থির করিল "আর কেন! মরিব, নিশ্চয় মরিব। কিন্তু মরিলে কি হইবে! মরিলে তো এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

তাই শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার বন্দোবস্ত করিলেন, ইন্দু নিশ্চয়ই মরিবে, তাহা ছাড়া তাহার দুর্গত জীবনের ইতিহাস পত্নী-প্রেমিক স্বামীর কাছে নিবেদন করিয়া, তাহার পায়ে মহা পাপ স্বীকার করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিবে যে সে এই কলঙ্কিনীর কলঙ্কের কথা জনসাধারণে প্রচার করিবে, তাহা হইলে হয়তো লোকের অভিশাপে, স্বামীর আশীর্বাদে তাহার মহাপাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হইবে!

"ধীরে ধীরে ভূপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, সকলে উঠিয়া গেল। উচ্ছসিত কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলিলেন, "ইন্দু, ইন্দু, একি!" "বলি" বলিয়া ইন্দু একখানি চিঠি ভূপেন্দ্রের হাতে দিল, তারপর ভূপেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "আমার বুকে দিন রাত নরকের আগুন জলছে, এ পাপের বোঝা আর আমি বইতে পারি না, চিঠিতে সব রইল, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

ইন্দুর করুণতা এই ছোট-গল্পটিকে স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ করিয়াছে এবং ইহাই হইতেছে ছোট-গল্পের মেরুদণ্ড। একটা করাল প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকা, একটা জীবন্ত মর্মন্তুদ কাহিনী, সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার পুনঃ পুন উক্তি :

"আমার বুকে সুদারুণ নরকের আগুন।"

এই ছোট-গল্পটিকে খাঁটি ছোট-গল্পের শ্রেণীতে তুলিয়াছে।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের "ইন্দু" কি মূলক তাহা এযাবৎ আলোচনা করা হয় নাই। ইহা সমাজ সংস্কারক হইলেও ইহাকে সমাজ-সংস্কারমূলক বলা চলিবে না, কারণ ইহাতে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব এরূপ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে

যে ইহাকে মনস্তত্ত্বমূলক গল্প বলা হইবে। কিরূপ ধাপে ধাপে ইহা পাঠক পাঠিকার মনের বিকাশের উপর আঘাত করে তাহা পড়িতেও পরম আনন্দ হয়।

এই "ইন্দু" ছোট-গল্প সমালোচনাকালে শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য ছোট-গল্প গুলির গল্পাংশ লিখিতে গিয়াও তাঁহার নিজস্ব ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা দ্বারাই পাঠক পাঠিকারা তাঁহার ভাষার বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

হেমের অনধিকার। উৎসাহ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের "হেমের অনধিকার" ছোট-গল্প ১৩০৫ বঙ্গাব্দের "উৎসাহ" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিনি ইহাতে এমন একটি গুরুতর সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, যে বিষয় লইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের মনীষিগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াও সে সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু কেহই বড়াই করিয়া বলিতে পারেন না, তাঁহার যুক্তি অকাট্য সত্য।

লেখকের মনে তর্ক উঠিয়াছিল, মানুষের একবার বিবাহ করিয়া স্ত্রী বর্তমান থাকিলে বা স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহার বিবাহ করা কর্তব্য কি না, এবং বহু বিবাহ সমাজ সঙ্গত কি না, উহার শাশ্বতঃ ধর্মতঃ ন্যায়তঃ প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা প্রভৃতি আছে কি না, অমনি দেখা যায় পৃথিবীর সব দেশে এই বহু বিবাহরীতি একরূপ প্রচলিত আছে।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার "হেমের অনধিকারে" সত্যেন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহার দ্বিতীয় বার পত্নী গ্রহণ তিনি সমর্থন করেন নাই কারণ সেখানে হেমের অনধিকারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। হেম শিশু সন্তান, অতি শৈশবে সে মাতৃহারা হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীকে, হেমের মাকে লইয়া আগ্রায় বেশ সুখেই ছিল। সে সেখানে কলেজের অধ্যাপক ছিল। কিন্তু উপায় নাই যখন পত্নীসুখ তাহার অদৃষ্টে টিকিল না।

সত্যেন্দ্র নাথ যুবক, রূপবান, ধনবান, সংসারী। সে সংযমী নহে, সন্ন্যাসী নহে। সেক্ষেত্রে তাহার পুনঃবিবাহ শৈলেশ চন্দ্র বিধান করিয়া ভালই করিয়াছেন নতুবা সে যে নষ্টচরিত্র হইয়া পড়িবে। তবে প্রশ্ন, শিশু সন্তান হেমের ভবিষ্যত যে কষ্টের জীবন হইবে; কারণ সত্যেন্দ্রনাথ যাহাকে পুনরায় বিবাহ করিবে, সেই স্ত্রী যত সচ্চরিত্র হউক না কেন হেমকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও যখন তাহার নিজের পেটে ছেলে হইবে, তখন যে হেমের প্রতি সে-স্নেহ তাহার কিছুতেই থাকিতে পারে না। এজন্য হেমের অনধিকার হইবেই। তাহার পিতার নিকট সে ষোল আনা স্নেহ দাবী করিতেই পারে না।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার তাই অতি সত্য কথা এই ছোট-গল্পে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি যে বস্তুতন্ত্রবাদী লেখক (Rsalistic Writer) ছিলেন বলিয়া স্থানান্তার বলা হইয়াছে, ইহা এই ঘটনায় বাস্তবিক প্রমাণিত হইয়াছে।

তিনি সত্যেন্দ্রের পত্নী বিয়োগের পর তাহার যে অবস্থাটা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রতি বাঙ্গালী বিপত্নীকের বেলায় কম বেশী মাত্রায় দেখা যায়। বউ মরিলে সেই উদাস ভাব, সেই সংসার বৈরাগ্য, সেই মৃতা পত্নীর অভাবে জল স্থল শূন্য বোধ, ইহা খাঁটি বাঙ্গালীর জিনিস।

বউ মরিলে বাঙ্গালী কবি বা সাহিত্যিক হইয়া পড়ে এবং ইহা যেন ঠেকাইয়া রাখা যায় না, যদিও পত্নীর জীবিতাবস্থায় তাহার কাব্য বা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকে নাই। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে স্ত্রী-আচার

শ্রীস্বদেশ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

স্ত্রী-আচার অর্থহীন ও কুসংস্কার নহে। অধুনা ভদ্র-সমাজে অধিকাংশ লোকই স্ত্রী-আচারকে অসভ্যতা, কুসংস্কারকেও সনাতনী জড়তা বলিয়া মনে করেন। ১২৯১ সালের ভাদ্র মাসের ভারতী পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন যে, "বাস্তবিক স্ত্রী-আচারের অর্থ আছে। পুরাতন রীতিনীতির একটা গৌরব আছে! তাহা অর্থময় না হইলেও ভাবময়। পুরাতন আচারের অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পূর্ব্বপুরুষদের সহিত গ্রথিত সেই আচারের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ধারাবহ স্মৃতি প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দেয়। তাই পুরাতন আচার অতি আদরে রক্ষণীয়।

আমাদের পুরাতন আচার ব্যবহারের অর্থ, উদ্দেশ্য একটু বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেই সহজেই তাহা বোধ-গম্য হইতে পারে। অবশ্য বিনাশ্রমে কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। প্রাচীন উন্নত ভারত যে সকল আচার ব্যবহার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা একবার পরীক্ষা না করিয়া দেখিয়াই তাহাকে হেয় মনে করিলে আমাদেরই মনের অন্ধতা প্রকাশ পাইবে।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় "স্ত্রী-আচার। স্ত্রী-আচার কি? কন্যাগৃহে বর আসিলে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বর কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক যে আচারাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই বিশেষরূপে স্ত্রী-আচার বলে। ইহা বিবাহের একটি অঙ্গ। স্ত্রী-আচারে চারিটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায়—প্রথম বরণ, দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ, তৃতীয় শুভদৃষ্টি, চতুর্থ মালাবদল। ইহার মধ্যে বরণ ও প্রদক্ষিণই স্ত্রী-আচারের প্রধান অঙ্গ।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার মনে শুভইচ্ছার সঞ্চালন করাই এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। শুভ ইচ্ছার দ্বারা বরকন্যাকে পূত করাই স্ত্রী-আচারের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে বিবাহোৎসব একদিনে শেষ হয় না! বিবাহের পূর্ব্বে আইবড় ভাত, গায়ে হলুদ, পরে বিবাহ। বাসি বিবাহ, ফুলশয্যা, বৌভাত। এই কয়দিনেই বরকন্যাকে বরণ করা হইয়া থাকে। গায়ে হলুদের দিন, বরের বাড়ীতে বরের, কন্যার বাড়ীতে কন্যার বরণ হয়। গায়ে হলুদের দিন বর বা কন্যাকে স্ব স্ব বাড়ীতে কলতলায় নূতন আলিপনা দেওয়া পিড়িতে দাঁড় করাইয়া বরের মা অন্যান্য রমণীগণ বরণ করিবার পর সাতজন সধবা মিলিয়া তাহার কপালে হলুদ ছোঁয়াইয়া দেন। বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে হলুদ আসিলে কন্যাকে বরণ করিয়া হলুদ মাখাইয়া স্নান করান হয়। বিবাহের দিন বর কন্যার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে বিকালে কলতলায় দাঁড় করাইয়া বাটীস্থ ও পাড়াস্থ সধবা রমণীগণ বরণ করিয়া গায়ে জলের ছিটা দিয়া সজ্জিত করিবার জন্য গৃহে লইয়া যায়। ইহার নাম কন্যা স্নান। বর না আসা পর্য্যন্ত কন্যাকে নির্জ্জন ঘরে থাকিতে হয়। কন্যাগৃহে জামাই বরণ হইবার পর অন্তঃপুরে কলতলায় (যেখানে কন্যার বরণ হইয়াছে, সেখানে) মঙ্গল ঘট ধান দুর্ব্বা সজ্জিত বরণ ডালা, শ্রী, প্রভৃতি স্ত্রী-আচারের সামগ্রী প্রস্তুত থাকে! এবার বরের বরণ। গায়ে হলুদ বাসিবিবাহ, ও অন্নপ্রাশনে স্ত্রীগণ যে বরণ করেন তাহাও স্ত্রীআচার, তবে বিবাহের রাত্রে বরের বরণ, প্রদক্ষিণ শুভ দৃষ্টি ও মালাবদলকেই বিশেষভাবে স্ত্রীআচার বলে। বরণে হাতের নানারূপ চালনা থাকে। রমণী সমাজে বরণের জন্য এক একজন বেশ প্রসিদ্ধ। দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীতে ধান-দুর্ব্বা ধরিয়া অন্য অঙ্গুলীগুলি প্রসারিত করিতে হয়। সেই প্রসারিত সংলগ্ন হস্তদ্বয় বরের পদমূলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত তুলিতে হয়। পুনরায় তথা হইতে পদমূলে আনিতে হয়। পরে হাত খুলিয়া ধান দুর্ব্বা গায়ে ফেলিয়া দিতে হয়। বর ও কন্যাকে বাঁধিবার জন্যই এই বরণ। স্ত্রী-আচারে মাতৃবরণ প্রশস্ত। কন্যার মঙ্গল কামনা সে হৃদয়ে উৎসারিত—কন্যার জন্ম হইতে মাতার হৃদয়ের শিরায় শিরায় বিজড়িত। বরণে মায়ের মত কে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে? মা অপারগ হইলে সধবা ঠাকুরমা, পিসিমা, খুড়িমা বৌদি, ও দিদিরা করিতে পারেন। বরণ-

কারিণীকে উপবাসী থাকিতে হয়। ভোজনে অসংযম ও চঞ্চলতা উপবাসে সংযম ও একাগ্রতা আনে। ধান দূর্ব্বার বরণ তিন বা সাতবার হইলে অন্য বরণ করা যায়। বরণ ডালা হইতে মঙ্গলঘট বরের পদমূল হইতে মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণ সহিত গায়ে জলছিটা দিতে হয়। পরে প্রদীপের বরণ। পদমূল হইতে মাথা অবধি প্রদীপ উঠাইয়া হাতের প্রদীপের তাপ ধরিয়া বরের গালে ও কপালে দিতে হয়। উদ্ভিদ, মাটি, জল ও উত্তাপ হইতেই জীবনীশক্তি, কাজেই ধান দূর্ব্বা, জলঘট মাটির ভাঁড় ও প্রদীপের তাপসহ বরণ শরীরের পক্ষে উপকারী। প্রতীচ্যে উদ্ভিদবিদ্যা বাড়িয়াছে আজকাল, কিন্তু প্রাচীন ভারত পদার্থ বিদ্যায় ঢের বেশী উন্নত ছিল। বরণের পর প্রদক্ষিণ। বরকে প্রশস্ত স্থানে দাঁড় করাইয়া, বরের দৃষ্টি রোধার্থ দুইজন লোক পট্টবস্ত্র দিয়া বরকে আড়াল করে। তথায় কন্যা আনীত হয়। নির্জ্জনে বসিয়া পট্টবস্ত্র সুসজ্জা চন্দনচর্চ্চিতা কন্যা স্বামী প্রেমে এতক্ষণ তন্ময় ছিল। এই হেতু বরণের পর কন্যার নির্জ্জনে বাস। যবনিকার আড়ালে সপ্তমধারার সহিত কন্যা বর প্রদক্ষিণ করে, কারো মাথায় বরণডালা কারো প্রদীপ,কেহবা জল ছড়ায়,কেহবা কন্যার হাত ধরিয়া ঘোরে। অসময়ে বরকন্যা দুজনেই পর্দার আড়ালে—কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। অবশ্য দেশকাল পাত্রভেদে এই ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতঃপর শুভদৃষ্টি। কন্যাকে বরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া,মাথার উপরে পট্টবাস ফেলিয়া দিতে হয়। বরকন্যার দৃষ্টি যাহাতে বাহিরে না যায় বা বাহিরের লোকে বরকন্যাকে দেখিতে না পায়। মন্দ স্ত্রীলোক সরাইয়া দিতে হয়। শতলোকের মধ্যে বরকন্যার বিজন মিলন হয়। শত শত রমণীর আশীর্ব্বাদ—সুমঙ্গল উলুধ্বনির মধ্যে চারিচক্ষের মিলন অপ্রেমিক হৃদয়ে প্রেম ভাব জাগায় না কি? অবশেষে মালাবদল। তখন জগতের কাছে দুজনে জীবন-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কন্যা বরের গৃহে আসিলে বরের মাতা উভয়কে একত্র বরণ করেন; একত্র দাঁড় করাইয়া সেইভাবে জল প্রদীপ ধান দূর্ব্বা মঙ্গলঘট প্রভৃতি সকল উপকরণে বরণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকাদি করিয়া থাকেন।—ইহাই স্ত্রী-আচার ইহার মধ্যে কি কোনও অর্থ নাই?—ইহাতে কি বিজ্ঞান নিহিত নাই? এ আনন্দ যিনি না পাইয়াছেন তিনি অনুকম্পার পাত্র। প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিরা শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কবি ছিলেন না, ছিলেন সচ্চিদানন্দ।

আবার ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীরাই যে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, শুধু তাহা নহে, তাহারা আচারপরায়ণও বটে। সাক্ষ্যস্থল—প্রাচীন বাঙলার মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও গীতি সমুদায়। আমরা বাঙ্গালী; তাই নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবরণী আহরণ করিয়া বঙ্গজননীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি। আশা করি বঙ্গবালাগণ এই ভ্রাতৃদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি সাদরে গ্রহণ করিয়া জাতীয় পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকল্পে দীন ভ্রাতাকে উৎসাহিত করিবেন।

পদ্মপুরাণের কবি দ্বিজবংশীবদন ভগবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে সমসাময়িক যুগের স্ত্রী-আচারের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু এয়োস্ত্রীর সমাগম হইত। চন্দন লেপন করিয়া তদুপরি আলিপনা চিত্র অঙ্কণ ও তৈলরঞ্জন প্রথা প্রকৃতই সুশোভন! পদ্মপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি,—

"সুমেরু গিরির নারী, সর্ব্বরেখা সুন্দরী, সুরূপা আইল
মহামায়া।
গন্ধকালী সুললিতা জয়ন্তী অপরাজিতা বৈজয়ন্তী শ্রীজয়া
বিজয়া।
দিতি অদিতি সীতা আইল কদ্রু বিনতা সুরভি সুরূপা
সুবদনী।
অরুসানা অরুন্ধতি ক্ষেতি ধৃতি সন্ততি, আর যত রাক্ষস-
নন্দিনী।
অষ্টরম্ভা অনুমতি, ক্ষেত্রি কৃতি সন্ততি, শচী রতি আসিল
ব্রহ্মাণী।
চন্দনে লেপিয়া স্থানে, নানা চিত্র আলিম্পনে, পাতিয়া
মঙ্গলঘটবারি।
কাঞ্চণ প্রদীপ জ্বালে, সুবর্ণের পাতিলে, তৈল রাখয়ে
সুরেশ্বরী।
অগুরু চন্দন জ্বালি, বিষ্ণু তৈল দিল ঢালি, উলুধ্বনি করে
চারিপাশে!
যতেক, সুগন্ধি আনি, তৈল ঢালি দিল পুনি, মন্দ মন্দ
সঞ্চরে বাতাসে।

স্বর্ণ সলুকা হাতে, জ্বালি তৈল ইঙ্গিতে, নামাইল স্বর্ণের ইটে।
তৈল রন্ধন করি, তবে মেনকা সুন্দরী হাসিয়া হাসিয়া গুয়া বাটে॥
যত সব নারী লোকে, হাস্যরঙ্গ কৌতুকে, পার্ব্বতীরে তুলে লৈল কোলে।
সিন্দুর কাজল পরে মঙ্গলাচরণ করে বংশীবদন দ্বিজেবলে।"

অতঃপর দেখিতেছি এয়োস্ত্রীগণ মহাদেবকে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে বরণ করিতেছেন,—

"এত বলি নারী সব প্রদীপ লইয়া।
অর্ঘ্য দিয়ে উলু দেয় মঙ্গল করিয়া॥
স্নান করাইতে নিয়া বসাইল আসনে।
শীঘ্র করি কাঞ্চন কলসে জল আনে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল হরিদ্রা পিটালী।
মার্জ্জন করিয়া গাত্রে জল দিল ঢালি॥
আর্দ্র বস্ত্র এড়ি পরে উত্তম বসন।
গন্ধ তৈল দিয়া কৈল অঙ্গ সুমার্জ্জন॥
দিতি অদিতি আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাজাইতে বসিলেক সে চারি যুবতী॥

* * *

শুক্ল বস্ত্র পরিধান ধবল উত্তরী।
জামাই বরিতে গিরি হাতে কুশ ধরি॥
দক্ষিণ অঙ্গ পরশিয়া বৈদিক বিধানে।
বরণ কার্য্য করাইল তাহারা আপনে॥
হরষিত মহাদেব কৈল অঙ্গীকার।
নারী লোক সারি সারি মঙ্গল আচার।
প্রদীপ পঞ্চশত জ্বালিয়া একেবারে।
নারী লোক সহ মেনকা আইল তৎপরে॥
এইবার 'কন্যাবর তুলিলা কৌতুকে!"
তখন "প্রণাম করিয়া কালী যায় দর্পণ বদলি
কাঞ্চন প্রদীপ লইয়া করে!
কটাক্ষে অর্ঘিল যেন শিখির পেখম তেন
অষ্টবাহু তুলি একেবারে
ঔষধ প্রকার করি মহামায়া সুন্দর,
নিলা শিবের ভুলি।
হস্তে লেপ নানা পাকে ব্যঙ্গ দেখে দেবলোকে
লৌকিক বিধানে করে কেলী
পারিজাত লৈয়া হাতে তীর্থজল বিন্দু তাতে
মস্তকে পুষ্পের ঝারা দিয়া
আবির কুঙ্কুম সনে অতি বড় সুলক্ষণে
মোলি মারে শিবের দিকে চাইয়া

* * * *

অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চাইয়া মুক্তা প্রবাল লইয়া
মেলামেলি কৌতুক অপার
সিন্দুর লইয়া পাছে মুষ্টি ভরিয়ে সিচে
পৃথিবী করিল রক্তাকার
বেদিভ্রমে সাতবার হুলাহুলি সবাকার

* * *

অতঃপর কবি দ্বিজবংশীবদন স্বকৃত বিষহরির পাঁচালীতে জরৎকারু মুনির সহিত পদ্মার বিবাহ কালে প্রাচীন যুগের স্ত্রী-আচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন,—

"নারীগণ সঙ্গে লইয়া মহোৎসব করি।
শুভক্ষণে তৈল রান্ধে পর্ব্বত কুমারী॥
সোহাগ সাধিতে গঙ্গা চলিল আপনে।
আগে পাছে যোগান ধারছে নারীগণে।"
নানারঙ্গ কুতুহলে সোহাগ সাধিতে চলে
পদ্মার বিবাহ রঙ্গ করি।
সেহেরা সুবেশে সাজিয়া সুরেশ্বরী॥
দেবকন্যা সমুদিত বিদ্যাধরী গায় গীত
বাদ্য বাজে পরম উল্লাসে।
একে একে সুরপুরী চলি যায় সুন্দরী
হুলাহুলি মঙ্গল চারি পাশে॥
ব্রহ্মার পুরীতে আগে অঞ্চল পাতিয়া মাগে
তবে গেলা বিষ্ণু ভবনে।
পদ্মার হইবে বিয়া কিঞ্চিৎ সোহাগ দিয়া
চল সখি রঙ্গ দরশনে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে তথায় মিলিল রঙ্গে
শচীর দুয়ারে ইন্দ্রপুরে।

সিন্দুর কজ্জল তথা সোহাগ অলক্ত পাতা
শঙ্খ দিল মনসার করে।
কুবের বরুণ আদি সবার সোহাগ সাধে
ঘরে চলে শচী ভাগীরথী।
বাদ্যধ্বনি মহোৎসব আনন্দিত নারী সব

* * *

সোহাগ সাধিয়া গঙ্গা আসিলেন ঘরে।
লোকাচার মত কর্ম্ম করায়ে পদ্মারে॥
ইন্দ্রাসনে বসাইল নারীগণ মিলি।
স্নান করায় সুবর্ণ কলসে জল ঢালি॥
বিধিপূর্ব্বকে স্নান করাইয়া পদ্মারে।
মনসার শুভকার্য্য শীঘ্র সবে করে।

চাঁদ সদাগরের সহিত সনকার বিবাহ প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিতরূপ স্ত্রী-আচার করা হইয়াছিল,—

শুভক্ষণে করি খেলা, তুলে মুখ চন্দ্রিকা
হুলাহুলী মঙ্গল চারিভিতে
কটাক্ষে সম্ভ্রম করি পশ্চিম মুখে সুন্দরী
সম্মুখে ভ্রমায় সাতবার।
সোহাগ কাজল আনি পরাইল সুবদনী
গলে দিন মালতীর হার
প্রকারে ঔষধ দিয়া মাইজ দর্পণ বদলিয়া
হস্তলেপ করিল প্রকার
অঙ্গে অঙ্গে তুলা তুলি পুষ্প লইয়া মেলামেলি
বেদিকা ভ্রমিল সাতবার
কন্যা সাজাইয়া ঘরে হরষিত মতে
জামাই বরণ বাক্য কৈল সাবহিতে।

লক্ষীন্দরের বিবাহ যাত্রাকালে কবি স্ত্রী-আচারের প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

সুবর্ণ আসনে বসি আসে পূর্ণ কলসী
নারীলোকে মঙ্গল যোকার।
পঞ্চাশত ঘটপাতি ঘৃতে জালিয়া বাতি
আম্রশাখা আর লাজ দধি।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ কেহ চারিপাশে
খই দই সিঞ্চে নিরবধি॥
লইয়া সধবা নারী আস সনকা সুন্দরী
কাঞ্চণ প্রদীপ লইয়া হাতে।
সঙ্কুচিত হইয়া মায় আমাদের অধিয়া যায়
ধান্য দূর্ব্বা তুলি দিল মাথে॥

সমসাময়িক যুগে বিবাহ বাড়ীতে লোকাচার অনুযায়ী তৈলরন্ধন প্রথা স্ত্রী-আচারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। লখীন্দরের বিবাহকালে সাহের বাড়ীতে দেখিতেছি,—

সাহের বাড়ী তৈল রন্ধন।
পুরবাসী যত নারী রত্ন অলঙ্কার পরি
সত্বরেতে করিল গমন।
আগে চলে ভাগীরথী গঙ্গা দুর্গা পার্ব্বতী
সর্ব্বাণী সে ভবানী চণ্ডিকা।
কাত্যায়ণী মহামায়া ত্রিপুরা ভৈরবী জয়া
রুদ্রাণী অপূর্ণা অম্বিকা।
বেহুলার মাতৃস্বসা আগে চলে চিত্ররেখা
খুড়ী জেঠী যতেক প্রধানা
কন্যা হইবেক বিহা- তৈল রান্ধিবা গিয়া
সবার হয়েছে নিমন্ত্রনা॥
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা রেবতী কাঞ্চণমালা
উষা পদ্মা জয়া ও বিজয়া।
সীতা তারা মন্দোদরী উর্ব্বশী প্রভাসুন্দরী
প্রিয়বতী চলে মহাশয়া॥
জয়ন্তী অপরাজিতা কামাখ্যা কনকলতা
ভাগ্যবতী ভারতী সে তারা।
সাবিত্রী ব্রাহ্মণী রমা গন্ধকালী তিলোত্তমা—
শশীমুখী সৌদামিনীহারা॥
চলিলা সুন্দরীগুলা চড়িয়া বিমান দোলা
পদব্রজে কেহ কেহ যায়।
যথাবিধি লোকাচারে যায় তৈল রান্ধিবারে।"

অতঃপর "তৈলরন্ধন" অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি বংশীদাস লিখিতেছেন,—

"অগুরুচন্দন ঢালি তৈলের উপর।
বেহুলার মাতা তৈল রান্ধিল সত্বর॥
ঔষধি আনিয়া তার পুনঃ দিল সত্ব।
তৈলের উপরে দিল নানা গন্ধযুত॥

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বিচিত্র বিজানী দিয়া বাতাস করিল।
হস্তের কঙ্কণ তার কিছু না নড়িল॥
রন্ধন করিল তৈল সুমিত্রা সুন্দরী।
কর্পূর তাম্বুল গুয়া নিল বাটা ভরি॥
এয়োগণে বসাইল সুবর্ণের খাটে।
তৈল সিন্দুর দিয়া গুয়া পান বাটে॥
হাস্য পরিহাস করি করে স্ত্রীআচারে।
গন্ধ অধিবাস তথা কৈল লক্ষ্মীন্দরে॥"

অতঃপর লখিন্দরের বিবাহ বর্ণনায় ;—

স্নান করে চান্দের কুমার।
সুবর্ণ চৌকিতে বসে বাদ্য বাজে চারিপাশে
নারীগণে মঙ্গল জোকার।
ঘাইট ঘিলা আমলকী হরিদ্রারি তৈল মাখি
তিনগুণ করিয়া সন্ধান।
দাসীগণ সবে ধরি শরীর মার্জ্জনা করি
কাচা সোনা সমান সুঠাম॥
সুবর্ণ কলসী ভরি তীর্থজল সারি সারি
শিরে ঢালে পঞ্চাশ কলসী।
গন্ধ তৈল লাগাইয়া আইল গামছা লৈয়া
মাজি তোলে পূর্ণিমার শশী॥—
কেশব অগুরু সঙ্গে চন্দন লেপিল অঙ্গে
যেন দেখি পূর্ণ শশধর।
ধরিয়া দাসের গায় সোনার খড়ম পায়
বৈসে দিব্য আসন উপরে॥
রতন মুকুট শিরে নানাচিত্র অলঙ্কারে
সাজিলেক চান্দের নন্দন।
মাইজ দর্পণ সম্মুখে রঙ্গ দেখে নারীলোকে।"

বেহুলার বিবাহ প্রসঙ্গে :—

মিলিয়া সকল নারীলোকে।
কেহ নাচে কেহ গায় সোহাগ সাধিতে যায়
বেহুলার বিয়ার কৌতুকে।
মাথায় সোহাগ ডালা শুক্ল ছত্র শোভে ভালা
চলিয়াছে সাহের সুন্দরী।

* * *

হাতাহাতি করি রঙ্গে দুই দুই এক সঙ্গে
সোহাগ মঙ্গল গীত গাইয়া।
বাড়ী বাড়ী উত্তরিয়া ঘৃতের প্রদীপ দিয়া
আলিপনা পাতিয়া দুয়ারে।
জিরামরিচ লঙ্গ বাটি আসা চাউল গুটিগুটি
লয় সজ্জা মঙ্গল জোকারে॥
এই মতে পরিপাটী গন্ধবণিক বাটী
সোহাগ সাধিল সুরঙ্গণী।
সুমিত্রা সুন্দরী তথা আনি বেহুলারে।
স্ত্রী আচার শীঘ্র করি মঙ্গল আচারে॥
উপরে চান্দোয়া টানি দীপ সারি সারি।
প্রায়াজন করিলেক নাপিতের নারী॥
স্নান করাইতে নিয়া বসায় আসনে।
মঙ্গলাদি গীত গায় যত নারীগণে॥
শিলা আমলকী আর হরিদ্রা পিটালী।
মার্জ্জনা করিরা গায় দিলা জল ঢালি॥
আর্দ্র বস্ত্র এড়ি দেয় উত্তম বসন।
গন্ধ তৈল দিয়া কৈল অঙ্গ সম্মার্জ্জনা॥
শীতল পাটী বিছাইয়া যত নারীলোকে।
সাজাতে বসিল তারা পরম কৌতুকে॥

* * *

হস্ত লেপ দিতে শিখাইল নারীলোকে।
সুমিত্রা বলয়ে সখী মিষ্ট সম্বোধিয়া।
ঔষধ কিছু না পাইনু ঝিয়ের লাগিয়া॥
জামাই ঝি ঘরে দূর দেশান্তরে।
কড়ার ঔষধ নাই দিতে কি ঝিয়েরে॥

* * *

মোড় গুয়া মোড় পান মক্ষিকা মাকড়।
উভতনোঙ্গেবার ছাল মানের শিকড়॥
একত্র বাটিয়া পুনঃ কেশে দেহ জড়ি।
একতিল জামাই সে নাহি যাবে ছাড়ি॥

* * *

শ্মশানের জল আর কলসের মাটি।
পুরাণ কাঞ্জির রস একত্রেতে বাটি॥

গেঁঠুলিতে বান্ধিয়া রাখিও বামপাশে।
হাজার দোষ পায় যদি মুখ চেয়ে হাসে॥

* * *

কাঁকড়ার বামহাত ইন্দুর পিত্তিতে।
পেঁচার বাম চক্ষু দিয়া কাজল রাত্রিতে॥
বাম চক্ষুতে দিবে অঙ্গুলি করিয়া।
গালি পাড়িলেও থাকে পেঁচা মত চেয়া॥
আর সখী বলে আমি ফুল পড়া জানি।
যদি শুঙ্গাইতে পার যত্ন করি আনি॥
পুষ্প মধু খেয়ে যেন ভ্রমরা মোহিত।
এই মত স্বামী সে না ছাড়ে কদাচিত॥
এই মতে নারীগণে ঔষধ বিচার।
কেহ নাচে কেহ গায় কৌতুক অপার॥

কবি ঘনরাম কৃত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যে রঞ্জাবতীর বিবাহ পালায় দেখিতে পাই,—

"মঙ্গল নারীগণে লইয়া নিকেতনে।
কন্যা সে কণকচন্দ্রিকা॥

* * * *

বুঝিয়া শুভ লগ্ন আনন্দে হয়ে মগ্ন
বরে করিলা পুরস্কার।
বসন নানা রত্নে বরণ করি যত্নে
কারতে নিল স্ত্রী-আচার॥
উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে।
শশিমুখী সকলে বরিতে এল বরে॥
কোন নব নাগরী লাবণ্য দেশ বই।
কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে ঢালে দই॥
কর ভঙ্গী করিয়ে কহিছে কত তানে।
বরের বদন বিধু বরে ঢাকে পানে॥
মুখে দিয়ে তাম্বুল সেনের সেকে গাল।
সাতবার ঘুরিল ঘুরায়ে হেম আল॥
সাজান সাতাশ কোটি সখীগণ লয়ে।
মঙ্গল আচার করে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
দু'হাতে ঘুরায়ে পান লাজে হেট মুখী।
বসনে বরের মুখ ঢাকে সব সখী॥
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে সাতবার।
দুজনে বদলে মালা পসারিয়া কর॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভকর তুলি।
বরেরে ফেলিয়া মারে সগুড় চাউলি॥
চারি চক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে॥

* * *

এত বলি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা॥
কৌতুকে কামিনী দল দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলি ময়॥
শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্যে উঠে জয়ধ্বনি॥
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়ে জল ধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী-আচার সারা॥

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কৃত শিবায়ন কাব্যে শিবের বিবাহ কালে অয়োগণের জল সহিবার প্রথা রহিয়াছে—

"ওথা নৃত্য গীত বাদ্য করি কোলাহল।
শত এয়ো সহিত মেনকা সহে জল॥

অতঃপর এয়োগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"এয়োর প্রধান এয়ো সংসারের সার।
আনন্দদায়িনী এয়ো মহিমা অপার॥
ভদ্রকালী ভবানী ঈভারী ভগবতী।
ভাগ্যবতী ভানুমতী ভাগীরথী রতি॥
রামেশ্বরী রুক্মিণী রোহিণী রাধা রমা।
রম্ভা, তারা, ত্রিপুরা তুলসী তিলোত্তমা॥
চন্দ্র মুখী চিত্র লেখা চিত্রানী চর্চ্চিকা।
অরুন্ধতী অন্নপূর্ণা অর্পণা অম্বিকা॥

জাহ্নবী যমুনা জয়া জানকী যশোদা।
সুলোচনা সুশোভনা সুন্দরী সারদা ॥
সুভদ্রা সুমিত্রা সত্যভামা সত্যবতী।
স্বাহা স্বধা শচী সীতা শিবা সরস্বতী ॥
পুণ্যবতী পার্ব্বতী পারশী পরতরা।
পদ্মমুখী পদ্মিনী পরমেশ্বরী পরা ॥
হরিপ্রিয়া হৈমবতী অদিতি অভয়া।
দনু দিতি দ্রৌপদী—দৈবকী দুর্গাদয়া ॥
কাত্যায়ণী কালী জয়াবতী কল্পলতা।
কামেশ্বরী কৃশোদরী কুন্তী কৌশুমতা ॥
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী।
মধুমতী মাতঙ্গী মদনা মন্দোদরী ॥
বিদ্যাধরী বিশালাক্ষী বিমলা বিজয়া।
বেণু বৃন্দা গোমতী গান্ধারী গঙ্গী গয়া ॥
ঈশ্বরী ইন্দ্রাণী উমা উর্ব্বশী অহল্যা।
কুমারী কল্যাণী কুব্জা কৈকেয়ী কৌশল্যা।
কুঞ্জলতা ললিতা লক্ষ্মীর অবতার।
এয়োর প্রধান শত এয়ো কত আর ॥
সুরধনী মাধুনী ধনী চিন্তামণি চাঁপা।
সোহাগী সম্পদী পদী খুদী সোনারূপা ॥
যোড় হয়ে জল ল'য়ে মঙ্গলিলা হাঁড়ী।
হেনকালে হইল বরের তড়বড়ি ॥
আনন্দে বিহ্বল হয়ে রহে মহীধর।
স্ত্রী-আচারে নারদ লইয়া চলে বর ॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বেড়িলেন বরে।
তার মাঝে মেনকা মোহিনী আগুসরে ॥
দুদিকে দু দাসী লয়ে ঔষধের ডালা।
বরের নিকট রাখে বরণের থালা ॥

এইবার পার্ব্বতীর বিবাহ আসরে স্ত্রী-আচার প্রসঙ্গে দেখিতেছি,—

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরি।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে দিব্য শোভা করি ॥
রতন প্রদীপ সব রমণীর হাতে।
বেড়িল পদ্মিনী ঘটা পার্ব্বতীর নাথে ॥

* * *

শাশুড়ী বরণ করে সাবধান হয়ে।
দিব্য দধি দিয়া দুটি চরণার বিন্দে।
অঙ্গুলি হেলায় রামা অশেষ প্রবন্ধে ॥
পায় হাত মস্তক মস্তক হ'তে পা।
প্রচুর প্রবন্ধ কৈল পার্ব্বতীর মা ॥
তর্জ্জণী অঙ্গুষ্ঠে মোথে দুই হস্ত ধরি।
নিছিয়া ফেলিল পান পরিপাটি করি ॥
মাথায় মণ্ডল দিয়া জোকে সাতবার ॥
কপালে চন্দন দিয়া গলে দিল হার ॥
ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল ঔষধ করণ ॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কৃত "অভয়ামঙ্গল" কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে স্ত্রী-আচারের মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে—

"মেনকা সুন্দরী ডাকি সহচরী
আনাইল যত সখীগণ।
শুনি আনন্দ রব ধাইল নারীসব
আইল গিরি রাজার ভবন ॥
তুলসী মালতী কৌশল্যা অরুন্ধতী
আইল কুমারী ভবানী।
সাধু মাধু হারী গঙ্গা দুর্গা প্যারী
কমলা কলাবতী রাণী ॥
চিত্র রেখা শীলা সুভদ্রা সুশীলা
শ্রীমতী আইলা সাবিত্রী।
গৌরী সতী মায়া চিত্রা কালী জয়া
করুণা তারা হীরাবতী ॥
জাহ্নবী হৈমতী অহল্যা রেবতী
অভয়া অম্বিকা সুমতী।
খুল্লনা বিমলা বিদ্যাধরী নীলা
সুমিত্রা কৈকেয়ী পার্ব্বতী ॥
কালিনী কামিনী অপর্ণা রোহিণী
সারদা বরদা রুক্মিণী
ভারতী শশিকলা বিজয়া সতীমালা
ললিতা নাগরী বারুণী ॥

কাঁখে হেমঝারি　　　মেনকা সুন্দরী
　　জল সাধে ঘরে ঘরে।
যত এয়ো মিলি　　　দেয় হুলাহুলি
　　মঙ্গলসূত্র বাঁধে করে॥
বিরলে সহল করি　　　মেনকা সুন্দরী
　　করিল স্ত্রী-আচরণ।
করি নানা ছন্দ　　　নানা ঔষধ প্রবন্ধ
　　করিলা লয়্যা সখীগণ॥

কোন নাগরীর আধ-সীমন্তে সিঁন্দুর।
কারো ভ্রমে পদে হার পায়েতে নিপুর॥
কারো এক নেত্রে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নাহিল সকলে॥
আণ্ডলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
পদ্মাবতী স্বর্ণ রেখা রতি কলাবতী॥
বল্লভা দুর্লভ রম্ভা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী রাণী শচী সুলোচনা॥
হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গোপী সুমিত্রা সুন্দরী॥
যশোদা রোহিণী রাধা রুক্মিণী শঙ্করী।
চিত্ররেখা সুধামুখী গোপী মন্দোদরী॥
ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।
আল্য করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ॥
এক পদে কোন আইয়ো দিয়াছে নিপূর।
কপালে সিন্দুর নাই সীমন্তে সিন্দুর॥
এক চক্ষে কোন আইয়ো দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন॥
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো।
কোন আইয়ো আসে তার হাতে কাঁখে পো॥
চড়িয়া জাঙ্গালে আইয়ো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া॥
বরণ করিতে আইয়ো করিল পয়ান।"

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে স্ত্রীআচার প্রসঙ্গে যত কবি যত বর্ণনাই উপহার দিন নাগরীগণের বর দর্শনের জন্য ব্যস্ততার বিষয় এত সুন্দর, মনোরম ও স্বাভাবিক ভাবে কবিকঙ্কন ভিন্ন আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।—অসভ্য ব্যাধ রমণীদের মধ্যেও স্ত্রী-আচার বর্ত্তমান। কালকেতুর বিবাহকালে কবিকঙ্কন লিখিতেছেন,—

"কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি　　　দেয় ব্যাধ নিতম্বিনী
　　নিদয়ার মানস সফল॥
কেহ আগাইয়া ধীরে　　　গুড় চাউলি মারে
　　গুয়া কাটায় হৈলা গণ্ডগোল।

*　*　*

বিরলে করিয়া স্নান　　　জামাতার করে মান
　　প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দুর্ব্বা ধান—　　　নিছিয়া ফেলিল পান
　　গাঁথি গলে দিল পুষ্পমালা॥
পাট চড়ি রূপবতী　　　প্রদক্ষিণ করে পতি
　　চৌদিক বেড়িয়া কোলাহল।
যতেক ব্যাধের নারী　　　গান করে মনোহারী
　　ফুল্লরার বিবাহ মঙ্গল॥
চৌদিগে গীত্তি নাটে　　　ফুল্লরা চড়িল পাটে
　　কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদিগে ব্যাধের নারী　　　উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি,
　　ছাউনি হইল কন্যা বরে॥"

কবি কঙ্কণ ভারতের বহির্দেশে সিংহল রাজ্যে সুশীলা ও শ্রীমন্তের বিবাহবাসরে তদ্দেশীয় নারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্ত্রী-আচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

"কাঁখে হেম ঝারি　　　রাজার সুন্দরী
　　জল সহে ঘরে ঘরে।
এয়ো গুয়ো মিলি　　　দেয় হুলাহুলি
　　তণ্ডুল মঙ্গল করে॥"

কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত সীতার বিবাহ প্রসঙ্গে স্ত্রী-আচারের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,—

"সখীগণ দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান এবে করে চন্দ্রমুখী॥

চারি ভগিনীতে বেশ করিল বিলক্ষণ।
শুভক্ষণে মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন।
অঞ্জলী পুষ্প দিয়া তবে নমস্কার করে।
সপ্ত প্রদক্ষিন করে রামের পদ তলে ॥

বাংলার কাব্যসাহিত্যে স্ত্রী-আচার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আজিও বাংলার অন্তঃপুরে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান।

অনিন্দিতা

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী

অনু উত্তর দিলে—"কেন খানিকক্ষণ যে বাড়ুজ্জেদের রকে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তখন ত তার মাথাও কিছু নীচু ছিল না। দেখলি না যখন ওপরের দিকে তাকাল কি সুন্দর বড় বড় চোখ দুটী। আমার কিন্তু তখন খুব ভাল লেগেছিল।"

ফুলী বললে—"চোখ সুন্দর হ'লে কি হবে,মাতাল ত?"

অনুর মন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে শুধু বলে—"আচ্ছা ফুলী ও রাধার কাকাবাবুর চাইতেও কি খারাপ?"

ফুলী উত্তর দিলে—"খারাপ না হ'ক, ভাল ত নয়ই। ওই এক রকম মাতালই দুজন।"

অনু ও ফুলীর মদ খাওয়া ও মাতাল বিষয়ে যে কিরূপ অভিজ্ঞতা তাহা তাহাদের কথোপকথন হইতেই সবাই অনুমান করিতে পারিবে। অনুদের বাড়ীর কেউ মদ খায় না, কাজেই মদ দেখ্‌তে যে কেমন তাও অনুরা জানে না; শুধু জানে যে-লোক মদ খায় তাদের মত ঘৃণ্য বুঝি পৃথিবীতে কিছু নেই। রাধা প্রতিবেশীদের ছোট একটী মেয়ে। তার কাকাবাবু খুব মদ খান। কোন কোন দিন মদ খেয়ে এত চীৎকার গোলমাল করেন, এবং ছোট ছেলে মেয়েদের মার ধর করে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে এমন হুলুস্থুল সুরু করে দেন যে বাড়ী শুদ্ধ ছেলে বুড় তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। শুধু রাধার কাকীমাই তখন ঐ দুরন্ত রাগী লোকটীর সাম্নে গিয়ে যেন জোর করে ঠেলে নিয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখেন। রাধার কাকীমাকেই যা রাধার কাকা একটু তখন ভয় করেন, নতুবা মদ খেয়ে রাগের সময় তাহার কার্য্যকলাপ দেখ্‌লে কেউ তাকে উন্মত্ত পাগল ছাড়া আর কিছু বলবে না। রাধার প্রতি তাহার কাকাবাবুর ভালবাসা অত্যন্ত বেশী, কিন্তু সেই মমতাময় কাকাবাবুই মদ খেয়ে এসে রাধাকে কাছে পেলে যে রকম মারধর করেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ব্যাপার। রাধার শিশু অঙ্গে তাহার কাকাবাবুর প্রহারের অনেক চিহ্ন আছে, তা দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না অমন নৃশংস দুর্দ্দান্ত লোকটী মদের প্রভাব না থাক্‌লে সত্যই পরম স্নেহময় কাকা হ'তে পারে। আবার এমনও হয়েছে মদ খেয়ে বাড়ী ফেরবার পথে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার কোথাও পড়েছিলেন দেখে পাড়ার লোকেরা দয়া পরবশ হ'য়ে ধরাধরি করে রাধাদের বাড়ী তার কাকাবাবুকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর তার পরদিন রাধা এসে অনুদের বাড়ী গল্প করে গেল—"জান অনুদি, কাকাবাবু কাল খুব মদ খেয়েছিলেন; তা বেশ ভালই হয়েছিল, বাড়ী ফিরে কাউকে আর মার ধোর করতে পারেন নি।"

অনুরা জিজ্ঞাসা করে—"মাতালকে তোর ভয় করে না রাধা?"

রাধা উত্তর দেয়—"করে না আবার, খু-উ-ব করে, কিন্তু কি করব বল। আমার ইচ্ছে হয় অনুদি জান, কাকাবাবু যদি মদ খাবেই তবে তা খুব বেশী যেন খায়। এই মনে কর যেমন সেদিন রাত্রে হ'ল। মদ খেয়েছেন, কিন্তু বেশ হুঁস আছে; টল্‌তে টল্‌তে মাথাটী নীচু করে ত বাড়ী ঢুকলেন; কাকীমা দেখ্‌তে পেয়ে তক্ষুনি ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন; ব্যাস আর কোন উৎপাত নেই।"

মাতালের অভিজ্ঞতা ঐ পর্য্যন্তই; রাধার কাছে শুনে ও বই পড়ে অনুদের যা সঞ্চয় হয়েছে; আর সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা স্থির করে ফেল্‌লে—যে খানিকক্ষণ পুর্ব্বে যে ১২।১৪ জন ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান হাসি ঠাট্টা আমোদ আহ্লাদ করছিল তারা সবাই মাতাল। তবে এরা রাধার কাকাবাবুর মত মারধোর না করে, বইয়ে যেমন পড়া আছে মদ খেলে লোকেরা খুব গান গায় স্ফুর্ত্তি করে, এরাও ঠিক তেমনি রাস্তার জলে নেমে স্ফুর্ত্তি করতে বেরিয়েছে। ছেলের দল মাতাল ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। আর কাঁধে চড়া সুন্দর ছেলেটী বেশী মদ খেয়েছে বলেই হাঁট্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই বন্ধুরা তাঁকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

অনুর মনটা ভারী কোমল, খুবই স্নেহপ্রবণ। কাহারও দুঃখের কথা শুনলে বা দেখ্‌লে তার একটুতেই কষ্ট হয়। কিশোরী চিত্ত তার আজ মাতালের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌লেও তার স্নেহ পরায়ণা নারী চিত্তে সেই অনাত্মীয় অপরিচিত সুন্দর লোকটীর জন্য কেমন একটা ব্যথা বোধ হ'ল। সেই অল্পক্ষণ দেখা সুন্দর মুখখানির উজ্জ্বল বড় দুইটী চোখ তখনও যেন তার সমস্ত মনটা জুড়ে ছিল। সে খানিকক্ষণ একটু অন্যমনস্ক থেকে শেষে বললে—"আয় ভাই ফুলী, আমরা ঐ মাতালদের ভাল করে দেবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। অমন সুন্দর করে ভগবান যাকে সৃষ্টি করলেন সে যেন আর মাতাল না হয়।"

ফুলী বললে—"আচ্ছা।"

তখন দুইজনে জোর আসন করে বিছানার উপর বসে করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে লাগল।

ফুলী যে মনে মনে ভগবানের নিকট কি কামনা করিল সে সংবাদ আমার জানা নাই, কিন্তু তাহাকে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চুপ করিয়া অনুর সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। আর অনু একাগ্র হইয়া সমস্ত মনে প্রাণে বলিল—"হে ভগবান, তুমি পৃথিবীতে অত মাতাল পাঠিও না। অত সুন্দর করে যাকে সৃষ্টি করেছ তাকে মাতাল হ'তে দিলে কেন ঠাকুর; তাকে ভাল করে দাও। যদিও আমি এ সব মাতালদের কাউকেই চিনি না, তবু তাদের হ'য়ে আমি তোমায় জানাচ্ছি, ওদের সকলকে ভাল করে দাও। মাতালকে আমার বড় ভয় করে ভগবান, তুমি ওদের সকলকে সুবুদ্ধি দাও; মদ খাওয়া বন্ধ করে ওরা যেন তোমায় ডাক্‌তে শেখে, ভালবাসে, তুমি তাদের সেই বুদ্ধিই দাও ঠাকুর, তুমি তাদের ভাল কর। ফুলী ও আমি মাতালদের সকলের হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করি ঠাকুর তুমি আমাদের প্রার্থনা শোন। আমরা তোমায় প্রণাম করি, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।"

এই প্রার্থনা শেষে ফুলী ও অনু একত্রে নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস মত "প্রভুমীশ মহীশমশেষ গুণং" এবং কর্পূর গৌরং করুণা বতংশং ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া বালিসে মাথা দিয়া শুইবা মাত্রই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা হইল।

অনুর ভাই বোনেরা সকলেই অতি শিশুকাল হইতে মায়ের নিকট স্তব পাঠ শিক্ষা করে, শেষে সেই শিশু বয়সের শিক্ষা বয়সকালে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। অনুদের বাড়ীর সকলেরই বহু স্তব মুখস্থ এবং সকাল সন্ধ্যা বিনা আড়ম্বরে অভ্যাস মত অনুর দাদা দিদিরা এবং তাহাদের দেখাদেখি বউরাও প্রায় সকলে স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। অনু এবং ফুলী প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই কয়েকটী স্তব পাঠ করিয়া বিছানা ছাড়ে, এবং রাত্রে বিছানায় আসিবার পূর্ব্বে স্তব পাঠ করে।

যেখানে মাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, অথবা সব কথা সব সময় এখন আর অতি শিশুর মত মাকে বলিতে পারা যায় না, লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, সেখানে অনু সে সব অব্যক্ত কথা একাগ্র চিত্তে নীরবে ভগবানের কাছে প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা পায়।

চৌদ্দ বছরের মেয়ে অনু, তিন সপ্তাহ পরেই তার বিয়ে, বাইরের ব্যবহারে দেহের গড়নে শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে সে কৈশোরে পৌঁছে গেছে কিন্তু নির্জ্জনে অন্ধকার ঘরে যে শিশু চিত্ত জেগে ওঠে সেখানে সে যেন ১০ বছরের খুকীটী। তাই আজ অনুর সেই শিশু চিত্তই পরের দুঃখে ব্যথিত হয়ে মাতালগুলিকে ভাল করে দেবার জন্য ভগবানের চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে শিশুটীর মতই পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘটনাটি সত্যই এমন কিছু আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপার দাঁড়াল যেন মস্ত হেয়ালী। সে রাত্রে অনু ও ফুলী যাদের মাতাল ভেবে আতঙ্কিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল, তারা যে কেহই সত্যি মাতাল নয়, কিন্তু প্রাণের সজীবতায় ভরা প্রফুল্ল চিত্ত কয়েকটী কলেজের ছাত্র সে কথা লেখাই বাহুল্য।

অনুর সহিত সমীরের বিহাহের সমস্ত কিন্তু ঠিক করেন উভয় তরফের কর্ত্তা গিন্নীরা এবং বিবাহের সমস্ত কিছু যখন একবারে পাকা হইয়া গিয়াছে তখন সমীরের পিতা পুত্রকে লেখেন যে তিনি সমীরের বিবাহের সব কিছু স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যাটী শ্যামবর্ণা, কিন্তু খুব সুলক্ষণ যুক্তা তাই বাড়ীর সকলেরই এ বিবাহে খুব আগ্রহ। সমীর যেন এবার পরীক্ষান্তে অন্যত্র বেড়াইতে না গিয়া বাড়ী আসে এবং কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিলে, চৈত্র মাস বাদে বৈশাখ মাসের ২৫ তারিখে তাহার বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হইয়া আছে।

সমীর নিজের খেয়ালে কলিকাতা ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌ গিয়া ডাক্তারী পড়ে। কি ভাবিয়া পিতা মাতা পুত্রের এ খেয়ালে বাধা না দিয়া বরং নিয়মিতই তাহার লক্ষ্ণৌ এ পড়ার খরচ পাঠাইয়া আসিয়াছেন। ছেলেটী দেখিতে অতি সুশ্রী, পড়ায় খুব ভাল, তাই অনেক কন্যার ধনী পিতার তাহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল, এবং এতদিনে তাহার বিবাহ ও হইয়া যাইত, কিন্তু, পড়া শেষ না করিয়া কিছুতে সে বিবাহ করিবে না এইরূপ জেদ প্রকাশ করায় পিতামাতা তাদের এই খেয়ালী ছেলেটীকে জোর করিয়া আর বিবাহ দেন নাই। এ বছরই সমীরের ফাইনাল এগজামিন, তাই বাড়ীর সকলে মিলিয়া সে কিছু মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহের সব কিছু স্থির করিয়া ফেলিলেন।

সমীর যখন পিতার পত্র পাঠে তাহার বিবাহের সংবাদ পাইল তখন মোটেই খুসী হইতে পারিল না। পিতা-মাতাকে বিবাহের তাগিদ হইতে বন্ধ করিবার জন্যই সে এতদিন বলিয়া আসিয়াছে যে সমস্ত পড়া শেষ না হইলে সে কিছুতে বিবাহ করিবে না, কিন্তু তাহার সে কথা রাখার জন্য যে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে না দিতেই পিতামাতা তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিন পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইবেন তাহা সে কখনো ভাবিতেও পারে নাই।

মোট কথা ইতিপূর্ব্বে সমীর নিজের বিবাহের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়া পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিয়া সে এক রকম আনন্দেই তাহার বিদেশ বাসের সময়গুলি কাটাইয়াছে, কেবল ছুটীতে বাড়ী আসিলে মা দিদি বউদিদের কাছ থেকে বিবাহ করিবার তাগিদ পাইয়াছে, এবং ছুটী শেষে লক্ষ্ণৌ গিয়া কলেজে যোগ দিয়া বিবাহ বিষয়ে সমস্ত কথা একবারে ভুলিয়া থাকিতে পারিয়াছে। চতুর্বিংশ বর্ষীয় যুবকের মনে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তখনও গভীর ভাবে কোন ছাপ দেয় নাই বরং যুবজনোচিত ঔদার্য্যে সে ভাবিয়া রাখিয়াছে যে জীবনে সে কখনো বিবাহ করিবে না, আজীবন চিরকুমার থাকিয়া দেশের ও দশের জন্য জীবন-পাত করিবে। তখন সবেমাত্র ইয়োরোপে মহাযুদ্ধের সূচনা। সমীরের একান্ত ইচ্ছা সে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা গুলি পাশ করিলেই যুদ্ধের ডাক্তার হইবার জন্য নাম লিখাইবে, আর এখন কিনা পিতা লিখিতেছেন পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হও।

বিবাহ স্থির হইয়াছে সংবাদ পাইয়া হঠাৎ তাহার মন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"মজা মন্দ নয়, বিবাহ করিব আমি কিন্তু আমার মতামতের কোনই প্রয়োজন নাই। সমস্ত স্থির করিয়া এখন ২৫শে বৈশাখ কোন এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে

কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমার আহ্বান, তাও আবার মেয়েটী শ্যামবর্ণা।"

অত্যন্ত অভিমান করিয়া সে পিতার পত্রের উত্তরই দিল না। দিন কয়েক পরেই পিতার নিকট হইতে দ্বিতীয় পত্র আসিল।

"পরম স্নেহাস্পদ,

বাবা সমীর, সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল তোমার পত্র পাইতেছি না। পত্র পাঠ তোমার কুশল জানাইতে বিলম্ব করিও না। তোমার মা তোমার সংবাদের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। এ সপ্তাহে তোমার পত্র না আসিলে তিনি লক্ষ্ণৌ যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। তোমার নীরবতার কারণ কিছু বুঝিলাম না, বোধহয় পরীক্ষার চাপে সময় করিতে পার নাই, কিন্তু পত্র না লেখা তোমার স্বভাব নয় জন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে, হয়ত বা হঠাৎ তুমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ।

যাই হউক এ পত্র পাওয়া মাত্র তোমার সুস্থ সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

তোমার সহিত যে মেয়েটীর বিবাহ স্থির করিয়াছি তাহাকে তোমার মায়ের খুবই পছন্দ হইয়াছে। তিনি গত পরশু দিন গিয়া পুনরায় কন্যাটীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এখানে সকলেই সে মেয়েটীকে বধূরূপে আনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। অত্র শুভ। আশীর্ব্বাদ করি পরীক্ষায় সফলকাম হও।

ইতি—পিতা
শ্রীভুপেশ চন্দ্র মৈত্র।

পত্র পাঠ করিয়া মায়ের কথা ভাবিয়া তাহার সমস্ত অভিমান দূর হইয়া গেল। তাহার সেই স্নেহময়ী মা, নিজের চিন্তা, নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতি এইসব ভাবিয়া সে মাকে এ কয়দিন ভুলিয়াছিল। মা তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া সংসার ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সে নিজের দিকটাই কেবল এ কয়দিন ভাবিয়াছে—কিন্তু সর্ব্বোপরি সব চিন্তার উপরে যে তাহার মা আছেন সে কথা ত ভাবে নাই। কি অকৃতজ্ঞ সন্তান সে! বিবাহ না করিয়া মায়ের মনে ব্যথা দিবার মত মনের জোর তাহার নাই। এতদিন বিবাহ বিষয়ে যেমন ভাবে নাই তেমনি এখন সত্যই যখন তাহা নিদারুন সত্যরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল, তখন পিতার উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মন তাহার বিরূপ হইলেও মায়ের মুখ স্মরণ করিয়া সে মায়ের মনে কষ্ট দিবার কথা ভাবিতেও চেষ্টা করিল না। সমীরের মনটা বড়ই কোমল, একান্ত স্নেহপ্রবণ, এবং তাহার মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং আকর্ষণ এখনও কি যেন কচি শিশুর মতই। মায়ের চিন্তা, মায়ের মুখ তাহাকে সমস্ত প্রলোভন হইতে রক্ষা ক'রে। মায়ের কথা ভাবিয়া সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল; শুধু মনে মনে বলিল—

"মা তুমি যাকে বধূরূপে আনতে চাও আমি যেন তার যথার্থ স্বামী হতে পারি। আমার কাছ থেকে সে যেন কোনদিন কষ্ট না পায়; তুমি আমায় সেই আশীর্ব্বাদই কর মা।"

সেইদিন রাত্রেই সে মাকে পত্র লিখিল।

"আমার মা মণি,—

বাবার উভয় পত্রই পেয়েছি, ক'দিন চিঠি না লেখা আমার ভারী অন্যায় হয়েছে। তুমি তোমার বুড় ছেলের জন্য এখনও অত ভাব কেন বুঝি না। আমিও কিন্তু তোমার কথা খুব ভাবি মা। সম্প্রতি তোমার কাছে যাবার জন্য আমার মন ভারী ব্যাকুল হয়েছে। পরীক্ষার আর মাত্র ক'দিন বাকী, পরীক্ষান্তেই আমি তোমার কাছে যাব। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার তুষ্টু—সমু।"

বিবাহের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া ভাল ছেলের মতই সমীর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ী পৌছিলে দাদারা বলিলেন—"ক' জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন গিয়ে মেয়েটী দেখে আয় সমীর।"

সে উত্তর দিল—"মা, দিদি, বউদি সবাই সে মেয়েটীকে দেখেই নাকি পছন্দ করে ফেলেছেন, আমি গিয়ে তাদের সে দেখাটা এখন বাতিল করে দিয়ে আসব ?"

দাদারা বলেন—"তবু নিজে একবার দেখে এলে ভাল হ'ত।"

হাসিয়া সমীর জবাব দেয়—"তোমাদের বেলায় যদি না দেখেই ও ব্যাপারটা সমাধা হ'য়ে থাকে তবে আমি বাড়ীর ছোট ছেলে, সে নিয়ম কেন আর উল্টে দিই বল।"

বড় ভাই একটু ইতঃস্ততঃ করে বলেন—"তবে কি না বুঝিস না—এই কথা হচ্ছে গিয়ে কিনা—এই মেয়েটী একটু শ্যামবর্ণ বলে শুনেছি ; তাই তুই একবার নিজে গিয়ে দেখে এলে পারতিস।"

এই বিংশ শতাব্দীতে কন্যা শ্যামবর্ণ শুনে কেউ যা করতে পারে না, সমীর তাই করলে। সে হো হো করে জোরে হেসে উঠে বললে—"মেয়ে দেখবার কিছু প্রয়োজন নেই বড়দা। আমি ত বরং বলি সেই ত বেশ ভাল হবে, কালো কোলো একটী মেয়ে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াবে, বেশ দেখাবে।" শেষে একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"মা যখন পছন্দ করেছেন, সে মেয়ে কি কখন খারাপ হ'তে পারে বড়দা।"

তবু বড়দা বললেন—"বড় বউ বলছিল—মেয়ে তাদের বেশ পছন্দ হয়েছে ; ভারী লক্ষ্মী—শ্রীযুক্ত মেয়েটী, কিন্তু রংটা একটু ময়লা, তোর পছন্দ হবে কিনা সন্দেহ।"

সমীর হেসেই উত্তর দিলে—"বড় বউদি ত কম নয়। নিজে অত সুন্দরী হ'য়ে কি করে আমার জন্য একটী কালো মেয়ে পছন্দ করে বস্‌লেন। শুধু তাই নয়, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করে, এখন বলছেন কিনা কালো মেয়েটীকে গিয়ে একটু দেখে এসো। সুন্দরী মেয়ে ঠিক করতে কি হয়েছিল ? যাই তএকবার, এ নিয়ে বড় বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে আসি।"

বলে সমীর সত্য সত্যই বড় বউদির ঘরের দিকে চলে গেল।

দাদারা নিজেদের ভেতর বলাবলি করলেন—"নাঃ সমুর আর কোন কালে বুদ্ধি হ'বে না। এখনও সেই ছোটর মতই আছে। নিজের খেয়ালে বাইরে বাইরে থেকেই পড়াশুনা নিয়ে কাটিয়ে দিলে সংসারের ঝঞ্চাট কিছু জানলে না এখনও আজ বাদে কাল বিয়ে করবে তবু যদি কোন জিনিষ সিরিয়াস ভাবে নিতে জানে। ও চিরদিন ছোটই থাক্‌বে।

সমীরের বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই গিয়া অনুকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সমীরের মা দিন দুই গিয়াছিলেন। তিনি এই কালো মেয়েটীর ভিতর এমন কি দেখিলেন তিনিই জানেন কিন্তু মেয়ে দেখিয়া প্রথম দিনেই সেখানে বসিয়া বলিয়া আসিলেন—"এ মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি একে বউ করে নিয়ে যাবই।"

বাড়ী আসিয়া বলেন—"তা হোক শ্যামবর্ণ মেয়ে। কি সুন্দর গোলগাল গড়ন, হাতের আঙ্গুল গুলিই বা কি সুন্দর আর কি মিষ্টি চাউনি। মনটী যেন ধোয়া মোছা। আমার পাঁচটার সংসার, সব বউগুলি এসেছে ভাল, এইবার ছোট-টী ভাল আন্‌তে পারলেই আমার সংসারে আর ঝগড়া বিদ্বেষ ঢুকবেনা। এই রকম মেয়েই আমি চাই। দেখেই ঐ মনে হয় ও মেয়ের আয় পয় আছে। ও মেয়ে আমার ঘরে আন্‌তে পারলে সংসারের লক্ষ্মী শ্রী বাড়বে। রংটা যা মেয়েটীর একটু ময়লা, তা হোক্, আমি ঐ কাল মেয়ের সঙ্গেই সমুর বিয়ে দেব।"

সমীরদের বাড়ীতে তাহার মাতাই সাম্রাজ্ঞী। সর্ব্বদিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। সংসার চালনায় তিনি পাকা গৃহিনী, মমতাময়ী নারী ; আবার তেমনি তাহার দৃপ্ত তেজ। বাড়ীর কাহারও তাহার মত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা বা সাহস নাই, এবং সকলেই জানে মা যা করিবেন তাহা সকলের পক্ষেই শ্রেয় ও শুভ হইবে। কাল মেয়ে বলিয়া দিদি বউদিরা কেহ কেহ একটু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু মা যখন পছন্দ করিয়াছেন তখন সে আপত্তি আর টিকিলনা, মায়ের আদেশ ও ইচ্ছামতই সমীরের সহিত অনুর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। এদিকে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া সমীরের পিতা ভূপেশ বাবু ও সমীরের দাদারা ভাবী কুটুম্বের সরল অমায়িক ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন যে তাহারও তখন মত

শীঘ্র সম্ভব সমীরের বিবাহ ঐ কাল মেয়েটীর সহিতই সম্পন্ন করিয়া কুটুম্বিতাটা পাকা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

সমীর মেয়ে দেখ্‌তে না যাওয়ায় তার বাড়ীর লোকের কিছুমাত্র দুঃখ নেই, কিন্তু বন্ধুর দল এ নিয়ে তাকে উৎপাত সুরু করে দিলে। তারা সমীরকে ধরে বসল—"বিয়ের আগে চল তোকে মেয়ে দেখতেই হবে।"

সমীর উত্তর দেয়—"দেখব সেই ছাঁদনা তলায় শুভ দৃষ্টির শুভসময়।"

বন্ধুরা রেগে বলে—"এই বিংশ শতাব্দীতে তুই একটী আস্ত গাধা।"

সমীর বলে—"তাই আমার মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।"

বন্ধুরা দমিবার পাত্র নয়, বলে—"তিনি যদি কালো মেয়েই পছন্দ করেন, তাই বলে তোরও কি সেই কাল-ই পছন্দ হবে?"

সমীর মৃদু হেসে বলে—"না হবারই বা কারন কি; বাইরের রংটা তার কাল হ'তে পারে, কিন্তু ভিতরের মনটা যে তার আলোয় ভরা থাকবে, সে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নতুবা মা এ মেয়ে পছন্দ করতেন না।"

বন্ধুরা আরো চটে যায়, বলে—"রেখে দে তোর ও সব কবিত্ব, রং যার কালো, থাকবে তার মনভরা আলো, এ সব কথা কানে শুনতেই বেশ কিন্তু কাজে যে কি হবে তাত কিছু জানিস না; শেষে বাইরে ভেতরে দুদিকেই অন্ধকার পেয়ে পস্তাবি, তার চাইতে নিজের চোখে দেখে অন্তত বাইরেটা ত সাদা নিয়ে আয়, তখন ভিতরের অন্ধকার ধরা পড়লেও বাইরের আলোতে ব্যালেন্স ঠিক থাকবে।"

অনিল লক্ষ্ণৌতে পড়ত, বয়সে সে সমীরের চাইতে কিছু বড়, দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু। অনিল নিজে বেশ কালো, কিন্তু কাল মেয়ে সে মোটে পছন্দ করে না, এবং সৌভাগ্যক্রমে যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে মেয়েটীর রং খুবই ফরসা, এবং বন্ধু হিসাবে তার খুব ইচ্ছা সমীরও একটী রং-ফরসা মেয়ে বিয়ে করুক।

অনিল বললে—"দেখ সমীর, ও সব ভনিতা রেখে দিয়ে চল আমরা গিয়ে একদিন মেয়েটাকে দেখে আসি। কাল মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হ'তেই পারে না। তোর সুন্দরের ওপর আকর্ষণ যে কেমন তাত আমি জানি। বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় ক'নের রং কাল দেখে ত আর বিয়ে বন্ধ রাখতে পারবি না, হাজার হোক্ চক্ষু লজ্জা ত আছে। তখন যতই কেন না মনে মনে হা হতোস্মি করিস বিয়ের অবশিষ্ট অধ্যায় ও তোকে নীরবে সমাধা করতেই হ'বে। তার চাইতে সময় থাকতে ক'জন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে মেয়ে দেখে এসে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর, বুঝলি রে গাধা।"

সমীর হেসে উত্তর দিলে—"আমার নিজের তরফ থেকে চক্ষু কর্ণের কোন বিবাদ আরম্ভ হয়েছে বলে ত আমার জানা নেই যে তার মীমাংসার জন্য তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখতে যাব, তবে কেন তোমরা সবাই মিলে কাল রং কাল রং বলে চেঁচাচ্ছিস। আর যদি সে কালই হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?"

অনিল উত্তর দিলে—"ক্ষতি এই, সেই কাল মূর্ত্তিটীকে চিরদিনের জন্য পাশে নিয়ে বেড়াতে তোর আদৌ ভাল লাগবে না, এবং কাল রং দেখে তাকে তুই ভালও বাস্‌তে পারিব না, অতএব কেন একটী মেয়েকে সারা জীবন অসুখী করে রাখবি বল।"

সমীর বললে—"তোর বাগাড়ম্বরটাই যে সব চেয়ে উঁচু পর্দ্দায় উঠছে অনিল। তুই নিজে ও যে কি গভীর কৃষ্ণমূর্ত্তি তাত জানিস, সেই তোকেই যদি তোর অমন কাল রং সত্ত্বেও এত ভালবাস্‌তে পারি,—লক্ষ্ণৌএর এত গুলি বছর তোর সঙ্গে একই ঘরে ঘুমাতে পারি, পাশে নিয়ে বেড়াতে পারি, তবে আর সেই ছোট্ট কাল মেয়েটীকে পাশে রাখতে পারব না, আদর করে কাছে ডেকে ভাল-বাস্‌তে পারব না? সে যে তখন আমার কৃষ্ণমূর্ত্তি বন্ধু অনিলের চাইতেও আপন বিয়ে করা বউ হবে রে?"

অনিল উত্তর দিলে—লোকের গলদ ত হয় সেই বিয়ে করা বউ নিয়ে রে, কাল বন্ধু নিয়ে নয়।"

কৃত্রিম কোপ সহকারে সমীর অনিলের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বললে—লক্ষ্মীছাড়া, মা যাকে পছন্দ করে আনছেন তাকে এমনি করে কাল বলে নিন্দে করতে হয়? তা ছাড়া তোর ও একটীও শ্যালিকা নেই যে সেই সুন্দরী মেয়েটীর লোভে মৈত্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাঢ়ী বারেন্দ্র

বিবাহ অসামাজিক হ'লেও সামাজিক করে তোলবার চেষ্টা করতে পারি। আমি এখন বিয়ে পাগলা বুড়ো, অতএব হাতের কাছে কাল ফরসা যা পাই তাই অম্লান চিত্তে বিয়ে করতে রাজী আছি।"

তার এই মনখোলা অনাবিল হাসিতে বন্ধুরাও যোগ না দিয়ে থাকতে পারলে না।

সব রকম চেষ্টা করেই যখন দেখা গেল, বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে না দেখা বিষয়ে সমীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: তখন বন্ধুরা ভারী নিরাশ্বাস হয়ে পড়ল, এদিকে মেয়ে দেখবার জন্ম তাদের কৌতূহল অদম্য।

একদিন তারা সমীরকে বললে—"তোকে সঙ্গে নিয়ে, ক'নে দেখার সময়, বিয়ের আগেই যে একটু মিষ্টি মুখ করে আস্‌ব, তুই হতভাগা আমাদের সে খাবার পন্থাটা একেবারে বন্ধ করে দিলি। বিয়ের রাত্রের নিমন্ত্রণে সবাই ত খায়, আমরাও বরযাত্র হয়ে গিয়ে খেয়ে আসব, কিন্তু বিয়ের আগে বরের বন্ধু সেজে গিয়ে যে খাওয়া ও আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায় সেইটাই ত আসল মজা; কিন্তু তোর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্ম আমরা সে আনন্দ থেকে এ জন্মের মত বঞ্চিত হলাম। বন্ধুদের প্রতি তোর এত বড় অধর্ম্ম সইলে হয়।"

অনিল বললে—"বন্ধু হয়ে গিয়ে ক'নে দেখা ও মিষ্টি খাওয়াত আর ভাগ্যে হল না, কিন্তু না জানিয়ে বাইরে থেকে মেয়েটীকে দেখতে দোষ কি। তোর ভাবী শ্বশুর-বাড়ীটা কোথায় বল ত সমীর?"

অম্লান বদনে সমীর উত্তর দিলে—"রামবাগান লেনে।"

"নম্বর।"

"জানি না।"

"জানি না বললেই হ'ল? কাল জেনে এসে আমাদের জানিয়ে দিবি, বুঝলি?"

ঘাড় নাড়িয়া সমীর উত্তর দেয় "জানাইবে।" বন্ধুর দল ঘাড় নাড়া দেখিতে চায় না, মুখের জবাব শুনিতে চায়, রেগে জিজ্ঞাসা করে—"কি রে, চুপ করে রইলি যে?"

সমীর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে—"কি বলব?"

বন্ধুর দল বলে "একটা কিছুত বল।"

সমীর বললে—"তা হ'লেই বলতে হয়, দোহাই তোমাদের, নম্বর জেনে নিয়ে রামবাগান লেনের সেই বাড়ীর যাকে তাকে দেখে এসে, এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যার কালরূপ বর্ণনা করে যেন আমার সব রোমান্সটুকু মাটী করে দিও না। আমার প্রিয়ার রূপের প্রথম সমালোচক আমিই হ'ব, তোমরা নয় হে।

বন্ধুর দল —"কেন আমরা সমালোচনা করবো না, যাকে তাকে দেখে এসে। স্বামীর বলে "তোদের যার যা খুসী তাই বলবি। শুনেছি সে বাড়ীতে এখনও গণ্ডাকয় মেয়ে "কুমারীর খাতায়" নাম লেখাবার মত বড় আছে, এবং গণ্ডা পাঁচ সাত নাকি সেখান থেকে নাম কাটিয়ে "বিবাহিতার খাতায়" নাম লিখিয়ে ফেলতে পেরেছেন। যা বলেন, সান্যাল বাড়ী, বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবার। অতএব সেই বৃহৎ পরিবারের কোন এক বুঁচি পেঁচী যেঁদিকে দেখে এসে ভুল করে তারই রূপ বর্ণনায় আমার কর্ণযুগলকে পীড়িতে করে তুল্‌বি, অথচ আসলে যিনি হবেন আমার হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী তিনি দূরেই থাকবেন। তাই মনে হয় এখন রাম বাগান লেনে ঘোরাঘুরি না করে, একবারে বরযাত্র সেজে গিয়ে ক'নে দেখে আসিস্‌, সেইটাই হবে শ্রেয়ঃ।"

বন্ধুরা রাগের মিথ্য অভিনয় করে ঝাঁজ দেখিয়ে বলে যা, যা, বকামী করিস না সমীর, তোর মুখে এত বাজে কথা মোটে মানায় না?"

সমীর—"তথাস্তু?" বলে গম্ভীর হবার ভাব দেখিয়ে চুপ করে যায়।

ক্রমশঃ

জীবোৎপত্তি

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

পৃথিবী যখন সূর্য্য হ'তে আলাদা হ'য়ে প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার মধ্যে কোন জীব ছিলনা, জীব থাকা তখন সম্ভবও ছিল না। সূর্য্যের জলন্ত বাষ্পের মধ্যে কোন জীব আছে, তাকি কখনো কল্পনা করা যায়? সূর্য্য হ'তে জন্মগ্রহণ করার পর পৃথিবী প্রথম সূর্য্যেরই মতো জলন্ত বাষ্পের একটি গোলক ছিল। সেরকম জলন্ত বাষ্পে কোন রকম জীবের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে প্রথম জীবের জন্ম হয়েছিল পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। ঠাণ্ডা হ'য়ে পৃথিবী পরে জীববাসের উপযোগী হয়েছিল। সে অবস্থায় হয় অন্য কোথাও হ'তে পৃথিবীতে জীবের আমদানী হয়েছিল, নয় কোন উপায়ে এই পৃথিবীতেই প্রথম জীবের জন্ম হয়।

এই দু'মতই পণ্ডিত মহলে প্রচলিত আছে। একদল পণ্ডিতের মতে আদি জীবের জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীতেই। এঁদের এই মতকে বলা হয় স্বতঃ জন্মবাদ (sponteneous generation) এঁরা প্রাচীনপন্থী।

আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, জীব থেকেই জীবের জন্ম হয়। কিন্তু উপরোক্ত প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতগণ বল্লেন, জীব হ'তে যেমন জীবের জন্ম হয় তেমনি অজীব প্রাণহীন জড়পদার্থ হ'তেও জীবের জন্ম হ'তে পারে। এক টুকরো মাংস রেখে দিলে তার পর দিন তার উপরে ক্রিমির মতো অসংখ্য পোকা কিলবিল করতে দেখা যায়। এত পোকা কোথা হ'তে এলো। পূর্ব্বে তো মাংসের টুকরোয় এসব পোকা ছিল না। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ বল্লেন, মাংসের ভিতরে আপন হ'তেই এসব পোকার জন্ম হয়েছে। এই হলো স্বতঃ জন্মবাদ। এই পণ্ডিতগণের মনে তখনো বিশ্বাস ছিল যদি কিছু নেকড়ার ফালির মধ্যে খাবার রেখে কিছুদিন ফেলে রাখা যায় তাহলে তার ভিতরে কিছুদিনের মধ্যে আপন হ'তেই ইঁদুরের জন্ম হবে।

তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় হয়নি। সুতরাং জীবাণু জাতীয় জীবের কথা তখন লোকের জানা ছিল না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হবার পর আসলেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তর সাহেব (Louis Pasture)। তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে একটি নূতন রাজ্য আবিষ্কার করলেন। আমাদের চারদিকের হাওয়া পায়ের তলার প্রতি ধূলিকণা যে জীবাণু জাতীয় জীবে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে একথা পূর্ব্বে কারোরই জানা ছিল না। পাস্তর সাহেবই প্রথম জীবাণু জাতীয় জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। জীবাণু জাতীয় জীব এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। পাস্তর সাহেবের অনুবীক্ষণে প্রথম এই জীব ধরা পড়লো।

জীবাণু আবিষ্কার হওয়ায় স্বতঃজন্মবাদের ভিৎ নড়ে উঠলো। পাস্তর সাহেব অনুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে প্রমাণ করলেন, যেখানে অজীব প্রাণহীন বস্তু হ'তে জীবের জন্ম হ'তে দেখা যায় সেখানে জীবাণু জাতীয় জীব পূর্ব্ব হতেই ছিল কিম্বা হাওয়ার ভিতর হ'তে তার মধ্যে জীবাণু জীবের আমদানী হয়েছিল। সেই জীবাণু ছোট বলে আমরা চোখে তাদের দেখতে পাই নে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তাকালে দেখা যায় তার মধ্যে অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে আছে। তারা খায়, পুষ্ট হয় ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। যদি কোন উপায়ে সেই পদার্থকে জীবাণু মুক্ত করা যায় ও তার ভিতরে কোনরূপে হাওয়া প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় তাহলে সে জিনিস সহজে পচবেও না, তার ভিতরে কোন রকম কীট পোকার জন্মও হবে না। জ্যাম, জেলি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য এই ভাবেই বোতলে বা টিনের কৌটায় বহুদিন পর্য্যন্ত রাখা হয়। জীবাণু জাতীয় জীব আবিষ্কারের পর পাস্তর সাবেবের নানা পরীক্ষায় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের স্বতঃজন্মবাদ আর টিকতে পারলো না।

তারপর এলেন আর একদল পণ্ডিত। তাঁরা বল্লেন

পৃথিবীর আদি জীব পৃথিবীতে প্রথম জন্ম গ্রহণ করেনি। তারা এসেছে অন্য গ্রহ বা লোকান্তর হ'তে। এ দলের বড় পাণ্ডা ছিলেন বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোলট্‌জ আর ছিলেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্‌; দুজনেই মহাপণ্ডিত। কাজেই তাদের কথা একেবারে উড়িয়ে দেও চলে না।

আমাদের পৃথিবীর উপর কখনো কখনো উল্কাপাৎ হয়। সেই উল্কাদলের অধিকাংশই পড়তে পড়তেই আকাশেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দুএকটি আমাদের পৃথিবীর উপরও এসে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার এরিজোনা প্রদেশে এ রকম বড় বড় উল্কাপিণ্ডের পতনের চিহ্ন অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সে সব জায়গা তাদের পতনে খাদের মাতো গর্ত্ত হ'য়ে গেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় এই রকমের একটি উল্কাপিণ্ডের পতন হয়েছিল। তাতে যে ঝড় উঠেছিল তাতে তার চার ধারে ৮।১০ ক্রোশ পরিমিত জায়গার অরণ্যের গাছ সব ভূমিসাৎ হ'য়ে গিয়েছিল। ছোট ছোট কয়েকটি উল্কা পিণ্ড কলকাতার মিউজিয়াম ঘরে গেলেও দেখা যায়।

এই সব উল্কাপিণ্ড খুব সম্ভবতঃ অন্য কোন গ্রহের চূর্ণ বিচুর্ণ টুকরো, মহাশূন্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলবার সময় কোন এক অতীত যুগে হয়তো দুটি গ্রহেতে ঠোকাঠুকি হয়েছিল। তারি পরিণাম হয়তো এই উল্কাপিণ্ডের দল। লর্ড কেলভিন্‌ প্রভৃতি কয়েক জন বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস সে রকম কোন গ্রহাংশের টুকরোই পৃথিবীতে আদি জীবকে প্রথম বহন করে এনেছে। সে রকম আদি জীবাণু সম্ভবতঃ ছিল কোন জাতীয় জীবাণু।

এই মতকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ আমরা জানি কোন কোন শ্রেণীর জীবাণু জাতীয় জীবের শক্তি অতি অদ্ভুত। তারা দীর্ঘ কাল অনাহারে ও নানা প্রতিকুল অবস্থার ভিতরে টিকে থাকতে পারে; অতি শুষ্ক আবহাওয়া ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও তাদের মারতে পারে না। সুতরাং গ্রহান্তর হ'তে জীবের আমদানী একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নাও হতে পারে।

ধ'রে নেওয়া গেল, অন্য গ্রহ হ'তেই পৃথিবীতে প্রথম জীবের আমদানী হয়েছিল। কিন্তু তাতে কি জীবোৎপত্তির মূল সমস্যার কিছু সমাধান হলো? পৃথিবীতে না-হয় জীব আস্‌লো অন্যগ্রহ হ'তে কিন্তু সেই গ্রহে জীবোৎপত্তি কী ক'রে হলো? গ্রহান্তর হতে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হয়েছে এই কল্পনা দ্বারা জীবোৎপত্তির রহস্যকে এক গ্রহ হ'তে অন্যগ্রহে ঠেলে দেওয়া হলো মাত্র। কিন্তু তাতে জীবোৎপত্তির সমস্যার কিছুই সমাধান হলো না।

অন্য একটি মত অতি আধুনিক। এই মতকে ক্রমবিকাশবাদ বলা হয়, এই মতের দ্বারাও অপ্রাণ জড় পদার্থ হ'তে জৈব পদার্থ ও জীবের জন্ম অনুমান করা হয়েছে। এও এক রকমের স্বতঃ জন্মবাদ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের জন্মবাদ হতে এর প্রভেদ অনেক। এই মতে জীবের হঠাৎ জন্ম হয়নি, বহু যুগ ধরে একটু একটু করে অ-প্রাণ জড় পদার্থ হতে জীব ক্রমবিকাশ লাভ করেছে।

অতি আদিতে একমাত্র ছিন্ন জড়কণা। বৈজ্ঞানিকগণ তার নাম দিয়েছেন পরমাণু। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই পরমাণুকণা ধূলিজালের ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। কালে কালে যুগে যুগে মহাকর্ষণের প্রভাবে সেই ধূলিজাল ক্রমশঃ সংহত সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে জন্ম দিল গ্রহ নক্ষত্রের, আমাদের পৃথিবীর। সেই জড়কণারই বিচিত্র লীলা জল স্থল আকাশের বিচিত্ররূপ। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, জগৎ সৃষ্টির আদি উপাদান জড়কণা যেমন ক্রমশ সংহত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম দিয়েছে তেমনি সেই জড়কনাই অতীত যুগের কোন এক বিশেষ সময়ে বিশেষ এক রাসায়নিক মিশ্রণে দানা বেঁধে প্রথম জন্ম দিয়েছিল জৈব পদার্থের। জড় পদার্থ দু শ্রেণীতে বিভক্ত Organic ও অজৈব (inorganic)। মাটি, পাথর, মাটির ভিতরে নানাজাতীয় নুন ও ধাতু অজৈব পদার্থ। জীব দেহে যে পদার্থ আছে তা জৈব পদার্থ নামে পরিচিত; জীবদেহের জৈবপদার্থ জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান জড় পদার্থেরই বিশেষ রূপান্তর। চিনি, নীল, সুরাসার জাতীয় কয়েকটি জৈব পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণ তাদের কারখানায়ও তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু জীবদেহের সব জৈব

পদার্থ তৈরী কররার শক্তি মানুষ এখনো লাভ করতে পারেনি।

যে দেহ-কোষ (Cell) দিয়ে জীবদেহ তৈরী তার মধ্যে আছে প্রাণপিণ্ড বা প্রটোপ্লেজম (Protoplasm) নামক মশলা। এ দেখতে অনেকটা জেলির মতো থলথলে। এর মধ্যে আছে দেহপুষ্টির সকল রকমের উপাদান। দেহপুষ্টির জন্য এর মধ্যে আছে প্রোটিড্ বা মাংসজাতীয় পদার্থ, শ্বেতসার বা ভাতের মাড় জাতীয় পদার্থ, আর আছে চর্ব্বি বা তেল জাতীয় পদার্থ। এগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি পদার্থ যা দিয়ে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন হয়। এ সবেরই মধ্যে আছে বিশ্বের মূল উপাদানের কয়েক জাতীয় জড়কণা রূপান্তরিত হয়ে। কিন্তু এই রূপান্তর ঘটেছে একটি বিশেষ নিয়মে। মাটি পাথর যেভাবে তৈরী হয়েছে জীবদেহের দেহকোষ সেভাবে তৈরী হয়নি। দেহ কোষের প্রাণপিণ্ড পদার্থ খুব সম্ভবতঃ তৈরী হয়েছিল অতি আদিম যুগের পৃথিবীর জলবায়ুর বিশেষ এক অবস্থায় জড়কণার বিশেষ এক রাসায়নিক মিশ্রণে। সেকাল সে যুগ অতীত হয়ে গেছে। স্থতরাং যে যুগের আবহাওয়া প্রকৃতি আর জানবার উপায় নেই। স্থতরাং সে যুগের জড়কণার সে বিশেষ রাসায়নিক মিশ্রণের প্রকৃতি আমাদের নিকট আজ অজ্ঞাত।

যা হ'ক জীব স্থষ্টির পূর্ব্বে প্রথম তৈরী হয়েছিল জীবদেহের প্রধান মশলা প্রাণপিণ্ড পদার্থ। খুব সম্ভবতঃ সে মশলা প্রথম তৈরী হয়েছিল সমুদ্রের জলে। জল রাসায়ণিক মিশ্রণ ঘটায় সহজে। সমুদ্রের জল তখন খুব সম্ভবতঃ ছিল উত্তপ্ত, আবহাওয়ায় ছিল বিদ্যুৎ শক্তির প্রচণ্ড প্রবাহ। এই সব বিভিন্ন শক্তির যোগাযোগে খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের জলে জড়কণার বিশেষ একটি রাসায়ণিক মিশ্রণ ঘটবার স্থযোগ ঘটেছিল। তারি ফলে পরমাণু কণা অনুতে, অনুকণা জড়দানায় (crystal) জড়দানা জৈবদানায়, জৈবদানা প্রাণপিণ্ড পদার্থে পরিণত হয়েছে। এই প্রাণপিণ্ড পদার্থই সবশেষে দেহ-কোষে (Cell) পরিণত হ'য়ে প্রাণবান হ'য়ে উঠেছিল। অতি আদি জীব এইরূপ একটি প্রাণবান কোষেই তৈরী। এমিবা এক কোষ জীব; সমুদ্রের কোন কোন জাতীয় শেওলা এক কোষ উদ্ভিদ।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আষাঢ় দিনের শেষে

শ্রীঅরুণ বসু

আষাঢ় দিনের শেষে—
নামহীন কোন এক তটিনীর পরে,
মুছে গেল দিগন্তের রক্ত রেখা খানি,
ধরা বুঝি ইসারায় ডাকিল আঁধারে;
নেমে এল চুপে চুপে তাই সন্ধ্যারাণী।

ওপারে খেয়ার ঘাটে—
ভরাপালে ত্বরা-গতি এল দাঁড় বেয়ে
বোঝাই নায়ের সারি; দূর গ্রাম হ'তে
পরদেশে চলিয়াছে এক শ্যামা মেয়ে।
কাঁদে মেয়ে; কাঁদে নদী ছল ছল স্রোতে।

কূলে একা বসে আছি—
অন্ধকার দীর্ঘশাখা ঘন বটচ্ছায়—
নিস্তব্ধতা বিস্তারিল কি যে মায়া ঘোর—
কে যেন করিল বন্দী মোরে এ সন্ধ্যায়
অলক্ষিতে কণ্ঠে মোর বাঁধি বাহু ডোর।

মাতৃত্বে শিশুমঙ্গল বিজ্ঞান ও জাতীয়তা সংগঠনে তৎপ্রয়োগ

ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, অর্ সি, ও,, জি (লণ্ডন)

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

কর্ম্ম করিবার জন্যই দেহধারণ। বিনা শক্তিপ্রয়োগে কর্ম্ম সম্পাদন হয় না। অতএব শরীর যাহাতে কর্ম্মক্ষম থাকে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। শরীর সবল না থাকিলে কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সাধন হয় না।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

জননীর স্বাস্থ্যহানির কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জননীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হয় না। জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই পুড়িবে, ইহার অন্যথা কখনও হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনই জননীদের স্বাস্থ্য হানির প্রধান কারণ। জননী-জীবনে অর্থাৎ ঋতু কালীন' গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে আঁতুড়ে যে সকল নিয়ম পালন একান্ত প্রয়োজন তাহা যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায়, এদেশে কত শত জননী অকালে কালকবলে পতিত হ'ন এবং কত লক্ষ লক্ষ জননী যে জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করেন— তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মূল কারণ—প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন।

প্রকৃতির শাসন বড়ই কঠোর শাসন। তাঁর আইন অমান্য করিলে কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ দণ্ডের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই।

"এই ভয়ঙ্করী দেবীর নাই রে করুণা
কাঁদিলে খালাস দিবে না দিবে না।"

Ignorance of Law is no excuse.

এই আলোচনায় অগ্রসর হইবার প্রারম্ভে আমার নিবেদন—

১। দেশকল্যাণকর যে মহা বৃক্ষের বীজ আজ আরো পিত হইতেছে, সমাগত সকলের চরণে আমার সানুনয় প্রার্থনা—আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় অভিসিঞ্চিত হইয়া এই বীজ অদূর ভবিষ্যতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া সু-ফল প্রসব করুক। অভিশপ্ত ভারতের কলঙ্ককালিমা অচীরে বিদূরিত হোক!

২। এই মহান্ যজ্ঞে ব্রতী হইবেন—জনসাধারণ, দেশের কর্ম্মিবৃন্দ, পাবলিক প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্ত্রীরোগীচিকিৎসকগণ। দেশশাসনতন্ত্র যাঁহাদের হস্তে নিহিত তাঁহাদের সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন।

চিকিৎক সম্প্রদায় বর্ত্তমানে দেশের, বিশেষতঃ জননীগণের যে সেবা করিতেছেন, তাহা সেবার একপাদ মাত্র। ইহার ত্রিপাদ এখনও অবজ্ঞাত—অর্থাৎ সাধন হইতে বাকি আছে। একটু খুলিয়া বলি—এ দেশের চিকিৎসকগণ বর্ত্তমানে মাত্র রোগ আরোগ্যের বিষয়েই চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে দেশের ও দশের যতটুকু উপকার সাধিত হইতেছে, তাহার তিনগুণ উপকার সাধিত করা যায় যদি, রোগ যাহাতে না জন্মাইতে পারে সেই ব্যবস্থায় সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়. স্ত্রীরোগচিকিৎসার দৃষ্টান্তরূপে জানাইতেছি যে, জরায়ুর 'ক্যান্সার' নামক যে দুরারোগ্য ব্যাধির আজ এত প্রাদুর্ভাব, ইহার কবল হইতে অতি সহজেই পরিত্রান পাওয়া যায়, যদি জননীগণের জানা থাকে, এই ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষন কি, এবং এই পূর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হইবামাত্র চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আজকাল যক্ষ্মা রোগের এত যে বাড়াবাড়ি তাহা নিরোধ করা যায়, যদি জনসাধারণের জানা থাকে যে কি উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগ জন্মিতে না পায়।

জ্ঞানের অভাবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। জনসাধারণের মধ্যে এই জ্ঞানের বিস্তার একান্ত

প্রয়োজন হইয়াছে এবং এই বিস্তার কার্য্যে পাবলিক প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ দেশের যত উপকার করিতে পারেন তত আর কেহই পারেনা।

৩। দেশের নেতৃবৃন্দ, জন সাধারণ, কর্ম্মিবৃন্দ, চিকিৎসক সম্প্রদায় ও গভর্ণমেণ্ট—সকলের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা—আসুন আমরা সকলে সমবেত হইয়া এই মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই।

পরিশেষে বঙ্গের 'ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ' লেঃ-কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি, আই, এম' এস মহোদয়ের নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ যে তিনি এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম্মসঙ্ঘ হইতে প্রতিনিধি লইয়া সত্বর একটী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনকরতঃ দেশকল্যাণকর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতাস্বরূপ এই মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন।

আমার ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা সম্ভব সে বিষয়ে আমি ত্রুটি করিব না।

এক্ষণে আমরা অদ্যকার আলোচনায় অগ্রসর হইব।

আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে' গর্ভধারণ ও ও সন্তানপ্রসব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়—পরন্তু ইহা সুস্থ দেহের স্বাভাবিক ঘটনা। It is not a disease—not a Pathological Process but a pure and simple Physiological Phenomenon.

অধুনা প্রসবকর্ম্ম নানা কারণে অস্বাভাবিকতায় পরিণত হইতেছে। তন্মধ্যে জননীগণের স্বাস্থ্যবিষয়ক অজ্ঞতা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম পালনে তাঁহাদের অগ্রাহ্যতা ও নিয়ম লঙ্ঘনই প্রধান বলিয়া মনে হয়। নারীজীবনে কোন সময়ে কি কি নিয়ম পালন করা উচিৎ, সুযোগ হইলে ভবিষতে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। সময় সংক্ষেপ বশতঃ অদ্য মাত্র "ঋতুকালীন নিয়মপালন" বলিয়াই নিরস্ত হইব।

ঋতুকালীন নিয়ম পালন

ঋতুকালীন নিয়ম পালন—সন্তান পালনের যোগ্যক্ষেত্র রচনা করা মাত্র।

১। কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ করিবে না।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শারীরিক ব্যায়াম সকল শিক্ষালয়েই আজকাল অভ্যাস করান হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, ঋতুকালীন ছাত্রীগণকে ব্যায়াম করাইলে তাহাদের জরায়ুসংক্রান্ত রোগ জন্মাইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

২। ঋতুকালীন তলপেটে কদাচ ঠাণ্ডা লাগাইবে না।

৩। স্থানান্তর গমন করিবে না।

ঋতু অবস্থায়ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ী নিমন্ত্রনে যাওয়া, সিনেমা বায়োস্কোপ যাওয়া, আজকাল সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা জননীগণ জানেন না।

৪। রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত "ঋতুস্নান" করিবে না।

আজকাল অধিকাংশ মেয়েরাই উপরিউক্ত নিয়মগুলি পালন করেন না। ইহার ফলে—ঘরে ঘরে স্ত্রীরোগের প্রাদুর্ভাব। আমাদের আধুনিক আচারব্যবহার জননীগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের ও আয়ুক্ষয়ের জন্য কতদূর যে দায়ী তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

(১৬)

আয়ুর্ব্বেদে উল্লেখ আছে—

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ॥
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ।
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্॥
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণং॥
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।',

অর্থাৎ—

"রজস্বলা স্ত্রী রজঃ নিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে; পতিকে দর্শনও করিবে না, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে; অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন স্নান, দিবানিদ্রা, হাস্য, বহু ভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ

শব্দ শ্রবণ, ভূমি খনন ও প্রবল বাত সেবন—এইগুলি বর্জ্জন করিবে।„

এই অমোঘ ঋষি বাক্য অমান্য করিলে সঙ্গেসঙ্গেই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক্ বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়—ইহা স্থির নিশ্চয়।

ঋতুকালীন নিয়মগুলি সম্যক পালিত হইলে তবে spermএ chromosom অর্থাৎ বর্ণতত্ত্বরূপে সেই বীজের পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত জাতি আয়ু চরিত্র ভোগশক্তি নিহিত থাকে, যে পরম তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুগঠিত—সেই বর্ণ প্রকারের প্রকৃষ্ট সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে এবং বংশগত ক্রমধারা আত্মার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

(১৭)

Chromosom সম্বন্ধে এখানে দু'একটী কথা বলা দরকার। sperm (শুক্রকণা) ovum (মাতৃশক্তি) এই দুইএর যে অংশ 'বর্ণ' গ্রহণ করে অর্থাৎ staining দ্বারা রঞ্জিত হয় তাহার নাম chromosom sperm. (পিতৃবীজ) এবং ovum (মাতৃশক্তি) একত্র মিলিত হইয়া সন্তানের অঙ্কুর সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে chromosomএ কতকগুতি পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনের পর এই দুইটি মিলিত হইয়া সন্তানের অঙ্কুরসৃষ্টি হয়। chromosom এ জাতকের পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত জাতি আয়ু চরিত্র ও ভোগশক্তি নিহিত থাকে। সহস্রার (cerebrum) হইতে পিতৃলোক বা সংস্কার গ্রন্থি (cerebellum) ভেদ করিয়া মেরুদণ্ড অবলম্বনে 'অর্'-সকল (awra) কোন্ বিজ্ঞানবলে অণ্ডে প্রবেশ করিয়া জাতকের বর্ণ জাতি ইত্যাদি নির্ণীত করে, তাহা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশের মনীষিরা আজ পর্য্যন্ত সন্ধান পান নাই। যাহারা এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করেন তাঁহার জানেন না—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে কি নিগূঢ় বিজ্ঞান নিহিত আছে।

খাদ্যাখাদ্য বিচার

অবান্তর হইলেও এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কথাটী এই—খাদ্যাখাদ্য বিচার। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেরই ধারণা যে খাদ্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার নাই, অর্থাৎ যাহা রুচি তাহাই খাইতে পারা যায়। খাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। জীবনধারণের জন্যেই খাদ্যের প্রয়োজন—লালসা নিবারণের জন্য নয়। Live to eat নীতি সমীচীন নয়—Eat to live নীতিই সমীচীন অর্থাৎ খাবার জন্য বেঁচে থাকা নয়—বেঁচে থাকার জন্যই খাওয়া। উপনিষদে যে সকল অকাট্য বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—"তেজোময়ী বাক্ আপোময়োহি প্রাণঃ অন্নময়ংহি ইদং মনঃ"—অর্থাৎ তেজ হইতে বাক্, জল হইতে প্রাণ এবং অন্ন হইতে মনের উৎপত্তি। এই তেজ, জল ও অন্ন প্রত্যেকটী ত্রিধা বিভক্ত হয়। এখানে কেবল অন্নের কথাই উল্লেখ করিব। অন্ন ভুক্ত অর্থাৎ গ্রসিত হইলে ইহার স্থূলতম অংশ মলরূপে নির্গত হইয়া যায়; ইহার মধ্যমাংশ মাংসে পরিণত হয়,—এবং ইহার সূক্ষ্মতম অংশ হইতে মনের সৃষ্টি হয়—

"অন্নমশিতম্ ত্রেধাবিধীয়তে
তস্য যো স্থবিষ্ঠোধাতুস্তৎ
পুরীষং ভবতি, যো মধ্যম
স্তন্মাংসং যোহনিষ্ঠস্তন্মনঃ।"

—ছান্দোগ্য ৬অঃ ৫খণ্ড।

আমি

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

১

অনন্ত মোর জীবন, আত্মা
অবিনশ্বর যে,
আমার মতন এত সুখী হায়
এত সুখী আর কে ?
এতই প্রবল, এত দুর্ব্বল,
এমন সফল, এত নিস্ফল।
এত আসক্তি এত বীতরাগ
নিতি ঐশ্বর্য্যে।

২

সুদূর জনমে হয়ত ছিলাম
আমিই জগৎ শেঠ।
ধরণী তাহার মণি মাণিক্যে
সাজায়ে আনিত ভেট।
কিম্বা ছিলাম নিঃস্ব ভিখারী,
মিটিতনা ক্ষুধা ফিরি বাড়ী বাড়ী
হয়ত এ শির উন্নত ছিল
নতুবা আছিল হেঁট।

৩

কুরুক্ষেত্রে হয়ত যুঝেছি
আমি ভীষ্মের সাথ।
হয়ত আবার দুর্ব্বল হিয়া,
অরাতি সৈন্য গিয়াছে দলিয়া,
হয়ত একাকী শত শত্রুর
জীবন করেছি পাত।

৪

নলরাজ সনে বনেতে ফিরেছি
কেঁদেছি বারম্বার।
ধ্রুবের সঙ্গে হরিরে ডেকেছি
এ মোর অহঙ্কার।
ভক্তের রজ মেখেছি অঙ্গে
হয়ত ফিরেছি ভরত সঙ্গে!
যুগ যুগ ধরে লভিয়া এসেছি
আমি সেবা-অধিকার।

৫

সপ্ত সাগর গড়িয়া দিয়াছে
আমার চোখের জল,
আমারি হর্ষ-বিষাদে গঠিত
বৃহৎ ভূমণ্ডল।
শ্যামল ধরণী আমি ভালবাসি
দেখিতে কেমন ঘুরে ফিরে আসি,
আমারি আলোকে আলোকিত হয়
গগন-জল-স্থল

৬

বিধির সখের দোলক দুলছি
হাসি অন্তর মাঝ
যা কিছু করায় তাই করি আমি
নাই যেরে কোন কাজ।
আমিই নৃপতি আমিই বিশ্ব
আমিই ভিখারী আমিই নিঃস্ব
নিম্ন নিম্ন সাগরের তল
উচ্চ নগাধিরাজ।

একটী বটগাছের আত্মকথা

শ্রীবাসন্তী বক্সী

ছেলে বেলাকার কথা আমার ভাল মনে পড়ে না। শৈশব কেটে গেছে আমার অনেক দিন হ'ল। এই সুদীর্ঘ বছরের ব্যবধানে তার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। তবু সেই লুপ্তপ্রায় স্মৃতির মাঝে ছোট বেলাকার একটা একটা টুক্‌রো ঘটনা মনে পড়ে' মনটাকে টেনে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতের পানে। মনে পড়ে, শরতের আলো-ঝলমলকরা প্রভাতে আমারই প্রতিবেশী এক শিউলি গাছের নীচে শিউলি ফুল বিছানো থাক্‌তো। শিশির সিক্ত শিউলিগুলি, আমার মনে হতো ছুটে যাই তাদের কাছে, যেয়ে' তাদের কুড়িয়ে নিয়ে একটু আদর করি,কিন্তু যেতে আর পারতুম না। কি করে যাবো? আমি যে স্থবির, আমি একটা ছোট বট গাছ। অক্ষম হ'য়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে' থাকতুম তাদের দিকে। নবোদিত সূর্য্য তার আলোর ডালি নিয়ে দাঁড়াতো পূবদিকে। সেখান থেকে সোনালী আলো এসে পড়্‌তো আমার কচি কচি পাতার ওপর। চিকমিকিয়ে উঠতো আমার সারা দেহ। একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে; তখন আমি বোধ হয় দু হাত কি তিন হাত উঁচু হয়েছি, একটা ছোট ছাগল ছানা তার সামনের দুটো পা আমার গায়ের অনেকটা ওপরে তুলে দিয়ে দাঁড়ালো। আমি ভাবলাম, ছাগলটা বুঝি আদর কোরে আমায় জড়িয়ে ধরেছে তাই আমি মৃদু বাতাসের সাহায্যে আমার ছোট্ট দুটী শাখা দিয়ে ছাগলছানাটীকে সাদরে আলিঙ্গন করতে গেলাম—ও মা, সে তক্ষুণি মহানন্দে আমার শাখা থেকে আমার কত আদরের ছোট ছোট পাতাগুলি খেতে সুরু কোরে দিলে। আমি শাখা ছাড়িয়ে নিতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। সে তখন তার ছোট ছোট পা দিয়ে আমায় চেপে ধরেছিল। আমি একান্ত অসহায় ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে আমার দুটী ডালের সব পাতাগুলি খেয়ে পরম তৃপ্তি ভরে চলে গেল সেখান থেকে।

এমনি আরও কয়েকটি টুকরো ঘটনা বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করে আজও জেগে ওঠে মনে। আজ আমি প্রাচীন বটগাছ চারিদিকে আমার ডালপালা ছড়িয়ে আছে। অজস্র ঝুরি ঝুলে রয়েছে সন্ন্যাসীর জটার মত। শুনতে পাই এ অঞ্চলে আমায় সবাই বলে "বুড়ো বটগাছ" সত্যিই তাই। আমার শৈশব ও যৌবন কেটে গেছে কবে কোন কালে কেবল এই বার্দ্ধক্য কালে আমার জীবনের সবটুকু বুড়ো। অনেক দিন ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে এমনি স্থবির হয়ে। এই অঞ্চলের অনেক দিনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার সঙ্গে। আমার জীবনে প্রত্যহ ভোরে উষারাণী যখন সূর্য্যকিরণের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ান পৃথিবীর কোলে, তখন অজস্র পাখী জেগে উঠে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, কিচিমিচি কোরে ডাক্‌তে সুরু করে। তাদের সেই কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে সে জায়গা। কত রকমের পাখী তাদের কত রকমের ডাক! আমি ছাই অত চিনিও না। একটু ফরসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার পাতায় ঢাকা তাদের বাসা ছেড়ে উড়ে চলে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে। তারপর সারাদিন তারা আর বড় একটা আসে না আমার কাছে। আবার দিনের শেষে যখন ক্লান্ত সূর্য্যদেব নৈশ-বিরামের আশায় ঢলে পড়েন আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে, সন্ধ্যারাণী মন্থর গতিতে তাঁর কালো ওড়না টেনে দিতে থাকেন ধরার বুকে তখন পাখীর দল ভয় পেয়ে' যায়। চিকমিক করতে করতে আবার ফিরে আসে তাদের বাসায়, আমার বুকে। আমার মাঝ ডালটার কাছে একটা বাসা আছে। সেখানে থাকে একজোড়া শালিক। তারা অনেক দিন ধরে বাস করছে, তাই তাদের সঙ্গে পরিচয়টা আমার একটু বেশী। এ অঞ্চলের সবই আমার খুব পরিচিত। এখানকার ছেলে মেয়েরা তাদের মা বাপ এবং তাদের ঠাকুর্দ্দারা যে খবর জানে না সে সব খবরও আমার কাছে

জানা। ঐ যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী রয়েছে আমার কাছে ওটাকে সবাই বলে ভূতের বাড়ী। ও বাড়ীর সম্বন্ধে ছেলে মেয়েরা অনেক কথা শোনে। তারা ভয় পায় বাড়ীটার দিকে তাকালে। আমি কিন্তু ভেবে পাই না ওটা ভূতের বাড়ী আখ্যা পেল কেন? আমার বেশ মনে পড়ে যখন আমার পূর্ণ যৌবন তখন ঐ বাড়ীটা ছিল নতুন ঝরঝরে একটা সুন্দর বাড়ী, বাড়ীটা ভর্ত্তি ছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আর তাদের মা বাবা। এখনও বেশ মনে পড়ে, তাদের একটী ছোট্ট মেয়ে ছিল, সে তার কোঁকড়া চুলগুলি দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটতো কাছের ঐ মাঠের দিকে। এক এক সময় দেখতাম, ঐযে জানলাটার পাশ দিয়ে এখন একটা অশথ গাছ উঠেছে, সেই জানলাটার গরাদ ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকতো তার ছোট্ট বুড়ো আঙুলটী মুখে পুরে তন্ময় হয়ে সে দেখতো আকাশের পানে, কখনও সে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমারই নীচে সে রোজ রোজ খেলা করতো। এখন সেই বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা জীর্ণ কঙ্কাল। প্রকৃতির অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে যুঝতে যুঝতে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। এই বাড়ীটার মত এ অঞ্চলের সব জিনিষ আমার একান্ত পরিচিত, সবাই যেন আপনার লোক। আমার পরিচিত বাড়ীগুলিতে কতলোক এল কত লোক গেল, তাদের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ সব জমা হয়ে আছে স্তরে স্তরে আমার মাঝে। আমার ডানদিকে একটু তফাতে রাস্তার উপর ঐ যে বড় বাড়ী, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের ভাব আছে। ওটা একজন জমিদার বাবুর বাড়ী। অনেক লোকজন দাসী চাকর থাকে বাড়ীটায়। আমি দাঁড়িয়ে দেখি ওদের বাড়ীর কর্ম্মপ্রবাহ। সকাল থেকে রাত অবধি অবিরাম গতিতে বাড়ীর কর্ম্ম-কোলাহল চলতে থাকে। তাদের বাড়ীর ঝিএরা প্রায়ই ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে বসে থাকে আমার ডালপালার ছায়ায়···আমার গুড়ির কাছে।

শুধু তারা কেন, অনেক পথিকই আসে আমার কাছে। গ্রীষ্মের দারুণ তাপে চারিদিক যখন জ্বলে যাওয়ার মত হয়, অনেক দূর থেকে আসা পথিকের দল, মুটের দল আকুল দৃষ্টি মেলে তাকায় চারিদিকে, যদি একটু ছায়া দেখতে পায় বসে সেখানে খানিক বাঁচবে হাঁফ ছেড়ে। মাঠ পার হয়ে এখানে এসে আমায় দেখতে পায়, দেখতে পায় আমার বিশাল জটাজুটের মাঝে বিস্তীর্ণ ছায়া, মনটা তাদের খুশি হয়ে ওঠে, ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় তারা তাড়াতাড়ি এসে বসে আমার ছায়ায়। একটা শান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে আমার মনটা তখন ভরে ওঠে তৃপ্তিতে আনন্দে। মনে হয়, ধন্য আমার জীবন, ধন্য আমার এই স্থবির অবস্থা আর এক সময় আমার এমনি তৃপ্তি বোধ হয় যখন বৃষ্টি এসে লোকদের ভিজিয়ে দেয়। বৃষ্টির জলের আঘাতে আহত লোকেরা ব্যাকুল ভাবে ছুটতে ছুটতে আমার নীচে এসে আশ্রয় নেয়; এমনি করে কত গ্রীষ্ম বর্ষা কেটে যাচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমারই সামনে দুনিয়ার কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল কিন্তু আমি অপরিবর্ত্তনীয় অবিচল ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। গ্রীষ্ম এসে তার জ্বালাময়ী তাপে আমায় জ্বলিয়ে দেয়, আবার বর্ষা এসে দেয় শীতল স্নিগ্ধ করে; বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা আমায় ভিজিয়ে স্যাঁত স্যাঁতে করে দেয়—চারিদিকে গড়ে ওঠে একটা বিমর্ষ ভাব; আবার শরত আসে তা'র চকচকে রোদ নিয়ে আমার সে ভাবকে কেটে দিতে। হেমন্ত, শীত ও পর পর এসে তাদের ভালমন্দ সব অবস্থা দিয়েই আমায় আলিঙ্গন করে। সবার শেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। ধরার বুকে তখন এক নব জাগরণের সাড়া পেয়ে যায়, সব কিছুই হয়ে ওঠে নতুন, সুন্দর, আনন্দময়। প্রকৃতির সেই সুন্দরের মেলায় এসে আমারও পুরাণ পাতা ঝরে গিয়ে নতুন কচি পাতা গজায়। আমায় দেখতে তখন হয় সুন্দর। বসন্তের মৃদুল মলয় পরশে আমার শাখায় শাখায় মৃদু কাঁপন জাগে। অজস্র কোকিল আমার ডালে বসে তাদের কুহুকুহু রবে সারা জায়গাটা মাতিয়ে তোলে। এমনি করে একটা বছর কেটে যায় আবার একটা আসে; কত বছরই কেটে গেল আমার সামনে আরও কত কাটবে তা জানি না। অতীতের পানে তাকালে চমকে উঠি—কত কত বছর কেটে গেছে আমার জীবনে, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কিছু থৈ পাই না। এখনও কত বছর থাকতে হবে এমনি ভাবে। তাই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

"গীত-শ্রী"—

সঙ্গীত সম্মিলনী মহিলাদের জন্য উচ্চাঙ্গের গানের ব্যবহারিক স্বরবোধ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া গীতশ্রী পদবী প্রদান করেন। সম্প্রতি এই পরীক্ষায় ডাঃ অমিয়নাথ স্যান্যাল, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আদি প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীমতী নন্দরাণী মৈত্র, (মিসেস বি, কে, মৈত্র) সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী বেলা চৌধুরাণী ও নীহারিকা দেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিন জনেই গীতশ্রী উপাধি পাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রী এবং অপর একজন বাহিরের। যাঁহারা গীতশ্রী উপাধি পাইবেন, তাঁহারা যাহাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা দিবার উপযোগী হন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মে বাঙালী মহিলা উকিল—

শ্রীমতী সুরভি সিংহ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৯৩২) রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পাশ করিয়াছিলেন। তিনি রেঙ্গুন কলেজ হইতে ১৯৩০ সালে বি-এ, পাশ করেন। ইনি বার্ম্মার বেশিন সহরের ডাক্তার রঘুনাথ সিংহের কন্যা। তিনি এখন উক্ত নগরে ওকালতী করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন।

উইমেন্স কলেজ

এই কলেজ সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের সহিত শুশ্রূষা কার্য্য, গার্হস্থ্য কার্য্য, পুষ্টিকর খাদ্যজ্ঞান, সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্য এবং চিত্র বিদ্যার ব্যবসায়িক মূল্য প্রভৃতি বিষয়গুলি কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অভিনব প্রথায় উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন লেডী মেরী হার্বার্ট করিবার সময় বলিয়াছেন যে এই কলেজ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগ সৃষ্টি করিবে। এই কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মহিলাগণ সুগৃহিণী ও সমাজের সেবিকা হইলে দেশের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে।

কেন্দ্র সমিতির কথা

মহিলা সমিতি পরিদর্শন

গত ২৬শে জুন মিসেস সুবোধবালা ঘোষ ও প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি সুন্দররূপেই আগ্রসর হইতেছে।

গত ১৪ই জুলাই প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী ও মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ যশোহর জেলায় কালিয়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। এই উপলক্ষে সম্পাদিকা একটী মহিলা সভার আয়োজন করেন; মিসেস ঘোষ বক্তৃতা করেন এবং পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ণ সহযোগে বক্তৃতা করেন।

বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রচার কার্য্য :—

গত ১৭ই জুলাই বেলতলা (ভবানীপুর, কলিকাতা)

বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে বেলা ৩টার সময় স্কুল-ভবনে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের এক সভা হয়, প্রথমে মিসেস ঘোষ বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার দিনে নারী জাতির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর প্রচারক সুধীরবাবু ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা বিভিন্ন মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি বুঝাইয়া বলেন।

স্যার আশুতোষ বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে গত ২৪শে জুলাই স্কুল ভবনে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের এক সভা হয়। মিসেস ঘোষ বক্তৃতা করার পর পণ্ডিত শাস্ত্রী ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা করেন।

কালিয়া মহিলা সমিতি—জুলাই মাসের স্কুল পরিদর্শনের রিপোর্ট

গত ১৪ই জুলাই কেন্দ্র সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ মহোদয়া ও শ্রীযুক্ত কামাক্ষ্যা শাস্ত্রী (পণ্ডিত মহাশয়) কালিয়া সমিতি পরিদর্শন করিতে যান।

প্রথমে ১০ ঘটীকার সময় তাঁহারা সমিতি ও তদন্তর্গত ইণ্ডাষ্ট্রিস্ স্কুল পরিদর্শন করেন; ঐ সময় ৩৫টি শিক্ষার্থিনী উপস্থিত ছিলেন এবং কাটীং বিভাগ, পেণ্টিং বিভাগ, [illegible] বিভাগ ও কুটীর শিল্প এই চার বিভাগের কার্য্য সুচারু [illegible] করিতে থাকেন। তাহা দৃষ্টে উহাঁরা বিশেষ সন্তোষ [illegible] করেন।

পরে ২ ঘটীকার সময় উক্ত স্কুলপ্রাঙ্গণে একটী [illegible] মহিলা সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বড় কা[illegible] ছোট কালিয়া, রামনগর, বেন্দা, চাঁদপুর, মৃজাপুর, ঘো[illegible] হইতে ভদ্রাভদ্র হিন্দু মুসলমান প্রায় ৩৫০।৪০০ [illegible] সমবেত হন। প্রথমে সম্পাদিকা উক্ত পণ্ডিত মহাশয় [illegible] ঘোষজায়া মহোদয়াকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাপতির [illegible] উপবিষ্ট করান, পরে একটী বালিকা প্রারম্ভ সঙ্গীতান্তে [illegible] স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা উহাঁদের অভিনন্দন করেন [illegible] মিসেস্ ঘোষ মহোদয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকা[illegible] সম্বন্ধে অন্যূন ২ ঘণ্টাকাল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করে[illegible] পণ্ডিত মহাশয় উক্ত বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করেন, [illegible] সঙ্গীতান্তে সভা ভঙ্গ হয় ৫ ঘটীকার সময়।

ঐ দিন রাত্রি ৮টার সময় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহা[illegible] পণ্ডিত মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়ও নিক[illegible] কালিয়াবাসী প্রায় ১৫০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি নিবেদন

আগামী ২১শে আশ্বিন ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা আরম্ভ হইবে। ৩রা আশ্বিনএর পূ[illegible] আমরা আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী বাহির করিব। বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের [illegible] শারদীয়া পূজার নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞাপনের কপি আগামী ১লা আশ্বিনএর মধ্যে আমা[illegible] আফিসে পাঠাইলে, আমরা কার্ত্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীও ১৭ই আশ্বিন বাহির করিতে ভরসা [illegible]। অতএব বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আশ্বিন সংখ্[illegible] বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কপি সমূহ ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য [illegible] ১লা আশ্বিনের মধ্যে অবশ্য অবশ্য পাঠান। ইতি—

কার্য্যাধ্যক্ষ
বঙ্গলক্ষ্মী

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

বিলেতের National Institute of Industrial Psychologyর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ব্রিটেনের কারখানাগুলোতে কাজের মাঝখানে মজুরদের বিশ্রাম ও সামান্য জলখাবার দেওয়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি গবেষণা হয়ে গেছে। এ গবেষণার ফলে যে সব তথ্য জানা গেছে তার প্রধান তথ্যটি এই : "বিলেতের মজুরদের সবচেয়ে প্রিয় জলযোগ হচ্ছে রুটি আর চা"।

গবেষণাটির কেন্দ্র ছিল ইংলণ্ডের সাতটি কারখানা-বহুল সহর নিয়ে—১০৫০টি কারখানাতে হয়েছিল অনুসন্ধান এবং এ-কারখানাগুলোর শ্রমিকসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ থেকে বারো হাজার পর্য্যন্ত।

এসব কলকারখানাতে শ্রমিকদের ক্লান্তি এবং তা নিবারণের উপায় প্রসঙ্গে Institute একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন সেই রিপোর্টে জানা গেছে যে, আজকাল এই কলকারখানা আর প্রতিযোগিতার যুগে মিলের মালিক ও অন্যান্য উপর ওয়ালারা শ্রমিকদের শরীর ও মন ভালো রাখতে খুব তৎপর। সেই জন্যেই আজকাল কারখানাগুলিতে কাজের মাঝখানে শ্রমিকদের একটু ছুটি এবং সম্ভব হলে, তার সঙ্গে সামান্য কিছু খেতে দেওয়ার রেওয়াজ এসেছে। এ-ব্যবস্থার উপযোগিতা মালিকরা নিজেরাই স্বীকার করছেন।

গবেষণাকারীরা যে-সব কারখানা পরিদর্শন করেছেন তার মধ্যে শতকরা ৬৭·৭টি কারখানাতে—হয় নিয়ম করে, নয়তো বিনা নিয়মে—মজুরদের কাজের মাঝখানে খানিক ক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। তার মানে এই যে, গ্রেট ব্রিটেনের কলকারখানার অধিকাংশ মালিকেরাই মজুরদের জন্য এই রকম একটু বিশ্রাম এবং তার সঙ্গে সামান্য জলযোগের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এতে লোকজনদের স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

ব্রিটেনের কলকারখানার মজুরেরা যে সব জলখাবার পছন্দ ক'রে তার আলোচনা করে' উল্লিখিত রিপোর্ট বলে; "চায়ের স্থান সবার ওপরে। তার কারণ কেবলমাত্র এ-ই নয় যে চা শরীর ও মন তাজা করে' তোলে—চায়ের জনপ্রিয়তার একটা কারণ তার সামাজিক ও আনন্দময় দিক;—বিশেষত যেখানে মেয়েরা আছে। যে সব কারখানায় অনুসন্ধান করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৭৮·৬টিতে চা-ই হয় সবচেয়ে প্রিয় পানীয়, নয়তো একমাত্র পানীয়, আর শতকরা ৯৮·৬টি কারখানাতেই মজুরদের চা দেওয়া হয়।"

মজুরদের জন্য একটু বিশ্রাম আর চা—ব্যবস্থার প্রচলন এদেশে খুব অল্প দিন থেকে হচ্ছে এবং এ বিষয়ে অগ্রণী হচ্ছেন ইণ্ডিয়ান্ টী এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড। তাঁরা এই অল্প দিনের ভিতরেই কয়েকটি কারখানা-বহুল জায়গায় এ-নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছেন। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় মিল মালিকদের মতামত বেশ উল্লেখযোগ্য। কোচিন্ ষ্টেইটের নামজাদা একটি কাপড়ের কলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সম্প্রতি টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড যে চিঠি পেয়েছেন তার প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে এই যে, নিয়মিত বিশ্রাম ও চা দেওয়ার ফলে মজুরদের বেশ উন্নতি হয়েছে। ম্যানেজার লিখেছেন : "আপনাদের লোকেরা আমাদের লোকজনদের গত নভেম্বর মাস থেকে সুরু করে পাঁচ মাসের ওপর আমাদের লোকজনদের বিনামূল্যে চা দিয়েছে এবং তারপর থেকে আমরাই এ-নিয়ম বজায় রেখেছি। আমরা আনন্দের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলছি যে, এখানে বোর্ড এতদিন যে চমৎকার কাজ করেছে তার ফলে মজুরদের প্রচুর উপকার হয়েছে, এবং সেহেতু পরোক্ষভাবে আমরাও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। চা পানের এই যে নূতন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আমাদের মজুররা করেছে তার ফলে এদের-যে কত উপকার হয়েছে তা বলাই বাহুল্য; কারণ, চা যে মদ ইত্যাদি উত্তেজক জিনিষের চেয়ে ঢের ভালো অথচ নির্দ্দোষ, একথা সবাই জানে।"

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.

বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবী-বন্দনা

শিল্পী—শ্রীবাসবেন্দ্র ঠাকুর

১৫শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৭ | ১১শ সংখ্যা

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Elgersburg Thurwald
M. Hote Warte.

দিনকরকরকমলেষু—

এবার চলিনু তবে
সময় হয়েচে নিকট, এখন
জাহাজে চড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছল ছল
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।

রবিদাদা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

দিনু, তোরা কোথায় জানিনে, শৈলশিখরে না সমুদ্রতীরে, না রাজধানীতে না শান্তিনিকেতনে। আমি আছি ঘুর্ণিপাকের পিঠে চড়ে। এখানে ওখানে, এপারে ওপারে, এর বাড়ীতে, ওর বাড়ীতে, এ সভায় ও সভায়, এখানে চায়ে ওখানে ডিনারে, এখানে জাহাজে ওখানে রেলগাড়িতে। মনের কম্পাসের কাঁটা নিত্যই রয়েছে উত্তরায়ণের সেই কোণার্কের দিকটাতে। লীলমণির আশ্রয়ে কবে আমার কেদারায় গিয়ে অধিষ্ঠিত হব, এই কথা চিন্তা করচি। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৪

রবি দাদা

কল্যাণীয়েষু,

এখানে এসে অবধি তোদের কোন চিঠিপত্র পাইনি। কেমন আছিস, কোথায় আছিস, সমস্ত আন্দাজে অন্ধকারে ঝাপ্সা। আমরা যে দেশে এসেছি, এ একেবারেই গানের দেশ নয়, এ ছবির দেশ। এরা এদের সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ছবি দিয়েই ব্যক্ত করে। এদের গান শুনেচি কিন্তু তাকে গান বলা চলে না—সুর সহযোগে আওয়াজ করা মাত্র। এদের নাচ খুবই সুন্দর কিন্তু গান যতদূর কাঁচা হতে হয়। কাজেই আমারো গানের স্ফুর্ত্তি একেবারে নেই। গানের সমস্ত স্মৃতি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যেত যদি-না প্রায় মুকুলটা চীৎকার শব্দে যখন তখন যেখানে সেখানে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নির্দ্দয়ভাবে আমার গান আওড়াতো। এমনি দুর্ভিক্ষের দশা যে মুকুলকেও থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক, এখন ওকেও ফেলে যেতে হচ্ছে। ও এখানে থেকে ছবি আঁকার চর্চ্চা করবে। আমেরিকায় গান বাজনার অভাব হবে না। কিন্তু আমাদের সেই শান্তি-নিকেতনের মত গানে জবজবে আকাশ কোথায় পাব? তোর ঘরের সেই গানের আসর ছবির মতো মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তোর জানলার গরাদের বাইরে থেকে কালো কালো জ্বলজ্বলে সেই চোখগুলো। এবারকার বর্ষার পালা শান্তি নিকেতনের মাঠের উপর থেকে আপন পাওনা চুকিয়ে নিয়ে চলে গেছে—আকাশ থেকে বাদল মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে শ্রাবণের দলবল বিদায় নিয়েচে, এখন শরতের শিউলী ফোটার সময় হয়ে এল। কিন্তু আশ্রমের এই সব ঋতু-অতিথিরা কি তাদের কবি-বৈতালিকের কথা স্মরণ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাবে না? বৎসরে বৎসরে তারা যে বিচিত্র অভ্যর্থনা পেয়ে এসেচে এবারে তার আয়োজনের ক্রুটির নালিশ ওখানকার মাঠে মাঠে রয়ে গেল। তাই থেকে থেকে মনটার ভিতর ঝটপট্ করে ওঠে—কিন্তু—চলিগো চলিগো, যাইগো চলে।

তোদের বিদ্যালয়ের জন্যে একটা জাপানী ঘণ্টা পাঠাচ্ছি। আহার, উপাসনা প্রভৃতি সাধনার আহ্বানের বেলায় এটা ব্যবহার করলে চলবে। এই ঘণ্টা আমার একজন জাপানী বন্ধু বিদ্যালয়কে দান করেচেন। রেলগাড়ী চলচে, আমিও চলন্ত তাই লেখাটা অনেকটা তোর ছাঁদের হয়ে এল।

তোদের রবি দাদা

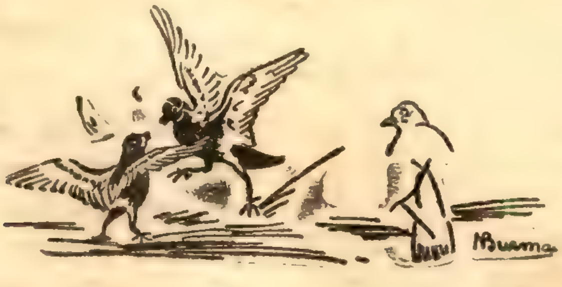

দর্শন

শ্রীহেমলতা দেবী

ঋষিগণ সোজা চোখে দেখেছেন তাঁরে
বলেছেন 'ওই' তিনি তমসার পারে।
বলেছেন 'এই' তিনি রয়েছেন ঠায়.
আমলকি ফল সম হাতের মুঠায়।
এমন আশ্চর্য্য কভু শুনে নাই কেহ
চোখে তারে দেখা যায় নাহি যার দেহ।
কাণে যারে শুনিবারে নাহি যায় পাওয়া
আকাশে তাহার বাণী করে আসা-যাওয়া।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলি সবে যত ফুল ফল
আকাশে বাতাসে ঘেরা মাটি তৃণ জল
অন্ন হ'তে অগ্নি হ'তে চেতনা আহরি',
বলেছেন ঋষিগণ 'এই' তাঁরে ধরি'
'এই' বোলে পাওয়া তাঁরে মিথ্যা কভু নয়,
প্রত্যক্ষ আনন্দ তিনি শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়।

৪ঠা ভাদ্র—১৩৪৭

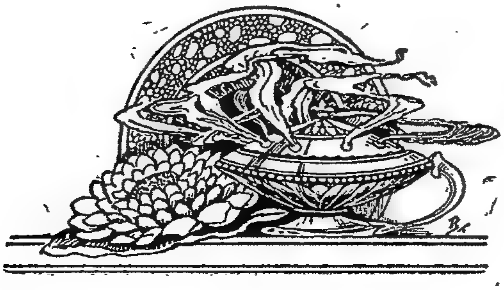

সেৎন নদীর ধারে একটি সন্ধ্যায়

শ্রীচিন্তামণি কর

এক সন্ধ্যায় বুলভার্দ সঁা মিশেল দিয়ে চল্‌ছি। মনে পড়ছিল, বাংলার শ্যামল বুকে সন্ধ্যা কেমন সাদর সন্তর্পণে আঁধার আঁচলখানি বিছিয়ে দেয়। আগত সন্ধ্যার স্বচ্ছ আঁধারের আবরণখানি ভেদ করে কয়েকটী প্রদীপশিখা নির্ব্বাপিত দিবালোকের আত্মা যে একেবারে নিঃশেষ হয়নি, জানিয়ে যেন জ্বলে উঠে। মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনি যেন সাবধান বাণী শোনায়, "এইশব্দের সঙ্গে সব গোলমাল চুপ হয়ে যাক্, "ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা, ওরে মন নত কর শির, সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী"। কানের মধ্যে ঝিল্লীরবের একতান বাজছিল তাকে বিদীর্ণ করে বেজে উঠল কোন এক কাফের অর্কেষ্ট্রার উচ্চতান। সুবেশ নরনারীর চলমান স্রোতে উত্থিত হাসির কলধ্বনি অর্কেষ্ট্রাকে যেন আর একপর্দ্দা চড়িয়ে দিল। বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় আঁধার ডুবে দু'একটি অট্টালিকার কোনে আশ্রয় পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তলিয়ে গেল। রঙ্গমঞ্চ নিসৃত সঙ্গীত, প্রশংসাধ্বনী, প্রমোদোবেশাপ্লুত পারীবাসীর সঙ্গে একযোগে বিদ্রূপ করে যেন বল্লে, "সন্ধ্যা তোমার কালিমার স্থান এখানে নেই, তোমার নিঃস্তব্ধতাকে আমরা পছন্দ করিনা। পারী সুন্দরীর তাচ্ছিল্যভরা হস্তভঙ্গিমার কঙ্কন যেন পানপাত্রের ঠুন্‌ঠুন্ শব্দে বেজে উঠল। প্রস্থানোমুখী সন্ধ্যার আঁচলের খানিক যেন সেৎননদীর উপর লুটিয়ে চলছিল, তারই একপ্রান্তে বসে গেলাম।

সঙ্গে ছিলেন এক বন্ধু। নিস্তব্ধতা বোধ হয় তাঁর খুব প্রিয় নয়। প্রশ্ন করলেন, কর, এত বিষয় থাকতে শিল্পকে তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করলে কেন! আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এর প্রয়োজন কি?. তা ছাড়া তোমাদের কেউ বুঝছে বা আদর করছে তারও ত কোন লক্ষণ দেখিনা। বল্লাম, আমাদের আদর যে নেই ওার প্রমাণ তুমি নিজেই। আর প্রয়োজনের কথা বলছ, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই কি মানুষ বাঁচতে পারে? তোমার রুচিমত করে না থাকলে তোমার মন অসুস্থ হয় অথচ তোমার রুচিমত নয় এমন করেও তুমি বেঁচে থাকতে পার। কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এমন আহার, বাসস্থান, পোষাকটুকু দিলেই কি সে সন্তুষ্ট থাকে? কবিতা না লিখলে গান না গাইলে কি জীবন বাঁচে না, তবে কেন তা চাও? যে গাছের ফুল হয় না পত্র স্তবক ভরা শাখা প্রশাখা ছায়া বিস্তার করে না তার যা মূল্য, সাহিত্য-শিল্প-সম্পদ বিহীন স্বাধীন জাতের মানব সমাজে তার চেয়ে বেশী দাম নয়। তাই বলে স্বাধীনতা চাইনা তা বলিনা। স্বাধীন না হলে, আমাদের দেশকে শিল্প সম্পদে আবার ত ভরে দেবেনা। স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা হবে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতির সম্পদ দিয়ে। মনে কর-না শিল্প সাহিত্যের বিকাশ শান্তির ফল।

ইতিহাসে পাই, সম্রাট ও ধনীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত জনসমাজে বিক্ষুব্ধ অসন্তোষাগ্নির আবহাওয়ার মধ্যে কবি রুশো, শিল্পী দুমিয়ের স্পেনে দরদী শিল্পী গোয়য়া প্রভৃতি কবি শিল্পীরবিদের উদ্ভব হয়েছে। শিল্প, সাহিত্যকে উপেক্ষা করে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিপূর্ণ হয় না। জনসংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তা কেবল বর্ণপরিচয়ে হয় না, কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত সে শিক্ষা সহজে স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে দিতে পারে।

বিপ্লবের সময় রাশিয়ার অশিক্ষিত জনসাধারণকে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, বিজ্ঞাপনি চিত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনেকের অবিদিত নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হলেই যে শিল্প ও শিল্পীর আদর হয়ে থাকে তা নয়। চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে বিক্রমে, সম্পদে বলীয়ান ফ্রান্স, তখনকার সেরা ভাস্কর প্যুগেকে অবজ্ঞা করেছে। সম্রাট ও ধনীদের চোখে লব্রু' হল সেরা শিল্পী। সে হল রাজকীয় শিল্পীদের

সভাপতি, অর্থবলে, রাজকীয় কৃপায়, শিল্পীদের মধ্যে যেন আর এক সম্রাট।"

বন্ধু হঠাৎ ফরাসী শিল্প ইতিহাসের গল্পে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা লব্রুঁ এবং চতুর্দ্দশ লুইয়ের পর এ দেশী শিল্পের বিশেষ করে ভাস্কর্য্যের অবস্থা কেমন হল?"

বল্লাম, "পরিবর্ত্তন যে হয়নি তা নয়। তবে স্থাপত্যে কিছু পরিবর্ত্তন ছাড়া ভাস্কর্য্যে এমন কিছু বদল হল না যার উল্লেখ করা যায়। কারণ, স্থূল, গুরুভার বস্তুর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শিল্প সৃষ্টির উপাদান ভাস্করের রচনার স্ফুরণকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। চিত্রকর, কিরণচ্ছত্রের বিচিত্র প্রতিফলনকে রঙে আবদ্ধ করে আমাদের চোখে বর্ণের হিল্লোল বইয়ে দিতে পারে। সমুজ্জ্বল সূর্য্যোদয়ের রক্তিমাকে তরল উচ্ছাসে ঢেলে দিতে পারে। বিম্বাধরীর মুখকমলের সুষমাকে মুকুরে প্রতিবিম্বিত করে দেখাতে পারে রূপযৌবন মদে মত্তার গর্ব্বকে। ভাস্কর এ সুবিধে না পেলেও ক্ষান্ত হয় নি রূপ রচনায়। সে বলে, একবর্ণ, প্রস্তর মৃত্তিকায়, আলোছায়ার প্রলেপ দিয়ে আমি বহুবর্ণের উচ্ছাস দেখাই। ব্রোঞ্জ, মর্ম্মরে গঠন দিয়ে আমি দেখাই ত্বকের সজীবতা, ধমনীর রক্ত সঞ্চালন। দর্শক চোখে দেখে আমার রচনার স্পর্শসুখ অনুভব করবে।" কিন্তু তবু ও, চিত্রকর তার রচনা শৈলীতে যত বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে ভাস্কর ততটা পারেনি। লব্রুঁর মৃত্যুর পর পোষাক পরিচ্ছদের একটু বাহুল্য কি সংক্ষিপ্তকরণ, দেহ-সংস্থান, পেশী বা ত্বকের সূক্ষ্ম গঠন ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্ভ্রম বা কামোন্মত্ততার কদর্য্যরূপ, শুদ্ধ পবিত্রতা বা অসভ্যতার প্রকাশ রচনাশৈলীতে কিছু পরিবর্ত্তন আনেনি। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল থেকে বিপ্লব পর্য্যন্ত, ফরাসী জনসাধারণের অত্যাচার ও দারিদ্র জ্বালায় জর্জ্জরিত প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত এই সময়ে জাতীয় বৈশিষ্ট ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়ে শিল্পের ক্ষেত্র জাতীয় জীবন থেকে সরে সংকীর্ণ হচ্ছিল। সংস্কৃতির সবকিছু ধনীদের সখের উপর নির্ভর করে চলছিল। রাজা শিল্পধারার বিধান দিতেন আর ধনীরা তাই মাথা পেতে গ্রহণ করে কৃতার্থ মনে করতেন। সম্রাট পঞ্চদশ লুই ছিলেন কামোন্মত্ত, লম্পট। রাজা ও রাজসভার অনুকূল আবহাওয়ায় শিল্পের প্রকাশও কামভাবোদ্দ্যোতক হয়েছিল। এই সময়ের শিল্পী বুশের চিত্রনে ও ক্লদিয়র ভাস্কর্য্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁদের রচিত সরল, যৌবনপুষ্ট, অপ্রাকৃত নগ্নমূর্ত্তি, সমাজ নৈতিক অবনতি ঘটাবার তত অবসর পায়নি। ১৭১৫ খৃঃ অব্দের রিজেন্সি কর্ত্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র থেকে বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সের পূর্ব্ব চিত্রণ, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ধরণ বেশ উন্নত হয়েছিল এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপে ফরাসী সভ্যতার প্রভাব ব্যাপক-ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ইতালিয় ও ক্লাসিক রীতির আধিপত্য থেকে ভাস্কর্য্য পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব জাতীয় এক ধারার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। এই সময়ের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তির ব্রোঞ্জ ও প্রস্তর অবয়বে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। ত্বকের সুষমা-সম্পদই যেন ভাস্করের চরম লক্ষ্য হয়েছিল। নাতিয়ে, লাতুর ও শারদাঁ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অমররূপ দিয়ে এ যুগের চিত্রণকে মহনীয় করেছেন। প্রতিকৃতি নির্ম্মাণে দক্ষ বিখ্যাত ভাস্কর হুদোঁ এই সময়ের ভাস্কর্য্যকে উন্নতির পথে আরো এগিয়ে দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে নানা রাজ-নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ফরাসী শিল্পীসকলে সমালোচক ও জন সাধারণের মন ক্লাসিক যুগে ফিরে যাচ্ছিল। বুশে ও ক্লদিয়র অপ্রাকৃত রচনা দর্শকদের আর আকৃষ্ট করতে পারছিল না। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে পাম্পেই আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণ, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হয়েছিল। ষোড়শ লুই কোঁৎ দাঁজভিয়ারকে রাজকীয় শিল্পস্থাপত্যের সমগ্র ভার দিয়েছিলেন। দাঁজভিয়ার নিজের খেয়ালমত শিল্প ও শিল্পীর উপর প্রভুত্ব করে ছিলেন। নাঁপলেয়র সময়, গত নুগতিক জীবন থেকে বহু পরিবর্ত্তিত, ঘটনাবহুল চাঞ্চল্যময় জীবনের পরিণতিতে শিল্পীরা নূতন, বিষয় নূতন উদ্যম ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। ফরাসীদের ইতিহাসে এমন যুগ দেখতে পাই না যখন শিল্প ও শিল্পান্দোলন তাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে অপরিহার্য্য বিষয় ছিল না। এবং প্রথম নাঁপলেয়র রাজত্ব-

কালে শিল্প ঐশ্বর্য্যে ফ্রান্স সর্ব্ব যুগাপেক্ষা উন্নিত ও গৌরবান্বিত হয়েছিল। এই সময় থেকে শিল্পে যে সব উদ্যমের সুত্রপাত হল, জেরিকো ও দ্যলাক্রোয়া সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্লাসিক ভাবধারার থেকে সরে এসে, নব রোমান্টিক শিল্পধারার প্রতিষ্ঠা করে, তার উন্নততম পরিণতি দেখালেন। ভাস্কর্য্যে রুদ্, দাভিদাঁজে ও বারই প্রকৃতির সাক্ষাৎ অনুশীলনে সকল শিল্পধারার সংস্কারমুক্ত এক আবেগময় মুর্ত্তিগঠন ধারার সৃষ্টি করলেন। চিত্রণে রোমান্টিক ভাবধারার বদল হয়ে বর্ত্তমান কালের মধ্যে বহু শিল্পপদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু রোদাঁ ও বুর্দেঁল ছাড়া গঠন ও ভাবধারার অপরূপ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। নাঁপলেয়র বিজয়স্তম্ভ আর্ক দ্য ত্রায়াম্ফ এ রুদ্ কৃত সৈন্য দলের অভিযানের যে বীরত্বপূর্ণ তেজ ও গতির সমাবেশ তা প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি ত দেখছ অবসারভোতায়ার পার্কের বাইরে একপ্রান্তে মার্শাল নের কি অপূর্ব্ব শক্তিশালী ও নির্ভিক বীরমূর্ত্তি। রুদ্ এর ভাস্কর্য্যে শুধু যে মূর্ত্তিগুলির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় তা নয়, কানে তাদের উল্লাস চিৎকার ধ্বনি ও যেন আঘাত করে। রুদ্ এর ছাত্র ভাস্করশ্রেষ্ঠ কারপো, তাঁর রচনায় লাবণ্য ও কমনীয়তার সুষমা গঠনে দেখিয়েছেন। অপেরার সামনে নৃত্যশীল নরনারীর দলটী কারপোর শিল্প সাধনার একটি উন্নততম বিকাশ জানবে।"

বন্ধু হঠাৎ প্রসঙ্গ ভঙ্গ করে বল্লেন, "থামাও বাপু তোমার ইসিতাসের নজির। আর অন্ধকার ভাল লাগছে না। চল, কোন কাফেতে গিয়ে বসে একটু পান ও গান উপভোগের চেষ্টা করি।"

আশ্রয়

শ্রীআদ্যনাথ রায় চৌধুরী

পত্নী বিয়োগের পরে অমলের জীবনে এলো পরিবর্ত্তন। জগতের পরিবর্ত্তনশীল গতিরও যে একটা পুরাতনের ছাপ আছে তা অমল বুঝতে পারেনা। সে ভেবেছিলো এমন বুঝি আর কারও হয়নি, হবেনা। লক্ষী যেদিন গেল সেদিনও সে উপলব্ধি করতে পারে নাই, এ যাওয়াটা কত বড় যাওয়া, শুধু বুঝেছিল মান-করে বাপের বাড়ী যাওয়া এ নয়। সেদিন ও চোখের জল ফেলেনি আজ ও কেউ দেখেনি ওকে চোখের জল ফেলতে। লোকে বলেই থাকে, অন্তত সেদিন বলেছিল, "বেটা ছেলে আবার বিয়ে করবে, কই কান্না কাটি দুঃখে মুসড়ে যাওয়া ত' দেখলাম না।" আজ লোকের বলাটা পাল্টেছে—বিয়ে-থা কর, আর কতদিন এমন করে থাকবে।

পাশের টেবিলে চায়ের বাটী হ'তে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। ধরান সিগারেটে টান দিতে ভুলে গিয়ে অমল স্মৃতির জাল বুনে চলে। ভজুয়া লক্ষীর চেয়ে বছর তিনেক বড়; ভজুয়া আজোও বেঁচে আছে। বিয়ের আগে আরও কাকে কাকে ভাল বেসেছিল জিজ্ঞেস করায় লক্ষী কোন উত্তরই দিতে চায়নি, হাজারবার সে বলেছিলো 'না" আর সে নাটা বারবার প্রকাশ করে দিয়েছিলো মনের দুর্ব্বলতা। রাত্রের কৌতুক-মিথ্যার মাঝে যেদিন সত্যই একখণ্ড মেঘ জন্মাল সেদিন লক্ষী বলতে বাধ্য হল বলতে চায়নি আগে, অন্তরের ব্যাথায় আঘাত দিয়ে আরও বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা ছিলনা বলেই। কিশোর কিশোরীর সে ছেলে খেলা ইতিহাসে স্থান পাবার মর্য্যাদা পায়না, জানা।

"শ্বশুর মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করায় লক্ষী পড়েছিল অবজ্ঞাতের দলে। নূতন বিয়ের মোহ দুদিনেই কাটল। মনের অশান্তি ঘটাতে তিনি ভজন পূজনে মন দিলেন। যথা নিয়মে অফিস যান, বাইরের সকলের সঙ্গে পরিচয় ও ব্যবহার রইল অব্যাহত। বন্ধুদের মৌখিক সহানু-

ভূতি প্রকাশকে হাস্তমুখে সহ্য করলেন। পরিচিতদের ব্যঙ্গ কৌতুকে রইলেন মৌন। এই মৌন হাসি জামা কাপড়ের মত আচ্ছাদন দিল অন্তরকে।"

সিগারেট পুড়তে পুড়তে এসে আঙ্গুলের কাছে জানাল তার অক্ষমতা হঠাৎ চমকে উঠে চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়ে দেখল অমল, সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

"শ্বশুর ম'শাই বড় হল ঘরটায় পার্টিশেন দেওয়াল দেওয়ালেন, ফলে যে ছোট্ট ঘরখানি দাঁড়াল সেটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার আর পবিত্র। ধূপের সুগন্ধে আর ঘিএর প্রদীপে ঘরটি আমোদিত আলোকিত।

লক্ষী তখন চাকরের নয় বৎসরের ছেলের সঙ্গে খেলা করত। অজস্র খেলনা পেয়েছিল, দম দেওয়া মটর, টিনের পুলিশ, রবারের হাতী ঘোড়া আর কত কি? প্রত্যেক দিন অফিসের ফেরৎ কমলেশবাবু আনেন এক একটা চকচকে খেলনা; নূতন নূতন সম্পত্তি পাওয়ায় হাসি খুসিতেই লক্ষীর কাটে দিন। তাতেই শশুর মহাশয় পেতেন একটু আনন্দ। লক্ষী আপন মনে সাজায় ভজুয়া দাঁড়িয়ে থাকে পেছনে। নূতন মা হঠাৎ এসে ভেঙ্গে দেয় এখেলা; চাকরের ছেলে ভজুয়া ম্লান মুখে নীচে নেমে যায়।"

পা দুটিকে ভেঁজে নিয়ে অমল ভাবতে থাকে "একবার শাশুড়ী ঠাকুরাণী গেলেন বাপের বাড়ী, লক্ষী পেল অনন্ত অবসর খেলবার। স্নানাহার সময় মত হয় না। খিদে পেলেই ঠাকুরকে ভাত চায়, ভাত খেয়ে আবার বসে রেলপেতে ইঞ্জিন দম দিয়ে চালায় মেঝের উপরে জাপানী রেল গাড়ী। ভজুয়া পাশে বসে থাকে চুপ ক'রে, দেখে লক্ষীর খেলা ও খেলনা।

দিন গুলো কালের বাঁধা চাকার মত ঠিকঠিক চলতে থাকে। ভজুয়া যখন স্নান করে লক্ষী তখন স্নান করে, ভজুয়া যখন খায়, লক্ষী তখন খায়। ভজুয়া যখন ছেঁড়া বই আর শ্লেট নিয়ে বসে পড়তে লক্ষী তখন খোকা খুকু হাতে এসে বলে ভজু তোমার কাছে পড়ব? ভজুয়া একবার হাসে তাই দেখে লক্ষীও হাসে। তারপর গাদুলিয়ে সুর করে পড়া চলে দশমিনিট। পড়ার সুর আস্তে থেমে যায়, আরম্ভ হয় গল্প হাসি। হঠাৎ পাশের হলঘর হ'তে শোনা যায় ঘণ্টার ধ্বনি। তারা পড়তে আরম্ভ করে সকলকে শুনিয়ে "পিতা মাতার পিতামাতার বাধ্য হইবে, লক্ষী পড়ে, আমার মা আমাকে বড় ভাল বাসেন।

. . . স চায়ের বাটী নিয়ে যায়, দিয়ে যায় মশলা। অভ্যাস বশতঃ দুটো মুখে পুরে, সিগারেটের আশায় পকেটে হাত ভরিয়ে অমল আবার খেয়াল দেখে। স্পষ্ট দেখতে পায় একখানি ছবি—শ্বশুর মশায় দিচ্ছেন একটি নাড়ু গোপাল খেলনা লক্ষীর হাতে তুলে, ভজুয়া পাশে দাঁড়িয়ে। খেলনা নিয়ে লক্ষী বলে 'বাবা ভজুয়ার একটা—অসমাপ্ত কথারি মাঝে পিতার রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। হাসি মুখটা হঠাৎ নিবিয়ে যাওয়া প্রদীপের মত নামিয়ে নেয় লক্ষী—ভজুয়ারও আস্তে আস্তে ঘাড়টি নিচু হয়ে আসে।"

সব ছবি যেন মনে ভাসছে অমলের; এমনি দরদ দিয়ে বলেছিল লক্ষী আর ও শুনেছিল, শূন্য মায়ের স্থান পূর্ণ করার মমতা নাই বাজারের সবগুলো খেলনারও। মোটর টার স্প্রিং যায় কেটে সেটা একপাশে পড়ে থাকে, ইঞ্জিনটা জুতার গাদায় পড়ে থাকে কোথায় থেকে, সেদিন নিয়ে আসে ভজুয়া দুটো ইট একটা পাটাও জোগাড় করে সে তাই দিয়ে হয় সিংহাসন খবরের কাগজ দিয়ে পাটা ও ইটকে ঢেকে দেয় বেশ ক'রে, তারই উপরে ডানহাত তুলে হাটুতে ভর দিয়ে দাঁড়ায় নাড়ু গোপাল, পুজার দিকে ঝোঁকে চাপে দুজনার।

পূজা শেষে হাসি মুখে বেরিয়ে আসে দুজনে, ঠাকুর ভাত দাও রান্না ঘরে এসে দাঁড়ায় একটি বালক একটি বালিকা। চাকর বকে ভজুয়াকে, এই, তুই এখন খাবি কি? খিদে পেয়েছে খাবনা আমরা?" বলে লক্ষী। ভজুয়া বলে "না এখন খিদে পায়নি আমার, পরে খাব" অমনি লক্ষী সায় দিয়ে বলে "পরে খাব"। সে ভজুয়ার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলে যায়।

ভজুয়া জিজ্ঞেস করে "তুমি খেলে না কেন?" উত্তর পায় "বা রে আমাদের ত ক্ষিদে পায় নি এখন?" "তোমার পেয়েছে।" "তোমার পেয়েছে?" "না" "তবে আমার কি ক'রে ক্ষিদে পাবে?" "লক্ষীর ক্ষিদে না পাওয়ার কারণ ভজুয়া খুঁজে পায় না—অথচ মনটাও সুপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে না। ভজুয়ার নিজের পেট জলছে, এই যদি ভজুয়ার একমাত্র

কারণ হয় লক্ষ্মীর ক্ষিদে পাওয়ার; তাই সে বলে—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে খাও না কেন লক্ষ্মী? "বাবা যে আমাকে ভালবাসে না" বড় বড় চোখ দুটো লক্ষ্মী মিলে ধরে ভজুয়ার মুখের ওপর। "কেন, তোমাকে তিনি নিত্যি খেলনা দেন।" লক্ষ্মী আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না।

একদিন ওরা দুজনে চুরি করে শ্বশুরের সাজি থেকে টাটকা ফুল; নাড়ু গোপালের পূজা হবে। ফুল কম দেখে শ্বশুর মহাশয় হাঁকেন—"ঠাকুর, কে আমার পুজোর ঘরে ঢুকেছিল? ঠাকুর চাকর জানে না কে ঢুকেছিল। এই না জানার জন্যে তারা কি কর্ত্তে আছে প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারল না। ডাক পড়ে লক্ষ্মীর—তার পেছনে এসে দাঁড়ায় ভজুয়া। ওরা দুজনেই স্বীকার করে নিজেদের দোষ—বলে "পূজো করতে মাত্র চারটে ফুল নিয়েছি—আমার দুটো আর—" ততক্ষণ পিঠে অনুভব করে একটি কঠিন চড়। যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে উঠবার পূর্ব্বেই দেখে ভজুয়ার কান ধরে বের করে দিয়ে, ভজুয়ার বাবাকে বলেছেন শ্বশুর মশায়, "আজ তোমাকে জবাব দিলাম, যাও। ঐ পাজী ছোঁড়ার পাল্লায় পড়ে মেয়েটা মাটী হ'ল।

মাইনার টাকা কয়টি নিয়ে ভজুয়ার বাবা যখন ভজুয়ার হাত ধ'রে বেরিয়ে যায় তখন সজল চোখে সে একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকায়। লক্ষ্মীর চোখ তখন খোলা কিন্তু দৃষ্টি নাই।

হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগেই লক্ষ্মী কেঁদে ওঠে, পিঠে চড়ের যন্ত্রনায়—বাবা ভজুয়া চ'লে গেল? বলে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে মেঝেতে।"

আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘ নিঃশাস ফেলে অমল ডাকে "ভজুয়া" একজন বলিষ্ট যুবক এসে দাঁড়ায়। অমল জিজ্ঞাসা করে, শ্বশুর মশায় তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর আর তুমি লক্ষ্মীকে দেখেছ ভজুয়া?" সংক্ষিপ্ত উত্তর "না"

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"সে কথা থাক্ বাবু, আমি আপনার কাছে—থাকব, তার কি করলেন বলুন।

থাকবে ভজুয়া থাকবে, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কথার জবাব দাও—বিয়ে করোনি কেন?

"আপনি বিয়ে করুন বাবু, আমরা দেখেশুনে সুখী হই।"

দোলন-চাঁপা

শ্রীঅমিতা দেবী

প্রেমের প্রতীক্ শুভ্র দোলন-চাঁপা,
সকল রংয়ে হার মানালো—
রূপ সে না যায় মাপা।
প্রজাপতির রং হারানো শুভ্র ডানা মেলে
মন যেন তার উড়ে গেছে মাটির বাসা ফেলে—
আপন গন্ধে নয় সচেতন তাই,
দিয়েই খুসী চাওয়ার দাবী নাই।
সময় হ'লে শ্যামল বুকে পড়বে যখন ঝরে
নিঠুর চরণ-পাতে যদি কেউ দলে যায় ওরে—
বিনা অভিযোগে তবু দিবে গন্ধ সুধা
নিবেদনের আনন্দেতে মিটাবে সব ক্ষুধা॥

নারী

শ্রীরমানাথ বিশ্বাস

নর, নারীর কথা কি করে বল্‌তে পারে? যদিও বা বলে তবে সত্যিকারের সজীবতা তাতে থাকবে কি? নর নারীর সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের দেশে অনেক সংবাদ-পত্রে লিখেছে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি কতখানি হয়েছে তা প্রণিধানের যোগ্য, তর্ক করার যোগ্য নয়। সেই বিজ্ঞপ্তি-পত্র আমি অনেক পাঠ করেছি, অনেক তর্ক করেছি, তারপর যথায় ছিলাম তথায় ফিরে গেছি। ভারতের নারী সেই আন্দোলনের ঢেউয়ে কতটুকু এগিয়ে গেছেন, সে সমাচার তাঁরাই রাখেন। আমার জন্ম ভারতে, বর্দ্ধন ভারতে, কিন্তু মন শিক্ষার দিকে ধাবিত হতো না, যেন কেঁপে উঠ্‌ত। কিসের জন্য কেঁপে উঠ্‌ত তা বুঝতে পারতাম না, তবে এটা বুঝতে পারতাম, যা দেখ্‌ছি, যা শিখছি তা মনের মত নয়। অহঙ্কার আমার ছিল, এখনও আছে, তাই একদিন শিক্ষার হাঁড়ি হাটে ভেঙ্গে স্বাধীন ভাবে গ্রামে গ্রামে বেড়াতে লাগলাম। সেই যে ভ্রমণ-তৃষ্ণা তার অদম্য উৎসাহ, আমাকে পৃথিবী ভ্রমণের দিকে টেনে নিয়ে গেল, আমি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম। নর এবং নারী উভয়েই আমাকে সাহায্য করেছে, কিন্তু আপন হতেই ইচ্ছা হতো, আমাদের দেশের নারীর সঙ্গে অপর দেশের নারীর কি প্রার্থক্য তাও দেখা চাই, তাই দেখেছি, তুলনা করেছি, অনেকদিন বসে ভেবেছি, কারণ বুঝতে পেরেছি, নারী অবহেলার নয়। নারীর প্রতিভা, শক্তি, সহিষ্ণুতা নরের চেয়ে কম নয়।

মৌলিকত্ব ছেড়ে দিয়ে সাধারণ সমস্যায় আসা চাই। এর মানে আমি সাধারণ লোক, আমার কথা সাধারণ হওয়া চাই, ভাব সাধারণ হওয়া চাই, বড় কার্য্য করা, বড় কথা বলা আমার শোভা পায় না। ঐ যে বিজ্ঞপ্তি পত্র পাঠ করেছিলাম, তার দাগ আমার মনে অনেক পুরু করে কেটেছিল, তাই ইউরোপীয়ান সভ্যতা আমার মোটেই পছন্দ হতোনা। তারপর ভারতের নারীচরিত্র ... ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকার নারীরা লিখতে ... তখন মনের ভাব সপ্তমে উঠল। হিংসা, প্রতিহিং... আরও বেড়ে গেল, এমন কি বাক্যে এবং কাজে ... গিয়ে আমাকে মহা ফেসাদে ফেল্ল। তারপর ... অন্য দেশে নারী জাতটাকে ঘরের মাঝে চাকরাণীর ... অথবা অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি ... জার্ম্মেনীতে গেলাম, হিটলারের রাজত্ব তখন ... পৌচেছে। নারী চাকরাণী কিংবা আর কিছু ... কিনা তাই ভাল করে দেখতে লাগলাম। এখ... রাখা ভাল, পর্য্যটন সময়ে যথায়ই যাই তথায়ই ... খাবার এবং থাকবার খরচ ভিক্ষা করে যোগাড় ... গোড়াই করেছি।

জার্ম্মাণীতে ও ভিক্ষা করেই দিন কাটাতে হয়... নরের কাছ হতে যত ভিক্ষা পেয়েছি সর্ব্বত্র, ... কাছ হতে তার একশত গুণ বেশি পেয়েছি। ... দেশেও নারী ভিক্ষা দিয়ে থাকে। এক পয়সা নয়, ... চাল, এর বেশী দিবার তাঁর অধিকার নাই, নিজে খ... ছেলেপিলেকে খাওয়াবে কি, স্বামী রোজগার কর... সেই ধরণের নারীই আমাকে বিদেশে ভিক্ষা দি... দুটা নারী রেঁস্তোরা যেদিন ঘুরে এসেছি সেদিনই ... পক্ষে পঁচিশ টাকা পেয়েছি। মনে রাখবেন রেঁস্তোরা, ... বাংলা কথা হলো 'চায়ের দোকান'। চায়ের দোকা... আমাদের দেশে মেয়ে লোক দেখি নাই, দেখব বলে ... নাই। এক একটি চায়ের দোকানে তিনশতেরও ... নারী চা খেতে দেখেছি এবং তাদের কাছ হতে ... পেয়েছি, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা করি নাই। ... দিনের বেলা নর যেমন ব্যস্ত, নারীও তেমনি ... বিকাল বেলা তাদের ফুরসত হয়, কাঁফে, কাবেরেতে ...

চা খায়, নাচে, সিনেমা দেখে, বাগানে বেড়ায়। কিন্তু ভারতে প্রচার হলো নারীগণ আর বাইরে যায় না, হয় চাকরাণীর কাজ করে নয় আর কিছু করে। ভাগ্য ভাল, তাই দেখতে পেরেছিলাম চাকরাণী না রাজরাণী। আমার মনে হয়, ভারতীয় রমণীর প্রগতির পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এসব বাজে কথা তিলকে তাল করে প্রচার করা হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি, ইউরোপীয় সভ্যতা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু ক্রমাগত আমার মনে হচ্ছিল,—ধরে নিলাম আমাদের দেশের নারী না হয় শাড়ী প'রেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য রাখল, কিন্তু তাদের মনের পরিবর্ত্তন কি ক'রে হবে? ইউরোপ আমেরিকায় শাড়ীর আদর কোথাও শুনি নাই। ভারতীয় নারী লেকচার দিয়েছেন, অনেক বলেছেন, হিসাব নিকাশ তার হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, 'সার কথা' তাতে কিছুই নাই। যে দেশের নারী "বিন্দু" সম্বন্ধে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারে সে দেশের নারী নিশ্চয়ই শিক্ষিত, নিশ্চয়ই সাহসী, কিন্তু কোথায় তার প্রমাণ? এ কথাই ইউরোপীয় মার্কিণ এমেরিকান এবং জাপানী স্ত্রীলোকেরা ব'লে থাকে।

অনেক চিন্তার পর মনে হ'ল ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারছি না তবুও মনে হ'ল যথায় সভ্যতা পৌঁছায় নাই তথায় নর এবং নারী কি করে বসবাস করে? বনের জানোয়ারের মাঝেও নরনারী আছে; তারা কি ক'রে থাকে? হয়ত তাদের মাঝে যে চালচলন তাতে কোন রূপ ভেজাল পৌঁছে নাই। যখন আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করতাম, তখন তাই দেখতাম্ এবং মনের মাঝে বনফুল দিয়ে তারই চিত্র অঙ্কিত করতাম। কিন্তু সে চিত্র কাউকে দেখাব বলে ভাবি নাই, এখন আবার ভাবছি, সে চিত্র প্রদর্শনীতে দেখাবার উপযুক্ত কিনা, একটু যাচাই করা যাক্।

আফ্রিকার অনেক স্থানে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করেছে। যথায় সেই সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, তথায় যাওয়া আমার লক্ষ্য ছিল। একদিন গন্তব্য স্থানে গিয়ে হাজির হ'লাম। গন্তব্য স্থানে যাবার পূর্ব্বে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম, সেখানে কোনরূপ কষ্ট পেতে হয় নাই। বোধ হয় পিতাপুত্রে মিলে একটা সাপ ধরার ফাঁদ তৈরী করছিল, এমনি সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। একটা ছোট কুঁড়ে ঘর, যে ঘরের তুলনা আমি দিতে পারব না এদেশের কোন ঘরের সঙ্গে। সেই ঘরের মাঝে ছেলের মা বোধ হয় কোন কাজ করছিলেন। পিতা আমার দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নত করল। ছেলে তার মাকে ঘর হতে ডেকে নিয়ে আসল। নারী আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন, একটা কথার ও উত্তর দিতে পারলাম না ভাষা জান্‌লে ত জবাব দিব! নারী যখন হয়রাণ হয়ে গেলেন তখন নর আমাকে বসতে দিল, নারী ঘরে চলে গেলেন। এর মানে, আগন্তককে যদি কোন কথা বল্‌তে হয় তবে বল্‌তে হবে নারীর সঙ্গে প্রথম। নারীর ইচ্ছানুযায়ী গৃহকার্য্য চল্‌বে। পিতা কিংবা পুত্রের তাতে কোন হাত নাই। পিতাপুত্রে বেশ ভাল রকমের বন্ধুত্বই দেখলাম। মনে হলো পিতাপুত্র যেন মাকে ভয় করেই চলে।

বনের ঘর, মাটির দেওয়াল, গোলাকৃতি, আবর্জ্জনা পূর্ণ। সকল সময় ঘর ব্যবহার হয় না। পিতা একদিকে, আর মাতা একদিকে বের হয়ে পড়ল। যাবার বেলা কে কোন-দিকে যাচ্ছে, কি কাজে যাচ্ছে, অনুমান করলাম মাত্র, জান্‌তে পারলাম না। হয়ত তারা খাদ্য অন্বেষণে বের হয়েছে, কিন্তু একদিকে যায় নাই, তিনজনা তিনদিকে। সকলেই স্বাধীন, আপন মনে আপন পথে চলেছে। উদ্দেশ্য হয়ত এক, কিন্তু কর্ম্ম-পদ্ধতি অন্যরূপ। এখনও হয়ত সমাজ গ'ড়ে উঠে নাই। পিতা আপন মন মত খোঁজে বের হয়েছে, হয়ত মাতা এবং পুত্র ও সেরূপই।

স্ত্রীলোক যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কয়, আমাদের কথা দূরে থাক্, যারা সভ্য ব'লে আপনাদেরে বলে থাকে, তারাও অনেক সময় প্রতিহিংসা নেয়, কিন্তু এই দেশে তা হবার যো নাই। তুমি যেমন কথা বল্‌তে পার, আমিও ঠিক তেমনই; তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি। পান থেকে চুণ খসলে তুমি যেমন রাগ্‌বে, তেম্‌নি আমিও রাগ্‌ব। এই কয়টি কথা কয়েক-দিন ওদের সঙ্গে থেকে বুঝ্‌তে পারলাম। তবে সতী,

সাবিত্রী, সহমরণ আস্‌ল কোথা হতে? আমার মনে হয় তার কোন গোপনীয় মানে ছিল। এই প্রবন্ধে তা বলা যেতে পারে না। যদি বল্‌তে হয় তবে আপন কথা আপন প্রেসে ছাপতে হবে। কারণ সেই কথাতে পরাধীনতা থাকবে না, অতএব স্বাধীন ভাবেই ছাপতে হবে।

কথাটা অতিসংক্ষেপে সেরে নিতে হল। আরও একটু পরিষ্কার করে বল্‌তে পারতাম, কিন্তু এখন ও সে সময় হয় নাই। তবে এটা বেশ বুঝতে পারলাম, নর চায় নারীর সাহায্য, নারী চায় নরের সাহায্য। একের সাহায্য ছাড়া অপরের গুজরান হয় না, তা বলে, একজন অন্যকে গোলাম করবার অধিকারী হতে পারে না। নারী আমাদের দেশে কেন, সভ্য জগতেও সর্ব্বত্রই নরের মুখাপেক্ষি। অনেক সময় নারী মনের দুঃখে কাঁদে তবু ও নরকে কষ্ট দেয় না, এমন কি কষ্ট দিবার সাহস ও করে না। কিন্তু অসভ্যদের মাঝে তা হবার কোনরূপ সুবিধা নাই। ঘরের মালিক নারী, নর যদি ঘরের মান মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে না চল্‌তে পার, তবে এই ঘর তোমার কায়েমী নয়। যাকে "স্ত্রী" বল তাও তোমার কায়েমী নয়। আমার মনে হয় "স্ত্রী" শব্দটাই একটা রহস্যময় কথা, যথায় শুধু নর ও নারী শব্দের প্রচলন আছে, তথায় স্ত্রী ইচ্ছা করলেই এক স্বামীকে তাড়িয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। আফ্রিকার জঙ্গলে তাই হয়। স্বামীর আছে বল্‌তে কিছু নাই। স্ত্রীর সন্তান আছে, ঘর আছে। বনে পোতা মিষ্ট ভিটামিনে ভর্ত্তি কন্দমূল আছে। সেই কন্দ বপন করে নারী, নর জানে না সে ঐ গৃহে কত দিন বাস করবে তাই। এসব হয় যৌবনের প্রথম ভাগে, তারপর আর নারী নরের পরিবর্ত্তন করে না; সেজন্যই বোধ হয় বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে, যাতে সুরুতেই ভাঙ্গন এসে দেখা না দেয়।

কতকগুলি সভ্য সমাজ বিবাহ পদ্ধতিকে আপন মন গড়া ক'রে নিয়ে হয়ত বন্ধনটা একটু শক্ত করে নিয়েছে, যেমন, জমি ক্রয় আর বিক্রয়, দলিলে যেন এমন কোন খুঁত না থাকে, যাতে করে বিচারক কোনরূপ ভুল ধরে, ক্রয় কিংবা বিক্রয় পত্র বাতিল করতে পারেন। এটা হলো Highest stage যা আমাদের মাঝে আছে। এই উচ্চ মার্গে পৌঁছা ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে তা আমি বল্‌তে যাব না। জাপানও আমাদের মত উচ্চমার্গে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেদিন দেখে আস্‌লাম তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে! কেমন করে সে ধ্বংস হল তাও বল্‌তে পারব না কারণ আমাদের ভাষায় তার স্থান নাই। তবে ঐ যে শক্ত রেজেষ্টারী কবালাপত্র, তা যেন অনেকটা সুবিধার জন্যেই হয়েছিল। সেই জাপানী নর এখন দেখছে যদি ঐ রেজেষ্টারী কবালা পত্র বলবৎ থাকে তবে তাদের দেশে আর মানুষ দেখা যাবে না, তাই শক্ত কবালা পত্রকে আগুনে পুড়িয়ে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি দেখছি নারী তাতে সুখী হয়েছে, লোক সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। আমার মনের কথা ভাষার মারফতে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌তে হচ্ছে, কারণ আমাদের শ্লীলতার গণ্ডী Junker হতেও Junker or Juniper এখনও শব্দে প্রকাশ হয় নাই, হয়ত সত্বরই হবে, তখন বুঝবেন অস্ত্রটা কত দুর্দ্দান্ত। আবার যদি জাপানে নূতন দলিল লিখতে হয়, তবে হয়ত নারী আর মান্‌বে না। নারী অতি কষ্টে সময়ের প্রভাবে যা পেয়েছে, তা আর ছাড়বে না, সেই ভয়ে ভীত হয়ে এখনই অনেক জাপানী নর মাথা চুলকাতে আরম্ভ করেছেন। এতে মনে হয় কতকগুলি নর নারীর স্বাধীনতা দেখতে পারেনা। সেই নর সমূহ সমাজের শত্রু কি মিত্র, সমাজ তা অনেক সময় ভাবে না। শুধু আদেশ মেনে চলে। ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই। সেই যে দুর্ব্বলতা তার কারণ খুজলে দেখতে পাওয়া যায়, যে সমাজে নারী পরাধীন, সেই সমাজেই, অনেক নর দাস ভাবাপন্ন। যার মা দাসী তার ছেলে কি করে সাহসী হতে পারে? বৈজ্ঞানিক এদিকে খাঁটি মন্তব্য করে বাধিত করবেন।

এই মাত্র যে অসভ্য আফ্রিকান নারীর কথা বল্লাম, তাতে ও যেন সভ্যতার চিহ্ন আছে। এমন অনেক অসভ্য সমাজে পৌঁছেছি, যেখানে একটুও সভ্যতার আলো প্রবেশ করে নাই। তারা অসভ্য রয়েছে নিজেরা ইচ্ছা করে। তারা সভ্য সমাজে প্রবেশ করতে চায় না। এরূপ অসভ্য

নর নারী উত্তর বর্ম্মা, শ্যাম, মালয়, কম্বোজের উত্তর লুয়াক্স এ দেখেছি। এসব স্থানে যেতে হলে প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আমার প্রাণ আছে কি নাই তার নির্দ্ধারণ করার পূর্ব্বে, এ সকল স্থানের নর নারীর কথাও বল্‌তে চাই যদি শ্রোতা পাই। কিন্তু এমনই সময় এসে পড়েছে যখন সুধু মুখ খুলে কিছু বলে বিশেষ লাভ নেই। যা ইচ্ছা মতামত করে যাও, যদি কেউ তাতে একটু উচ্চবাচ্য করে অম্‌নি তাকে তাড়িয়ে দাও। যে সমাজে আছি, সেই সমাজের কল্যাণ করাই হলো ইচ্ছা, তাড়িত হয়ে, পৃথক হয়ে থাকবার ইচ্ছা নাই, তাই এবার মাত্র সুরু। এই সুরুতেই যদি সমাপ্তি হয় তবে বুঝব, হয় আমার বলার মত শক্তি হয় নাই, নয়ত শ্রোতারও শুন্‌বার মত শক্তি নাই।

চরণ-তরী

শ্রীহেমলতা দেবী

পৃথিবী কেন তোমার চরণ হলো,
চরণ ঘিরে রক্ত-নদী
হাসছে যে ঐ খলো খেলো।
পূজবো চরণ শুদ্ধ জলে
সদ্য ফোটা ফুলে ফলে,
সেই চরণে রক্ত-লীলা
কেমন করে সইব বলো।
যাব আমি তোমার ঘরে
তোমার চরণ বক্ষে ধরে,
রক্তে ধোয়া চরণ ছুঁতে
প্রাণ যে আমার ডরিয়ে গলো
রক্ত যতই বইতে পাবে
শ্যামল শোভা শুকিয়ে যাবে
মরণ-খেলায় ক্ষ্যান্ত দিয়ে
চরণ-ভেলায় পারে চলো।

তরুণ শিল্পী বাসবেন্দ্র ঠাকুর

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বর্ত্তমান যুগে জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বংশ বাঙ্গলার সাহিত্য ও শিল্পের এক প্রধান উৎস। এখনও ঠাকুর বাটীর ছেলে মেয়েরা নিত্য নূতন উদ্ভাবন শক্তিতে বাঙ্গলার সাহিত্য ও শিল্পকে পুষ্ট করিতেছে। বাঙ্গলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাঁহাদের প্রতিভায় বিশ্বে মর্য্যাদা পাইয়া থাকে।

কবি কাব্য সৃষ্টি করিয়া মানব মনের উৎকর্ষ সাধন করে। শিল্পী চিত্র অঙ্কন ও মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। কবি ও রূপদক্ষ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্র ঠাকুর একাধারে কবি ও শিল্পী।

বাসবেন্দ্র ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সাহিত্যরথী ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র। ঠাকুর বাটীর সৌজন্যের, সাহিত্য সেবার, শিল্পানুরাগের ধারা তাঁহার রক্তে ওতঃপ্রোতভাবে প্রবাহিত। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই তিনি কাব্যে ও শিল্পে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেশে ও বিদেশে প্রদান করিয়াছেন। তিন মাস মাত্র লণ্ডন হইতে বাহির হইয়া ছয় সপ্তাহ সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে আফ্রিকা মহাদেশ বেড় দিয়া ভারতে আসিয়াছেন।

প্রায় চারবৎসর পূর্ব্বে ভাস্কর্য্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই লণ্ডনের "রয়েল কলেজ অব আর্টস" শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে কয়েকটী মূর্ত্তি গঠন করিয়া ছিলেন তাহাতেই তাঁহার দক্ষতা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব ভাবে প্রভাবন্বিত নরনারীগণ তাঁহার গঠিত অপার্থিব সুষমা মণ্ডিত মূর্ত্তি গুলি সে দেশের অধিবাসীগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। লণ্ডনের রাজকীয় শিল্পবিদ্যালয়ের উদ্যোগে যে ভারতীয় চারুকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারই হাতে প্রস্তুত 'শান্তি' নামক মূর্ত্তিটী দর্শক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের ১৫ ই ফ্রেবরুয়ারী তারিখের ডেলী এক্সপ্রেস পত্রিকা এই মূর্ত্তির অজস্র প্রসংশা করিয়া লিখিয়াছেন যে এমন সুন্দর সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্য শিল্প, এমন চারুকলা বিশিষ্ট, এমন মহিমামণ্ডিত দেবী মূর্ত্তি এই প্রথম প্রদর্শিত হইল।

শান্তি

রয়েল এম্পায়ার সোসাইটি গৃহে শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধন সময় ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড বলিয়াছিলেন—

"He paid warm tribute to the great contributions of the Tagores to art, and said that he did not think there was in the whole world a more cultured family. We should not go to Bengal for great warriors or greart statesmen, but for that for which warriors fought and statesmen planned—namely, a serene, a beautiful, and a

happy life. The contriutbion which the province had made to art in the widest sense brought credit to the whole of India.

Perhaps when Europe had recovered from the frenzy of brutality which had come over her, and England and France had cleared the way for a more settled order of things, Europe might be readier to accept those rich fruits or the spirit that India was producing in such abundance. * * He both models and carves, and his work shows a more than usually successful attempt to preserve Indian inspiration and feeling in Western technical methods. (The Times, Thursday, January 16, 1940) ইহার অনুবাদ :—

শিল্প জগতে ঠাকুর পরিবারের অশেষ দান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করিয়া বলেন যে তাঁর মতে 'ঠাকুর পরিবারের' চাইতে অধিক সুরুচি ও কৃষ্টি সম্পন্ন পরিবার পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় নাই। বিখ্যাত যোদ্ধা ও বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের খোঁজে আমরা বাংলাদেশে যাব না,—কিন্তু যোদ্ধা যে জন্য যুদ্ধ করেন,—রাজনীতিজ্ঞ যে জন্য পরিকল্পনা করেন—সেই শান্ত, সুন্দর ও মধুর জীবনের সন্ধান মিল্‌বে বাংলাদেশে। আর্টের জগতে বাংলাদেশের দান সমস্ত ভারতের পক্ষে গৌরব এনেছে। ইউরোপ যখন আবার ক্ষিপ্ত বর্ব্বরতা হতে মুক্তি লাভ করবে, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চেষ্টায় সুশৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'বে—তখনই বোধ হয় ইউরোপ ভারতের প্রচুর আধ্যাত্মিক অবদান অধিকতর আগ্রহের সহিত গ্রহণ করবে।

ইনি (শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্র নাথ ঠাকুর) মডেল গঠন ও মূর্ত্তি খোদাই দুইই করেন। এবং ইনি পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্যে ভারতীয় ভাবধারা ও ভারতীয় মনস্তত্ব পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টায় সাধারণের চেয়ে অধিক কৃতকার্য্য হয়েছেন।

ইয়ংহাজব্যাণ্ড সাহেব তাঁহার নিজের একটী আবক্ষ মূর্ত্তি বাসবেন্দ্র ঠাকুর মহাশয় দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছেন। মিসেস্ চেম্বারলেন (তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রির পত্নী) তাঁহার ভাস্কর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটী চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বৃটীশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন বাসুবেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে ভারতীয় চারু কলা (Indian art) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করাইয়া ৩ পাউণ্ড ৩ শিলিং প্রদান করিয়াছিলেন।

শিল্পী ও ইয়ং হাজ্‌বেণ্ড

লণ্ডনের 'মর্ণিং পোষ্ট' দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ১৯৩৭ সালে ১৯শে জুলাই 'রয়েল কলেজ অব আর্টস'এর শত বার্ষিক প্রদর্শনীর ভাস্কর্য্য শিল্পীদের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছে যে—The travalling scholarship for sculp-

ture goes to A. G. King but capital pieces come from B. Tagore. A. R. C. A.

বাসবেন্দ্র ঠাকুরই একমাত্র ভারতীয় শিল্পী যিনি এলেকজেণ্ডা প্যালেসের টেলিভিসনের জন্য শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী স্যর উলিয়াম রীড়-ডিক্, আর, এ বাসবেন্দ্র ঠাকুরের মস্তক নির্ম্মাণ দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—It is post Sculpturesque in the class.

স্যার উইলিয়াম রাদেন্ ষ্টাইন, স্যার ফ্রাঙ্ক ব্রাউণ ও স্যার জন মার্শেল সকলেই তাঁহার ভাস্কর্য্য

পল্লীবালা

শিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গলার শিল্পী গোষ্ঠীর দানে বর্ত্তমান ভারত বাহিরের জগতে একটা বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান লাভ করিয়াছে। এই উদীয়মান শিল্পীর ইংলণ্ডের মর্য্যদা ও সুযশ প্রাপ্তি হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই নবীন শিল্পীর তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও তাঁহার আপন অবদানে নিজস্ব ভঙ্গীতে বাস্তবে রূপায়িত করিবার কৌশল উচ্চ স্তরের কয়েকটী নিদর্শনে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যেমন 'কলসী কক্ষে মৃগ সহচরী পল্লীবালা'। তিনি ফ্রান্স ও ইটালীতে গমন করিয়া ভাস্কর্য্য শিল্পর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

বিলাতের প্রবাসকালে তিনি কেবল ভাস্কর্য্যের সাধনা করিয়াছেন তাহা নহে। বাঙ্গলা ভাষার মহিমা ও ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উদ্যোগে এক সভায় তিনি বাঙ্গলা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান সময়ে (Development of Bengali Literature) বলেন যে Bengali is one of the great expressive languages of the world capable of being the vehicle of as great thing as any speech of man. অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষা পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে একটী প্রধান ভাষা যাহার সাহায্যে যে কোন প্রকার মনোভাব সরল ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। মানবের বাকশক্তি যে কোন উচ্চ চিন্তার মর্ম্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম, তাহার সঠিক প্রকাশের বাহন এই ঐশ্বর্য্য-শালী বঙ্গ ভাষাই উপযুক্ত হইতে পারে। এই কথা ১৯৩৭ সালে বিখ্যাত লণ্ডন টাইম্‌সের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

তাঁহার সাহিত্য অনুরাগ তাঁহাকে গদ্য ও পদ্য লিখিবার শক্তি প্রদান করিয়াছে। এই অল্প বয়সেই তিনি যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন—'মঞ্জু' (কাব্যোপন্যাস), সিগারেট (গল্প কবিতা), পুপের লভ (গল্প) সুরের কবর (কবিতা), ইরিণা (উপন্যাস), ও দ্বিতীয় বিপ্লব (পলিটিক্যাল উপন্যাস) সেইগুলিতে তাঁহার চিন্তা শক্তির এক নূতন ধারা প্রকাশ পাইতেছে। ভাষায় ও ভাবের উপর তাহার বেশ দখলই আছে।

ইণ্ডিয়া সোসাইটীর বার্ষিক রিপোর্টেও বাসবেন্দ্র নাথের সাহিত্য সাধনার কথাও মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণার মাননীয় স্যর ষ্ট্যানলী জ্যাকসন এই সভায় সভাপতি ছিলেন এবং লেডী জ্যাকসন মহোদয়া বাসবেন্দ্র ঠাকুরকে চায়ের বাসরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। লর্ড রণাল্ডসে বা জেটল্যাণ্ড তাঁহার সাহিত্য ও শিল্প সাধনায় মুগ্ধ হইয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

বাসবেন্দ্রর চিত্ত যে কেবল সাহিত্য ও শিল্প সাধনায় পর্য্যবসিত ছিল তাহা নয় এই বিশ্বব্যাপী প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের

তাণ্ডব লীলাতেও তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রায় আট মাস তিনি Auxilary Ambhlance

উদ্যানের এক অংশ

serviceএ অতি দক্ষতার সহিত আহতদের শুশ্রূষাকারী বাহিনীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে বিদায় কালে এই বাহিনীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ রীড তাঁহার পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও তাঁহার দক্ষতার জন্য প্রশংসা করিয়া একটী পত্র দিয়াছেন।

আজ বাঙ্গলার বিষম দুর্দ্দিন, এমন সময়ে বাসবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মতন যুবকের উদারতা, সৌজন্য ও দক্ষতাই বাঙ্গলীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে।

নতে কর আরো নত

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

আর্ত্ত আমি, আর্ত্তপ্রাণ, আর্ত্তরব হৃদয়ে ও মুখে,
শান্তি-সুখে নিশ্চিহ্নতা বুকভাঙ্গা পুঞ্জীভূত দুখে।
কেহত চাহেনা ফিরে, ডাকি যদি কাহারেও কাছে,
দূরে দূরে থাকে তারা মলিনতা-স্পর্শ লাগে পাছে।
একা ভাবি, একা কাঁদি, একা ফেলি একার নিশ্বাস,
রিক্ততা ও তিক্ততায় নরধর্মে গিয়াছে বিশ্বাস।
হোমাগ্নির শিখা তবু এ হৃদয়ে নিবে নিবে জ্বলে,
তাই মনে হয়, আছি দেবতার সিংহাসনতলে।
দুঃখ দিয়ে ভগবান, নরদ্বেষী কোরোনা আমায়,
দগ্ধ প্রাণ, তবু চাই থাকিবারে প্রীতির ছায়ায়।
শিখায়েছ ভালবাসা, শত্রুকেও তাই ভালবাসি,
বেদনায় কাঁদিলেও পরের হাসিতে তবু হাসি।
হৃদয়-সাগরে কর নিস্তরঙ্গ ত্যাগ মহিমায়,
শক্তি দাও উপেক্ষিতে সংসারের যত অবজ্ঞায়।
অভিমান শূন্য কর, পুণ্য কর পাপক্ষত মন,
বিশ্বনাথ বিশ্বপ্রেমে ব্যথিতের ঘুচাও বেদন।
বন্দী চাহে মুক্তি আজি ভালবেসে লক্ষ-আঘাতেও,
নতে কর আরো নত অহংএর শত বাধাতেও।

জ্ঞানের মোহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

(২৮)

—মা!

পুত্রের ডাকে আশা দেবী সামনে আসিয়া বলিলেন,—এত রাত হ'ল যে অরু?

—উষাকে তোমার কাছে এনেছি মা!

বিস্মিত চোখে একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া, উষার হাত ধরিয়া, আশা দেবী বলিলেন—এসো মা—

—উষাকে কাপড় ছাড়তে দাও মা! বলিয়া অরুণ নিজের ঘরে গেল।

—তাই তো! তোমার যে সব ভিজে! বলিয়া আশা দেবী উষার চুলের উপর হাত রাখিলেন।

উষা হেঁট হইয়া তাঁকে প্রণাম করিল।

—থাক্ মা—এসো, কাপড় ছাড়বে।

আশা দেবী আলমারী খুলিয়া নিজের আগের দিনের জামা কাপড় উষাকে দিয়া বলিলেন—এই নাও কাপড়—নাইবার ঘরে গিয়ে পরে এসো—

উষা কাপড় ছাড়িতে গেলে, অরুণ আসিয়া বলিল——উষাকে দেখে তুমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়েছ, মা?

—সত্যি অরু! আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে—কী হয়েছে বল্ তো?

—সন্ধ্যের পর যখন বৃষ্টি এলো, উষা সাতকড়ির অসুখ শুনে দেখতে এসেছিল। আমি তখন ওখানেই ছিলুম। আসবার সময় উষাকে তার বাড়ীতে পৌছে দিতে গেলুম, কিন্তু ওর বাবা উষাকে দেখেই রেগে বল্লেন—"এ বাড়ীতে তোমার জায়গা নেই।" উষা কেঁদে বল্লে—"আপনার মেয়ে আমি কোথায় যাব!"

"আমার কোন মেয়ে নেই" বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। অনেকক্ষণ উষা ডাকাডাকি করলে, কত কাঁদলে, কিন্তু দরজা তিনি কিছুতেই খুললেন না, বা কোন জবাব দিলেন না। আমি ওকে জোর ক'রে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি, মা!

—বেশ করেছিস্ বাবা! ওর বাপের রাগ্ হ'লে বিবেচনা শক্তি একেবারে থাকে না!

—এ রকম রাগ্ কিন্তু মোটেই ভাল নয় মা!

—তা তো নয়ই, বাবা! এই অন্ধকার রাতে মেয়েটাকে যে বাইরে বের ক'রে তিনি দরজা দিলেন, রাগের বশে একবার ভাবলেন না, যে সে কোথায় যাবে!

কিন্তু তিনি ঠিক্ বুঝেছিলেন যে উষাকে ফেলে আমি আস্‌বো না! আমার ওপর রাগ দেখিয়ে, তিনি মেয়েকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিলেন না!

—তোর এতে দোষ কী বাবা!

—তাঁর কাছে যে আমার দোষ ষোল আনাই মা, তা বুঝি তুমি জান না!

—তুই যা বাবার কাছে, আমি দেখি উষার কাপড় ছাড়া হলো কি না।

অরুণকে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—এতক্ষণে এলে নাকি অরু?

—হ্যাঁ দাদু! বলিয়া অরুণ তাঁর শয্যার একপাশে বসিল।

—এই বাদ্‌লার দিনে এত রাত ক'রলে কেন?

আশা দেবী আসিয়া বলিলেন—অরুণ আজ এক কীর্ত্তি ক'রে এসেছে, বাবা!

—জনার্দ্দনের সঙ্গে হাতাহাতি নাকি? বলিয়া ঘোষাল মহাশয় অরুণের দিকে চাহিলেন।

—হাসিয়া অরুণ বলিল—না, তবে প্রায় কাছাকাছি!

—বলো দেখি, ব্যাপার কী?

—মার কাছ থেকে শুনুন দাদু!

ঘোষাল মহাশয় বধূর দিকে চাহিলেন।

আশা দেবী বলিলেন—উষার বাবা তাকে আজ বাড়ী ঢুক্‌তে দেয় নি!

—কেন, সে গিয়েছিল কোথায়?

—জগন্নাথ বাগদির ছেলেকে দেখতে!

—কখন?

—যখন বৃষ্টি আসে—

—জনার্দ্দন জান্‌ত না বুঝি?

—না! জান্‌লে কী আর তিনি যেতে দিতেন! তাই ত উষা লুকিয়ে গিয়েছিল! আসবার সময় অরুণ পৌঁছে দিতে যায়, কিন্তু উষার বাবা উষাকে খুব বকে দরজা বন্ধ ক'রে দেন। কিছুতেই দুয়োর খোলেন নি। একে রাত, তায় এই বৃষ্টি, কাজেই অরুণ তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে!

বিস্মিত কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—এঁ্যা! উষাকে তুমি নিয়ে এসেছ, অরু?

—হ্যাঁ, দাদু!

—কিন্তু ভারী চিন্তায় ফেল্‌লে যে—জনার্দ্দন তো সোজা লোক নয়! তায় তোমার ওপর সে চটে আছে!

—কিন্তু উষাকে সেই রাস্তার মধ্যে ফেলে আসাই কি উচিত হতো, দাদু?

—না তাও হো'ত না অরু! কিন্তু কথা হচ্ছে উষাকে নিয়েই! জনার্দ্দন তার বিয়ের ঠিক ক'রেছে—এ সময় রাত্রে তোমার সঙ্গে উষার চলে আসায় বিশ্রী একটা কথার সৃষ্টি হবে গাঁয়ে, তাতে ঐ নিরীহ মেয়েটারই মুস্কিল! এখন পাত্র পক্ষ বেঁকে না বসে, আমি তাই ভাবছি!

—এতে দোষের কী আছে, দাদু! আমি তো তাকে মার কাছে বাড়ীতেই এনেছি!

—তোমার কথা আমি বুঝ্‌ছি, অরুণ! কিন্তু সমাজ যে বড় কড়া কিনা!

আশা দেবী বলিলেন—ও সব কথা নিয়ে ভাববার কোন দরকার নেই, বাবা! সে ব্যবস্থা আমি করব!

—তুমি কী করবে, বৌমা?

—গাঁয়ের লোক যাতে বোঝে, যে উষাকে আমি নিজে এনেছি, তাই কর'ব, বাবা!

—তা কী ক'রে করবে, মা?

—সে কাজ হরির মাই করবে বাবা!

—হাঁ বৌমা! তা যদি তুমি করতে পার, তাহ'লে গ্রামের কুৎসার হাত থেকে উষা রক্ষা পাবে বটে কিন্তু তার বাপের রাগ তাতে কমবে না।

—উষাকে আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাব, বুঝিয়ে বলবো, যাতে তিনি তাকে ক্ষমা করেন।

—কিন্তু তা যদি সে না করে মেয়ে যদি সে ত্যাগ করে. তা হ'লে উষাকে নিয়ে তুমি কী করবে মা?

—সত্যিই যদি উষার বাবা মেয়েকে ত্যাগ করেন, তাহ'লে আমি তাকে বরণ করে ঘরে তুলব, কিন্তু রাস্তায় বার ক'রে দিতে পারবো না বাবা!

—আর আমার কোন ভাবনাই নেই বৌমা, এবার তোমার উষাকে নিয়ে এসো, দেখি একবার!

আশা দেবী উষাকে আনিয়া বলিলেন—ইনি আমার বাবা, উষা!

উষা ঘোষাল মহাশয়কে প্রণাম করিতে তিনি তার হাত ধরিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি, তুমী সুখী হও! এসো আমার কাছে।

(২৯)

পণ্ডিত ননী গোপালকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তার দাদার সঙ্গে দুপুরে আসিয়া সে শুনিল, যে উষাকে তার পিতা রাগ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং জমীদার গিন্নি তাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাড়ী লইয়া গিয়াছেন।

সে রাগিয়া পণ্ডিতের কাছে গিয়া বলিল—

—এ সব কী কথা মামা!

—কীসের? বলিয়া পণ্ডিত কলিকায় ফুঁ দিতে লাগলেন।

—আমার ভাবী স্ত্রীকে—বুড়ো নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে?

—তাড়িয়ে দিয়েছে, কি উষা নিজে গিয়েছে তা আমি জানিনে! বলিয়া পণ্ডিত ধুমপানে মন দিলেন।

—যাই হোক! আমার মত নেওয়া তাদের উচিত ছিল!

—কাদের ?

—ঐ বুড়ো পুরুত, আর তোমাদের জমীদার গিন্নির, আমি অমনি ছাড়ছিনে, তা তুমি দেখে নিও মামা!

—থাম ননী, বেশী ভ্যাবভ্যাবানী দেখাস্‌নে! জানিস্‌নে তো জনার্দ্দনকে, এখনও কোন রকমে খোসামদ্‌ করলে, বিয়েটা হ'তে পারে, কিন্তু তুই যদি এমনি গোঁয়ারতুমী করিস্‌, তা হ'লে শিশুপালের মত বাড়ী ফিরে যেতে হবে, তা মনে রাখিস্‌।

—ও খোসামদ টোসামদ্‌ আমার দ্বারা হবে না মামা! বৌয়ের বাপের খোসামদ্‌ করবে ননী গোপাল। সে ছেলে আমি নই!

—ব্যাটা, আহাম্মক! উষার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে না কি, যে জনার্দ্দন তোর বৌয়ের বাপ।

—ও একরকম হওয়াই।

—হাঁ, হওয়াই! ব্যাটা গাধা কোথাকার! মনে করলুম, পেটে বিদ্যে নেই ঘটে বুদ্ধি নেই, শেষটায় দুটো খেতে পাবিনে, তাই, জনার্দ্দনকে কত করে রাজী করেছিলুম। তোর ভাগ্যে নেই, তা আমি করবো কী।

—আচ্ছা মামা! আমি আর কিছু বলবো না। তুমি যেমন করে হয় বিয়েটা দেওয়াও আমার। বুড়োর মেয়েটা সত্যি খুব সুন্দর মামা। আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।

—আচ্ছা পাগল তো তুই। আমি না তোর গুরুজন।

—গুরুজন তো কী, সত্যি ব'ল্‌'ব তাতে ভয় কীসের।

—তোর সঙ্গে উষার বিয়ে না হওয়াই ভাল। আমি যেমন,—বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা দিতে গিইছিলুম।

—বাঁদর কীসে আমি; তোমরা তো আমার কোন গুণই দেখতে পাও না

—হ্যা, তুমি যে গুণের জাহাজ।

—তা যদি না হতুম, তো তোমার ঐ পণ্ডিত মেয়ে দিতে রাজী হোত, মামা?

—খুব হয়েছে? চুপ কর্‌। বলিয়া পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—দোহাই মামা! রাগ করো না, তোমার পায়ে পড়ি আমি স্বীকার করছি যে আমার গুণ নেই—তুমি কোন রকমে ঐ মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়েটা দিয়ে দাও।

—ভাগনের পিঠে ধীরে ধীরে থাবা দিয়া পণ্ডিত বলিলেন—ব্যস্ত হোস্‌নে, তোর মামা কি নিশ্চিন্ত আছে রে!

—আচ্ছা মামা! বুড়ো যদি তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না দেয় তাহ'লে তার ঐ দোপড়া মেয়ে আর কে বিয়ে করবে?

—সাধে কি তোকে মুখ্যু বলিরে? শুনছিস্‌ কী তবে! সে এখন জমীদার বাড়ী—ওরা ওদের পাল্টা ঘর; উষা অমন সুন্দরী, আমার মনে হয়, এর মধ্যে কিছু কথা আছে, জনার্দ্দনের ও সব তাড়িয়ে দেওয়ার কথা টথা মিথ্যে, হয়তো জমীদার গিন্নির উষাকে পছন্দ হয়েছে! কোন্‌দিন শুনবো হয়তো জমীদারের নাতির সঙ্গে তার বিয়ে।

—ননী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের ওপর হাত দিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিল,

—আমি তাহ'লে আদালত ক'রব, মামা? তোমার জমীদারকে অমনি ছাড়'ব না। উষা আমার বাক্‌দত্তা, তার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার?

—থাম্‌ বাপু! খুব আস্ফালন হয়েছে!

—আস্ফালন্‌ করবো না! বলো কী মামা! এ কী মগের মুলুক না কী! ও মেয়েকে আমার বিয়ে করা চাই-ই!

—তাই করিস্‌ বাপু আর জ্বালাস্‌নে। বলিয়া পণ্ডিত ভিতরে গেলেন।

(৩০)

উষার ভোরে ওঠা চিরদিনের অভ্যাস্‌। নূতন জায়গায় রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, দীনু বৈরাগীর প্রভাতী টহল্‌ কাণে যাইতে সে উঠিয়া বসিল। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমীদারবাড়ী তখনও নিশুতি। নীচে নামিয়া সে ফুলবাগানে গেল। দূরে তখনও দীনু বৈরাগীর হাতের খঞ্জনীর সঙ্গে কণ্ঠের গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া-

ছিল। কিন্তু তার তাণ্ডব নৃত্যের নিদর্শন তখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। লাল টক্‌টকে মিহির পূর্ব্বদিকে দেখা দিতেই, তার সোনালী রোদে, বসুমতীর বুক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উষা চাহিয়া দেখিল সেইদিকে—এ সময় সে নদীতে স্নান সারিয়া বাগানে ফুল তুলিত, রাধাগোবিন্দের জন্য—আজ সে এখানে, তার সে কাজ কে করিবে। পিতা তার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে জপে বসেন। গৃহ দেবতার সকল কাজই পড়িয়া আছে? উষা কী আর তাহা করিতে পাইবে না। তার সেই চিরপরিচিত স্থানে যাইতে পাইবে না। সত্যই কী তার বাবা আর তাকে সে বাড়ীতে ঢুকিতে দিবেন না। উষার চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অরুণ আসিয়া উষার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—এখানে কী করছ উষা? চলো মার কাছে—

উষার জবাব না পাইয়া সাম্‌নে আসিয়া অরুণ বলিল—

—এ কী, তুমি কাঁদছ! আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগছে না, উষা?

—আমাকে মাপ করবেন—আপনাদের ঋণ আমার চিরদিন মনে থাকবে। এখানে আমার দুঃখ কিছু নেই, কিন্তু বাবা যে আমাকে ছেড়ে কোনদিন থাকেন নি—তাঁকে দেখবার কেউ নেই। কে আজ বাবাকে খেতে দেবে? তিনি হয়তো আজ না খেয়েই থাকবেন! বলিয়া উষা কাঁদিতে লাগিল।

—শান্ত হও, উষা! বুঝতে পেরেছি আমি, আজই তোমাকে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব, দে'খ যদি ক্ষমা পাও।

—হ্যাঁ, তাই দিন। বাবার ক্ষমা না পেলে আমি কিছুতেই শান্তি পা'ব না। আমি জানি, আমার ওপর তিনি অত রূঢ় থাকতে পারবেন না।

—এখন চলো, মাকে বলি তিনিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?

—আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

—না উষা! একা তোমাকে যেতে দেব না!

—কেন?

—তোমার বাবার রাগ নিশ্চয় এখনও কমেনি। যদি তিনি কাল রাতের মত ঢুক্‌তে না দেন বাড়ীতে, তখন তুমি কী করবে?

—না না, অমন কথা ব'লবেন না।

—না তা বলছিনে। তুমি চলো এখন স্নান্ করবে; তোমার সকালে নাওয়া অভ্যেস্।

—যাচ্ছি, কিন্তু কখন যাব আমি বাবার কাছে?

—মাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে বলবো তোমাকে।

—এখন গেলে হয় না?

—বলনুম্ তো তোমাকে, মাকে জিজ্ঞেস্ না ক'রে কিছু বল্‌তে পারছিনে।

—কিন্তু এখন না গেলে যে রাধা গোবিন্দের পুজোর জোগাড় হবে না, জানেন তো আপনি।

—জানি উষা। কিন্তু সে চিন্তা তোমার এখন নেই। তোমার বাবা তার ব্যবস্থা করবেন।

—বাবা কী ক'রে করবেন! সে সব যে আমার কাজ? তিনি তো এ সময় জপ করেন!

—কিন্তু আজ তিনি নিজেই তোমার কাজগুলি করবেন, উষা!

—তা হ'লে বাবার যে বড্ডো কষ্ট হবে।

—তা হ'লে আর উপায় কী—এ কষ্ট যে তিনি নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছেন।

আশা দেবী আসিয়া বলিলেন—তুমি এখানে রয়েছ মা! আমি বলি—কোথা গেল। স্নান, টান্ হয়েছে?

অরুন বলিল—না মা। এখনও ওর কিছুই হয় নি, কিন্তু খুব ভোরেই উষার নাওয়া অভ্যেস্।

—তবে এসো মা, আর দেরী করো না। কাল রাতে তো কিছু খাও নি। নেয়ে কিছু খাবে।

উষা বলিল—এত সকালে আমার খাওয়া অভ্যেস্ নয় মা!

—তা হোক্। সে আমার কাছে চল্‌বে না, উষা। সেখানে তুমি নিজে যা হয় করতে—

অরুণ বলিল—উষার এখানে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, মা। ও ওদের বাড়ী যেতে চায়।

—তা যাবে বই কী! এখন এসো মা—বলিয়া আশা দেবী উষার একখানি হাত ধরিলেন।

(৩১)

উষাকে বিদায় দিয়া সে রাত্রে জপার্দ্দন ঘুমাইতে পারিলেন না। বিনিদ্র নয়নে সারারাত্রি তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারী করিয়া কাটাইলেন। অরুণ যে উষাকে লইয়া গেল, তা তিনি জানালা হইতে দেখিয়াছিলেন। অরুণের উপর রাগে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বালা করিতে লাগিল। তার জন্য আজ উষা অবাধ্য হইয়াছে! তাঁর পুত্র নাই, কিন্তু উষাকে দিয়া তাঁর সে ক্ষোভ মিটিয়াছিল। তাকে তিনি পুত্রের ন্যায়ই শিক্ষা দিয়াছিলেন। উষার অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন, কিন্তু সে অভিসারিকার মত কেন আসিল।

দীনু বৈরাগীর ভোরের গান কাণে আসিতে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দীনুর গান শুনিতে লাগিলেন। রোজ সে এই সময়ে গান গাহিয়া যায় বটে, কিন্তু কোন-দিনই জনার্দ্দন তা কান দিয়া শোনেন না, আজ তার গানটি তাঁকে মুগ্ধ করিল। গানের কথাগুলির মধ্য দিয়া কিসের যেন সন্ধান তিনি পাইলেন।

স্নান সারিয়া পূজার ঘরে গিয়া অনভ্যস্ত হাতে ঠাকুরের কাজে মন দিলেন, কিন্তু কিছুতেই আজ তিনি পূজায় মন দিতে পারিলেন না,—উষার কথাই আজ তাঁর মনে আসিতেছিল। রাগের বশে প্রাণসম কন্যাকে সেই দুর্য্যোগের মধ্যে বাড়ী ঢুকিতে না দিয়া, আজ তাঁর মনে একটুও শান্তি ছিল না। রাত্রির ক্রোধ প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চলিয়া গিয়াছিল! আসিয়াছিল সেখানে অপত্যস্নেহ! তার উপর দীনু বৈরাগীর গানের কথাগুলি তাঁর মনে শিকড় গাড়িয়া বসিল। **"সকল মানবই যে ভগবানের সন্তান"** এ কথা তো তিনিও কতবার পড়িয়াছেন, তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে, কিন্তু কই সে কথা তো মনে হয় নাই কোনদিন! অরুণ বলিতে আসিলে ও কী এক অন্ধ মোহে এ কথা তিনি কাণে তোলেন নি! সত্যই তো! কীসের অধিকারে ভগবানের দর্শন থেকে অপরকে বঞ্চিত করেন! যে নামের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই, ভগবানের সেই নাম লওয়ার পর আর কী কেউ অপবিত্র থাকিতে পারে! প্রাণ ভরা বিশ্বাস নিয়ে, ছুটে এসেছে তারা; অন্ধ সংস্কারে রূঢ়ভাবে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি! সেদিন যদুর কথা মনে হইতে অনুশোচনায় বুক তাঁর ভরিয়া উঠিল। উষা তাঁর কন্যা হইলেও তাঁর হইতে অনেক বোঝে! তার শিক্ষা সার্থক হইয়াছিল! বৃথাই তিনি নিজের পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিয়াছেন এতদিন!

পণ্ডিত আসিয়া বলিল—এখন ও পূজো শেষ হয় নি আপনার?

জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিস্মিত পণ্ডিত তাঁর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি কাঁদছিলেন?

—একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া জনার্দ্দন হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—না, কাঁদব কেন।

—ঠাকুরের এখনও ভোগ হয় নি বোধ হয়?

—না, এই তো পূজো ক'রে উঠলুম্!

—এত বেলা হ'ল কেন?

—বেলা কী খুব বেশী হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! দুটো বাজল!

—ওঃ! তা হ'লে যাই, ঠাকুরের ভোগের জোগাড় করি!

—এখনও কি পাক্ হয় নি?

—না।

একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—শুনলুম্, উষা না কী জমীদার বাড়ী গেছে?

—হুঁ।

—বিয়ে কী তা হলে ও বাড়ী থেকেই হবে?

—এখন আমার ও সব আলোচনা করবার অবসর নেই পণ্ডিত। আমি চললুম, ঠাকুরের ভোগ দিতে হবে! বলিয়া জনার্দ্দন ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সেইদিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া আপন মনে বলিলেন—না, সুবিধে বোধ হচ্ছে না—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কোন প্রকারে ভাতে ভাত নামাইয়া, জনার্দ্দন যখন ঠাকুরের ভোগ দিলেন, তখন অপরাহ্ন গড়াইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের প্রসাদ একদিকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া, তিনি অলস ভাবে মাতুরের উপর শুইয়া পড়িলেন। যে উষাকে দূরে রাখিবার ভয়ে তিনি ননীগোপালের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেছিলেন, আজ তাকে ছাড়িয়া সমস্ত দিন যে তাঁর কী কষ্ট যাইতেছে, তা তিনিই জানেন। উষা তাঁর আদরের স্নেহের দুলালী; তাকে তিনি নিজে রাস্তায় রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হু-হু করিয়া জনার্দ্দনের চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

পায়ের ওপর মৃদু নরম হাতের পরশ পাইলেন। ঠিক্ যেন তাঁর উষার! এমনি করিয়া সে প্রতিদিন দুপুরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইত!

—বাবা! কম্পিত উষার স্বরে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বাবা! আমাকে ক্ষমা করুন, বলিয়া উষা পিতার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া কাদিতে লাগিল।

—এঁ্যা এ কে! অরুণ!…আপনি! আপনিও এসেছেন! বলিয়া জনার্দ্দন আশা দেবীর দিকে চাহিলেন।

আশাদেবী বলিলেন—আপনার উষাকে দিতে এলুম্! ওকে সান্ত্বনা দিন! কাল রাতে অরুণ যখন থেকে ওকে নিয়ে গেছে, উষা কেঁদে সারা হচ্ছে, আপনি ওর ওপর রাগ করেছেন বোলে!

—সন্তানের ওপর রাগ করা বড় কঠিন। তোর বাবা যে প্রতিটা মুহূর্ত্ত তোর আশাপথ দেখছে মা! বলিয়া জনার্দ্দন কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন। তারপর আশা-দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুধু উষাকে দিলেই তো হবে না, বৌরাণী! উষা যে অরুণের ছায়া! উষা আর অরুণ তো পৃথক্ নয়—দুয়ে মিশে ওরা আজ আমার কাছে এক হ'য়ে গেছে!

অরুণ ভাবিল—একী সেই জনার্দ্দন!

সমাপ্ত

বদরিকাশ্রম ভ্রমণ

শ্রীনির্ম্মলাসুন্দরী বসাক

সুপবিত্র বদরিকাশ্রম দর্শন মানসে, বহুদিন অবধি শত আশা ও আশঙ্কা লইয়া দেবতার মন্দিরে একান্ত মনে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণত হইয়াছিলাম।

কবে সেই নির্ম্মল প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকের মত তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম স্থানে সমগ্র বিশ্বের বাঞ্ছিত দেবতা হরিহরের পবিত্র মন্দির দর্শনে নয়ন সার্থক করিব, ইহাই ব্যথিত হৃদয়ের এক-মাত্র কামনা ছিল।

একদিন মনস্থ করিলাম, সেই পবিত্র স্থান দর্শনে নিশ্চয় বাহির হইব, কিন্তু কেমন করিয়া বাহির হইব, কে আমায় সেই দুর্গম পথে লইয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলাম।

একদিকে সেই স্থান দর্শনের প্রবল আকাঙ্খা আর অপর দিকে কে সে স্থানে লইয়া যাইবে তাহাও মহা-সমস্যা।

এমনি করিয়া একজনকে কোন প্রকারে বদরিকাশ্রম লইয়া যাইতে সম্মত করাইলাম।

প্রাণ বেশ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং কবে দর্শনে বাহির হইব, কি দ্রব্য দেবতার চরণে সমর্পন করিব, ইহাই তখন একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

মনে মনে কত প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়া পুলকিত মনে সুখস্বপ্ন গড়িলাম।

হঠাৎ একদিন সেই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। যে আমাকে সেস্থানে লইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সে লইয়া যাইতে অক্ষম হইল।

আমি আর একজনকে আমায় বদরিকাশ্রম লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম।

সে প্রথমে আমাকে আশ্বাস দিয়া, পরে লইয়া যাইতে অসম্মত হইল।

আমি তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। এমনি হতাশায় দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

আমি কর্ত্তব্য বোধে নীরবে সকল কার্য্য করিতাম, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই একটি বাসনা মনে জাগিয়া উঠিত।

তবে বুঝি আর এ জীবনে সেই পবিত্র নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন হইল না।

নারী জীবনে কোন আশা কি পূরণ হইবার নয়? শুধু কি ব্যর্থতা হীনতা পরাধীনতার জন্যই নারীর জন্ম?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্যর্থতার মধ্যেই দিনের পর যত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই আমার প্রাণ ভগবানের দর্শন আশায় ব্যাকুল হইতে লাগিল। মন যেন ততই প্রভূত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল।

এই একান্ত চিত্তের ব্যাকুল কামনা যে সত্যই একদিন ভক্তাধীন ভগবানের করুণাদ্বার উন্মুক্ত করিতে পারে, তাহা প্রকৃত রূপে সম্ভব বলিয়া আমার ধারণা ছিল না।

কিন্তু আজ তাহা এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয় অটল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইল। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। সারা বিশ্বমাঝে তাঁহারি অপার মহিমার প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

আমি ত বদরিকাশ্রম যাত্রার সকল আশা ত্যাগ করিয়া নীরবে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিয়া ছিলাম। অকস্মাৎ একদিন স্বাতী নক্ষত্রের একবিন্দু বারির মতই শুভ মুহূর্ত্তে আমাকে শ্রবণ করাইল, যে আমার শুভার্থিনী স্নেহময়ী জেঠাইমা শীঘ্রই আমার প্রার্থনীয় স্থান বদরিকাশ্রম দর্শনে বাহির হইবেন।

এই শুভবার্ত্তা দৈববাণীর মতই আমার অন্তঃকরণকে প্রফুল্ল করিয়াছিল। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম, ইহা অলীক না সত্য?

এইবার দৃঢ়তা সহকারে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, সেস্থানে যাইবই।

নানা প্রকারের বিঘ্ন ও বাধা সেই বিদ্রোহী মনকে পরাভব করিতে অক্ষম হইল।

পরে সবিশেষ সংবাদে জ্ঞাত হইলাম ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কয়জন উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে বাহির হইতেছেন, তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া জ্যেঠাইমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তাই তিনি ভ্রমনোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া, তাঁহাদের সহিত সানন্দে বাহির হইতে মনস্থ করিয়াছেন।

আমি ও আভাসে তাঁহার সঙ্গী হইতেছি জানাইয়া, সেস্থানে লইয়া যাইবার উপযোগী সামগ্রী সংগ্রহে অতিশয় মনোযোগ দিলাম। এমনি করিয়া কিছুদিন গত হইবার পর, এক সুপ্রভাতে যাত্রার সেই আকাঙ্খিত দিনটি আসিল।

তখন আত্মীয়েরা বারাণসীতে ছিলেন। আমিও সেস্থানে গমন করিতে প্রস্তুত হইলাম। যাত্রার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

আমি সেই সময় প্রেমানন্দে মন্দির মধ্যস্থিত গৃহদেবতার চরণে ভক্তি শ্রদ্ধা মিশ্রিত গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, জননীর চরণে প্রণত হইয়া, সুদূর তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমাকে বারাণসী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে আমার একটী ভ্রাতাকে সাথী করিলাম। ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছি, গাড়ীতে অপর যাত্রীর কোলাহল নাই।

ট্রেণ হুহু শব্দে ছুটিয়াছে কেবল ভ্রাতা ও ভগিনী নীরবে ট্রেণের বাতায়ণের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছি। এই ভ্রাতা ও ভগিনী কি পবিত্র সম্বন্ধ! স্বার্থলেশহীন, স্নেহের আদান প্রদানে উভয়েরই অন্তর এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ, ইহা জগতের মধ্যে একটী দুর্ল্লভ কাম্য বস্তু। এই সময় গাড়ীর ভিতর গভীর নির্জ্জনতা বিরাজ করিতেছিল। আমি কোথায় যাইব? বিশ্বনাথের রাজধানীতেও বহুবার গমন করিয়াছি, কিন্তু এবার যেন মন অন্যভাবে ভরিয়া উঠিল। তবে কি, সত্যই আমি সেই প্রার্থিত স্থান দর্শনে চলিয়াছি! তাহা যেন কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আত্মহারা হইয়া, নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছি। সেদিন আমার মনের মধ্যে কত বিচিত্রভাবের উদয় হইতেছিল।

এমন সময় বাহিরের দৃশ্যগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

গ্রীষ্মকাল; বাহিরে রৌদ্রের উত্তাপে বিস্তীর্ণ মাঠ গুলির দূর্ব্বাঘাস নির্জ্জীব প্রায় হইয়াছে। ট্রেণ তাহার উপর দিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় নয়ন-গোচর হইতেছে।

তাহা অধিকাংশই শুষ্ক প্রায়।

চতুর্দ্দিকে বহুবিধ বৃক্ষ শ্রেণী রহিয়াছে। কোথাও বৃক্ষগুলিতে ফলপুষ্প পূর্ণ আবার কোথাও বা বৃক্ষগুলির পত্র একেবারে শুষ্ক হইয়াছে।

আমার মনে হইল এই বৃক্ষগুলি বুঝি অলসভাবে উদাস নয়নে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে। এতটুকু বারি বর্ষনেই যেন তাহাদের জীবন সজীবতা প্রাপ্ত হইবে।

এই গ্রীষ্মেও রাখালেরা গোচারণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ নাই। পল্লীগ্রামের এক একটী ক্ষুদ্র কুটীর দূর হইতে দৃষ্ট হইতেছে।

পল্লী বধূরা কলসী কক্ষে সলজ্জ ভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া মন্থর গতিতে জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ছোট বালক বালিকারা উৎফুল্ল চিত্তে বিবিধ খেলায় মগ্ন রহিয়াছে। কেহবা খেলা ফেলিয়া চলন্ত ট্রেণের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

এমনি সময় একপশলা বৃষ্টি বর্ষণ হইল, ধরণীকে একটু শীতল করিল এবং তাহার সহিত মৃদু মৃদু বায়ু ও বহিয়া আসিতে লাগিল।

এই সময় সায়ংকাল সমাগত হইল সন্ধ্যাকালের লোহিত রঞ্জিত মেঘমালার হিরণ আভা পরিব্যাপ্ত হইয়া, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিল। তখন আমার অন্তর মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত নূতন হইতে নূতন-তর পুলকধারায় অভিষিক্ত হইতেছিল।

আমি ক্ষণপরে নিদ্রাভিভূত হইলাম। ভোরের স্নিগ্ধ-সমীরণ স্পর্শে ও পক্ষীর কাকলিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম, বারাণসী আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই, নিকটেই জাহ্নবীর সেতু। যখন সেতুর উপর পৌছিলাম, তখন প্রভাতের আলোকরশ্মি জগতে প্রকাশিত হইয়া জাহ্নবীর সৌন্দর্য্যকে অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল।

আমি পতিতোদ্ধারিণী জননী জাহ্নবীকে দর্শন করিয়া, ভক্তিপ্লুত নয়নে তাঁহার মানস পূজা করিতে করিতে ৺বিশ্ব-নাথের রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলাম। তখন মুক্তির আনন্দে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিল।

আমি সে স্থানে পৌছিয়াই তৎক্ষণাৎ তড়িৎগতিতে জাহ্নবীর নিকট গমন করিয়া, তাহাতে অবগাহন স্নান করিলাম। এবং ৺অন্নপূর্ণাকে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি সাদরে অর্পণ করিয়া, তাঁহাদের চরণারবিন্দে প্রণত হইলাম।

আর সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীদের পদরজঃ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, আবার নির্দ্দিষ্ট পথে তীর্থাদিমুখে বাহির হইলাম।

এইবার হর বা হরির দ্বার স্বরূপ হরিদ্বারে পৌছিলাম। কণ্খলের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা আমাদেরকে সমাদরে সেখানে লইয়া গেলেন। কয়দিন সেখানে বাস করিয়া, দর্শনীয় বস্তু দর্শন ও বিশ্রাম করিলাম।

পরে একদিন বিমল প্রভাতে আমরা পরহিত ব্রতধারী সন্ন্যাসীদের সহিত দেবপ্রয়াগে রওনা হইলাম।

এইবার যে কি তৃপ্তি তাহা অবর্ণনীয়, ভাষা সর্ব্বদা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব?

যখন অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সেই অপূর্ব্ব তরঙ্গ সঙ্গম দর্শন করিলাম তাহা যেন অনিমেষ নেত্রে দর্শনেও মন তৃপ্ত হইতে ছিল না। যদি এই পবিত্র নীর-সঙ্গমে শরীরের এতটুকুও কণা প্রয়োগ করিতে পারিতাম, তবে বুঝি জন্ম মৃত্যু রহিত যে অব্যয় শাশ্বত স্থান তাহাই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইত।

এই মনন করিয়া, নিজের মস্তকের বহুদিনের সযত্ন রক্ষিত অলকগুচ্ছগুলি মুণ্ডণ করিয়া, সেই স্রোতস্বিনীর সঙ্গম স্থলে স্বহস্তে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। তাহা ক্ষণিকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। আমি তাহাতে পরমা-নন্দ লাভ করিলাম।

এই স্থান হইতে বদরিকাশ্রমের পথের প্রাকৃতিক শোভা আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা পথের মধ্যে বিল্বকেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম।

এখানে অর্জ্জুন শঙ্করের আরাধনায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

আজ সেই নির্ভীক ও ভক্ত অর্জ্জুন কোথায়? কিন্ত তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমরত্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তাঁহার সেই বীরত্বব্যঞ্জক তেজস্বিতা, সখ্যভাবে ভগবৎপাদপদ্মে একাগ্র আত্মনির্ভরতাকেই কেন্দ্র করিয়া মহাভারত রচিত হইয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। মহাভারত অর্জ্জুনকেই শ্রেষ্ঠ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া কমলেশ্বর মহাদেবের দর্শন হইল। উহারি নিকটে কপিলদেব আপন মাতা দেবহূতির প্রশ্নে তাঁহাকে বৈরাগ্য সমন্বিত সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সকল দেবদেবী দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রগামী হইতে লাগিলাম।

সেখানে পথের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর। সূর্য্য উদিত হইবার সময় আকাশে সোনালী আভায় শৈলশৃঙ্গের উপরের কিছু স্থান লোহিত বর্ণ ধারণ করে, তাহা দূর হইতে দৃষ্ট হইলে একখানি অঙ্কিত চিত্রপটের মত অনুভব হয়।

পর্ব্বতের ধারে ধারে বহুনিম্নে অলকানন্দা বক্রগতিতে কোন স্থানে বিস্তারিত ও কোন স্থানে ক্ষীণকায়া জলরেখাটির মতই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পরপারে পার্ব্বত্যপথ সঙ্কীর্ণ রেখাটির মতই আঁকিয়া বাঁকিয়া কখন কখন নিম্নে নামিয়াছে। বুঝি পর্ব্বত ও গঙ্গার এই অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শনে পুরাকালের যোগী-ঋষিগণ গভীর আত্ম নির্ভরতা পূর্ণ কঠিন তপস্যা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক সাধন ভজনের ইহাই প্রকৃত স্থান, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সেই সকল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের ছোট কুটীর গুলি আজ কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্ত সেইস্থান দর্শনে এখনও পুরাকালের স্মৃতিগুলি স্বপ্নালোকের মত নয়ন সম্মুখে ভাসমান থাকে। কোথায় আজ সেই প্রশান্ত দীপ্তিশালী মহাপুরুষেরা যাহারা যুগে যুগে কঠোর তপস্যায় নির্ব্বানপদ লাভ করিতে সহাস্যবদনে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেন। শাখে শাখে বহুবিধ পক্ষীর প্রাণমাতান স্বর পথিকদের শ্রান্তিক্লান্তি, ও অবসাদ দূরীভূত করে।

রুদ্র প্রয়াগে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী ও অলকানন্দার অপূর্ব্ব সঙ্গম, ইহাই যে হরিহরের প্রকৃত মিলন স্থান। এখানে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেরই সেই মিলন দৃশ্য দর্শনে ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়।

প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠে।

এই তোয়ধারা সমূদ্র গর্জ্জনের মত গুরুগম্ভীর শব্দে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; ইহার শোভা অতীব মনোমুগ্ধকর।

যেদিন পুনরায় গুপ্ত বারানসীতে পৌছিলাম সেদিন করপুটে তাহার রজকণার উপরে লুণ্ঠিত হইয়া উদ্দেশে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে শ্রদ্ধা জানাইলাম। ইহা দ্বিতীয় বারানসী। এস্থানে মনিকর্ণিকা কুণ্ড আছে, তাহাতে শৈল শঙ্কটের গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখে গঙ্গার এবং যমুনেত্রী হইতে হস্তীমুখে যমুনার পয়োধারা আসিয়া সেই কুণ্ডে পতিত হইতেছে।

গুপ্ত বারানসীতে গুপ্তদানের মাহাত্ম্য আছে।

সারাদিবস এই সকল কর্ম্মে অতিবাহিত হইল। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যারাণী উপস্থিত হইলেন। ৺বিশ্বনাথ মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গম্ভীর শঙ্খধ্বনি দেবতার মঙ্গলে আশীর্ব্বাদ প্রচার করিল।

ভক্তেরা মধুরস্বরে জগজ্জননীর স্তুতি গাহিলেন। সেই মা—মা ধ্বনি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া আমার অন্তরে বাহিরে নবভাবের আবেশ আনিয়াছিল।

আহা ‘ মা”—মা কি প্রাণস্পর্শী অমৃতময়ী বাণী; আমি নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিলাম। আরতির ঘণ্টা থামিয়া গিয়াছে।

যাত্রীর কোলাহল নীরব হইয়াছে। সহসা বাহির হইতে একটী সাধক গাহিয়া উঠিলেন—

ওহে ত্রিভুবন পতি তুমি অগতির গতি
মহিমা তব নাহি জানি আমি
জ্ঞানহীন মূঢ় অতি জানিনা করিতে স্তুতি

শাস্ত্র বলে আছ তুমি তবু অন্ধ হয়ে আছি
ভক্ত হৃদয়ে বিরাজিছ তুমি
একবার কৃপাকরি দাওগো চরণ তরি-
পাই যেন তোমা জীবন ভরি।

সেই সময় পশ্চাৎ হইতে কোমল কর স্পর্শে চাহিয়া দেখিলাম,

আত্মীয়েরা আমাকে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আহ্বান করিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

সাধক তখন করুণস্বরে সেই গানটি গাহিতেছিলেন।

পর্ব্বতের দুই পার্শ্বে পথ একধারে কেদারখণ্ড অন্যধারে ত্রিযুগী নারায়ণ; প্রথমে ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করিলাম। এখানে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই ত্রিযুগ ভগবান নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। দেবতার সম্মুখে একটী বেদী আছে, তাহাতে সেবকবৃন্দ সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। এইরূপ প্রবাদ।

রাবণের চিতার মত ইহাও চিরদিন জ্বলন্ত থাকিবে। দেবোদ্দেশ্যে করজোড়ে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনে পরম সুখানুভব করিলাম।

কেদার খণ্ডে যাত্রা করিয়াছি, সেস্থানে পৌছাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, যত কেদার ধামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, দেখিলাম, শৈলশৃঙ্গ ও পার্ব্বত্য পথে স্তুপাকার হিমানী জমিয়া রহিয়াছে।

সেই শৈলশিখর পর্ব্বত প্রস্থের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম। সে অপরিমেয় শোভা সম্পদ আর কোথাও আছে কিনা জানিনা বোধ করি তাহা দুর্ল্লভ। আমরা সেই অভিনব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সেই স্থান হইতে যদি কোন প্রকারে কাহার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে পতিত ব্যক্তির কথা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়। সেই দুর্গমপথ ভিন্ন গমনাগমনের অন্য উপায় নাই, কিন্তু তথাপি আমার অন্তর নবীন উৎসাহে পূর্ণ ছিল। ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে তাহা দর্শন করা অসম্ভব।

যখন সেই পবিত্রধামে পৌছিয়াছিলাম, সেদিন প্রাণে এক বিপুল পুলকের আবির্ভাব হইল, এতদিন যাহা কল্পনায় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আজ বাস্তব জীবনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত নেত্রে দেবতার চরণে বার বার মস্তক অবনত করিলাম। মনে হইল, আমার একি সৌভাগ্য। বহুবিধ পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতের গাত্রে গাত্রে হিমানী জমিয়া রজত খণ্ডের মত রৌদ্রের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আর ঐযে উর্দ্ধে শ্বেতাকায় তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, উহাই কি তবে শিব? আর তাহাতে যে উজ্জ্বল আলোক সমাগত হইয়াছে, তাহাই কি তবে বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি?

সেই স্থানেই মন্দির মধ্যে বিশ্ববরেণ্য দেবাদিদেব মহাদেব কেদারনাথ বিরাজ করিতেছেন, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত সুন্দর ও মৌন। তাঁহার এই মন্দির যে কবে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা কেহই সবিশেষ বলিতে সক্ষম নহেন। হিমপ্রদেশে দেবতার এমন পবিত্র মন্দির কে নির্ম্মাণ করিল, আর তাহাতে কে প্রেমময় দেবতাকে স্থাপিত করিয়া ভক্তের মন মোহিত করিল—তাহা ভাবিলে মন হৃদয় হর্ষ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। সে মন্দিরের অবারিত দ্বার। দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দু মাত্রেরই ভক্তিপূত পূজা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাই সেস্থানে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ কোন কিছু প্রভেদ নাই। সকলেই সানন্দে, স্বহস্তে দেবতাকে পূজা আরতি ও আলিঙ্গন করিয়া, ভোগ দিয়া তৃপ্ত হন এবং তাঁহার পবিত্র স্তবগানে অসীম আনন্দ উপভোগ করেন।

এইস্থান হইতে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী আবির্ভূতা হইয়াছেন। মন্দাকিনীর নির্ঝর প্রশস্ত, গভীর ও নির্ম্মল ছিল। মনে হইল এই গঙ্গাপ্রবাহ অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি করিতে করিতে অবিশ্রামে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। আবার কোথাও তাহার স্বচ্ছ সলিল কল কল তানে নিজের ভাষায় ঝঙ্কার তুলিয়া, এই স্থানই যে স্বর্গ ইহাই সকলকে জানাইতে ব্যগ্র।

বহু উচ্চ পর্ব্বত হইতে তুষার গলিয়া, ঝরণারূপে বহিয়া আসিয়া, গঙ্গায় পতিত হইয়া, মন্দাকিনী বারিকে অধিক শীতল করিতেছে। সেই হিমপ্রদেশে বৃক্ষ সকল সর্ব্বদাই নবভাবে সজীব থাকে, তাই সেই সকল স্থান মনোরম!

এই পুণ্যসলিলা মন্দাকিনী ও কেদারনাথকে ছাড়িতে

প্রাণ ব্যথিত হইল। বোধ হয় এ জীবনে এই তাঁহাকে শেষ দর্শন। মন্দাকিনীকে বহুদূরে রাখিয়া সত্বর তুঙ্গনাথ অভিমুখে চলিলাম। এই স্থানের দৃশ্য দর্শনীয়। দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী তাহারই মধ্যস্থল দিয়া চলিয়াছি, ক্রমশঃ এক ধারে পর্ব্বত ও অন্যধারে বৃক্ষশ্রেণী পড়িল। এই বিজন প্রান্তরে এমন সুন্দর বনবীথিকা কে সজ্জিত করিল? যে কাশ্মীর উপত্যকাকে ভুস্বর্গ বলিয়া বর্ণন করা হয় তাহার সহিত ইহার উপমা দেওয়া যায়।

কেদারনাথের পর্ব্বত অপেক্ষা তুঙ্গনাথের পর্ব্বত অনেক উচ্চ, সেই পার্ব্বত্য পথের চড়াই উঠিতে উঠিতে কেদার নাথের তুষার মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গগুলি অন্যরূপ মাধুর্য্যে পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছিল, কোথাও লোহিত রঞ্জিত কোথাও উজ্জ্বল রজত খণ্ডবৎ আবার কোন স্থানে অন্য বর্ণ অনুমান হইতেছিল।

আহা বিধাতার কি অপরূপ সৃজন কৌশল! শ্রেষ্ঠ জীব মানবও তাহা প্রকৃত ধারণা করিতে সক্ষম নহে।

এই যে সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর চিরন্তনী প্রথা অবিরাম গতিতে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া চলিয়াছে, ইহার পরিণতি কোথায়?

আমার মানস নেত্রে ক্ষণিকের জন্য তাহা চিত্রপটের মত ভাসিয়া উঠিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার লুপ্ত হইল।

তুঙ্গনাথে পৌছিয়া আগ্রহ সহকারে মহেশ্বরের বন্দনা করিলাম। এইবার শুধু বদরিনাথের দর্শন হইলেই এই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ সার্থক হয়।

বদরিনাথ গমন করিতেছি, একটী সেতু পার হইয়া বিষ্ণু প্রয়াগে পৌছিলাম। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গম দর্শন করিলাম। তাহার তট দিয়া পদব্রজে চলিলাম, মধ্যপথে অলকানন্দার উপরে কতক স্থানে হিমানী জমিয়া রহিয়াছে।

তাহারই তলদেশ হইতে ধীরে ধীরে বারি প্রবাহিত হইতেছে। স্থানে স্থানে পারাপার হইবার কাঁচা ও পাকা সেতুগুলি রহিয়া তোয়ধারাকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়াছে।

পর্ব্বতের ধারে বৃক্ষে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। কোন বৃক্ষটী উচ্চে কেনেটী নিম্নে, সেই সকল পুষ্পের সৌরভে দিক আমোদিত হইতেছে। তখন মন বেশ অজানা শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠি। স্বর্গ কোথায়? এই সকল দৃশ্য কত আনন্দপ্রদ তাহা বর্ণনাতীত। বাস্তবিক ইহা দর্শনীয় বস্তু।

ইহার প্রায় চতুর্থ দিবস পরে একদিন বৈকালে বদরি-নারায়ণে পৌছিলাম। এতদ্দিনে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল, ধূলিপদে দেব দর্শন করিয়া, অন্তরের দুঃখ গ্লানি মুছিল।

সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে। নিকটেই বদরিদেবের পবিত্র মন্দির, সেই মন্দির হইতে মধ্যে মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া দূরাগত সঙ্গীতের মতই কর্ণে পৌছাইতেছিল। পূর্ণিমা রাত্রে সারা জগৎকে জ্যোৎস্নার আলোকে হাসাইয়া তুলিয়াছে! কি মধুর ও মনোরম দৃশ্য। আমি নীরবে সেই জ্যোৎস্নার আলোকে ধর্ম্মধানীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি কি স্নিগ্ধকর ও আনন্দদায়ক। সেই নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র কৌমুদীরাশিতে জগতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দিকে যেন পুলকে ভরিয়া দিয়াছিল। কিছুদূরে অলকানন্দা কুলু কুলু রবে বদরিদেবের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে।

পরদিবস প্রাতে পঞ্চতীর্থের জলে সঙ্কল্প করিয়া তপ্ত কুণ্ডে অবগাহন স্নান করিয়া, পুণ্যতোয়া অলকানন্দার তটস্থিত স্থান ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদানের নিমিত্ত গমন করিলাম।

সেস্থানে বহু প্রবাসী লোকান্তর বাসীর মুক্তি কামনায় প্রসাদের পিণ্ড লইয়া, গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ছিলেন, তাহা বেদধ্বনির মতই শ্রুতিসুখকর। এই সময় আমার মনে এমন এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইয়াছিল, যে জগতের ক্ষণ স্থায়িত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া, হৃদয় একরূপ করুণ রসে আপ্লুত হইল। জীবনের এত গর্ব্ব এত দর্পের কি ইহাই সমাপ্তি।

হায়রে ধন মান আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত মানব, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? যেখানে শুধু ধর্ম্মে বিশ্বাস, দীনতা, নম্রতা, সত্যবাদিতা অমলরূপে বিরাজমান, সেইখানেই না তাহার প্রতিষ্ঠা।

মন্দিরের নিকটেই নর ও নারায়ণ নামে দুইটী পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যস্থিত স্থানকে বদরিকাশ্রম নামে

অভিহিত করা হয়। সেখানে যে পঞ্চ তীর্থ আছে, তাহা নারদগঙ্গা, প্রহ্লাদগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কুর্ম্মধারা ও তপ্তকুণ্ড নামে বিখ্যাত।

তাহার মধ্যে তপ্তকুণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ। কোথা হইতে পর্ব্বত ও গঙ্গার উপকূলে এমন অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যজনক তপ্ত সলিল বহিয়া আসিল তাহা সত্যই অতীব বিস্ময়কর। সেই বারি অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইয়া একটী কুণ্ডে পতিত হইতেছে। ইহার যে কোথায় উৎপত্তি তাহা নির্ণয় করা যায় না।

উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিতে সন্ন্যাসী ও ভক্তেরা দেশ-দেশান্তর হইতে ব্যাকুল চিত্তে সেস্থানে গমন করেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই পদব্রজে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করেন।

সন্ন্যাসী ও ভক্তেরা ভক্তি অবনত চিত্তে বদরিদেবের সেই কল্যাণময় নির্ব্বাণরূপ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিয়া, গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। তাঁহাদের ব্যথিত প্রাণের সকল ব্যথা তিরোহিত হইয়া, অন্তরের গভীরতম প্রদেশ নির্ম্মল অমিয়ধারায় সিক্ত হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা তাঁহাদের এই অস্থায়ী জীবন সার্থক হইয়াছে জানিয়া কৃতার্থ হন।

স্থান মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, সেস্থান ভক্তি ও বিশ্বাসে দর্শন করিলে মুক্তি অনিবার্য্য। তাই সেস্থানের আর একটী নাম মুক্তিক্ষেত্র।

শৈলেশ মজুমদারের ছোট গল্প

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"হেমের অনধিকার" ছোট-গল্পে আর একটা দিক উহার করুণতা। উহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। সুখের হাটে দুঃখের বেচা-কেনা বড়ই শোককর।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "দাদার কাণ্ড" ১৩০৫ বঙ্গাব্দের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়।

"সেবক" এই ছোট-গল্পে যেন আলো ও আঁধার দুইটি পাশাপাশি রাখিয়াছেন। আলোর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে গেলে যেমন আঁধারের প্রয়োজন, সেরূপ আঁধারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে গেল আলোর প্রয়োজন। দুইটিই নিরবচ্ছিন্ন।

"দাদার কাণ্ডে" দুইটি বিসদৃশ বিষয় বস্তু লইয়া শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার ইহার ঘটনা সংস্থান করিয়াছেন।

তিনি সত্যই বহু বিবাহ পছন্দ করিতেন না। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন, কি আশ্চর্য্য! নারী একবার প্রেম নিবেদন করিলে যে স্পৃষ্টা হইয়া যায়, তাই অন্যপতির কামনা তাহার পক্ষে প্রবল অন্যায়, হিন্দু শাস্ত্র সে স্পৃষ্টাকে কখনই ক্ষমা করে না; নারী জাতি যদি দ্বিচারিণী হয় তবে তাহার প্রতি যত রকম কঠিন শাসন প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা উহাতে বিহিত আছে, কিন্তু পুরুষের বেলায় শাস্ত্র-কারেরা সে-রূপ কড়াকড়ি করেন নাই, তাই এক পুরুষ পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতে পারে, পত্নী বিয়োগ হইলে সে বিবাহ করে, পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও সে পত্নীর সপত্নী গ্রহণ করে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না, তাই তিনি বোধহয় এখানে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন, আগের ছোট গল্পেও করিয়াছেন, এবং এই ছোট-গল্পের সতীন বৌকে মসী-লিপিতে চিত্রিত করিয়াছেন।

সে যাহা হউক উহা এই ছোট-গল্পের ব্যাপক অঙ্গে প্রযুক্ত কিন্তু মূল উদ্দেশ্য লেখকের ইহা দেখানো যে ভ্রাতৃ প্রেম, সহোদরের প্রতি ভালবাসা এত অনাবিল হইতে পারে যে তাহা কোনরূপ চাপে বিকৃত হইতে পারে না। ভাই ভাইই থাকে। সে ভাই গৃহিণীর কুপরামর্শে পর হইতে পারে না।

তিনি "দাদার কাণ্ডে" আর একটি ছবির ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার। এই বাংলা

দেশে হিন্দুর যুক্তি, সংসারে বা যৌথ পরিবারে পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃস্বরূপ, এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃরূপিণী। মা যেমন বুক দিয়া সন্তানের ইষ্টের জন্য চিন্তা করেন, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তেমন দেবরের প্রতি ব্যবহার করে। তাঁহার নিকট নিজের পুত্রও যে জিনিস, দেবরও সেই বস্তু। নিম্নোদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ দেবরের জন্য নিজের প্রাণ ঢালিয়া মঙ্গল কামনা করেন।

"আমদের গ্রামের নবীন ও ভুপেন পড়িতেন। ছুটিতে তাঁহারা বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেসে সিটও খালি, সুতরাং কলিকাতায় গিয়া প্রথম ও প্রধান যে উদ্বেগ, তাহা দূর হইল। নবীনদের সহিত কলিকাতায় যাওয়াই স্থির। শেষে যাত্রার দিন আসিল। আমার যাওয়ার ক্ষুদ্র আয়োজন প্রস্তুত। বৌমাই সব গুছাইয়া দিয়াছেন। একটি টিনের প্যাটরায় প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও একটি পুটলিতে খানকতক আমসত্ব, পাকা আমের আমচুর, আর আমি সুপারি বড় ভালবাসি বলিয়া মিহি সুপারি সের খানেক বাঁধিয়া দিলেন, আর দিলেন একটা ভাঁড়ে সের তিনেক গাওয়া ঘি। সঙ্গে সঙ্গে বৌমা মাথার দিব্য দিয়ে বলিলেন, 'শুনেছি কলিকাতায় ভাল দুধ ঘি মেলেনা, রোজ দুবেলা ঘি অবশ্য অবশ্য খেও।' কলিকাতায় গিয়াই ভাল জুতা ও জামা কিনিয়া লইবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না; তার পর স্বহস্তে আমের শাখা ভাঙ্গিলেন, ঘট পুরিয়া আনিলেন। এখন আমার যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের বড় ঘরে একখানি আসন পাতা, বৌমা আমায় সেইখানে বসিতে দিলেন, নিজেও আমার নিকট বসিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতী সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমার মঙ্গলের জন্য ভক্তিভরে অর্চনা করিয়া আমায় সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম, শেষে আমার কপালে দধি ও সিন্দুরের ফোঁটা ও মাথায় নির্ম্মাল্য দিলেন, আবার পরক্ষণেই নির্ম্মাল্যটি আমার চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, শেষে দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে আমায় লইয়া যাত্রার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এইরূপ মায়ের মত ভালবাসা, সন্তানের জন্য মায়ের এই ঔৎসুক্যের ন্যায় এরূপ ঔৎসুক্য হিন্দু ঘরের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর ভিতর বিরল নহে। বহুদিন হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে, যদিও কালের বিবর্ত্তনে ও পাশ্চাত্যের অভিযানে সেই মধুর সম্পর্ক ম্লান ও শিথিল হইয়া আসিতেছে এবং কালে হয়তো থাকিবেই না বলিয়া লেখকের আশঙ্কা।

বধু-ঠাকুরাণীর যে-দেবরের প্রতি এত ভালবাসা সেই দেবরের বধু-ঠাকুরাণীর প্রতি কিরূপ ঐকান্তিক ভক্তি, ভালবাসা, ঔৎসুক্য, তাহারও বিবরণ তিনি নিখুঁত ভাবে দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ লক্ষ্যনীয়?

তখন নূতন উৎসাহে ডাক্তার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই রোগবাগ মানিল না। বৌমাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারিলাম না। বৌমা অন্তিম শয্যায় আমায় বলিলেন, বিনু, আর কেন এত চেষ্টা ভাই, আমার যে সময় হয়েছে। আমার সব সাধই তো পুরেছে। আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি, এর চেয়ে আমার আর কি সুখ আছে, আমি তো চলিলাম। ছোট বৌ ছেলে মানুষ। দেখ, ওর জেন কষ্ট না হয়।' তারপর বৌমা কাতর দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিলে আমি কি একটা উপলক্ষে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। দাদার ডাকে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরিলাম, দেখিলাম দাদা চক্ষু মুছিতেছেন, বৌমার ও চোখে জল। কৈ বৌমা! আমার তো সাধ মেটে নাই, কিন্তু দেবী। তোমায় বাঁচাইতে পারিল্যম কৈ; দাদার পায়ে মাথা রাখিয়া আমায় সম্মুখে বসাইয়া বৌমা চোখ মুদিলেন। সে চক্ষু আর মেলিলনা। আমাদের সোনার প্রদীপ নিবিয়া গেল। গৃহ অন্ধকার হইলে বিজয়ার প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের সে দেবী-প্রতিমার বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম।"

দেবরের এই প্রাণপূর্ণ ব্যস্ততা, শোক ও দুঃখ লক্ষ্যনীয়। মনে হয় ছেলে মাকে হারাইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে, আর বুক চাপড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "দাদার কাণ্ড" ছোট গল্পে লেখক শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। সেই মাতৃমূর্ত্তি জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর বিয়োগের পর যখন সকলের পীড়নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুনরায় বিবাহ করিল, তখন সে গৃহে আনিল একটি অসুরীকে।

শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার যে দ্বি বা বহু বিবাহ ইচ্ছা করিতেন না ইহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে এবং এই জন্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ দানবীয় চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন এবং দুইটি চরিত্র পাশাপাশি বর্ণনা করিয়াছেন ?

"একদিন দাদা আর আমি বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, সহসা বড় বধূর (পূর্বের জন ছিলেন বৌমা) কণ্ঠ কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া মরমে পশিল "বসে বসে কেবল শূয়রের পাল বিওবেন, আর জ্ঞাতিবাদ সাধবেন।" বেশ বোঝা গেল, সে বাক্যবাণ ছোট বধূর উদ্দেশ্যেই বিক্ষিপ্ত, কিন্তু দাদাও যেন সে স্বর-শরে কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। আমি কথাটি শুনিয়াছি কিনা সন্দেহে দাদা আমার দিকে চাহিলেন। আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া শেষে মুখ নত করিলেন। দাদা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। 'কি পাগলামি করে' বলিয়া উঠিয়া বড় বধূর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবার বড় বধূর কণ্ঠস্বর শুনা গেল 'কি অন্যায় কথাটাই বলেছি ? এত ভয় কর্ত্তে গেলে আমার পোষাবে না।'

'না আর চুপ কি ? আমার কাছে এত ঢাক গুড় গুড় নেই, আমার স্পষ্ট কথা। আমি অত অনৈরণ সইতে পারি নে। কেন ? আমি চুরি করেছি ? না ডাকাতি করেছি ? উনি বসে বসে গেরস্তালিটা পয়মাল্ দেবেন, আর তাই বুঝি চুপ করে দেখতে হবে ? অত আহ্লাদ আমার কাছে খাটবে না।"

সংসারে বড় বধূর ন্যায় চরিত্রও দেখা যায় আবার বৌমার মত অন্তঃকরণও চোখে পড়ে। একজন দানবী, অন্য জন দেবী। সংসারে যত অনর্থ ঘটিয়া থাকে তাহা সাধারণতঃ নারীর জন্য, কারণ পুরুষ স্বভাবতঃ নারীর বশে চালিত হয়। কিন্তু পুরুষ যদি বিচারক্ষম না হয় তবে যৌথ পরিবারে শান্তি আসিতে পারে না বলিয়া লেখকের ধারণা।

"ভাত প্রস্তুত। ছোট বধূ আহার করিতে ডাকিলেন। সত্যই আমার কান্না আসিল। দাদার সহিত পৃথক হইয়া খাইতে হইবে ? আমার ছেলের আর আমার দুইখানি আসন পাতা, আমি তখনও কি ভাবিতেছি। ইতিমধ্যে দাদা স্নান করিয়া আসিলেন। আমারই একখানা কাপড় লইয়া ছাড়িলেন। তারপর 'বিনু ! চল খেতে যাই', বলিয়া সেই আসনে গিয়া বসিলেন। 'বোস !' দাদার দ্বিতীয় ডাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ আহারে বসিলাম। দাদা বেশ হাসিয়া অন্য দিনের মত গল্প করিয়া আহার শেষ করিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম "দাদার এ কি কাণ্ড।"

ঝি আমার সহিত দাদাকে আহার করিতে দেখিয়া গিয়া বড় বধূ ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল। ভীষণ মূর্তি বড় বধূ তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই গালে হাত দিলেন। তারপর কি বলিতে যাইতেছিলেন। দাদা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন 'কি দেখছ ? তোমার ভিন্ন হতে বড় সাধ তাই তোমাকে ভিন্ন করে দিলাম। আমি আর বিনু কি ভিন্ন ?"

লেখকের এইরূপ চমৎকার ভারত-ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ এই দেশের পাশ্চাত্যের অভিযানে অনেক উপকারে আসিবে এবং ছোট গল্পের এইরূপ নাটকীয় ভাবে ঘটনা সংস্থান উহাকে অত্যন্ত উঁচু করিয়া দেয়।

"দাদার কাণ্ডের' বৌমার করুণ মৃত্যুতে শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের ছোট-গল্প রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এই ছোট-গল্পের চারিটি চরিত্র বৌমা, বড়বধূ, বিনু, দাদা, ইহারা সকলেই উল্লেখ যোগ্য। বড় বধূর দানবীত্ব বৌমার দেবীত্বকে অনেক বড় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আলো-আঁধারের তুলনা এখানে প্রকটিত। তারপর দাদার চরিত্রের দেবোপম ভাব লেখক এখানে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেখক শৈলেশ চন্দ্র মজুমদারের সহোদর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও একজন কৃতী লেখক ছিলেন। তাঁহার "চৌকিদার" নামক ছোট-গল্প ১২৯৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" মাসিকে প্রকাশিত হয় এবং "পৌষ পার্বণ" ১৩০০-০১ বঙ্গাব্দের "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

উল্লিখিত দুইটি ছোট-গল্প ভিন্ন তাঁহার আর কোনও ছোট-গল্প এই গ্রন্থের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না।

প্রাচীন বাঙালা কাব্যে নারীর শক্তি

শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাঙলা কাব্যের বহু স্থলেই দেখিতে পাই অশ্বে আরোহন করিয়া কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীর রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছেন। মহায়সী মহিলাগণের এতাদৃশ শৌর্য্যবীর্য্য প্রাচীনবাঙ্গালার গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয় ছিল। কালের ঘাতপ্রতিঘাতে ঘোররবে উন্মুক্ত তরবারির ঝঞ্চনায় কতশত ঘটনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সুখশান্তির মলয় মারুত কতবার মন্দ বহিয়াছে—সেই মহা ঝটিকাসঙ্কুল দিনে বাঙ্গালার বীররমণীগণই ছিলেন তাহার প্রাণশক্তির উৎস। প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যের গল্পগুলি উপকথা আকাশকুসুম নহে, মস্তিস্কের বিকৃতি নহে'—বাস্তবঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। এ কাব্যগুলি ঐতিহাসিক, তবে কবি কল্পনায় ইতিহাস কাব্যরসের মধ্যদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তখনই বাঙ্গালী বীর রমণীকুলের পদভরে রণস্থল কম্পিত হইত। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন, সমুদ্রসদৃশ নবলক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কাররবে রণস্থল প্রকম্পিত করিতেছে, এমন সময় অজয় নন্দতীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল—গৌড়ের ভুপতিকে আর কর দেয়না, তাঁহার হুকুম মানেনা অবিলম্বে গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাইএর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। গৌড়কুমারী কানাড়ার যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী রচিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্য দেখিতে পাই—

রাজআজ্ঞা পেয়ে কন্যা দিলে হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে সিঙ্গায় শুধু সাড়া॥
কাড়া পাড়া ঠমক খমক করতাল।
জগঝাম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল॥
রণভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।
রণসিঙ্গা কাসর সঘনে শুনি রোল॥
ঘন রণদামামা দগড়ে পড়ে কাটি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী॥
ধাও ধাঁও ধাঙসা বাজে ডিগডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥
রায় রেঞ্জে বার ভুঞে মীর মিঞাগণে।
তুরগী তুরগে কেহ ইরাণী বারণে॥
হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ী সেফাই ফকির।
ধানুকী বন্দুকী ঢালি পাইক পদাতিক॥
তিন লক্ষ তাজা তাজী তুরগী তুরঙ্গ।
ঊনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ।
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি সগরিকার।
সমুদ্রে নব লক্ষ সম অবতার॥"

অতঃপর কানাড়ার দাসী ধুমসীর বিক্রম দেখিয়াও স্তম্ভিত হইতে হয়।

কবি ঘনরাম কানাড়ার বিবাহ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

"আমি কানাড়ার দাসী, ধুমসী ধরি নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাস সংগ্রাম॥
হেনে দিলে গণ্ডার দাসীর হব দাসী।
মিছা অহঙ্কারী জনে ঘাস হেন বাসী॥
রায় রেঞা বারভুঞা মীর মিয়া দল।
শুনিয়া সবার মুখে শুকাইল জল॥"

অন্যত্র ধুমসীর শৌর্য্যবীর্য্য সম্পর্কে দেখিতেছি,—

"হান হান বলিয়া ধুমসী দিল হানা।
চমৎকার ভাবে যত ভুপতির সেনা॥
ডাকাডাকি উঠিল চৌদিকে ধাওয়া ধাই।
বাজে জাড়া সিঙ্গাকাড়া, টমক টেমাই॥
সম্মুখ সমরে দাসী সিংহনাদ ছাড়ে।
হুঙ্কার হুতাশে হাতী হুটারিয়া পড়ে॥
বায়ে ভর করে দাসী লস্কর ভিতরে।
গুঞ্জরে সিংহিনী যেন কুঞ্জর নিকরে॥

হান হান হাঁকারে হাতীর হানে শুঁড়।
হানিছে ঘোড়ার জাঙ্গি মানুষের মুড় ॥
চৌদিকে চাপিয়া যুঝে ভূপতির ঠাট।
দাদালে দুহাতে দাসী জুড়ে এল কাঠ ॥
কুঠার করিয়া কাটে কুঞ্জরের স্কন্ধ ॥
সর্দ্দার সিফাই পড়ে শিরে শরবন্ধ ॥
দুষ্কর সাহসে তবু রায় রণ ভীম।
হাতাহাতী দড়বড় বাড়ালে মহিম ॥
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ বা ঘোড়ায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী যুঝে পায় পায় ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর শাঙ্গি শেলগুলি।
না লাগে দাসীর গায় রাখেন বাসুলী ॥
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধুম।
চারিদিকে বাজে গোলা দুড়ুম দুড়ুম ॥
থুম থুম ধুমসী দুহাতে হাতী হানে।
কাদালে কদলী যেন হানিছে কৃষাণে ॥”

অতঃপর কবি ঘন রাম সমগ্র নারী জাতির দেবীস্বরূপ মহাশক্তিকে যুদ্ধে নামাইলেন।—

“রঙ্গিনী উরিলা রণে রুধিরলোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপিয়া চলে দানা ॥
হটিল জটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট দশন রক্ত জবা যেন ফুটে ॥
মুলাপারা দশন বসন হীন কটি।
কেহ বা কাঁচুলি পরে কেহ বীরধটি ॥
ছটপটি ঝাপটি ঝাঁপিল ঝুপ ঝাপ।
চমকিত রাজ সেনা বলে বাপ বাপ ॥”

“রঙ্গিনী রণজই, দুন্দুভি বাজাই, ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজপুত, যৈছন যমদূত সমমুখ যুঝে খানসামা ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে আকাশে একাকার ধুম।
দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলাগাজে দুড়ুম দুড়ুম ॥
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ ঝিকিছে লুপলুপ লাফালাফি লুফিছে দানা।
ভুতপ্রেত পিশাচী ধাওয়া ধাই ধুমসী থুমসী রণে দিল হানা ॥
ঝাকড়া ঝাকে ঝাকে ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে লাখে লাখে বরিষে তীর।
সামলিয়া হানিতে গজবাজি সহিতে সমরে শিফাইয়ের শির ॥
বড় গোলা বন্দুক দূড় দূড় দশমুখ চাহিতে চমকিত শেষ।
অবনী টলটল কম্পিত কুলাচল ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥
ধুমসী পরদল হানিছে দলবল হাঁকিছে বিপরীত রা।
বীরগতি চলিছে, বাহু তুলি বলিছে’ বলিলও বাসুলি গো মা ॥”

অতঃপর যুদ্ধ অন্তে ভূপতি পলাইবার উপক্রম করিতেই তিনি বীর ললনা ধুমসীর হাতে ধরা পড়িয়া গেলেন।—

“প্রাণ লয়ে ভূপতি পালাইয়া মহানিশি।
পাওর পলাতে ধেয়ে ধরিল ধুমসী ॥
ধুমসী উপাড়ি দাড়ি ছেড়ে দিল তায়।
প্রাণ লয়ে পাপমতি পাওর পলায় ॥
তরাসে তরল কেহ ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
দেখে কেহ হুভাশে হুটুরে পড়ে ভুঞে ॥
ফিরে নাহি চায় কেহ ধায় তড়বড়ি।
পথে পথে ঢাল খাড়া মাথার পাগড়ি ॥
খালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
ঝাড়ে ঝাড়ে আড়ে কেহ তরাসে লুকায় ॥
ভেয়ে বাবু মিঞা কত সর্দ্দার সিফাই।
সমরে কাটায়ে ঘোড়া সবে দিল ধাই ॥”

পুনরায় কানাড়ার যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে কবি প্রাচীন বাঙলার নারীকুলের শৌর্য্য বীর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।—

“ডগমগী রুধিরে মজিল ডোমপাড়া।
ডরে ডরাইয়া ডাকে কিঙ্করী কানাড়া ॥
গায়ে পর পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িত জড়িত ॥
কোমর কষনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পটুকা তার কোলে ॥
শিরে বান্ধে সরবন্ধ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঙ্কহীরা ॥
দড় দড় কোমর কষিয়া কড়াকড়ি।
আগুলিয়া ধুমসী আইল রড়ারড়ি ॥

বেঁধেছে হেথের যেন মূর্তিমন্ত কাল।
বাঁ হাথে ধরেছে খাঁড়া, ডানি হাতে ঢাল॥
মুড়ায়ে মালক্ মেরে চড়া দিয়া চাপে।
ধেয়ে যেতে ধুমসী ধমকে ধরা কাঁপে॥
দুর্মুখা ধুমসী দাসী আগুদলে ধরে অসি
হান হান হাঁকিছে কানাড়া।
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ধুমসী সম্মুখ রণে
দুহাতে হানিছে হাতী ঘোড়া।
মার মার হাঁকিছে মামুদা মূঢ়মতি।
হান হান হাঁকে রাণী কানড়া যুবতী॥
ঢাল মুড়ে মহিমে মাতিল মহারাণী।
হাম কাট হুঙ্কারে হাঁকারি হানাহানি॥
ভুমে লোটে গজবাজী সিপাহী জঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা জোড়া॥
দাঁতে ধরে লাগাম দু হাতে ধরে খাঁড়া।
সেনাগনে হানে রাণী রণে দিয়া তাড়া॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাখে শরগুলি।
সমর সিংহিনী রাণী ঝিকে ঢাল ঢালি॥
সাজি শেল ঝকড়া কানড়া ফলা সাটে।
সামলিয়া সাহসে সমরে সেনা কাটে॥
হাতীঘোড়া সান রণে হানে ঠাস্ ঠাস্।
শরগুলি আথালি পাথালি তালিখাস্॥
ধূমসী তামসী রণে পাড়ে ধুন্ধুমার।
হাতীঘোড়া সিপাই পড়িছে একাকার॥
একচাপে রুষিয়া চঞ্চল ঢাল চালি।
ধূমসী সম্মুখে যোঝে ষোলশতঢালি॥
সমরে সিফাই মত দাবাইল ঘোড়া।
মজুত অযুত মাঝে হাজার জাঙ্গাড়া॥
ঝটপট শব্দ খাঁড়ার ঝণঝাণ।
চটাপট চৌদিকে চাপিয়া টনটান॥
মীর মীঞা মোগল পাঠান খানসামা।
রণরঙ্গ রণরাস রণে দিল হানা॥
দেবে কত তরাসে তরল হলো রাণী।
হেনকালে নানামূর্তি উরিলা রঙ্গিনী॥
খণ্ডিণী শূলিনী কেহ গাদিনী চক্রিনী।
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ড মালিনী॥
কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালীকপালিনী কেহ করাল বদনা॥
বামহাতে অসিকার ডাহিনে খর্পর।
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর॥
ঘোর মূর্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিত লোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপিল চণ্ডদানা॥"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত অভয়া মঙ্গল কাব্যে আমরা শ্রীমন্তের চণ্ডীদেবীর অসামান্য বীর নৈপুণ্য দেখিতে পাই। পুরাণকারগণ যে সাধকদিগের অবলম্বন নিমিত্ত দুর্গার মানুষী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেই দুর্গাকে বাঙ্গালী বীরাঙ্গনা সাজাইয়া দুর্গার সেই মানুষী ভাবের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ বর্ণিত চণ্ডীদেবীর পশ্চাতে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা দৌড়িতে থাকে।—সিংহল

"কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানের ঘন্টা।
আইল দানা দুইভাই নামে রণঝাণ্টা॥
নেত কোটালের ঘাড়ে মারে সাতহাথা।
করের প্রহারে তার ছিড়ে গেল মাথা॥
যুঝয়ে দেবীর দানা কোটালের ঠাটে।
রণভরী শবদে গগনতল ফাটে॥
মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুইদলে রণপড়া বাজে জয় ঢাক॥
ঝটঝট করিয়া তবকে পুরে গুলি।
রণঝাণ্টা যুদ্ধ করে মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
রণে পদ্মাবতী দিল দুন্দুভি নিশাণ।
অষ্টদিকে দানা ঘটা বেরিল মশান॥"

কোটালের চণ্ডীর যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"ঘরদল পরদল বাজায়ে মাদল কেহ কার নানি শুনে বাণী॥
ভ্রূকুটি কুটিলা পিঙ্গল জটিলা পরিহিত লোহিত বসনা।
কড়মড় দন্তা সমর দুরন্তা ভয়দা ভীষণ বদনা॥
লোহিত লোচনা ভীষণ রসনা আজানুলম্বিত জটা।
রণভূমে কালী বিষম করালী জলধর জিনিয়া ছটা॥

বেঢ়িয়া মশান পাইকের চাপান ঘনবাজে দামামা কাড়া।
রণে মাতোয়ালা ধায় তাল বেতালা খেতে ধায় মেলিয়া দাড়া
খরতর দৃষ্টে গজার পৃষ্ঠে মাহুত সারিল কুম্ভ।
শতনর খণ্ডী ধরিয়া চণ্ডী মারিয়া ভাঙ্গিল দন্ত॥
করীবর শুণ্ডা ধরিয়া চামুণ্ডা ঘন দেই গগনে পাক।
গজবর চাপনে পড়িল মশানে পদাতিক লাখে লাখ॥
বিক্ষি গদাধর পড়িল বীরবর গদা হাতে পড়িল গদী
পাইক তবকী পড়িল ধানুকী বেগে ধায় রুধিরের নদী॥”

সিংহলরাজের অগনিত সৈন্যসজ্জা দর্শনে ভীত শ্রীমন্ত চণ্ডী দেবীকে বলিতেছে,—

“অভয়া ঝাট চল তেজিয়া মশান।
তুমি গো অবলা জাতি আমি নহি রণে কৃতি
কেন মাতা হারাবে পরাণ॥
একে তুমি অবলা আর তাহে বিভোলা
নাহি দেখ নাহি শুন কাণে
পদাতি সারথি রথী কত আইসে সেনাপতি
সমর করিবে কার সনে।
আটদিকে আগুদলে পড়ে বজ্র সরে শিলে
ধূমে আচ্ছাদিল দিণমণি।
মেঘের গর্জ্জন ধ্বনি কামানের শব্দ শুনি
সেনাভরে কাপয়ে মেদিনী॥
দেখিয়া লাগয়ে ধাঁধা তুরগে তবক বাঁধা
আসোয়ার কবচে মণ্ডিত।
চাঙরা ডোঙরা সাথে কামান কৃপান হাথে
কত আসে সমরে পণ্ডিত॥
মাথায় সুরঙ্গ ঢালি তবকী ধানুকী ঢালি
পাইক আইসে পনে পনে।
পরান করিয়া পান আইসে করিতে রণ
সাহস করহ অকারণে॥”

রাজসৈন্য ও দেবী সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

রাজসেনা দেবীসেনা দোঁহে বাজে রণ।
দুইদলে কাটাকাটি শুনি ঝনঝন॥
সিংহদাস নামে দানা উঠিল গগনে।
কর হৈতে কেড়েঁ নিল সভার কামানে॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে
তালফল সম গোলা পূরিল ভিতরে॥
গুরু শুঙরিয়া গোলা ভেজায় অনলে।
পাছু হয়ে পড়ে গোলা নরপতি দলে॥
নরপতি দলে গোলা খেয়ে বুলে তালি।
হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আউলি॥
আদ্যাসনাতনী মাতা ছাড়েন অম্বর।
ত্রিশূল পট্টিশ আর শেল সমধর॥
রনস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী।
সমর বিষম শিঙ্গা বাজয়ে দুন্দুভি॥
রনস্থলে রনসিংহী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
আদ্যা সনাতনী মাতা কাল অবতার।
ত্রিশূল পট্টিশ অসি শেল সমধার॥
যুগান্ত প্রলয়ে ঝড় উঠিল সিংহলে।
সঘনে লোফয়ে চণ্ডী তাড়িপত্র খাঁড়া।
যারে হানে মসানেতে সেই হয় গুঁড়া॥
দশনে দশনে যুঝে মাতঙ্গসগণে।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণে॥
অকালে বরিষা হইল দক্ষিণ মশানে।

শোনিতের খানিজুলি, ভরি রহে দুকুলি, সিংহল ভ'রিল বানে
শোনিত উপরে ভাসে গজবরে দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ।
চণ্ডী রনস্থলে কাটেন কৃতুহলে দানবে বাড়য়ে রঙ্গ॥
রুধিরের পানা পাণ করে দানা চাতক পিয়ে যেন জল।
ধরি করে খাণ্ডা কাটেন চামুণ্ডা সিংহল নৃপতির দল।

পড়িল অনেক সেনা পর্ব্বতের চূড়া।
নবলক্ষদল মৈল আর বৃদ্ধ খুড়া॥”

কোথাকার সামান্য সিংহলেশ্বরকে দমন করিতে চণ্ডিকা রণসাজে সজ্জিত হইবেন বুঝিয়াই দেবী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াই সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেকালের কাল্পনিক চণ্ডীর সময় না হউক কবি মুকুন্দরামের সমসাময়িক যুগের অর্থাৎ ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বেকার নারীশক্তি প্রসঙ্গে কবিগণ এইরূপই বর্ণনা দিয়াছেন।

অনিন্দিতা

শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী

খেয়ে দেয়ে মালকোচা দিয়ে কাপড় পরে নিয়ে সবাই রাস্তায় বের হতে গিয়ে দেখে সমীর সঙ্গে নেই। অথচ তাকে সঙ্গে নেবার জন্যই না সকলের এই জলের ভেতর রামবাগান লেনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া; সমীর সঙ্গে না থাকলে চলবে কেন?

কজন বন্ধু দু' তিনটে করে সিঁড়ি একত্রে টপকে দৌড়ে উপরে গেল। ঘরে এসে দেখে, সমীর চিৎপাত হইয়া দিব্যি আরামে অনিলের বিছানায় শুয়ে আছে।

বন্ধুদের দেখেই ত সমীরের মুখে হাসি খেলে গেল, কিন্তু তা দেখে ত' বন্ধুর দল চটেই অস্থির।

তারা চেঁচিয়ে বললে—উল্লুক কোথাকার, চালাকী পেয়েছিস, না? আমরা সবাই যাব জলকাদা ভেঙ্গে তোর শ্বশুর বাড়ী খুঁজতে আর তুই ইত্যবসরে এখানে মজা করে শুয়ে ঘুম দিবি। সেটি হচ্ছে না। ওঠ সমীর, আমাদের সঙ্গে এসে সেই হলদে তেতলা বাড়ী কোনটা দেখিয়ে দিবি আয়।

সমীর বেশ জানে বন্ধুদের সঙ্গে এই জল কাদায় বাইরে না গিয়ে উপায় নেই তবু একটু মিনতির স্বরে বল্‌লে—আমি ত সেই ছাদনা তলাতেই শুভদৃষ্টি করব বলে দিয়েছি। শুধু সেই হলদে বাড়ীখানা দেখবার জন্য এই জলের ভেতর এত রাত্রে আমার যাবার এতটুকু ঔৎসুক্য নেই ভাই। তার চাইতে তোরা সবাই যা, ফিরে আমার কাছে সব সালঙ্কারে সব গল্প করিস আমি তার উপর আমার কল্পনার রং ফলিয়ে মানস চক্ষে দেখে নেব।"

বন্ধুরা বললে—"বাঃ তোর বিয়ের সূচনা থেকেই মজা ত মন্দ হচ্ছে না। আমাদের সব দিকেই লোকসানের পালা দেখছি। ক'নে দেখতে গিয়ে মিষ্টি না খেতে পাওয়ার দুঃখ ত গেলই না, এখন আবার শুধু বাড়ীটা যে দেখে আসব তাতেও তোর আপত্তি। সে সব হচ্ছে না সমীর, আমাদের সঙ্গে এখন তোকে আসতেই হ'বে।

সমীর আর একটু করুণ স্বরে বললে—"আমায় বাদ দিয়ে তোরা সবাই বেড়িয়ে আয়না ভাই; আমি ততক্ষণ এখানে একটু ঘুমিয়ে নিই।"

বন্ধুরা মেজাজ গরম করে বললে—"বটে, আমরা এই রাত্রে জলের ভেতর যাব ওর শ্বশুর বাড়ী খুঁজতে আর উনি ওখানে দিব্যি আরামে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ফ্যানের তলায় ঘুম লাগাবেন। সেটী হ'তে দিচ্ছি না।" বলেই একজন তাকে একটানে বিছানার উপর উঠে বসাল এবং সে কিছু বলবার পূর্ব্বেই সকলে মিলে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই নীচে নামিয়ে নিয়ে এল।

নীচে সদর দরজা খুলতেই চোখে পড়ল রাস্তায় এক হাঁটু জল। অত জলে সমীর কিছুতেই নামতে চায় না দেখে প্রভাত অগ্রসর হয়ে এসে বললে—"আজকে আপনার কোন আপত্তিই আমরা শুনব না সমীরদা। আপনাকে আসতেই হবে।"

অন্য বন্ধু বললে—"বাইরে না বেরিয়ে ঘরের ভিতর বসেই যে এমন জলের রাত্রির স্ফূর্ত্তিটুকু আমরা নষ্ট করব, তা মনেও করিস না সমীর। মালকোচা মেরে কাপড় পরে আমাদের সঙ্গে নেমে পড়্‌।"

প্রভাত আবার বললে—"আর তিনটী সপ্তাহও নাই বউদি আসবার। তারপর বউদির বিনানুমতিতে আমাদের দলে এসে স্ফূর্ত্তি করবার আপনার সাধ্যও থাকবে না, অবসরও হবে না কাজেই এখনও যে কটা দিন আছে, আপনাকে আমাদের স্ফূর্ত্তির খোরাক জোগাবার জন্যই দান করতে হ'বে।

সমীর ততক্ষণে পাশের একখানা টুল দখল করে বসে পড়ে বললে—"আজকে রাত্রিটা আমায় ছুটি দিয়ে তোরা হৈ হৈ করে বেড়িয়ে আয়, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

প্রভাত বললে—"আবার যদি আপনি আপত্তি করেন

তবে আমি সমস্ত রাস্তা আপনাকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াব।"

প্রভাত দলের ভেতর সব চেয়ে ছোট কিন্তু গায়ে শক্তি রাখে সকলের চেয়ে বেশী। শোনা যায় সে নাকি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকে। চেহারাটাও তাহার সুস্থ সবল যণ্ডা গোছের। সে সত্য সত্যই তাহার বলিষ্ঠ দুটি বাহু বাড়িয়ে সমীরকে ধরে জোর করে নিজের কাঁধে বসিয়ে নিলে।

হাসি ঠাট্টা কোলাহলের ভিতর দিয়ে ছেলের দল রাস্তার জলে নেমে পড়ল। বয়স সকলেরই অল্প, তরুণ মন, অদম্য স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা। তারা পরীক্ষা দিয়ে সংসারের পথে পা বাড়াতে সুরু করেছে, কেউ বা করবে। সংসারের কারবারে দুঃখ দৈন্য দুশ্চিন্তায় তখনও তাদের তরুণ চিত্তের যুব-জনোচিত সরস আনন্দ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষ নিয়ে তারা মন খুলে লাফালাফি হাসাহাসি করে অত রাত্রে রাস্তার জলে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল।

এই নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে মত্ত যুবকের দলই সে রাত্রে শিলা বৃষ্টির সময় রামবাগান লেনের সমীরের ভাবী শ্বশুর বাড়ীর সম্মুখে বাড়ুজ্জেদের রকে আশ্রয় নিয়ে হাসি তামাসা করছিল; আর তখন দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে মাতাল বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞা অনু ও ফুলী ছেলের দলের উল্লাসপূর্ণ হাসি দেখে সকলকে মাতাল ভেবে নিজেরা অনর্থক শঙ্কিতা হয়ে উঠেছিল।

যদিও রাস্তাটায় সমীর বন্ধুদের সঙ্গে সমান উৎসাহে তর্ক ও চীৎকার করে এসেছিল কিন্তু রাম বাগান লেনে ঢুকে হঠাৎ তার কেমন একটু লজ্জা বোধ হওয়ায় তার মাথাটা একটু নীচু হয়ে মুখের জবাব বন্ধ হয়ে এসেছিল। বন্ধুরা নিজেদের কলরব নিয়ে মত্ত থাকায় সমীরের নিস্তব্ধতা কিছু মাত্র লক্ষ্য করেনি, কিন্তু অনু ও ফুলি তাহা লক্ষ্য করেছিল।

সমীর রাস্তায় বেরিয়ে অনেকবার কাঁধ থেকে নামতে চাইলেও বন্ধুর দল জোর করেই তাকে প্রভাতের কাঁধে বসিয়ে রেখে সমস্ত রাস্তাটাই তাকে নিয়ে সংএর মত ঘুরে বেড়িয়েছে। সমীরের এই কাঁধে চড়া দেখেই অনু ও ফুলীর মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে সুন্দর ছেলেটী অত্যন্ত বেশী মদ খেয়েছে বলেই চলৎশক্তিহীন হয়েছে, তাই বন্ধুর দলকে বাধ্য হয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

সমস্ত ঘটনা মিলে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ হাসি ঠাট্টা ছাড়া মাতালের বাষ্প মাত্রও নাই অথচ এক মিথ্যা কল্পিত সন্দেহের বশে অনুর জীবন বিড়ম্বিত হইল।

শুভদৃষ্টির সময় সে কিছুতেই তাহার অলস মনের একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ দুইটি টানিয়া খুলিতে পারিতেছিল না। সকলে যখন তাকে বারবার শুভদৃষ্টি করিবার জন্য বলিতে লাগিল তখন লজ্জা ভয় অথবা কোন এক অজানিত আশাঙ্কায় তার চোখ আপনিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

অতবড় ভারী মেয়ে, কতক্ষণ আর তাহাকে পীড়িশুদ্ধ রাখা যায়, দাদারা প্রায় হাপিয়ে উঠেছিল। সতীশ একটু অনুযোগের সুরে বললে—"লক্ষ্মী বোনটি আমার, চোখ খোল শুভদৃষ্টিটা করে নে। তোর মত ভারী মেয়ে কতক্ষণ আর ধরে রাখতে পারি বল? আমাদেরও ত কষ্ট হয়। চেয়ে দেখ তোকে এতক্ষণ উচু করে ধরে থাকায় আমরা কি রকম ঘেমে গিয়েছি।"

সতীশের কথায় অনুর চেতনা যেন নিজের ভেতর ফিরে এল, ভাবলে 'সত্যিই ত, আমার জন্য দাদাদেরও ত কষ্ট কম হচ্ছে না। তার জন্য ভাইদের কষ্ট হচ্ছে ভেবে সে তখন প্রাণপণ শক্তি সংগ্রহ করে একান্ত চেষ্টায় তার চোখ টেনে খুললে।

দাদারা সমীরের সামনে এমনভাবে পিড়ি উচু করে ধরেছিলেন যে অনু চোখ মেলবামাত্র তার দৃষ্টির সহিত সমীরের দৃষ্টি মিলিত হ'ল।

হাস্য কৌতুকোজ্জলে পরিপূর্ণ সুন্দর বড় বড় দুইটী চোখ। প্রাণের দীপ্তিতে তা পরিপূর্ণ, নির্ম্মল দৃষ্টি স্নিগ্ধ সে চাহনি। এই দৃষ্টিই অনু প্রথম দেখেছিল সমীরের চোখে তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে, শিলাবৃষ্টির রাত্রে, উজ্জল গ্যাসালোকে, বাড়ুজ্জেদের রকে। সে দৃষ্টিতে ভয় পাইবার লেশমাত্র আভাষ নাই। সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দের উৎস। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে ফল হইল এখানে বিপরীত।

সমীরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইবা মাত্রই তাহার উজ্জল দুইটী চোখ অনুর মনে আশ্বাস না দিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিল।

অনুর মনে তৎক্ষণাৎ ফুলির কথা আঘাত করিল,—

"সুন্দর হ'লে কি হবে, মাতাল ত ?"

দুঃসহ বেদনায়, অপরিসীম ঘৃনায় অনুর চোখ আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মুখে ভয় ও বিতৃষ্ণা একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় রক্তশূন্য বিবর্ণতা দেখা দিল।

সমীর নব বিবাহিতার মুখের ভাবের হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার নিজের মুখের ও আনন্দোচ্ছাস চলিয়া গিয়া সেখানে স্নেহ মমতার সহিত ব্যথা ও বেদনা দেখা দিল। চোখ দুটীতে ভাসিয়া উঠিল অপরিসীম বিস্ময়!

বাড়ীর প্রাচীন প্রথানুযায়ী শুভদৃষ্টির সময় বর ক'নের সাতবার দৃষ্টি বিনিময় করিবার নিয়ম; কিন্তু অনু সেই যে একবার চক্ষু বন্ধ করিল শত অনুরোধ উপরোধেও কেহ তাহার চক্ষু খোলাইতে পারিলনা। গরমে তখন সকলেরই খুব কষ্ট হইতেছিল; এবং সমীরের রহস্যোজ্জল দৃষ্টিতে যে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও দাদারা একটু লক্ষ্য করিলেন কিন্তু সকলেই ভাবিলেন, গরমে অনুর মত সমীরের ও খুব কষ্ট হইতেছে, তাই হয়ত ছোকরা মুখের হাসি আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দাদারা অনুসহ সাতবার পিড়াখানা ঘুরাইয়া নামাইয়া রাখিলেন। বাড়ীর প্রথানুযায়ী বরকনের সাতবার দৃষ্টি বিনিময় করিবার নিয়ম থাকিলেও অনুর বেলায় তাহা সম্পূর্ণ হইল না। সে একবার তাকাইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিল। অনুর দিদি বউদিরা নিজেদের ভিতর বলাবলি করিলেন—

"এদিকে ত বাজনা শুনেই মেয়ে বর দেখতে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় লজ্জায় চোখই খুলতে পারলোনা; কি অদ্ভুত লজ্জা মেয়ের।"

বিবাহ, বাসী বিবাহ সমস্ত কাজই সম্পন্ন হইল! অনু নির্ব্বাক ভাবে যথারীতি কথিত কাজগুলি করিয়া গেল!

এইবার বিদায়ের পালা। সন্ধ্যা রাত্রেই মোটরকারে করিয়া বরকনের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু দৈব বিবাদী, যাত্রার সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাই সকলে স্থির করিলেন বৃষ্টি একটু কমিলে তখন রওনা হইবেন, সন্ধ্যা গিয়া গভীর রাত্রি হইল, কিন্তু বৃষ্টির প্রকোপ বাড়িল বই কমিলনা। আকাশের অবস্থা দেখিয়া অনুদের বাড়ীর সকলে বলিলেন, এই দুর্যোগের রাত্রে আর বর কনের গিয়া কাজ নাই। সমীরদের বাড়ীর যাহারা তখনও সেখানে আছে সকলে মিলিয়া অবশিষ্ট রাতটুকু বিবাহ বাড়ীতেই কাটাইয়া পরদিন একটু বেলা থাকিতেই যাত্রা করিবেন ভাবিলেন। ইহাতে সমীরদের বাড়ীর গ্রামস্থ পুরোহিত মহাশয় ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিবাহের পরদিনের রাত্রি কালরাত্রি, সে কালরাত্রি কখনও কন্যার বাড়ীতে যাপন করিতে নাই, তাহাতে সমীরদের বংশে ভীষণ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা আছে। বংশানুক্রমিক যে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে জল ঝড়ের অজুহাতে তাহা ব্যতিক্রম করিলে এ বিবাহ কিছুতেই মঙ্গলের হইতে পারেনা। ইত্যাদি

কন্যা পক্ষের সেই ঝড় বাদলের রাত্রে কন্যা পাঠাইতে আদৌ ইচ্ছা নাই। তাহারাও নানাভাবে বিভিন্ন তর্ক তুলিলেন কিন্তু নানা তর্ক বিতর্কের পর বর পক্ষের পুরোহিত মহাশয়ের কথাই রাখিতে হইল। একবার যখন কন্যা সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে তখন আর তাহার উপর পিত্রালয়ের লোকের কোন দাবী দাওয়াই নাই। এত যে স্নেহের পুতলী, সম্প্রদানের পর মূহূর্ত্ত হইতেই সে সম্পূর্ণ পর হইয়া গেল।

অনুর পিতামাতাও পাছে কাল রাত্রি কন্যার বাড়ীতে কাটাইলে তাহাদের কন্যা জামাতার জীবনে কোন অমঙ্গলের রেখাপাত করে এই মিথ্যা আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া সেই রাত্রেই জল ঝড়ের ভিতরে কন্যা জামাতাকে বিদায় দিতে স্বীকৃত হইলেন।

রাত্রি যখন প্রায় দুইটা বাজে, বাহিরে তখন ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ সামান্য কিছু কমিয়া আসিয়াছে, ভিতরে বিবাহ বাড়ীর কলরব ও নিঃঝুম হইয়াছে। এ কয়দিনের অনিয়মের ক্লান্তিতে অনু তখন গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। অপর ঘরে সমীরও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু—তর্ক বিতর্কের পর—যাত্রা করাইবার জন্য অনুর পিতা মাতা জ্যোঠামহাশয়

পিশিমা ইত্যাদি কয়েকজন এবং উভয় পক্ষের পুরোহিত মহাশয়েরা জাগিয়া বসিয়া আছেন।

বর-কনের সঙ্গে যাইবার জন্য যে কয়জন বন্ধু বান্ধব গাড়ী মোটারকার সহ আসিয়াছিলেন বৃষ্টির প্রকোপ দেখিয়া সকলেই সন্ধ্যার সময় নিজেদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া সে রাত্রে আর বরকনের যাওয়া হইতে পারে না বিবেচনায়, তাহাদের নিবার জন্য পুষ্প মাল্যে বিভূষিত যে মোটারকার আসিয়াছিল তাহাও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই এখন এত রাত্রে খান দুই থার্ডক্লাশ ভাড়াটীয়া গাড়ী ছাড়া, বর ক'নে নিবার জন্য অমন দুর্য্যোগে আর কোন যান-বাহনই জুটিল না।

সমীরকে ডাকিতেই সে উঠিল ও জিজ্ঞাসা করিল—"আজ এত রাত্রে না গেলেই কি নয়? বড় ঘুম পাচ্ছে যে।"

সতীশই ডাকিতে গিয়াছিল। অনুদের সে রাত্রে বিদায় দিতে তার নিতান্ত আপত্তি, কিন্তু যাইতে দিতেই হইল, কাজেই তার মেজাজটা তখন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না, তাই সে একটু চড়া সুরেই সমীরের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"না হে না, আজ রাত্রেই তোমাদের বিদায় হ'তে হবে। গ্রাম থেকে কি যে টিকিধারী পুরুত ঠাকুর এনেছে তার বাক্যের দাপটে আমরাও অস্থির।

"কালরাত্রি" "ভীষণ অমঙ্গল" "সমীদের বংশে কখনও এমন ঘটেনি" ইত্যাদি চীৎকার করে তিনি কাকা কাকীমাকে (অনুর পিতামাতা) পর্য্যন্ত এমন ভড়কে দিয়েছেন যে তাঁরা পর্য্যন্ত তোমাদের আজ রাত্রে যাওয়াই সঙ্গত মনে করেছেন।"

অগত্যা দুইহাতে ঘুমন্ত চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সমীর সতীশের সহিতই উঠিয়া আসিল।

অনু গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে এক রকম টানিয়া উঠাইতে হইল। জড়িত চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি করব?"

উত্তর শুনিল—"তোকে এখন শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে।"

"এত রাত্রে?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িল তাহার বিবাহ হইয়াছে একটা মাতালের সঙ্গে; এবং ভাবিল, সেই মাতালই জোর করিয়া এতরাত্রে তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাইতেছে। অনুর হৃদয় ভয়ে ও ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল; তখন হইতে তাহার মন সমীরের প্রতি পরম বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে লাগিল।

এইবার সে প্রথম কাঁদিতে সুরু করিল। সকলে ভাবিল পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন পরিচিত সংসার সব ছাড়িয়া অজানিত স্থানে যাইবার আশঙ্কায় এই কান্না। হয়ত স্বাভাবিক মনের অবস্থায় অনুর এ রোদন তাহাই হইত। কিন্তু তখন তাহার মনের অবস্থা এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত দুঃখ ছাপাইয়া সেখানে তাহার স্বামী যে মাতাল এই ভয় ও বিভীষিকাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তাহার পরম স্নেহময় পিতা ও জ্যাঠামহাশয় কখনও কি মাতালের সহিত অনুর বিবাহ দিতে পারেন? এ কথা অনু ভাবিল না।

ভাবিল যে,—তাঁহারাও হয়ত অনুর মতই এই লোকটীর বাহিরের সৌম্য শান্ত সুন্দর রূপটা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া অনুর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

অনু এমন করিয়াও ভাবিল না—যে ফুলীর কথা ব্যতীত লোকটী যে সত্যই মাতাল তাহার প্রমাণ কি?

সে কিছুই ভাবিল না; সে শুধু জানিল, তাহার এক মাতালের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

মাতাল বিষয়ে নিজ মনে বিচার বিবেচনা করিয়া কোন কিছু ঠিক করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুর মন বিমুখ হইয়া সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। সে দুই হাতে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি ও মাতালের সঙ্গে কিছুতে যাব না জ্যাঠা মশাই, তোমরা আমায় জোর করে ওর সঙ্গে পাঠিও না।"

কান্নার রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসে অনুর কথাটা জড়াইয়া আসিতেছিল, তাই সে যে কি বলিল তাহা কেহই প্রায় শুনিতে পাইল না ও শঙ্খের উচ্চ রোলে "মাতাল" কথাটা কাহারও কানেই পৌঁছিল না।

কেহ কিছু না শুনিয়াই ইহা অনুর বিদায় বেলার কান্না

ভাবিয়া সকলেই নিজ নিজ চোখ মুছিতে মুছিতে এক রকম জোর করিয়াই অনুকে গাড়ীর নিকট নিয়া গেল।

অনু দেখিল কেহই তাহার কথা শুনিতেছে না, বরং জোর করিয়াই মাতালটার সহিত যাইবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিল; এই ভাবিয়া তাহার মন পিতা মাতা ভাই বোন, আত্মীয় পর, জ্যাঠামহাশয় সকলের প্রতিই নিতান্ত বিমুখ হইয়া উঠিল। সে সকলের প্রতি দুরন্ত অভিমানে আর একটী মাত্রও শব্দ উচ্চারণ না করিয়া, একান্ত চেষ্টায় অশ্রু জল সম্বরণ করিতে করিতে গুম্ হইয়া গিয়া গাড়ীতে বসিল।

একটু পরেই সমীর আসিয়া যখন তাহার পাশে বসিল তখন তাহার স্পর্শ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য অনু যতদূর সম্ভব স'রিয়া জানালা ঘেঁসিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বৃষ্টি আসিতেছিল বলিয়া জানালা বন্ধ ছিল; বাহিরের দিকে কিছুই দেখা যায় না। অনু একটু নড়িয়া বসিয়া পলকের জন্য সমীরের দিকে চাহিল, তখন কি জানি কেন সমীরও শ্যামলীর দিকে তাকাইল। উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইতেই শ্যামলী তৎক্ষণাৎ চক্ষু নত করিল। আবার তাহার মুখের ভাব কঠোর হইয়া ঘৃণার ছাপ প্রকাশিত হইল। কিন্তু তখন সে মনে মনে বলিল—"অমন সুন্দর অম্লান চক্ষু দুটী যার, সে কি কখন মাতাল হ'তে পারে?"

আর চলন্ত গাড়ির সেই ক্ষীণ দাপালোকেও স্ত্রীর চোখের সেই দৃষ্টি ও মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সমীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ভাবিল—অতটুকু মেয়ের চোখে কি হিংস্র দৃষ্টি। মুখের ভাবে কি নিবিড় ঘৃণার ছাপ প্রকাশিত। আত্মীয় বিচ্ছেদ ব্যথার অশ্রু জলের লেশ মাত্রও ত ও চোখে মুখে নাই। সমস্ত মুখখানা শবের মত বিবর্ণ, আর এই মেয়েটীই তার বিবাহিতা স্ত্রী।

রাত্রি প্রায় তিনটা আন্দাজ, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভিতরে বর ক'নে সহ ছ্যাকরা গাড়ী আসিয়া সমীরদের দরজায় থামিল। অমন দুর্য্যোগের রাত্রে সময় মতই যখন বর ক'নে আসিতে পারিল না, গাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন সকলেই ভাবিলেন যে রাত্রিটা মেয়ের বাড়ী কাটাইয়া সকালে বর-বধূ আসিবে। পুরোহিত ঠাকুর যে জোর করিয়াই তাহাদের আনিবে এ কথা কেহ ভাবিতেও পারে নাই; তাই বধুবরণ করার জন্য সন্ধ্যারাত্রে যে সব আয়োজন হইয়াছিল, সমস্ত সরঞ্জাম গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া ও সব কাজ কর্ম্ম চুকাইয়া দিয়া সমীরদের বাড়ী শুদ্ধ লোক তখন গভীর নিদ্রায় সুপ্ত।

অনেক ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কাতেও কেহ যখন উঠিল না, তখন গাঁটছড়া বাঁধা চাদরখানা আস্তে অনুকে ছাড়িয়া দিয়া সমীর আসিয়া রাস্তার দিকের একটী জানালা জোর করিয়া খুলিয়া, রাস্তা হইতে দুই হাত আঁজলা করিয়া খানিকটা জল নিয়া ঘরের ভিতর ছিটাইয়া দিল, ও সঙ্গে সঙ্গেই হাউ, মাউ, বাবাগো বলিয়া একটা লোক চীৎকার করিয়া উঠিল।

তখন সমীর বলিল—"এই কেষ্ট, ভিজে মলাম, তুই দরজা খুলবি কিনা বল।"

"ওমা, ছোড়দাদাবাবু যে।"

বলিয়া সে ব্যস্ত সমস্তে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাহার ভয় ও বিরক্তি চলিয়া গিয়া গলার রুক্ষ স্বর মোলায়েম মেজাজে নামিয়া আসিল।

এ গাড়ীতে অনু ঝী সহ বসিয়া রহিল, অপর গাড়ী হইতে পুরোহিত ঠাকুর, সমীরের মামা ও অন্যান্য সকলে নামিয়া পড়িলেন।

রাস্তার গ্যাসের অস্পষ্ট আলোক ছাড়া, সে স্থানটা প্রায় অন্ধকার। সমস্ত বাড়ীর সব আলোক নিভাইয়া দিয়া বাড়ী-শুদ্ধ লোক তখন ঘুমন্ত। নববধূ আসিয়াছে, তাহাকে নামাইবার, বরণ করিয়া নিবার কোন আয়োজনই তখন সেখানে নাই। ইহা দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুর ত চটিয়া অস্থির, সঙ্গে মামারাও চেঁচাইতে লাগিলেন—"কি আক্কেল, বাড়ী শুদ্ধ লোক যেন মরে আছে। বধু বরণ করার কোন বিধি ব্যবস্থা কিছু তৈরী নেই।"

তাহারা এটুকু ভাবিলেন না, বিধি ব্যবস্থা সবই যথাসময় ঠিক ছিল, কিন্তু তাহারাই সে সময়মত আসিতে না পারায় এমন বৃষ্টি বাদলের ভিতর এমন গভীর রাত্রে নববধুর আসার আশা কেহই করিতে পারে না।

তখন নীচ তালায় একটা জাগরণের সঞ্চার হইয়াছে।

আলো জ্বালান, এ ওকে ডাকিয়া উঠান, উপরে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে গিন্নীমাকে নব বধূ আসার সংবাদ দিবে, এ জন্য দৌড় ধাপ করিয়া উপরে যাওয়া ইত্যাদি কোলাহ'লে বাড়ী তখন মুখর হইয়া উঠিতেছে। আর এ দিকে যাহার জন্য এত ব্যস্ততা, সে বধূ তখনও গাড়ীর একপাশ ঘেসিয়া বসিয়া আছে।

অনুকে না নামাইয়াই যখন মামারা উপরে চলিয়া গেলেন, এবং সকলে বৃথাই এ দিক্ ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে, দেখা গেল, তখন সমীরই অগ্রসর হইয়া, আসিয়া গাড়ার ভিতর মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার সঙ্গে এস অনু, আমরা মায়ের কাছে যাই।"

অনু এ কথায় উঠিবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ করিলনা দেখিয়া সে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"এই যে, আমার হাত ধরে নেমে এস অনু, আমি তোমায় ওপরে নিয়ে যাই।"

তবু অনু উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করেনা দেখিয়া, তাহার সহিত যে বৃদ্ধা ঝি আসিয়াছিল সে বলিল—"সত্যি বাপু যে বিধি ব্যবস্থা দেখছি তাতে কেউ যে তোমায় নাবাতে আসবে তা মনে হয়না। এত রাত্তির দেখে সবাই হয়ত ঘুমুচ্ছে! তুমি জামাই বাবুর হাত ধরেই নেবে পড় দিদিমণি। জামাইবাবু আর কতক্ষণ জলের ভিতর দাঁড়িয়ে ভিজবেন বল।"

রাত দুপুরে অর্দ্ধঘুমের পর ক'নে-সহিত আসিতে ঝিয়ের খুব ইচ্ছা ছিলনা, তাই সমীরদের বাড়ীর লোকের প্রতি মনটা তাহার খুব প্রসন্ন ছিলনা। এখন আবার নব বধূকে নামাইবার জন্য তৎক্ষনাৎ কেহ দৌড়াইয়া আসিলনা দেখিয়া সে মোটেই খুসী হইতে পারে নাই, তাই সে একটু জোরেই সমীরকে শুনাইতে বলিল—"রাত দুপুরে ত সেখান থেকে ঠেলেঠুলে এই জল বাদলে নিয়ে এলে; কিন্তু এখানে বৌ আসবে বলে না আছে কোন আলো বাতি, না কেউ এল বৌ নাবাতে তাড়াতাড়ি।"

সমীরের কানে সবকথাই গেল; শুধু ভাবিল মামারাই যখন এ নিয়ে দোষারোপ করেছেন তখন আর একটা অশিক্ষিত ঝি এর কথার প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিয়া লাভ নাই যে বিধি ব্যবস্থা আলো বাতি সবই ছিল ও আছে কিন্তু তাহারাই অসময়ে আসিয়া পড়িয়া সবাইকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে এবং নিজেরাও বিব্রত হইতেছে।

মুখে সে বলিল—"এ দিকটা কি অন্ধকার, সিঁড়ীর দিকেও ত আলো দেখছিনা। তুমি আগে ঐ চালন বাতি না কি সব তোমার হাতে রয়েছে তাই নিয়ে নেমে পড়। তোমার সেই আলোর পেছনে পেছনে আমরা আসছি।"

ঝী রাস্তায় নামিতেই সমীর গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সস্নেহে অনুর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল—রাত প্রায় ভোর হ'য়ে এল। কতক্ষণ আর একা গাড়ীর ভেতর বসে বসে থাকবে অনু। আমার সঙ্গে এস, মায়ের কাছে যাই।

সঙ্গের ঝী নামিয়া গিয়াছে। গাড়ীর ভিতরে সে তাহার মাতাল প্রভু সহ একা। মনে মনে তার কেমন একটা ভয় হ'ল তাই কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে সে সমীরের মুঠির ভিতরে নিজের আবদ্ধ হাতখানি ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে তাহার পাশে নামিয়া দাঁড়াইল।

চালন বাতি সহ ঝী আগে আগে চলিতেছে, আর সেই ক্ষীণ দীপালোকে অনু ও সমীর পিছনে পিছনে আসিতেছে।

তখনও সমীরের হাতের ভিতরেই অনুর শিথিল হাত খানি আবদ্ধ আছে। মাতাল তাহাকে ধরিয়াছে বলিয়া বিতৃষ্ণা আসিতে পারে, কিন্তু মাতালের হাতখানি ত বড় কোমল, মাতালের স্পর্শ ত বড় স্নিগ্ধ, সে স্পর্শে কেমন যেন একটু অননুভূত মধুরতা আছে যাহা পূর্ব্বে কোন দিন কোন কারণেই সে অনুভব করে নাই।

সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে কারণেই হউক, কিছুমাত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া সমীরের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে দোতালা পর্য্যন্ত আসিল। সেখানে তখন সমস্ত আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীশুদ্ধ সকলে না জাগিলেও অনেকেই তখন জাগিয়া উঠিয়াছে ও নববধূ কোথায় খোঁজ খবর লইতেছে। এমন সময় অনুকে নিয়া সমীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বারান্দায় আসিয়া ঐ উজ্জ্বল আলোকে কেহ কিছু দেখিবার পূর্ব্বেই সমীর অনুর হাতখানা আস্তে ছাড়িয়া

দিল। এই অচেনা পুরীতে এতগুলি অপরিচিতের ভিতর যে কোমল হাতখানা সামান্যক্ষণের জন্যও তাহাকে আশ্রয় দিয়া অন্ধকার সিড়ি হইতে এই জন সমাকুল স্থানে আনিয়াছে সেই হাতের আশ্রয়খানা ধীরে সরিয়া যাইতেই অনু নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ সমীরের দিকে চক্ষু ফিরাইল। যেন সে জানিতে চায় যে স্নিগ্ধ স্পর্শের ভিতর একখানা মোলায়েম হাত আশ্রয় করিয়া এখানে আসিয়া পৌছিল, সে স্পর্শ, সে আশ্রয় হঠাৎ কোথায় কতদূরে সরিয়া গেল। সমীর তখন খানিকটা সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া ঘোমটার ভিতর দিয়া সে সমীরকে ভালদেখিতে পাইলনা, শুধু দেখিল, যে হাতখানা তাকে ধরিয়াছিল সেই হাতের আঙ্গুলগুলি। ভাবিল লোকটীর আঙ্গুলগুলিই বা কি সুন্দর। সুন্দরের মোহ মানুষকে এমন করিয়াই মুগ্ধ করে। তখনকার মত সমীরের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণার ভাব কমিয়া গেল। মনে মনে সে বলিল—"সব দিকে যে এত সুন্দর সেও মাতাল হয়।" তাহার কিশোরী চিত্ত ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

সমীর অনুকে ছাড়িয়া একটু সরিয়া যাইতে না যাইতে সমীরের বড় বউদি নীতা পাশের একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও অনুকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত দু'খানি নিজের হাতের ভিতর নিয়া হাসি মুখে বলিলেন—"এমন দুর্য্যোগের রাত্রেও ঠাকুরপো তোমায় টেনে এনেছেন। তার আর দোষ কি বল। নিজের জিনিষ কি এখন আর এতটুকু দূরে রাখতে ইচ্ছে করে। তোমাদের না নিয়েই যখন গাড়ী ফিরে এল, তখন আজ রাত্রে আর তোমাদের আসা সম্ভব নয় জেনেও—যদিই বা তুমি আস, এই ভেবে আমরা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তোমাদের আশায় জেগে ছিলাম। নিজের লোকের ওপর এমনই টান হয়। তোমারা যে আজ রাত্রে আসবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। যাক্, তুমি যে আজই এসেছ এতে ভারী আনন্দ হচ্ছে। এস বোন, এস তোমার আশায় আমরা গত ক' মাস হ'ল দিন গুণে এসেছি।"

নীতা আদর করে অনুকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে। অনুও এই অপরিচিত স্থানে অমন হাসি ভরা মুখের এই কয়টা আদরের কথা শুনে সব ভয় ভাবনা ত্যাগ করে বড় জায়ের বাহু বেষ্টনীর ভেতর নিজকে ছেড়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও আরাম বোধ করল। (ক্রমশঃ)

বাংলা দেশের মেয়ে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সাহা

বাংলা-ঘরের লক্ষ্মী তোরা বাংলা দেশের মেয়ে,
কোরূছে আশা ভাবী বাংলা তোদের মুখটী চেয়ে।
স্বামীর পায়ে হ'য়ে শিকল,
করিস্ না ক তারে বিকল,
রুদ্র পাশে শক্তি হেন তোদের সাথে পেয়ে,
কর্ম্মপথে হোক্ আগুয়ান, জগৎ দেখুক্ চেয়ে।
স্নেহ পাশে মায়া ডোরে,—
রাখিস্ না কো পঙ্গু কোরে,
উচ্চশিরে সন্তান তোর বলুক্ মানুষ হোয়ে,
"শক্তিময়ী মা যে মোদের, বাংলা দেশের মেয়ে।
তোরাই তাদের জন্মদাত্রী,
তোরাই তাদের হবি ধাত্রী,
শিক্ষা, দীক্ষা, শক্তি, সাহস, তোদের কাছে পেয়ে,
তোদের হাতে উঠবে গড়ে' ভাবী বাংলার মেয়ে।
লক্ষ্মী তোরা গৃহমাঝে,
শক্তি তোরা সর্ব্বকাযে'
আদ্যাশক্তির অংশ হতে জন্ম তোরা লয়ে'
বাংলা-ঘরের লক্ষ্মী তোরা, বাংলা দেশের মেয়ে।

শিশুপালনে মায়ের দায়িত্ব ও শিশুপালন

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

এখন, শিশুপালন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া অদ্যকার আলোচনা শেষ করিব।

শিশুর প্রয়োজনীয়তা

"শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা।" শিশু ভিন্ন অন্য কেহই বংশ রক্ষা, জাতি রক্ষা, বা দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন! কিন্তু যদি সেই শিশু সুস্থ ও বলিষ্ট না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশরক্ষা—জাতিরক্ষা—বা দেশরক্ষার কোন কাজই হয়না। যদি সে চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক—দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হওয়া যে কি নিদারুণ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রনা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ—পিতামাতার সে যে কি জীবন্ত দহন—তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে মাত্র তাঁহারাই জানেন! ইহা অন্যের ধারণা হওয়া সম্ভবপর নয়।

শিশু এরূপ হয় কেন? শিক্ষার দোষে।

শিশুর শিক্ষা

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সৎশিক্ষা না পায়, সে কখনও সুস্থ বলিষ্ট চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারেনা। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে পালন করা হয় না, তাহাকে যথারীতি 'পালন' করিতে হইলে, তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া সদৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না। আবার বলি—গর্ভধারিণী হওয়া সহজ কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়। "জননি, তুমি যদি সন্তানের 'মা' হইতে চাও, প্রথমে নিজেকে সংশোধিত করিয়া পরে তোমার কোলের শিশুর শিক্ষা বিধানে যত্নবতী হও। বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তোমার সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম দিন হইতে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা—সুশৃঙ্খলা—শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।" তাই আমার সকাতরে নিবেদন—"মা, যদি তুমি সুস্থ—বলিষ্ঠ—চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে, বংশের গৌরব—জাতির গৌরব—দেশের গৌরব স্বরূপ দেখিতে চাও,—তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও! তোমার বংশ ধন্য হউক! সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি গৃহ, সুস্থ বলিষ্ঠ চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

শিশুর শিক্ষারম্ভের প্রকৃষ্ট কাল ও স্থান।

প্রকৃত শিক্ষা। বাল্যের শিক্ষক

আঁতুড়ে জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ-সন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। বাল্যকালের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাস হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত সহজে অভ্যাস হয় না। ভাল বা মন্দ, বাল্যের শিক্ষা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়। সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল-কলেজে অর্থকরী বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু তথায় 'মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আজ কাল পিতৃমাতৃ সন্নিধানে ও নিজ পরিজন মধ্যে শিশু যে শিক্ষা পায়, ক্ষেত্র-

বিশেষে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই হইতে বেশী দেখা যায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি, শিশু যখনই যাহা চায়, সে যখনই আবদার ধরে, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, স্নেহবশতঃ পিতা বা আত্মীয়স্বজন তখনই তাহাকে সেই দ্রব্য দিয়া থাকেন বা তাহার সেই আব্দার পুর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নপর হন। এরূপ করিলে শিশুর লালসা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই ক্লেশময় হয়। বাল্যকাল হইতে শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। দয়া ক্ষমা ভালবাসা প্রভৃতি তাহার বিভিন্ন সৎ-প্রবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে; এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে তাহার হৃদয়ে উদিত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিশু যখন পাঠশালা যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব 'গুরু' মহাশয়ের উপরেও কতকাংশে নির্ভর করে। কারণ, তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক। পাঠশালাতে শিশুর 'গুরুকরণ' আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'উপযুক্ত' মাতৃগুণলাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে 'মা' হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয়, যথোপযুক্ত গুরুগুণবিহীন হইয়াও সেইরূপ অনেকেই গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। 'মা'-ই হউন, আর গুরুমহাশয় হউন—যাহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তিনি, অপরের, বিশেষতঃ ভালমন্দ জ্ঞানশূন্য শিশুর চরিত্র গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কামক্রোধাদি রিপু দমন করিতে অক্ষম, তিনি অপরকে রিপু দমন শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্রগঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া সেই চরিত্র অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষকগণের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্রই—তাঁহাদের শিক্ষাই, দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ শিশুতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য

শাস্ত্রে আছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে শরীর অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে। কেননা, শরীরই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার প্রধান সহায়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপরই বিশেষভাবে ন্যস্ত। শিশু সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ভুমিষ্ট হয়। তখন তাহার শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তৎসমস্তই মায়ের হাতে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত উষ্ণতা ইত্যাদির কষ্ট শিশু কথা কহিয়া প্রকাশ করিতে পারেনা। এমন কি, মলমূত্র ত্যাগ করিলে, অন্যে যতক্ষণ পরিষ্কার করিয়া না দেয় ততক্ষণ তাহাকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হয়—সে এত অসহায়, ক্ষুধার তাড়ন, রোগের যাতনা, শীত-উষ্ণতাদি, দৈহিক ক্লেশ ব্যক্ত করিবার তা'র মাত্র এক অস্ত্র আছে। সে অস্ত্র—'কান্না'। এই কান্না মাতৃহৃদয়ে যেমন প্রতিঘাত হয় তেমন আর কোথাও হয় না। এই জন্যই বলি, "সন্তানের রক্ষার্থেই ভগবান্ একাধারে মাতৃ-হৃদয়ে বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্ম-ত্যাগ পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন।" কিন্তু অনভিজ্ঞা মা শিশু কাঁদিলেই মনে করেন যে, শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছে তাই, শিশু যখনই কাঁদে, তখনই তিনি তাহাকে স্তন্যপান করান বা দুধ খাওয়ান। এরূপ করা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণাদি শিশুর যাবতীয় অভাব কষ্ট প্রকাশ করিবার তাহার অন্য উপায় নাই। এ কথা সকল মায়েরই সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। কেননা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 'মা' যত দায়ী তত দায়ী আর কেহই নয়। তাহাকে সুস্থ, ও বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে হইলে মায়ের হৃদয় 'করুণ' অথচ 'দৃঢ়' হওয়া চাই। কথায় বলে—"ছেলে 'মানুষ' করিতে হইলে তাহাকে হাতের আন্দাজে খাওয়াও, আর বাঘের নজরে দেখ।"

যিনি মাপে মাপে খাওয়ান, তিনিই প্রকৃত মা। এই "মাপে মাপে" খাওয়ানর বিজ্ঞান অতীব অদ্ভুত বিজ্ঞান। গুরুকৃপায় এই বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ হইলে সন্তানের হৃদয় মাতৃ-ভক্তি-রসে স্বতঃই পরিপ্লুত হইয়া যায়। হায় মা! সেদিন আবার কবে হবে! যাক্ সে অন্য কথা।

মায়ের হৃদয় কেবলমাত্র করুণ কিংবা কেবলমাত্র কঠোর, বুঝিতে হইবে, শিশুপালন করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। অন্যের উপর রাগ করিয়া বিনা অপরাধে নিজের ছেলেকে প্রহার করেন, এমন মা এদেশে বিরল নন্!

শিশুকে সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ করিতে হইলে তাহার আহার পরিধান বিষয়ে যে সকল নিয়ম পালন করা একান্ত প্রয়োজন তাহা বলিবার আজ অবসর হইবে না। কিন্তু শিশুর নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে আজ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। কেন না, শিশু যাহাতে 'অমানুষ' না হইয়া 'মানুষ' হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সকল পিতামাতারই একান্ত কর্ত্তব্য। জাতীয়তা সংগঠনের জন্যই 'খাঁটী মানুষ' আজ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ, দেশের দিকে তাকাইয়া আজ মনে পড়ে স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের সেই অমর গীতি—

"ওরে আবার তোরা মানুষ হ'।
"কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হোস্,
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান্।
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্,
বিশ্ব তো'র আপন ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ—
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান—
মিত্র হোক ভণ্ড যে তাহাকে দূর করিয়া দে
সবার বাড়া শত্রু সে—আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দু'টী সেনা, পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ্
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্।
ধর্ম্ম যেথা সে-দিকে থাক্, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্
স্বজন দেশ ডুবিয়া যায়—আবার তোরা মানুষ হ'॥
ওরে আবার তোরা মানুষ হ'।"

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

শিশুকে নিয়মিত খাওয়ান ও পোষাক পরান, অর্থাৎ সুস্থ ও বলিষ্ঠ করা যত সহজ, তাহাকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করা তত সহজ নয়। সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে না পারিলে 'মা' হওয়ার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। তাই প্রারম্ভেই বলিয়াছি, "গর্ভধারিণী হওয়া সহজ কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়।"

আহার—নিদ্রা—মৈথুন, মানব জীবনের কেবলমাত্র কর্ত্তব্য নয়। পশুপক্ষীরাও এই তিনটীরই আচরণ করে। মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়—ত্যাগে, প্রবৃত্তি মার্গে নয়—নিবৃত্তি মার্গে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র ভোগ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত তাহারা পশুর সমান।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

(মনুসংহিতা)

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সৎসঙ্গ—

সন্তানকে সর্ব্বজনপ্রিয়রূপে গঠিত করিতে হইলে তাহাকে কখনও কুসংসর্গে মিশিতে দিবে না। কেননা জঙ্গলী জায়গার ফল যেমন প্রায়ই বিস্বাদু হয়, কুসংসর্গে পালিত শিশুর স্বভাবচরিত্রও তেমনি প্রায়ই অপ্রিয়কর হয়। সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গই—চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব সদবংশের ছেলেদের সহিতই শিশুকে সর্ব্বদা মিলিতে মিশিতে দিবে। এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে পরে পরিতাপের কারণ উপস্থিত হইবে।

শিশুর সম্মুখে সৎ বা অসৎ যে কোন কর্ম্মই করনা কেন, সেই সেই কর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি তাহার নির্ম্মল কোমল অন্তঃকরণে সংস্কার- আকারে, বীজ-আকারে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন সে সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করে, তখন বাল্যের সেই ক্ষুদ্র ছবিগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে সেই সেই সৎ বা অসৎ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করায়। অতএব নিজে সদা সৎকার্য্য করিয়া, শিশুকে সৎকার্য্য করিতে শিক্ষা দিবে। মাত্র মুখের কথায় বা কাগজে-কলমের শিক্ষায়

অপরকে সংশিক্ষা দেওয়া যায় না। নিজে সৎ হইয়া, 'হাতে কলমে' সৎকার্য্য করিয়া ও করাইয়া অপরকে সংশিক্ষা দিতে হয়। সৎ না হইলে অপরকে সৎপথে আনিবার যোগ্যতা জন্মায় না।

সহবৎ

শিশুর সহিত 'তুই-তো-কারী' ভাবে কথা বলিলে সেও সকলের সহিত 'তুই-তো-কারী ভাবে কথা বলে। তাহার সাক্ষাতে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিলে, সেও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। শিশু মায়ের পোষা পাখী; মা তাহাকে যে বুলি শিখান সে তাহাই শিখে। এইসব দেখিয়াও যে কত পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, শিশুর সহিত তুই-তো-কারী করেন ও অশ্লীল বাক্য বলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

সত্যবাদিতা—

মনুষ্যত্বের প্রথম ও প্রধানস্তম্ভ—সত্যবাদিতা। যাহার চরিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে চরিত্রবান হইতে পারেনা। নিজে সর্ব্বদা সত্যকথা বলিয়া অপরকে সত্য বলা শিক্ষা দিতে হয়। নিজ দোষ গোপন করিবার জন্য-কিম্বা সাংসারিক কোন স্বার্থ লাভের জন্যই লোকে মিথ্যা কথা বলে। শিশুর সাক্ষাতে মিথ্যা বলিলে, কিম্বা কোন দোষ গোপন করাইবার জন্য তাহাকে মিথ্যা বলাইলে, সে ক্রমশঃই মিথ্যাবাদী হইয়া দাঁড়ায়।

সরলতা—

শিশুর প্রকৃতি স্বভাবতঃই সরল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে যতই কুসংসর্গে মিলিত হয়ে, ততই প্রকৃতি কুটিল হয়। প্রাণান্তেও শিশুকে কুসংসর্গে মিশিতে দিবে না। সচ্চরিত্র ছেলেদের সহিতই তাহাকে খেলাধুলা করিতে দিবে।

অহিংসা—পরপীড়াবর্জ্জন—

হিংসাপ্রবৃত্তি মানবকে পশুর অধম করে। মায়ের কোলে অন্য শিশু রাখিয়া সন্তানের ঈর্ষা জাগাইয়া আমোদ করেন এমন অনেক আত্মীয় বান্ধব দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, অপরকে দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ দেওয়া কখনই উচিত নয়। জীব যেমন নিজের কষ্ট ভোগ চায় না, তেমনি পরকেও কষ্ট দেওয়া তাহার উচিত নয়। পরপীড়ন মনুষ্যত্ববিরুদ্ধ। [illegible] পাখীর বাচ্চা ও বিড়াল ছানা লইয়া খেলা করিতেছে, তাহাদিগকে কত ক্লেশ দিতেছে, কত কীটপতঙ্গ মারিতেছে, অনেক পিতামাতা তাহা দেখিয়াও দেখেন না। [illegible] ছেলে আনন্দ পাইতেছে, এই দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট। কিন্তু আজ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ পীড়ন করিয়া যে [illegible] আনন্দ পাইতেছে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই আনন্দ [illegible] জন্য মানুষ পীড়ন, এমন কি নিজ পিতা মাতাকেই পীড়ন করিবে, একথা যদি বাপ মা গোড়ায় ভাবিতেন তাহা [illegible] নিজ সন্তানকে বাল্যকালে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ [illegible] করিতে কয়জন বাপ-মা দিতেন?

ক্ষমা—

এই গুণ মহৎ অন্তঃকরণেরই লক্ষণ। শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনায়, তাহাকে বাল্যকাল হইতেই ক্ষমাগুণ শিক্ষা দিতে হয়। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হইলে, এইরূপক্ষেত্রে নিজ ছেলের দোষ সত্ত্বেও তাহাকে শাসন না করিয়া পরের ছেলেকে শাসন করেন, এমন অনেক পিতামাতাই আছেন। এরূপ করিলে নিজের ছেলের যে কত অনিষ্ট করা হয় তাহা তাঁহারা একবার ভাবেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে পরের ছেলের দোষ থাকিলেও তাহাকে ক্ষমা করিয়া নিজের ছেলেকে শিখাইতে হইবে যে, প্রতিশোধ না লইয়া অপরের দোষ ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। প্রতিশোধে শান্তি নাই—ক্ষমাতেই শান্তি।

পুস্তক পরিচয়

চামড়ার কারুশিল্প—

শ্রীযতীন্দ্র মোহন দাশ গুপ্ত, প্রকাশক শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ৫৮।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া কারুশিল্পের কথা ভুলিতে বসিয়াছি। রাখালের বাঁশের বাঁশীতে, কুমারের মাটির ভাঁড়ে এবং ভদ্রলোকের হাতের ভ্রমণযষ্টিতে যে সূক্ষ্ম কারুশিল্প আজও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার প্রয়োজন আর তেমন করিয়া অনুভূত হয়না। এখন কলের

উপরে চাবির কেস্
নীচে মেয়েদের হাতব্যাগ

ইঞ্জিন ছাঁচে ঢালিয়া সুন্দরতম বস্তু তৈয়ারি করিয়া দেয় অতি অল্প সময়ে। তথাপি কারুশিল্পের রসবেত্তাগণ উহার আদর করিয়া থাকেন। শিল্পীর হাতের নিপুণ ছেনী চালনায় পলে পলে যে শিল্পটি গড়িয়া উঠে তাহা কলের ছাঁচের তৈয়ারী বস্তু অপেক্ষা সুধু উৎকৃষ্ট নয়, আভিযাত্যের অধিকারী।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন বহু নবতর কারু শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা উহারই একটির ধারাবাহিক পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া কারুশিল্পামোদী ব্যক্তিগণের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন।

চামড়ার উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইচ্ছামত রং ফলাইয়া ব্যাগ, সুটকেশ, জুতা ইত্যাদি কিরূপ সুন্দর ও সৌখীন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়, গ্রন্থকার সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার অবদান তিনি এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে এই শিল্পের অনুরাগী মাত্রেই তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থকার লিখিতেছেন—এইকাজের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যথা—

১। চামড়া বাছাই,

২। কার্য্যে আত্ম সতর্কতা

৩। ধৈর্য্য

৪। উপযুক্ত রং ফলান

৫। পরিচ্ছন্নতা।

এই কার্য্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকাটি সুদীর্ঘ, উহার আনুমানিক ব্যয় ১৫৲ টাকা মাত্র। এই যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির ব্যবহারপদ্ধতি দিয়া গ্রন্থকার চামড়ার উপর কিরূপে কারুশিল্প ফলানো যাইতে পারে তাহার ধারাবাহিক ভাবে বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি সুন্দর ছবির ডিজাইনও এই সঙ্গে দেওয়া আছে। একটি ছবির ডিজাইন এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে সুন্দর করিয়া রাখা মানুষের স্বভাব, এবং দানে ও গ্রহণে আনন্দ বোধ হয়। চামড়ার কারুশিল্প পুস্তকটি পড়িয়া মনে হইল, কার্য্যটি খুব কঠিন না হইলেও ধৈর্য্যসাপেক্ষ। বঙ্গ মহিলাগণ ইহা পাঠে উপকার লাভ করিবেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ

আছে। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য কিছু বেশি মনে হইল।

বাংলায় ভ্রমণ—পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। বাইণ্ডিং করা আর্টপেপারে মুদ্রিত, মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১॥ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান সেণ্ট্রাল পাবলিসিটীবুরো, ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েজ ই, আই, রেলওয়ে, ফেয়ার্‌লি প্লেস, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীঅমিয় বসু।

মাত্র দেড় টাকায় এরূপ একখানি পুস্তক বিক্রয় বিতরণের নামান্তর। পূর্ব্ববঙ্গ রেল কোম্পানী দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই মূল্য এরূপ সুলভ করিয়াছেন।

বইখানি পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বাংলার যাবতীয় দর্শনীয়, মন্দির, মস্‌জেদ, ধ্বংসস্তূপ, প্রাচীন কীর্ত্তি এবং নব-নগর ও তাহাদের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা দেশের ইহা যেন একটি এন-সাইক্লোপিডিয়া। সুন্দর বর্ণনাভঙ্গী, সুরুচি সম্মত ভাষা এবং প্রচুর চিত্র বইখানিকে প্রত্যেকের নিকট আদরণীয় করিবে। স্কুলের বালক-বালিকা হইতে বানপ্রস্থাবলম্বী বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন। ভ্রমণ করার আনন্দ মানুষের আদিম দিনের ইতিহাসের সহিত জড়িত। আজো মানুষ অকাজে অপথে চলিতে ভালবাসে, অপ্রয়োজনীয় তাহার প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে—ভ্রমণ যাহাদের করা হয় না, বা করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারাও ভ্রমণের নেশায় মাতিয়া উঠিবে এই ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া। "বাংলায় ভ্রমণ" বাঙ্গালীকে শুধু আনন্দ দিয়াই ছাড়িবে না, [illegible] করাইয়া ছাড়িবে। প্রচারবিভাগের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ছবি

শ্রীমমতা ঘোষ

তুচ্ছ ব্যাপার—সামান্ত সে জানি
তবু হেলা যায় না করা তারে,
সে যে কখন্ কোন্ ক্ষণেতে আসি'
চিত্ত আমার ভরল একেবারে।
যে পুলকের নাইকো কোনো ভাষা—
প্রকাশ যারে কর্‌তে নাহি পারি ;
তারেই বলি অনির্ব্বচনীয়,—
অন্তরেতে আলয় জানি তারি।
শীতের রাতে গভীর ঘুমের মাঝে
হঠাৎ আমার নিদ্রা গেল টুটে ;
জান্‌লা ফাঁকে আকাশ দেখা যায়—
নিশীথিনীর তিমির আঁচল লুটে !
দেখ্‌ছি ঘরে বিজ্‌লি বাতি জ্বালা—
শয্যা 'পরে অর্দ্ধ শয়ান হ'য়ে
এক মনেতে পড়ায় তুমি রত
মোটা মোটা কেতাবগুলি ল'য়ে।
পালঙ্কেরি একটি ধারে শিশু
ঘুমায় সুখে মোটা লেপের তলে ;
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে কি ও ?
অধরে ওর হাসির রেখা জ্বলে।
আর এক পাশে ঘুম জড়ানো চোখে
দেখছি তোমায় দেখছি শিশুটিরে,
কিছুই তো নয়,—তবুও অনিমেষে
দুজনারে দেখছি ফিরে ফিরে।
অপূর্ব্ব এক মিষ্টি রসের মাঝে
চিত্ত আমার ডুবল ধীরে ধীরে,
তুচ্ছ ছবি অসামান্ত হ'য়ে
কুহক-মায়ায় রাখল আমায় ঘিরে।

কিষাণগঞ্জ মহিলা সমিতির বাৎসরিক উৎসব

শিল্প প্রদর্শনী ও নটিকাভিনয়

গত জুন মাসে কিষণগঞ্জ মহিলা সমিতির দ্বিতীয় বাৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা ও ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীগণ ও সহরের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি সমিতির বাৎসরিক উৎসবের সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিশু, মাতৃমঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ও মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল এবং ২৩শে জুন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সমিতির সভাপতি মিঃ এ, ডাব্লিউ ক্ল্যাক উহার উদ্বোধন করেন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। শিল্প

শ্রীমতী শোভা মুখোপাধ্যায় সেক্রেটারী, কিষণগঞ্জ মহিলা সমিতি, কমিশনার, কিশনগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কিষণগঞ্জ সাবডিভিশন্তাল কংগ্রেস কমিটি।

প্রদর্শনীতে বহু মহিলা শিল্প দ্রব্য, স্বহস্ত নির্ম্মিত খাদ্যাদি হাতে কাটা সূতা দিয়াছিলেন, প্রদর্শনী তিন দিবস খোলা ছিল। স্থানীয় বহুশত স্ত্রীলোক ও পুরুষ প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সমিতির সুযোগ্যা সম্পাদিকা, কিষণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যা, কিষণগঞ্জ সাব্‌ডিভিসনাল কংগ্রেস্ কমিটির সহ সভানেত্রী অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীমতী শোভা মুখোপাধ্যায় অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রদর্শনীতে রক্ষিত মডেল, চার্ট, চিত্রাবলী সম্বন্ধে সকল বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ২৭শে জুন বৃহস্পতিবার সম্পাদিকার পরিচালনায় ও তাঁহার উদ্যোগে কিষণগঞ্জক্লাবে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় তাঁহার লিখিত নাটিকা "রূপ চন্দন" ছোট ছোট বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। বালিকাদের অভিনয়, নৃত্য গীত, সাজ সজ্জা নিখুঁৎ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলী তিন ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছিলেন। ইহাতে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের দেবদাসী রূপে দুটি নৃত্য উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল এবং নারীর ভূমিকায় অভিনয় ও সুন্দর হইয়াছিল। অস্পৃশ্যা বালিকা চন্দনার ভূমিকায় কুমারী ইরা দাসের, দয়াবতী রাজ কুমারী রূপশ্রীর ভূমিকায় কুমারী হাঁসি কুমারের ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় চার বৎসরের বালিকা কুমারী শুক্লার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অপর বালিকাগণের মধ্যে কুমার গীতা, অনিমা, জয়শ্রী ও দীপ্তির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সমিতির সভাপতি ও কিষাণগঞ্জের এস্, ডি, ও, মিঃ ক্ল্যাক এবং স্থানীয় বহু মহিলা ও ভদ্র মহোদয়ের অনুরোধে গত ৯ই জুলাই শিল্প প্রদর্শনীর মহিলাদিগের পদক ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঐ নাটিকার পুনরভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ান্তে কুমারী বালিকা শুক্লা, ইরা, হাঁসি, জয়শ্রী, রৌপ্য পদক পাইয়াছিল। বালিকার নৃত্য-গীত দর্শনে প্রীত হইয়া অনেকে রৌপ্য পদক দিয়াছিলেন। শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার ৬টী রৌপ্য পদক ও ৬টী দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সাধনায় এই সমিতির দ্রুত উন্নতি হইতেছে। সাধারণের পক্ষ হইতে উকিল শ্রীযুত বুলাকিলাল রামদাস এবং রাজকর্ম্মচারিদের পক্ষ হইতে মিঃ ক্ল্যাক্ এবং পণ্ডিত ভিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। মহিলা সমিতির ভিতর দিয়া কিষণগঞ্জবাসী মহিলাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে।

গ্রামের ধাঁধা কৌতুক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

বাংলার পল্লীসাহিত্য অমূল্য সম্পদের আধার। পল্লী সাহিত্যের স্রোত রাখালী গান, ধূয়া গান, ব্রতকথা, ক্রীড়া-কৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, বারমাসী, বাউল, মুর্শিদা, কীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পল্লীকুটীরই লোক-সাহিত্যের আলোচনাকেন্দ্র।

পল্লীর নর নারীই গ্রাম্য গীতির পৃষ্টপোষক ও উৎসাহ-দাতা। পল্লীতে উৎসব উপলক্ষে লোক সমাগম হইত এবং সেখানে পল্লী সাহিত্যের আসর বসিত। এই আসরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যোগদান করিত এবং অসীম আনন্দ উপভোগ করিত। এমন কি, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে দুই চারি জন লোকের সমাবেশ হইলেও সাহিত্যিক আলোচনা বাদ যাইত না। হাসি ঠাট্টা, গল্প গুজব কথাবার্তার ভিতরে সাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। লোক সমাগম হইলেই তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইত। এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন ও উত্তর গুলিকেই "ধাঁধা-কৌতুক" নামে অভিহিত করা যায়। এই ধাঁধা-কৌতুক গুলি বাংলার বিরাট পল্লী-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য।

বাংলার প্রাচীন ধাঁধা কৌতুক গুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) শিশু সুলভ, (২) সমাধান মূলক, (৩) আলোচনা মূলক।

(১) শিশু সুলভ

শিশুদের মন স্বভাবতঃই ঔৎসুক্যে ও অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ। পল্লীর ঠাকুর-দাদা ও ঠাকুর-মা সন্ধ্যা ও সকালে শিশুগণের নিকট নানা প্রকার ছড়া গাহিতেন এবং তাহাদের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য নানাবিধ সহজ ধাঁধার অবতারণা করিয়া সমাধান করিয়া দিতেন। শিশুরা ঔৎসুক্যের সহিত সে গুলি শুনিত এবং মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে শিশুরা যখন আট নয় বৎসরের বালক, তখন তাহারা সেগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। ঠাকুর-দাদা বা ঠাকুর-মার অনুপস্থিতে তাহারা সমবেত হইয়া আপনারাই এই সব ছড়া বা ধাঁধার আলোচনা করিত। ইহাতে যে শিশুর স্মৃতিশক্তি বেশী সেই জয়লাভ করিত। ইহাতে যাহারা পরাজিত হইত, তাহারা সকলের উপহাসাস্পদ হইত।

এইরূপ ধাঁধা কৌতুক গুলি শিশুদের নিকট আনন্দের খনি স্বরূপ ছিল এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিত। শিশুর মনোবৃত্তি সংগঠনে এইরূপ শিশু-সুলভ ধাঁধা কৌতুক রচনা করিয়া গ্রামের ঠাকুর দাদা ঠাকুর-মা গ্রামবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

উত্তর বঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে এইরূপ প্রচলিত এই জাতীয় ধাঁধা কৌতুক কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) বার হাত বলদে
তের হাত শিং,
নাচে বলদে
ধীতিং ধীং॥
(উত্তর—যাত বা সেচনী।)

(২) এনাকুটি বুড়ী
কেঁথা ওড়ে কুড়ি কুড়ি॥
(উত্তর—কলার থোড়।)

(৩) উলার ভিঁয়ে
বুল্ বুলী নাচে
আরও বল্লে
আরও নাচে॥
(উত্তর—চোখের পাঁতা।)

(৪) আজ মঙ্গলবার
কাল মঙ্গলবার
সতীর হাট।
এমন দিব্যি দেখ্যা আলাম
ফলের উপর গাছ॥
(উঃ—আনারস।)

(৫) এনাকুট্টি এঁড়ে
জঙ্গল যায় ফেঁড়ে।
(উঃ উৎকুন)

(৬) এনাকুট্টি বুড়ী।
নিত্য খায় গুড়ী
(উঃ গরুর খুঁটা)

(৭) এনাকুট্টি বুড়ী
ভাত নিয়ে যায় ভূত কুঁড়ী॥
ভূতে মারলে কীল।
বুড়ী ভাত গিল॥
(উঃ পিপীলিকা)

(৮) এনাকুট্টি পুকুর
মাছ থুক্‌বুক্ করে।
জেলের বেটার সাধ্যি নাই,
জাল ফেল্‌বার পারে॥
(উঃ ভাতের হাড়ী)

(৯) জঙ্গলেত্ হিনি বারা'ল টিয়া।
সোনার টুপি মাথাত্ দিয়া॥
(উঃ আনারস বা মুরগী)

[শব্দার্থঃ—হিনি=হইতে।]

(১০) এনাকুট্টি গাছে।
লাল পিয়াদা নাচে॥
(উঃ গাছে মরিচ, লঙ্কা)

(১১) দিলে খায় না।
নাদিলে খায়॥
(গরুর গোমাই)

(১২) মামারা পলায়া গেল।
লাল লাঠিখান ছাড়্যা গেল॥
(লাল ডাঁটা)

(১৩) মামীরা আঁধে বাড়ে
মামারা খায়।
আমরা গেলে
কপাট দেয়॥
(শামুক)
[আঁধে=রন্ধন করে]

(১৪) উত্তর হিনি এল রে কালু
বাঁশ ঘাড়ে কর‍্যা।
গাছ আছে তার গোড়া নাই
কাটব কেমন কর‍্যা।
(লতা)

(১৫) এক কাবারীর
দুই চলি। (কলার পাতা)

(২) সমাধান মূলক

শিশুদের ভিতর যে প্রকার সহজ ধাঁধার প্রচলন আছে, সেইরূপ পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরাও ধাঁধাঁ কৌতুকের আলোচনা করেন। এই সব ধাঁধার সমাধান করিতে বিশেষ চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির আবশ্যক করিত। পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে এই জাতীয় ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যাঁহারা এই সকল ধাঁধার সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারা সমাজে পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন।

(১) ছয়খানি চরণ তার চারিখানি সরু।
দুইখানি চরণ তার মনুষ্যের উরু॥
ঘোড়ার আকৃতি মুখ দুই শিং শিরে।
হস্তীর আকৃতি কন্দ উড়াইতে পারে॥
সর্পের আকৃতি পেট কচ্ছপের বুক।
কহে ভবে মহাদেব হেঁয়ালীর ছন্দ।
মূর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ॥
[উত্তর—আদাড়। শব্দার্থ—কন্দ=স্কন্ধ।]

(২) মাথা কাটা কন্দকাটা
জিহ্বা কাটা ছুরি।
কাল গঙ্গাতে স্নান করি
নানা মূরতি ধরি॥
যাহার দ্বারে ভুবন কাঁপে
কন্দে করি বাস।
কাল মহাকাল সর্প—
কহে কৃষ্ণদাস॥

(৩) গাঙের কূলে বস্যা আছেন মুনি তপোধন।
হস্ত নাই পদ নাই দন্ত দরশন॥
দন্তগুলি রাঙ্গা রাঙ্গা পান নাহি খায়।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত ভাই ধর্ম্ম সভায়॥
[উত্তর অজ্ঞাত।]

(৪)　ব্যাঘ্র নয় ভল্লুকও নয়
　　　না পুরে সন্ধান।
　পৃষ্ঠেতে আছে তার
　　　সহস্রেক বাণ॥
　বাণ নয় সে তীর
　　　না যায় সুমের এ।
　আবদুল শেখে কয়
　　　ছুঁলে বাত্ত মারে॥

[উত্তর—আঁচা। এই ধাঁধাটী জনৈক আবদুল শেখ কর্ত্তৃক রচিত।]

(৫)　ছিয়ানব্বই নগর তার
　　　প্রজা ষোল জন।
　তিন ভাই উকিলি করে
　　　বিয়াল্লিশ লোচন॥
　ধন মান নাহি চায়
　　　সদাই চায় দান।
　আবদুল শেখে কয়
　　　বুঝহ সন্ধান॥

[উত্তর—পাশা।]

(৩) আলোচনা মূলক

গ্রামের বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বৈঠক বা সভা বসিত। এই বৈঠকে সামাজিক, বৈষয়িক নানাবিধ আলোচনা হইত। ইহাতে সাহিত্যিক আলোচনাও বাদ যাইত না।

(ক)

বৈঠক আরম্ভ হইবার পর কোনও ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে সভার বন্দনা করিয়া বসিতে হইত। সভায় প্রবেশ দ্বারে একজন অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তি থাকিতেন। তিনি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—

আইস বলি মহাশয় বৈস সভাতে।
বিচারিয়া কহ কিছু জিজ্ঞাসি তোমাকে॥
পৃথিবী হাঁটিয়া কর শরীর ধারণ।
কহ দেখি পৃথিবী জন্মিল কি কারণ॥
কি হেতু পবন বয়, কি হেতু তপন।
চন্দ্রসূর্য্য দিকপাল হৈল কি কারণ॥
মৈনাক পর্ব্বত কেন হৈল তল।
কিরূপেতে কোথা হৈতে মেঘে দেয় জল॥
শ্রীহরি ভূতলেতে আসি কি কারণ জন্মিল।
কি কারণে দেবতারা সমুদ্র মন্থিল॥
সমুদ্র বাঁধিয়া রাম বধিল রাবণ।
মন্দোদরী সধবা থাকিল কি কারণ॥
কি কারণে কুন্তী বামা নিত্য যুবা সতী।
কি কারণে দ্রৌপদীর হৈল পঞ্চপতি।

এই প্রশ্নের উত্তরটী সভাবন্দনা বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার উত্তর দিয়া প্রবেশ করিবার রীতি। উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়া তখনকার দিনে নিন্দা বা অপ্রশংসার কথা, ইহার উত্তরটী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

(খ)

সভায় প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করার সময় আগন্তুককে সভাস্থ একজন প্রশ্ন করেন—

আইসেন মশায় বইসেন ভিড়ে।
সগ্‌গ মত্ত পাতাল ছেড়ে॥
ডাইনে গুরুচরণ বামে গুরুচরণ।
সমুখে বইসেন ত দোহাই ধর্ম্মের॥

আগন্তুক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

আইলাম রঙ্গে,
বসিলাম সঙ্গে।
বলিলাম কলির ভাব,
গুরুর চরণ মাথাত নিয়া
সভায় দিলাম পা।
আইলাম মশায় বড় শ্রম কইরা।
বস্‌ব মশায় তোমার ঘাড় পড়্যা॥

(গ)

হুঁকার ধূম পান করা বাংলায় পল্লীর লোকের একটি প্রিয় জিনিস। সভায় আগন্তুক উপবেশন করিলেই তাঁহাকে হুঁকা দিবার বিধি। হুঁকা দিবার সময় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়—

হুঁকা খাও মশায়
　　কথা কও ঠাওরে।
হুঁকার জন্ম হৈল
　　কি মত্‌ প্রকারে॥
যদি কইতে পার
　　হুঁকার জন্ম কথা,
আনন্দে খাও হুঁকা
　　নাই কোন বাধা।
যদি না কইতে পার
　　হুঁকার জন্মকথা,

মরিয়া শৃগাল হৈয়া
চাটে মরার মাথা।

আগন্তুকের উত্তর—

উত্তম গাছের ফল
তাহে বলি নারিকেল।
হুঁকা বিষ্ট কল্কি বিষ্ট
নচিয়া মহেশ্বর।
তাহার ভিতরে আছে কত জাহ্নবীর জল॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ তার লম্বা লম্বা পাতা।
তিলেক না খাইলে হয় মাথার ব্যথা॥
পথের লোক পথিক ফিরে ফিরে চায়॥
রাম নাম দিয়া কাছে আস্যা বসয়॥
আর বাপু হুঁকাত্ কি এত মধু আছয়॥
মনুষ্য হয়্যা যেবা হুঁকর নিন্দা করে।
মরিয়া শৃগাল হয়্যা 'হুক্কা হুক্কা' করে॥

(ঘ)

হুঁকার পরে আগন্তুককে পান দেওয়ার বিধি। পান দেওয়ার সময় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়—

পান খাও মশায় কথা কও ঠাওরে।
পানের জন্ম হৈল কি মত্ প্রকারে॥
যদি কইতে পার পানের জন্ম কথা।
নিঃসন্দেহে খাও পান তাতে নাই বাধা॥
যদি না কইতে পার পানের জন্মকথা।
ছাগল হৈয়া খাও পান যেন শড়ের পাতা॥

আগন্তুকের উত্তর—

জগন্নাথে জন্মিল পান শিবে দিল চূণ।
ব্রহ্মার স্থাপিত গুয়া ধরে তিন জন॥
পান খাইয়া মুখ শুদ্ধ অমৃত সমান।
তুমি বুঝ পানের জন্ম তোমার নাই জ্ঞান॥
পার্ব্বতী খায় পান শিবে ক্যালে বোঁটা।
অনুমানে বুঝি তুমিই ছাগলের পাঁঠা॥

(ঙ)

অতঃপর সভাস্থ একজন আগন্তুককে নাম, ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেন—

"কাহার বেটা তুমি কাহার নাতি।
কাহার ঘাটে তুমি কাচিলেন ধুতি॥
কাহার ঘাটে করিলেন স্নান।
কে দিল ব্রহ্মজ্ঞান॥

উত্তরে আগন্তুক বলেন—

"বাপের বেটা বড় বাপের নাতি।
ধোপার ঘাটে কাচিলাম ধুতি॥
গঙ্গার ঘাটে করিলাম স্নান।
গুরু দিল ব্রহ্মজ্ঞান॥"

সভা হইতে যিনি নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করেন, আগন্তুক তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন করেন—

(১) কোন্ গাছের কুটা তুমি,
কোন গাছের ছাল ?
কাহার আজ্ঞা নিয়া
আস্ছেন নাম পুছিবার ?

[পুছিবার—জিজ্ঞাসা করিবার।]

(২) কেমন গুরু কেমন চেলা,
কোন্ গুরু হাতে দিল মালা ?
কোন্ গুরু ফিকরেল নাম,
কোন্ গুরু রাখিল জাতি কুল মান।

(৩) চন্দ্র গেল চন্দনে
সূর্য্য গেল বন্দনে।
মিত্তিকা গেল ভাস্যা,
তোমার গুরু নাম দিল
কোন স্থানে বস্যা ?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে প্রথম ব্যক্তি বলেন—

(১) তুলসী গাছের কুটা আমি
চন্দন গাছের ছাল।
গুরুর আজ্ঞা নিয়া
আস্ছি নাম পুছিবার॥

(২) মোহন গুরু মোহন চেলা।
বৈষ্ণব গুরু হাতে দিল মালা॥
আদ্য গুরু ফিকরিল নাম।
বাপ-মা-গুরু এ রাখিল জাতি-কুল-মান॥

(৩) চন্দ্র যায়নি চন্দনে,
সূর্য্য যায়নি বন্দনে।
মিত্তিকা যায়নি ভাস্যা,
আমার গুরু নাম দিল
শ্রীবৃন্দাবনে বস্যা॥

[শেষোক্ত দুইটী ছড়া গীতিতে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়।]

এই ধরণের প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক, শিক্ষামূলক, নানাবিধ আলোচনার প্রচলন প্রাচীনকালে ছিল। অদ্যাপি এই সব মূল্যবান জিনিষ পল্লী প্রদেশে লুপ্ত হয় নাই। অতীত বাংলার সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইলে, এই জাতীয় গ্রাম্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কেন্দ্র সমিতির কথা

কাঁচড়া পাড়া মহিলা সমিতি—

গত জুন মাসের শেষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এইচ্ ডি, পি, আর এস, মিস্ দীপ্তি চ্যাটার্জ্জী, বি, এ, বি, টি, ও মিস্ হেমনলিনী মল্লিক প্রভৃতি সমিতির সদস্যগণ সহ কাঁচড়া পাড়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান।

এই উপলক্ষে তথায় একটী ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল; ডাঃ নিয়োগী এই সমিতিতে সময়োপযোগী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এমব্রয়ডারী কার্য্যের জন্য তিনি একটী সদস্যকে রৌপ্যপদক পুরস্কার দেন।

অপরাহ্ন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় স্থানীয় "হাইগুমার্স ইন্‌ষ্টিটিউটে মহিলা ও পুরুষদের একটী সম্মিলিত সভা হয়। ঐ সভায় তিনি "ভারতে রসায়ন শিল্প'' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

মাণিকতলা মহিলা সমিতি—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সদস্যা মিস্ দীপ্তি দেবী, বি, এ, বি, টি, মিস্ প্রতিভা সেন বি, এ, বি, টি ও প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী উক্ত মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতি ঘোষ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সম্পাদিকা ও এই সমিতি হইতে প্রেরিত শিক্ষয়িত্রীর চেষ্টা ও যত্নে সমিতিটি ভালভাবেই চলিতেছে। এই সমিতিতে শিল্প-শিক্ষা ভিন্ন শিশুপালন ও স্বাস্থ্যপালন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া একটী বিশেষ কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, এজন্য রেডক্রস সোসাইটী সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে প্রচার কার্য্য :—

ঈশ্বরগঞ্জ :—

গত আগষ্ট মাসের শেষভাগে কেন্দ্র সমিতি হইতে মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ও প্রচারক শ্রীযুত সুধীরলাল সরকার মৈমনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ নামক স্থানে গমন করেন। এতদুপলক্ষে ঈশ্বরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মহিলা সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা ঘোষ উক্ত সভাগুলির সভানেত্রীত্ব করেন। সভায় "নারী মঙ্গল" সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন প্রদর্শিত হয়।

চরণীখোলা—এই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই মুসলমান। এই গ্রামবাসীদের উৎসাহে তথায় একটি মহিলা সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা ঘোষ ও শ্রীযুত সরকার এই সভায় "মহিলা সমিতির গঠন প্রণালী, উহার কার্য্যধারা ও উপকারিতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এ স্থানে একটি মহিলা সমিতি গঠিত করিবার জন্য স্থানীয় মহিলাগণ ও কর্ম্মীগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

Associated Country women of the world

লণ্ডনে "সরোজনলিনীর জীবন চরিতের "A woman of India"র সমাদর

১৯৪০ সনের ২৬ এবং ২৭শে জুন লণ্ডনে "Associated Country women of the World" এর যে বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে "সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাদুড়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের (Associated Country women of the World) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ভারতীয় সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস মহোদয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লিখিত ভারতবর্ষে "মহিলা সমিতি আন্দোলনের" প্রতিষ্ঠাত্রী সরোজনলিনী দত্তের জীবনচরিত (A woman of India) উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সদস্যই ঐ পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী এজন্য শ্রীযুক্তা ভাদুড়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, উক্ত

পুস্তকখানি A. C. W. W. এর গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হইবে এবং তিনি আশা করেন যে সকল সদস্যই ঐ পুস্তকখানা সাদরে অধ্যয়ন করিবেন।"

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ উল্লেখ ও প্রণিধানযোগ্য যে A. C. W. W. এর সদস্যারা বর্ত্তমানে যুদ্ধজনিত নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁহাদের কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সংযম বিশেষ প্রশংসনীয়।

কসবা মহিলা সমিতি :—

গত ৭ই ভাদ্র কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী কসবা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রতিভা ব্রহ্মচারী সাংসারিক নানাবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকায় বর্ত্তমানে সমিতির কার্য্য মন্দ-গতিতে চলিতেছে, পূজার পর হইতে আবার পূর্ণোদ্যমে সমিতির কার্য্য চলিতে থাকিবে বলিয়া সম্পাদিকা জানাইলেন।

টালা সমবায় মহিলা সমিতি :—

গত ২৯শে আগষ্ট কেন্দ্রসমিতির প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী টালা সমবায় মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন কিছুদিন যাবৎ বাতরোগে অচল-অবস্থায় পড়িয়া থাকায় সমিতির কার্য্য ঠিক মত চলিতেছে না। সম্পাদিকা বলিলেন যে, সত্বরই তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যারম্ভ করিবেন। সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভূক্ত মহিলা সমিতি-সমূহের মধ্যে এই সমিতি-ই সমবায়প্রণালী মতে রেজেষ্টারীকৃত মহিলা সমিতি; বহুদিন ধরিয়াই এই সমিতির কার্য্য প্রশংসালাভ করিয়া আসিতেছে।

বাঁটরা মহিলা সমিতি :—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী বাঁটরা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। এই সমিতির কার্য্য ভালভাবেই চলিতেছে। প্রায় ১৫টী মহিলা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকেন ; ছাঁট-কাট ও সেলাই ভিন্ন এমব্রয়ডারী প্রভৃতি কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয় ; তাঁতের ক্লাস ও চামড়ার উপর নক্সার কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সম্পাদিকা ও শিক্ষয়িত্রীর খুব আগ্রহ আছে ; কিন্তু হাওড়ার মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের সাহায্যের টাকার পরিমান অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাও নিয়মিত আদায় হয় না বলিয়া অর্থাভাব বশতঃ ইচ্ছা ও আগ্রহ কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না।

রাজবালা (ভবানীপুর) মহিলা সমিতি :—

গত ২০শে আগষ্ট প্রচারক পণ্ডিত মহাশয় ভবানীপুর রাজবালা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। এই সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রাজবালা মিত্র সমিতির অন্তর্গত বালিকা বিদ্যালয়টীকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া তৎ-পরিচালনেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া সমিতির শিল্পশিক্ষা বিভাগের কার্য্য অচল হইয়া পড়িয়াছে ; অবশ্য কেন্দ্রসমিতি চেষ্টা করিবেন যে, অন্য কর্ম্মীর সহযোগিতায় শিল্প-বিভাগটী যাহাতে পুনরায় কার্য্যকরী হইয়া উঠে ; পূজার ছুটীর পর হইতে সেই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামরিক নার্স-বিদ্যা শিক্ষা—সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মিটিংএ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সামরিক বিদ্যা ও ছাত্রীদের নার্সবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক কলেজে যাহাতে ছাত্রীগণ সমরে আহত সৈন্যদিগকে সেবা শুশ্রূষা করিবার দক্ষতা লাভ করিতে পারে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বিরুদ্ধ আলোচনাকারীগণ, এরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সাধারণ বিদ্যার্জ্জনের ক্ষতি হইবে, যুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্তাবকারী দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া ছিলেন যে অধুনা বিশ্বে যেরূপ সমরলীলা চলিতেছে এমত অবস্থায় এদেশের লোকের মনে সংগ্রামের সময় ইতিকর্ত্তব্যতা বোধের বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা কেবল ছাত্র ও ছাত্রীদের সমর-সজ্জা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান দ্বারাই সম্ভব।

ঈশ্বরগঞ্জ মহিলা-সমিতি

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভূক্ত 'ঈশ্বরগঞ্জ মহিলা সমিতি' নামে স্থানীয় মহিলাদের একটী শাখা সমিতি বিগত ১৩৪৩ সনে ঈশ্বরগঞ্জ সহরে স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় মহিলাগণ উক্ত সমিতিতে নানাবিধ তাঁতের কাজ ও চারু শিল্পের কাজ ইত্যাদি সাফল্যের সহিত শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত সমিতিতে উল্লিখিত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে ও সাহায্যে গত বৎসর ধাত্রী ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছে ও ঐ বৎসর ১৪ জন মহিলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বিগত ১৫ই তারিখ স্থানীয় সমিতির মহিলাগণের উদ্যোগে স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাদের এক মিলিত সভা আহ্বান করিয়া উত্তীর্ণা মহিলাদিগকে সার্টিফিকেট ও ব্যাগ বিতরণ করা হয়। ঐ উপলক্ষে কলিকাতা সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি হইতে মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ মহাশয়া ও মাননীয় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার মহাশয় এবং ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ্ অফিসার সাহেব, অত্র সহরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমন উপলক্ষে সভায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের মাননীয় শ্রীযুক্ত সেনেটারী ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব সার্কেল অফিসার ও বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা সমিতির কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। উক্ত সভায় মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন ও স্ত্রী জাতির যাহাতে উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ক অতি বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আশা করি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি কল্পে স্থানীয় মহিলা সমিতির অভাব—অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ও সর্ব্বদা তাঁহাদের সদুপদেশ দ্বারা উত্তরোত্তর সমিতির উন্নতির সহায়তা করিবেন। ইতি—

নিবেদিকা—

সম্পাদিকা

ছাত্রীদের বেঙ্গল ক্যামিকেল কারখানা ও বাসন্তী কটন মিল পরিদর্শন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সরোজনলিনী স্কুলের সেক্রেটারী মিস্ এন্, বি, সোম বি, এ, বি টি, এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ, পি, এইচ ডি, পি, আর এস, মহোদয় প্রায় ৩০ জন ছাত্রী সমভিব্যাহারে বেঙ্গল ক্যামিকেলের পানিহাটিস্থ কারখানা পরিদর্শন করিতে যান। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগ ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি সুচারুরূপে বুঝাইয়া দেন। বিদায়ের সময় প্রচুর জলযোগ ও কারখানার প্রস্তুত উপহার দ্রব্যাদি সহ সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উক্ত দিবসেই বাসন্তী কটন মিলে গমন করিয়া তাঁহারা বস্ত্রবয়ন কার্য্য পদ্ধতি দর্শন করেন। মিলের ম্যানেজার মহোদয় যথেষ্ট যত্ন ও আগ্রহের সহিত সকলকে বস্ত্র বয়ন কার্য্য দর্শন করান।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর অন্য এক দল ছাত্রী লইয়া বোর্ডিং সুপাঃ মিসেস ননীবালা রায় ও মিসেস সুবোধ বালা ঘোষ উক্ত বেঙ্গল ক্যামিকেল কারখানা এবং বাসন্তী কটন মিল দর্শন করেন। দুই দিনই বেঙ্গল কেমিকেলের ও বাসন্তী মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রচুর আদর আপ্যায়নের সহিত সমস্ত বিষয়গুলি দর্শন করান।

বাঙ্গালীর গৌরব বেঙ্গল ক্যামিকেল ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বাসন্তী মিলের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবার সঙ্গে আমরা দেশবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছি যেন তাহারা এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া দেশের ঋণ যৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ করেন।

ছবিতে দেখে এসো

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই লোকে প্রচুর চা খায় ; জল আর দুধ বাদ দিলে পানীয় হিসেবে চায়ের ব্যবহারই সম্ভবতঃ পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি। চা বাস্তবিক সর্ব্বত্রই সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রাচ্যে চীন ও জাপান এবং প্রতীচ্যে—গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডই চা-প্রিয় জাতিগুলির মধ্যে প্রধান। জগদ্ব্যাপী ডোমিনিয়ান ইত্যাদি নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাসিন্দারা পানীয়ের মধ্যে চা-ই সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে। ভারতের লোকও যে ক্রমশঃই বেশি চা-প্রিয় হয়ে উঠছে তারও প্রমাণের অভাব নেই।

ধরা যাক ভারতের আধুনিক ছায়াচিত্র জগত—যাকে সামাজিক অবস্থার দর্পণ বলা যেতে পারে। তাতে যেমন আধুনিক সমাজের অন্য সব নীতি, রুচি, হাল-চাল অতি সুন্দর প্রতিফলিত হচ্ছে তেমন আবার আধুনিক সমাজের চা-প্রিয়তার ও অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকখানি ছবির কথা জানি, যার মধ্যে অন্তত এক জায়গায় চা খাওয়ার দৃশ্যটাই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। "গৃহাগমন" বলে' একখানি তেলেগু সামাজিক ছবিতে দেখা যায় যে একজন মজুর তার প্রথম চায়ের পেয়ালা পেলো একটি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর বিয়েতে। মেয়ের বাপের সঙ্গে সেই সূত্রে তার এই রকম আলাপ হতে দেখা যায়।

মজুর : এটা কি জিনিষ ?

মেয়ের বাপ : এ হচ্ছে চা। একটু খেয়েই দেখো, এই গরমের রাত্তিরে দেখবে শরীর কেমন তাজা করে দেবে ।

মজুর : (কয়েক চুমুক খেয়ে) এমন চমৎকার জিনিষ তো কখনো খাইনি।

মেয়ের বাপ : সত্যি তোমার ভাল লাগছে ?

মজুর : চমৎকার ! দয়া করে আমাকে আর এক পেয়ালা দিন।

জনপ্রিয় বাংলা ছবি "অভিনয়-এ দেখা গেল এক অজীর্ণ রোগগ্রস্ত জমিদার তাঁর মেজাজ সব সময় খারাপ হয়েই আছে। তিনি চা খেতেন না, পাছে তার অজীর্ণ রোগ বাড়ে। অবশেষে এক প্রিয়দর্শন যুবা এসে এই জমিদারের সব ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়ে দিলে—সর্ব্বদা গোমড়ামুখো বুড়াকে প্রাণ খুলে হাসালে আর দুজনে মিলে মহানন্দে পান করলে চা।

নামজাদা হিন্দি ছবি "দুনিয়া না মানে"-তে পাওয়া গেল একটি করুণ হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। নতুন বউ শ্বশুরবাড়ী এসেছে। দজ্জাল এক দূর সম্পর্কের শাশুড়ী তাকে চা দিলেন না। বাড়ীর একটি ছোট্টমেয়ে কিন্তু তার চায়ের পেয়ালা নিজে না খেয়ে নতুন বউয়ের সামনে এনে দিলে। নববধূর চোখ জলে ভরে' এলো। এ দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে দর্শকের চোখও সজল হয়ে ওঠে।

সত্যি এই সব ছায়াচিত্র দেখলে বোঝা যায় যে চা আজ আমাদের সামাজিক জীবনে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করেছে।

এদেশেও ফিল্ম ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট লোকজনদের সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখবার জন্য আজকাল চা যে কত অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠান ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রচার সচিবের একটি উক্তিতে তার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ইনি জানিয়েছেন এঁদের নামজাদা ছবি 'রিক্তা' তোলবার সময় প্রায় চার মাস সময়ের মধ্যে অভিনেতা, অভিনেত্রী ও অন্যান্য লোকজনেরা সবসুদ্ধ মোট ৪০,০০০ পেয়ালা চা খেয়েছেন—যা তৈরী করতে প্রয়োজন হয়েছে ১৫০পাউণ্ড শুকনো পাতা চা।

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.

রণোন্মাদিনী

১৫শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৭ | ১২শ সংখ্যা

পত্রালাপ

New york
8 November 1920

দিনু

আমি সর্ব্বদাই প্রশ্ন করেছি,

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

সোনার তরী যাতে শান্তিনিকেতনের পারে ভেড়ে এই আমার ইচ্ছে—কর্ণধার মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসচেন। আপাততঃ নিয়ুইয়র্কের ঘাটে বসে দোলা খাচ্চি। গান বন্ধ। যখন দেশের দিকে পাড়ি দেব তখন হয়ত হৃদয়তন্ত্রে ছুটো একটা তান লাগতে থাকবে। গান নেই কিন্তু বক্তৃতা চলছে।

রবিদাদা

নিয়ুইয়র্ক

দিনু,

চিত্ত পিপাসিত রে
গীত সুধার তরে।

এখানে অনেক ঘর বাড়ী, দোকান বাজার, কলকারখানা লোক লস্কর হাঙ্গাম হুজ্জুত—কিন্তু গানের উৎস খুঁজে পাচ্ছিনে। ডলারের থলের তলায় চাপা পড়ে গেছে। বুঝতে পারছি সাঁচ্চা গানের দাম জোগাতে পারে এত বড় ব্যাঙ্ক এখানে একটাও নেই। অতএব ধনান্ বর্জ্জয়ধ্বং ধনান্ বর্জ্জয়ধ্বং।

রবিদাদা

অনাহুত

শ্রীহেমলতা দেবী

দ্বার হতে ফিরাইল, না শুনিল কাণে,
ভিক্ষালব্ধ অন্নমুষ্টি—বঞ্চিল সে দানে,
রৌদ্র দগ্ধ দ্বিপ্রহর—ঘুঘু বসি ডালে
সর্ব্বহারা বৈরাগ্যের স্বরটুকু ঢালে।
ভিক্ষুক হাঁটিয়া চলে, অনাবৃত দেহ
"মিলেছে তণ্ডুলকণা" জিজ্ঞাসে না কেহ
যায় যায় ফিরে চায়—প্রতীক্ষায় থাকে
প্রত্যাখ্যাত জনে যদি কেহ ফিরে ডাকে।
আহ্বানি আনিবে তারে কার হেন দায়
ভিক্ষুরে ভিক্ষার তরে কে কবে শুধায় ?
ছায়ায় দাঁড়ায়ে ছিল দৈব অনুচর
বর দিল—"ভিক্ষু তুমি হও লক্ষেশ্বর
অলক্ষ্যে তোমার ধন পুঞ্জীভূত রবে
অনাহুত জন তাহা লভি ধন্য হবে।"

কাঁকন

গল্প

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

"নাঃ আর ভালো লাগেনা—সত্যি আর ভাল লাগেনা—অসহ্য ;

ষোল বছরের মেয়ে রানু কিছুতেই বুঝতে পারেনা,—আজকে কেন সে মনের ভিতরে একটা নিবিড় রিক্ততা, শূন্য মরুভূমির মতই অনুভব করছে। ওর কিসের অভাব ? ধনী বাপের একটি মাত্র মেয়ে সে—ওর গায়ে ব্যথার আঁচড়টি লাগ্‌তে পারবেনা বলে, ওর দাদা ওকে নিজের কর্ম্মস্থলে এনে রেখেছেন।

তবে ?

হ্যাঁ—তবে—,না—না যাক্ সে কথা—তা'তে হয়েছে বা কী ? ওর বয়সের এমন কত মেয়েতো এখনও ফ্রক পরেই ঘুরে বেড়ায়। বছর দেড় পূর্ব্বে কয়েক মাসের জন্য ওকে না হয় সিঁথিতে সিদূর, হাতে নোয়া এবং শাঁখা পরতে হয়েছিল বলেই—আজ ওকে শাড়ী পরতে হচ্ছে। সে শাড়ী এখন সাদা অথবা রঙিন হোক্ পাড়, থাক্ অথবা না থাক্।

কিশোরী রাণুর বুকের তল গ'ঢ় একটি নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠলো।

সেদিন দুর্গোৎসবের বিজয়া তিথি। তখন সন্ধ্যার আবছা আলো দিগন্তর বুকে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে নামছে, সুদূর নদীর প্রান্ত হ'তে অস্পষ্ট শব্দে দেবীর বিদায় বাজ্‌নার করুণ সুরের রেশটি ভেসে আসছে, বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে রাণুর দাদা ভাসান দেখতে গিয়েছেন। রাণু সংসারের টুকিটাকি কাজ গুলো সেরে, গা হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ ঢুকেছে। হ্যাঁ এখুনি বিজয়ার প্রণাম প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি আদান প্রদান করতে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা এসে পড়বেন,—ও:ক একখানা পরিস্কার কাপড় যে পরতে হবে।

কিন্তু সেই কাপড় খানা পরবার ওর আগ্রহ উৎসাহ কই ? প্রায় মিনিট কুড়ি অতিক্রম কোরছে, ও ঘরে এসে তোরঙ্গর ঢাকা খুলে বসে আছে—, কোলের উপর ওর একগাছা নানারূপ পুঁথির কারুকার্য্য করা রংচঙে কাঁচের কঙ্কন পড়ে রয়েছে। মন বোধহয় কোথায় কতদূরে স্মৃতির সাগরে ভাস্‌তে চলে গিয়েছে!

আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে স্বামীর, স্ত্রীকে খোলাখুলি ভাবে কিছু উপহার দেওয়াটা এখনও বেহায়াপনা, লজ্জা-হীনতা ইত্যাদির পরিচয়। তা সত্ত্বেও গত বৎসরের এই দিনটীতে স্থপ্রিয় কত না গোপনে, কতনা আগ্রহে কতনা স্নেহের সঙ্গে এই কঙ্কন জোড়াটা নববধূ রাণুর হাতে পরিয়ে দিয়েছিল এনে। রাণু মৃদু অনুযোগের সঙ্গে বলেছিল "তুমি এখন কলেজে পড়, কেন এত খরচ করলে বলত ?" স্থপ্রিয় বলেছিল—,"বারে আমার বুঝি তোমাকে আজকের দিনে কিছু দিতে ইচ্ছে করেনা ?"

রাণু আর কিছু বলেনি—,শুধু প্রাণের সব ভালোবাসা উজাড় কোরে স্বামীকে একটী প্রণাম কোরেছিল। এর প্রত্যুৎত্তর স্বরূপ স্থপ্রিয় ওকে কাছে টেনে নিয়ে—রাণু আর ভাবতে পারলোনা,—মধুর সেই স্মৃতির মদির একটা আবেশে ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, গভীর তৃপ্তির সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্ম ও চোখদুটী মুদ্রিত করলো। পুনরায় চোখ খুলে কঙ্কন জোড়াটা কোল থেকে তুলে নিল—অতীতের সেই চলে যাওয়া দিনের স্বপ্ন-সুন্দর গল্পটাকে কল্পনার আলোতেই আজ একবার ফিরিয়ে আনতে সে কী পারে না ? রাণু ভাবলো—কেন পারে না ? নিশ্চয়ই পারে। ও একগাছা কঙ্কন হাতে গলাতে গেল কিন্তু পারলো না,—চিরন্তনী সংস্কার ওর মনের মধ্যে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়ালো। সে যে বিধবা, একথা তাকে ভুললে তো চলবে না। স্মৃতির সম্মান রক্ষা করার চেয়ে বৈধব্যের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই যে ওর এখনকার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ। রাণু ইচ্ছে করলো কঙ্কন জোড়াটা ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে দেয়। ঠিক সেই সময় ওর দাদার বারো তেরো বছরের মেয়ে বুলু কাঁদতে কাঁদতে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"কী হয়েছে রে কাঁদ্‌ছিস্ কেন ?"

রাণু ওকে সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। "দেখনা পিসিমা, মা আমায় এখন বল্‌ছেন, "অমিয়াদের সঙ্গে বিজয়ার দেখা শুনা কোরে আয় গিয়ে, কিন্তু অমিয়ার মত কাঁকন বাবা আমায় কিনে দিলেন না, বল্‌লেন, "ও সব বাজে খরচ করতে তিনি পারবেন না,—কিন্তু আমি এখন ওদের বাড়ী যাই কী কোরে বলত ? গেলেই সবাই আমার কাঁকনের কথা জিজ্ঞেস করবে। এখানকার প্রায় সব মেয়েই কিনেছে—বল্‌তে বল্‌তে বুলু আরও ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

রাণু কয়েক মুহূর্ত্ত ওর অশ্রুভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, হঠাৎ ওর মনে হোল, ও যেন তার ওই ব্যর্থ কাঁকন জোড়ার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। ও নিজের আঁচল দিয়ে বুলুর ভিজে চোখ মুছিয়ে দিয়ে, পরম যত্নের সঙ্গে নিজের কাঁকন জোড়া হাতে তার পরিয়ে দিতে দিতে বল্‌লো—"এ জোড়া আজকের দিনে তোর পিসেমশায় আমায় দিয়েছিলেন, বুঝলি—এর অনাদর করিস্ নে, মিছে বাক্সে আমার পড়েই থাকবে, ব্যবহার করিস্, বুঝলি ? বর্ষার পর শরৎশ্রীর নূতন আলোয় বুলুর মুখটা আনন্দে ঝলমলে হয়ে উঠলো, ওর সেই উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রাণু অনেকক্ষণ, প্রায় মিনিট কুড়ি। রাণু একটা নিশ্বাস ফেললো। বুলু রাণুর ঘর থেকে চলে গিয়েছে, কিন্তু রাণু তখনও মেঝেয় বসে, ওর বাক্সের ডালা তেমনি খোলা রয়েছে। তখনও যে কী ভাব্‌ছে, সে কথা সেই জানে। হঠাৎ নীচ থেকে বউদির উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌তে ওর চিন্তার তার কেটে গেল—ও দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এসে দেখলো, বৌদি যেন অগ্নি মূর্ত্তি নিয়ে তিরস্কার করছেন, বুলু ম্লানমুখে সেখানে দাঁড়িয়ে, হাত দিয়ে ওর রক্ত ঝর্‌ঝর্ করে ঝরছে, তার দেওয়া কঙ্কন জোড়াটা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মেঝেয় পড়ে রয়েছে। একটু আশ্চর্য্যভাবে সেই দিকে তাকিয়ে রাণু জিজ্ঞেস করলো,—"কী হয়েছে বউদি ওকে বকছো কেন ?" "হবে আর কী, হয়েছে আমার মাথা আমার মুণ্ডু—'কণ্ঠে সপ্ত তন্ত্রীর ঝঙ্কার তুলে বউদি বল্‌লেন,—"ও না হয় ছেলে মানুষ জানে না, তুমি আজকে বচ্ছরকার দিনে কি বলে তোমার হাতের বালা ওকে

পরিয়ে দিলে বল ত? নিজের কপাল পুড়িয়ে বুঝি আশ মিটলো না—তাই ওকেও দলে টান্‌তে চাইছো—"

কেন সে তার অভিশপ্ত হাতের পরিত্যক্ত জিনিষ—নবীনা এক কুমারীকে দিতে গেছলো? কিন্তু সে যাকে ভালবাসে, তারই স্নেহের দান যে কখনও অপবিত্র হতে পারে এ অভিজ্ঞতা যে ধারণার বাইরে ছিল! জোর করে ঠোঁটের রেখায় একটু মলিন হাসি টেনে সে বল্‌লো—"ওকে আর বোক না বৌদি, ভুল আমার হ'য়ে গেছ্‌লো; না জানা ভুলের দোষ ওকে ছুঁতে পারবে না, তুমি দেখো—" ঠিক্ সেই সময় ওর দাদা ছেলেদের নিয়ে ভাসান দেখে ফিরে আস্‌তে, ও বিজয়ার মিষ্টি মুখের খাবার গোছাতে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেল। চোখ মুছতে মুছতে বুলু ওকে অনুসরণ কর্‌ল।

ভাঁড়ারে গিয়ে রাণু পাথরের পাত্রে সিদ্ধি গোলা এবং কাঁসার রেকাবে নিমকী, সিঙ্গাড়া, নারিকেল, ছানা, গজা প্রভৃতি থরে থরে সাজাতে লাগলো, এখুনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে পড়বে। ওকে সাহায্য কর্‌তে কর্‌তে বুলু বল্‌লো, "আমার থালায় তোমার খাবারগুলোও তুলে রাখো পিসিমা, হৈ হৈ মিটলে এক সঙ্গে খাবো আমরা—মৃদু হেসে রাণু বল্‌লো,—"এ যে বাজারের খাবার, আমার তো খেতে নেই বুলু"—"তুমি খাবে না, আবার কাল যে তোমার একাদশী, তখন বলছিলে—"

"তা হোক্ গে, তুই শোন্ বুলু—"গলার স্বর নিম্ন করে রাণু বল্‌লো—"তুই যা-তো চুপি চুপি উঠোন থেকে ওই চুড়ির ভাঙ্গা কাঁচগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আয়তো, পার্‌বি তো? "খুব পারবো, মা তো এখন বাবার সঙ্গে ঘরের মধ্যে গল্প করছেন"—চঞ্চল পায়ে বুলু ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

শণির দৃষ্টি

শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহসা চাপিয়া শণি যে কাঁধেতে মোর
বলে কবিতা লিখিতে হবেরে তোর।
কহিনু তাহারে করিয়া মিনতি
কেমনে লিখিব বল গ্রহপতি
কখনো করিনি সাধনা যা
কি করে সাধিব আজিকে তা।
শনিরাজ বলে শোনরে মুর্খ
উপদেশ দেই অতীব সূক্ষ্ম
যাহা মনে আসে লিখিয়া দে
কাগজে বাহির হইবে সে;
গলি ঘুঁচি থেকে ছাই ও পাঁশ
বস্তাপচা ও মাছের আঁশ
যা কিছু নেংরা যা কিছু অশুচি
আজিকার দিনে তাহে সবে রুচি,
প্রগতির দিনে এই সবি সার
কবিতা লেখাটা শক্ত কি আর
বলিনু শণিরে দাও পদধুলি
দিলে খুলে মোর চক্ষের ঠুলি॥

ছেলেবেলা

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের নূতন পুস্তক 'ছেলেবেলা' পড়ে আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছি। আশী বৎসর বয়সের এই আশ্চর্য্য মানুষটির মনে আলোকের ঝরণা ঝরে পড়েছে কত স্বচ্ছ ও অনাবিল হয়ে, সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দিচ্ছে ছেলে বুড়ো সবার মনে কেমন সমভাবে, ভাবলে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। সমালোচনায় সৌন্দর্য্য ক্ষুন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায় নমুনা স্বরূপ তার গোড়ার একটু অংশ উদ্ধৃত করে পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিয়ে তৃপ্ত হচ্ছি। নমুনা দেখলে বইখানি আগাগোড়া না পড়ে কেউ থাকতে পারবেন না আমাদের বিশ্বাস। সঃ

১

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে ছ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড় বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি, তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আঁটা চামড়ার আধ ঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকতো পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে, গাড়িতে চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠতো না। কোন মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি, তার মানে, লজ্জা সরমের মাথা খাওয়া কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামতো নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বৌদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকতো মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হোত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজী। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ী আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুম বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্ব্বনের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত

* ছেলেবেলা—রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ১৷৷০, ২৲ প্রকাশক—কিশোরী মোহন সাঁতরা বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকতো। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান। বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হোত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুটত, কখনো বা কাঁচা শাকসুদ্ধ মূলো খেত আরামে। আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম রাধাকৃষ্ণ। সে যতই হাঁ হাঁ করে দুহাত তুলত আমাদের জিদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্ট দেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহুরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা আরো অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাষ্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ রগড়ানি। তারপর শুনতে হোত মাষ্টার মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মূর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহাল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূতপ্রেত ছিল গল্পে গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে কানাচে। কোন দাসী হঠাৎ শুনতে পেত শাঁক চুন্নির নাকি সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদমেজাজি তার লোভ ছিল মাছের উপরে। বাড়ির পশ্চিম কোনে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ তারই ডালে এক পা আর অন্য পা-টা তেতলার কার্নিসের পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন মূর্ত্তি, তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্ম্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড় সুড় করে উঠত।

তখন জলের কল বসেনি। বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। এক তলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।

নিচের তলার স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধান নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হোত ঝরঝর কলকল করে ঝরণার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরৎ দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিং ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিস, পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীরাধারাণী দেবী

স্বর্গতঃ কবি অতুল প্রসাদ সেনের স্মৃতি প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর সুন্দর মধুর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কথা। তারপর তাঁর কবিত্বের ও কর্ম্মঠতার।

'মানুষ' হিসাবে তিনি ছিলেন সর্ব্বজন প্রিয় এবং রসিক সুধীজন বরেণ্য। বন্ধু বৎসলতায় ছিলেন আদর্শ চরিত্র,—দানে ছিলেন মুক্তহস্ত পুরুষ।

আজকাল আমাদের দেশ থেকে' মজলিসি মানুষ ক্রমশঃই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যে উচ্চশিক্ষা, উদার সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট কতকগুলি স্বভাবজাত গুণ ও শক্তি থাকলে মানুষকে 'মজলিশি পুরুষ' আখ্যা দেওয়া যায়, কবি অতুল প্রসাদে সেই সমস্ত ক'টি গুণই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তাঁর মজলিসে যে সকল উচ্চশিক্ষিত, সুরসিক, কলাবিদ্ বাঙালী এবং অবাঙ্গালী উপস্থিত থাকতেন, সকলেই এক বাক্যে এ'কথা প্রচার ও স্বীকার করে থাকেন।

অতুল প্রসাদ ছিলেন উদার মানব। পরদুঃখকাতরতা কোমলতা, করুণা ভাবপ্রবণতা এবং জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আত্মপর নির্ব্বিশেষে প্রেম ও প্রীতি ছিল তাঁর স্বভাবের সহজ ধর্ম্ম।

বাংলাদেশের সকলে স্বর্গীয় অতুল প্রসাদ সেনকে সঙ্গীত রচয়িতা কবি হিসাবেই বেশি চেনেন। কারণ তিনি বাংলার বাহিরে তাঁর কর্ম্মজীবন যাপন করে গিয়েছেন। বাংলা দেশ চেনে তাঁকে তাঁর সুন্দর সুমধুর সঙ্গীত ধারার মধ্য দিয়ে। যে সঙ্গীত সুরের সুরধুনী লক্ষ্ণৌ হতে বাংলায় একদা বহন করে এনেছিলেন দিলীপ কুমার, সাহানা দেবী, কনকদাস, সতীদেবী ইত্যাদি। আজ অতুল প্রসাদের গান বাঙালী মাত্রেরই সুবিদিত এবং প্রিয় সামগ্রী।

কবি অতুল প্রসাদ তাঁর জীবনকালে কেবল মাত্র ভাবুক কবিমাত্রই ছিলেন না। চারুকলারসিক হলেও, অন্য দিকে তিনি কঠোর কর্ম্মী। অদম্য অধ্যবসায়ে নিষ্ঠা সহকারে দেশ ও সমাজের সেবায় তিনি জীবনপাত করে গিয়েছেন। প্রবাসী বাঙালী সমাজের তিনি ছিলেন সর্ব্বজনের আন্তরিক বাঞ্ছিত প্রিয়তম নেতা। এই নেতৃত্ব তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত চিরদিন অটুট ও অটল ছিল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন যে কয়জন উদ্যোগী শিক্ষিত বাঙালীর প্রচেষ্টায় প্রথম স্থাপিত হয়, ৺অতুল প্রসাদ সেন তাঁদের অন্যতম। তিনি উত্তর ভারতের বহু প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে সে সকল প্রমাণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা তাঁকে বড়ো করে তুলবার প্রয়াস তুচ্ছ। কারণ তিনি এ সকলের বহু উপরের ছিলেন।

রাজনৈতিক মতবাদে উদার মতাবলম্বী হয়েও তাঁর মধ্যে তেজস্বিতা, দূরদর্শিতা, নিরপেক্ষতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা গুণ বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল, অনেকেই জানেন, তাই একাধিকবার তিনি যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক উদার নৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। পল্লী-সংগঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, লোকশিক্ষা প্রচার ও প্রসার, দরিদ্র্যতার মূলকারণগুলি বিনষ্টকরণ, দুর্গত দুঃখী জন সাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রচেষ্টা,—এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের সত্যকার খাটি ঔজ্জ্বল্য যাচাই করে নিতে হলে, অর্থই প্রধান কষ্টিপাথর। আর্থিক ব্যাপারে যে মানুষ নিজের অন্তরের ঔদার্য্য এবং দয়া, করুণা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলির অকৃত্রিমত্ব সপ্রমাণ করতে পারেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অকৃত্রিমত্ব অনস্বীকার্য্য। স্বর্গীয় অতুল প্রসাদকে এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় …তিনি ছিলেন নিখাদ সোনা। প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন যেরূপ, তেমনি দানও করেছেন দুইহাতে অজস্রধারে। অর্থে তাঁর আসক্তি ছিল না। দানকালে কখনও বিচারও করতেন না গ্রহিতা সে-দানের যোগ্য কি না! এ সম্বন্ধে, তাঁর বিচার ছিল না শুধু নয় বিভেদও ছিল না।

মৃত্যুর পরও তাই ইচ্ছাপত্র বা দানপত্রে তাঁর অন্তরের সেই নিঃস্বার্থ উদার দানপরায়ণতাই প্রকাশ পেয়েছে।

অতুল প্রসাদ ছিলেন কবি এবং তারও চেয়ে বেশি ছিলেন রসবেত্তা। বৈষ্ণব, পদাবলী সাহিত্য বা বাংলা রবীন্দ্র কাব্যে তাঁর যেমন অনুরক্তি ছিল তেমনই ছিল অনুরাগ মুসলমান গীতিকাব্যে, হিন্দী তুলসী দাস, কবীর, নাকক রজ্জব প্রভৃতিতে। তাঁর গানের মধ্যেও তাই এই সার্ব্বজনীন উদার ভাব এবং বিভিন্ন কাব্য সাহিত্যের ভঙ্গিমা বর্ত্তমান। উর্দ্দু সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও মূল সম্পদ গুলি বাংলা গানে সঞ্চারিত করবার প্রচেষ্টা বোধহয় অতুল প্রসাদই প্রথম করেছেন। তাঁর সুবিদিত সঙ্গীত 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী —উঠ আজি জগজন পূজ্যা'" গানটি সম্বন্ধে তাঁর একাধিক বন্ধুর মুখে শুনেছি, তিনি ইটালীতে গিয়ে ইতালীয় ভিক্ষুকদের মুখে বিখ্যাত ফাউন্ট কাব্যের গান শুনে সেই প্রাচীন ইতালীয় সুরের ভঙ্গীতে ঐ গানটীতে সুর রচনা করেছিলেন।

বাংলার বাউল গানের সাথে উর্দ্দু-মার্শিয়া ও গজল গানের সংমিশ্রণ,—বাংলাগানের মধ্যে হিন্দুস্থানী কাজরী, চৈতী, হোলি, শাওয়নী প্রভৃতির প্রভাব অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। তাঁর "বঁধু, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে— কিংবা "বাদল ঝুমুঝুমু বোলে—" শুধু সুরে তানে তালেই নয়, ভাবের দিক দিয়েও বিশিষ্টতা দাবী করে। অতুল প্রসাদের দুঃখ ও বেদনাসূচক এবং ঈশ্বরের প্রতি আবেদন মূলক সঙ্গীতগুলিও বিশেষ উল্লেযোগ্য। খাঁটী সুর, তান, লয়সহ সুমধুর ভাষা লালিত্যের জন্য অতুল প্রসাদের সঙ্গীতকে অনেক সময়ে অনেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বলে ভ্রম করেছেন, দেখেছি।

আমার মনে হয় স্বর্গীয় অতুল প্রসাদের গানের মধ্যে বেশির ভাগ গান আভিজাত্যের বৈশিষ্টের চেয়ে সহজ সরলতার দাবী অধিক করতে পারে। সেজন্য অতুল প্রসাদের গানের কথা অশিক্ষিত সম্পূর্ণ নিরক্ষর শ্রেণীকেও রসাস্বাদ দান করে। তাঁর গান বাঙলা দেশে এবং বাংলার বাহিরে যথেষ্ট প্রচলিত। এই গানগুলি সুরের দিক দিয়ে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী হলেও, ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে কতকাংশে লোক সঙ্গীত নাম গ্রহণ করবার যোগ্য।

অতুলপ্রসাদের গান ভাষার সৌন্দর্যে সুর তানের সৌন্দর্য্যে এবং ভাবের সৌগন্ধে চিরদিন রসিকজন চিত্তে আনন্দ দান করতে থাকবে।

আমরা সভা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি যে সম্বর্দ্ধনা দান করতে পারি—তার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশি ফলপ্রদ সম্মাননা বা স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি যদি তাঁর সমস্ত সঙ্গীতগুলি যথার্থ সঠিক সুরে তানে ও তালে বাংলাদেশে প্রচলনের ব্যবস্থা করি। তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষা এবং স্মৃতির প্রতি সম্মাননা যত সুন্দর এবং সহজ হতে পারে এমন বোধ হয় অন্য আর কিছুতেই নয়।

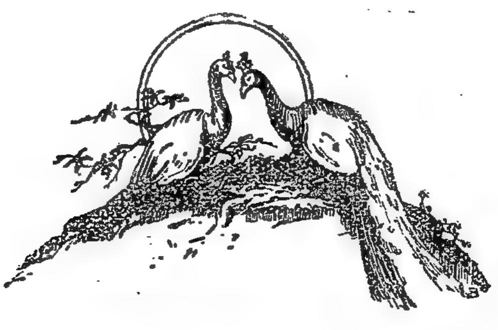

আমাদের দুর্গোৎসব

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দুর্গাপূজা, ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ প্রচলিত অনুষ্ঠান। তবে বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও দশভুজার পূজা প্রচলিত আছে বলিয়া জানা নাই। তবে অন্যান্য দেশে নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নবরাত্রি ব্রতে দুর্গাপূজার ন্যায় হোম, চণ্ডীপাঠ, পূজা হয়; মৃন্ময়ী দশভুজা মূর্ত্তি পূজা বঙ্গদেশে হইয়া থাকে, ইহাই বাঙ্গালীর পরম বৈশিষ্ট্য। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া মা ভগবতীর অর্চ্চনা-পদ্ধতি বাঙ্গালী হিন্দুগণের একটা মনগড়া কল্পনা নহে, আধুনিক অনুষ্ঠানও নহে, ইহা এক অতি প্রাচীন পৌরাণিক অনুষ্ঠান। ভক্ত ভাবুক বাঙ্গালী যখন নয়ন ও মনোহারী কমনীয় কান্তি মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে মা মা বলিয়া আরাধনা করে, তখন তাহার চিত্তে অপূর্ব্ব ভক্তি, শ্রদ্ধা আনন্দ উচ্ছসিত হয়। সে রস অন্যের পক্ষে অনুভব করা সম্ভবপর না হইলেও আবালবৃদ্ধ বঙ্গনরনারী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান বৎসর বৎসর মহামায়ার আগমনে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এমন উৎসব বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই। বার মাসে তের পার্ব্বণ বাঙ্গালীর ছিল, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্ব্বন এই দুর্গা পূজা। মা নামের কি অপার মহিমা। সকলকেই মুগ্ধ করে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্নিত আছে সুরথ রাজা ভগবতীর করুণা লাভের জন্য নদীতীরে গমন করিয়া 'মহীময়ী' (মৃন্ময়ী) মূর্ত্তি নির্ম্মান পূর্ব্বক পুষ্প ধুপ ধুনাদ্বারা দেবী ভগবতীর অর্চ্চনা করেন। তদবধি দুর্গাপূজা প্রচলিত রহিয়াছে। তাহা ব্যতিত মৎস্য পুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণেই দশভূজা ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা পদ্ধতি সন্নিবদ্ধ আছে। তন্ত্র শাস্ত্রেও দুর্গাপূজার বিধান রহিয়াছে। বেদে এই রূপ কোন পূজার উল্লেখ নাই, এমন কি দুর্গা বা ভগবতী নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে উমা ও হৈমবতী নাম আছে।

প্রতি বৎসর শরতকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জননীর আবির্ভাব হয়, আগমনীর করুণ সুর বাঙ্গালীর হৃদয় আর্দ্র করিয়া দেয়, সমগ্র দেশে নবজীবনের সঞ্চার হয়, নিদ্রালস হৃদয়ে একটা জাগরণের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, আধি-ব্যাধি শোকসন্তাপিত, দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালী নর-নারীর অবসন্ন হৃদয়ে কয়েক দিনের জন্য যেন অপার আনন্দ মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়, আশার আলোকসম্পাতে বঙ্গরমণীর মলিন মুখে বিমল হাসির রেখা দেখা দেয়, বিষাদ কাতর হৃদয়ের মধ্যে নবীন উৎসাহ ও অদম্য উদ্যমের ঢেউ খেলিয়া যায়। ধনি দরিদ্র জাতি নির্ব্বিশেষে সকল নরনারী আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে। নববস্ত্র পরিধানে মনকে চিরনবীন করে।

বাঙ্গালীর এই উৎসবের প্রকৃত আনন্দের ও শ্রদ্ধার ঢেউ পল্লীগ্রামের নরনারীর মধ্যে যেমন বহিয়া যায় অন্যত্র তাহার নিদর্শন বিরল। সেই পল্লীগ্রামের দুর্গোৎসবের একটি ছবি বর্ণিত হইল। বরষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের রুদ্রলীলার মধ্যে বাঙ্গালী যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসবে মাতোয়ারা তখন সেই প্রেমলীলার অঙ্কুরের সঙ্গেই মাতৃস্নেহের প্রবাহ বহিতে সুরু হয়। বাঙ্গালী সাধকরা শ্যামের প্রেম ও শ্যামা মায়ের স্নেহের পীযুষধারায় বঙ্গসাহিত্য সরস করিয়া রাখিয়াছে। জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবের নৃত্যগীতের ঝঙ্কার মিলাইতে না মিলাইতে আগমনীর সুরে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠে। জন্মাষ্টমীর দিনই দুর্গা প্রতিমার কাঠাম করিবার জন্য বাঁশ কাটা হয়, সেই দিন হইতে গিরি কুমারীকে ঘরে আনিবার আয়োজন সুরু হইল। আমাদের গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনটী বাটীতে দুর্গোৎসব হইত। বর্ত্তমানে আমাদেরই দালানে কেবল প্রতিমা উঠে তাই গ্রামের লোকেরা বাঁশ কাটার অভিযানে আগ্রহে যোগদান করেন। এই বংশে ১৫০ বৎসর পূজা হইতেছে। পল্লীর বালক বালিকারা মহামায়ায় বিরাট মূর্ত্তি কি করিয়া মূর্ত্ত হয়,

তাহা দেখিবার জন্যই আগ্রহে ঠাকুর দালানে পটুয়ার তাড়না পাইয়াও ভীড় করিয়া থাকে। শিল্পীর সৃজন শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হয়, তাহার অনুকরণ করিয়া নিজ শক্তি বিকাশের চেষ্টা করে। রং প্রস্তুত ও রংফলান এখনও দেশীয় দ্রব্য দ্বারাই হইয়া থাকে। ক্রমশঃ খড় জড়ান এক মেঠো, দোমেঠো, খড়ি দেওয়া, রং মাখান, চক্ষু অঙ্কন, গর্জ্জন তৈল দ্বারা মুখ উজ্জল করন নানাবিধ সমস্ত কাজই চলিয়াছে; ছেলে মেয়েরা খুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়।

আশ্বিন মাসের শারদীয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যখন বোধনের মঙ্গল ঘট স্থাপন হইল, পুরোহিতের উচ্চ কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ ধ্বনিতে যখন দালান মুখরিত হইয়া উঠিল তখন গ্রামের লোকেরা স্ব স্ব কাজ ফেলিয়া পূজা বাড়ীর কাজে মাতিয়া যাইল। তাহারা না করে কোন মজুরীর আশা, না রাখে কোন প্রশংসার দাবী, তাহাদের হৃদয়ে কেবল জাগে মহামায়ার সেবা। এই বেগার খাটিবার জন্যে হিন্দু মুসলমানগণ সমান ভাবে আগ্রহান্বিত। আজকালের এই উৎকট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঢক্কানিনাদের মধ্যেও মুসলমান গ্রামবাসীগণ বিশেষত প্রবীণগণ হিন্দুর দুর্গোৎসবে সানন্দে মাতিয়া উঠে, ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া ঘোষ বাবুদের দেউড়ীতে আড্ডা জমায়। যত প্রকার কষ্ট সাধ্য কাজই তাহারাই করে। ম্লেচ্ছ বলিয়া গোঁড়াদের উপেক্ষা তারা গায়ে মাখে না, তারা যেন ভগবানেরই কাজের জন্যই আসিয়াছে, হিন্দু জমিদারের ক্ষিদমদকারী করিবার জন্য নহে। মহানবমীর দিন যখন কয়েকজন মুসমমান প্রতিবেশী নৈবিদ্য পাইবার আগ্রহ জানায় এবং যখন তাহাদের মহামায়ার প্রসাদি নৈবেদ্য চাল ও ফল মূল মিষ্টান্ন আচলে ঢালিয়া দিতেছিলাম তখন লক্ষ্য করিলাম তাহাদের মুখে আনন্দ রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রের আড়াই সের চাল পাইবার সে আনন্দ নয় ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাইবার এই আনন্দ। মুসলমান রমণীগণ সন্তানসহ নববস্ত্র পরিধান করিয়া আরতি দর্শন করে, আরতি অন্তে ঠাকুর প্রণাম করিয়া মঙ্গল কামনাও করে। কলিকাতা হইতে মাত্র এগার ক্রোশ দূরের পল্লীর মুসলমানরা এখনও 'রাম' ও 'রহিম' ভিন্ন নহে এই জ্ঞানে হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত সামিলে সানন্দে বসবাস করিতেছে। পল্লীর এই শান্তি যেন সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট না হয়, এই মহামায়ার কাছে প্রার্থনা।

মহালয়ার অমাবস্যার দিন পূজার জন্য কলার কাঁদি কাটা হয়। সাতদিন অগ্রে কলার কাঁদি কাটিয়া না রাখিলে পাকিবে না সেই জন্য এই প্রথা প্রচলিত। এই দিনটিকে গ্রামবাসীরা 'কলা কাটা অমাবস্যা' বলে।

বোধনের প্রায় পনর দিন পূর্ব্ব হইতে আতপ্ চাউল ঝাড়া বাছা হইতেছে। ছয় মণ চাল একনিষ্ঠ ভাবে একটী একটী করিয়া নিখুত করিয়া বাছা, কুলায় পাছড়ান সবই গ্রামের বিধবা রমণীরা কয়েক দিন ধরিয়া করিয়া থাকে— মুড়ি ভাজা, খৈ ভাজা সমস্তই মেয়েরাই করে। এক কোঁচড় জলপান (মুড়ি ও মুড়কী) পায় মাত্র। নারিকেল ছাড়ান, কাঠ কাটা, ঘর-বাড়ি মেরামত, জঙ্গল সাপ সকলই 'বেগারে' হইয়া থাকে। তাহারা এই সব কাজ নিজের বাটীর পূজা ভাবিয়া করে, কোন জুলুমে করে না। এম্, এল এ-গণ একবার সচক্ষে দেখিয়া আসিয়া ব্যবস্থাপক সভায় যেন আস্ফালন করেন।

প্রতিপদ হইতেই দালান, আটচালা, ভিয়ানচালা গুলজার। চণ্ডীপাঠ ও ঢাক-ঢোলের বাদ্যিতে পল্লী সরগরম হইয়া উঠে। যদিও বাবুরা কেহ তখনও ভীটায় পদার্পণ করেন নাই, কেবল বাটীর এক প্রবীণা গৃহিণী আগমন করিয়াছেন। সারা বৎসর বাটী চাবি দেওয়া থাকে, বৎসরান্তে কলিকাতা ভবানীপুর হইতে ঘোষ বাবুরা সপরিবারে দেশের ভীটায় আগমন করেন। কুলদেবতা 'রাজরাজেশ্বর' ও কুলদেবী 'মেলাইচণ্ডীর' এবং দুই বুড়া শিবের পূজার ভার কুল পুরোহিতের উপর ন্যস্ত এবং গ্রামের নরনারীরা তাহাদেরই নিত্য আশীর্ব্বাদ পাইয়া থাকেন। ঠাকুর সেবার আনন্দ ঘোষবাবুরা যেমন ভোগ করে না, আশীর্ব্বাদও তেমনই তাহাদের ভাগ্যে জোটে না।

এই কয়দিন পেট্রোম্যাক্স আলো, কলের গান, বাবুদের ছেলে-মেয়ে-গিন্নির নানা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, সাটী, ব্লাউজ, নানা ফ্যাসানের বেণী বাঁধা, রং বেরংয়ে জুতা, সেপটী রেজারে দাড়ি কামান, ঝরণা কলমে লেখা, ক্যামারায় ছবি তোলা দেখিবার জন্য পাঁচ সাতখানা গ্রামের নরনারী সমবেত হয়, যেন এক প্রদর্শনী বসিয়া গিয়াছে। বালিকা রমা ও গীতা কাছা কোঁচা দিয়া মাহারাষ্ট্র সাটী পরিধান ও

নূপুর পায় দিয়া দেবদাসী ও ব্রতচারী নৃত্য যেমন পল্লীবাসীদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ছিল তেমনই আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। যাত্রা হইলে যেমন জনসমাগম হয় সেই প্রকার নরনারীর ভীড় জমিয়া ছিল।

চাউলখোলার ঘোষেদের দুর্গা পূজা তেমন আড়ম্বর সহিত না হইলেও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হয় বলিয়া সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। ৫৫০ নগদ টাকা, ছয় মণ আতপ চাউল, নয় মণ সিদ্ধ চাউল এবং পাঁচশত নারিকেল খরচ হয়। ইহা ব্যতীত পোটুয়া, মালাকর, কুমার ও গয়লা পূজার সামগ্রী স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করিবার সত্বে কয়েক বিঘা ধান্য জমি তাহাদের বিলি করা আছে। পূজার দালানের কয়দিন যোগাড় দিবার ভার নরসুন্দরের উপর, বিশ্বাসী মাহিষ্য প্রতিবেশী মান্নাদের বংশের বয়জ্যেষ্ঠর উপরই ভাণ্ডারের ভার; ময়রা পাড়ার বৃন্দাবন ধাড়ার উপর ভিয়ান চালার সম্পূর্ণ ভার; আলোবাতি বাটী, আট চালা বাগান, পুকুর পরিষ্কার রাখিবার যাবতীয় ভার মুসলমান তরফুদ্দি মোল্লার উপর; কলাপাতা সরবরাহ, হাট বাজার করার ভার শুল্কী (অনুন্নত) মহেশ চৌকীদারের উপর বহু বৎসর হইতে দেওয়া আছে। এমন কি চিরশত্রু জাতির মাতা ফল ছাড়াইবার জন্য নিত্য উপস্থিত থাকা তাহারাও আত্ম পর জ্ঞান না করিয়া সানন্দে মহামায়ার পূজাটী সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সুসম্পন্ন করিবার জন্য মন প্রাণ দেয়। এই ত প্রকৃত সার্ব্বজনীন উৎসব। এক টাকা চাঁদা দিয়া সত্ত্ব-সামিত্ব জাহির করিয়া বারোয়ারি পূজা করিলে এই রূপ নির্দ্দোষ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ হয় না। বাবুরাও কলিকাতায় পৃথক পৃথক পাড়ায় ও বাটীতে থাকিয়া সারা বৎসর কেহ কাহার হয় ত সংবাদ রাখিবার সুযোগ পান না, কিন্তু যখন তাহারা পূজার সময় দেশে সমবেত হন, তখন বাঙ্গলার বৈশিষ্টময় একান্নবর্ত্তী পরিবারের মতন একত্রে আহার ও বিহার করেন। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন ছেলে মেয়ে একত্রে থাকিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন। এইত আনন্দময়ীর আগমন!

পূজার নৈবেদ্য, বস্ত্র, উপকরণ আদির একটী তালিকা প্রদান করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! বর্ত্তমানের পল্লিগ্রামের পূজার আয়োজনের বিষয় জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

ষষ্ঠীর দিবস বৈকালে প্রতিবাসিনী যে সধবা মহিলার নিকট "শ্রী" গড়িতে দেওয়া হইয়াছিল একটী পাঁচ সের চালের 'সিধা' (চাল, ঘৃত, তৈল, লবণ, মসলা, তরকারী ভোজ্য সামগ্রী ডালায় সজ্জিত করিয়া) প্রদান করিয়া বাদ্য সহ "শ্রী" আনয়ন করা হয়। ইতি পূর্ব্বে 'বরণ ডালা'—মহী, চন্দন, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, কদলী, দধি, ঘৃত, শ্রী, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, হরিদ্রা, সিদ্ধি, কাঞ্চন, রূপা, তাম্র, দীপ, চামর, দর্পণ, তৈল, রোচনা আলতা এই মঙ্গল দ্রব্য থালায় সজ্জিত হইয়াছে। তৎপরে সন্ধ্যায় বিল্বমূলে দেবীর মঙ্গল ঘট স্থাপন, অধিবাস, নবপত্রিকা আহ্বান সঙ্কল্প পূজা আরতি হয়।

দুর্গাপূজার এক বিশিষ্ট প্রথা 'নবপত্রিকা' স্থাপন। একটী কচি কলা গাছে—কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান, ধান ও কলা—এই নয়টী গাছপালা সংযুক্ত করিয়া বক্ষস্থলে স্তনযুগল কল্পনায় এক বৃন্তে দুইটী বেল দেয় অপরাজিতা লতার দ্বারা বাঁধিয়া—নবপত্রিকা গঠন হয় তাহাকে একখানি লাল পাড় দশহাতী সাটী বেষ্টন করিয়া, একটী পাতা নত করিয়া সাটী দ্বারা ঘোমটার ন্যায় আচ্ছাদান করা হয় এবং সিঁথায় সিন্দুর টানিয়া দেওয়া হয়। ইনি মা দুর্গা, ইহারই বোধন। ছেলেরা ইহাকে কলা বৌ বলে, অনেকে ভ্রমে গণেশের বৌও বলিয়া থাকে। কলা বৌয়ের স্নান ও প্রবেশ দেখিবার জন্য ছেলে মেয়েরা আনন্দে মত্ত।

বোধন সময় একখানি ৵৫ সের, চণ্ডীর এক খানি ৵১ সের ও কুচ ৵১ সের, বোধনের ৵১ সের চাউলের নৈবিদ্য হয়। একখানি বস্ত্রও প্রয়োজন।

সপ্তমী পূজার শারদ প্রাতে অরুণ উদয় সহিত যখন প্রাঙ্গণে শিশির স্নাত শেফালী বৃক্ষ ধরণীর শ্যামল বক্ষে তাহার পুষ্প ঝরাইয়া আঁচল বিছাইয়া রাখিয়াছে তখনই নবপত্রিকা প্রবেশের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। গঙ্গা, নদী, বা প্রতিষ্ঠিত সরোবরে নবপত্রিকাকে বাদ্যসহ লইয়া গিয়া স্নান করানই বিধি। ঘোষেদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত "শানের পুকুরের" শান বাঁধান ঘাটেই কলাবৌকে স্নান করান হইল। তৎপরে দালানে আনয়ন করিয়া বাটির সধবা সর্ব্ব বড় মহিলা প্রশস্তি পাত্র, শ্রী, মঙ্গলঘট লইয়া আপন বধু

বরণের ন্যায় বরণ করিয়া দালানে উঠাইলেন। পুরোহিত ও তন্ত্রধারক বরণ হইবার পর পূজা আরম্ভ। সপ্তমী পূজার একখানি মূল নৈবিদ্য ॥০ মণ চাউল, পঞ্চদশ প্রকার ফল পাঁচ কলাই থালে থালে ভরিয়া পানীয় জল পাঁচ প্রকার (যথা ডাব, মিছরীর পানা, মধুর পানা, কর্পূর জল) সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। নৈবেদ্যর চাল উচু করিয়া যখন তাহার শিরে 'আগ' সন্দেশ স্থাপন হয় তখন ঠিক একটী বৌদ্ধ স্তূপের (সাঁচীর) মতন দেখায়। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব,মনসা অসুর, সিংহ, সর্প, ময়ূর,, চণ্ডি, নারায়ন (রাজ রাজেশ্বর) পূজার জন্য ৹/২॥ সের চাউলের ১৪ খানি নৈবেদ্য এবং /১ সের চালের নৈবেদ্য তেত্রিশ কোটী দেবতার জন্য উৎসর্গ হয়। প্রথম দিবস সপ্তমীর পূজার জন্য ১০ হাতা লাল পাড় সাটী, পূজক এবং তন্ত্রধারকের বরণের জন্য চৌদ্দ হাতী দুইটী জোড় ও চক্ষুদানের ৮ হাতী সাটি প্রয়োজন।

অষ্টমী পূজার জন্য ১৪ হাতী জোড় একটি ১০ হাতী সাটী একখানা, লক্ষী ও সরস্বতীর ৮ হাতী সাটী দুইখানা এবং ১২ খানা বস্ত্র ৫ হাতী বা ৮ হাতী দেওয়া হয়। সপ্তমী পূজার ন্যায় চৌদ্দখানা নৈবেদ্য /২॥০ চালের এবং আধমন চালের প্রধান নৈবেদ্য, দশসের চালের সিধা দেওয়া হয়। নবমী পূজারও এই আয়োজন। পূর্ব্বে ছাগ বলি হইত শুনিয়াছি এখন তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচসের করিয়া চিনির নৈবেদ্য তিন দিনই দিবার ব্যবস্থা পুরোহিত মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সন্ধিপূজা সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ অষ্টমী অন্তে নবমী আগমনের সংযোগ স্থলে দশভূজা পূজা গ্রহণ করেন। ঠিক সময়ে এই পূজাটীর বিধি বলিয়া সকলের মন ও আগ্রহ পূজার উপরে থাকে। একাগ্রচিত্তে অতি শুদ্ধ চিত্তে ইহার আয়োজন করিতে হয়। বর্ত্তমান বৎসর ভোর ৪।৪৭মিঃ সময় সন্ধিপূজার কাল ছিল। রাত্রি একটার সময় বাটীর কয়েক জন মহিলাকে লইয়া পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া পূজার ও নৈবেদ্যর আয়োজন আরম্ভ হইল। চারিদিক নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে নিরবে আয়োজন চলিয়াছে। পচিশ সের চাউল ধুইয়া প্রকাণ্ড থালায় পর্ব্বত আকারে উচু করা হইল প্রকাণ্ড পাঁচপোয়া ওজনের 'আগ' সন্দেশ বসান হইল। স্তরে স্তরে ত্রিশটি থালায় এক এক রকম সহজপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য ফল কড়াই মিষ্টান্নদ্বারা সাজান হইল। কোটী যোগিনীর পাঁচসেরা নৈবেদ্য ও বলিদানের পরিবর্ত্তে চিনির নৈবেদ্য দেবীর ডান ও বাম দিকে রাখা হইল। ১০৮ প্রদীপের আলার প্রতি দীপটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি অপূর্ব্ব শোভা দালানটীর যেন দেবীর আগমন প্রতীক্ষায় অপার সুষমা মণ্ডিত হইয়া সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছে। চেলীর সাটী, সিন্দুর চুবড়ী শাখা 'নেয়য়া'দিয়া পূজা ঠিক সময় আরম্ভ হইল, এবার সন্ধিক্ষণে ৪।৪৭ মিনিট বলিদান— সকলেই সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন। ঘড়ি হাতে দাঁড়াইয়া কর্ত্তারা মুহুর্মুহুর সন্ধিক্ষণের আগমন সময় পূজককে জানাইতেছেন, সময় আগত 'জয় মা' বলিয়া মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, বলির কোপ পড়িল গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল বিজয় বাদ্যরোল উত্থিত হইল। সন্ধিপূজা দেখিবার জন্য দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে দশবার খানি গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সমবেত হইয়াছে। যথা সময় নির্বিঘ্নে মা চামুণ্ডে বলি গ্রহণ করিয়াছেন, গৃহস্থের মেয়ে পুরুষের চিত্ত যেমন পুলকিত হইল তেমনই দর্শকদের মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; সকলে মঙ্গলময়ীর চরণে প্রণত হইল।

পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মনাদি ভোজনও অপূর্ব্ব, পূর্ব্ব রাত্রে ভাজা লুচী কুমড়ার ছক্কা ছোলার ডাল বেগুন ও পটল ভাজা, চাটনী, দুর্গাদে নারিকেল নাড়ু রসকরা (চিনির) বঁদে গজা এই খাইবার জন্য দুই বৎসরের শিশু হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ৩।৪ ক্রোশ দূর হইতে জল কাদা ভাঙ্গিয়া আগমন করে। তাহাদের ভোজন করাইয়া যেমন তৃপ্তি হয় তেমনই ভূরি ভোজন দেখিয়া বিস্ময়ে চিত্ত ভরিয়া উঠে। সল্লাহারী সহরবাসী অনাহারী পল্লী বাসীর এই ভূরি ভোজন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় করুণাও হয়। আমাদের কি দৈন্য। অপর লোকেদের ভোজন ব্যাপারও অদ্ভুত। ঘোষ বাবুদের বাটীতে পূজা কিন্তু পূজার সময় চাউলখোলা বাসীদের বাটী কুটুম্বতে পরিপূর্ণ, দুই বেলা পুইশাক চর্চ্চরী ভাত খাইবার জন্য কি আগ্রহ। তারা নিমন্ত্রনের ধার ধারেন না, পূর্ব্ব হইতে জানন প্রয়োজন বোধ করেন না। পূজা বাটী এক মুঠা খেতে পাইব এই তাহাদো দাবী। আহার করিবার জনসংখ্যা ঠিক না

থাকার অকারনে বিলম্ব হয় অপরাহ্ণ এমন কি সন্ধ্যা হইয়া যায়—কোন বিরক্তি নাই।

বর্ত্তমান বর্ষ বড়ই দুর্বৎসর, অর্থাভাবে সকলকে লুচী তরকারী এক দিনও খাওয়ান সম্ভব হইয়া উঠিল না। গ্রামবাসীরা আবদার করিল আমরা লুচী খাইতে পাই আর নাই পাই কুটুম্বদের খাওয়াইয়া দিন—আর বাবু একটী দিন গাহনা দিন—অর্থাৎ যাত্রার ব্যবস্থা করুণ। গ্রাম গ্রামান্তর হতে মেয়ে ছেলেরা এসেছে, বছর অন্তে একটী দিন 'যাত্রা, শুনিতে পাইবেনা এই বড় দুঃখ। কর্ত্তাদের নিকট আমল না পাইয়া গিন্নি মায়েদের নিকট ছুটাছুটী আরম্ভ হইল। এঘর ওঘর করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া পনর টাকা আদায় করিল, শ্যামরায় চরের দল বায়না হইবে। এবৎসর এক পুরাণ ভাল যাত্রাদল ভাঙ্গি নূতন পোষাক পরিচ্ছদ করিয়া নূতন অপেরাপার্টি গঠন করিয়াছে। কেবল সাজ ও গাড়ী ভাড়া লইয়া মহামায়ার নিকট গান করিয়া যাইবে 'উষাহরণ' পালা দলে প্রায় পয়তাল্লিশজন লোক তাঁহাদের ত জলখাবার দিতে হইবে। তখন তাহারা আসিয়া কর্ত্তাবাবুর শরনাপন্ন হইল। কর্ত্তারও মন তখন নরম হইয়াছে লোকজনের আগ্রহ নাতি নাতনীর আবদার রক্ষা করিবার জন্য ঘি ময়দা আনিবার হুকুম দিলেন। রাত্র ১ টার সময় সাপের মুখে পা পড়ে কি বিছে কামড়ায় কোন খেয়াল নাই যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। নবমীর দিন আরতির পর যাত্রা আরম্ভ হইবে—তোড়যোড় করিতে রাত্র ১টা বাজিল। আটচালা, ভিয়ানচালা সকল স্থান মেয়ে, পুরুষ, বালক, বালিকা হিন্দু মুসলমানে ভরিয়া গেল।

এই যাত্রা পাল্লীগ্রামের লোক শিক্ষার এবং ধর্ম্মদীক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। বিনাপয়সা খরচে এমন আমোদ, এমন গানশুনা, এমন নীতিকথা জানা, এমন শুদ্ধ ভাষা শিক্ষা পাওয়া কি লাভ ও লোভের জিনিষ। এক রাত্রি যাত্রা দিয়া প্রজাদের হৃদয় যত সহজে জয় হয় অন্য কোন ব্যবস্থায় তাহা হয় না।

তিনদিন, তিন রাত্র আনন্দময়ীর পূজায় কেমন করিয়া আনন্দে সময় কাটিয়া গেল তাহা জানিতে কেহ পারিল না ভোরে মঙ্গল আরতির বাদ্যে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া সমস্ত দিন পূজা, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, জলপান বিতরণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন, বলিদান, সন্ধ্যা, আরতি গান বাজনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সময় কাটিয়া যায়। দশমীর দিন দর্পন বিসর্জ্জনের সহিত সকলের মন যেন ভারাক্রান্ত, অপরাহ্নে প্রতিমা বিসর্জ্জনের আয়োজন চলিল— ছেলে মেয়েরা আজ নববস্ত্র পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হইল বিজয় উৎসব করিতে। সাত শত বর্ষের পরাধীন জাতি বিজয় উৎসবের কল্পনা করিতে কি পারে? তথাপি তাহারা সেই উৎসবের স্মৃতি এখনও হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রাণের নিরানন্দভাব চাপিয়া বিজয়া করিবার উদ্যমে ও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। যেমনই হাসি মুখে দেবীকে গৃহে আনিয়াছিল তেমনই নির্ব্বিকার চিত্তে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া দেবীর প্রতিমা নিরঞ্জন করিয়া আসিল। মনের বেদনা চাপিবার জন্য সিদ্ধি খাইয়া চেতনা হারাইল, যেন যুদ্ধ জয়ে গর্ব্বিত হইয়াছে, আনন্দে উৎফুল্ল শত্রু ও মিত্র ভেদাভেদ নাই। গুরুজন দেখিলেই শির নত, অপরজন দেখিলে বক্ষ মধ্যে টানিয়া কোলাকুলি মিষ্টিমুখ। বাঙ্গালীরা সব দৈন্য সব দুঃখ এই মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যায়। আটচালায় বিরাট মেঝেতে বসিয়া শান্তিজল গ্রহণ, দুর্গা নাম কলাপাতার উপর আলতা গোলা কালীতে লেখা আরম্ভ হইল। বয়ক্রম হিসাবে পর পর এক একজন ব্রাহ্মনের নিকট যাইয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল, অনুপস্থিত আত্মীয় জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিল না। তৎপরে রাজ রাজেশ্বরের প্রসাদ ক্ষির সন্দেশ খাওয়া এবং প্রণাম ও কোলাকুলি (আলিঙ্গন) চলিল অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত। সমস্ত দ্বেষ হিংসা, অভাব অভিযোগ ভুলিয়া সকলকে আপনজন মনে করিতে লাগিল। বিজয়ার এই আনন্দ মিলন স্থায়ী হউক।

অনিন্দিতা

শ্রীহিমাংশু বালা ভাদুড়ী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীতি অনুর সঙ্গের ঝিকে বললে—"এত রাত্তির হয়েছে তোমার ত বড্ড ঘুম পেয়েছে বাছা, তা হাতের জিনিষ গুলি ঐ ঘরের কোনে রেখে পাশের ঘরে বিন্দী ঝীর পাশে বিছানা পাতাই আছে তাতে একটু গড়িয়ে নাওগে। রাত প্রায় ফরসা হ'য়ে এল, তবু যতটুকু পার ঘুমিয়ে নাও। তোমাদের মেয়ের জন্য ভেবনা, তার যা কিছু দরকার আমরাই করব।„

বৃদ্ধা ঝি বড় বধুর নির্দ্দেশ মত হাতের জিনিষ গুলি যথাস্থানে নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে বিন্দী ঝীর পাশে শুইতে গেল। এত রাতে যে আবার কনের জামা কাপড় ছাড়াবার জন্য তাকে বসিয়ে না রেখে ছুটী দিয়েছে এই কথা মনে করে নীতির প্রতি ঝীয়ের মন খুসী হয়ে উঠল। ফিরে গিয়ে অনুর মায়ের কাছে বড় বধূ বিষয়ে কি কি ভাল কথা বলবে তাও ইতিমধ্যে স্থির করে ফেললে। প্রথম প্রবেশের সময় নববধু-বরণের কোন সরঞ্জাম না দেখে তাহার মনে যে বিরক্তির সঞ্চার হয়েছিল, নীতার মিষ্টি কথায় ঝির মন থেকে তাহাও মুছে গেল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর যতগুলি মেয়ে-বউয়ের ঘুম ভেঙ্গেছিল সবাই ভীড় করে অনুকে ঘিরে মায়ের ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

সমীরের বড় ভাগ্নী রেবা ঘরে ঢুকে দেখে তার ছোটমামা ইতিপূর্ব্বে কখন এসে দিদিমার কোলে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে আছে। সে হাসিমুখে বললে—"এখন দিদিমার কোলটি অমন করে জুড়ে থাকলে আর চলবেনা ছোটমামা এতকাল আইবুড় কার্ত্তিক থেকে যা ভোগ করবার করে নিয়েছ; এখন মামীমা এসেছেন, দিদিমার কোলটি তাকে এখন ছেড়ে দাওত দেখি।"

সমীর ওঠবার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ না করে বেশ গম্ভীর ভাবে বললে—"সেটি হচ্ছেনা রেবা। আমি সব দিতে পারি, কিন্তু মায়ের কোলের ভাগ আমি কাউকে দিতে পারিনা।"

ছোট বোন দীপা এবার বলে উঠল,—

"মজা মন্দ নয়, পরের বাড়ীর মেয়েটি এনে ঠিক পরের মতই রেখে দেবে—না? তাকে নিজের করতে হলে নিজের জিনিষটী তাকে দিতে হবে।"

সমীর বললে—"সব ভাল জিনিষই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তুই ও ত কম ভাল নয়, তোকেও আমি ছেড়ে দিলাম, তাই বলে মায়ের কোল? সেখানে আমি ভাগীদার জোটাচ্ছি না।"

দীপা উত্তর দিলে—"না বললেই হল কিনা, বেচারা নূতন এসেছে তাকে আগে মায়ের কোলটী ছেড়ে দিয়ে নিজে এখান থেকে প্রস্থান করত দেখি।"

সমীর—"মায়ের কাছটী ছাড়া আমার প্রস্থান করবার আর কোন স্থান নেই কিন্তু তোর শ্বশুর বাড়ী বলে ত একটা জায়গা আছে, তুই তা ছেড়ে ডাকতেই কেন এলি বলত দেখি?"

দীপা—"না ডাকতেই তোমার বিয়েতে আমার আসতে বয়ে গিয়েছিল। কত খোসামোদ করে তবে আমায় আস্তে পেরেছ, তা আমি জানি?"

সমীর— "তবে চল, তারা খোসামোদ করবার আগেই তোকে সেখানে পৌছে দিয়ে আসি।"

এমনি করিয়া কথায় তর্ক বাধিয়া গেল। ভাই বোনে ঝগড়া হয় আর কি। তাহাদের এই ছেলেমানুষী দেখিয়া, সমীরের মাতাই শেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'কি ছেলেমী করছিস সমু, আজ আমায় এক সঙ্গে ছেলে বউ কোলে কোরতে হয়। নে এখন তুই উঠে বস্।"

বলে তিনি সমীরকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দুই ব্যাগ্র বাহু অনুর দিকে বাড়িয়ে বললেন—"এস মা এস। এই এত রাত্তিরে তোমায় নিয়ে এল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে না? এইবার তুমি আমার কাছে ঘুমিয়ে পড়ে।"

তিনি বধুকে কোলে টানিয়া নিলেন ও যতশীঘ্র সম্ভব যে সব মঙ্গলাচরণ না করিলেই নয় তাহা কোন রকমে সাত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন, ও বলিলেন "আর যা বাকী রইল সব কাল হবে।" এ বাড়ীতে মাতাই সাম্রাজ্ঞী, এখানে পুরোহিত ঠাকুরের ও সমস্ত কথা খাটবে না জানিয়া তিনি আসিয়াই কর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিছানায় গিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ সম্পূর্ণ সমাধা হয় কিনা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করেন নাই।

অনুর বেনারসী সাড়ী জামা ও অতিরিক্ত সব অলঙ্কার খোলাইয়া, একটি সেমিজ ও একখানা শান্তিপুরী সাড়ী পরাইয়া, ঘর শুদ্ধ লোককে চলিয়া যাইতে বলিয়া শাশুড়ী বধুকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সে রাত্রে যাহারা এক ঘুমের পর উঠিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের বাকী রাত্রিটুকু বধুকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকায়, অনুকে তাহারা অন্য ঘরে নিজেদের নিকট নিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কাহারও অনুরোধই থাকিল না। গৃহিণীর আদেশে বাধ্য হইয়াই সকলকে সে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল; এবং অনু ও এই মাতৃসমা শাশুড়ীর বুকে মুখ রাখিয়া শুইবা মাত্রই ক্লান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন কাক ডাকিতে সুরু করিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

পরদিন প্রভাত হইতেই ঘুমন্ত অনুর হাতখানি নিজের দেহ হইতে আস্তে নামাইয়া দিয়া গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন। অনু নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতে লাগিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন, যখন তাহার পিত্রালয়ের ঝী ক্ষীরদা তাহার গায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া বলিতেছিল—"কত বেলা হয়ে গেল, বাড়ী শুদ্ধ লোক উঠে পড়েছে, এখানে এত বেলা পর্য্যন্ত কি আর ঘুমুতে আছে। উঠে পড় দিদিমণী, এই বেলা শীগগীর করে জামা কাপড় বদলে নাও।"

অনু চাহিয়া দেখে ঘরে রৌদ্র আসিয়াছে। প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জল আলোক ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া নিজ মনেই বলিল—"ওঃ কত বেলা হয়ে গেছে। মা আজ ডেকে ও দেয়নি।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু রগড়াইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতেই দেখিল এ ত তাহার পিত্রালয় নয়, এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন স্থান! তখন তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার ও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, গত রাত্রের গভীর দুর্য্যোগের ভিতরেই তাহাকে পিত্রালয় ছাড়িতে হইয়াছে, এবং সর্ব্বোপরি, যে মাতালের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই মাতালের হাত অবলম্বন করিয়াই সে গাড়ী হইতে নামিয়া অন্ধকার সিঁড়ী বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। "মাতাল" এই কথাটা মনে উদয় হইবামাত্রই অনুর মন আবার সমীরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। মাতাল ভাবিয়া স্বামীর প্রতি তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিলেও, মনে মনে সে যেন সমীরের স্পর্শ—অনুর হাতখানি স্বেচ্ছায় নিজের হাতের ভিতর নিয়া, নীচের অন্ধকার হইতে উপরের আলোকে নিয়া আসা পর্য্যন্ত—ভিতরে ভিতরে অনুভব করিয়া অনু একটু শিহরিয়া উঠিল। অনু বুঝিতে পারিল না কেন মাতালের স্পর্শ তাহাকে অমন অভিভুত করিল। মনে মনে সে বলিল—"মাতাল হ'লেও তার হাত কি কোমল, স্পর্শ কি মধুর।"

বসিয়া বসিয়া বেশী কিছু ভাবিবার অবসর তখন ছিল না। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়াই বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা যাহারা এতক্ষণ গৃহিণীর আদেশে দূরে অপেক্ষা করিতেছিল, সকলেই দৌড়াইয়া আসিয়া অনুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর মেয়ে ও বধুরা অনেকেই আসিয়া জুটিল এবং অনুকে সাজাইয়া গোছাইয়া নিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে ব্যস্ত রহিল।

*　　*　　*

ফুল শয্যার রাত্রি। ফুলের মুকুট, ফুলের দুল, ফুলের আংটী, ফুলের বালা, ফুলের মালা, ফুলেরই সব গহনা পরাইয়া, ফুলরাণী সাজাইয়া, অনুকে সকলে যে ঘরে লইয়া

আসিল, সেখানে আসিয়া অনু দেখে "সেই মাতাল" একটা ফুল দিয়ে সাজান বিছানায় বসে আছে, এবং তাকে ঘিরে রেবা, দীপা, ও অন্যান্য কয়টী মেয়ে বউ বেশ হাসি খুসী ভাবেই গল্প কর'ছে।

অনু যাইতেই সকলে মহা কলরব করিয়া অনুকে এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া নিয়া সেই মাতালের একবারে গাঘেসিয়া বসাইয়া দিল। অনুর মন ইহাতে মাতালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেও বাহিরে সে কিছুমাত্র বিদ্রোহিতা প্রকাশ না করিয়া ফুলশয্যার রাতের খেলাধূলা সকলে তাহাকে দিয়া যাহা করাইল সবই নীরবে সম্পন্ন করিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল তবু মেয়েদের হাসি গল্প আনন্দ যেন ফুরাইতে চায়না। এমন সময় মায়ের সাথে থাকিয়া হাতে হাতে প্রায় সব কাজ চুকাইয়া দিয়া একটা পান চিবাইতে চিবাইতে, সমীরের বড়দি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন—

"কি রে সমু, এর মধ্যেই চোখ লাল হয়ে উঠল যে।"

সমীরের চোখ তখন সত্যই বেশ লাল হইয়া উঠিয়াছে—আশ্চর্য্য এই যে সমীদের ভাই বোন সকলেরই ঘুম পেলেই চোখ অত্যন্ত লাল হয়ে থাকে, যা সাধারণতঃ আর দশজনের হয়না। তারা অস্বীকার করলেও চোখ লাল দেখেই লোকে অনুমান করতে পারে যে তাদের ঘুম পাচ্ছে।

সমীর এখন অস্বীকার না করিয়া দিদির কথার উত্তরে বলিল—"হ্যাঁ বড়দি বড় ঘুম পাচ্ছে।" সেজ বউদি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—

সন্ধ্যে না হতেই ছোটঠাকুরপোর চোখ লাল হতে আরম্ভ করেছে—কিন্তু আজকের রাত্রে আমরা এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি কিনা।"

সমীর বলিল—রাতত কম হয়নি বউদি, এবার তোমরাও ঘুমাও, আমায়ও ছুটী দাও।

রেবা বললে—"এখুনি ছুটী না আরো কিছু। দীপা বললে—নতুন বৌ একটা গান না করা পর্য্যন্ত আমরা যাচ্ছিনা।"

সমীর বললে,—"তবেই হয়েছে। পুরাণ বউ যারা আছে তাদের গানই কোন দিন কানে গেলনা, আজ আবার নতুন বউয়ের গান। তা ছাড়া আমাদের বাড়ীটা এমনই পর্দ্দানশীন যে গান ত পরের কথা, বউদিরা সব দিনের বেলায় দাদাদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেনা ; এখন বেচারা নতুন বৌকে দিয়ে গান করিয়ে নিয়ে কেন তার নিন্দে বার করবে দীপা।"

তারপর রেবার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে বললে— নতুন বউ বোধহয় গান জানেনা অতএব এতগুলি লোকের সামনে তাকে অক্ষমতার লজ্জায় লাল করে কি হবে।"

দীপা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—

বিয়ে হতে না হতেই বউয়ের উপর ছোড়দার কি রকম টান দেখছত বউদি।"

বড়দি তখনও দাঁড়াইয়া, সমীর বসিয়া, কাজেই সে যখন বড়দির মুখের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল—দীপাটার সঙ্গে ঝগড়া করলে সত্যিই রাত কাবার হয়ে যাবে এ দিকে আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে বড়দি, তুমি দীপাকে এঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে ?"

তখন অনু হঠাৎ একবার সমীরের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল অমন সুন্দর বড় বড় দুইটী চোখের দৃষ্টি দিদির দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া যে কথা বলিতেছে সে মাতাল, এবং সেই মাতালের বড় বড় লাল চোখ।

সমীরের ঘুমন্ত চোখের লাল আভা দেখিয়া অনুর মনে এখন আর ফুলীর কথার সন্দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিল না যে এ লোকটা সত্যই মাতাল। নতুবা ঘুম পেলেই কারো চোখ অত লাল হয়, মদ খেলে তবেই হয়।

সমীর যখন দিদির দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কথা বলিতেছিল, তখন ঘরের উজ্জল আলোকে, মুহূর্ত্তের জন্য অনু সে দৃষ্টিতে যাহাই দেখিয়া থাকুক, কিন্তু ভয় পাইবার মত এতটুকু কিছু তাহাতে ছিল না। সে দৃষ্টি ছিল শিশুর মত সরল নিষ্পাপ, নির্ম্মল, গলার স্বর ছিল কোমল নম্র স্নিগ্ধ! অনু নিজের মনে মুগ্ধ হইল কিন্তু মাতাল ভাবিয়া স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিতেও বিলম্ব হইল না।

বড়দি সবাইকে তাড়া দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং অনুকে একা সমীরের কাছে রাখিয়া নিজেও কোন এক ফাঁকে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইতেই কে বা কাহারা বাহির হইতে তৎক্ষণাৎ দরজায় শিকল টানিয়া দিল। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অনুর মনে মাতাল সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিভীষিকা কঠোর ভাবে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে এমন ভীত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিল যে এতক্ষণের এই শান্ত ধীর মেয়েটী হঠাৎ অতি চঞ্চল ভাবে উঠিয়া দৌড়াইয়া দরজার নিকট গিয়া তাহা টানিয়া খুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। বাহির হইতে শিকল বন্ধ করা দরজা তাহার মুখের সান্‌নে তেমনই আবদ্ধ রহিল, এক চুলও ফাঁক হইল না।

যে মেয়েটী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া এতগুলি লোকের হাসি তামাসা সহ্য করিয়া গিয়াছে, সে হঠাৎ কি কারণে যে অমন চঞ্চল হইয়া দৌড়াইয়া দরজার নিকট গেল তাহার কারণ সমীর কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল।

সমীর যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে দরজার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ান অনুর মুখ স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও পাশ হইতে যতটুকু তাহার নজরে পড়িল, তাহাতেই সে বুঝিতে পারিল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফুলের সাজে সজ্জিতা হইয়া ফুলরাণী বেশে যে মেয়েটী তাহার পাশে স্থির ভাবে বসিয়া নির্ব্বাবাদে সমস্ত স্ত্রীআচার, মঙ্গলাচরণ করিয়াছে এ আর সে মেয়ে নয়। এখন সে ফুলরাণী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে পিত্রালয় ছাড়িবার সময় গাড়ীর ভিতরে দেখা হিংস্র দৃষ্টি ও মুখে গভীর বিতৃষ্ণার ছাপ নিয়ে যে মেয়েটী ছিল,—এ সেই মেয়ে। নিজের অজ্ঞাতেই সমীরের বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ব্যথিত চিত্তে সে ভাবিল—"এই আমার স্ত্রী।"

কিন্তু অনুর মুখের ভয়াতুর বিবর্ণতা সমীরের মনে দয়ার উদ্রেক করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজকে সম্বরণ করিয়া নিয়া—স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠে বলিল—"ওরা বোধ হয় বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, খানিকটা পরে নিজেরাই খুলে দেবে। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে অনু, এস আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।"

অনু নড়িবার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া স্থির নিরুত্তর মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমীর বুঝিয়াছিল যাহারা তামাসা করিয়া বাহির হইতে শিকল দিয়াছে তাহারা বেশী দূরে যায় নাই? নিকটেই কোথাও না কোথাও লুকাইয়া আছে; খানিকক্ষণ পরে কোথাও না কোথাও দিয়া এই বন্ধ ঘরের ভিতরে উঁকি ঝুকি মারিবে।

ঘরের ভিতরে তখনও সবগুলি আলোই জ্বলিতেছিল সেই উজ্জল আলোকে পাছে কেহ কোন দিক হইতে গোপনে অনুর মুখের হিংস্র কোঠর ভাব চোখের ঐ ভয়াতুর তীব্র দৃষ্টি দেখিয়া ফেলে তাহা সমীরের পছন্দ হলনা। সে উঠিয়া একের পর একটী করিয়া সমস্ত আলোই নিভাইয়া দিল। অমন উজ্জল আলোকের পরে একসঙ্গে সবগুলি বাতিই হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় ঘরের ভিতরটা যেন সুচিভেদ্য অন্ধকারে পরিণত হইল। সে অন্ধকারে নিজের হাতখানাও যেন নিজে দেখিতে পাওয়া যায়না।

আলো নিভানর সঙ্গে সঙ্গেই অনুর বক্ষ ভেদ করিয়া আর্ত্তস্বরে মা বলিয়া একটা বুক ফাটা চীৎকার বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু মাতালের ভয়ে তাহার কণ্ঠের স্বর বাহিরে এতটুকুও প্রকাশিত হইল না।

এই অপরিচিত বাড়ীতে একটা অন্ধকার ঘরে সে আর তাহার মাতাল স্বামী, যাহার লাল দুই চক্ষু সে এই খানিক ক্ষণ পূর্ব্বেও দেখিয়াছে। মাতাল যে তাহাকে কি করিতে পারে বা করিবে সে-বিষয়ে অনুর কোন ধারণা মাত্র ছিলনা এবং তখন চিন্তা করিবারও তাহার কোন ক্ষমতা ছিলনা; কেবল একটা পরম বিতৃষ্ণতা ও গভীর আতঙ্ক তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে মনে মনে কঠোর করিয়া তুলিল। ভয়ে এবং দুঃখে তাহার কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু সে অশ্রুজল সংগোপন করিবার একান্ত চেষ্টায় ভিতরে কাঁদিতে লাগিল। তার অবশ পা দুটাকে আর সে খাড় করিয়ে রাখিতে পারিতেছেনা। এই মাতালের ঘরের বাহিরে যে কোন স্থানে একটু আশ্রয় পাইয়া সে শুইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়।

আলো নিভানর পর অন্ধকারটা একটু স্থায়ী হইয়া আসিলে, সমীর যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বলিল—কেন মিছে দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছ অনু, শোবে, এস।

অনুর সমস্ত দেহ তখনও এত দুর্ব্বল বোধ করিতেছিল, যে কোথাও একটু স্থান করিয়া শুইয়া পড়িবার জন্য তাহার মন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ ঘরে সে শুইবে কোথায়। ঘরে একটীমাত্র খাট তাহাতেই দুইজনের বালিস দিয়া বিছানা করা আছে। অনু যদি খাটে গিয়া শোয় তবে মাতাল থাকিবে কোথায়। যে মাতাল হয়, তাহার পক্ষে তখন কিছু করাই বিচিত্র নয়; শেষে মাতালও গিয়া যদি অনুর পাশে একই বিছনায় শোয়, তবে? এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই অনু ভয়ে পুনরায় বেশী করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সমীর তখন রাস্তার দিকের একটা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদাস ভাবে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহা সেই জানে।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বাহিরের পৃথিবী জোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা সহরের উজ্জল গ্যাসালোকে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক বুঝিবার উপায় নাই কিন্তু সেদিনের নির্ম্মল আকাশ ভেদ করিয়া অন্ধকার ঘর তখন জোৎস্নার মৃদু আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সমীর কতক্ষণ যে জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল খেয়াল নাই হঠাৎ একটা শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখে অনু সেই দরজার কাছটি ঘেসিয়া মাটিতেই শুইয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা, আপাদ মস্তক ঢাকা ফুলের একটা বৃহৎ পুটলি সেখানে পড়িয়া আছে। সমীরের চোখে অনুর ঐ জড় সড় ভাবে শোয়ার ভঙ্গিটী বড়ই ভাল লাগিল, বড়ই করুণ বোধ হইল। স্ত্রীর প্রতি মমতায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। ভাবিল—আহা ছেলেমানুষ, এত রাত্রে শ্রান্ত হয়ে গভীর ঘুমে মাটীতেই শুয়ে পড়েছে।

সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে অনুর নিতান্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অতি মৃদুস্বরে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—এখানে মাটীতে শুলে কেন অনু। উঠে বিছনায় শোবে এস।

ক্লান্তি ও ঘুমে অনু আর জাগিয়া থাকিতে পারিতেছিল না, কোথাও একটু শুইবার মত স্থান পাইলেই হয়, কিন্তু ঘরে একটী ব্যতীত দ্বিতীয় বিছানা না থাকায়, সে মাটীকেই শয্যাশ্রয় করিয়া খাটের বিছানা মাতালকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন সেই মাতালই যখন তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে বিছানায় যাইতে বলিল,—তখন সে প্রসন্ন না হইয়া নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই দরজাতেই পিঠ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিছানায় যাইবার জন্য এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

তাহার এই বিদ্রোহী ভাব দেখিয়া, সমীর মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া, কি যেন ভাবিয়া নিয়া প্রকাশ্যে অনুকে বলিল—"ভয় নেই অনু, আমি ও বিছানায় শোব না। আমি মেঝেতে একটা কিছু পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ছি তুমি গিয়ে খাটে শোও। লক্ষীটী, আর রাত্রি জেগোনা।'

সমীর ঘরের কোন হইতে একটা মাদুর যোগাড় করিয়া, বিছানা হইতে একটা বালিস টানিয়া নিয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িল। একটু পরে চাহিয়া দেখে অনু তখনও সেই পূর্ব্ব স্থানটীতে নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে।

এমন কোমল অথচ এত দৃঢ় এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পরস্পর বিরোধী দুইটী ভাব দেখিয়া সমীর আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না এবং হয়ত বা অনুর ব্যবহারে তাহার প্রতি সমীরের একটু রাগ বা অভিমান ও হইয়াছিল তাই সে মনে মনে ভাবিল আমিত ঘুমিয়ে নেই ওর নিজের ইচ্ছামত যখন খুসী ঘুমাবে; সে জন্য আমার ঘুম নষ্ট করে কোন লাভ নেই।

সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদিল। ঘুমে যখন তাহার চক্ষু প্রায় জুড়িয়া আসিয়াছে তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল অনু শুইতে গিয়াছে কিনা। চাহিয়া দেখে অনু ও ঠিক সেই স্থানটিতেই তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে।

তৎক্ষণাৎ তাহার স্নেহ প্রবণ হৃদয় তাহাকে কষাঘাত করিয়া বলিল—আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছাড়িয়া একমাত্র

তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে এই অপরিচিতের মধ্যে আসিয়াছে তাহাকে, ঐ কিশোরী বধুকে ঐখানে ঐভাবে বসাইয়া রাখিয়া নিজে শুইয়া পড়িতে তোমার পৌরুষে এতটুকু বাধিল না? দুই রাত্রি পূর্ব্বেও যে বালিকা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়াছে তাহার যদি আজ এই অজানিত স্থানে অপরিচিত পুরুষ তুমি, তোমার সহিত একাকী ঘুমাইতে ভয় হয় তাহা কি এই বালিকার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়?"

এই ধরণের চিন্তা তাহার মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিতান্ত অনুতপ্ত চিত্তে উঠিয়া বসিল এবং অনুর নিকটে গিয়া—কণ্ঠস্বরে বিশ্বের অভয় ঢালিয়া দিয়া বলিল—"ভয় করছে অনু? আমায় যখন চিনবে তখন বুঝবে আমার ভেতরে ভয় করার মত এতটুকু কিছু নেই। কেন রাত করছ রাণী, আর বসে থেকনা, এইবার ঘুমিয়ে পড়" বলে অনুর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে আস্তে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করলে।

আবার সেই স্পর্শ।

যে স্পর্শে মুগ্ধ হয়ে অনু গতরাত্রে সিঁড়ী দিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। এ স্পর্শে যেন কি এক মাদকতা আছে। অনু এখন কিছুমাত্র বিদ্রোহীতা প্রকাশ না করে মন্ত্র মুগ্ধের মত সমীরের হাত ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। বিছানায় শোবা মাত্র গভীর ঘুমে তার চোখ দুটী মুদে গেল।

সমীরের নিজের চোখও ঘুমে প্রায় জুড়ে এসেছে, জোর করে চোখ টেনে খুলে রেখে নিদ্রিতা স্ত্রীর পার্শ্বে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝতে পারলে যে অনু সত্যই একবারে ঘুমিয়ে গেছে, তখন যথা সম্ভব সন্তর্পণে তাহার ফুলের গহণা সব খুলে দিয়ে মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে আস্তে আস্তে তাকে হাওয়া করতে লাগল।

মাথার দিকের খোলা জানালাটা দিয়ে চন্দ্রের অপর্য্যাপ্ত কিরণ এসে তখন অনুর মুখের ওপর পড়ে তাকে ভারী লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছিল। ঘরের ভিতরের চন্দ্রালোকে যেন কি মধুরতা আছে চাঁদের সেই স্নিগ্ধ আলোকে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সমীর মুগ্ধ হয়ে গেল। মন তার অনুর প্রতি স্নেহ মমতায় ভরে উঠল। তখন তার একান্ত ইচ্ছা হল এই ফাঁকে ঘুমন্ত স্ত্রীর গালে একটী চুমো রেখে যায়। কিন্তু এই সামান্যক্ষণ পূর্ব্বেই—যাহাকে দেখে ভয় করবার মত কিছু নেই বলে স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে, এখন তাহা অজানিতে ঘুমন্ত অবস্থায় সে বিশ্বাস ভঙ্গ করবার ম[illegible] নীচতা সমীরের ভিতরে ছিলনা তাই সে মুহূর্ত্তে নিজে[illegible] সংযত করে নিয়ে অতি ধীরে অনুর কপালে হাত বুলি[illegible] দেখলে যে তার সমস্ত ঘাম এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে এবং হাওয়া পেয়ে পরম আরামে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ছোট এক[illegible] বালিকার মত ঘুমুচ্ছে।

পাখাখানা অনুর বিছানার একপাশে নামিয়ে রে[illegible] সমীর এসে নিজের মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ল। তাহাদে[illegible] ফুলশয্যার রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইল।

পরদিন অতি প্রভাতে অনু ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে তাহা[illegible] ঘরে কেহই নাই।

রাত্রে যে মাদুরটাতে সমীর শুইয়াছিল সেটা দেয়ালে[illegible] কোনে দাঁড় করান রহিয়াছে, যে বালিশটা সে মাথা[illegible] দিয়াছিল তাহা খাটের উপর ঠিক তাহারই বালি[illegible] পাশে কে যেন সন্তর্পণে রাখিয়া গিয়াছে যাহা অনু ঘু[illegible]র ঘোরে জানিতে ও পারে নাই।

সে তড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল, দেখিল ক্ষী[illegible] সাবান তেল তোয়ালে ইতাদি নিয়া তাহারই ঘরের দি[illegible]ক আসিতেছে। বোধহয় অনুকে ডাকিবার জন্যই ক্ষীর[illegible]র এত ভোরে এ দিকে আগমন।

অনুকে দেখিয়া ক্ষীরদা বলিয়া উঠিল—"এই যে, তু[illegible]ও দেখ্‌ছি উঠেছ দিদিমনী। ভোর হ'তে না হতেই [illegible] আমি উঠেছি তখনই দেখি জামাইবাবু তাড়াতাড়ি [illegible] থেকে বার হয়ে এলেন। শুধুলুম, এত ভোরে উঠ্‌লে [illegible] জামাই বাবু?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন—'সকালে [illegible] আমার চিরদিনের অভ্যাস।' আমি ভাবলুম হ'বে [illegible]। ওমা, এখন গিন্নীমার ঘরের দালান দিয়ে আসতে [illegible] জামাইবাবু ও ঘরে মায়ের খাটে শুয়ে দিব্বি ঘুমুচ্ছেন। [illegible] দিদিমনী, সারারাত্তির কি জামাইবাবুকে ঘুমুতে দাও[illegible]?" বলে সে একবার চোখ টিপিয়া হাসিল।

অনু ক্ষীরদার কথার কোন উত্তর না দিয়া [illegible] তাহাকে অনুসরন করিয়া বাথরুমে গেল। আপন [illegible]

তখন তাহার মাতাল স্বামীর জন্য একটু দুঃখ হইল। ভাবিল মাতাল হইলে কি হয় চিরদিনের অভ্যাস ত খাট ও নরম বিছানায় শোয়া। কাল সারারাত্রি আমি যখন খাটে আরামে ঘুমাইয়াছি তখন যিনি আমাকে দয়া করে বিছানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি সারারাত্রি ভূমি আশ্রয় করিয়া মাদুরে শুইয়া বিনিদ্র নয়নে কাটাইয়াছেন তাই প্রভাত হইতে না হইতে মায়ের বিছানায় শুইয়া একটু ঘুমাইয়া নিতেছেন। অনুর মনে মনে নিজের স্বার্থপরতার জন্য কেমন একটু লজ্জা হইল। কিন্তু সে ইহা ভাবিতে পারিল না যে নতুন বধূকে লজ্জার হাত হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই স্বামী তাহার মাদুর বালিস যথাস্থানে রাখিয়া সকলের দৃষ্টি হইতে তাহাদের পৃথক শয়নের ব্যবস্থা গোপন করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গিয়াছেন। নতুবা ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী ফুলের বিছানা ছাড়িয়া আলাদা শুইবে তাহা কেহ ভাবিতেও পারে না এবং সে ব্যবস্থা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে ব্যবহারটা অনুর পক্ষে আদৌ প্রীতিপদ হইত না।

অষ্টমঙ্গলের কয়টা দিন অনুকে সমীরদের বাড়ীতেই থাকিতে হইল। এই আট দিনের ব্যাপারে দিনের বেলায় সমীরের সহিত তাহার কোন সময়ই দেখা হয় নাই। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া একরূপ নিন্দনীয় বিষয় ছিল বিশেষ সমীরদের বাড়ীতে। অনু তখন বিয়ের ক'নে অনুর বড় জা নীতা তিনটী সন্তানের জননী হইয়াছেন তিনিও পারত পক্ষে দিনের বেলায় স্বামীর সহিত কথা বলিতেন না। সমীরদের বাড়ীতে পুরাতন জমীদারীর আর কিছু তখন বর্ত্তমান না থাকুক স্বামী স্ত্রীর দিনের বেলায় দেখা না করার প্রথাটা তখনও পুরামাত্রায় অব্যাহত ছিল।

সারাটা দিন সমীর বাহিরে বেড়াইয়া মায়ের ঘরে ঘুমাইয়া ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজব করিয়া কাটাইয়া দিত। আর অনু ভিতর মহলে নীতা দীপা ও রেবা ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পরিবৃতা হইয়া এক রকমে সময় কাটাইয়া দিত। রাত্রের মাতালের বিভীষিকা দিনের আলোয় বিবাহ বাড়ীর আমোদ আহ্লাদ গোলমাল হৈ চৈ এ চাপা পড়িয়া যাইত।

অষ্টমঙ্গলের কয়টা দিন বাড়ীর দু একজন বউ অথবা মেয়ে প্রতি রাত্রে অনুকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাহার ঘরে পৌছাইয়া দিয়া যাইত। সমীর ঘরে আসিয়া খাটে শুইয়া আছে। সে নিঃশব্দে ফুল শয্যার রাত্রের মতই দরজার কাছে চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিত। তাহা মাতালের প্রতি ভয়ে অথবা স্বামীর প্রতি লজ্জায় কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। জায়েরা অনুকে রাখিতে আসিলে দরজার নিকট দাঁড়াইয়াই সমীরের সহিত দু চারটে কথা বার্ত্তা বলিত এবং যাইবার পূর্ব্বে এই রইল ভাই তোমার ধন আদর করে কাছে ডেকে নাও বলে বাহির হইতে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

তাহাদের পদশব্দ দরজার গোড়া হইতে মিলাইতে না মিলাইতে, সমীর উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিত। তারপর নিজের মাদুর বালিশ আনিয়া মাটীতে বিছানা পাতিয়া রাখিয়া, সেই প্রথম রাত্রির মতই অনুর নিকটে আসিয়া একান্ত স্নেহভরে তাহার হাতখানি নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া নিয়া বলিত—"এখানে দাঁড়িয়ে কেন অনু, অনেক রাত্রি হয়েছে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।" বলে, তাকে খাটের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া নিজে আসিয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িত।

কোনদিন মাটীতে শুইয়াই অনুকে জিজ্ঞাসা করিত—

"অনু, গরম লাগছে?"

"কি অনু, এখনও আমায় দেখে ভয় করে?"

এমনি দু একটা অবান্তর কথা, কিন্তু অনু তাহার একটী প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়া কাপড় দিয়া সমস্ত গা মাথা ঢাকিয়া খাটের এক প্রান্ত ঘেসিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। খানিকক্ষণ পরে আপনিই তাহার চক্ষু ঘুমে জুড়িয়া আসে। ঘুমের ঘোরেই হয়ত সে এ পাশ ফিরিয়া শোয়, নিজের অজ্ঞাতে তাহার মুখের কাপড় সরিয়া যায়।

সমীর তখন আস্তে উঠিয়া নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখের প্রতি নিষ্পলকে চাহিয়া তাহার অন্তরের ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করে। নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখের শান্ত শ্রী দেখিয়া সমীর মুগ্ধ হইয়া যায়। সে মুখে তখন এতটুকু ভ্রূ কুঞ্চন নাই এতটুকু হিংসা কুটীলতা বিতৃষ্ণার ছাপ নাই। সে ঘুমন্ত মুখ তখন ফুলের মত পবিত্র নিষ্পাপ। এই মুখই সমীর আশা করে,

এই মুখই সে দেখিতে চায়, অথচ তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলেই এই সুন্দর মুখখানাই হঠাৎ কিরূপ ভয়াবহ বিশ্রী আকার ধারণ করে—এ কথা মনে করিয়া সমীর ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বার বার তার মনে হয় "হায় এই দ্বিমূর্ত্তি ধারিণীই আমার স্ত্রী, আর ইহাকে লইয়াই আমায় সারা জীবন কাটাইতে হইবে।"

ক্রমশঃ

নূতন আগননী

৺সরোজবাসিনী বসু

(১)

উজল বিমল শারদ প্রভাতে আয় গো জননী আয়
ফল ফুল ভারে সেজেছে ধরণী সুকোমল লতিকায়
সারাটী বরষ কত আশা ভরে,
পথ চেয়ে মাগো আছে তব তরে
হরষে মাতিয়া গাহিছে সবাই তব আগমনী গান
আয় গো জননী শান্তি সলিলে জুড়াতে তাপিত প্রাণ।

(২)

তনয় তোমার দেব সেনাপতি অজেয় সকল রণে
সুতা অর্পণা করিবে পূর্ণা নূতন ধান্য ধনে
হেরিব আবার মাঠ ভরা ধান
গাহিবে বিহগ সুমধুর গান
মাঠে মাঠে পুনঃ হেরিব কৃষক লাঙ্গল নিয়েছে করে
রাখাল বালক চরায় গোধন গাহিয়া মধুর স্বরে

(৩)

কমল বাসিনী দেবী বীণাপাণি মাতায়ে সবার প্রাণ
বীণা লয়ে করে আবার ভারতে গাবিবে বিজয় গান।
যশের মুকুট দিবে শিরে তুলে
ভিখারী বাঙ্গালী যাবে ব্যথা ভুলে
আবাহন গীতি গাহিয়া সকলে পূজিবে কমল দলে
বিজয় মাল্য দিবেন ভারতী ভারতবাসীর গলে।

(৪)

দেব গজানন আসিবেন পুনঃ বাসনা সিদ্ধকারী
সফল হইবে সকল কামনা পূজিয়ে চরণ তারি,
সুত সুতা লয়ে আয় গো জননী
হোক্ অবসান এ দুঃখ রজনী
শোক তাপ সব ভুলিয়ে সবাই গাহিবে বিজয় গান
অঞ্জলি ভরি হৃদয়-বেদনা করিবে চরণে অর্ঘ্য দান।

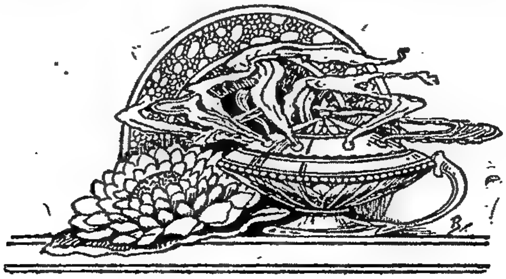

ইউরোপীয়ান ফেডারেশন

(প্রবন্ধ)

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস বি-এ (বৃটিশ প্রাইজ উইনর)

সম্প্রতি ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা আপোষে কি করিয়া মীমাংসা হইতে পারে সেইজন্য ইউরোপের বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌গণ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। যাহাতে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি একটি ফেডারেশনে একত্রিত হয় সেই সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ চলিতেছে। ইউরোপে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তি সমূহ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিকতা ত্যাগ করিতে পারে নাই। পররাজ্যলোলুপতা ইউরোপকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

ইউরোপের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইউরোপ তিনবার একত্রিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। প্রথমে নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র সমূহ একত্রিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই সময় (Holy Alliance) হোলী এলায়ন্স সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয় বার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপ (Absoletism) এবসোলিটিসমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়।

ম্যাক স্থইনীর (Maziin) প্রতিভা সমগ্র ইউরোপকে একত্রিত করিতে পারিত কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্য ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইচ্ছা করিলে ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে লিপ্ত হন। তৃতীয়বার মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটেন সমগ্র ইউরোপকে একত্রিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইউরোপীয় রাজনীতি বিদগণ ইচ্ছা করিলে উহা করিতে পারিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় উহা করেন নাই। ভার্সাই সন্ধিতে ভবিষ্যত কলহের বীজ অন্তর্নিহিত ছিল।

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্কটসঙ্কুল হওয়াতে বৃটেন একটি ইউরোপীয় রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণী প্রবল পরাক্রান্ত হওয়াতে বৃটেন বুঝিতে পারিয়াছে যে ইউরোপের ভাগ্যের সহিত তাহার ভাগ্য জড়িত বিজড়িত। বৃটেন যদি না সমগ্র ইউরোপকে পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তথাকথিত গণতন্ত্রের (Democracy) বিনাশ সাধন করিবে।

বৃটেন নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের সময় ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যখন ইউরোপের গগন মেঘ নির্ম্মুক্ত হইল, তখন বৃটেন ইউরোপের রাজনীতি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বৃটেন এখন ইউরোপীয় রাজনীতিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। বোমযান আবিষ্কার হওয়াতে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিল। কামান আবিষ্কার হওয়াতে ভেনিসের স্বাধীনতা যেমন বিপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যোমযান আবিষ্কার হওয়াতে ইংলণ্ড বিপন্ন হইল। এমন কি বৃটিশ নৌবহরের প্রাধান্য বোমারু বিমানের দরুণ বিপন্ন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কিরূপে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা Federal union সম্ভব? ইহা সম্ভব। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সুইজারল্যাণ্ড। ক্ষুদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভিন্ন ভিন্ন states আছে; তাহারা ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন আচার এবং কৃষ্টি। তাহা সত্ত্বেও সুইটজারল্যাণ্ড আপনাদের সহস্র

সহস্র সমস্যার সমাধান করিয়াছে। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র (states) আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্বাধীন।

ইউরোপকে একত্রিত করিবার কি উপায় আছে? ইউরোপের রাজনীতিবিদ্‌গণের মত হইতেছে যে রাশিয়া ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা একই রূপ। পশ্চিম ডেমোক্রেসির (western democracies) একই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি (culture) কিন্তু রাশিয়াকে বাদ দিয়া ইউরোপ কি একত্রিত হইতে পারে।

ইউরোপীয় ফেডারেশন সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ্‌গণ যদি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হন তাহা হইলে কোন ইউরোপীয় ফেডারেশন হইতে পারিবে না। ইউরোপ পৃথিবী হইতে পৃথক নয়। অতি আধুনিক যন্ত্র এবং যানের আবিষ্কারের ফলে সময় এবং দুরত্বের ব্যবধান হ্রাস হইয়াছে। আমরা সকলে পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। আমরা সকলে একই অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্ভারের আদান প্রদানের জন্য আমরা নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে অবস্থিত যে কোন দেশ এই আর্থিক সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ধনতান্ত্রিকতা ও সাম্রাজ্যবাদিকতা সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। সমাজতন্ত্রবাদ জগতে প্রচারিত না হইলে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে না। যদি ইউরোপের কতক গুলি রাজ্য একত্রিত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বক্ষ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ অপসারিত হইবে না। সমানভাবে পৃথিবীর কাঁচা মাল বিভিন্ন দেশ সমূহে বণ্টন করা দরকার। জগতে কখনই শান্তি স্থাপন হইতে পারে না যতক্ষণ না জগতের সকল মানুষগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতেছে।

ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া আপোষে মীমাংসা করিবার জন্য জল্পনা করিতেছে। কারণ ইউরোপীয় জাতীগণ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে রত হয় তাহা হইলে ইউরোপীয় শক্তি সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে কৃষ্ণকায় জাতিগুলি বিপ্লবের সুযোগ পাইয়া বিদেশীর বন্ধন ত্যাগ করিবে।

সেইজন্য ইউরোপীয় শক্তি সমূহ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জগতের কৃষ্ণকায় জাতিদিগের উপর তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর করিবে।

ইউরোপীয় ফেডারেশনের যুক্তি তর্ক সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হইবে। জগতে যদিনা নূতন নিয়ম (New world order) প্রবর্ত্তিত হইতেছে ততদিন জগতের কিম্বা ইউরোপের মঙ্গল সাধিত হইবেনা। সমাজ তন্ত্রবাদ জগতের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র দূর করিবে।

ভিক্ষাবৃত্তি গণিকাবৃত্তি ও দাসত্ব জগতের বক্ষ হইতে দূরিকৃত হওয়া দরকার। জাতীয়তাবাদ ভুলিয়া পৃথিবীর সকল জাতির সমন্বয় দরকার। পৃথিবীকে মহামিলনের ক্ষেত্র করিতে হইবে। কোন জাতি অপর কোন জাতিকে পদানত করিয়া শোষণ করিবেনা। জগতে শাসক এবং শোষিত যতদিন থাকিবে ততদিন বিশ্বের বক্ষ হইতে সমরানল নির্ব্বাপিত হইবেনা।

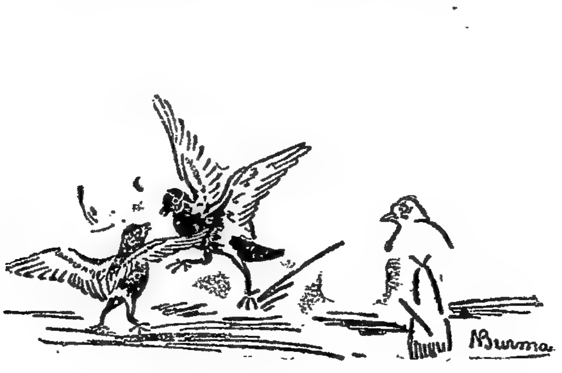

হাল-চাল

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

দুনিয়ার হালচাল
আজকাল নব্য
বাতচিত সব্‌কার
ঠিক ঠাক সভ্য
চটপটে সব্‌বাই—
মাজা ঘসা চেহারা।
ফিট ফাট্ দেখ ঐ
বাবুদের বেহারা।
হাইহিল জুতাপায়
চলেযায় ডগরে
ছোট বড় কত মেয়ে
আধুনিক নগরে।
পর্দার জাত নাই রাস্তার বক্ষে
নারী নর পাশা পাশি, চেয়ে দেখ চক্ষে,
দুর্দম ঠেলা ঠেলি হাসা হাসি চলচে—
নব্যের জুতা আজ পুরাতনে ডলছে,
চশমায় চোখ সব রোশ নাই বিতরে
ভেদ নাই আর ভাই ভদ্দর ইতরে।
উজ্জল চোখ সব পাউডার আস্যে
ঝর্ণার গান ঝরে-বউ ঝির হাস্যে।
লজ্জার ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই বিশ্বে,
বান্ধবী বন্ধুর পাশে হাসে রিক্সে—
চলেছে সে ভাবে ভোর' দোঁহে দোঁহা তুষ্ট
মুর্খের দল তাই দেখে হয় রুষ্ট।

জলসায় ঝিক্ মিক্ রূপ দীপ কত যে
ধুমপান পাল্লায় সব্বাই রত যে,
বলনাচ দেখ আছ জোড় জোড় রঙ্গ,
অতীতের বুকে shell মারে আজ বঙ্গ।
বৃদ্ধের দল আজ
অন্তরে ক্ষুন্ন,
আপশোষে কেঁদে মরে—
তহবিল শূন্য,—
দপ্তায় দূরে থেকে,—
সাত্ত্বিক তাইতে,
(তবু) শিঙ ভেঙে বাছুরের
দলে চায় যাইতে,
ধর্ম্মের বুলি বলে
তবু তারা নিত্য
উন্মন তারা হায়
দেখে নব নৃত্য।
যুবকের দল ধায়
উৎফুল চিত্ত,
দুনিয়ার হাল-কাল
তাহাদেরি বিত্ত।
মুর্খের দল, তোরা চুপ কর বিশ্বে,
যার খুসি যার ধন বুক ভরে নিক্ সে।

পূর্ব্ববঙ্গের মুরসিদা গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান নগণ্য নহে। বঙ্গভাষা হিন্দুদের ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমানদেরও মাতৃভাষা; শত শত মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বিশেষতঃ পালা গান রচনায় মুসলমান কবিরা যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান কবিদের ভাসান গান লক্ষ্মীর পাঁচালী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতে বাংলার পল্লী অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিত এখনও অল্প বিস্তর হয়। মুসলমান কৃষকদের সুধামধুর কবিত্ব রসের কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। আজও মুসলমান কৃষকেরা অবসর সময়ে দল বাঁধিয়া অসংখ্য গান গাহিয়া জন সাধারণের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর মুসলমান চাষীরা হাল চাষ করিতে অথবা মুসলমান মাঝিরা বড় বড় নদীতে নৌকা চালাইতে চালাইতে মুখে মুখে অসংখ্য মুরশিদা গানের রচনা করিতা। এগুলি দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত। ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাব সম্পদ অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে এই ভাব সম্পদ এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে যে ভাবিলে একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়।

পূর্ব্ব বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ফকির, দরবেশ, বাউলেরা এখনও বহু মুরসিদা গান গাহিয়া জন সাধারণের মধ্যে দেহতত্ত্বের কথা প্রচার করিয়া থাকে। ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে এই জাতীয় যে সব পল্লীসঙ্গীত সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাদের কয়টী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১)

ও মন ভোলা,
তুমি করত্যাছ কিসের খেলা।
তুমি আখের ভাব্যা দিন গণিওরে,
দিন গণ্যা তোর ডুবল বেলা॥
আখেরে কি জবাব দিবি,
ও পাগলা মন বল এবেলা।
চন্দ্রর সাথে যোগ দিয়া,
তুই কর‍্যা নিলি ভবের খেলা॥
তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল,
আখের বেলা ডুবা গেল।
পিঞ্জিরারে ফাঁকি দিয়া,
রয়লা তুমি আখের ভুলি।
তোর পাখী যখন উড়্যা যাবি,
তখন পড়্যা রবে সাধের খাঁচা।
তুমি করত্যাছ কিসের খেলা॥

(২)

এখন আমি জানিলাম
কেউ ত কার নয় রে।
আশায় আশায় এত সংসারে
বিচ্ছেদ ভাবনা শেষ হয় রে॥
ও উদাস মন—
মন সায়রে মনের সাথে
আইলাম গাইতে বিচ্ছেদের গান।
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই,
অন্তিম কালে দিও পানি,
দিও বৈকুণ্ঠে স্থান॥

(৩)

আমি মন পাখী তোমার অন্ত পাইলাম না।
তুমি থাক্যা থাক্যা শিকল বাঁকাও
তা দেখ্যা প্রাণ বাঁচে না॥

তুমি যাই যাই বল্যা সদা করছ বাসনা।
এবার যাই যাই শব্দ ক্ষান্ত কর,
গুরু নামটি চিন্তায় কর তার উপাসনা॥
তোরে খাওয়াছি কত মিছরি পানা।
আর খাওয়াইছি মাখন ছানা—
তবু তোর মন পাইলাম না॥

এই পল্লী সঙ্গীত গুলি বনফুলের মত স্বভাব সুলভ ও সুন্দর। বনফুলের মতই শিক্ষিত 'ভদ্র' সমাজের অনাদরে এগুলি শুকাইয়া বিনষ্ট হয়। আমরা শিক্ষিত সমাজ এই বনফুলগুলি দেখি না, কুড়াই না, ইহাদের নীরব সুরভি গ্রহণ করি না। গণ-মঙ্গলের জন্য আনন্দ ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া এই সব ফুল নিত্য বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা কি ইহাদের খোঁজ করিব না? এগুলি যে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বের সামগ্রী, তাহা কি আমরা বুঝিব না?

পল্লীকে ভালবাসিতে হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবেই ভাল বাসিতে হইবে। পল্লীর সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, সৎ সম্পদকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথের ভাষায় বলিতে হয়—

"গ্রামের যে একটা বিশেষ সাহিত্য ও গীতি কাব্য উদ্ভুত হয়েছে, তার চিরন্তন মূল্য আছে। এই যে পল্লী সাহিত্য প্রভৃতি এগুলি মূল থেকে আমাদের দেশ থেকে শুকিয়ে গিয়েছে। এগুলিতে আজ পোকা লেগেছে। এইখানে মানুষকে বাঁচাতে চাই। পল্লীতে খণ্ডভাবে উপকার চলে না। তাকে সমগ্রভাবে জাগাতে হবে, তবে সে নিতে পারবে। তার চিত্তকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করতে হবে।'

বাংলার পল্লীগ্রামের জন স্বাস্থ্য ও নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীকমলা দেবী

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি প্রপীড়িত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে বিভীষিকাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে—তাহার জন্য বাংলার পুরুষ শ্রেণী যত পরিমাণে দায়ী, নারী সম্প্রদায়ও তদপেক্ষা কম দায়ী ন'ন। (সরকার বাহাদুরের কথা ছাড়িয়া দিলেও)

পুরুষ সম্প্রদায় এ যাবৎ যতপ্রকার পল্লী সংস্কার ও পল্লী-উন্নয়নকার্য্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ স্থানেই নারীর সহযোগীতা ও সমকর্ত্তব্য বোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য উপরিউক্ত অস্বাস্থ্য অবস্থা সমূহের বিষয়েই আলোচনা করিতেছি।

দেখা যায় যে, গ্রামের বিসূচিকা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নির্বারণী আন্দোলনে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণে গ্রামের বাগান জঙ্গল পরিষ্কার করা, বড় বড় সাধারণ ড্রেন পরিষ্কার ও খনন করা, অসংস্কৃত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, কুইনাইন প্রভৃতি প্রতিষেধক বিতরণ করা, প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কার, প্রতিষেধ ও প্রতিকারমূলক কার্য্য করিয়া থাকেন—বাংলার পল্লীনারীগণ সেই সেই ব্যাপারে প্রায়ই নিরুদ্বিগ্ন ও নিরাসক্ত থাকেন। আপনারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে নারীমহলের কার্য্যতালিকার বাহিরে ঐসব কার্য্য; পুরনারীগণ কি করিয়াই বা বাগানে বাগানে কোদাল কুড়ুল লইয়া বেড়াইবেন? কি করিয়া তাঁহারা ঘরের বাধা ঠেলিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্মের অবনতি (?) আনিয়া বাহিরে বাহিরে বেড়াইবেন? কিন্তু এই ধারণা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক বলিতে হইবে; নারীদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার এ দিকই না হইলেও চলিবে; তবে এমন কিছু তাঁহাদের করিবার চেষ্টা করা উচিত যাহা পুরুষদের কর্ম্ম-সূচীর অনুরূপ না হইলেও সমান্তরাল ভাবেই কার্য্যকরী হইতে পারে; তাঁহারা হাতে ধরিয়া কার্য্য না করিলেও সময় ও অবসর মত কর্ম্মক্ষেত্রের ঊষর রুক্ষতাকে উৎসাহে উদ্দীপনায়, কতক পরিমাণে যে সরস ও সুখময় করিয়া কর্ম্মি-দলকে কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন, ইহা সত্য।

এতদ্ভিন্ন গ্রামের বাহিরের দিক্‌কার কার্য্যের দিক ছাড়িয়া দিলেও আপনাদের স্ব স্ব বসত বাটীর আশপাশের ও অভ্যন্তরের দিকেও দৃষ্টি দেন ও আশপাশের অস্বাস্থ্য দূরীকরণার্থে সর্ব্বথা যত্নশীলা হয়েন তাহা হইলে আপনাদের বাহুবলের অন্তর্গত যাবতীয় উন্নয়নের কার্য্যে নিশ্চয়ই সফল হইবেন এবং তদ্দারা পুরুষদিগের কার্য্যের বহুল সাহায্য করা হইবে; সঙ্গে সঙ্গে পল্লী সংস্কারের সমূহ একদেশদর্শী কর্ম্ম-সূচীর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভও অসম্ভব হইবে না।

কর্ম্মসমন্বয় ও সহযোগীতা

গ্রাম সংস্কারকামী পুরুষগণ যেরূপ গ্রামে বহিঃ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্য্যে অগ্রসর হ'ন ঠিক সেইরূপ নারী সঙ্ঘও গ্রামস্থ রুগ্নদের শুশ্রূষা, সেবা, পথ্য সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইলে উভয় দিককার সংস্কার একই সঙ্গে হইয়া যাইবে। গ্রামের যুবক সমিতি গ্রাম সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি করিলেন, নারী সংঘ নিজ নিজ গ্রামের বাসিন্দাবর্গের বাটীতে বাটীতে বেড়াইতে গিয়া, জ্বরের তালিকা সংগ্রহ, পথ্য নিয়ন্ত্রণ, রোগীর সেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিলেন আবশ্যক হইলে শিশুমঙ্গল, ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বর্ষীয়সীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইলেন।

আবশ্যক হইলে নিজেরাই বা কিছু কিছু অর্থ সংগহ করিয়া ২।১টী ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাহাতে গ্রামস্থ শিক্ষিতা বর্ষীয়সী মহিলার দ্বারা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত স্ত্রীলোকদিগকে অল্প বিস্তর শিখাইলেন—এইরূপ কার্য্যক্রমে গ্রামের নারীসঙ্ঘের উপর সাধারণ নারী ও পুরুষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সম্ভ্রম বাড়িয়া যাইবে, উপরন্তু গ্রামসুলভ পরচর্চ্চা পরনিন্দা ও অন্যান্য অবান্তরচর্চ্চা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদ্ভাবসূত্র স্থাপিত হইতে পারে। গ্রামের অন্দর বাহির সৎশিক্ষা ও সাধনায় অগ্রগামী হয় উঠিতে পারে। নিজ নিজ সন্তানদিগকে কি ভাবে চালাইলে তাহারা শিক্ষায় সংস্কারে শৌর্য্যে স্বাস্থ্যে উন্নত হইতে পারে তদ্বিষেও আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ হইতে পারে তাহাতে উত্তরকালে গ্রামে অধিকসংখ্যক শিক্ষিত দায়ীত্বজ্ঞান সম্পন্ন সুসভ্য দেশহিতৈষী সন্তান সন্ততি গড়িয়া উঠিয়া সমাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের হেতু সাধন হইতে পারিবে।

কথায় আছে, আগে ঘর সংস্কার পরে বহিঃ সংস্কার। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাংলার গৃহিণীগণ পূর্ব্বের ন্যায় শ্রমশীল বা কার্য্য তৎপর আর প্রায়ই হয়েন না তাহার বহুবিধ হেতু থাকিলেও প্রধানতম একটী এই যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ স্বাস্থ্য হইয়া গৃহিণী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, গৃহ, অঙ্গন প্রভৃতি মার্জ্জন কার্য্য প্রাতঃস্নান, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি কার্য্য, ক্রমেই স্বল্পায়তনে নিবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। দেখা যায়, বহু- বহু বিস্তীর্ণ বসতবাটী প্রভৃতি সংস্কার অভাবে ক্রমে বন জঙ্গলে ভরিয়া থাকে, গৃহিণীগণ দূরে যাইবার ভয়ে যেখানে সেখানে নিজেদের ও গরুছাগল প্রভৃতিদের মলমূত্র ক্ষেপন করিয়া থাকেন। নিজ নিজ আবশ্যক ও সুবিধা মত যেখানে সেখানে খানা, গর্ত্ত করিয়া রাখেন, যেথায় সেখানে ভাঙ্গা হাঁড়ি কুড়ি, শিশি, বোতল প্রভৃতি ফেলিয়া রাখেন, বাড়ীর পাশেই আস্তাকুঁড়, আবর্জ্জনা, গোময় প্রভৃতি পচনের উৎকৃষ্ট ও উন্মুক্ত স্থান সৃষ্টি করিয়া রাখেন; আশেপাশে তরিতরকারীর ক্ষেতে দেখা যায়। খানা ডোবার জন্য ইতস্ততঃ জল জমিয়া থাকে তাহার ফলে উদ্যান কৃষির যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় জল নিকাশের অভাবে তেমনই বদ্ধ জলে মশক শিশু জন্মাইবারও তেমনি সুযোগ হয়। এই ত গেল ডাঙাজমির কথা; পুষ্করিণী প্রভৃতির কথাও ঐরূপ; একে ত বাংলাদেশে নলকূপের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইহারও পূর্ব্ব হইতেই পুষ্করিণী, দীঘি জলাশয়, প্রভৃতির সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্য্যে বাংলার ক্ষীণজীবি পরিবারবর্গের ইচ্ছা ও ঔদাস্যের ফলে বন্ধ হইতে বসিয়াছে তথাপি যে সব পল্লীগ্রামে নলকূলের তত বেশী প্রচার লাভ হয় নাই সেখানে যে সমস্ত খানা, পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে তাহাদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ও যাহাতে তাহাদের জল কোনও প্রকারে নিজেদের ব্যবহার দ্বারা দূষিত ও অব্যবহার্য্য হইয়া না পড়ে তাহার দিকে আপনারই নিজেরাই লক্ষ্য রাখিতে পারেন এবং আবশ্যকীয়

সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন—যাহাতে পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর অজগর বন, উনানের ছাই, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি স্তূপীকৃত হইয়া না থাকে তাহাও নিজেরাই বন্ধ করিতে পারেন—পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর দিয়া যেথানে সেথানে ভাঙ্গিয়া লোকে না যাতায়াত করেন তাহাও আপনারাই করিতে পারেন। ইহাতে একদিকে যেমন পুষ্করিণীর গর্ত্ত ভরিয়া উঠে, অপরদিকে জল বাহিরের ধোয়ানিতে দূষিত হইয়া মনুষ্য ও মৎস্যকুলের জীবন সংশয়ের কারণ হইতে পারে, এই সমস্ত অস্বাস্থ্যের মূল। যদি নারীসমাজ একটু জাগরূক হয় তাহা হইলে তাঁহাদের অল্পমাত্র পরিশ্রমেই গ্রামের আভ্যন্তরীণ অস্বাস্থ্য দূর হইতে পারে, ইহাতে আপনাদের কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে?

বিগত ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৭ সাল বাঁশঘাট্যা স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত।

সব ভাল যার শেষ ভাল

শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়

(গল্প)

বন্ধুরা বিস্মিত হয়ে গেলো অমরের ব্যবহারে। যে অমর এক মুহূর্ত্তও চুপ করে থাকতে পারে না, যার বেশী কথা বলার জন্য তারা তাকে বাচনিক আখ্যা প্রদান করেছিল আজ তার একি পরিবর্ত্তন! আদৌ কথা বলে না সে, বন্ধুদের শত উপহাস, ব্যঙ্গ, অনুযোগ, অভিযোগ উপেক্ষা করেই। তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না, যখন দলের মধ্য হতে সে সমরকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠলো।

সমরও যথেষ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল অমরের এই ভাবান্তরে। মিনিট দশেক চুপ করে থাকার পর সে সমরকে জিজ্ঞাসা কল্ "কি ব্যাপার অমর, আজ তোর কি হয়েছে?" অমর উত্তর দেয় "সেই কথাই বলতে তোকে আজ ডেকে এনেছি বন্ধু! ওরা সকলেই হয়ত কত কি মনে করছে কিন্তু তুই ছাড়া যে আমার অন্য গতি নেই।"

বিহ্বলকণ্ঠে সমর বলে ওঠে "কি ব্যাপার?"

কিড়িং করে ঘণ্টা বাজল; ট্রাম থামে মেডিকেল কলেজের সামনে। হাঁসপাতালের ফটক দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অমর বলে "শোন্ ভাই সমর, সকলেই লীলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু ভাই আমার পক্ষে বর্ত্তমানে তা একেবারেই অসম্ভব।"

"সে কি" সমর চমকে উঠে বলে—তার মুখে একরাশ বিস্ময়।—সে বলতে থাকে "আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, দিন পর্য্যন্ত ঠিক; বাবা, মা জিনিষপত্র পর্য্যন্ত কেনাকাটা সুরু করে দিয়েছেন, আর তুই এসময় বলিস কি? তাছাড়া আমি লীলাকেই বা কি বলি?

"জানি বন্ধু", অমর বলে "আর এও জানি, এতে বেশী লজ্জা পেতে হবে তোকেই; কিন্তু ভাই, আমিও তো তোর বন্ধু, আমার প্রতিও তো তোর একটা কর্ত্তব্য আছে, তারই দাবী আমি আজ কচ্ছি। তুই রাগ করিস নি ভাই, দয়া করে আমায় আজ সাহায্য কর্। অল্প নিস্তব্ধ থাকার পর সমর উত্তর দেয় "বেশ তাই হবে।"

দুজনেই এগিয়ে চলেছে হসপিটলের মধ্য দিয়ে, কারো মুখেই কোন কথা নেই। সেই মৌনতা ভঙ্গ করে হঠাৎ যেন গাম্ভীর্য্য সহকারে সমর বলে উঠ্ল "আচ্ছা অমর, এতদিন ছেলেমানুষী না করে এ সত্যি কথাটা কিছুদিন আগেই তো আমাকে জানালে পারতিস যে লীলাকে তুই অপছন্দ করিস।" ব্যস্ত হয়ে সমর বাধা দিয়ে বলে ওঠে "না, না, মোটেই তা নয়, আমি তাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে কর্ব না"—

তার অর্দ্ধসমাপ্ত কথার পরেই সমর জিজ্ঞাসা করে "তবে ?"

"মানে এই বর্ত্তমানে"—

আবার পড়ে কথার মাঝখানে বাধা—"বর্ত্তমানে, মানে"

অমর বলে "হাঁ ভাই বর্ত্তমানে ; বর্ত্তমানে আমি বিয়ে কর্ত্তে পারি না, কারণ, আমার শরীরে আছে এক ভীষণ ব্যাধি।"

"সেকি, কি ব্যাধি" সমর প্রশ্ন কর্লে, তার স্বর দারুণ উদ্বেগ ও বিস্ময়ে ভরা।

"ব্যাধি, হাঁ ব্যাধি" অমর ঝড়ের মত বল্‌তে থাকে "আমার পেটে হয়েছে এ্যাপেণ্ডিসাইটীস! ডাক্তারেরা বলেছেন অপারেশন করাতে। তুই তো জানিস, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরই চিরদিন আমার কাম্য। আজ এই প্রিন্স অফ ওয়েলস হসপিটলে তাই ভর্ত্তি হয়েছি। কিন্তু এ খবর বাড়ীর কেউই জানে না। তারা জানে এক মাসের জন্যে আমি আজ দিল্লি বেড়াতে যাব। তুই ও আমার ভর্ত্তি হওয়ার খবর কারুকে দিসনি। কারুকেই বিব্রত কর্ত্তে চাই না আমি। যদি বাঁচি ভালই, আবার ফিরবো তোদের মাঝখানে, নয়ত সকলের অলক্ষিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ব্ব শান্তিতে। এ বিষয়ে যে তোকে সাহায্য কর্ত্তেই হবে বন্ধু," অমর চুপ করে।

উত্তরে সমর বল্ল "কি ভাবে আমি সাহায্য কর্ব্ব ?"

আমর বল্ল "সেই কথাই তোকে আজ বিশেষ ভাবে বলে দেব ; চল ওপরে।" দুজনে উঠে গেল হসপিটলের দোতালায়।

কয়েকদিন পরে। অমরের অপারেশনের দিন সমর বেলা প্রায় দশটার সময় এল তাকে দেখতে।

নার্স ততক্ষণে তাকে কুলিদের দিয়ে তেতলায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের সঙ্গে সমরও চল্লো বন্ধুকে উৎসাহ দিতে দিতে। অস্ত্রোপচারের ঘরের মধ্যে তারা অমরকে নিয়ে গেল। সমরও প্রবেশ কর্ত্তে গেল তাদের সঙ্গে কিন্তু তার পূর্ব্বেই সঙ্গের নার্সটী হাত দিয়ে রুখে তাকে যেতে বাধা দিলে—কেবল তাই নয়, গম্ভীর কণ্ঠে আদেশের স্বরে জানিয়েও দিলে বারান্দার ওয়েটিং হলে অপেক্ষা কর্ত্তে কারণ সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই।

শুষ্কমুখে সমর চলে যায়। ওয়েটিং হলে বসে বসে তার উদ্বেগ বাড়্‌তে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সমর উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তার, ছাত্র, নার্স, কুলি যাকেই সামনে দেখে, একই প্রশ্ন করে তাকে "এ্যাপেণ্ডীসাইটীস কি কোন গুরুতর অপারেশন ? এতে ভয়ের কোন কারণ আছে, সব রোগী বাঁচে তো ?" উত্তরও আসে একই প্রকারের "না, না, এতে আশঙ্কার কিছু নেই, সকলেই ভাল হয়ে যায়, শুধু 'শকে' এক আধজন মারাও গিয়ে থাকে বৈকি!" সমরের চিন্তা বেড়ে যায় এতে। তার মনে হয়, সেই এক আধজনের মধ্যেই যদি অমর পড়ে।" বেচারী ঘরের মধ্যে ছটফট কর্ত্তে থাকে। অবশেষে টেবিলে মাথা রেখে বসে পড়ে কতকটা অর্দ্ধচেতনের মত। কতক্ষণ পরে তার সম্বিৎ ফিরে আসে এক কুলীর ডাকে। সে জানালো যে অমরের অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। শুনে সমর ছোটে তার বেডের দিকে এমনি হন্তদন্ত ভাবে যে দু একজন নার্স ও ডাক্তারের সাথে তার ধাক্কা লেগে গিয়েছিলো আর কি!

অমর চাইলো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে। তার হাত পা তখনও খাটের সঙ্গে বাঁধা। ক্লোরোফরমের ঘোর তার তখনও যথেষ্ট আছে। সমর তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত রাখে। ফাঁকা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অমর কতকটা জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে "এই সমর, হাত দেরে গাধা হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি, সেকহ্যাণ্ড কর্। সমর কতকটা অভিভূতের মত যাই তার হাত খুলে দিতে গিয়েছে, পাশের কুলীটা অমনিই বলে ওঠে "হাত মৎ খুলিয়ে বাবুজী, আভিতক পেসিন নেশামে হ্যায়।" অগত্যা সেকহ্যাণ্ড তাকে কর্ত্তে হয় সেই বাঁধা হাতের সঙ্গেই। কিছুক্ষণ পরে অমর আবার বলে "দেখ এরা মনে কচ্ছে হাত খুলে দিলে আমি পালাব, তাই হাত খুললে না ; যাক্ একটু জল খাওয়াবি ভাই।" ফিডিং কাপে করে সমর তাকে জল খাওয়াতে গেল। কিন্তু কোথায় ছিল সেই নার্স, চোখের পলকে এসে ফিডিং কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে ধমকের স্বরে বল্‌লে "বাইরে যান ; আপনার এ ঘরে থাকবার

প্রয়োজন নেই আর। যান, পাঁচটার সময় আসবেন।"

হতভম্বের মত সমর বেরিয়ে যায় সে ঘর হতে।

বেলা পাঁচটা বেজেছে। হাঁসপাতাল বেশ সরগরম। রোগীদের দেখতে এসেছেন তাঁদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা। সমরও বসে আছে বন্ধুর পাশে একখানি টুলের ওপরে। এখন অমরের জ্ঞান ফিরে এসেছে; তার হাত পা-ও খোলা। দুই বন্ধুতে গল্প স্বল্প চলছে, এমন সময় সেই নার্স টী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। সমর ত তাকে দেখে রীতিমত ঘাবড়িয়ে গেল—কি জানি কি আবার বলে বসে!

তিনি কিন্তু এসে বেশ ধীরভাবেই বল্লেন "ওবেলার ব্যবহারে আপনি নিশ্চয়ই আমার ওপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু আমাকে তা কর্ত্তে হয়েছে নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়েই। তাহলেও আমার ব্যবহার কতকটা রূঢ় হয়েছিল, তাই ক্ষমা চাইছি।" সমরের মুখে ভাষা ফুটলো এবার, সে উত্তর বলে "না না, কৈ আপনি তো তেমন কিছুই বলেন নি।"

নার্স টী বলেন "হ্যাঁ বলেছি বৈ কি, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন—অপারেশন থিয়েটারে বাইরের লোক চলে গেলে আমাদের অনেক গালাগালি শুনতে হয়; আর দুপুরে যদি আপনি বন্ধুকে তখন জল খাওয়াতেন তো তার ফলে এমন বমি আরম্ভ হতো যে এ বেলা ওঁর অবস্থা রীতিমত ভাবিয়ে তুল'তো আমাদের।" "না না, কি যে বলেন আপনি," সমর পুনরায় বিনীতভাবে বলে "দোষ বরঞ্চ আমারই হয়েছিলো।" শুনে নার্স টী একটু মৃদু হেসে বিলাতী ধরণে ছোট্ট একটী নমস্কার করে চলে গেল পাশের বেডের রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে। ব্যাপার সব শুনে অমরও একটু হাসলে।

কয়েক দিন কেটে গেছে। অমরের অবস্থা যাচ্ছে ক্রমশঃ ভালর দিকেই। আর খুব বেশী হয়তো হপ্তাখানেক তাকে থাকতে হবে হাঁসপাতালে। ইতি মধ্যে ব্যাপারও বহু ঘটেছে। সমরের বাড়ীর সকলেই তাকে অমরের কথা জিজ্ঞাসা করে; অমরের বাড়ী হতেও লোক আসে খবর জানতে। বন্ধুরাও সেই ঘটনার পরেই অমরের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, তারাও তাকে জিজ্ঞাসা করে অমরের সম্বন্ধে! সমরের মুখে লেগে থাকে এক উত্তর "সে দিল্লী গেছে বিশেষ কাজে; আর দিন কয়েক পরেই ফিরে আসবে।"

কিন্তু সেই বিশেষ কাজ যে কি সে আর কেউ জানতে পারে না। কেউ তা জানতে পীড়াপীড়ি করলে সমর বলে "ঠিক জানি না কি কাজ, অমর এসে বলবেখন।" বেশী কাণ্ড ঘটেছে কিন্তু হাঁসপাতালেই। একদিন অমর বলে সমরকে "বিভ্রাট ঘটাবি তুই"

সমর উত্তর দেয় "তা একটু ঘটলই বা"

অমর বলে "তোর পেটে পেটে এত নষ্টামী তা আগে কে জানতো"

"এখন জানলি তো" সমর উত্তর দিল।

"ফের, ওরে ফের, এখনও ফিরে আয়" অমর আবার বলে।

এর উত্তরে একটু মুচকি হেসে অভিনয়ের ভঙ্গিতে সমর বলে "আসিব না ফিরে মহারাজ!

বাধা দিয়ে কিছু রুক্ষ ভাবেই অমর বলে "এতে হাসি ঠাট্টার কিছু নেই স্তর; বান্দা ভাল কথাই বলছে। একটা জীবন নষ্ট কর্ব্বি বৈত নয়।"

"জীবনটাকে যে বাঁচাবো না, একথা জানলি কি করে" সমর জিজ্ঞাসা করে এবার।

অমর উত্তর দেয় "তা জানা যায় বৈকি"

"হাত গুণে" সমর ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে ওঠে।

ধমকের স্বরেই এবারে অমর বলে উঠল "থাম, বাজে বকতে হবে না।"

উত্তরে সমর অদ্ভুত ভঙ্গীতে তার দুটী ওষ্ঠের প্রান্তে তর্জ্জনী স্পর্শ করে বলে "তথাস্তু দেব, মুখে এই চাবি দিলুম।"

দুজনেই কিছুক্ষণ বসে আছে, কারো মুখে কোন কথা নেই।

এই অস্বস্তির আবহাওয়াকে কিছু লঘু করে নেওয়ার উদ্দেশে সমর একটা সিগারেট ধরালে। এমন সময় নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়ালেন সেই নার্স টী। দুজনে এমনি অন্যমনস্ক ছিল যে কেউ তার আগমন জানতে পারে নি। মাথাটী একটু হেলিয়ে তিনি বলে ওঠেন "আচ্ছা মুখে

অমর বন্ধুকে জানালে এ কথা। সমর তাকে বলে "যত বড়ই বিপদ আসুক ভাই অঞ্জলিকে আমি বিয়ে কর্ব্বই। অমর বলে "কিন্তু তার পিতৃ পরিচয় দিতে দোষ কি?" "দোষ কিছুই নেই, তবে ও বাড়ী থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছে। তাই সে পরিচয় দিতে চায় না।" আমি তার আর বিশেষ কিছু পরিচয় চাই না ভাই, যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট" সমর বলে। "কিন্তু"; অমরের কথায় বাধা দিয়ে সমর বলে উঠল, "এর আর কিন্তু নেই ভাই, তুই তো জানিস অমর, ও আমাকে কত ভালবাসে।" "জানি সবই" অমর বলে "এও জানি তোর সঙ্গে মেলামেশা করাতে, বেড়াতে যাওয়ায় সিষ্টার, ডাক্তার এদের সকলের কাছে তাকে কত গালাগালি খেতে হয়েছে, লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, জানি সমর ও তোকে কত ভালবাসে।" "তবে তুইই বল্" সমর বলে, যে এত লাঞ্ছনা, তিরস্কার সহ্য করেও আমাকে ভালবেসে চলেছে, তাকে নিষ্ঠুর ভাবে কি আমি ত্যাগ কর্ত্তে পারি?" অমর উত্তরে বলে "না, তা হয়ত পারা যায় না, কিন্তু সমর, মনে পড়ে সেই কথা, সেই প্রথম দিনেই আমি বলেছিলাম শেষ রক্ষা হবে তো।" অমরের পিঠে মৃদু করাঘাত করে সমর বলে "হবে বন্ধু হবে।"

"কিন্তু কি ভাবে" অমর জিজ্ঞাসা কর্লে।

সমর উত্তর দেয় "তা দেখতেই পাবি।

এর কয়েকদিন পরেই দেখা গেল সমর নিরুদ্দেশ। অনেক চেষ্টাতেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না তিন দিনের মধ্যে। তার বাবা বিজয়বাবু বা মা মন্দাকিনী দেবী কেউই কিন্তু এতটা আশা করেন নি। দুঃখ ও চিন্তা এই দুইয়ের ভারেই তাঁরা ভেঙ্গে পড়লেন। এর উপর ছিল আরও বিপদ "মাত্র দিন কয়েক পরেই নীলার বিয়ের দিন ধার্য্য হয়েছে ও সেই অনুযায়ী বন্দোবস্তও করা হয়ে গেছে।" বিজয় বাবু অবশেষে সব ঘটনা জানিয়ে ফৈজাবাদে তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি দিলেন, এ বিপদে এসে তাঁকে সাহায্য কর্ত্তে।

সমর আর সে বাল্যবন্ধু। সেই সিকসথ ক্লাশ হতে এক সঙ্গে এম, পর্য্যন্ত পড়ে এসেছে। দুদিন পর্য্যন্ত তাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি; পরস্পরের সুখ দুঃখের সংবাদ সব সময়ই বিনিময় হোতো। আর এখন কিনা—সমরের উপরে অমরের ক্রোধও হোলো দুর্জ্জয় রকমের। সে ভা[illegible] যাই হোক আমাকে বলে যাওয়া তার উচিত ছিল। [illegible] সমরকে খুজে বার কর্ত্তেই হবে। কিন্তু কি ভাবে। অঞ্জলির কাছে একবার জিজ্ঞাসা করে এলে হয় না। [illegible] বা কি ভাবে সম্ভবপর।" এই রকম পাঁচ সাত ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে কখন যে নীলাদের বাড়ীতে গিয়ে [illegible] ধাক্কা দিলে তা সে খেয়ালই করে নি। এবার সে একটু সচকিত হোলো। নীলা তাকে আরও আশ্চর্য্য করে [illegible] একখানি চিঠি দিয়ে; তার দুচোখ জলে ভরা। [illegible] যে কি জিজ্ঞাসা করায় নীলা বল্ল 'দাদার চিঠি; [illegible] কোন দূর দেশে আজই চলে যাচ্ছে, দেশে আর [illegible] ফিরবে না। খামখানি সমর নিরীক্ষণ কর্লে। [illegible] নীলাকে বল্ল "দেখ এ দুটো মোহরের তারিখ [illegible] তো।" নীলা বলে, "তাতে কি?" "ক্লু একটা [illegible] গেছে।" বলে কথা শেষ হতে না হতেই অমর লাগালো এক রাম দৌড়।

তার দৌড়ের বহর দেখে নীলা তো অবাক হয়ে [illegible]।

মিস অঞ্জলি দেবী কাজ কচ্ছেন ওয়ার্ডে। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা, হঠাৎ অমর এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে; অমরকে দেখে তিনি যেন কিছু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর্লেন। অমরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি হতে সে ভাব এ[illegible] না। অমর কিন্তু সাধারণ ভাবেই বল্ল "অঞ্জলি দেবী বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে একটু ত্যক্ত কর্ত্তে এলাম।" "কেন, ব্যাপার কি" তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

"আর কি ব্যাপার" অমর বলে যায় "সমর আমায় এক খানা চিঠিতে জানিয়েছে যে পত্রপাঠ সুটকেশে করে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ তাকে দিয়ে [illegible]। কিন্তু চিঠিতে সে কোন ঠিকানা দেয় নি, যেখানে [illegible] এটা দিয়ে আস্ব। কেবল এইটুকু লিখেছে যে তুমি চেষ্টা কর্লেই আমার ঠিকানা পেতে পার্ব্বে। এই দেখুন [illegible] তাঁর চিঠি" বলেই সে পকেটে হাত চালিয়ে দিলে। অঞ্জলি দেবী যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলেন এতে। তিনি বলেন "আমি কি করে জানাবো, তার ঠিকানা।"

"দেখুন সে কথাও সে আমাকে লিখেছে, [illegible]" অমর বলে এবার। পরক্ষণেই একখানা চিঠি বার করে

নিজেই পড়তে সুরু করে দিলে "অঞ্জলির কাছে সব সাহায্য তুই পাবি। ভাই সুটকেশটা আমার বিশেষ প্রয়োজন। ভুলবি না।" এই পর্য্যন্ত পড়ে বলে উঠল "দেখছেন তো।" অঞ্জলি দেবী উত্তর দিলেন "কিন্তু তিনি তো আমার কোয়ার্টার্সে থাকেন না।"

অমর মৃদু হেসে বলে "সে ঠিকানাটা কেন লেখেনি জানেন, যদি দৈবক্রমে আর কেউ এই চিঠিখানা পড়ে ফেলে সেই জন্যেই এত সতর্কতা। মিস অঞ্জলি নীরবে মিনিট দুই চিন্তা করে বলেন "যখন তিনি নিজে চিঠি লিখেছেন, তখন অবিশ্বাসের আমার কিছু নেই। তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা হচ্ছে ফ্ল্যাট, *নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কিন্তু দেখবেন যেন কোন গোলযোগ না হয় এতে।"

"না, না, সে কি। আচ্ছা নমস্কার"

"নমস্কার"

অমর চলে গেল

অঞ্জলি বর্ণিত ফ্ল্যাটটীর দ্বারে করাঘাত কর্ত্তেই একজন চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কর্লে "কাকে চান।" চট করে অমর উত্তর দিলে "কাউকে চাই না, তবে এ বাড়ীর সমর বাবু বলে যে ভদ্রলোক থাকেন তাঁকে বলো যে কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে মিস অঞ্জলি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; এখন তিনি কিছু সুস্থ, কিন্তু সমর বাবুকে দেখবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাই আমি সংবাদ দিতে এসেছি। আমি মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র।" চাকরটী দ্বার বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল আর অমরও সেই অবসরে নীচে নেমে এককোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রৈল। অল্পক্ষণ পরে যাই সমর সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে যাবে অমনিই পিছন হতে অমর তার ঘাড় ধরে বললে "কিরে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছিস কবে, একলাই যাবি না যুগলে।" সমর তো প্রথমে দারুণ চমকে উঠেছিলো এতে। সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সে বলে উঠল "ছাড় ভাই ছাড়, আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।"

"কি পাশপোর্ট ঠিক কর্ত্তে বুঝি" অমর বল্লো।

"না, না, হাসপাতালে" সমর উত্তর দিলে।

অমর বল্ল "কোন দরকার নেই, আমিই সেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র যে এই বাজে সংবাদ এনেছে। অতএব মা ভৈষী। দেবী তোমার ভালই আছেন, সুস্থ্য শরীরে ডিউটিতে মোতায়েন হয়ে। তাঁর কাছ থেকেই ছলে ও কৌশলে, তবে আদৌ বলে নয় তোমার ঠিকানা জেনে এখানে এসেছি। আর এ ছাড়া আমার গত্যন্তরও ছিল না।"

"কিন্তু এ রকম আসার মানে" সমর একটু রূঢ়ভাবেই বলে

অমর উত্তর দেয় "মানে অতি প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ; প্রথমতঃ আমার স্কুল ফ্রেণ্ড হিসাবে ও দ্বিতীয়তঃ আমার ভাবী কুটুম্ব হিসাবে তোমার সঙ্গে আমার তামাসা চলতে পারে বৈকি। কিন্তু তুইতো আচ্ছা বাঁদর। পালালি, তা আমায় জানিয়ে পালা, এখন যদি তোকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাই। যাক্ ভয় নেই, তা নিয়ে যাব না, যাই হোক তুই এখন কল্‌কাতা ছেড়ে বেশী দূরে পালাস নি আর যতদিন না বলি বাড়ীতেও দেখা দিবি না, বুঝেচিস হনুমান। তাছাড়া চ ওপরে তোর ঘরে, অনেক কথা আছে, এখানে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

লীলার বিয়ের দিন এসে পড়ল বলে। আজও সমরের কোন উদ্দেশ হয় নি। কিন্তু তাই বলে তো আর মেয়ের বিয়ে বন্ধ রাখা যায় না সব জোগাড় হয়ে গেছে। ফৈজাবাদ হতে বিজয় বাবুর বন্ধু যতীনবাবুও এসে হাজির হয়েছেন। সে ভদ্রলোকেরও মহা দুঃখ। তাঁর উচ্চশিক্ষিতা মেয়েকে সামান্য কড়া কথা বলায় সেও নিরুদ্দেশ হয়েছে। "বীণা লিখে এসেছিল যদি তাকে কোনরকমে সন্ধানের চেষ্টা করা হয় তো সে সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা কর্ব্বে।" তাঁরা তার সন্ধানের চেষ্টাও করে উঠতে সক্ষম হন নি। মনের দুঃখ মনেই চেপে আছেন। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরেই দুঃখের গল্প করলেন। অমরেরও কাণে উঠলো সে কথা। সে মেয়েটীর ফটোও দেখলে। ফটো দেখে তার ওষ্ঠের কোণে একটী মুচকী হাসি ফুটে উঠল। বিজয়বাবু ও যতীনবাবু চেষ্টা কর্লেন সমরের উদ্দেশ পাওয়ার জন্য, অমরও অনেক চেষ্টা কর্লে অবশ্য লোক দেখানো। কোনই ফল হোলো না।

বিয়ের রাত্রি। বর এসেছে এক বন্ধ সীডন মোটরে। সামনের আসনে বসে ছিল নাপিত। পিছনের আসন হতে বর ও পুরুত কেউ অভ্যর্থনা করার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি নেমে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গাড়ীর কাঁচে কাল পর্দা

দেওয়া ছিল বলে তার ভিতরের কিছুই কারো চোখে পড়লো না। অমর গাড়ী হতে নেমে দেখলো মন্দাকিনী দেবীর চোখে জল বিজয়বাবুও বেশ বিমর্ষ। মেয়ের দল বর দেখে হুলুধ্বনি দিলে বটে কিন্তু তাতে কোন প্রাণ ছিলো না। অমর নেমে মন্দাকিনী দেবীকে বললো মা আজকের এই দিনে সমর থাকলে আনন্দ আমাদের দশগুণ বেড়ে যেত এ কথায় মা দিলেন চোখে আঁচল চাপা আর বিজয়বাবুর বুক চিরে বেরিয়ে এল এক বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। অমর আবার বল্লে যদি তার ইচ্ছায় আপনারা রাজী হন তো চেষ্টা কর্লে হয়তো এখনও তাকে খুজে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। মা যেন চাঁদ পেলেন হাতে, তিনি বল্লেন তা হয় কি বাবা? তবে তাকে তোমরা খুজে নিয়ে এস। সে যা বলবে তাতেই আমরা সায় দেবো। বিজয়বাবুর দিকে চোখ অমর বল্লে আপনারও কি এই অভিমত? কারণ এতদিনে খুব সম্ভবতঃ সে সেই নার্সকে বিয়ে কর্ত্তে পারে।

বিজয়বাবুও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন "আর বাবা, পুত্রস্নেহ যে কি তাতো জানো না। বাপ হওয়া অতি পাপ। দেখ যদি তাকে আনতে পার ফিরিয়ে-বেশ তাই হবে" বলে নাটকীয় ধরণে অমর বাইরে বেরিয়ে এল। সকলেই উঠলেন এতে হাঁ হাঁ করে। বরের কি হলো, সে কি রাগ করে চলে যাচ্ছে, এই সব নানান রকম জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। কোন নিষেধ দৃকপাত না করে অমর সটান গাড়ীর সামনে এসে দরজা খুলে সেনা নায়কের ভঙ্গীতে বলে উঠল "নেমে আয় সমর, নাম বীণা। গাড়ীর মধ্য হতে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে নেমে এলো সমর ও অঞ্জলি। অঞ্জলিও বীণা নাম শুনে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তার আসল নাম অমর জান্লে কেমন করে। মা এসে এবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধর্লেন সমরকে। এতক্ষণে বিজয়বাবু কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন, তিনি বললেন "শেষে সেই জাতকুলহীন নার্সকে বিয়ে কর্লি। যাক যা ভাল বোঝ কর। বলেই তিনি সেখান হতে চলে যাবার উদ্যোগ কর্চ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গোলোযোগ শুনে ভিতরবাড়ী হতে যতীনবাবুও এসে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। তিনি এতক্ষণ ভিতর বাড়ীতেই তত্ত্বাবধান করছিলেন। বিজয়বাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই তিনি বল্লেন "কাকে কি বল্ছ বিজয়, এযে আমার মেয়ে বীণা।

গভীর রাত্রে দেখা গেল অনেকগুলি মেয়ের মাঝে তারা বসে রয়েছে আর অমর বলছে সমরকে, "তোর জন্যেই তো আমাকে বন্ধ গাড়ী চড়ে পর্দ্দানশীন হয়ে বিয়ে কর্ত্তে আসতে হলো রে হনুমান্।"

অন্ধ-স্নেহ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হে ধরণী মাতা আর কতদিন ধরি হায়
অপল্লব প্রাণহীন ঐ নগ্ন তরুটিরে
বক্ষ স্নেহ বন্ধে মৃত শিশুটির প্রায়
আকড়িয়া রবে ধরি অরণ্যের তীরে।
　একদিন যেথায় সে প্রাণের আনন্দে
　দিত যৌবনের বার্ত্তা পল্লব-মর্ম্মরে
　নব ফাল্গুনের দিনে রহস্যের ছন্দে;
　যেথা আলিম্পন ছাঁদে যেত ঝ'রে ঝ'রে
　পুষ্পরূপ নিয়ে তার প্রাণের উচ্ছ্বাস
　সবুজ তৃণের বুকে, সেথা এক ঘরে-
　সম, কুড়াইছে সে যে বন-পরিহাস।
　কী গভীর স্নেহ তব, হে ধরিত্রী মাতা
　সাক্ষ্য তার ঐ পাদপে আছে যেন গাঁথা।

হিন্দীতে সন্তবাণী

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

সত্যকার কাব্য ও কবিতা যুগধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। পুরানো হিন্দী কবিদের কাব্য ও কবিতা পুরাতনপন্থী হ'লেও তা আধুনিক কালের রুচিবিরোধী আদৌ নয়,—বরং তা আধুনিক সাহিত্যিক-মণ্ডলীর নিকটে অমূল্য সম্পদ ব'লেই গৃহীত হবে। তাঁদের কবিধর্ম্ম ও কাব্য-প্রকৃতি শুধু সাময়িক খ্যাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে নি; কাল ও দেশ তা বিচার ক'রে একে এত উঁচুতে স্থান দিয়েছে যে আজও তা সমাদৃত হয়ে আসছে।

বিষয় ও আখ্যান-বস্তু মহিমায় হিন্দী ভাষার গত যুগ এত সূক্ষ্ম ও করুণ যে আংশিক ভাবে তার পরিচয় দিলে কাব্য-রসিকের মনে আনন্দ হবে না, মন ভরবে না। কিন্তু বিস্তৃত ভাবে এক-একটি সম্পূর্ণ কবিতার পরিচয় এই প্রবন্ধের অপরিসর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু এ-সকল কবিতার ছিটেফোঁটা পড়েও আনন্দ হয়। অবসর যাপনের বিলাস-সামগ্রী তা নয়; তাতে যথেষ্ট পরিমাণে মনের খোরাক যোগায়—অনেক অনধীত বিষয় জ্ঞানলাভ হয়। সাধু-সন্তজনের বাণী আলোচনা করলে তাতে দেখা যাবে যে সেগুলি নিছক শুষ্ক উপদেশপূর্ণ নয়; বিষয়, আখ্যানবস্তু ও কবিত্ব-মাধুর্য্যে তা অনুপম।

শিখগুরু তেগ বাহাদুর নানকের একটি বাণী উল্লেখ করেছেন—

"কহি রে খোজন যাই,
সর্ব-নিবাসী, সদা আলোপা, তোহি সঙ্গ সমাই,
পুহুপ মধ্যে জিমি বাস বসত হায়,
মুকুর মাহ জম্ ছাঁহি,
তয়সেহি হরি বসে নিরন্তর,
ঘরহি খোঁজহি যাই;
বাহর ভিতর একহি জানহু,
এহ গুরু জ্ঞান বতাই,
জন নানক বিন আপহি চিনহি,
মিটে না ভ্রমকি কাই।"

তুমি কেন তাঁকে খুঁজতে বনে যাচ্ছ, তিনি সর্ব্ব-নিবাসী কিন্তু সর্ব্ব-অগোচর, তোমার মাঝেই তো তিনি আছেন। পুষ্পের মাঝে যেমন সুবাস, মুকুরের মাঝে যেমন প্রতিচ্ছবি, তেমনি তিনি তোমার মাঝে নিরন্তর বাস করছেন, তাঁকে তোমার ঘরে গিয়েই খোঁজ। গুরু বলছেন, তোমার ভিতর-বাইরে ভগবান বিরাজ করছেন—এই জ্ঞান তোমার অন্তরে আপনি না উদয় হ'লে মানুষ মানুষকে উপদেশ দিয়ে এই ভ্রম-জাল দূর করতে পারে না।

সন্ত-বাণী হিসাবে কবীরের বাণীর প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে। তিনি—

"মালা তো করমে ফিরে,
জীভ ফিরে মুখ জাহি;
মনুয়া তো দুহুঁ দিশি ফিরে,
এই তো সুমিরণ নাহি।"

তোমার মালা হাতে করে জপ করছ, তোমার জিবও তোমার মুখের মধ্যে নাম কপচাচ্ছে, কিন্তু তোমার মন তো তাতে বসছে না, সে দশ-দিশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,—এরূপ ভাবে ভগবানকে স্মরণ করলে তো তাঁকে পাওয়া যাবে না।

কবীর সাহেব আরও বলছেন যে, প্রেম প্রেম ক'রে লোকে কত বলছে কিন্তু প্রেমের আসল স্বরূপ তো কেউ ধারণা করতে পারছে না। তাই তিনি বলছেন—

"প্রেম না বাড়ী উপজে,
প্রেম না হাট বিকায়;
রাজা, পরজা যেঁহি রুচে,
যীশ দেই লে যায়।
প্রেম, প্রেম সব কোই কহৈ,
প্রেম না চিন্হি কোই;
আঠ পহর ভীনা রহৈ,
প্রেম কহাঐ সোই।"

প্রেম ক্ষেতের ফসল নয়, প্রেম হাটে বিকায় না, প্রেমের সম্পর্কে রাজা-প্রজার ভেদ নেই, কারণ উভয়েই প্রেমের আকর্ষণে মস্তক অবনত করে। প্রেম প্রেম ক'রে চেঁচালেই হয় না; প্রেমের অষ্ট প্রহর অর্থাৎ সদা-নিরত সাধনা চাই।

সুরদাস হিন্দী ভাষার মহাকবি। তিনি এক স্থলে বলেছেন—

"প্রীতি করি কাহু সুখ ন লহৌ"

প্রেম ক'রে, প্রীতি জ্ঞাপন ক'রে কেউ কখনও সুখশান্তি পায় নি। তার চিরজীবন দুঃখেই কেটে যায়।

আর এক জায়গায় বলেছেন—

"মেরে কুওঁর কান্হ বিনু সব কুছ,
বৈসেহি ধন্যো রহে।"

সমস্ত ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল, শ্রীকৃষ্ণও ব্রজের বিরহে অধীর। এমনি করে ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ না করলে তার সাধনা ব্যর্থতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দী ভাষাতে সাধুসন্তদের বাণী-সংগ্রহ প্রকাশিত হ'লে দেখা যাবে যে তা অক্ষয় ভাণ্ডার। অন্য ভাষাভাষী সন্তজনও এই ভাষাতে তাঁদের অমূল্য উপদেশবাণী প্রচার ক'রে গেছেন। তা এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী যে এক বার পড়তে গেলেই মন মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে চোখে পড়ে কবীর ও রৈদাস (বাংলায় আমরা যাঁকে রবিদাস ব'লে থাকি) দুই ভায়ে সাধু ও ভক্ত-কবির ধর্ম্মালোচনায় বাদ-প্রতিবাদ, যা প্রায়ই লেগে থাকত।

রৈদাসজীর প্রভাব একদিন গুজরাত দেশকে ঢেকে ফেলেছিল। আজও গুজরাতে তাঁর লাখ-লাখ শিষ্য আছেন; তাঁরা নিজেকে রবিদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন। দরিদ্র চণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে ভগবদ্‌ভক্তি ও আরাধনা তাঁকে সর্ব্বজাতির পূজ্য গুরুর আসনে বসিয়েছিল।

কবীর সাহেব ও রৈদাসজীর মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হ'ত কিন্তু তাতে উভয়ের সৌহার্দ্দ্য শিথিল না হয়ে আরও গভীর, আরও দৃঢ়ীভূত হয়েছিল।

রৈদাস বলেছেন—

"প্রভূজী তুম চন্দন্ হম পানী,
যাকি অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানী॥"

প্রভু, তুমি চন্দন আর আমি জল—উভয়ের অবিচ্ছেদ্য মিলনে কণায় কণায় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

"প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা,
যৈ সে চিতওত চন্দ-চকোরা।"

প্রভু, তুমি যেন নিবিড় বন, আমি তার মাঝে ময়ূর, চকোর যেমন চাঁদের দিকে চেয়ে আছে তেমনি আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি।

আবার বলছেন—

"প্রভুজী তুম মোতী হম ধাগা,
যৈসে সোনে মিলত্ সোহাগা।"

প্রভু, তুমি মহামূল্যবান মোতী আর আমি (ভক্ত) মোতির মালা গাঁথবার সুতো (ধাগা)। তুমি ও আমি সোনা-সোহাগার ন্যায় মিশে এক হয়ে আছি।

দাদু দয়াল শুধু একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না, তিনি এক জন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। তাঁর একটি উপদেশ বাণী উল্লেখ করছি:—

"জাতি ন পুঁছো সাধু কী,
পুঁছ লীজিয়ে জ্ঞান;
মোল করো তলয়ার কা,
পড়া রহন কো ম্যান।"

সাধুসন্ত জনের জাতি-পাঁতির খোঁজ ক'র না,—তার জ্ঞান ও গুণের পরখ কর। তরবারির ধাতু ও মূল্য পরখ কর, তার কোষ দূরে পড়ে থাকুক।

দাদু দয়াল নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তাই তিনি "সব মে রমনেওয়ালা রাম" বলে ভগবানের নাম জপ করতেন। তিনি বহু ভষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দী, ফার্সী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাতে তাঁর বাণী রেখে গেছেন।

দাদুর রচনা সর্ব্বসাধারণের নিকট "শাখী" বলে পরিচিত আর কবীরের রচনা "ভজন" বলে অভিহিত করা হয়। দাদুর "শাখী" প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল আর কবীরের "ভজন" ভক্তি শ্রদ্ধার মহিমায় করুণ।

এই দুইজন মহাকবি পরম সাধু হিন্দু ও মুসলমানে কোনো-রূপ ভেদাভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের দূরে গোঁড়ামির রেখাপাতও করতে পারে নি—এমনি এঁরা ছিলেন।

গুরু নানকের উপদেশ-বাণী অনেক বাংলা-সাহিত্যরসিকের আদরণীয় ও প্রিয়।

সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি আরও কত সাধু-সন্তজনের উপদেশ-বাণীতে হিন্দী ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডার ভরে আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

কবীরের আর একটি বাণী এখানে উল্লেখ করি।

তিনি বলেছেন—

"বীত গয়ে দিন ভজন বিনা রে।
বালকপন গয়ো খেল-কুদ মে,
জব জওয়ানী তব মান কিয়ারে।
* * * *
কহত কবীর শুনো ভাই যাকৈ,
পার উতর গয়ে সন্ত জনারে।"

বিনা সাধন ভজনে মানব-জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল। বাল্যকাল খেলায়ধুলায় আর যৌবন হাস্য-পরিহাসে কেটে গেল… যাঁরা সাধুসন্তজন; বৃথা কালাতিপাত করেন নি, সাধন-ভজন করেছেন,—তাঁরা অনায়াসে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

সুরদাসের একটি বাণী উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"উধো, মন ন হোঁহি দশ, বীশ,
এক হুতো সো গয়ো শ্যাম সঙ্গ
অব কো আরাধয় ঈশ।"

সুরদাস বলছেন যে মানুষের একটা মন থাকে, দশ-বিশটা তো মন থাকে না। সেই একটা মন শ্যামের সঙ্গে চলে গিয়েছে এখন আর কে ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

—"প্রবাসী"

বগুড়া মহিলা সমিতি

শ্রীসরযূবালা রায়

বগুড়া জেলার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাথ বন্ধু তালুকদার মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা তালুকদার মহোদয়ার অদম্য উৎসাহে আমাদের সমিতি ১৩৩৬ সনে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মহিলাগণের অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমাদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের সমিতির ২টী বিভাগ। বয়স্কামহিলাগণ ইহার সভ্যাশ্রেণী ভুক্ত। বর্ত্তমানে ২০ জন সভ্যা আছেন। সপ্তাহে একদিন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হয়। সভ্যাগণ দৈনিক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া নানা বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এবং নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমিতির শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক সভ্যা নানাপ্রকার নিত্য ব্যবহার্য্য জামা প্রস্তুত করিতে পারেন। উলের নানাপ্রকার নমুনার সোয়েটার ব্লাউজ প্রভৃতি এবং সূতীর সর্ব্বপ্রকার জামা যায় সাট কোট, পাঞ্জাবী, পান্টুলন প্রভৃতি প্রত্যেক সভ্যা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং যে কোন মহিলাকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিতেছেন। ৮।১০ জন গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবসর সময়ে কাজ করিয়া মাসিক ৮।১০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার দিনে এই স্বল্প আয় মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের অস্বচ্ছলতার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের সমিতির সভ্যাগণ ধাত্রী বিদ্যায় ও বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতেই সভ্যাগণ প্রতিবেশিনীগণের প্রসব সঙ্কটে ধাত্রীর কাজ করিতেছিলেন। ১৩৩৭ সনে কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্যে আমরা "ধাই ট্রেণিং ক্লাশ খুলিয়াছিলাম, তাহাতে সকল বর্ণের মহিলা সভ্যাগণ হাড়ী, ডোম প্রভৃতি ব্যবসায়ী ধাত্রীগণের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমরা সমিতি হইতে ২২টী ব্যাগ বিতরণ করিয়াছিলাম। আমাদের সভ্যাগণ ব্যবসায়ী ধাত্রীগণের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন-

তার জ্ঞান বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের সমিতির সভ্যাগণ অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ মহোদয় সহরে সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলেই, তাহার প্রতিবিধান ও পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সভ্যাগণের জ্ঞান বিস্তার কল্পে সাহায্য করিয়া থাকেন। সমিতির নিজ গৃহাদি না থাকায় সমিতির কোন সব্জী বাগান নাই, সভ্যরা নিজ বাড়ীতে তরকারীর বাগান করিয়া থাকেন। তদ্বারাও প্রত্যেক গৃহস্থের অনেক অর্থানুকূল্য হইয়া থাকে। বন্যা বা দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যকল্পে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সভ্যাগণ নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। সমিতির প্রতিষ্ঠান হইতে মহিলা গণের মধ্যে পরস্পর ভাব বিনিময় ও আলাপ আলোচনাদি দ্বারা নানা প্রকার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে।

আমাদের সমিতির অপর বিভাগ বালিকাগণের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়। আমাদের সমিতির বিদ্যালয়ে ৩৩৬টী ছাত্রী আছে। তাহাদিগকে ৪র্থমান পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ইংরেজী, অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ছাত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকার সূচী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রীগণ উলের নানাপ্রকার কাজ শিক্ষা করিয়া তাহাদের মাতা, ভগিনী ও প্রতিবেশী-গণকে শিক্ষা দিয়া থাকে,এজন্য অনেক মহিলা সমিতির সভ্যা হইয়াও সমিতির ছাত্রীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার না শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকেন।পূর্ব্বে দেখিতাম কোন মহিলা কোন নূতন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিলে সহজে অপরকে তাহা শিখাইতেন না। বর্ত্তমানে আমাদের সভ্যা বা ছাত্রীবর্গ মধ্যে কেহ নূতন কিছু শিখিলে, অত্যল্পকাল মধ্যেই সকলেই তাহা শিখিয়া ফেলিয়া থাকেন। দশ জনের মধ্যে মিশিবার ফলেই সকলের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে। আমাদের সমিতিতে একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, বর্ত্তমানে সম্পাদিকার ম্যাটিক পাশ কন্যাটীও শিক্ষয়িত্রীকে সাহায্য করায় শিক্ষার অনেক সুযোগ হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে শিক্ষয়িত্রীর বেতন মধ্যে মাসিক ১০৲ টাকা দেওয়া হইতেছে কিন্তু একটী শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে সমিতির বিদ্যালয়ে শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইতেছে। মাসিক আরও ৫৲ টাকা সাহায্য দিলে আর একটী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে পারিলে শিক্ষা দেওয়া সুবিধা হইতে পারিত।

আমাদের সমিতির একটী গ্রন্থাগার আছে। তাহাতে প্রায় ২৫০ শত গ্রন্থ আছে। কিন্তু অর্থাভাবে আমাদের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিতেছি না। আমরা অনেক গ্রন্থকারের নিকট তাহাদের গ্রন্থের একখণ্ড করিয়া আমাদের গ্রন্থাগারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু কোন স্থলেই সদুত্তর পাই নাই। অনেকেই প্রকাশকের নিকট হইতে নগদ মূল্যে খরিদ করিতে সদুপদেশ দিয়াছেন। আমরা অনেকের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছি। সদ্‌গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞানের বিস্তার না করাইতে পারিলে মহিলাগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করা সম্ভব হয় না। আমরা আশা করি কেন্দ্র সমিতি হইতে আমাদের গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক সাহায্য করিবেন।

আমাদের সমিতি হইতে শিল্প দ্রব্যাদির প্রদর্শনী করিতে কখনও সক্ষম হই নাই। বগুড়া সহরে এবং মফস্বলে যে সকল প্রদর্শনী হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সমিতি হইতে শিল্প দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছি এবং সভ্যাগণ অনেক মেডেল ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা সমিতিতে কিছুদিন তাঁত চালাইয়াছিলাম, তাহাতে সুবিধা করিতে না পারিয়া আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি। একটী মোজা-গেঞ্জীকল সমিতিতে আনিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। আমরা আশা করি ভগবৎ কৃপায় আমাদের আশা ফলবতী হইবে।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পাটনার বাঙ্গালী ছাত্রীর প্রতি অবিচার—

ইংরাজি সভ্যতার ও শিক্ষার প্রদীপ বাঙ্গালীরাই বিহারে প্রজ্জলিত করিয়া ছিল এখনও সমুজ্জল রাখিয়াছে। পাটনা সহরে 'রামমোহন রায় সিমেনারী' একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়—তাহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালীই, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাঙ্গালী আছেন।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ও আছেন।

শ্রীশ বাবুর কন্যা বর্ত্তমান বর্ষে পাটনা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারি বৃত্তি পাইবার অধিকারিণী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বা তাহার পিতা বিধি মত বেহার প্রদেশবাসী (ডোমিসাইল্ড) বলিয়া গণ্য না হওয়াতে এই মহিলাটীকে সরকারি বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, এবং কলেজে পাড়বার বাধাও সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পিতা পাটনায় বাস করিতেছেন এবং শত সহস্র বেহারীকে শিক্ষা দান করিয়া কৃতবিদ্য করিয়া দিয়াছেন তথাপি তিনি ডোমিসাইল্ড হইলেন না বা তাহার কন্যাকে বৃত্তি প্রদান করিয়া বেহার সরকার উদারতা দেখাইতে সক্ষম হইলেন না। বাঙ্গালীর এমনিই দুর্ভাগ্য। একটী মহিলার উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পথ দুর্গম করা বাঞ্ছনীয় নহে।

কৃতি ছাত্রী

কুমারী বাণী গুপ্ত বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, পরীক্ষায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত, সুকুমার কলা বিদ্যায় (ফাইন আর্টসে) উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মহিলাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম সুকুমার কলা বিভাগে উত্তীর্ণদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী গুপ্ত সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী মহিলা। তিনি প্রসিদ্ধ ব্লক প্রস্তুতকারক (ভারত ফটো টাইপ ষ্টুডিয়র) শ্রীযুত ললিত মোহন গুপ্তর কন্যা। শিল্পীর কন্যার সুকুমার কলা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করাই সমিচীন। মহিলাদেরই অধ্যয়নের ইহা এক প্রকৃষ্ট বিষয়। আমরা

কুমারী বাণী গুপ্ত

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কুমারী বাণী আলোচ্য বিষয় গবেষণা করিয়া উচ্চতর সম্মান লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

উমারাণী সংগ্রহ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে যে 'উমারাণী সংগ্রহ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রায় ছয় শত বাঙ্গালী মহিলা লেখিকার প্রণীত পুস্তক একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। অনেক দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন পুস্তকও এই পুস্তকাধারে আছে। মহিলা লেখিকার হস্তলিপিও রক্ষিত আছে।

.বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই "উমা ঘোষ" সংগ্রহের ্য পুস্তক এক স্থানে একটি বড় পুস্তকাধারে পৃথক যত্নে রাখিয়াছেন। বাঙ্গালী মহিলা লেখিকাদের ক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যায় আর কোথাও নাই। মেয়ে কাদের সহিত পরিচয় হইবার ইহা বিশেষ সুবিধা।

াশ্বিন মাসে উমা রাণীর পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতির উদ্দেশ্যে ানি পুস্তক প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে কয়েক জন কা এই সংগ্রহে রাখিবার জন্য স্বরচিত পুস্তক প্রদান াছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (চৌধুরী) বি এ য়া সত্তর বৎসর আগের মুদ্রিত ও লিখিত স্বর্গীয়া ময়ী দেবীর (আধ আধ ভাষিণী ১৮৭০ খৃঃ বনলতা - খৃঃ নীহারিকা ১২৯০ খৃঃ সালে মুদ্রিত, তারা .ত পূর্ব্ব কথা অশোকা) ছয়খানি ও স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা বীর অংশু এবং চম্পা বই দুইখানি প্রদান করিয়াছেন। ী হেমলতা দেবী (ঠাকুর) বঙ্গলক্ষী সম্পাদিকা তাঁহার কাশিত গল্পের বই 'দেহলী', নদীয়ার মহারাণী শ্রীমতী র্ম্ময়ী দেবী তাঁহার নূতন বই 'মায়ের দান', শ্রীমতী ঘায় 'পরলোকাঞ্জলি' প্রদান করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ 'উমা রাণী' সংগ্রহের পৃথক ালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। যদি মহিলা লেখিকারা করিয়া পুস্তক এই "উমারাণী ঘোষ" রাখিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থা- াঃ নীহাররঞ্জন রায়ের নিকট দয়া করিয়া পাঠাইয়া হা হইলে মহিলাদের পুস্তক সংগ্রহাধারটী পুষ্ট হয় কত্রীদের বই এক বিশ্বস্ত স্থানে থাকিয়া ভবিষ্যতে রিচয় করিবার (বিবলিওগ্রাফী) সুবিধা হইবে।

তী রমণীর এম এ পরীক্ষায় কৃতিত্ব—

তী আত্রেয়ী মজুমদার এম এ দুইটী সন্তানের জননী বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধন্য তাঁহার য় পুণ্য তাঁর শিক্ষানুরাগ। ইহার এক ভগ্নি শ্রীমতী দেবী এমেরিকায় তাঁহার খুল্লতাত স্বর্গীয় স্বামী ন্দের নিকট থাকিয়া উচ্চশিক্ষা অর্জ্জন করিতেছিলেন; োষ্ঠা ভগ্নি শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনী ত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ সুকুমার দত্তর পত্নী, কন্যার জননী আই এ পাশ করেন। বিবাহের সহিত বাঙ্গালী মেয়েরা প্রায় লেখা পড়ার চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন, ইহারা সে দলভুক্ত নহেন।

এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রী

নৃতত্ত্বে—শ্রীমতি প্রীতি মিত্র (১ম শ্রেণীতে) প্রথম।
পদার্থ বিদ্যা— ,, প্রতিমা দাসগুপ্ত (১ম শ্রেণী)।
,, ,, রমা সরকার (দ্বিতীয় শ্রেণী)।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী

ইংরাজীতে—শ্রীমতী আশাতরু সেন, আইভী খাঁ, ইলা গুপ্ত, বাণী রায়, বাণী দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং তারা বেদ্দা, আশা দত্ত, মণিকা নিয়োগী, স্নেহময়ী রায়, নিশা চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কৃততে—শ্রীমতী আত্রেয়ী মজুমদার, প্রতিভা নিয়োগী প্রথম শ্রেণী এবং সন্ধ্যা শশী মুখোপাধ্যায়, মণিকা বিশ্বাস, উমারাণী রায়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলাতে—বিজয়া সেনগুপ্ত, শান্তিপ্রভা দাসগুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে এবং লতিকা সেন, নিলীমা বসু, সুলতা কর, শোভনা গুহ, রমা সেন, জ্যোতিকণা সেনগুপ্ত, বকুল সেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আসামীতে—দুর্গাবতী সইকীয়া ২য় শ্রেণী।

ইতিহাসে—অপরাজিতা রায়, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম, লতিকা রায়, শান্তি রায়, কল্যাণী দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং বীণাপাণি দাসগুপ্ত, পুণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, ইন্দুবালা দাসগুপ্ত তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে—বাণী গুপ্ত, অমিয়া দাসগুপ্ত ও জ্যোৎস্না দেবী দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

দর্শনে—অরুণা সিংহ, ইন্দিরা ঘোষাল ও পুষ্প মুখোপাধ্যায়, তরুণ প্রভা দেবী দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সুহাসিনী রায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

অর্থনীতিতে—শোভনা সেনগুপ্ত, মল্লিকা সেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শান্তি সরকার ও সুকৃতি মজুমদার তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছেন।

টেক্‌ঘড়ি

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

চরিত্রাবলী

রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৪৫—ডেলিপ্যাসেঞ্জার।
অন্নপূর্ণা, ২৫—তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
অজিতলাল, ১৬—ঐ প্রথম পক্ষের ছেলে।
নিতাই, ৮,— ঐ দ্বিতীয় ,, ,,
বলাই ৭;— ঐ ,, ,, ,,
টুনটুনী ৬,— ঐ দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে।
গিরিবালা, ৫৫,—গ্রামেরসকল প্রকার ঘোঁটের কেন্দ্র।
দুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী—৬০, তেজারতী করে।
কালিপদর মা, ৫০, রমণীরঞ্জনের তোলা ঝি।
কালীপদ, ৩২, কলে কাজ করে।
দারোগা।
কন্‌ষ্টেবল।
কণ্ঠস্বর।

ঘটনাস্থল—কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী একটি গ্রাম, নাম, "হৃদয়পুর"।

যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি কলকাতাই ধরণের একখানি সাজানো বৈঠখখানা আমাদের চোখে পড়ে। মঞ্চের মাঝ দেয়ালে বড় বড় গরাদে দেওয়া দুইটা জানালা তাহার ভিতর দিয়া সাম্‌নের বাগান ও রোয়াকের একটু দেখা যাইতেছে। তাহার ওপারে যে রাস্তা তাহা লোক চলাচল হইতেই বোঝা যায়। ডান দিকে অন্দর মহলের দরজা বাঁ দিকে বাহিরের যাইবার দরজা। বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া করাস তাহার উপর গোটাকয়েক তাকিয়া। কয়েকখানা চেয়ার ছিটের খোলে ঢাকা। জানালা দুইটার মাঝখানে একখানি বই-রাখা তাহার উপর একটা দাঁড়ানো ঘড়ি বন্ধ হইয়া আছে। ডানদিকের দেওয়াল জুড়িয়া একখানা লম্বা খোলে ঢাকা সোফা। দেওয়ালের একপাশে আল্‌নায় রমণীরঞ্জনের হেডক্লার্কী পোষাক ঝুলিতেছে। জিনের পেন্টলেন, আলপাকার কোট ও পাগড়ী টুপী। ধুতী ও চটিজুতা পরিহিত র
রঞ্জনের সার্টের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে অন্দর মহ
দরজা দিয়া প্রবেশ।

রমণীরঞ্জন। সর্ব্বনাশ হয়েচে, সর্ব্বনাশ হয়ে
শুন্‌চো গো, ঐ আটটার ভোঁ বাজলো। ভাত বাড়ো
ভাত বাড়ো কাঁচা হাপ্‌ কাঁচা, যা হ'য়েচে তাই বা
ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রাহ্মণ ভাস্বতে। আমার আহ্নিক
হ'লো কোন্‌ কালে। সূর্য্যি মন্তর প'ড়চি, ভেবেছি
বাকীটা গণ্ডুষের সঙ্গে সেরে নেবো, বিষ্টর্ত্তেজসে। রে
রান্না আর শেষ হয় না। আট্‌টা পৈঁতিরিশ
দেখ্‌চি কলা দেখিয়ে চ'লে যাবে। কাল একটা কে
হ'তে হ'তে বেঁচে গেচে। কাল ছোটসায়েব নাকি
না ব'লে ক'য়ে একেবারে আমার ঘরে এসে
ভাগ্যিস্‌ ঘরের কাছে চাপ্‌রাশিটা ছিল, ব'ল্‌লে
গোসলখানামে গিয়ে আভি লৌটেগা।" চাপ্‌রা
আটগণ্ডা পয়সা বক্সিশ্‌ দিতে হ'লো মিথ্যে মিথ্যে।
দেখচি না খেয়েই বেরুতে হ'লো। রোদ চড়্‌চড়্‌
বেলা ক'টা তার ঠিক নেই। (জানালার বাহিরে তা
ক্ষ্যান্তো মেছুনী দেখি এর মধ্যেই ফিরচে।

সে কি, এর মধ্যেই! এই ত আট্‌টার ভোঁ
না! সর্ব্বনাশ, বোধহয় সেটা ন'টার ভোঁ। খে
সর্ব্বনাশ হ'য়েচে। যাক্‌ আজ পিণ্ডি না গিলেই.
হ'লে। (বিরাম) ঘরের মাঝ-মধ্যিখানে ঘড়িটা
রাখা! অজে'টাকে কতদিন বলেচি, বলি ঘড়ি
রবিবার দম দিবি, তা ও ছোঁড়া কি কোনো
তুল্‌বে। আজ দু'হপ্তা হ'লো ঘড়িটা সাড়ে দশ
থেমে র'য়েচে। তাড়াতাড়ির মাথায় এ পটেক
হাত্‌ড়ে টেঁক্‌ ঘড়িটা মিল্‌বে, তবে জান্‌তে পার
বেজেচে! (আলপাকার কোটের পকেট হা
হাতড়াইতে) বুক পকেটে ছিল না! নেই! পাশে

, ভেতরের পকেটে নেই, পেন্টুলেনের পকেটে নেই। ...স্তিতভাবে) নেই! তার মানে? অজিত, নিতাই, ...াই, টুন্‌টুনী। বলি, পকেটে ঘড়িটাকেও কি রাখবার ... নেই। ঘড়িটা যে কে নিলে আমার? (চীৎকার করিয়া) ..., ঘড়িটা কে নিলে আমার? কথাগুলো কি কাণে ...চ্ছ? কে ঘড়ি নিয়েচে, শিগ্‌গির এনে দাও।

অজিত, নিতাই, বলাই ও টুন্‌টুনীর বেগে প্রবেশ।

সকলে। (একসঙ্গে) কী ব'লচো বাবা?

রমণীরঞ্জন। এতক্ষণে কী ব'লচো বাবা! পকেট ...ক ঘড়ি কে নিয়েচে আমার?

সকলে। (বিস্ময়ে) ঘড়ি!

রমণীরঞ্জন (রাগিয়া) হ্যাঁ, ঘড়ি কে নিয়েচে শিগ্‌গির ...লো।

অজিত। (স্থিরভাবে) আমি জানি না বাবা।

নিতাই। (ব্যস্তভাবে, পাছে তাহার দোষ সাব্যস্ত ... সত্যি বল্‌চি বাবা, এই তোমার গা ছুয়ে, আমি ...ার ঘড়ি নিই নিকো। ঘড়িতে আমার কী হবে? ... আমি নিই নি। আর আমি তোমার পকেটের ধারে ...ও কোনো দিন যাই না। হয়তো বলাই, ওই ত যখন ... বাবা তোমার পকেট হাতড়ায় বলে, পেন্সিল ...।

...লাই। (প্রতিবাদ করিয়া) হ্যাঁ বলাই বৈ কি! ...সত্যি ব'লচি আমি তোমার পকেটে পেন্সিল ছাড়া ...কিছু খুঁজি না। তুমি রোজ বলো আমার জন্যে একটা ...ীল পেন্সিল আনবে ক'লকাতা থেকে। তাই ত এক ...র খুঁজে দেখি আছে কি না। ভাবি হয়তো তোমার ... পেন্সিলটা প'ড়ে আছে, আর তোমার সে কথা ...নেই।

...টুনী। আমার ঘড়ির দরকারও নেই, আর আমি ... পকেটে হাত ও দিই না বাবা। মেজদা' সে দিন ...র পকেটে একটা দোয়ানী কুড়িয়ে পেলে। সেটা ভাঙ্গিয়ে আমরা সবাই এক এক পয়সার মিষ্টি বিস্কুট কিনে খেলুম। মেজদা', ছোড়দা আর আমি। আর ছোড়দা' একটা পয়সা পেলে আর আমি একটা।

নিতাই। (রাগিয়া) মিথ্যক! দোয়ানিটা বাবার পকেটে ছিল, না মেঝের ওপর প'ড়ে ছিল সোফার তলায়।

টুন্‌টুনী। (প্রতিবাদ করিয়া) মিথ্যক বৈ কি! আমা... বুঝি দেখি নি! আর বাবাকে ব'লতে বারণ ক'রে দিলে কে?

রমণীরঞ্জন। (ধমক দিয়া) কথার সব এক একটি জাহাজ। ভালোয় ভালোয় বল্‌চি এখনও, ঘড়িটা কে কোথায় লুকিয়ে রেখেচো বার ক'রে এনে দাও, তা না হ'লে একধার থেকে সবাই পিটুনী খাবে। (অজিতের প্রতি) অজে, তুই দু'মাস ম্যাট্রিক দিয়ে ব'সে আচিস্‌, ছোট ভাই বোনগুলোকেও সামলাতে পারিস্‌ না।

গোলমাল শুনিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, তোমার অজিত যদি কাজে... হতো তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কী? কী ছাইভস্ম নে... সারাটি দিন তোমার এই বৈঠকখানায় খাতা পেন্সিল নিয়ে ব'সে থাকে জানালার ধারে। এক ঘটি জল গড়িয়ে দিয়েও উপকার নেই। মেয়েটা সেদিন ঢেঁকির ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে মাথাটা চিপি ক'রলে, অজিত একবার বাড়ীর ভেতর... পর্য্যন্ত মাড়ালে না। ভাত বেড়েচি, খাবে এসো গো বেলা চড় চড় ক'রচে, ক'টা বেজেচে কে জানে!

রমণীরঞ্জন। (রাগিয়া) ভাত না পিণ্ডি! আমা... টেক্‌ ঘড়িটা কে কোন্‌ চুলোর দোরে দিয়ে এসেচো ... ঠিকানা নাই। এখন জিজ্ঞের ক'রচো ক'টা বেজেচে।

অন্নপূর্ণা। তোমার ঘড়িটা?

রমণীরঞ্জন। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার ঘড়িটা, টেক্‌ ঘড়ি।

ক্রমশঃ

শোক সংবাদ

...র্গীয় নারায়ণ চন্দ্র মৈত্র। আলমবাজার ...র নারায়ণ চন্দ্র মৈত্র মহাশয় গত ভাদ্র-মাসে ইহলোক ...করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বহু পরিচিত ...ন্ধব আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিবেন। স্বর্গীয় মহাশয় আজীবন সৎকার্য্যে, সাহিত্য সেবায় এবং হিতৈষণায় যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানে এবং পুরীর বসন্ত কুমারী বিধবা...শ্রমে তিনি কত ভাবে কত যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার মধুর ব্যবহার এবং স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সর্ব্বদা মনে হইয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে। ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন।

বিবিধ সংগ্রহ

খেলা-ধূলা

বাঙালী বালিকাদের বাস্কেট বল খেলা

বাস্কেটবল খেলার প্রতি বাঙালী বালিকাগণের উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্রীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণ পর্য্যন্ত এই খেলায় যোগদান করিতেছেন। ইণ্টার স্কুল ও ইণ্টার কলেজ মহিলা বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। অথচ মাত্র ৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাস্কেট বল খেলায় বাঙ্গালী বালিকা বা যুবতীগণের এইরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। তখন কেবলমাত্র সরকারের অথবা মিশনারী পরিচালিত বালিকা স্কুল বা কলেজের ছাত্রীগণকে এই খেলায় কখনও কখনও যোগদান করিতে দেখা যাইত। এই সকল মিশনারী স্কুল কলেজে বাস্কেটবল খেলার ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই আছে। এই সকল স্কুল ও কলেজের ব্যায়াম পরিচালিকাগণ এই খেলার প্রতি যাহাতে বালিকাগণ আকৃষ্ট হয় ও নিয়মিতভাবে যোগদান করে, তাহার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা অনেক সময়ই বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন শোনা গিয়াছে, "বাস্কেটবল খেলার প্রতি বাঙালী বালিকাগণের উৎসাহ কোনদিনই বৃদ্ধি পাইবে না।" কিন্তু তাহাদের সেই উক্তি যে বৃথা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে তাঁহারাই স্বীকার করেন। তাঁহাদের অনেকেই বর্ত্তমানে বলিয়া থাকেন, "এত অধিক সংখ্যক বাঙালী বালিকা এই খেলা শিক্ষা করিবার জন্ম ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদের শিক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইতেছে।" পাঁচ বৎসরের মধ্যে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল ইহা অনেকেরই কল্পনাতীত; কিন্তু আমরা কোনরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কারণ আমরা জানি এই উৎসাহ বৃদ্ধির মূল কোথায়? খেলার ব্যবস্থা করিলে হয় না, খেলার প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, ইহা বাস্কেটবল খেলাটি বাঙালী বালিকাগণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্ম যাঁহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন প্রথমে খেলা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার পর যখন বহুসংখ্যক ছাত্রী এই খেলা শিক্ষা করিয়াছে দেখা যাইবে তখনই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলে চলিবে। এইরূপ চিন্তা করা তাঁহাদের যে খুবই অন্যায় হইয়াছিল তাহা নহে। যাঁহারা বিভিন্ন খেলা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে দ্রুত প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাই হইতেছে, একমাত্র উপায় যাহার দ্বারা যেকোন খেলা বা ব্যায়াম ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারতা সম্ভব হয়। বাস্কেটবল খেলার প্রতি বর্ত্তমানে বাঙালী বালিকা ও যুবতীগণের যে অভাবনীয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে ইহার প্রসার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলেও আছে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল খেলা

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত ইণ্টার কলেজ হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড চ্যালেঞ্জ বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা, বালিকাগণের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার উৎসাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, ইহা একরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলা চলে। এই প্রতিযোগিতাটি ১৯৩৮ সালে সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে কলেজের ছাত্রীগণের জন্য বাস্কেট বল খেলার এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। ইহার পূর্ব্বে যে কয়েকটী বালিকাদের বাস্কেট বল খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে কেবল মহিলা ক্লাব বা স্কুলের ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিত। এই সকল প্রতিযোগিতায় বাঙালী বালিকাগণ যোগদান করিত না। ১৯৩৮ সালে ইণ্টার কলেজ মহিলা বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইলে, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, প্রতিযোগিতা চলিবে না। প্রথম বৎসরে তিনটি কলেজের ছাত্রীগণ যোগদান করিল। তাহার মধ্যে দুইটি বাঙালী পরিচালিত কলেজ। একটি বাঙালী মহিলা কলেজ এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইল। পর বৎসর দেখা গেল কলিকাতার সকল মহিলা কলেজই যোগদান করিয়াছে

চ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের বাস্কেট বল খেলার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ায়, বাঙলার সর্বত্র বালিকা ও যুবতীগণ এই খেলার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। যে যে স্কুল বা কলেজে এই খেলার ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্কুল ও কলেজের ছাত্রীগণ নিয়মিতভাবে খেলায় যোগ দিতে লাগিলেন। যে যে স্কুল বা কলেজে খেলার ব্যবস্থা ছিল না, সেই সেই স্কুল বা কলেজ ছাত্রীগণের চাপে পড়িয়া খেলার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ তিন বৎসরের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার প্রসার বাঙালী বালিকাগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর মহিলা ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল খেলায় মুসলমান যুবতীগণও যোগ দিয়াছেন। সুতরাং দুই এক বৎসরের মধ্যে বাস্কেট বল খেলায় বাঙলা দেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের বালিকা ও যুবতীগণকে বিনা দ্বিধায় যোগদান করিতে দেখা যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্কেট বল খেলার ইতিহাস

১৮৯১ সালে আমেরিকার ওয়াই এম সি এর এক ব্যায়াম শিক্ষক মিঃ জেমস নেই স্মিথ সর্ব্বপ্রথম এই খেলার প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই এই খেলার আবিষ্কারক। শীতের সময় ঘরের মধ্যে ফুটবল বা বেসবল জাতীয় কোন খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, ইহা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার কৌশল উদয় হয়। তিনি তখন কাল্পনিক খেলাটিকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ওয়াই এম সি এর ছাত্রগণকে লইয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন খেলিবার পর নিয়মকানুন গঠন করা সম্ভব হয়। তাহার পর ওয়াই এম সি এর কর্ত্তৃপক্ষগণকে মিঃ স্মিথ তাঁহার পরিকল্পিত খেলার কথা বলিলে, তাঁহারা খুবই আনন্দিত হন ও খেলার প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ওয়াই এম সি এর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আড্ডা আছে। এই আড্ডার সাহায্যে এই খেলার প্রসার করা সম্ভব হয়। পুরুষগণের মধ্যেই প্রথম এই খেলা প্রসার লাভ করে। স্ত্রীজাতিও যাহাতে এই খেলার যোগদান করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে ঘন ঘন অনুরোধ আসিতে থাকায়, ওয়াই এম সি এর কর্ত্তৃপক্ষগণ বাস্কেট বল খেলার নিয়মকানুনে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মহিলাদের খেলিবার পক্ষে উপযোগী করিয়া দেন। মহিলাদের বাস্কেট বল খেলিবার নিয়মাবলীর সহিত পুরুষদের বাস্কেট বল খেলার নিয়মাবলীর বিশেষ পার্থক্য নাই। মহিলাদের নিয়মে খেলোয়াড়গণ নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাহার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তিন সেকেণ্ডের বেশী বল ধরিয়া রাখিতে পারেন না। ড্রিবল করিবার সময়ই মাত্র বল মাটিতে ঠুকিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্য সকল নিয়ম পুরুষদের মত।

—দেশ

বিচিত্র সংবাদ

ক্যালিফোর্ণিয়ায় লস্ এঞ্জেলস্ সহরে প্যান আমেরিকান্ কর্পোরেশনের তৈলভাণ্ডার পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এতে—৪,১০,০০,০০০ ব্যারেল তেল ধরে।

*   *   *

জগতের কোন দেশে কত পোষ্ট অফিস আছে তাহার একটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)	৪৬,৫৯০
রুশিয়া	৪৬,৬৫২
জার্ম্মাণী	৪৫,৯৯৪
চীন	৪২,৬৮৬
ভারতবর্ষ	২৪,১৪৬
গ্রেটব্রিটেন	২৩,৮৫৩
ফ্রান্স	১৭,০০৩
ক্যানাডা	১২,০৩৯
ইটালী	১১,৬০৫
জাপান	১০,৮৯১
অষ্ট্রেলিয়া	৮,০৫৪
ব্রেজিল	৪,৫১৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩,১৮২
আয়ারল্যাণ্ড	২,২৮৩
নিউজিল্যাণ্ড	১,০৭১
তুরস্ক	৮০৪
দক্ষিণ রোডেশিয়া	৩১৫
ড্যানজিগ	০৭
ভেটিকান	৪
জিব্রালটার	২

কেন্দ্র সমিতির কথা

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে সান্ধ্য মজলিস্ কর্ত্তৃক যাত্রাভিনয়

গত সেপ্টেম্বর মাসে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যের জন্য ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বালিগঞ্জের সান্ধ্য মজলিস "কর্ত্তৃক "ভদ্রার্জ্জুন" যাত্রাভিনয় হয়। এই যাত্রাভিনয়ে ১২১৪৲ টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছিল। সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় এই সমিতির সাহায্যার্থে যাত্রার টিকেট কিনিয়া সমিতির কার্য্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য সমিতি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

"সান্ধ্য মজলিস" নামমাত্র খরচে সমিতির সাহায্যের জন্য যে অভিনয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তজ্জন্য কেন্দ্র সমিতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও শিল্পীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

টিকেট বিক্রয় ব্যাপারে মিস্ হেমনলিনী মল্লিক যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় সমিতি বেশী টাকার ক্রিকেট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এজন্য মিস্ মল্লিক সমিতির ধন্যবাদার্হ। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী ও কর্ম্মচারীগণ সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছেন।

ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ উহার বর্ত্তমান সেক্রেটারী অল্পভাড়ায় উক্ত হলে অভিনয় করিবার সম্মতি প্রদান করিয়া সমিতির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য উহার কর্তৃপক্ষের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ।

অভিনয়ের শেষে শ্রীযুত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেন্দ্র সমিতিকে ১০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী অভিনয়ান্তে সান্ধ্য মজলিসের কর্ত্তৃপক্ষ, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও পোষিকাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বগুড়া মহিলা সমিতি ঃ—

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে কেন্দ্র সমিতি হই[illegible] শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ও শ্রীযুত সুধীর লাল সর[illegible] বগুড়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান! বগু[illegible] সন্নিকটে একটী মুসলমান মহিলা সমিতি গঠিত হই[illegible] শ্রীযুক্তা ঘোষ ঐ সমিতিও পরিদর্শন করেন।

জলপাইগুড়ি মহিলা সমিতি ঃ—

শ্রীযুক্তা নির্ম্মল নলিনী দত্ত ও স্থানীয় কতিপয় মহিলার প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়িতে একটী মহিলা সমিতি গ[illegible] হয়; কেন্দ্র সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা ঘোষ ও শ্রীযুত সর[illegible] তথায় গমন করেন। স্থানীয় H E. School এ এক[illegible] মহিলা সভার অধিবেশন হয়। উক্ত স্কুলের Head mistress এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণ এই সভার ব্যবস্থা করেন।

প্রথম শ্রীযুক্তা ঘোষ সমিতির উদ্দেশ্যে কার্য্যাবলী ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে শ্রীযুক্তা সরকার ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন সমিতির কার্য্যাবলী ও প্রয়োজনাদি বুঝাইয়া দেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ঃ—

উক্ত সমিতি কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

"ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন" কর্ত্তৃক প্রস্তা[illegible] "দি ক্যালকাটা পাবলিক মেডিকেল সার্ভিস্ স্কীম্" [illegible] পরিণত হইলে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিশেষ সুবিধা হ[illegible] কলিকাতায় নিজ গৃহে সহজে ও সুলভে ডাক্তারী সা[illegible] পাইবার তেমন বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। এই স্ক[illegible] কার্য্যে পরিণত হইলে অল্প খরচেই নানাবিধ ডাক্তা[illegible] সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে।

দেশের বর্ত্তমান এই দুর্দ্দিনে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যক। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

পুস্তক পরিচয়

মায়ের দান, উপন্যাস—মহারাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—মূল্য ১৲ টাকা।

কৃষ্ণ নগরের রাজবংশ চিরদিনই সাহিত্যানুরাগী এবং বঙ্গ সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ না পাইলে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ হইত না। কিন্তু এই রাজবংশের কেহ নিজে সাহিত্য সেবা করেন নাই। মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীই প্রথম পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। বড় ঘরের দুলালী ও বধূকে [illegible] সাহিত্যের সেবিকা হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। [illegible] করি তাঁহার এই উদ্যম। এইখানেই শেষ হইবে না বই[illegible] ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় যথার্থই বলিয়াছে[illegible] "বাংলার জমিদার বংশের প্রকৃত ছবি এই ক্ষুদ্র উপন্যা[illegible] চিত্রিত হইয়াছে। নূতন লেখিকার পক্ষে পুস্তকখানি[illegible] ঘটনা সংস্থান অর্থাৎ (প্লট) এবং ভাষা মন্দ হয় নাই[illegible] লেখিকা জমিদার গৃহিণীর যে আশ্রিতবাৎসল্য এবং [illegible] জ্ঞানের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা খুব দরদের সহিত [illegible] হইয়াছে। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুখপাঠ্য।"

কবিগুরুর আরোগ্য লাভ

গদ্বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্ব্বে পং এ অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশবাসীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে তাঁহাকে তায় যোড়া সাঁকো বাটীতে আনা হয়। বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক এবং আশঙ্কার আর কারণ নাই।

হার এই অসুস্থতার সংবাদে প্রত্যেক বাঙালীর অন্তর এতখানি বিচলিত হইয়াছিল [illegible] পূজার আনন্দে তাহারা ভালরূপে যোগদান করিতে [illegible] নাই।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন; বিশ্বের সর্ব্বত্র আজ তিনি বন্দিত হইতেছেন তথাপি বাঙালী তাঁহাকে এতই আপন জন মনে করে যে তাঁহার আরোগ্য সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলেই ম্রিয়মান ছিলেন। তাঁহার আরোগ্য লাভের জন্য আমরা ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

নিবেদন—

আজ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় ও সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপন দাতাগণ, ও সমিতির গণ প্রভৃতির আন্তরিক সহানুভূতি এবং অনুগ্রহে বঙ্গলক্ষ্মীর ১৫শ বর্ষ কার্ত্তিক সংখ্যায় পূর্ণ হইল পঞ্চদশ বৎসর যাবত সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে বঙ্গলক্ষ্মী যে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আছে, আশা করি আগামী অগ্রহায়ণ মাস, অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষেও তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইবে না।

নববর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাদি ও বিভিন্ন চিত্রসম্পদে অধিকতর মনোরম করার জন্য করা হইবে। এক কথায় অগ্রহায়ণের বঙ্গলক্ষ্মীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা য় ও পরিশ্রমের কোন প্রকার কার্পণ্য সরোজনলিনীদত্ত নারী মঙ্গল সমিতি হইতে করা হইবে না। ন যুদ্ধের দরুণ কাগজ পত্রের মূল্যাধিক্য সত্ত্বেও আমরা বঙ্গলক্ষ্মীকে পূর্ব্ব মূল্যেই লোক মনোরঞ্জক ার চেষ্টা করিব। আশা করি, মহিলাদিগের উন্নতি-বিধায়ক এই পত্রিকাখানিকে সকলেই বিশেষতঃ লাগণ নানাভাবে সাহায্য করিবেন।

যাঁহারা নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হ'ন। াতন গ্রাহক গ্রাহিকারা অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্ব্বপ্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা আগামী কার্ত্তিক মাসে শেষ হইয়া ইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নববর্ষের বার্ষিক চাঁদা কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই মণিঅর্ডার যোগে ঠাইয়া বাধিত করেন। তাহা হইলে আর তাঁহাদের অনর্থক ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না এবং যাহারা ঃ পিঃ তে নববর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী লইতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও যেন পত্রযোগে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে জানাইয়া নুগৃহীত করেন।

কার্ত্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমাদের পুরাতন গ্রাহকদের নিকট তে কোন আদেশ বা মণিঅর্ডার না পাইলে বুঝিব যে ভিঃ পিঃ গ্রহণে সম্মতি আছে।

৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে আমরা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার পত্রাদি না লে, ১০ই অগ্রহায়ণের পর হইতে পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট দেয় বার্ষিক চাঁদার জন্য ায়ণ সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে াদের অবহেলা বশতঃ কোন ভিঃ পি ফেরৎ আসিয়া অযথা নারীমঙ্গল সমিতিকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। নিবেদন ইতি—

বিনীত
কার্য্যাধ্যক্ষ
বঙ্গলক্ষ্মী

এই মধুগন্ধি পাত্র

ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে মদ্য নিরোধ নিয়ে পরীক্ষা সুরু হবার পর থেকে ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড সুরার বদলে চা-পানের প্রচার কার্যে নিযুক্ত হন। এই নতুন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার কথা ভেবে অধুনা লুপ্ত "ইংলিশম্যান" কাগজে প্রকাশিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাদের আজ মনে পড়ছে। এই প্রবন্ধে লেখা ছিলো ঃ

"সম্প্রতি ইংরেজ জাতির পানাভ্যাসে যে পরিবর্তন এসেছে তার মূলে রয়েছে চা। মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন যে সফলতা লাভ করেছে তার জন্যও দায়ী চা। চায়ের প্রভাব না থাকলে ১০০ বছর আগেকার সেই মদ্য-প্রিয়তা আজও কমতো না—চা-ই আজকাল পানদোষের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

"অবসন্ন উৎসাহ আর কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তুলতে চা সবচেয়ে ভালো আর চায়ের প্রক্রিয়া দেখি মনের প্রশান্ত অবস্থাতে। মেয়েদের সুক্ষ্ম কাজে চা একটি প্রধান সহায়। ভদ্রতার কাঠিন্যকে চা সহজ করে তোলে আর আলাপ-আলোচনাকে ক'রে প্রাণবন্ত ও সরস। চা সামাজিক জীবনের আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

মদ্যপায়ীর মদ খাবার আকাঙ্ক্ষাটাকে চা অনেক পরিমাণে দমন করে অবশ্য—এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চা পানকারী লোকদের এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে সস্তা দরের চা কিনলে তা শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে না। বরংচ চায়ের পেছনে দু'এক পয়সা বেশি খরচা করলে সে খরচ সার্থকই হয়।

"আজকাল সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই চা খাওয়ার চলন হয়েছে। বাস্তবিক এ অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ অসাধারণ। বাড়ীতে কিম্বা বাড়ীর বাইরে যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে—যেখানেই মেয়েরা উপস্থিত থাকে চা-সার্বজনীন পানীয়। তার কারণ, চা সবার ভিতরে এ[illegible] আনন্দের ভাব ছড়িয়ে দেয়।

এ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে[illegible] উপযোগিতা সপ্রমাণ। বিশেষ করে এ-দেশে সকা[illegible] ঘুম থেকে উঠেই বেড়াতে কিম্বা কাজ করতে [illegible] আগে এক পেয়ালা চা না পেলে যে আমরা কি কর[illegible] ভাবতেই পারি না।"

অধুনা মদ্য বর্জন আন্দোলনের সপক্ষে চা [illegible] করেছে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতারা তার উচ্ছসিত [illegible] করেছেন। মাদ্রাজে সেইলেম্ জেলায় যখন প্রথম [illegible] সুরু হয়, এবং তাড়ির দোকানগুলোকে চায়ের [illegible] পরিবর্ত্তিত করা হয়, তখন এই রকম একটি দোকান উ[illegible]ধনের সময় মাদ্রাজের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত [illegible] গোপালাচারিয়ার সর্বপ্রথম এক পেয়ালা চা খেয়ে [illegible] জনসাধারণের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করে[illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করেন যে "তাড়ি[illegible] দেহ থেকে তাড়ির চিহ্ন মুছে ফেল্তে চা বিশেষ স[illegible] করবে।"

মধ্য প্রদেশের আবগারী ও ব্যবসায় বিভাগের [illegible] মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি, জে, ভারুকা বলেছেন যে আগে যার[illegible] খেতো তাদের পক্ষে চা বিশেষ উপযোগী। এই [illegible] এই বিভাগের আর একজন মন্ত্রী, পি, বি, গোলে[illegible] একটি তাড়ির দোকানের স্থানে চায়ের দোকানের [illegible] করতে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ "অ[illegible] জায়গায় তাড়ির গন্ধ ভুরভুর করতো আজ সেখানে পাচ্ছি তাজাকরা পানীয় মধুগন্ধি চা।"

Printed by A. C. Sarkar at the Classic Press, 21, Patuatola Lane
and Published by him from 60B, Mirzapur Street, Calcutta.